"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বৈশাখের সূচি

জ্যৈষ্ঠের সূচি
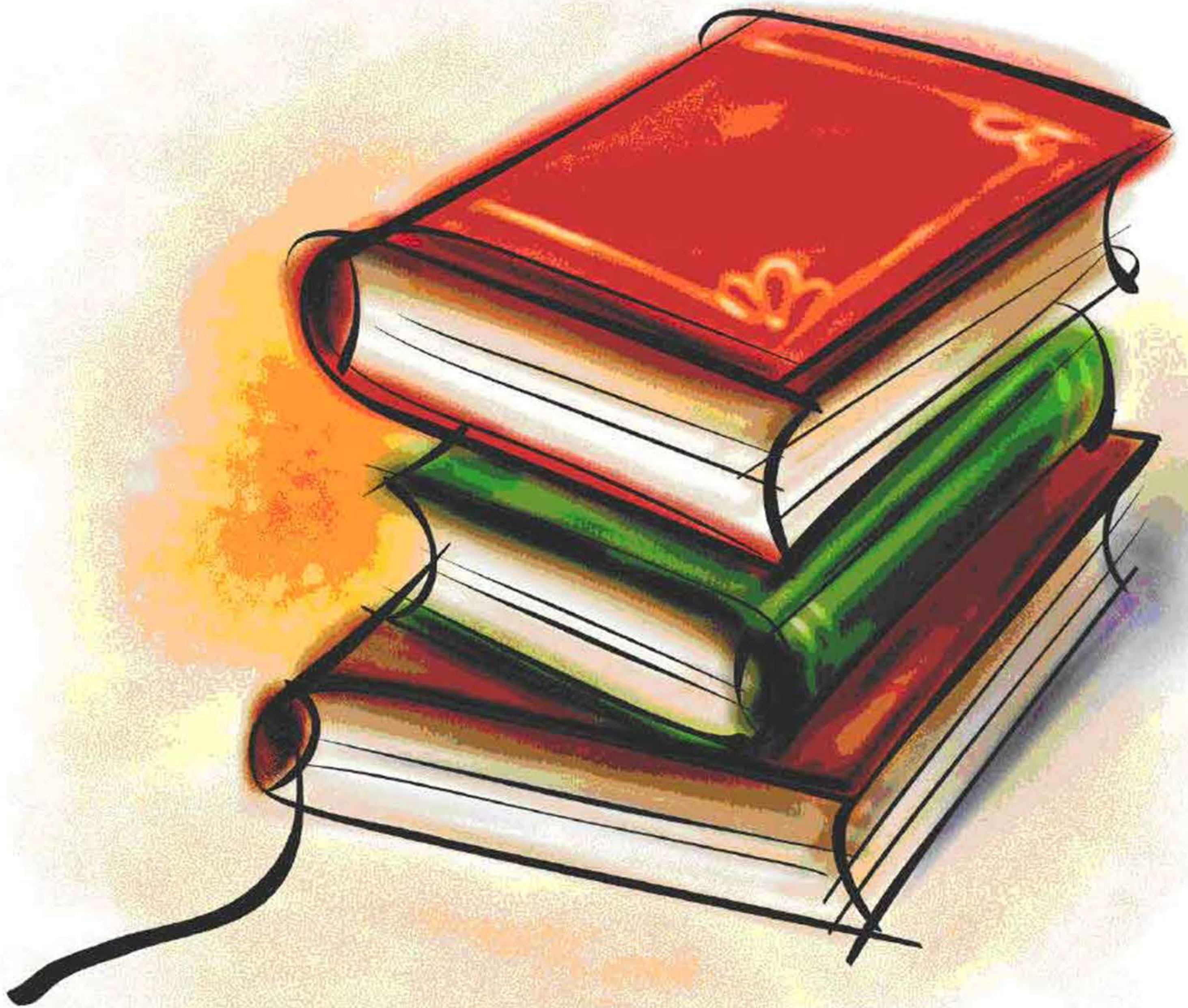
অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নামোল্লেখ করিবেন।

আষাঢ়ের সূচি

—০:০:০—

শ্রাবণের সূচি

—০:০:০—

ভাদ্রের সূচি

—০:০:০—

আশ্বিনের সূচী—

কার্ত্তিকের সূচী

অগ্রহায়ণের সূচী

পৌষমাসের সূচী

(ক) ভারতের পণ্য

(খ) মুষ্টিযোগ ও স্বাস্থ্য কথা

(গ) চিকিৎসা সহায়

ব্যবসা ও বাণিজ্যের
বীমা-বার্ষিকী

বাহির হইয়াছে

এজেণ্ট ও বীমাকর্ম্মীদিগের পুস্তক খানি পাইবার অপূর্ব্ব সুযোগ !!

এতবড় পুস্তকের ডাকমাশুল বেশী লাগে বলিয়া আমরা এজেণ্ট ও বীমাকর্ম্মীদিগকে নিজ নিজ কোম্পানীর মারফতে পুস্তক লইতে পরামর্শ দিতেছি। তাঁহারা যদি কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিত "বীমা বার্ষিকী" একখানি পাঠাইয়া দিতে বলেন, এবং তাহার মূল্যাদি তাঁহাদের প্রাপ্য কমিশন একাউণ্ট হইতে পরে কাটিয়া লইতে অনুরোধ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নগদ দাম ও মাশুলাদি পাঠাইতে হইবে না, পরে অতি সহজেই কমিশন হইতে দাম উশুল হইয়া যাইবে।

ইহাতে পুস্তকখানি যেমন তাঁহারা এখনই পাইয়া যাইবেন তেম্‌নি তাহার দামও পকেট হইতে নগদ বাহির করিয়া দিতে হইবে না। নিজের নিজের earning হইতেই কোম্পানী তাঁহাদের পক্ষ হইতে দাম দিয়া দিবে।

পুস্তকের মূল্য—২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার ব্যবসা ও বাণিজ্য আপিশ
৯৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাঘ মাসের
সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

ফাল্গুন মাসের সূচী

চৈত্র মাসের

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

— —

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ | বৈশাখ---১৩৪৫ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষের অভিবাদন

যাহার কৃপায় আজ "ব্যবসা ও বাণিজ্য" অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইল, আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া নববর্ষে পদক্ষেপ করিতেছি। এই দীর্ঘকাল নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইবার শক্তি তিনিই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। নিরাশার ঘোর অন্ধকারে তিনিই সকল দুঃখ ক্ষতি সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছেন; তিনিই আমাদিগকে আশার আলোক দেখাইয়াছেন। হতাশায় যখন মনপ্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং অকূলপাথারের মধ্যে যখন কোনও কূল কিনারা দেখিতে পাই নাই, তখন তিনিই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন,—

> নিশিদিন ভরসা রাখিস্
> ওরে মন হবেই হবে
> যদি পণ করে থাকিস্
> সে পণ তোর রবেই রবে।

নববর্ষে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া নববলে বলীয়ান হইয়া আমরা পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপন দাতা সকলকেই আমরা নমস্কার জানাইতেছি। আমাদের পত্রিকার চিন্তাশীল লেখক, গুণগ্রাহী ও দোষদর্শী সমালোচক, সমব্যবসায়ী সহযোগী সকলকেই প্রীত্যভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

দেশের উন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা সকলেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে চাকুরীর দ্বারা অন্ন-সংস্থান অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট, রেল কোম্পানী, মিউনিসিপালিটী এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

সমূহ দেশের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা দুই তিন জনের বেশী লোককে চাকুরী দিতে পারে না। খুব উন্নত দেশেরও এই অবস্থা। অধিকাংশ, লোককেই কৃষি, শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। সুতরাং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই জনসাধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কৃষক, শিল্পকার, এবং ব্যবসায়ী,—ইহারাই দেশের ধনবৃদ্ধি করতঃ দেশকে সমৃদ্ধশালী করে,—কেরাণীরা নহে। এই জন্যই লোকে বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ [illegible] কৃষি কর্ম্মণি।"

ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলেও জনসাধারণের কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও মতিগতি এখনও ব্যবসায়ের অভিমুখীন হয় নাই,—যাহাকে ইংরাজীতে বলে Business minded; দেশের মধ্যে ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষার অভাব ইহার একমাত্র কারণ। যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজী শিক্ষার মধ্যে ব্যবসায় বিষয়ক শিক্ষাও প্রচলিত করিয়াছেন,—(আই-কম্, বি-কম্ ও এম্-কম্) তথাপি উহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয় নাই এবং দেশব্যাপী দুঃখ দারিদ্র দূর করিতেও পারে নাই। কলেজের ফেরতা, আই-কম্, পাশ করা অথবা বি-কম, এম-কম্ ডিগ্রীধারী যুবকগণ চাকুরীর জন্যই লালায়িত হয় বেশী,—ব্যবসার দিকে ঝোঁকে না।

পুনশ্চ, ব্যবসার যাহা মূল ভিত্তি, সেই কৃষি ও শিল্প শিক্ষার কোন ব্যবস্থা দেশে নাই। গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে যে-টুকু হয় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ। দেশের মধ্যে বৃহদাকারের কোন এগ্রিকালচার্যাল কলেজ অথবা ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল নাই। সেই জন্য লোকের অন্তরে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলেও, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিবার কোন পন্থা খুঁজিয়া পায় না। আমাদের কাছে মাসে মাসে বহু সংখ্যক চিঠি আসে, তাহাতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠকগণ দেখিয়াছেন, আমাদিগকে অনেক সময় একটু অপ্রীতিকর এবং কিঞ্চিৎ কঠোর ভাষায় সেই সকল চিঠির জবাব দিতে হয়। জনসাধারণের ব্যবসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত এবং পরিস্ফুট করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক এবং কৃষি শিল্প সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই মাসিক পত্রিকার সাহায্যেই এইরূপ শিক্ষার প্রচার কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ,—একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এই পথে লইয়া আসা,—ইহাকে বলা যায়, প্রপ্যাগাণ্ডা (Propaganda) বা প্রচার কার্য্য। অন্যদিকে নানাবিধ শিল্প ও ব্যবসায়ের সন্ধান ও নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা;—ইহাকে বলা যায় ব্যবসায়ের সন্ধান ও নানারূপ secrets বা গুপ্ত তত্ত্বের আলোচনা, যাহা কোনও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন এবং জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী মূলধন, মনোবৃত্তি, সাধ্য এবং ক্ষমতা আছে কি না তাহার বিচার বিবেচনা। আজ ১৮ বৎসর যাবৎ আমরা এই দ্বিবিধ কর্ত্তব্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা,—যাঁহারা ছাপাখানার কারবার করেন তাঁহারা, এবং যাঁহারা মাসিক পত্রিকা পাঠ করেন তাঁহারা—এই দুই শ্রেণীর লোকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারেন। বাংলাদেশে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যের মধ্যে এত কল্পনা, কাহিনী, অলীকতা, গল্প এবং তরল চিন্তার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে যে, কোন গভীর ভাব, সত্যিকার ঘটনা, সুচিন্তিত সমালোচনা, তত্ত্বানুসন্ধান স্পৃহা—এ সকল আর লোকের মনে স্থান পায় না। সকলেই যেন কাতুকুতু খাইয়া হাসিতে চায়,—স্বাভাবিক প্রেরণায় হাসিতে চাহে না। যে সকল পত্রিকায় হাস্যোদ্দীপক, উন্মাদনাকর চিত্র—রোমাঞ্চকর গল্প,—সিনেমা-থিয়েটারের কথা—ভদ্রঘরের কুৎসা কাহিনী,—পরনিন্দা-পরচর্চ্চা,—দলাদলি, গালাগালি,—এ সব না থাকে,—সেই সকল পত্রিকা বাজারে চলে না,—তাহাদের দুর্দ্দশা একেবারে চরমে উঠে।

১৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন "ব্যবসা ও বাণিজ্য" লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলাম, তখন আমাদের বাধা বিঘ্ন ছিল অন্য রকমের। রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা নূতন তরঙ্গ জনসাধারণের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশী যুগের সুফল স্বরূপ দেশের মধ্যে বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল,—লোকের মনে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে ভাবে আসক্তি জন্মিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হয়। লোকের চিন্তা-ধারা এবং কর্ম্ম প্রচেষ্টা অন্য দিকে চলিতে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ না হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হওয়া অসম্ভব এবং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বহস্তে সুতা কাটিয়া তদ্দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিলেই সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ হইবে, এইরূপ ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। সুতরাং দেশের মধ্যে কলকারখানা স্থাপনের চেষ্টা কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকে। সেই আন্দোলনের একটা সুফল পাওয়া গিয়াছিল এই যে, কুটীর শিল্পের উন্নতির দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ে এবং আমরাও সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের পত্রিকায় বিবিধ কুটীর শিল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও চিত্রাদি সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকি। ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থা ফিরিতে লাগিল। এখন লোকে ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পন্থার সন্ধান পাইয়াছে।

প্রবল বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই যে দেশের উন্নতির হিসাব আমরা রাখিনা তাহা নহে। আমরা দুঃখবাদী (Pessimist) নহি; অফুরন্ত আশায় আমাদের হৃদয় ভরপুর; ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোক আমাদের চোখে পড়ে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাংলা দেশের একটা গৌরবময় স্থান আমরা দেখিতে পাইতেছি। সেই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া আজ ১৮ বৎসর ধরিয়া এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা স্থির লক্ষ্যে সম্মুখের দিকে চলিয়াছি, কখনও পিছাইয়া পড়ি নাই। আমরা সংগ্রাম ব্যতীত সিদ্ধি লাভের আশা করি না।

বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশীয় মূলধনে গঠিত এবং স্বদেশীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অনেক কাপড়ের কল, পাটের কল, চিনির কল, তেল-সাবান, গন্ধ দ্রব্য, ঔষধাদির কারখানা, বীমার কারবার,

ব্যাঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, বিজলী সরবরাহের কারবার, চামড়ার জিনিষের কারখানা, বিস্কুট, লজেন্স, পেন্সিল, কলম, পিস্‌বোর্ড, রবার, প্রভৃতির ফ্যাক্টরী বাংলাদেশে স্থাপিত হইয়াছে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাঙ্গালী গত ৩০ বৎসরের মধ্যে যে ফল লাভ করিয়াছে, তাহা নৈরাশ্য জনক নহে। কিন্তু একথাও ঠিক, এই উন্নতি বাংলাদেশের চরম উন্নতি নহে, আমাদিগকে আরও অনেক অগ্রসর হইতে হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকা পরিচালনের একটা গুরুতর বাধা এই যে, ইহার পাঠক সংখ্যা অতি স্বল্প; বিশেষতঃ আমাদের বাংলাদেশে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের মাসিক ও সাময়িক পত্রগুলি আজ নারীর ছবি ও প্রেমের গল্পে ভরা। রং-চঙ্গে মলাটে বাঁধাই পত্রিকার আদরই বেশী। কিন্তু লোকে আসল কথাটী বুঝেনা। যাঁহারা রেস্তোরাঁয় বসিয়া অথবা ইজি-চেয়ারে দেহ এলাইয়া ঐরকম ছবি ও গল্পের পাতা উল্টাইতে থাকেন, তাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের চা-বিস্কুট-চুরট-দিয়াশলাই হইতে আরম্ভ করিয়া জামা-জুতা ধুতি-সাড়ি-ক্রীম-স্নো সমস্তই জোগায় দেশবিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান সমূহ।

দোকানদারী, চালানী কারবার, এজেন্সি, ম্যানুফ্যাক্‌চার, অর্থাৎ কোন জিনিষ তৈয়ারী, বীমা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলেই, রীতিমত পড়াশুনার দরকার, এই কথাটী আমাদের দেশের লোক বুঝেনা। তাহাদের বিশ্বাস, দোকান খুলিয়া বসিলেই জিনিস পত্র বিক্রয় হইবে, কারখানার ইঞ্জিন ঘুরাইলেই মাল তৈয়ারী হইবে এবং মাল তৈয়ারী হইলেই তাহা বাজারে কাট্‌তি হইবে। ইহার জন্য যে পুস্তকাদি পড়িয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, এ ধারণা অনেকের নাই। আমাদের দেশে প্রধানতঃ এই কারণেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়না, এবং এই কারণেই চল্‌তি ব্যবসায়ও নষ্ট হইয়া যায়।

কেহ কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া সেই সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিবরণ বন্ধুদের নিকট অথবা অন্যকাহারও কাছে মৌখিক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহেন। আমরা এইরকম অনেক চিঠি পত্র পাইয়া থাকি। ঐসকল পত্রলেখক মনে করেন "তুড়ি মারিয়াই কেল্লা ফতে করা যায়।" তাঁহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি সংশোধিত করিবার জন্য আমরা আমাদের পত্রাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে জপমন্ত্রের মত প্রতিবারে একটি ভূমিকা ছাপিতেছি। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা বোধ ও মর্য্যাদা জ্ঞান জাগ্রত হউক, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকের ধারণা চাকুরী করিতেই বিদ্যাবুদ্ধির দরকার, চাকুরীর জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশকরা অথবা ডিগ্রী লওয়ার প্রয়োজন। ব্যবসা করিতে সে সবের কোন আবশ্যকতা নাই। এই মারাত্মক ভুলেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যে ছেলেটী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলনা, যার লেখাপড়া কিছুই হইলনা, সেই ছেলেকে পিতা মাতা দিলেন দোকানদারী করিতে অথবা কারবার চালাইতে। তার ফলে, বৎসর না যাইতেই সেই ছেলে দোকান কারবার ফেল করিয়া বাপমায়ের টাকা রসাতলে ঢালিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল! আমাদের দেশের যে সকল যুবক

ব্যবসা আরম্ভ করিতে যায়, তাহাদের শোচনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এই!

ছোট হউক, বড় হউক, মুদি দোকান, রেস্তোরা, লণ্ড্রি, সেভিং সেলুন, কাপড়ের কারবার, মালচালানী, ষ্টেসনারী সপ্‌ প্রভৃতি যে-কোন ব্যবসা করিতে হয়, তারজন্য হাতে কলমে কাজ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিষয়ে অবিশ্রান্ত পড়াশুনা করাও এবং খোঁজ খবর রাখা একান্ত আবশ্যক। যতদিন এধারণা লোকের না জন্মিবে, ততদিন ব্যবসা বাণিজ্যে সফলতা লাভ অসম্ভব।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রত্যেক ব্যবসার পৃথক পৃথক জার্নাল্, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র আছে। সেখানকার মুদি, ধোপা, নাপিত, মুচি কলু, চাষা, তাঁতি, কাঁসারী, প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা নিয়মিতরূপে নিজ নিজ ব্যবসায় সংক্রান্ত সাময়িক পত্র পাঠ করিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন জ্ঞানলাভ করে। তাহারা দেশ বিদেশে কালের গতি ও সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া অগ্রসর হয়, সুতরাং তাহাদের ব্যবসা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা নাই।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এদেশে বাদশাহী ও নবাবী আমল হইতে আলবোলায় তামাকুর ধূমপান প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে বাবুদের বৈঠকখানা বা Drawing Room এ যাহারা "বয়" "বেয়ারার" কাজ করিত তাহাদের নাম ছিল ফরাস্‌দার, বাতীবরদার, হুঁকাবরদার, ছাতাবরদার ইত্যাদি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অবস্থাতে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিরাও আলবোলায় ধূমপান করিতেন। কিন্তু ইহা একটী বৈঠকী নেশা; অলসভাবে উপভোগ করিবার জিনিস। যখন ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে মানুষের দৈনিক কর্ম্মজীবন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন আর বাদশাহী আমলের আলবোলা সঙ্গে রাখা অসুবিধাজনক ও অসম্ভব হইয়া উঠিল। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করে। তথাকার চিন্তাশীল ব্যবসায়ী লোকেরা এই বিষয় লইয়া ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রে আলোচনা করিতে থাকেন। তাহার ফলে আজ বার্ডসাই, সিগার, ও সিগারেটে পৃথিবীর বাজার ছাইয়া গিয়াছে এবং সেই সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চাত্য দেশের তামাক ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিয়া নিতেছে।

সংবাদপত্রে কোয়েকার ওটসের বড় বড় বিজ্ঞাপন অনেকেরই নিশ্চয় চোখে পড়ে; কনূক্ কমার ও অয়েলম্যান ষ্টোর্সের দোকানে সারি সারি সজ্জিত কোয়েকার ওটসের টিন্ অনেকে দেখিয়াছেন; অনেকে উহা ব্যবহারও করিয়া থাকেন; কিন্তু কেহই বোধ হয় ধারণাও করিতে পারেন না যে একমাত্র বাংলাদেশেই কোয়েকার ওট্‌স্ বিক্রয় হয় বৎসরে ৬ লক্ষের উপর। এই কোয়েকার ওটস্ জিনিষটী কি? ইহা ঠিক আমাদের দেশের চিঁড়ের মত। ধানকে জলে ভিজাইয়া খোলায় একটু ভাজিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া যেমন চিঁড়ে তৈয়ারী হয়, ওট্ (Oat) বা জইকেও সেইরূপে ভিজাইয়া ভাজিয়া ও কুটিয়া তৈয়ারী করা হয়। উভয়ের মধ্যেই ভিটামিন বজায় থাকে সুতরাং পুষ্টিকারিতা হিসাবে কেউ কারো অপেক্ষা কম নয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা দ্রব্যগত নয়, ব্যবসা বুদ্ধিগত এবং এই প্রভেদের জন্যই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়।

প্রভেদটী এই,—আমাদের চিঁড়ে যেমন অপবিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় তৈয়ারী হয়, এবং যেমন নোংরা ভাবে দোকানে থাকে তাহা বর্ত্তমান যুগের খরিদ্দারদের মনোবৃত্তির বিরোধী। সকলেই আজকাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিসটী চিনে,—বেশ সাজান-গোজান;—গুছান-গাছান। কিন্তু দোকানে গেলে যে অবস্থা দেখা যায়, তাহাতে আর চিঁড়া কিনিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য চিঁড়ে আমাদের দেশে মুটে-মজুর, চাকর-বাকরদের খাদ্যরূপে গণ্য হইয়াছে,—উহা যেন ভদ্রলোকের খানায় পরিবেশন করিবার অযোগ্য। চিঁড়ার এই দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে বুদ্ধিমান বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা। তাহারা বাছাই করা পরিষ্কার জই গুলিকে পরিচ্ছন্ন স্থানে এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে তৈয়ারী করিয়া এমন সুন্দর টিনের কৌটায় প্যাক করিয়া লেবেল আঁটিয়া বাজারে বাহির করিল যে উহা সহজেই খরিদ্দারের নিকট লোভনীয় হইয়া উঠিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্যাক করা ওট্‌স্-গুলি অনেক দিন যাবৎ সুস্বাদু এবং ভাল থাকে। আমাদের চিঁড়ের মত পোকায় ধরিয়া বা ছ্যাত্‌লা পড়িয়া নষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় না। এখন সৌখীন বাবুরা অয়েলম্যান্ ষ্টোরে যাইয়া কোয়েকার ওট্‌সের টিন্ কিনিয়া আনে,—সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসিয়া বেশ আরামের সহিত উহা উপভোগ করেন। ইহার তুলনায় উড়ে দোকানের নোংরা হাতের চট্‌কান,—ধূলোবালি মাখান, পোকায় ধরা কাগজের ঠোঙ্গায় ভরা চিঁড়ে চিবাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয়না।

স্বদেশী শিল্পের উন্নতির কথা খুব ঢাক ঢোল পিটিয়া আলোচিত হয়,—কলকারখানা—এক্সপার্ট, টেক্‌নিক্, সায়েন্টীফিক্ মেথড্‌স্ (Scientific methods) প্রভৃতি নানা বিষয়ের কচ্‌কচিতে কান্ ঝালা পালা করিয়া দেয়,—বেকার যুবকেরা কি করিবে, খুঁজিয়া পায় না—কিন্তু আমাদের দেশে এই যে চিঁড়ে, মুড়ি, আচার, মোরব্বা,—চাটনী, কাসুন্দী, বড়ি-মোয়া—প্রভৃতি সহজ লভ্য প্রয়োজনীয় মুখ-রোচক খাদ্য দ্রব্যগুলিকে নূতন ভাবে সভ্য জগতের এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার চেষ্টা কাহারও নাই।

কেন নাই?—এ প্রশ্নের উত্তর—এই,—কেহ পড়াশুনা করিবে না, ব্যবসায় সম্বন্ধীয় সাহিত্য কেহ আলোচনা করে না। আকাশ হইতে "আইডিয়া" সৃষ্টি হয় না,—বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য অথবা কৃষি শিল্প সম্বন্ধে কোনরূপ আবহাওয়া নাই। 'আইডিয়া' (Idea) বা বুদ্ধির সন্ধান পাইতে হইলে প্রচলিত ব্যবসায় সাহিত্য রীতিমত পড়ার দরকার। কাপড়, কাগজ, চিনি, রবার, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, সাবান প্রভৃতি বড় বড় শিল্পের জন্য যেমন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি বিশেষরূপে পড়িতে হয়, তেমনি সাময়িক পত্রাদিও নিয়মিতরূপে পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু চিঁড়া মুড়ির উন্নতি করিয়া উহাদিগকে নূতন ভাবে বাজারে প্রতিষ্ঠিত করিতে কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু মাথায় "আইডিয়াটী" আসা দরকার। সেই আইডিয়া বা বুদ্ধি পাইতে হইলে ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রিকা রীতিমত পাঠ করা আবশ্যক।

১৮ বৎসর ধরিয়া আমরা আমাদের এই ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় এই রকম নানাবিধ

ব্যবসায়ের সন্ধান-সুলুক দিয়া আসিতেছি, আমাদের আট আনা মূল্যের একখানা নমুনার পুস্তক কিনিয়া কেহ কেহ এমন একটা ব্যবসায়ের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা এখন হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। বাংলা দেশের ব্যবসা ক্ষেত্র যতদুর প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সাধনের সুফল দেখিয়া আশান্বিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। সেই ভরসাতেই বুক বাঁধিয়া আমরা নববর্ষে পুনরায় এই বাধা বিঘ্ন সঙ্কুল পথে চলিতে চলিতে দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি ;—

আসুন, বাংলা দেশের কৃষক, শিল্পকার, ব্যবসায়ী ও বণিক সংঘ,—আপনাদের জন্য নব ভাবের প্রেরণা, নব নব বুদ্ধির কৌশল, নব নব কর্ম্মের সন্ধান সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছি। বাংলার যুবক সম্প্রদায়,—আর ছবি ও গল্পের তরল সাহিত্য পাঠ করিয়া সর্ব্বনাশের অভিমুখে অগ্রসর হইবেন না। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" আপনাদের বেকার নাম ঘুচাইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। এই সংকল্প সাধনে আপনারা আমাদের সহায় হউন। বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক।

জাপানী সরকারী ব্যবস্থার তুলনায় আমাদের সরকারী ব্যবস্থার অকিঞ্চিৎকরত্ব

জাপানের ব্যাঙ্কিং কার্য্যের উন্নতির বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করবার উদ্দেশ্যই হ'ল এই দেখানো যে, ব্যাঙ্কের মূলধনের সহযোগীতায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে একটা পশ্চাৎপদ দেশকে কত সহজেই না উন্নতিশীল করে গড়ে তোলা যায়। জাপান এটা দৃঢ়ভাবে বুঝেছিল যে, দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ঘটাতে গেলে ব্যাঙ্কিং কার্য্যের প্রসারতা অপরিহার্য্য। সেই জন্যই সে ব্যাঙ্কিং কার্য্যের উন্নতির জন্য অমন প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে। আমাদের দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতার প্রধান অন্তরায় হ'ল মূলধনের অভাব—দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরাও সহজে এধারে মন দিতে চান্‌না। এমতাবস্থায় দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি যদি মূলধন সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হয় তাহ'লে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু দেশীয় [illegible] সাহায্যকল্পে গবর্ণমেণ্ট মোটেই অগ্রসর [illegible] না; বরং দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি যখন বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিযোগীতায় উঠে যাবার দাখিল হয়, গবর্ণমেণ্ট তখন নিরপেক্ষতার ভাণ করে চুপচাপ বসে থাকেন—দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করবার কোন প্রচেষ্টাই চালান্‌ না। এই সমস্ত কারণেই আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিং [illegible] শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতা [illegible]

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে কোন দেশের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে গেলে মূলধন ছাড়াও সুদক্ষ শ্রমিকের আবশ্যক। দেশে যত শিল্প বিস্তার ঘটে ততই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে ওঠে। জাপানের মূলধনঘটিত ইতিহাসের বিষয় আমরা আলোচনা করেছি, এবার তার শিল্প বাণিজ্যের কথা আলোচনা করা যাক।

১৮৬৮ সালের পূর্ব্বে শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়ে জাপান-এর অবস্থা বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতের অবস্থারই প্রায় সমান ছিল; এইটুকু তফাৎ ছিল যে ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রচলিত ছিল কিন্তু জাপানে সংরক্ষণ নীতির বেড়া কাটেনি। উভয় দেশই নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্যের চাহিদা নিজেরাই মেটাতে পারত। কিন্তু হঠাৎ বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে জাপানীদের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটে, ফলে তারা বিদেশী দ্রব্য এবং রীতিনীতির অতিমাত্রায় পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। তখনকার অবস্থার সম্বন্ধে কাউণ্ট ওকুমা লিখেছেন—Those, who appeared attired in European

clothes, were saluted everywhere with profound bows এই রুচি ও রীতিনীতির পরিবর্ত্তনের ফলে লোকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করে এবং জাপানের দেশী শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, জাপানের কারিগররা এই অবস্থায় তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন পন্থাই খুঁজে পায় না। সেই ভীষণ দুঃসময়ের বিবরণ সম্পর্কে কাউন্ট ওকুমা লিখেছেন—The Japanese industrial world was thrown into a state of consternation at this surprising revolution and the majority of the craftsmen were quite at a loss as to how best to adapt themselves to their new surroundings. এর ফলে—The country was flooded with goods of foreign manufacture, and Japan which for centuries had remained a self-supporting country, thus found herself forced to depend upon foreign manufacturers for her daily wants and needs as well as luxuries and articles of toilet, etc. এই প্রকার অবস্থার দরুণই তার রপ্তানীর চেয়ে আমদানী মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৮ সালে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বৃদ্ধির পরিমাণ হ'ল ১১ কোটি ২০ লক্ষ ইয়েন। ১৯০০ সালে তা' ৮ কোটি ২০ লক্ষ ইয়েনে দাঁড়ায়; ১৯০৫ সালে তা' সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ হয়।

এই রকম দুঃসময়ে গভর্ণমেণ্ট যেন একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন কিন্তু তারপরে তাঁরা দেশকে বাঁচাবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হ'ন। সেই হেতু তারা বিদেশী দ্রব্যের ওপর রীতিমত শুল্ক স্থাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্যের অনুরূপ জিনিসপত্র প্রস্তুত মানসে দেশে কল-কারখানা স্থাপন করেন। তারই ফলে জাপান আজ এত বড় শক্তিশালী দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সে আজ পৃথিবীর সকল দেশের ত্রাসের বস্তু।

কি করে জাপানী গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার অসাধ্য সাধন করলে তা' এক বিস্ময়ের ব্যাপার এবং সে-সমস্ত প্রক্রিয়া সকল পশ্চাৎপদ জাতির গভর্ণমেণ্টের পক্ষে, বিশেষতঃ ভারত গভর্ণমেণ্টের সবিশেষ অনুকরণ যোগ্য। জাপান যে উপায়গুলি অবলম্বন করে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

১। বিশ্বের সকল প্রদর্শনীতে জাপানী মাল প্রদর্শন।

২। অপরাপর দেশের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী মাল প্রস্তুতের ব্যবস্থাকরণ ও তদনুসারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক্সপার্ট প্রেরণ।

৩। সরকারী প্রচেষ্টায় [illegible]কারী সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র ফ্যাক্টরী স্থাপন।

৪। জাপানের [illegible] বাণি[illegible] উন্নতিকল্পে বিভিন্ন এক্সপার্টদের নিয়ে এক প্রতিষ্ঠান গঠন।

৫। দেশের শিক্ষা বিভাগকে সম্পূর্ণ 'ঢেলে সেজে' সুসংস্কৃতকরণ।

৬। অবাধ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং তদনুসারে বিদেশে অসংখ্য ছাত্র প্রেরণ।

৭। মাল প্রেরণের সুব্যবস্থা এবং তদ্দরুণ জাপানের নিজস্ব জাহাজ বাহিণী গঠন।

এইবার আমরা এক এক করে উক্ত দফানুযায়ী জাপানের কার্য্যাবলীর আলোচনা করব। ১৮৬৮ সালে গভর্ণমেণ্ট সুদৃঢ় হবার চার বছর পরেই ভিয়েনায় এক আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, জাপান তাতে যোগ দেবার সকল ব্যবস্থা করে। তদনুসারে জাপানের প্রদর্শনীয় দ্রব্য সমূহ সংগ্রহের জন্য এবং তা' প্রেরণ করবার জন্য এক কমিটি গঠিত হয়, কাউণ্ট ওকুমা তার সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত হবার পর সত্তর জন সরকারী কর্ম্মচারী এবং বহু সংখ্যক কারিগর সমেত এক মিশন প্রেরিত হয়—সরকারী কর্ম্মচারিগণ সংগৃহীত দ্রব্য সমূহ বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে থাকেন এবং কারিগরগণ বিদেশী সমস্ত রুচি এবং দ্রব্য নির্ম্মাণের কর্ম্মকৌশল আয়ত্ত করতে থাকে। প্রদর্শনী শেষ হবার পর নির্ব্বাচিত লোকসমূহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয় এবং তারা সেই সেই দেশের দ্রব্য সমূহের নমুনা সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের শতবার্ষিকীর যে উৎসব হয়

জাপান তাতেও যোগদান করে এবং তার দেশজ দ্রব্য সমূহের গুণা-গুণ প্রচার করতে থাকে। এইরূপে সে সারা বিশ্বের বাণিজ্য বাজারে পরিচিত হয় এবং নিজেদের এক অপূর্ব্ব কৌশলে সস্তায় মাল উৎপাদনের দরুণ বিশ্বের বাজার অধিকার করে ফেলে।

কিন্তু আমরা কথায় যে ভাবে বিশ্ববাজার অধিকারের কথা ব্যক্ত করলাম, কার্য্যতঃ তত সহজে জিনিসটি সম্পন্ন হয়নি। এর জন্য গভর্ণমেণ্ট রীতিমত ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে যে সমস্ত নমুনা সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলি জাপানে উৎপন্ন করবার জন্য সরকার বহু ব্যয়ে দেশে অসংখ্য ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন এবং বিদেশে শিক্ষিত কর্ম্মচারীবৃন্দ তাতে নিযুক্ত হয়। প্রত্যেক নব নব প্রচেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট থেকে সর্ব্ব প্রথম নেতৃত্ব করা হয় এবং সেই শিল্প চালু হবার পর তার পরিচালনার ভার প্রাইভেট কোম্পানী সমূহকে প্রদত্ত হয়। এ সম্পর্কে লালা লাজপৎ রায় সুন্দর ভাবে লিখে গেছেন—Of the steps which the Imperial Government of Japan took to introduce and encourage new industries, the first and one of the most important was the establishment of model factories at considerable expense, where experience was gained in new manufactured "at the expense of the State--" (কোটেশান চিহ্ন আমাদের). Some of the concerns started by the Government for purposes of example and experience were then sold to private companies. Samples were brought from foreign countries and circulated among industrial circles at Government expense.

জাপানের সমস্ত প্রচার শিল্প বাণিজ্য ও কলাবিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্য ১৮৯০ সালে সরকার থেকে ইনিষ্টিটিউশন্ অব্ ইম্পিরিয়াল্ আর্টিষ্ট্স্ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। শিক্ষা বিভাগকে সম্পূর্ণ সুসংস্কৃত করা হয় যাতে করে ছাত্রদের শুধু পুঁথিগত নয়, ব্যবহারিক জ্ঞানলাভও ঘটতে পারে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করা হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি। সরকারী খরচায় অসংখ্য ছাত্রকে বিদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের জন্য পাঠানো হয়। সুদক্ষ কারিগর তৈরী করবার জন্য দেশেও বহু সংখ্যক টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়ে থাকে। গভর্ণমেণ্ট্ নিজ খরচায় কত সংখ্যক ছাত্র বিদেশে প্রেরণ করেছিলেন নিম্নের তালিকা থেকে তা' বোঝা যাবে :--

সাল।	ছাত্র সংখ্যা
১৯০৬ ৭	৮৫
১৯০৭-৮	৯৮
১৯০৮-৯	১০৩
১৯০৯-১০	১৩১
১৯১০-১১	১২৪
১৯১১-১২	১২৩
১৯১২ ১৩	১৩২

নিজ দেশেও গভর্ণমেণ্ট্ বে-সরকারী বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র গুলিতে প্রচুর সাহায্য প্রদান করতেন। ১৯০৭-৮ সালে কৃষি-বিষয়ক, শিল্প-বিষয়ক, বাণিজ্য-বিষয়ক, নৌ-সংক্রান্ত

বিদ্যালয় গুলির সংখ্যা ছিল ৩১৮ এবং গভর্ণমেণ্ট তাতে ৩,২১,৮৮০ ইয়েন সাহায্য করতেন। নিম্নে এই সংক্রান্ত একটি তালিকা দেওয়া হ'ল :—

সাল।	স্কুলের সংখ্যা।	সাহায্যের পরিমাণ
১৯০৮-৯	৩২০	৩,২৩,৮৩০ ইয়েন
১৯০৯-১০	৩১৮	৩,২৪,৭৭০ ,,
১৯১০-১১	৩৭১	৩,৩৬,১৫[illegible] ,,
১৯১১-১২	৩৮৭	৩,৩৭,৭[illegible] ,,

এ ছাড়া গভর্ণমেণ্ট ৫টি উচ্চ কমার্সিয়াল স্কুল বাবদ বাৎসরিক প্রায় ১,১৭,১৫৮ ইয়েন; ৬টি উচ্চ টেকনিক্যাল্ স্কুল বাবদ প্রায় ১,৬৭,৩৮৪ ইয়েন; একটি মাইনিং স্কুল বাবদ ৭৭,২১৯ ইয়েন খরচ করতেন। এতদ্ব্যতীত ২টি উচ্চ কৃষি সম্বন্ধীয় স্কুল, ৩টি উচ্চ বৃত্তিমূলক স্কুল, একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার স্কুল এবং একটি ফিসারী সংক্রান্ত স্কুল গভর্ণমেণ্ট পরিচালন করতেন।

ঐ সমস্ত স্কুল থেকে অসংখ্য ছাত্র বেরিয়েছে তারাই জাপানের উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। জাপানের লোকসংখ্যা ও আয়তন অনুপাতে গভর্ণমেণ্ট যে বিরাট ব্যবস্থা অবলম্বন করে ছিলেন তা' ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। এরই পাশে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা তুলনা করে দেখুন ত? আমাদের লোক সংখ্যা ও আয়তন যেমন বিরাট গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা তেমনি লজ্জাজনক ভাবে অল্প। সেইজন্যই আমাদের এত দুর্গতি। জাপানের কাছ থেকে

এ সম্পর্কে আমাদের গভর্ণমেণ্টের কি কিছুই শিক্ষা করবার নেই ?

পূর্ব্বেই বলেছি যে জাপান সরকারী প্রচেষ্টায় এবং সরকারী সাহায্যে অপরাপর দেশের ব্যবসা বাজার অধিকার করে ফেলে। কিন্তু বিদেশে মাল প্রেরণের জন্য নিজস্ব জাহাজ বাহিনী না থাকলে ব্যবসাক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অসুবিধা বোধ করতে হয়; অধিকন্তু মাল প্রেরণের অত্যাধিক খরচের জন্য প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। সেই জন্যই জাপান নিজস্ব জাহাজবাহিনী গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করে। এক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং সমস্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেন। ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বে জাপানের কোন জাহাজ ছিল না। তার প্রথম জাহাজ কোম্পানীর নাম হচ্ছে 'জাপানীজ্ ষ্টিম্সিপ্ কো:,' গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে টোকিও ও ওসাকার মধ্যে ইয়কোহামা হয়ে জাহাজ চলাচল করত। ১৮৭৫ সালে আর একটি জাহাজ কোম্পানীর জাহাজ চীন ও কশিয়ার উপকূল পর্য্যন্ত চলাচল সুরু করে। ১৮৭৬ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত জাপানী নাবিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ জন, ১৮৯৫ সালে সে সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,১৩৫। ১৮৯১ সালে জাপানী জাহাজগুলির সমষ্টিগত ভাবে মালবহন করবার ক্ষমতা ছিল মাত্র ১৫ হাজার টন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তা বৃদ্ধি করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হ'ন এবং নিজ ব্যয়ে কতকগুলি বিদেশী জাহাজ ক্রয় করেন। ফলে, ১৮৯৬ সালে সেই ক্ষমতা ১ লক্ষ ৯ হাজার টন-এ বৃদ্ধি। ১৯০৫ সালে সেই ক্ষমতা ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার টন দাঁড়ায় এবং ১৯১৬ সালে তা ২০ লক্ষ ১১ হাজার টন-এ বৃদ্ধি পায়।

শুধু তাই নয়; গবর্ণমেণ্ট নিজদেশে জাহাজ প্রস্তুত করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে ওঠেন। তজ্জন্য ১৮১৬ সালে এই মর্ম্মে এক আইন করা হয় যে, যাঁরা জাহাজ নির্ম্মাণ করবার চেষ্টা করবেন তাঁদের গবর্ণমেণ্ট থেকে অর্থ সাহায্য করা হ'বে। তদনুযায়ী জাপানের ডকে ১৮৯৮ সালে ৬ হাজার টনের এক জাহাজ নির্ম্মিত হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকটি দেশী জাহাজ নির্ম্মাণ কল্পে সাহায্য করেছিলেন, সেইজন্যই দেশীয় জাহাজের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ১৯১১ সালে জাপানী কোম্পানীগুলি কর্ত্তৃক ১৭,১৮৩ টনের ৭ খানি জাহাজ, ১৯১৩ সালে ৩৪,৪৭৮ টনের ৭ খানি জাহাজ এবং ১৯১৪ সালে ৬৬,৩২২ টনের ১৭ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হয়।

এছাড়া আরও নানান্ ভাবে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় জাহাজ শিল্পকে সাহায্য করেন। যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা যে কোম্পানীগুলি পরিচালনা করত, গবর্ণমেণ্ট তাদের অর্থদ্বারা ও অপরাপর ভাবে সহায়তা করতেন। ঐ সাহায্যের একটা সর্ত্ত ছিল যে, যাত্রীবাহী জাহাজগুলি প্রধানতঃ দেশে নির্ম্মিত হওয়া চাই। তদ্ব্যতীত দেশী জাহাজগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগীতার হাত থেকে তাঁরা আইন দ্বারা রক্ষা করতেন। বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর পক্ষে জাপানের উপকূল বাণিজ্য পরিচালনা করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯১৫-১৬ সালে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের পরিমাণের একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

ইউরোপীয়ান কট	১৮,৩২,৮০৬	ইয়েন
উত্তর আমেরিকা কট	১,৩৮,৫৫,০১০	,,
দক্ষিণ ,, ,,	১৪,৪৬,৮৮৮	,,
অষ্ট্রেলিয়ান ,,	৮,৭৫,৫০১	,,

আমরা জাপানের উন্নতির এক সংক্ষিপ্ত বিস্ময়কর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলাম। এর থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্য করেন কোন ব্যাপারেরই সংঘটন অসম্ভব নয়। ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বের জাপান বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভের ভারতবর্ষের চেয়েও যথেষ্ট পশ্চাদ্‌পদ ছিল, কিন্তু মাত্র ৫০ বছরের সরকারী প্রচেষ্টার ফলে জাপান কি অসম্ভব উন্নতিই না লাভ করেছে! পক্ষান্তরে ১৫০ বছরের ওপর ভারতবর্ষ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে রয়েছে, পূর্ব্বের ভারতবর্ষ অপেক্ষা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের আর্থিক দিক দিয়ে তাঁরা কী উন্নতি দেখাতে পারেন? বর্ত্তমান ভারতবর্ষ আজ ঋণগ্রস্ত, দরিদ্র, হতশ্রী, বুভুক্ষু। এদেশের অর্দ্ধেক লোক প্রত্যহ অনাহারে দিন কাটায়—নগ্নদেহ, ক্ষুধিত ও বেকারদের আর্ত্তনাদে ভারতের আকাশ বাতাস আজ ভারাক্রান্ত। জাপানী গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনের তুলনায় এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মহিমার গুণকীর্ত্তন নয়। ৫০ বছরে জাপান যা' করেছে ১৫০ বছরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি তার শতাংশের একাংশও না করে থাকতে পারে তাহ'লে বলতে হয় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসননীতিটা প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য নয়। জাপানের উন্নতিকল্পে জাপানী গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তারই পাশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা ভাবলে মনটা আপনা থেকেই সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। জাপানী গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপদ্ধতি ও আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে তুলনা করে কেউ যদি বলেন যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হ'ল ভারতকে শোষণ করা তবে তিনি বৃটিশের চোখে অপরাধী হলেও সত্যভাষণের দিক দিয়ে মোটেই অপরাধী হ'বেন না।

আমরা না হয় রাজভক্তের মত স্বীকার করে নিলাম যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতিটা শোষণের ধার দিয়েও যায় না, তাহ'লে এই বলতে হয় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন-রীতিটা বিজ্ঞজনোচিত নয়, ওতে পীড়নের রাজকীয়ত্ব আছে কিন্তু কল্যাণের বুদ্ধিবৃত্তি নেই। সেই সরকারী অবিবেচনার ফলেই দেশের স্বর্ণ ড্রেনের জলের মত বিদেশে রপ্তানী হয় অথচ বিদেশের টাকা দেশে আসে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে দেশের রাষ্ট্রীয় ঋণভার যদি ১২০০ শত কোটি টাকায় দাঁড়ায় তবে কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেটা গৌরবের কথা? তাঁদেরই অবিবেচনার ফলে দেশীয় শিল্প যদি বিদেশী প্রতিযোগীতার কাছে টিঁকে থাকতে না পারে তাহ'লে কেউ কি সরকারী নীতিকে প্রশংসা করবে?

যাক্ সেকথা, গবর্ণমেণ্টের নিন্দা যথেষ্ট হয়েছে, তবে এইটুকু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তাতেও তাঁদের চৈতন্য নেই। সম্প্রতি দেশে যে নব শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে শাসনভার দেশীয় লোকদের হস্তে কতকাংশে ন্যস্ত হয়েছে। নতুন গবর্ণমেণ্ট জাপানী গবর্ণমেণ্টের নীতি অনুসরণ করুন এই আমাদের প্রার্থনা। তাঁরা [illegible] খরচে নব নব শিল্প প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে সুরু করুন, তারপর তা' প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে তুলে দিন। তাহ'লেই দেশের বেকারগণ তাতে কাজ পাবে এবং দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে উঠবে। তার ফলে ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতি অসম্ভব নয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ
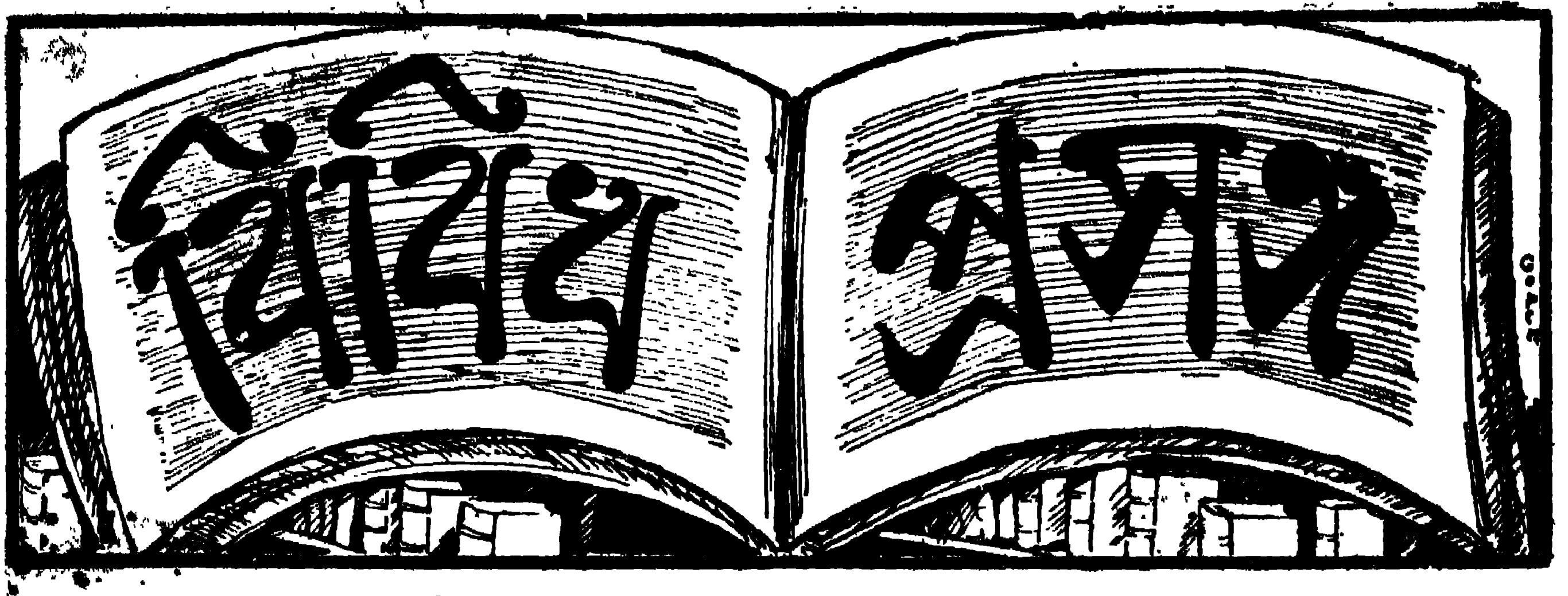
গরুর গাড়ীর চাকা ঃ—

একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছে,—গরুর গাড়ীর চাকা কাঠের তৈয়ারী হইবে,—না রবারের নিউম্যাটিক টায়ার হইবে। ভারত গভর্ণমেন্টের রোড্ বোর্ডের মেম্বারগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে লোহার বেড় পরাণ কাঠের চাকায় রাস্তা শীঘ্র নষ্ট হয়;—সুতরাং উহার মেরামতি খরচা বাড়িয়া যায়। পরন্তু ঐ প্রকার চাকাযুক্ত মাল বোঝাই গাড়ী খুব আস্তে আস্তে চলে। এই কারণে একদিকে যেমন গরু মহিষদের খাটুনী হয় বেশী,—অন্যদিকে তেমনি জিনিস পত্রের দরও কিছু চড়িয়া যায়। আমদানী-কারক যে স্থলে একবার গাড়ী বোঝাই করিয়া ২০ মণ মাল আনিতে পারে, সে স্থলে তাহাকে দুই বারে দশ মন করিয়া মাল আনিতে হয়। আমরা এই সকল কথা যুক্তি সঙ্গত মনে করি। সেইজন্য আমরা গো-মহিষের গাড়ীতে নিউ-ম্যাটিক রবার টায়ারযুক্ত চাকারই পক্ষপাতী। যাঁহারা আশঙ্কা করেন, ইহাতে কাঠের চাকা তৈয়ারীর কুটীর শিল্প নষ্ট হইবে তাঁহাদিগকে ভরসা দিতে পারি, ইহার সঙ্গে সঙ্গে রবার শিল্পের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। ভারতবর্ষে এবং নিকটবর্ত্তী সিংহল, মালয় প্রভৃতি দেশে প্রচুর রবার বৃক্ষ জন্মে, সেই কাঁচা রবার বিদেশে চলিয়া যায়। যদি ভারতের রবার ভারতেই শিল্পদ্রব্য তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়, তবে দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং কাঠের চাকা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। আমরা অবগত হইলাম, বিহার প্রদেশে কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলাবোর্ডে কণ্ট্রাক্টরদিগকে গরুর গাড়ীতে নিউম্যাটিক টায়ার ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। এমন কি, যে সকল ঠিকাদার কতিপয় নিউম্যাটিক টায়ারযুক্ত গাড়ীর সহিত একখানিও কাঠের চাকার গাড়ী ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কাজ দেওয়া হয় না। আমরা মিউনিসিপাল ও জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষদের এবম্বিধ আচরণ অসঙ্গত ও আপত্তিজনক মনে করিনা। কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন "বিহার প্রদেশ কংগ্রেস্ পক্ষীয় মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত;—সেখানে এরূপ ভাবে কুটীর শিল্পের নির্য্যাতন হইতেছে কেন?" এই সকল সমালোচকগণকে আমরা বলিতেছি, কংগ্রেসের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট্ শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুকে

যদিও গরুর গাড়ীতে চড়াইয়া শোভাযাত্রা করা হইয়াছে,—তথাপি মনে রাখিতে হইবে, তিনি সাধারণতঃ এরোপ্লেনেই চড়িয়া বেড়ান এবং ৮ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনিই মহাত্মা গান্ধীকে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন "Surely we are not going back to the age of bullock carts"—আমরা নিশ্চয়ই গরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাইব না।

বাংলাদেশে তুলার চাষ

আমরা বহুকাল যাবৎ আমাদের এই ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় বাংলাদেশে তুলার চাষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে লিখিয়া আসিতেছি। পাটের বাজার নষ্ট হওয়াতে বাংলাদেশের যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তুলার চাষের দ্বারা তাহার অনেকটা পরিপূরণ হইতে পারে। বিশেষতঃ বাংলাদেশে যখন কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়িতেছে; তখন তুলার জন্য একেবারে পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। শুনিয়া সুখী হইলাম এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন।

বাঙ্গলার বিভিন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্ট মিঃ এস, জি শার্ঙ্গপাণি একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা বিবেচনা করিবার জন্য গত শনিবার অপরাহ্নে বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। মোহিনী মিলের
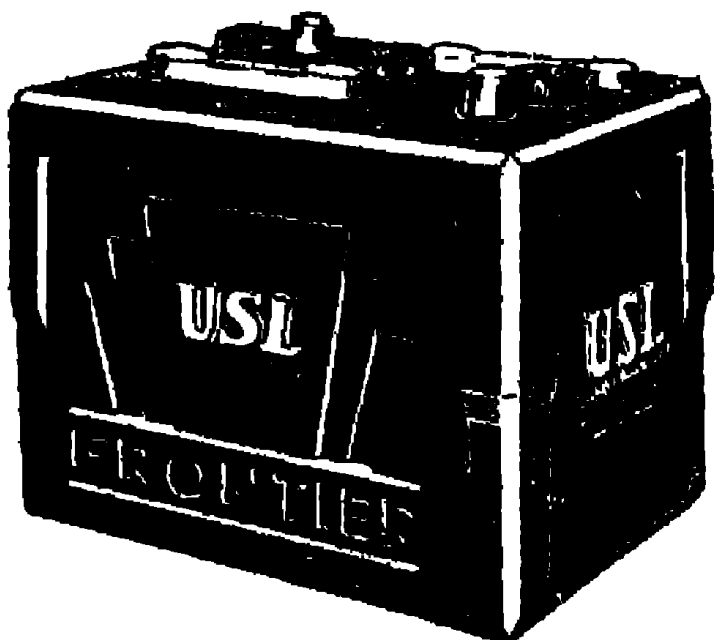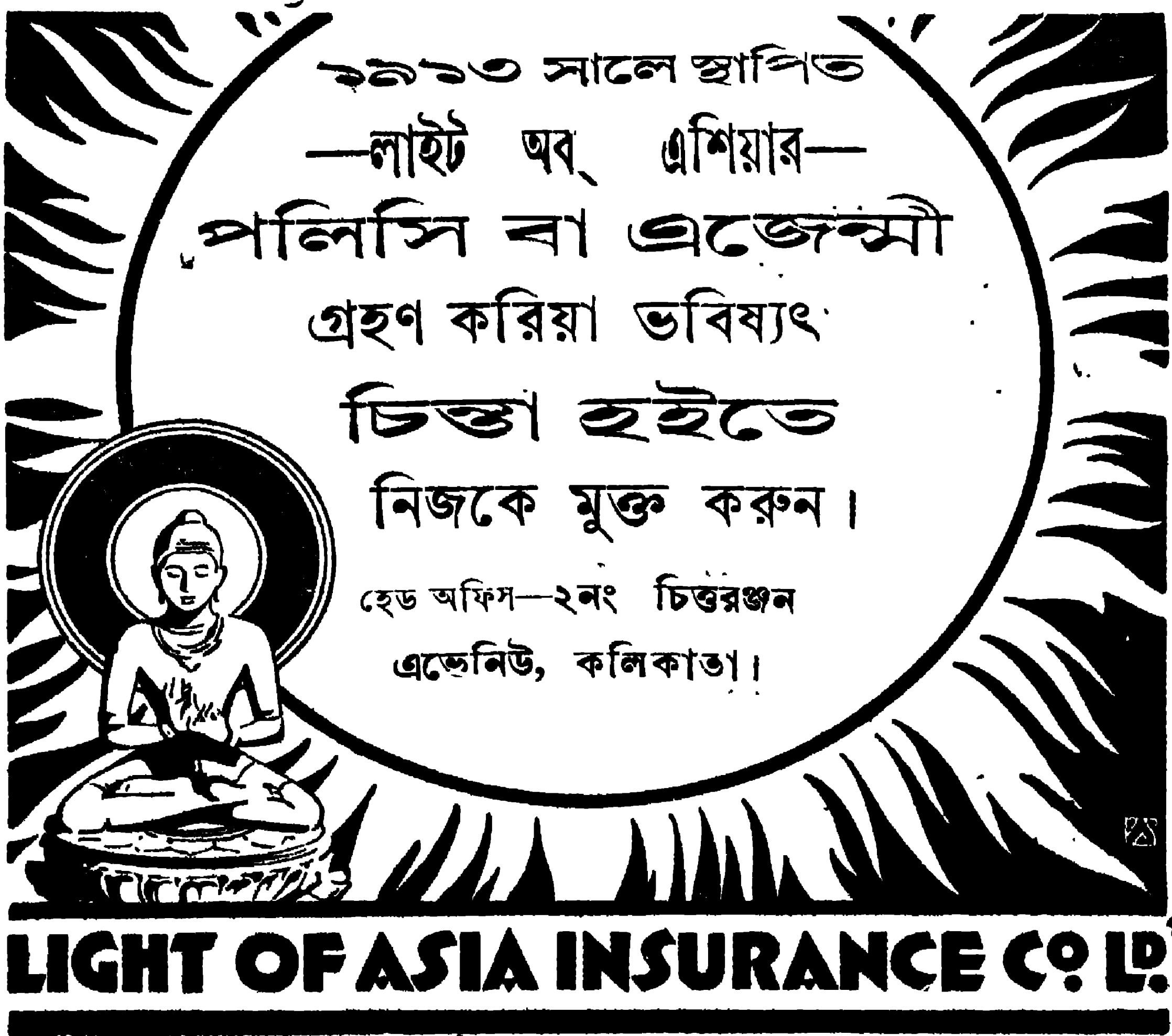
মিঃ জি, পি, চক্রবর্ত্তী, বঙ্গশ্রী কটন মিলের মিঃ ডিঃ, এন, চৌধুরী, শ্রীদুর্গা কটন মিলের মিঃ বি, জি, মুখার্জ্জী, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের রায় সাহেব এস, সি, ঘোষ, মেসার্স র‍্যালি ব্রাদার্সের মিঃ ডি, ই, ট্যালাটী, মেসার্স শওয়ালেস এণ্ড কোং'র মিঃ এফ, এল, অট্টো, মার্চ্চেণ্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বেঙ্গল মিল ও নার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সাময়িকভাবে উক্ত পরিকল্পনাটী অনুমোদন করা হয়; বাঙ্গলার তুলা ও কাপড়ের কলগুলি মালিকগণ সকলে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে যে ব্যয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক বহন করিবেন বলিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব করা হয় এবং বাঙ্গলা সরকারকে আর অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে অনুরোধ করা হয়। পরিকল্পনাটীর পর্য্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী কয়েকজন সদস্য লইয়া একটী কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাবও সভায় করা হয়। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত তুলা উৎপন্ন হইবে তাহা সমস্তই মিল মালিকগণ কর্ত্তৃক ক্রয় করিবার প্রস্তাব করা হয়। অপর কয়েকটী প্রস্তাবও এই সম্মেলনে সাময়িকভাবে অনুমোদন করা হয়। মাসের শেষ ভাগে মিলমালিকদের অপর একটি সম্মেলন হইবে,

ঐ সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি পাকাপাকিভাবে গৃহীত হইবে।

উক্ত পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম, ঢাকার উত্তর অঞ্চল, রাজসাহীর নওগাঁ মহকুমা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ এই কয়টী স্থানে ৫ বৎসরের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন করা যায় কিনা তাহার পরীক্ষার জন্য ৬টী কেন্দ্র খুলিতে বলা হইয়াছে। এই কেন্দ্রগুলি ৫ বৎসর ধরিয়া চালাইবার জন্য মোট ব্যয় দুই হাজার টাকা পড়িবে বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষি-জীবি। ভারতবর্ষের জলবায়ু এবং মৃত্তিকা বিবিধ শস্য ও ফলমূলাদি উৎপাদনের বিশেষ অনুকূল। কিন্তু এই দেশে বর্ত্তমান উন্নতির যুগে কৃষিকার্য্য শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার কর্ত্তৃপক্ষ যাহা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় তাহার প্রতি মনোযোগী না হইয়া চাকুরী জীবি কেরাণী তৈয়ারী করিবার উপযোগী শিক্ষার বন্দোবস্তই প্রথমে করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চোখ ফুটিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কৃষি শিক্ষার একটা পরিকল্পনা করিয়াছেন। উহার সার মর্ম্ম এই,—

জানা গিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যে এককালীন ব্যয়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা ও বার্ষিক ব্যয়ের জন্য ১২ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহাতে ভালভাবে কাজ চলে এবং শিক্ষাকেন্দ্রটিকে শীঘ্র গড়িয়া তোলা যায় তজ্জন্য বিশেষ দান সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে।

শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্য নির্ব্বাচিত স্থানটি ব্যারাকপুর রেসকোর্সের দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। স্থানটীর পরিমাণ ১১৫ বিঘা। উহার মধ্যে ৭টি পুকুর আছে। ঐস্থান সম্বন্ধে কলিকাতা রয়াল টার্ফ ক্লাবের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা-বার্ত্তা শীঘ্রই চূড়ান্ত হইবে।

মিঃ জে এন গুপ্ত আই-সি-এস, (অবসর প্রাপ্ত) ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত তিন বৎসর ধরিয়া এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ অনেক অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে যে পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিকতম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্রতরভাবে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। ছোট ছোট [illegible]গুলি ভূমিখণ্ড পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষানবীশদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের কৃষি শিক্ষা কেন্দ্রে লওয়া হইবে তাহাদিগকে নিজ হাতে কাজ করিতে হইবে এবং কৃষিকার্য্য পরিচালনার, সব্জীবাগানও বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চালাইবার উপায় শিক্ষা করিতে হইবে। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে তাহাদিগকে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি কুটীর শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। ঐ শিল্প দুইটির শিক্ষার্থীর বাসস্থানের কাছাকাছি ব্যবসায়ের কি সুবিধা আছে তৎসম্বন্ধেও তাহাকে প্রয়ো-জনীয় সংবাদাদি দেওয়া হইবে; শিক্ষাকাল ৩

বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য কোন টাকা দিতে হইবে না।

একটি পৃথক দালানে শিল্প শিক্ষার ক্লাস, ল্যাবরেটারী, ওয়ার্কসপ ও লেকচার দেওয়ার ঘর থাকিবে।

শিল্প শিক্ষার ক্লাসগুলিতে স্থানীয় সহজপ্রাপ্য কাঁচা মাল কার্য্যে লাগানর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ৪০ জন ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ঐ কেন্দ্রে থাকিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে একটি গবেষণাগারও শিল্পকেন্দ্রে থাকিবে।

কৃষি ও শিল্প শিক্ষা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রকে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য ভূগোল, প্রাথমিক রসায়নশাস্ত্র ও উদ্ভিদ্-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে যোগ্যতার

সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরি-উক্ত পরিকল্পনা সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইহার জন্য যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প এবং অপ্রচুর। ব্যারাকপুরের নিকট যে পরিমাণ জমি লওয়া হইয়াছে, তাহাও আমাদের ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া মনে হয়। এত বড় একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য এত অল্প টাকা ও এত ক্ষুদ্রস্থান ভবিষ্যৎ সফলতার সূচক নহে।

জাপানে গ্লিসিরিণ তৈয়ারী

বর্ত্তমান যুগে শিল্পজগতে গ্লিসিরিণ একটী প্রধান এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য। যুদ্ধের উপকরণ, সাবান, সুগন্ধি তৈল, ঔষধ প্রভৃতি করিতে গ্লিসিরিণ আবশ্যক। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতি সকলেই স্বাধীনভাবে গ্লিসিরিণ তৈয়ারী করিয়া থাকে। কারণ গ্লিসিরিণ জিনিসটী কেহ কাহাকেও সহজে দিতে চায় না। জাপান গ্লিসিরিণ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে বেশী দিন নহে,—২২ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৬ সালে। মাছের তৈলের উপর হাইড্রোলিসিস্ (Hydrolisis) প্রক্রিয়ার দ্বারা জাপানীরা প্রথমতঃ গ্লিসিরিণ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু দেখা যায়, এই উপায়ে গ্লিসিরিণ প্রস্তুত করিলে তাহা তেমন লাভজনক হয় না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ট্যালো বা চর্ব্বি হইতে গ্লিসিরিণ তৈয়ারী করিলে উহা ডিনামাইট্ (Dynamite) নামক বিস্ফোরক দ্রব্য তৈয়ারীর বিশেষ উপযোগী হয়। জাপানীরা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ট্যালো আমদানী করে। গত মহাযুদ্ধের সময় অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট ট্যালো রপ্তানী বন্ধ করেন। তখন জাপানীরা অত্যন্ত অসুবিধায় পতিত হয়। জাপানের সাবানের কারখানা গুলিও একরকম অচল হইয়া উঠে। তারপর জাপানের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, জাপান যে ট্যালো অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী করিবে, তাহা হইতে প্রস্তুত গ্লিসিরিণ পুনরায় অষ্ট্রেলিয়াকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই ভাবে তিন বৎসর চলিয়া যাইবার পর নানাবিধ পরীক্ষার ফলে অবশেষে জাপানী বৈজ্ঞানিকগণ হাইড্রোজেন-যুক্ত (Hydrogenated) মাছের তৈল এবং সয়াবীনের তৈল হইতে গ্লিসিরিণ তৈয়ারী করিবার কৌশল উদ্ভাবন করেন। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে তিমি মাছের তৈল এবং ট্যালো হইতেও গ্লিসিরিণ তৈয়ারী হইতেছে। ১৯২৭ সাল হইতে দশ বৎসরের মধ্যে জাপানে গ্লিসিরিণ তৈয়ারী কিরূপ বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমদানীও কিরূপ কমিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে দেখা যায়,—

সাল	আমদানী টন	দেশে তৈয়ারী টন
১৯২৭	১৭৮৬	২১৪৪
১৯২৮	২৩২২	১৯৬৮
১৯২৯	১১৯৯	২১৯৬
১৯৩০	১৭৩৫	২৯২২
১৯৩১	১৭৪৩	৩৪১২
১৯৩২	২৯৮২	৪০৭০
১৯৩৩	১১২৭	৪৫১০
১৯৩৪	৬৫২	৬৮০৩
১৯৩৫	১৫৯	৭৭৬৮
১৯৩৬	৭০	৮৩৫০

এই তালিকা হইতে মনে হয়, জাপান বর্ত্তমান সময়ে আর বিদেশ হইতে গ্লিসিরিণ আমদানী করেনা। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এবং হিসাবেও বুঝা যায়, সস্তায় গ্লিসিরিণ তৈয়ারী করিবার সুবিধা জাপানের যেমন আছে, পৃথিবীতে এমন আর কোন দেশের নাই। জাপানের উপকূলে অফুরন্ত সার্ডিন্ (Sardine) মৎস্য। মৎস্যের কারবার জাপানে বিখ্যাত। সার্ডিন মাছের তৈল গ্লিসিরিণ তৈয়ারীর একটী প্রধান উপকরণ। তারপর তিমি মাছের তৈল। সুমেরু মহাসাগরের দক্ষিণাংশে জাপানীদের তিমি ধরিবার বিরাট কারবার আছে। জাপানে প্রচুর সয়াবীন উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ সমগ্র মাঞ্চুরিয়ার সয়াবীনের অফুরন্ত ফসল,—সে সমস্তই জাপানের দখলে। সুতরাং সয়াবীনের তৈল জাপানীদের এখনও টান্ পড়িবেনা। পৃথিবীর মধ্যে সয়াবীন্ একমাত্র জাপানেরই করতলগত সম্পদ্,—যেমন বাঙ্গালীর সম্পদ্ পাট। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে প্রতিবৎসর একমাত্র সার্ডিন মৎস্যের তৈলই উৎপন্ন হয় প্রায় দেড় লক্ষ টন!

কেশ প্রসাধন সামগ্রীর বাজার

বিলাসিতা পরিত্যাগের জন্য যতই উপদেশ দেওয়া হউক, কেশ প্রসাধন সামগ্রীর বাজার চিরকালই জোরাল থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুণ্ডিত মস্তক অথবা জটা জাল, কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। টাক্-পড়া মাথাতেও কেশ-তৈল মাখিবার বিরাম নাই,—নূতন চুল গজাইবার আশায়। কেশ প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে সুগন্ধি তৈল, হেয়ার লোসান, পমেড্ শ্যাম্পু বা মাথা ঘষার দ্রব্য; হেয়ার ক্রীম, ব্রিলিয়্যান্টাইন্ বা চুলকে চক্‌চকে করিবার জিনিস,—এই কয়েকটীই প্রধান। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ সুগন্ধি তৈলই ব্যবহার করে বেশী। অন্যান্য জিনিসগুলি ইউরোপীয় এবং য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেই প্রচলিত। এই সকল কেশ প্রসাধন সামগ্রী কি পরিমাণ দেশে উৎপন্ন হয়, তাহার কোন ঠিক হিসাব নাই। তবে ইহা জানা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কেশ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকার উপর। আমাদের দেশে সুগন্ধি কেশ তৈলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জবাকুসুম তৈল, সর্ব্বজন পরিচিত এবং সুবিখ্যাত। আমরা অবগত আছি, ইহার জন্য বিজ্ঞাপন বাবতে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা খরচ হয় এবং ইহার বিক্রয়মূল্য বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকার উপর। জবাকুসুমের পর যে তৈলটী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাও বৎসরে প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ টাকা বিক্রয় হয়। বোম্বাইর তৈয়ারী একটী কেশ তৈল গত ২৫ বৎসর যাবৎ বাজারে চল্‌তি রহিয়াছে। কেশ তৈল তৈয়ারীর একটী প্রধান উপকরণ সাদা খনিজ তৈল। কেহ কেহ ইহার পরিবর্ত্তে তিল তৈল, নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহার করেন। ভারতে যে সাদা খনিজ তৈল আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশ আসে জার্ম্মাণী হইতে। অবশিষ্ট অল্পাংশ মাত্র বেলজিয়াম হইতে আসে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে সাদা খনিজ তৈল ভারতে আমদানী হইতেছে।

বেকার সমস্যায় আসাম গবর্ণমেণ্ট

আসামে কৃষিকার্য্যের বিস্তীর্ণক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানকার জমিও অনুর্ব্বর নহে। বৃষ্টিপাত ও নদী প্রবাহ, এই উভয়ের দ্বারা ভূমিভাগ নিত্য জলসিক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উপনদী সহ ব্রহ্মপুত্র সমগ্র আসাম প্রদেশকে বিধৌত করিতেছে। এই উপযুক্ত স্থানে জমি লইয়া কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিলে অনেক বেকার যুবকের অন্নসংস্থান হয়। আসাম গবর্ণমেণ্টের এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আট জন বেকার যুবকের প্রত্যেককে ২৫০ টাকা নগদ ও ৫০ বিঘা জমি দিবার প্রস্তাব আসাম গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদে ১২ বৎসরের মধ্যে ঐ ২৫০ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। প্রথম দুই বৎসর জমির খাজানা লাগিবে না। যদি দুইবৎসরের মধ্যে জমি চাষ করা না হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট জমি ফিরাইয়া নিবেন। আমাদের মনে হয়, এই প্রকার সুযোগে প্রত্যেক যুবকই কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন। জমি যখন বিনামূল্যে এবং প্রথম দুই বৎসর বিনা খাজানায় পাওয়া গেল, তখন নগদ ২৫০ টাকায় হালের গরু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করা যাইতে পারে।

উপযুক্ত স্থানে এগ্রিকালচার্য্যাল কলোনি (Agricultural Colony) বা কৃষক উপনিবেশ এবং কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিবার পরিকল্পনাও গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। আগামী বৎসরের বাজেটে নিম্নলিখিত দফার ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে,—

(১) পাট হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার এবং চট বুনিবার শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা।

(২) গেঞ্জি মোজা তৈয়ারী করা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা।

(৩) সুরমাভ্যালী টেক্‌নিক্যাল স্কুলে শ্রীহট্টে চামড়া ক্রোম্ ট্যানিং শিখাইবার ক্লাস খোলা।

(৪) জোরহাট টেকনিক্যাল স্কুলে কাঁসা পিতলের জিনিস তৈয়ারী এবং ইলেক্ট্রো প্লেটিং শিখাইবার ক্লাস খোলা। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আসাম প্রদেশে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে।

ফল চাষের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু বিশ্বের অপরাপর দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের ফল চাষের ব্যাপার লক্ষ্য করলে নিরাশ হতে হয়। ফলের দেশ ভারতবর্ষ, এর প্রত্যেকস্থানেই ফল শোভার সমারোহ—তবুও ভারতবর্ষে ফল চাষের ব্যাপার এখনো একেবারে শিশু অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কি গবেষণার দিক দিয়ে, বা কি আইনের দিক দিয়ে এদেশে এখনো এমন অবস্থা অবলম্বিত হয় নি যাতে করে বলা যেতে পারে যে, খানিকটা কাজ এগিয়েছে। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে—তাঁরা ফল চাষের উন্নতির জন্য রিসার্চ স্কীমের ব্যবস্থা করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সিন্ধুদেশে জল সেচনের উন্নত ব্যবস্থার দ্বারা ফল চাষের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সেখানে যে সমস্ত স্থানে শস্য ফলনের সম্ভাবনা নেই, সেই সমস্ত স্থানে ফলের বাগান করবার জন্য টাকা লগ্নী করা হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, আমাদের দেশে ফল চাষের উন্নতির জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা' কেবল পরীক্ষা কার্য্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোন্ মাটিতে কি রকম আব্‌হাওয়ার মধ্যে কোন্ প্রকারের গাছপালা জন্মাতে পারে সেটা দেখাই ছিল সে পরীক্ষাকার্য্যের উদ্দেশ্য। এরূপ প্রচেষ্টা অর্থকরী না হ'লেও এর যে কোন মূল্য নেই তা' নয়, বস্তুতঃ এই সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের দ্বারা বিভিন্ন রকমের উন্নত ধরণের ফল উৎপাদনে সাহায্য ঘটবে। এই পরীক্ষাকেন্দ্রেরও এখনো যথেষ্ট উন্নতি সাধিত করা দরকার।

ফল চাষের উন্নতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়:—

প্রথমতঃ, দেশের বা জগতের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন রকমের ফলের সংমিশ্রণে (Breeding) ঠিকমত কোয়ালিটি উৎপাদন করা। দ্বিতীয়তঃ ঠিকমত বীজ সংগ্রহ করা, যাতে করে বৃহৎ আকারে উৎপাদনে সহায়তা হয়। তৃতীয়তঃ, বিঘাপিছু যাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ফল পাওয়া যায় তজ্জন্য গাছের পুষ্টিসাধন, গাছ ছাটাই, জমিতে উন্নত ধরণের চাষ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারের প্রতি সবিশেষ যত্ন নেওয়া। চতুর্থতঃ, ফল চালানী বা ফল রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি করা ও তৎপ্রতি অধিকতর যত্ন নেওয়া যাতে করে ফল কম পঁচে। পঞ্চমতঃ ফলকে 'জারিয়ে' (Preservo) রাখবার ব্যবস্থা করা যদ্দারা প্রয়োজনাতিরিক্ত ফল অধিকতর মূল্যবান জিনিসে পরিণত হয়। ষষ্ঠতঃ, পোকামাকড়, রোগ ইত্যাদির হাত হ'তে গাছ

পালাকে রক্ষা করা। এই সমস্ত ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত হয় তা'হলে ফল চাষের নিশ্চয়ই উন্নতি সাধিত হবে এবং বৃহৎ আকারে ফল চাষের ক্ষেত্রে উপরের প্রত্যেকটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই গেল চাষের ব্যাপার। এই চাষের ব্যাপার ছাড়াও দেশের ফলের ব্যবসাকে রক্ষা কল্পে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সাহায্য দানের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ণ দ্বারা ফলের চাষের উন্নতি ঘটাতে পারে। ধরুন, কোন দেশে বিদেশী ফল ভয়ঙ্কর আমদানী হচ্ছে অতি সস্তায়; সেক্ষেত্রে দেশীয় ফল চাষীদের ব্যবসা মোটেই টিঁকবে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি আইন প্রণয়ণ দ্বারা শুল্ক চাপিয়ে বিদেশীয় আমদানী বন্ধ করতে পারে তা'হলে দেশীয় ব্যবসা বেশ চালু হয়। শুধু তাই নয়, দেশের লোকের যদি ক্রয় ক্ষমতা না থাকে তাহ'লে ফলের বাজারে তেমন ক্রেতা পাওয়া যাবে না। ফলে, ফলের দর এত কমে যাবে যে, ফল চাষ আর লাভজনক ব্যবসা বলে পরিগণিত হবে না। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ফলের দর বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং চাষীদের খাজনা, ঋণ ইত্যাদির ভার থেকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। তবেই ফল চাষের উন্নতি ঘটবে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সেইজন্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ফল চাষের ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। আইন দ্বারা যদি সমস্ত বিষয়টি সুসংবদ্ধ হয় তাহ'লে ফলের বাজার ঠিক থাকে, চাষীরাও লাভবান হয়।

আমরা উপরে ফল চাষের যে সমস্ত উন্নতির উপায় লিপিবদ্ধ করেছি তা' কার্য্যকরী করে তুলতে গেলে অর্থ ও ধৈর্য্য আবশ্যক। বিশ্বের অপরাপর যে সমস্ত দেশ ফল চাষের ব্যাপারে উন্নতি করেছে তাদের উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বহু অর্থ ব্যয় ও ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়েই সে জিনিষটি সাধিত হয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, ব্যবসা হিসাবে ফল চাষের প্রতি নজর দেওয়ার প্রচেষ্টা এপর্য্যন্ত খুব কমই দেখা গেছে। অথচ ভারতবর্ষে ফলের ব্যবসার একটা খুব বড় স্থান আছে। পূর্ব্বে ফল চাষ সম্পর্কে গবেষণা একটা গৌণ ব্যাপার বলে পরিগণিত হ'ত, কিন্তু বর্ত্তমানে সেটাকে মুখ্য ব্যাপারে দাঁড় করবার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষ কাঁচা মাল রপ্তানীর জন্যই বিখ্যাত, সুতরাং রীতিমত পরিমাণ ফলও যেন সে বিদেশে চালান দিতে সক্ষম হয়।

ভারতে ফল চাষের উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯২৫ সালে গভর্ণমেণ্টের এই চাষের উন্নতির প্রতি প্রথম নজর পড়ে এবং তার ফলেই উক্ত খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে ম্যাংগো মার্কেটিং কমিটি (mango marketing committee) গঠিত হয়। তার পরেই কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার আরও নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দেন ও ক[illegible] ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। ১৯২৬ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে সরকারী কার্য্যালয়ে ফল বি[illegible] একটি পৃথক বিভাগ গঠিত হয়। বোম্বাই সরকার ইতালীতে লেবু সম্পর্কে ও এশিয়া ম[illegible]রে ডুমুর (Figs) সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। এছাড়াও, ১৯৩২ [illegible] বোম্বাই সরকার ইম্পিরিয়াল্ কাউন্সিল্ অব্ এগ্রিকাল্চারাল্ রিসার্চের

সাহায্যে বিলাতে আম চালান দেবার ব্যবস্থা করেন এবং উক্ত ব্যবসা চালু রাখবার জন্য সচেষ্ট হন। ১৯৩৩ সালে তাঁরা ফলের ব্যবসা ও চালানী সংক্রান্ত আর দু'টি সম্মিলনী আহ্বান করেন এবং তার পরেই বোম্বাই এর ফলের বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য বম্বে ফ্রুট এণ্ড ভেজিটেবল্ মারকেটিং কমিটি (Bombay Fruit & Vegetable Marketing Committee) গঠিত হয়। ফলের ব্যবসার যাতে আরও উন্নতি সাধিত হয় তজ্জন্য ইম্পিরিয়াল্ কাউন্সিল্ অব্ এগ্রিকাল্‌চারাল্ রিসার্চ্চ আমকে পচন হ'তে রক্ষা করবার উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে গবেষণার জন্য রীতিমত অর্থের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ফল চাষের উন্নতির জন্য কাউন্সিল্ অর্থ সাহায্য করেন। এই গবেষণা কার্য্য যদি অনেকদিন পরিচালিত হয় তাহ'লে একই জমিতে যে বেশী সংখ্যায় ফল পাওয়া যাবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ফলের চাষের উন্নতির জন্য ও ফলের ব্যবসা ভাল ভাবে পরিচালনার জন্য বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ফল ব্যবসায়ী সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমস্ত সমিতির প্রচেষ্টায়ই জি, আই, পি; বি, এন, ডব্লিউ, এণ্ড সি, আই রেল কোম্পানী যে সমস্ত ফল [illegible] নষ্ট হয়ে যায় তাদের ভাড়া হ্রাস করেছে। ফলের ব্যবসা ভালভাবে চালু করবার জন্য এই রকম ভাড়া হ্রাসের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই রকম নানান্ প্রচেষ্টার ফলে শুধু যে ফলের ব্যবসার উন্নতি ঘটেছে তা' নয়। পরন্তু ফলের নানা রকম দেশীয় জিনিষও তৈরী হচ্ছে। লাইমজুস, জ্যাম প্রভৃতি ফলের দ্রব্য বাজারে বেশ বিক্রীত হচ্ছে। এসম্পর্কে আরও নানাবিধ গবেষণার জন্য যদি একটি কেন্দ্রীয় ফ্রুট ব্যুরো ও ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয় তাহ'লে অধিকতর উন্নতি ঘটবে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে ফল সম্পদকে অর্থকরী করবার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটু একটু করে এদিকে নজর পড়ছে। উপযুক্ত কৃষি গবেষণাগার, বাজার সংগঠন ব্যবস্থা, ও মাল প্রেরণের সুবিধা যদি বর্ত্তমান থাকে তাহ'লে ভারতের ফল সম্পদ্ একটা বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত হ'বে। ফলের রপ্তানী বাণিজ্য যাতে বৃদ্ধি পায় সেধারেও গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃহৎ ব্যাপার হিসাবে উৎপাদন করা ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু সমবায় পদ্ধতিতে যদি বিরাট আকারে উৎপাদন চালানো যায় তাহ'লে ব্যবসায়ীরা রীতিমত লাভবান হতে পারে। শুধু তাই নয়, এই ব্যবসা চালু হ'লে অনেক বেকারেরও অন্ন সংস্থান ঘটতে পারে। আমাদের মনে হয় এসম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের প্রথমে অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য—তাহ'লেও দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হ'তে পারে।

ডেনমার্কের উন্নতির বিবরণ

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এস, সি।

ডেনমার্ক্ দেশকে ইউরোপের লোকেরা বলে Keeper of the Baltic Portals অর্থাৎ বাল্টিক সাগরের প্রহরী স্বরূপ। যিনিই বাল্টিক সাগরে প্রবেশ করিবেন, অথবা বাল্টিক সাগর হইতে নির্গত হইবেন, তাঁহাকেই ডেন্মার্কের অনুমতি লইতে হইবে। এই অসুবিধার জন্যই জার্ম্মানী কিয়েল খাল কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে। বাল্টিক সাগর হইতে উত্তর সাগরে আসিতে হইলে জার্ম্মানীর জাহাজগুলিকে ডেন্মার্কের রাজার অনুমতি লইয়া ডেন্মার্কের পূর্ব্ব উত্তর ও পশ্চিম উপকূল ঘুরিয়া আসিতে হইত। সেই ঘোরাপথেও উপযুক্ত পোতাশ্রয়ের অভাব এবং ঝড় তুফানের বিপদ ছিল। কিয়েল খাল কাটাইবার পর জার্ম্মানীর সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে। এখন জার্ম্মানীর বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ কিয়েল খাল দিয়া একেবারে সোজাসুজি উত্তর সাগরে আসিয়া পড়ে।

ডেন্মার্কের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার মাইল। প্রতি তিন বর্গমাইলে এক মাইল। আয়তনের তুলনায় এত দীর্ঘ উপকূল রেখা গ্রীসদেশ ছাড়া আর কাহারও নাই। নরওয়ে সুইডেনের মত ডেন্মার্কের উপকূল ভাগে বহু সংখ্যক খাড়ি, ভাংতি অথবা খাঁজ আছে। এই সকল খাড়িকে ফিওর্ড (Fiord) বলে। ইহারা খুব গভীর নহে,—সেইজন্য জাহাজ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে এই সকল ফিওর্ড মাছ ধরিবার প্রধান আড্ডা। পশ্চিম উপকূলের লীম্ ফিওর্ড নামক সুদীর্ঘ বৃহত্তম লাগুন (Lagoon) বা উপহ্রদে (আমাদের ভারতীয় চিল্কা হ্রদের মত) মৎস্য চাষের খুব বড় কারবার রহিয়াছে। পশ্চিম উপকূলের সর্ব্বত্র অনুচ্চ বালিয়াড়ি দেখা যায়। এই সকল বালিয়াড়ির বালুকা রাশি বাতাসে উড়াইয়া যেন দেশের মধ্যে আনিতে না পারে সেইজন্য উপকূলের ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ করিয়া বনভূমি তৈয়ারী হইয়াছে।

ডেন্মার্ক দেশ বাস্তবিক বৃহৎ ইউরোপীয় সমভূমির উত্তরাংশ। ইহা যেন বাল্টিক সাগর এবং উত্তর সাগরের তরঙ্গাভিঘাতে উত্তর মুখে একটা পাতার আকারে বাহির হইয়া গিয়াছে। পাতার বোটা জার্ম্মানীর সহিত সংলগ্ন এবং উহার আর এক প্রান্ত হইল স্ব (Skaw) অন্তরীপ। দেশের ভূমিভাগ একটানা সমতল। হিমেল বির্গ্ (Himmelbierg) নামক পাহাড়ই ডেনমার্কে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা ৫০০ ফিট্ মাত্র। ডেনিস্ ভাষায় হিমেল-বির্গ্ শব্দের অর্থ "স্বর্গের পাহাড়"। নরওয়ের ফিওর্ড গুলির তীরবর্ত্তী এক একটা পাহাড়ের উচ্চতা ৬০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু ডেন্মার্কের ফিওর্ড্ সমূহের তীর-

ভূমি অতি নিম্ন বালুকার বাঁধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ডেনমার্কের সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ এরূপভাবে সাজান যে উহাদের ফাঁকে ফাঁকে বহু সংখ্যক প্রণালী রহিয়াছে। তন্মধ্যে সাউণ্ড্ (Sound), গ্রেট্ বেল্ট, (Great-Belt) এবং লিট্ল্ বেল্ট্ (Little Belt) প্রধান। সাউণ্ড্ প্রণালী সুইডেন ও জী ল্যাণ্ডের মধ্যে, গ্রেট্ বেল্ট্ জী-ল্যাণ্ড্ ও ফিউনেন্ দ্বীপের মধ্যে এবং লিট্ল্ বেল্ট ফিউনেন্ ও জাঠ-ল্যাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। লীম্‌ফিওর্ডের মুখ একটী স্বাভাবিক খালের মত কাটেগাট্ উপ-সাগরে পড়িয়াছে। গ্রেট্ বেল্টই একমাত্র গভীরতম প্রণালী; যাহার মধ্য দিয়া বড় যুদ্ধ জাহাজ যাইতে পারে। অন্যান্য প্রণালী সমূহের গভীরতা অতি অল্প। তাহাতে বড় জাহাজ চলাচলের উপায় নাই। গিউডেনা (Gudena) নামক ৯০মাইল দীর্ঘ একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত ডেনমার্কের একমাত্র নদী। সারি সারি বীচ্ বৃক্ষ-শোভিত বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর হ্রদ ডেনমার্কে আছে।

ডেনমার্কের জলবায়ু সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে তিনটী কথা মনে রাখিতে হইবে, (১) ডেনমার্ক অতি উত্তরে অবস্থিত [illegible] উত্তর প্রান্ত, অর্থাৎ স্ক অন্তরীপ, সুমেরু বিন্দু হইতে প্রায় ৩২ ডিগ্রী দূরবর্ত্তী; (২) দেশের ভূমিভাগ অতি নিম্ন (৩) দেশের সকল স্থানই সমুদ্রের অতি নিকট-বর্ত্তী। ডেনমার্ক দেশটী পশ্চিম ও পূর্ব্ব ইউ-রোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সুতরাং উভয়েরই জলবায়ুর অবস্থা ডেনমার্কে দেখা যায়। গ্রীষ্ম কালে এখানে ইংলণ্ড অপেক্ষা গরম বেশী এবং শীতকালেও ঠাণ্ডা বেশী বোধ হয়। কিন্তু ইহাতে লোকের কর্ম্মশক্তি নষ্ট করেনা। পশ্চিম ও পূর্ব্ব ইউরোপের মধ্যস্থলে এবং উত্তর প্রান্তে অবস্থিত হওয়াতে শুধু জলবায়ুর হিসাবে নহে ব্যবসা বাণিজ্যেও ডেনমার্কের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী দেশ খুব কাছে থাকতে তাহাদের সহিত কারবার করিয়া ডেনমার্কের অধিবাসিগণ দেশের বাণিজ্য সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে। একদিকে বাল্টিক সাগরের প্রবেশ পথ আগ্‌লাইয়া এবং অন্যদিকে উত্তর সাগরকে আয়ত্ত করিয়া তাহারা সমুদ্র পথেও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের কেন্দ্রবর্ত্তী সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সমুদ্র সান্নিধ্যের এই সুবিধা ঘটে নাই। ডেনমার্কের পক্ষে ইহাকেই বলা যায়, ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ-গ্রহণ।

(ক্রমশঃ)

আর্থিক সংবাদ

গত ২৬ শে জানুয়ারী ৮নং পগেয়াপট্টি ষ্ট্রীটে (কলিকাতা, বড়বাজার) কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের একটী ব্রাঞ্চ আফিস্ খোলা হইয়াছে। ঐ তারিখে গৌহাটী সহরে নাথ ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ আফিস্ স্থাপিত হয়। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে নাথ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

—০—

ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স আদায় ও হিসাবের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটী প্রধান জেলায় ভাগ করা হইবে। তদনুসারে কলিকাতার নাম হইবে, "কোম্পানীর জেলা নং ৩—Companies District no. III.

—০—

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল গত ২৬ শে জানুয়ারী আসানসোলে একটী ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন। বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার উদ্বোধন উৎসবে পৌরহিত্য করেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর ধীর ও নিশ্চিত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সুখী হইয়াছি।

—০—

নেপালের মহারাজা স্বীয় রাজ্যে একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহার মূলধন এক কোটী (নেপালীমুদ্রা)। বর্ত্তমানে ২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা হইবে। তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার নেপাল রাজসরকার নিজেই ক্রয় করিবেন। অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ টাকার শেয়ার নেপালের অধিবাসীদের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে। যাহারা নেপাল রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী নহেন, তাহাদের নিকট এই ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করা হইবে না।

—০—

ইতালী ও আবিসিনীয়ার যুদ্ধের সময় ইতালীকে জব্দ করিবার জন্য জাতি-সংঘ (League of Nations) হইতে ফতোয়া জারী হইয়াছিল, ইতালীর কাছে কেহ যেন কোন জিনিস বিক্রয় না করে। তখন ভারতবর্ষ হইতেও ইতালীতে মালপত্র পাঠান বন্ধ হয়। ফলে এখন ইতালীতে ভারতবর্ষের তিসি রপ্তানী একেবারে নাই। পূর্ব্বে ইতালী যত তৈলবীজ ক্রয় করিত তার অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত। ভারতবর্ষ তিসি পাঠান বন্ধ করিলে, সেই সুযোগে চীন, ব্রাজীল, ও আর্জ্জেন্টীনা এই তিনটী দেশ ইতালীর তৈল-বীজের বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে।

—০—

বিহার [illegible] প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একযোগে পরামর্শ করিয়া দেখিতেছেন, ঝোলা গুড় হইতে কিরূপে "পাওয়ার য়্যালকহল" Power Alcohol) তৈয়ারী করা যায়। ইহা

পেট্রোলের সঙ্গে মিশাইলে মোটর চালাইবার কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে চিনির কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঝোলা গুড় উৎপন্ন হইতেছে। উহাকে উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিতে না পারিলে আর্থিক ক্ষতি গুরুতর হইয়া উঠিবে।

—০—

৫নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের হাইকোর্ট ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী—নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাটনা ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিহার গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স্ ও কমার্স্ বিভাগের পার্লিয়ামেণ্টারি সেক্রেটারি মিঃ জগৎ নারায়ণ লাল এম্ এল এ, সভাপতির কার্য্য করেন।

—০—

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট্ কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৩৮ সালে ১৫০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা হইতে অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনার্স্ য়্যাসোসিয়েসান ২৯ হাজার টাকা পাইবে।

—০—

১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলের মজুরদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য "বম্বে টেক্সটাইল এন্‌কোয়ারী কমিটী" গঠন করেন। সম্প্রতি উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই,—"বস্ত্র শিল্প ব্যবসায়ে যে মন্দার বাজার পড়িয়াছিল, এখন আর তাহা নাই এবং ভবিষ্যতে পুনরায় মন্দা পড়িবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। সুতরাং এখন কাপড়ের কলের মালিকদের হাতে খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দ্বারা মজুরদের বেতন শতকরা ১২ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। উৎপাদন খরচার শতকরা ২২॥০ টাকা মজুরদের বেতন ধরিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে। এই হিসাব মত আহমদাবাদ মিলে শতকরা ৯ টাকা, বোম্বাই মিলে শতকরা ১১·৯ টাকা (প্রায় ১২ টাকা) এবং সোলাপুর মিলে শতকরা ১৪·৩ টাকা মজুরী বৃদ্ধি পাইবে।

—০—

"ষ্টার ফাইনান্স্ লিমিটেড" নামক কারবারের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "ক্যালকাটা ষ্টাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক্ লিমিটেড্" হইয়াছে এবং তাহার বর্ত্তমান আফিসের ঠিকানা ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

—০—

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হগ্ষ্ট্রীটে করপোরেশন বিল্ডিংসে ক্যালকাটা করপোরেশন ওয়ার্কার্স্ কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক্ লিমিটেড্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

—০—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা সহরে ত্রিপুরার মর্ডান্ ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ্ খোলা হইয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর এই ব্যাঙ্কের পেট্রন্ বা পিতৃস্থানীয়।

—০—

১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার নীট্ লাভ হইয়াছে ২৭৯১২০০ টাকা। ইহা হইতে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩||০ টাকা হিসাবে ডিভিডাণ্ড বা লভ্যাংশ দিবার জন্য ১৭৫০০০০ টাকা বাদ দিয়া মোট উদ্বৃত্ত ১০৪১২০০ টাকা (১৯৩৪ সালের রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক্ অব্ ইণ্ডিয়া আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে) গবর্ণর জেনারেলের হাতে দেওয়া হইবে।

—০—

যুক্ত প্রদেশের বাজেটে পল্লী গ্রামের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট্ প্রায় এককোটী টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে মদ্য প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় ও উহার ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে রাজস্ব কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য বাজেটে কিছু টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে।

—০—

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত ষ্টেট্-রেলওয়ের আয় হইয়াছে ৭৭ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহার পরিমাণ ২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা অধিক।

—০—

মিঃ এইচ্ এস্ মল্লিক, ও বি ই, আই সি এস্ আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে ভারতীয় ট্রেড্-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের কমিটী সদস্যগণ তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন,—

(১) আমেরিকার যুক্তরাজ্যে হেসীয়ান রপ্তানী।

(২) আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ রপ্তানী।

(৩) আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে চা-কাট্তি করাইবার উপায় নির্দ্ধারণ।

—০—

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে ১৪০টী নূতন জয়েন্ট্ ষ্টক্ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ ৫৬২০০০০ টাকা।

আমাদের গোধন ও দুগ্ধ সমস্যা

গোদুগ্ধ যে দেহের পুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক একথা কাকেও বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু গোদুগ্ধ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যে অনাবশ্যক নয় সেকথা আলোচনা করার দরকার আছে। একথা আজ সত্য যে, বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন শিশু; বৃদ্ধ বা যুবা পুষ্টির আবশ্যকীয় পরিমাণ দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় না, যদিও বা প্রাপ্ত হয় ত খাঁটী দুগ্ধ লাভ করে না। এর একমাত্র কারণ এই যে, বাংলাদেশে দুগ্ধের অভাব হয়েছে, যদিও গরুর কিছুমাত্র অভাব ঘটেনি। কথাটা নিতান্ত উল্টোপাল্টা শোনালেও ব্যাপারটা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নয়। হিসাব থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে গোজাতীয় পশু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় বর্ত্তমান, তবুও বাংলার লোক 'হা দুগ্ধ—হা দুগ্ধ' করে মরে। এর কারণ হচ্ছে যে, বাংলাদেশের গরু যে পরিমাণে সংখ্যায় বেশী, তার দুধ দেবার ক্ষমতাও ঠিক সেই পরিমাণেই কম। সুতরাং বাংলাদেশের গরুর কার্য্যকারীতা নেই বললেই চলে। সেধার দিয়ে দেখতে গেলে বাংলাদেশের গোধন জাতীয় সম্পদ না হয়ে জাতীয় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এসম্পর্কে চমৎকার কথা বলেছিলেন, তাঁর মতে বাংলার গরু কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট করে ফেলা কর্ত্তব্য। বাংলার গরুর এই রকম দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ যে খাদ্যাভাব, সেবিষয়ে সকলেই একমত। যে দেশের মানুষ খেতে পায় না সে দেশের গরুর যে আহার্য্য জুটবে না সেটা স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের খাদ্যের অভাবের দরুণই দেশের সমস্ত গোচারণ ভূমি পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং গরুর আহার্য্য জোটা যে কঠিন ব্যাপার সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বিচালী অর্থাৎ খড়ের জাব গরুকে দেওয়া চলে কিন্তু তার জন্যও দেশের [illegible] সঙ্গতি চাই, কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখতে পা[illegible] সঙ্গতি ত দূরে থাক্ দেশের [illegible] বেঁচে থাকার সামর্থ্য পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হ'তে চলেছে। বাংলার অধিকাংশ কেন, প্রায় সর্ব্বাংশের অধিকারী হচ্ছে কৃষক, সেই জন্যই বাংলার গোধনের বেশীর ভাগই থাকে পল্লীগ্রামে। কৃষকদের অভাব অনটনের জন্যই তারা কিয়ৎপরিমাণ খড় বিক্রী করতে বাধ্য হয়, অবশিষ্টাংশের মধ্যে কতকটা চাল ছাওয়ার কাজে ব্যয়িত হবার পর যেটুকু থাকে তার দ্বারা গরুর ঐ চিবানোর কাজই চলে, পেট ভরে না। সেইজন্যই বাংলার গরুর ঐ রকম হাড় জিরজিরে চেহারা—সেইজন্যই বাংলার গরু গড়ে দৈনিক আধসের দুধ দেয় কি না সন্দেহ। অনেকে বাংলা গাই-এর দোষ দিয়ে থাকেন, কিন্তু দোষটা সত্যই তার প্রাপ্য কি'না সেটা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

বাংলা গাই-এর একমাত্র দোষ যে সে পশ্চিমী গাই নয়, কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করে কি হবে? দেশের জল হাওয়ার গুণাগুণ আমরা বদলাতে পারি না, সেইজন্যই বাংলা গাই পশ্চিমী গাই হয়ে ওঠে না। কিন্তু বাংলা গাই ত ফেলো জিনিস নয়, উপযুক্ত যত্ন নিলে সেও ৩।৪ সের দুধ প্রদান করে। অনেকে আবার বলেন যে, গরুর পরিচর্য্যার অভাবেই আমাদের দেশে গোধনের অবনতি ঘটেছে। কথাটা খাঁটী সত্য, কিন্তু উক্ত ভাষণটি গরুর মালিকদের দোষ দেবার জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেটা মোটেই সত্য নয়। আমরা গরুর পরিচর্য্যা করি না, কিন্তু সেটা ইচ্ছা করে নয়, সামর্থ্য নেই বলেই করতে পারি না। যাদের সামর্থ্য আছে সেই সহরের লোকে গরুর পরিচর্য্যা করে থাকে কিন্তু সমগ্র দেশের লোক সংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা আর কতটুকু? এমতাবস্থায় আমাদের অতিরিক্ত গরু নষ্ট করে ফেলা ছাড়া আর উপায় কি?

কথাটা শুনে অনেকে হয়ত একেবারে চমকে উঠবেন, ধর্ম্ম রসাতলে গেল বলে আমাদের ওপর বহুলোক হয়ত মারমুখো হয়ে আসবেন, কিন্তু তাদের সকলকেই আমরা একবার প্রকৃত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে অনুরোধ করি।

একথা সত্যি যে, গরুর সংখ্যা আমরা যদি না কমাই তাহ'লে গোধনের হিতার্থে প্রত্যেক গরুটির আবশ্যকীয় পুষ্টির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কেউ যদি কোন মন্ত্রবলে বা তন্ত্রবলে অথবা নীতিবলে সে ব্যবস্থা করতে পারেন তাহ'লে আমরা এমন কথা কখনই বলবনা যে, গরুর সংখ্যা কমিয়ে দাও, কিন্তু আমরা জানি যে বর্ত্তমান অবস্থায় সে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সে ব্যবস্থা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন দেশের লোকের সঙ্গতি বৃদ্ধি পায়। দেশের লোকের সঙ্গতি বৃদ্ধি করবার ভার আমাদের হাতে নেই; সে ভার আছে রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্রবিপ্লব ছাড়া বর্ত্তমান রাষ্ট্রশক্তি যে সে ব্যবস্থা করবে এমন বিশ্বাস আমরা রাখিনে, সম্ভবতঃ বাংলাদেশের অনেকেই রাখেন না। কাজে কাজেই আমাদের রাষ্ট্র-বিপ্লব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই কিন্তু সেটিও সহজ ব্যাপার নয়, কেননা, তা' কখন ঘটবে সে কেউ হাত গুণে বলতে পারে না। অতএব অপর কোন্ উপায়ে গরুর পুষ্টিসাধন করতে পারা যায় সেটাই আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক।

গরুর পুষ্টিসাধনের উপায় স্বরূপ আমরা বীনামূল্যে বহু উপদেশ দিয়ে থাকি, আগ্রহাতিসয্যে বলি যে ভাল করে গরুকে খাওয়াও তাহলে দুগ্ধ বৃদ্ধি পাবে। লজ্জার ব্যাপার এই যে, আমরা ভেবেচিন্তে উপদেশ দিই না। ভাল করে খাওয়ালে যে গরুর দুধ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায় সেকথা সবাই জানে কিন্তু আমরা তা' পারব কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। তা যদি না পারি ত' ভাল করে খাওয়ানোর প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের সাধ্যমত আমরা সবাই মিলে প্রতি গ্রামে কয়েক বিঘা জমি গোচারণের জন্য আলাদা করে রাখতে পারি, সাধ্যাতীতভাবে চেষ্টা করলেও না হয় উৎকৃষ্ট প্রজনন কার্য্যের জন্য ভাল ষাঁড়ের ব্যবস্থা করতে পারি; কিন্তু শুধু [illegible] উন্নত প্রজনন-রীতির দ্বারা ত' দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, তার জন্য ভাল খাদ্যের প্রয়োজন; সেই ভাল খাদ্য যোগাড় করবার সঙ্গতি ত আমাদের নেই। তবে প্রত্যক্ষ সঙ্গতি না লাভ করলেও পরোক্ষ সঙ্গতি লাভ আমরা করতে পারি, যদি কিনা আমাদের গরুর সংখ্যা আমরা কমিয়ে দিই, সেইজন্যই আমরা কিয়ৎ সংখ্যক গরু নষ্ট করবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছি।

বিষয়টির একটু বিশদ ব্যাখ্যার দরকার। পল্লীগ্রামে গেলেই দেখা যায় বড় বড় কৃষক পরিবারের গোয়াল গোটেই শূন্য নেই, ৩|৪টি ভগবতী দেবী সেখানে বর্ত্তমান কাহারও কিন্তু শরীর সুস্থ নয়; সকলেরই হাড় জিরজিরে চেহারা, শুকনো মুখ, অশ্রুসিক্ত নয়ন। প্রাণীগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ধুঁকছে, তা' দেখে মা ভগবতীর প্রতি ভক্তি আর জাগে না, করুণাই জাগে। এই রকম অবস্থা ঘটার মূল কারণ যদি অনুসন্ধান করে দেখি তা'হলে দেখতে পাব যে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবেই প্রাণীগুলির ঐরূপ দশা [illegible], সুতরাং বেশী দুধ পাওয়া যাবে [illegible] কে? এইভাবেই প্রাণীদের সন্তান [illegible] হয়, তাদের পরিবার আরও বাড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে এরই দরুণ গাই পিছু খাদ্যের পরিমাণ আরও কমে যায়। সুতরাং অবস্থা যে কোন্ ধারে ফিরছে সেটা সহজেই অনুমেয়। শুধু বড় বড় কৃষক পরি-

বারেই নয়, সকল কৃষক পরিবারের গরুরই ঐ এক দশা। ছোট ছোট কৃষক পরিবারে হয়ত একটি গাই গরু থাকে কিন্তু তাতে কৃষকের লোকসান বই লাভ নেই, কেননা, গরুটিকে সারা বছর খাওয়াতে হয় তবুও মাত্র কয়েক মাস আধ সের করে দুধ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এই হ'ল বাংলার গোধনের আসল পরিচয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে এমতাবস্থায় কিয়ৎ সংখ্যক গরু নষ্ট করে ফেলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। যদি তা না করিত যত দিন যাবে অবস্থা ক্রমশঃ আরও চরমে গিয়ে পৌঁছবে। হিসাব থেকে জানা গেছে যে, এদেশে যত গরু আছে তৎউপযুক্ত খাদ্য এখানে উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হবার উপায়ও নেই, কেননা, তা'হলে অন্য যে সমস্ত চাষ চলেছে তার পরিমাণ কমাতে হয়—আর্থিক দিক দিয়ে সেটা ক্ষতিকর। এধার দিয়ে দেখতে গেলেও গরুর সংখ্যা কমানোই সমীচীন বলে মনে হয়। আগেই বলেছি যে, গরুর সংখ্যা কমালে পরোক্ষ-ভাবে লোকের সঙ্গতি বৃদ্ধি পাবে। কি রকম ভাবে বৃদ্ধি পাবে সেটাই একবার ভাল করে বিচার করা যাক্। যে কৃষক পরিবারে আজ ৪টি গরু আছে অথচ খাদ্যাভাবে কোনটাই বেশী দুধ দিচ্ছে না, যদি গরুর সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে চারটির স্থানে দু'টি করা যায় তা'হলে ঐ চারটি গরুর খাদ্য দু'টিকে প্রদান করলে আর খাদ্যাভাব

থাকবে না এবং ভাল খাদ্য পাওয়ার দরুণ ঐ দু'টি গরুই রীতিমত দুধ দেবে। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে যে, গরুর সংখ্যা কমানোতে পরোক্ষভাবে মালিকের খাওয়াবার সঙ্গতি বৃদ্ধি পেল, এইটারই প্রয়োজন ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে, বর্ত্তমান অবস্থাতে গরুর সংখ্যা কমানো ছাড়া গোধনের উন্নতির আর কোন উপায় নেই। আমরা এমন শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে গোধনকে রক্ষা কল্লে আমাদের অবিলম্বে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি কোন ব্যবস্থা না করিতে [illegible] আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও ক্ষতি। যে সমস্ত গরু আজ খাদ্যাভাবে রোগগ্রস্ত, জরাজীর্ণ ও দুগ্ধহীন হয়ে পড়ছে, দু'দিন বাদে তাদের সন্তান সন্ততির দুগ্ধদা হিসাবে আর কোন চিহ্নই না থাকার সম্ভাবনা। তা' না থাকার মানেই হ'ল আমাদের গোধন লুপ্ত পাওয়া। দেশ হিতকামী কোন ব্যক্তিই যে সে অবস্থা কামনা করেন না এটা নিশ্চয় করেই বলা যায়। আমাদের গোধন লুপ্ত হওয়া বা তার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনায় আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রধানতঃ গোধনের অবনতি ঘটায় তার প্রতিক্রিয়া শুধু গো-সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পরন্তু তা' সারা সমাজের উপর ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের স্বাস্থ্য বলতে তার মানসিক স্বাস্থ্যই বোঝায়, কিন্তু সমাজকে সক্রিয় করতে হ'লে শারীরিক স্বাস্থ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন। মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে গোদুগ্ধ একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ। এই গোদুগ্ধের প্রাচুর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের এতটা হানি ঘটেছে। আমাদের দেশের শিশু মৃত্যুর হার যে সর্ব্বাধিক সেটা সর্ব্বজন স্বীকৃত। কিন্তু পুষ্টির অভাবেই উক্ত মৃত্যু ঘটে থাকে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের হিসাবে আছে যে, প্রত্যেক শিশু ও বয়স্কর পক্ষে এতটা পরিমাণ দুগ্ধ ন্যূনপক্ষে অপরিহার্য্য; কিন্তু ভারতীয় লোকের দুগ্ধ ব্যবহারের যদি হিসাব নেওয়া যায় ত সভ্য জগতের লোক শিউরে উঠবে। ভারতের কমপক্ষে শতকরা ৯০ জন শিশু বা বয়স্কের বরাতে এক ফোঁটা দুধ জোটে না, অথচ স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম পরিমাণ দুগ্ধ একান্ত প্রয়োজন। তবুও এজাত বাঁচে ও বেঁচে আছে কিন্তু সে ত মরারই সামিল। শক্তিহীন, স্বাস্থ্যহীন, প্রাণহীন জড়দেহটাকে কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়াই ত জীবনের লক্ষণ নয়। কোথায় সে উদ্যম, কোথায় সে উৎসাহ, কোথায় সে অফুরান্ত তেজ প্রাচুর্য্য যা সমাজকে সক্রিয়তায় ভরিয়ে তোলে? [illegible] এবং নেই বলেই আমাদের আজ [illegible]গ্রাসী দুর্দ্দশা। এই নাস্তির প্রধানতম কারণ হ'ল আমাদের দেশের দুগ্ধাভাব। যে শিশু জন্ম নেয় তার মার স্তনে দুধ নেই শুধুমাত্র পুষ্টির অভাব, যে পিতা সন্তানকে জন্ম দিলে তার স্তিমিত নিস্তেজ, হৃতস্বাস্থ্যের দরুণই সন্তান পঙ্গুত্বের পরিধি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করল—এই রকম করে [illegible]লছে আমাদের লোক সমাজের গতি প্রবাহ। অথচ দেশে যদি দুগ্ধের প্রাচুর্য্য থাকত তা'লে এতখানি মারাত্মক শোচনীয়তা যে অন্ততঃ ঘটত না সে কথা নিঃসন্দেহে [illegible]

তাই দে[illegible] দিকে আজ দৃষ্টি প্রদান করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে যদি গরুর অভাব থাকতো

তাহ'লে নয় দেশে দুগ্ধাভাব ঘটবার কারণ ছিল, কিন্তু আমাদের দেশে গরুর সংখ্যা অত্যাধিক থাকা সত্বেও আমাদের যখন 'হা-দুগ্ধ' করে বুক চাপড়াতে হয় তখন এর চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার আর কিছুই নেই। সকলে হয়ত জানেন না কিন্তু এটা সত্যি যে কলিকাতার চেয়ে লণ্ডনে দুধের দাম সস্তা। এজিনিসটা সেখানে সম্ভব হয় কি করে? পত্রান্তরে প্রকাশ যে, লণ্ডন সহরে টাকায় ৭ সের দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে টাকায় ৪ সেরের বেশী মেলে না এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। লণ্ডনে দুধ সস্তা হবার কারণই হ'ল যে সেখানে দুধের উৎপাদন বেশী এবং আমাদের এখানে দুধের দর বেশী হবার কারণ হ'ল যে আমাদের এখানে দুধের উৎপাদন কম। ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র ব্যবসার লাভ-লোকসানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে আমাদের কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু এটা আমাদের জীবন মরণের সঙ্গে জড়িত। আমাদের গরু আশাতীতরূপে অধিক সংখ্যায় বর্ত্তমান, কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে পরিমাণ মাফিক দুধ আমাদের মোটেই মেলে না। অনুপাতিক কেন, সামান্য পরিমাণও যদি মিলত তাহলেও বুঝতাম কিন্তু সামান্যতম দুগ্ধ প্রদান করবার ক্ষমতাও আমাদের দেশী গরুর নেই। ব্যাপারটা সত্যই আশঙ্কার নয় কি?

অথচ দুধ যে শুধু পানীয় হিসাবেই ব্যবহৃত হয় তা' নয়, দুধের [illegible] আরও অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হয়ে থাকে [illegible] কারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পের ভাষায় [illegible] বলা যায় যে, দুধও 'কাঁচামাল' রূপে ব্যবহৃত [illegible] আমরা যে লক্ষ লক্ষ টাকার হর্লিক্স, মেলিন্স্ ফুড্, কন্ডেন্স্ড্ মিল্ক্ প্রভৃতি আমদানী করি সে সমস্তই দুগ্ধ হ'তে প্রস্তুত হয়ে থাকে। বিলাতে হাজার হাজার শ্রমিক ঐ সমস্ত প্রস্তুতকরণের কারখানায় কাজ পায়। শুধু ঐগুলি নয়, ঘৃত ও মাখন দুধ থেকেই তৈরী হয়। বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ টাকার ঘি ও মাখন বাংলার বাইরের প্রদেশগুলি থেকে আমদানী করে অথচ বাংলার যা' গোসম্পদ আছে তারা যদি উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধদরা হয় তাহলে বাংলার চাহিদা বাংলাই মেটাতে পারে। এসম্পর্কে খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা' [illegible] পূর্ববর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করেছি—তা' থেকে পাঠকবর্গ সহজেই ধারণা করে নিতে পারবেন যে দুগ্ধকে কি প্রকারে কাজে লাগনো চলে! এদেশে দুধ কেন সস্তা হয়না তার কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। কলিকাতায় কিংবা তাহার উপকণ্ঠে ব্যবসায়ীরা যদি বৃহৎ ব্যাপাররূপে ডেয়ারী ফার্ম স্থাপন করেন তাহলে দুগ্ধের মূল্য হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু সে ডেয়ারী ফার্মে শত শত উৎকৃষ্ট গাভী থাকা দরকার। লণ্ডনে এই রকম বৃহৎ স্কেলে সমস্ত ব্যাপার সাধিত হয়েছে বলেই লণ্ডনের দুধ অপেক্ষাকৃত সস্তা।

উপরে দুগ্ধ সম্পর্কে আমরা সমস্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিলাম, উৎসাহী জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এ বিষয়ে অবহিত হোন এই আমাদের কামনা। দুগ্ধহীন গাভীগুলিকে নিয়ে আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে উঠেছে সেকথা বলাই বাহুল্য, সুতরাং জনসাধারণ সহজেই এই দুগ্ধ সমস্যার প্রতি নজর দেবেন বলেই আমরা মনে করি।

অন্ন সমস্যায় বৃটেন ও বাংলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামানুজ কর

জন এসওয়ার্থ ক্র্যাবট্রী নামক একব্যক্তি ১৯১৯ সালে জে, এ ক্র্যাবট্রী এণ্ড কোং নামে ব্যক্তিগত কারবার গঠন করিয়া সুইচ ও অন্যান্য ইলেকট্রীক যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপন করেন। এই উদ্দেশ্যে ওয়ালসালে এক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইলেকট্রীক যন্ত্রপাতির ব্যবসার জন্য ইহা বেশ লাভজনক কেন্দ্র স্থল। কোম্পানীর কাজ দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১৯২৩ সালে সহরের উপকণ্ঠে লিঙ্কনওয়ারশি নামে আর একটি কারখানা স্থাপন করিতে হয়। কারবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে এজন্য কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রথমে যত্ পরিমাণ জমিতে কাজ চলিত বর্ত্তমানে তাহার ছয় গুণ জমিতে কাজ চলিতেছে। কারখানার জমির পরিমাণ ৭॥০ একর। এই কারখানায় ১৪০০ লোক কাজ করে। লণ্ডন, গ্লাসগো, মাঞ্চেষ্টার ও লীডসে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দোকান স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের দ্রব্য বিদেশেও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। পৃথিবীতে ইলেকট্রীক যন্ত্রপাতী নির্ম্মাণের কারখানাগুলির মধ্যে এইটিই সর্ব্ববৃহৎ। ইহাদের [illegible] পেটেন্টের সংখ্যা দুই শত এবং [illegible] নকসার সংখ্যা দেড় শত। কোম্পানীর মূলধন ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১ পাউণ্ড। রিজার্ভ ফাণ্ডে মজুত ১ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড। গত ১৯৩৬ সালে অংশীদারগণ শতকরা ৬০ হারে লভ্যাংশ পাইয়াছে। ১৯৩৫ সালে প্রদত্ত লভ্যাংশের হার শতকরা ৩৫। ১৯৩২ সালে কোম্পানীর ৭০ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল। তদবধি প্রতিবর্ষে লাভের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্র্যাবট্রী মারা যান। তাঁহার ট্রাষ্টীরা গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে এই কোম্পানীর সত্ব ৯॥ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। এই কারখানা পরিচালনের জন্য ক্র্যাবট্রী ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ নামে এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এক পাউণ্ডের প্রেফারেন্স ৩॥০ লক্ষ শেয়ার ২০ শিলিং ৬ পেন্স মূল্যে এবং ১০ শিলিং এর ৮ লক্ষ ৪০ হাজার সাধারণ শেয়ার ১২ শিলিং ৯ পেন্স মূল্যে মোট ৭ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ডের শেয়ার বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিলে, এক দিনেই ৩ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের আবেদন পাওয়া যায়। এক পাউণ্ড শেয়ারের জন্য ৯২॥০ লক্ষ এবং দশ শিলিং শেয়ারের জন্য ৪ কোটী ৪০ লক্ষ আবেদন হইয়াছিল। কাহাকেও দু'শতের অধিক প্রেফারেন্স শেয়ার

এবং এক শতের অধিক অর্ডিনারী শেয়ার দেওয়া হয় নাই। যাহারা এক হাজার বা ন্যূন—প্রেফারেন্স শেয়ারের অথবা ৩ হাজারের কম অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য আবেদন করিয়াছিল, তাঁহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই।

গত ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে বার্ণ কোম্পানীর উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী গঠিত হয়। আসানসোলের নিকট দামোদর নদের তীরে হীরাপুর ও সাঁতায় কারখানা স্থাপিত হয়। এই স্থানের নাম বার্ণপুর রাখা হয়। এই কোম্পানী সিংভূম জিলায় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দশ বর্গ মাইল জমি ইজারা লইয়াছেন। এখানে ৯ কোটী টন ওর (Ore) পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ণপুরে কোম্পানীর জমির পরিমাণ তিন বর্গ মাইল। এখানে ৩৫ কোটী গ্যালন জল রাখিবার এক জলাধার নির্ম্মিত হইয়াছে। ১১ মাইল পাকা রাস্তা

নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কারখানায় প্রত্যহ ৭৫০ টন পিগ আয়রণ ব্যবহৃত হয়। কোম্পানীর মূলধন ৫ কোটী টাকা। ১৮৯০ সালে কুলটীতে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হয়। এই কোম্পানী সিংভূম জিলায় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৭ বর্গ মাইল জমি ইজারা লইয়াছে। এখানে ১০ কোটী টন ওর পাইবার সম্ভাবনা। Phosphate Rock ও Phosphate of Lime এর জন্য ২৭ বর্গ মাইল জমি ইজারা লইয়াছে। ২॥ বর্গ মাইল জমির উপর কারখানা অবস্থিত। ইহা ব্যতীত কোম্পানীর নিজস্ব রামনগর ও কেন্দুয়া কলিয়ারীতে ৩ কোটী ২০ লক্ষ টন এবং ঝুঁচড়ি, জিতপুর খনিতে ৪ কোটী ১০ লক্ষ টন কয়লা থাকিবার সম্ভাবনা। এখানে প্রত্যহ ৮ শত টন পিগ আয়রণ প্রয়োজন হইবে। গত বৎসর এই দুই কোম্পানী সংযুক্ত হইয়াছে। কোম্পানীর ডিরেক্টরের সংখ্যা ১১ জন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী ৪ জন, ইউরোপীয় ৪ জন, মাড়োয়ারী ১, পার্শী ১ ও জাপানী ১ জন। চেয়ারম্যান বাঙ্গালী। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে এই কোম্পানী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ, এবং ১০ টাকার ৭৩১৪৬৭ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। বিলাতে ঋণ লওয়ায় এবং শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে উচ্চহারে বিজ্ঞাপন দেওয়া, দালালী, ব্যাঙ্কের চার্জ্জ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যয়-বাহুল্য আছে। বিলাতের লোককে কিছু লভ্যাংশ দেওয়াই বোধ হয় কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে কোন কোন কোম্পানী রেজেষ্টারী হইবার ৫।৬ বৎসরেও সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হয় না। দেশে যে অর্থের অভাব তাহা নহে। যাহারা কোম্পানী গঠন করেন, তাহাদের উপর লোকের আস্থা না থাকায় শেয়ার বিক্রী হয় না। নতুবা এখনও দেশের লোক ২৸০ টাকা বার্ষিক সুদে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৫ কোটী টাকার শেয়ারের জন্য ৮ কোটী টাকার দরখাস্ত পড়িয়াছিল। উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক কোম্পানীর ডিরেক্টর হইলে এদেশেও টাকার অভাব হয় না। একবার কোন কোম্পানীর দালাল বাঁকুড়ায় শেয়ার বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোম্পানীতে কে কে ডিরেক্টর আছেন? ব্যবসায় অভিজ্ঞ বিশ্বাসী কোন ধনী ডিরেক্টর হইয়াছেন কি? ডিরেক্টাররা কত টাকার শেয়ার লইয়াছেন? কিন্তু তিনি বলিলেন, সকলেই খুব যোগ্য লোক, কংগ্রেসের লোক, আইন অমান্য আন্দোলনে জেলে গিয়াছিলেন। কোম্পানীর মূলধন ৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু ৫ বৎসরে মোট ৪০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রী হইয়াছে। চারি আনা পয়সা দিয়া কংগ্রেসের সদস্য হইলে, আইন লঙ্ঘন করিয়া জেল খাটিয়া আসিলেই পাকা ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। এ সকল কাজে ব্যবসার কোন যোগ্যতাই লাভ হয় না। জিজ্ঞাসা করিলাম ডিরেক্টারেরা কে কত টাকার শেয়ার লইয়াছেন। তাহাতেও তিনি বলিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসের লোক। কংগ্রেসের লোক হইলেই পরের ধনে পোদ্দারী করিতে হয়। এই কোম্পানীতে ৭ জন ডিরেক্টর আছেন। মূলধন ৫ লক্ষ টাকা, প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা নিলেও ৭০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় হইত। ৫ লক্ষ টাকার কারবারে যাহারা প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা নিয়োগ করিতে পারেন না, তাহারা কোন সাহসে সাধারণের নিকট হইতে তত টাকা পাইবার আশা করেন? দেশের লোকই

বা কোন্ বিশ্বাসে এত টাকা তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিবেন? ধাপ্পাবাজী দিয়া অথবা দেশ্ হিতৈষণার ভান করিয়া দেশের লোকের চোখে ধূলি দিবার দিন গত হইয়াছে। তুমি যদি নিজে ৫০ হাজার বাহির করিতে পার, তবে দেশবাসীর নিকটও ৫০ হাজার পাইবার আশা করিতে পার। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা ও পরের ধনে পোদ্দারী করিবার দিন গত হইয়াছে।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা, কিন্তু ২৪ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রী হইয়াছে। পূর্ণোদ্যমে কাজও চলিতেছে। অংশীদারগণও লভ্যাংশ পাইতেছেন। ঢাকার কয়েকজন ধনী মিলিত হইয়া এই কল প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে ধনীর অভাব নাই, কাজেই মূলধন সংগ্রহে কষ্ট হয় নাই। ডিরেক্টারেরা মোটা টাকার শেয়ার কিনিয়াছেন। কোম্পানীর কোন ক্ষতি হইলে ডিরেক্টরগণেরই সর্ব্বনাশ, সবচেয়ে তাঁহাদেরই বেশী ক্ষতি হইবে। মিলের উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা বঙ্গেশ্বরী কটন মিলে অনেক টাকা দিয়াছেন এবং স্বয়ং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়াছেন। সার বিনোদচন্দ্র মিত্রের পুত্রগণ বাসন্তী কটন মিলে বহু টাকা দিয়াছেন। শ্রীযুত ভূতনাথ কোলে স্বয়ং কাপড়ের কল করিতেছেন। ধনীর ছেলেরা যদি এই ভাবে ঘরের টাকা বাহির করিয়া ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করেন, তবে সাফল্য অনিবার্য্য। যাহা হউক এতদিনে দেশের লোকও বুঝিতে পারিয়াছে এবং যাহাদের পয়সা আছে, তাঁহাদেরও বোধগম্য হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)
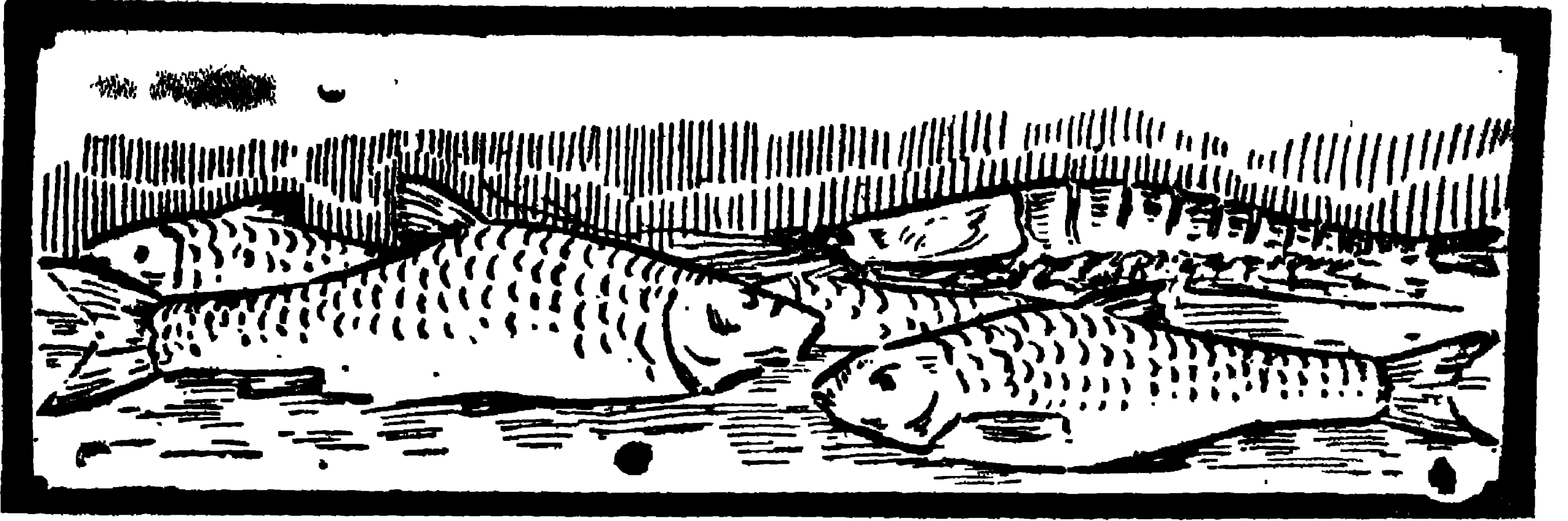
বাংলা দেশের মৎস্য সম্পদ

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় বহুকাল যাবৎ বার বার আমরা বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ্ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দক্ষিণে বিশাল সমুদ্র এবং স্থলভাগে বহু সংখ্যক নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী,—এই মৎস্য সম্পদের অফুরন্ত আধার। কিন্তু ইহাকে আয়ত্ত করিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। এদিকে বেকার সমস্যা ও আর্থিক দুর্গতি ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি ডাঃ নাইডু নামে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বাংলা গভর্ণমেণ্টের ফিসারী বিভাগে বিশেষজ্ঞরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বাংলাদেশের নানাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মৎস্য রক্ষা,—মৎস্য বৃদ্ধি এবং মৎস্য ব্যবসায় সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবেন। আমরা গভর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ও রিপোর্ট তৈয়ারী,—এই দুইটি কার্য্যকে ভাল চক্ষে দেখি না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—Much cry,—little wool ;—অর্থাৎ শূন্য ঘড়ায় শব্দ শোনায় বেশী। এ যাবৎ দেখিতেছি, যেখানে কমিটি, কমিশন, এক্স্পার্ট, রিপোর্ট,—প্রভৃতির ছড়াছড়ি সেইখানেই প্রকৃতপক্ষে কাজ কিছু হয় না। যাহা হউক এ ক্ষেত্রে আমাদের সেই ধারণা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমরা সুখীই হইব।

এসম্বন্ধে আর একটী বিষয়ে আমরা গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছি। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা একটা লজ্জাজনক অকর্ম্মণ্যতার পরিচায়ক যে দেড়শত বৎসর পরে এখনও বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ একজন বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধান ও মন্তব্যের উপর নির্ভর করিতেছে! দ্বিতীয়তঃ অনুসন্ধান করিতে আনা হইল একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোককে,—বাংলাদেশ সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ বাংলা দেশের মৎস্যবহুল কেন্দ্র সমূহের ভৌগলিক অবস্থান এবং মৎস্যজীবিদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তাহাদের সুবিধা অসুবিধাদি সম্বন্ধে যাঁহার সাক্ষাৎভাবে কোন জ্ঞান নাই। আমরা জানি কয়েকজন বাঙ্গালী (তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ আমেদ নামক জনৈক মুসলমান যুবক বিখ্যাত) মৎস্য-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে

মোহাম্মদী কাগজে আমেরিকায় মৎস্যের চাষ ও ব্যবসা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ ইনি লিখিয়া ছিলেন। কেহ কেহ ইউরোপ ও আমেরিকাতে যাইয়াও এসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সেই সকল বাঙ্গালী যুবক, স্বদেশের সমস্ত খুঁটিনাটি যেমন জানেন,—এমন আর কেহ জানিতে পারিবে না,—তিনি যত বড় বিশেষজ্ঞই হউন না কেন।

মিঃ নাইডু নাকি বাংলাদেশে আসিয়া শুনিলেন, ইলিশ মাছ বাঙ্গালীর খুবই প্রিয়;--সুতরাং তিনি বলিয়াছেন, "যদি ডিমওয়ালা ইলিশ মাছগুলি ধরিয়া লোকে খাইয়া ফেলে, তবে এই মাছের বংশ লোপ পাইবে। পক্ষান্তরে যদি ইলিশ মাছের ডিম ফুটাইবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ডিম হইতে মাছ উৎপাদন করা হয়, তবে ইলিশ মাছের বংশ বৃদ্ধি হইবে।" কি অপূর্ব্ব সংবাদই মিঃ নাইডু দিয়াছেন! এমন না হইলে কি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়? তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের বিষয় গত বারের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে আলোচিত হইবার যোগ্য ছিল! "ঘুমুলে যে চোখে দেখা যায় না"—এই তত্ত্বের চেয়েও মিঃ নাইডুর ইলিশ মাছ সম্পর্কিত আবিষ্কার অধিকতর মূল্যবান!

নিতান্ত মনের দুঃখে আমরা এতগুলি কথা বলিলাম। মিঃ নাইডুর যোগ্যতা বা জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের উন্নতি কার্য্য এখনই,—আগামী কল্যই আরম্ভ করা যাইতে পারে,—তার জন্য তদন্ত, রিপোর্ট প্রভৃতি তোড়জোড় ও পাঁয়তারার প্রয়োজন নাই। এসম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত-রূপে আলোচনা করিয়াছি,—ভবিষ্যতে আরও করিব।

কেমন করিয়া মাছের নানারূপ By product করা যায়, খাদ্য হিসাবে মাছকে কি করিয়া দীর্ঘকাল preserved করিয়া রাখা যায় তাহা হাতে কলমে শিখাইয়া দিবার জন্যই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে!

Preserved fish, fish paste, smoked fish, Dryfish, fish manure, fish bone-meal, Isinglass প্রভৃতি নানারূপ জিনিষ মাছ হইতে তৈরী করা হয় এবং পৃথিবী ব্যাপী তাহার ব্যবসা চলিতেছে। Transport facility বা মাল চালান দিবার সুবিধা না থাকায় বাংলা দেশের নানা মৎস্যকেন্দ্রে হাজার হাজার মণ মাছ পচিয়া যায় এবং তাহা "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" নষ্ট হইয়া যায়। অথচ উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে এবং মূলধন জোগাইবার ব্যবস্থা থাকিলে এই বিরাট অপচয়কে একটা জাতীয় সম্পদে পরিণত করা যায়। আমরা ঢাকার নবাব বাহাদুরের দৃষ্টি এইদিকেআকর্ষণ করিতেছি।

শিল্পপ্রসঙ্গ

খাম প্রস্তুতের ব্যবসা

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ নিজের মনের ভাব অপরের কাছে ব্যক্ত করতে শিখেছে—এটা শুধু তার পক্ষে প্রয়োজন নয়, এতে তার তৃপ্তি। সে মনের ভাব প্রকাশ শুধু তার মুখের কথায় নয়, ভাষা-লিখনের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। কথনের চেয়ে এই লিখন প্রণালী যার যত সম্পূর্ণ, আর্টও তার তত বেশী করায়ত্ত। মানুষ এই আর্টকে যেদিন থেকে আবিষ্কার করেছে, সেদিন থেকে হয়েছে সভ্যতার জন্ম। সভ্যতার যতই শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, লিখন-প্রণালীর ভঙ্গিমা ও ব্যাপকতা তত বেড়ে যাবে। আজকের যুগে এই লিখন প্রণালীটা শুধু আর আর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রভৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রেই তা' ছড়িয়ে পড়েছে।

সভ্যতা কিংবা আর্টের ব্যাপার আমাদের আলোচনার বস্তু নয়, আমাদের আলোচনার বিষয়, হ'ল ব্যবসা-বিজ্ঞান। কিন্তু আমরা যে বস্তু নিয়ে আলোচনা করছি তার সঙ্গে লিখন-প্রণালীর সম্পর্ক আছে। মালপত্র স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য যেমন চটের প্রয়োজন, দোকানে জিনিসপত্র বেচবার জন্য যেমন ঠোঙ্গা কিংবা বাক্সের প্রয়োজন, তেমনি লিখিত বিষয় অপর যায়গায় প্রেরণ করবার জন্য খামের প্রয়োজন। বস্তুত খাম ঐ ঠোঙা বা চট-জাতীয় বস্তুর ব্যবহারেরই সামিল, তবে আকৃতির রকমফের এই যা তফাৎ। আমাদের দেশে কিংবা সারা দুনিয়ায় চট্ বা ঠোঙা যে কী পরিমাণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা' সকলেরই জানা আছে। সেই রকম খামের ব্যবহারের কেউ যদি কোন হিসাব রাখত তাহ'লে দেখতে পেত যে তার ব্যবহারের পরিমাণ ও-দুটি বস্তুর চেয়ে মোটেই কম নয়, বরং বেশী। আমরা আমাদের চার পাশে দেখতে পাই যে ঠোঙা বিক্রী করে কত লোক দু'পয়সা রোজগার করছে, বস্তুত: ও-একটি কুটির শিল্পেরই সামিল। খাম প্রস্তুত করেও আমাদের দেশের দপ্তরী সম্প্রদায় বেশ দু'পয়সা পেয়ে থাকে, কিন্তু ঠোঙা প্রস্তুতের মত এবস্তুটি কুটির শিল্প হিসাবে এখনো গণ্য হয়নি। একমাত্র উপজীবিকারূপে

এ-বস্তুটি কুঠির শিল্পরূপে অবলম্বনের উপযুক্ত নয়, কেননা, বাজারে মেসিন প্রস্তুত খামের যথেষ্ট প্রতিযোগিতা আছে; কিন্তু কুঠির শিল্পের অপরাপর বস্তুর সঙ্গে খাম প্রস্তুত শিল্পটিও চলতে পারে বলেই মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, খামের ব্যবহার ও চাহিদা অনেক। দেশের শিল্প বাণিজ্য কিংবা আর্ট ও সাহিত্যের সঙ্গে তার ব্যবহার ও চাহিদা আরও বাড়বে। খাম প্রধানতঃ চিঠি বহনের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, প্রতিদিন কত লক্ষ লক্ষ চিঠি যে বিলি হয় তার ইয়ত্তা নেই। পাড়াগাঁয়ে লোকে কিংবা সাধারণ সহুরে লোকে ধারণা করতেই পারে না যে দৈনিক কী পরিমাণ চিঠি লেখা হয় এবং বিলি হয়; কিন্তু যাঁরাই অফিস অঞ্চলে ঘোরেন তাঁরাই জানেন যে চিঠির খমের ব্যবহাবের পরিমাণ কী বিরাট। দেশের শিল্প-প্রসারণ যত বেশী ঘটবে খামের ব্যবহার তত বেড়ে যাবে। সুতরাং খাম শিল্প আমাদের দেশে যে একটি চলতি কারবার এবং এর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। শুধু শিল্প প্রসারণের দিক দিয়েই নয়, সংস্কৃতিগত উন্নতির সঙ্গেও খাম শিল্পের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্ত্তমান। দেশে শিক্ষার বিস্তার যত ঘটবে, পত্র লেখার রীতি ও অভ্যাস তত বাড়বে। আজ আমাদের দেশের শতকরা ৮।১০ জনের মাত্র অক্ষর পরিচয় আছে, সুতরাং জন-সাধারণের চিঠি লেখার অভ্যাস নেই বললেই চলে। কিন্তু এই রকম অবস্থা ত আর সব সময় থাকবে না, ক্রমশঃই শিক্ষার বিস্তার ঘটছে। সংস্কৃতিগত উন্নতির একটা প্রধান গুণ এই যে, মানুষকে তা' সংস্কৃতিগত কোরে তোলে। সুতরাং মানুষের তখন ব্যক্তিগত রুচি চর্চ্চার বহরটা একটু বেড়ে যায়,—পত্র লেখাটা তার মধ্যে অন্যতম। কি সাহিত্য; কি শিল্প, কি ক্রীড়া-কৌতুক, যার যে ধারেই ঝোঁক থাকুক না কেন, চিঠি লিখন তার পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, খামের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।

এইবার ‘খাম প্রস্তুতের’ ব্যাপার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা য'ক্। শতাব্দীর পর শতাব্দীর মধ্য দিয়ে খামের আকৃতি এবং তা প্রস্তুতের নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রথম প্রথম কেহই পত্র খামে বন্ধ করবার আবশ্যকতা বোধ করত না। সে-সময় একখানি কাগজের এক পিঠে বক্তব্য বিষয় লিখে তার পর সেই কাগজখানা মুড়ে দিয়েই খামের কাজ সেরে দেওয়া হ'ত। কিছুকাল গত হ'বার পর সেই লিখিত কাগজখানা মোড়বার এমন কৌশল আবিষ্কৃত হ'ল যাতে ক'রে মোড়া কাগজখানাকে ঠিক খামের মতই দেখাত কিন্তু কালক্রমে চিঠিকে একটু সুদৃশ্য ও সৌখীন করবার জন্যই এবং বক্তব্য বিষয় অপরের নিকট গোপন রাখবার জন্যই খামের আবিষ্কার ঘটল। প্রথম প্রথম, যার চিঠি সেই ব্যক্তি নিজেই খাম প্রস্তুত করে নিতো, কিন্তু এটা কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ বোধ হওয়ায় মনোহারী দোকানের মালিকেরা এই খাম প্রস্তুত করণের ভার গ্রহণ করেছিল। পরে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাম প্রস্তুত করণের ফ্যাক্টরী গজিয়ে ওঠে। এই প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে একেবারে সরল ছিল, পরে মনুষ্য চালিত যন্ত্র সাহায্যে খাম উৎপন্ন হ'তে থাকে। কিন্তু তারপর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সমস্তই মেসিনে সমাধা হয়—শুধু একধারে কাগজ খাইয়ে দিতে হয় এবং অপরধারে খাম প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে আসে।

খাম প্রস্তুতের মেসিন প্রথমে জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়। তাতে কাগজ কাটা, আঠা লাগানো, কাগজ মোড়া ও জোড়া প্রভৃতি পৃথক পৃথক ভাবে সম্পন্ন হ'ত, কিন্তু সেই পুরাতন মডেলের মেসিনের এই ত্রুটি ছিল যে তাতে নানান্ আকারের খাম প্রস্তুত করতে অসুবিধায় পড়তে হ'ত। তা'ছাড়া তাতে ভাল কাগজ অর্থাৎ দু'ধারে মসৃণ কাগজ না দিলে ভাল খাম তৈরী করা চলত না। সেই জন্য বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর আবিষ্কৃত এক উন্নত ধরনের মেসিন ব্যবহৃত হয় যার নাম হ'ল Schnellaeufor or Racing machnies এই মেসিনের কর্ম্ম পদ্ধতি হচ্ছে যে, কাগজগুলোকে উপযুক্ত আকারে কেটে প্রথমে তাতে আঠা লাগানো হয়—তারপর অন্যান্য ব্যাপার সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। আসলে এই মেসিনের হ'ল দু'টি বিভাগ, একটিতে আঠা লাগানো হয় এবং অপরটিতে অন্যান্য কার্য্য চলে। আঠা লাগাবার যন্ত্রটিকে ৮ ঘণ্টা চালালে তা' ২॥ লক্ষ খামের উপযুক্ত কাগজে আঠা লাগিয়ে এবং তা' শুকিয়ে অপর বিভাগে পাঠিয়ে দেবে। এই অপর বিভাগ আবার ৮ ঘণ্টার মধ্যে সেগুলো খামে পরিণত করে থাক্ দিয়ে সাজিয়ে দেয়। খুব জোরে মেসিন চালালে ৮ ঘণ্টা কাজে উভয় বিভাগ হ'তে পাঁচ লক্ষ খাম উৎপন্ন হ'তে পারে—সময় সময় ৬ লক্ষও পাওয়া যায় এ ত গেল অটোম্যাটিক্ মেসিনের ব্যাপার। কিন্তু তা' ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেসিন দ্বারা খাম প্রস্তুত করা যায়। কম মূলধনে কাজ চালাবার পক্ষে এগুলি উপযোগী। অনেক যায়গায় হাতে আঠা লাগিয়ে তারপর মেসিন সাহায্যে খাম প্রস্তুত হয়ে থাকে কিন্তু তাতে সময় বেশী যায় এবং খামও সুন্দর হয় না। সেই জন্য খাম তৈরীর মেসিন ছাড়াও কাগজে আঠা

লাগাবার জন্য মেসিন থাকা দরকার। এই আঠা লাগাবার মেসিনের প্রক্রিয়া খুবই সহজ; কাটা কাগজ স্তূপাকার করে সাজান থাকে এবং তার উপরে গামিং বক্স্‌টি রাখা হয়। ঐ গামিং বক্সের তলার দিকে যে পরিমাণ যায়গায় আঠা লাগাতে হ'বে সেই পরিমাণ একটা 'ফেল্ট্‌' থাকে—এক একখানা করে টেনে নেওয়া হয় এবং সেই ফেল্ট্‌টি পর পর সাজানো কাগজের ওপর পড়ে ঠিক সমান ভাবে আঠা লাগিয়ে যায়।

বর্ত্তমানে, আঠা লাগানো এবং খাম প্রস্তুতকরণ একই মেসিনে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়। প্রথমে কাগজ খাইয়ে দেওয়া হয়। একটি মেসিনে তা' সাইজমত কেটে স্তূপীকৃত হয়; অপর একটি যায়গায় তাতে আঠা লাগানো (মিনিটে ৫০০) ও শুষ্ক হয়ে থাকে; তারপর সেগুলোকে অপর আর এক মেসিনে খাইয়ে দেওয়া হয়—তাতে ঐ কাগজ খামের আকারে মোড়া হয়, আটা দিয়ে জোড়া হয় এবং খাম আকারে অপর দিকে সাজানো হয়। তারপর সেগুলোকে নিয়ে প্যাক্‌ করে চালান দেওয়া হয়ে থাকে।

উপরোক্ত মেসিনে ৮ ঘণ্টায় ২০ হাজার খাম প্রস্তুত হ'তে পারে। ১০ জন লোক হাতে যে পরিমাণ খাম তৈরী করতে পারে, উক্ত মেসিনে ৭ জন লোকে তাই করতে সমর্থ হয়। ঐরূপ একটি মেসিনের দাম হ'ল ১৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া, খুচরো পৃথক মেসিন দ্বারা যদি কেউ ফ্যাক্টরী স্থাপন করতে চান তাহলে প্রায় ৭ হাজার টাকা খরচ পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে খামের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও খাম প্রস্তুতের ফ্যাক্টরী কলিকাতায় নেই বললেই চলে। আমরা এই শিল্পটির প্রতি ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বেকারদিগকে ঘরে খাম প্রস্তুত করে সামান্য দু পয়সা পাবার চেষ্টা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব। —সম্পাদক

শ্রীবিনয়ভূষণ সমাজপতি গোস্বামী

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

——(০)——

তোমার আছে আমার নাই,
তুমি আমার কিসের ভাই।

*

ঘরের কথা বাইরে কয় তারে বলি পর,
দুপুর বেলা গায়ে লেপ দেয় তারে বলি জ্বর।

*

কর্ত্তার বায়ুতে গন্ধ নাই।

*

নাই ঘরে খাই বেশী।

*

চালুনি বলে সুঁচ ভাই, তোমার পাছা ফুটা।

*

বাঁধা গরুর ছাদা (১) ঘাস।

*

বাড়ীর ধারে কালিয়ার মায়,
আশায় আশায় কথা কয়।

*

দাঁত নাই বুড়ীর সুপারী খাইতে চায়।

*

পরিষ্কারে পরিষ্কার চিনে—
কুত্তায় চিনে ছাই;
ব্রাহ্মণের পুষ্প নারী—
সন্ধ্যা দিতে নাই।

*

(১) খুব বেশী পরিমাণ

পাগলে জানে মধু মালার গীত।

*

পাগলে চিনে পাগল।

*

বাপ দাদার নাম নাই,
টেঙ্ গোপালের নাতি।

*

মায় বলে 'ঝি' কপালে আছে
বিয়া—কাঁদ্‌লে হবে কি'?

*

বড় টারে খাইছে বাঘে,
ছোট টায় আর কিসে লাগে!

*

কপালের নাম গোপাল,
কিনিয়া আনে গাই গরু—
হইয়া যায় আবাল। (১)

*

এক বেটার তিন মাউগ,
একটা হইছে চাঁদা ডাউক।

*

আপন ভাল পাগলেও বুঝে।

*

হ্যাডার (২) মুখে দাঁড়ি,
ফেরে বাড়ী বাড়ী।

*

আইচা (৩) ভরণীর ঝি, ঝিনুক ভরনী,
আমাকে দুঃখ দিয়া কারে দুঃখ দিতে গেলি।

*

মরিচ পাক্‌লে ঝাল বাড়ে।

*

পোঁদে নাই রোম, পুথি পড়বার যম।

*

যার নুন খাই, তার গুণ গাই।

-

আপন চরকায় তেল দাও।

*

ঝোলের লাউ অম্বলের কদু

*

না খায় প্রাণ, কাকুতি সার।

*

চক্ষু বুজিলে নিজে আঁধার দেখিবে।

*

মাউগ বেচিয়া পোলা
বিয়া করাইলাম, আর এক
ঘর কুটুম বাড়াইলাম।

*

সারা বছরে লেয়া, (৪) একই
ভাদ্দার ঝুন।

*

এত ভাত রাখছ দুধ দিয়া খাইতে।

*

যে যায় কায়না, সে আর আয়না।

*

যে যায় লঙ্কা, সেই হয় রাবণ।

*

মবে মবে তবু খুদের হাঁড়ি ছাড়ে না।

*

গবিয়া (৫) গরুর চোখ-গোরাণী (৬) সার।

*

ধাউরের (৭) চাপড়ায় (৮) বল।

*

একে ঝিনই (৯) তাতে কাইত।

*

---

(১) দামড়া গরু (২) শরীরের নিকৃষ্ট স্থান বিশেষ (৩) নারিকেলে মালা দ্বারা তৈয়ারী পাত্র বিশেষ। (৪) নেওয়াপাতি (ডাব) (৫) হাড় জিরজিরে। (৬) রাঙ্গানী (৭) চপল বাক্য বাগীশ (৮) চুয়াল (৯) ঝিনুক

সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

*

যার জন্য খোকার মা ;—
তাকে তুমি চিন্‌লানা।

*

হাজার টাকায় বামুণ ভিখারী।

*

এক খায় হাজারী, আর খায় বাজারী।

*

বেশ্যা নাম লিখাইলে—
মোটা চিকণের ভয় কি ?

*

অষ্টরম্ভা।

*

ঘোড়ার ডিম

*

বানরের হাতে লুরা !

*

বানরের গলায় মুক্তার হার।

*

যেমন জল-কুকুর, তেমন সুন্দরী মুগুর।

*

পেটে দিলে পিঠে সয়।

*

গাল জোড়া চাপড়টা। ২

*

ধীরে রাঁধে আস্তে খায়
জুড়াইলে তবে সাধ (৩) পায়।

*

সবুরে মেওয়া ফলে।

*

সরকারে খায় ঘাটে আচায়। ৪

*

বল বল হরি বল, জল জল গঙ্গাজল।

*

সার সার আপন সার।

*

হাগার নাই বাঘার ডর।

*

হেসেই ত নষ্ট করলাম,
নইলে জাল্‌টা ছিড়্‌তে পারতাম।

*

হাতিটা খাঁদে পড়লে,
চামচিকাটায়ও একটা লাথি দেয়।

*

সাবধানের মার নাই।

*

লিখ্‌তে পারিনা মোছবার যম।

*

তিন পয়সায় অক্রুর সংবাদ।

*

তিন আঙ্গুলে লোহার বাটী।

*

ঘোমটার মধ্যে খেমটা নাচ।

*

শাক খাইয়া বাঁধলে,—
ঘি পাইলেও ফুরায় না।

*

কেঁচো খুড়তে সাপ বেড়োয়।

* [ক্রমশঃ।

(১) মশাল (২) চড় (৩) আস্বাদ (৪) মুখ ধোয়

প্রবাদ বচন

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ পাল

খেয়ে আসে ডাল খিচুরী
গল্প করে দৈ
মেটে হুকায় তামাক খায়
গড়গড়াটা কৈ ?

*

যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়
চেড়াক-দাবের ঘোড়া।

*

বার হাত কাকুরের
তের হাত বীচি।

*

ভাত পায়না সেখের বেটী
পোস্তা ভাজা খায়

*

এক মণ তেলও পুড়বে না
রাধাও নাচবে না।

*

ঢাল নেই তলোয়ার নেই
খামচা মারেঙ্গে

*

পাঁঠার ইচ্ছায় কি ঘাড়ে কোপ।

*

সোণার পাথর বাটী।

*

কাঁটালের আমসত্ব

*

ছেলের চাইতে ছেলের গু ভারী

*

মাথায় চুল নেই বগলে বাবরী

*

হরি হে রাজা কর

*

কান টানলেই মাথা আসে

*

তেল দাও সিঁদুর দাও
ভবী ভোলবার নয়

*

বধুর বরণ কাল
দেখ্‌তে বড় ভাল

*

যেই না আমার বিয়ে
তার আবার চিতেরী বাজনা

*

কচুর বেটা ঘেঁচু,
যদি বাড়ে মান

*

নেংটার আবার বাটপাড়ের ভয়

*

হাগা নেই পড়্‌পড়ি আছে

*

শেষ ভাল যার, সব ভাল তার

*

উঠানি নাই ফুটানি আছে
বাহির বাড়ী নাই ভেতর বাড়ী আছে

*

রাম নাই জন্মাতে রামায়ন

*

সস্তার মাছ বিড়ালে কাটা বাছে

*

তপ্ত ভাতে বিড়াল বেজার
উচিত কথায় বন্ধু বেজার

*

কাচায় না নোয়ালে বাঁশ
পাকলে করে টঁ্যাস টঁ্যাস

*

ওপরে লাল ভিতরে কাল
মাখণ ফল দেখতে ভাল

*

গোঁফ আর দাড়ী
আঙ্গুল ছুই ছাড়াছাড়ি

*

যেখানে লুচি পুরি
সেখানে ঘুরি ফিরি

*

জামায়ের নামে বন্ধন
সারা গুষ্টির ভোজন

*

অনেক সন্ন্যাসী গাজন নষ্ট

*

চোরের মার বড় গলা

*

ভালবাসা করিও
মাখামাখি করিও না

*

শক্তের ভক্ত, নরমের বাঘ

*

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন

*

চুণ খেয়ে গাল পোড়ে
দই দেখে ভয় করে

*

জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বাদ

*

ফোটা ফুলে টাটকা মধু
খেয়ে যারে ভোমরা বধু

*

বাবাজীকো বাবাজী
তরকারীকো তরকারী

*

ভেড়ার মধ্যে
বাছুর পরামাণিক

*

ঢিল মারলে
পাটকেল খেতে হয়

*

আকাশে থু থু ফেল্লে
আপন গায়েই লাগে

*

ঘোরালে লাঠি
ফিরালে কোত্‌কা

*

সারাদিন যায় হেলে দুলে
রাত্তিরে বুড়ি কাপাস তলে

*

চিড়ে খেতে হাটের বেলা

*

ছটাক ঘী আঁওদা খরচ

*

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
যাবত জীবেত তাবদ সুখেত

*

সৎসঙ্গে কাশী বাস
অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ

*

হাসি কয় হাসা,
তুই বড় হাসি
এইরূপে
হাসাহাসি করে হাসাহাসি

*

বকা কয় বকি, তুই বড় বকী
এইরূপে
বকাবকি করে বকাবকি

*

যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতী
আশু গৃহে তার দেখিবেনা আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

*

যত বড় মুখ না তত বড় কথা।

*

মোল্লার দৌড় মজিদ পর্য্যন্ত।

*

উড়োখৈ গোবিন্দায় নমঃ।

*

ফোটায় ঢুকলে, ঘড়ায় সারেনা।

*

ঘু ঘু দেখেচো, ফাঁদ দেখনি

*

চেলা মেলে লাখ লাখ
গুরু না মিলে এক

*

হাতী ঘোড়া গেল তল
ভেড়া বলে কত জল।

*

কত কত মহারথী
তারা পায় না এক রতি।

*

এগুলেও ভেড়োর ভেড়ো
পেছলেও তাই।

*

নিজের খেয়ে বনের
মোষ তাড়ান।

*

জিতিলে সুখ্যাতি নেই
হটিলে অপমান

*

অতি বার বেড়োনা
ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে
অতি ছোট হোয় না
ছাগলে মুচড়ে খাবে।

*

যত্র আয় তত্র ব্যয়।

*

খেয়েছি বুনো ওল
নিয়ে আয় বাঘা তেতুল।

*

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা
শিশিরে কিবা ভয়।

*

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

*

গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল।

*

যার ধন তার ধন নয়
নেপোয় মারে দৈ ?

*

বড় বড় বানরের বড় বড় লেজ
লঙ্কা ডিঙ্গুতে মাথা করে হেট।

*

দশের লাঠি একের বোঝা।

(ক্রমশঃ)

কৃষি সংবাদ

বেগুনের চাষ

ভারতবাসী মাত্রই বেগুনের সঙ্গে পরিচিত এবং বেগুন বাঙালী গৃহস্থের একটি সাধারণ খাদ্য। শীতকালের দিনে বেগুনের ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসা। সুতরাং এই ফলটির চাষ সম্পর্কে চাষীরা যদি যথেষ্ট যত্ন নেয় তাহ'লে তারা বেশ লাভবান হ'তে পারে।

বেগুনের একটা সুবিধা এই যে, এ বস্তু বৎসরের সব সময়ই পাওয়া যায় যদিও শ্রেণী অনুযায়ী এর আকারের তারতম্য ঘটে। সাধারণতঃ বেগুন দু' প্রকারের হয়ে থাকে :— মুক্তকেশী, মকরা, এলোকেশী প্রভৃতি বড় বেগুন; এবং কুলিবেগুন জাতীয় ছোট বেগুন। কুলিবেগুনের উদ্ভিদ্ গ্রন্থগত পরিভাষা হ'ল 'সোলানাম লঙ্গাম্' (Solanum longum)। ঘোর বেগুনী কিংবা হাল্কা বেগুনী রঙের গোল বা ঈষৎ লম্বাটে ধরণের গোলাকৃতি ফলগুলি আহারের পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয়। এছাড়া, হাঁসের ডিমের মত সাদা, ছোট বেগুন এবং সাদা রঙের পশ্চিমী বড় বেগুন খেতে খুব মিষ্টি।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, চাষীরা যদি এ জিনিষটির চাষের প্রতি যত্ন নেয় ত তারা অধিকতর লাভবান হ'তে পারে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্ত্তমানে তারা যে প্রণালীতে চাষ করে, তদপেক্ষা যদি একটু বেশী খরচ করে সার প্রদানের উন্নতি সাধন করে তবে তাদের আয়ও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। চাষী মাত্রই অবগত আছে যে, সারযুক্ত জমিতে যে বেগুন জন্মায় তা' খুব সুস্বাদু হয়ে থাকে। যদি চাষীদের বিঘা পিছু অধিক সংখ্যক ফল লাভ করবার আশা থাকে, তাহ'লে তাদের এক বিঘা জমিতে ১৫।২০ মণ গোবর, ১৫ সের সাল্‌ফেট্ অব্ এ্যামোনিয়া ও অর্দ্ধমণ হাড়ের গুঁড়া দিতে হ'বে। যদি আশাতিরিক্ত ফল পাবার ইচ্ছা থাকে তবে উপরোক্ত পরিমাণ সার ছাড়া ৪।৫ সের শ্লেকড্ লাইম্ এবং ৬।৭ মণ ছাই প্রদান

করা কর্ত্তব্য। জমিতে চাষ সুরু হবার ছ'মাস পূর্ব্বে স্লেকৃড্ লাইম্ প্রদান করাই নিয়ম। হাড়ের গুঁড়া এবং সাল্‌ফেট্ অব্ এ্যামোনিয়া এক মাস পূর্ব্বে ও গোবর ঠিক চাষের প্রাক্কালে প্রদান করতে হয়। উঁচু নালাযুক্ত বালি জমিই বেগুন চাষের পক্ষে উপযুক্ত; কর্দ্দমাক্ত জমির বেগুন খুব মিষ্টি হয়। জমিতে নাইট্রোজেন-জনিত পদার্থ বেশী থাকলে ফলের চেয়ে পাতাই বেশী গজায়। বেগুন চাষের জমিতে অতিরিক্ত পোকা দেখা দেয় বলে এক জমিতে ২।৩ বারের বেশী চাষ করা উচিত নয়। চাষের জমিতে উপযুক্ত নালা রাখার প্রয়োজন যাতে না জল জমে থাকতে পায়, কেননা, বদ্ধ জলে পোকা হ'বার সম্ভাবনা বেশী। চারা বসাবার সময় চূণ এবং ছাই ব্যবহার করা দরকার; তা'ছাড়া চারা বসাবার পূর্ব্বে জমিকে ভাল করে নিঙ্‌ড়ে দিতে হ'বে।

এইবার বেগুন চাষের প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। গাছের প্রথম ফল যখন সবচেয়ে বড় হয় এবং পাকে তখন তাদের ছিঁড়ে নিয়ে মাঝখান দিয়ে ছ'ফালা করতে হয়। তারপর সেগুলো স্তূপাকার করে ছ'দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়। পরে তার মধ্য থেকে বীচি-গুলো আলাদা করে নিয়ে জলে ধুয়ে রৌদ্রে

শুকোতে দেওয়াই নিয়ম। বীজ রোপনের সময় প্রথমে চারাতলায় তৈরী পরিষ্কার নরম জমিতে বীচিগুলো পুঁততে হয়—পোঁতার পূর্ব্বে জমিতে উপযুক্ত পচা সার প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই সারের সঙ্গে অল্প চূণও যেন মিশ্রিত থাকে। জানুয়ারী অর্থাৎ পৌষ মাস থেকে জমি তৈরীর নিয়ম, মে মাস পর্য্যন্ত বীচি পোঁতা চল্‌তে পাবে। বীচি পোঁতবার পরে যদি বৃষ্টি হয়ে যায় ত ভাল, যদি তা' না হয় ত জল দিয়ে জমি ভিজিয়ে দিতে হ'বে। তারপর বীচিগুলো জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে হস্তদ্বারা সেগুলো মাটীতে অল্প টিপে দিতে হয়। ঐ চারাতলা যদি কোন ছায়াময় যায়গায় অবস্থিত থাকে তাহ'লে কথাই নেই, কিন্তু যদি সেখানে ছায়া না থাকে ত চারা না বেরোন পর্য্যন্ত ছাউনি দিয়ে রাখতে হ'বে। চারা বেরোবার পরও প্রতি সন্ধ্যায় অল্প জল দেওয়া রীতি। যদি খুব বৃষ্টি হয়ে জমিতে জল জমে তাহ'লে সে জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে; নইলে গাছের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। যদি দেখা যায় যে জমিতে কিংবা চারায় পোকা ধরেছে তাহ'লে ছাই এবং চূণের গুঁড়ো চারার ওপর ছড়িয়ে দিতে হ'বে। এক বিঘা জমিতে আন্দাজ ৪।৫ তোলা বীচি যথেষ্ট।

চারাগুলো যখন ৬ ইঞ্চি বড় হয় তখন তাদের চারাতলা থেকে নিয়ে গিয়ে ক্ষেতে বসানো হয়ে থাকে। উক্ত ক্ষেতের জমিও ভাল রকম তৈরী থাকা চাই। উক্ত জমি তৈরী করতে গেলে জমিকে প্রথমে কোদাল দিয়ে বেশ করে কোপানো আবশ্যক। তারপর চারা বসাবার সময় জমি বেশ করে সমান করে মাটি নিঙ্‌ড়ে দিতে হয়। জমির চারধারে এবং মধ্যে নালা থাকা দরকার যাতে জল না জমে বেরিয়ে যেতে পারে। তারপর এক গজ অন্তর অন্তর খাত করে তার মধ্যে চারা বসাতে হয়। চারা বসাবার পূর্ব্বে যদি এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে যায় ত ভাল। যদি এপ্রিল মে মাসে বীচি পোঁতা হয়ে থাকে তাহ'লে তার চারা বসাবার জন্য খাত করার প্রয়োজন নেই; সমতল জমিতে পূর্ব্বোক্ত এক গজ অন্তর চারা বসালেই চলবে। চারা বসাবার সময় খইল, ছাই এবং চূণের মিহি গুঁড়ো প্রতি চারার গোড়ায় ছড়ানো দরকার। গোবর এবং রেড়ীবীজও দেওয়া চলতে পাবে। এক একর জমির পক্ষে ৬ মণ খইল, ৩ মণ ছাই এবং ১ মণ চূণ যথেষ্ট। চারা বসাবার পর এক পক্ষ কাল গত হ'লে কোদাল দিয়ে মাটি সমান করে খাত বুজিয়ে দিতে হয় তারপর আরও এক পক্ষ কাল পরে চারাগুলোর সারির মধ্য দিয়ে কোদাল চালিয়ে মাটী তুলে চারার গোড়ায় দিতে হয় যাতে ক'রে চারার সারির জমিটা একটা আলে পরিণত হয়। বৃষ্টির হ্রাসবৃদ্ধির অনুপাতে জমিতে জল সিঞ্চন প্রয়োজন। আগষ্ট মাস অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে ফল ধরিতে আরম্ভ করে; আগষ্ট থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত গাছের গোড়ায় নূতন মাটী দিতে হয়।

কুলি বেগুনের বীচি পোঁতার সময় হ'ল সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর; নভেম্বর মাসে তার চারা ক্ষেতে বসাতে হয়। ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে তাতে ফল ধরে।

আমরা উপরে বেগুন চাষের সমস্ত খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করলাম। আমাদের সন্দেহ আছে যে চাষীরা উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী চাষ করে কিনা। চাষীরা যে প্রণালীতেই চাষ করে আসুক না কেন, উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে

তারা যদি চাষ করে তাহ'লে তারা যথেষ্ট লাভবান হ'তে পারবে। নিম্নে আমরা বেগুন চাষের একটা গড়পড়তা আয় ব্যয়ের হিসাব দিলাম, এর থেকে বোঝা যেতে পারে যে বেগুন চাষে কি পরিমাণ লাভ হ'তে পারে :—

(এক একর জমির চাষের হিসাব দেওয়া গেল)

জানুয়ারী—জমিতে লাঙ্গল কোদাল দেওয়ার খরচ ৪৷৷০ টাকা

ফেব্রুয়ারী—মাটি নিড্‌ড়াইলে ইত্যাদির খরচ ২৷৷০ „

জুন—জল সিঞ্চনের ব্যবস্থার „ ২৲ „

„—খাত তৈরীর „ ৬৲ „

„—চারা বসাবার „ ৬৲ „

„—সার প্রদান করবার „ ২০৲ „

„—চারাতে সার দেবার „ ৫৲ „

„—প্রথম মাটি দেওয়ার „ ৪৲ „

জুলাই—দ্বিতীয় মাটি „ „ ৪৲ „

আগষ্ট—ঘাস, আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কারের „ ৫৲ „

অক্টোবর—কোদাল চালানোর „ ৪৲ „

ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারী—জল সিঞ্চনের „ ২০৲ „

„ —ফল সংগ্রহের „ ৯৲ „

জমির খাজনার „ ৩৲ „

৯৫৲ টাকা

উক্ত এক একর জমিতে ১৫০ মণ বেগুন পাওয়া যায়। দেড় পয়সা করে যদি সের বিক্রী হয় তাহ'লে প্রায় ১৩৫৲ টাকা পাওয়া যাবে। তাহ'লেও ৪০৲ টাকা লাভ হ'বে। কিন্তু সবাই জানেন যে বাংলাদেশে দেড় পয়সা সেরে বেগুন সর্ব্বত্র বিক্রয় হয় না। সুতরাং আরও বেশী লাভ হওয়া সম্ভব।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

বার্ষিক হিসাব

গত ৩০শে এপ্রিল ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের এক বৎসরের হিসাবপত্র ও বিবরণীতে যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত কোম্পানীর গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কোম্পানীটি বাঙালীর একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সুতরাং ইহার অধিকতর সমৃদ্ধিতে বাঙালী মাত্রই গর্ব্ব অনুভব করেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সামান্যরূপেই অনাড়ম্বরে এই কোম্পানীর সূচনা হইয়াছিল, আজ নিজেদের সততা ও দক্ষতার গুণে এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরেও ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানী নূতন কার্য্য সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত ইহা সেই দুর্লভ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, বরং উত্তরোত্তর উন্নতির সহায়তায় তাহার প্রতিষ্ঠা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৬-৩৭ সালে যে সরকারী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কোম্পানীর পক্ষে সর্ব্বদিক দিয়া উন্নতির উহা একটি স্মরণীয় বৎসর। উক্ত বৎসরে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকার নূতন কার্য্য সংগৃহীত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ইহা ৫০ লক্ষ টাকা অধিক। উহা 'রেকর্ড' হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। ঐ বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম সমেত মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ৭৫ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ৬২ লক্ষ টাকা। জীবন-বীমা তহবিলে ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২ কোটী ৩২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে খরচের আনুপাতিক অঙ্ক শতকরা ৩৩.৩ থেকে ৩১.১এ নামিয়াছে। 'কম্বাইণ্ড পলিসি'র জন্য যে গোলযোগ বর্ত্তমান ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যাওয়াতে অংশীদারগণের অবস্থার যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি ঘটিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ২২,১৯০টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার আর্থিক পরিমাণ হইতেছে ৩ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে কোম্পানী ১৭,৬৩৭টি বীমাপত্র গ্রহণ করিয়াছেন, উহার মূল্য হইতেছে ২ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা—পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বেশী। প্রিমিয়াম বাবদ আদায় হইয়াছে ৬২ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বেশী। সুদ, ভাড়া, লভ্যাংশ ইত্যাদি হইতে আয় হইয়াছে ১২॥ লক্ষ টাকা। আলোচ্যবর্ষে কোম্পানী লাভ সহ মৃত্যুজনিত দাবী মিটাইয়াছে ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা,

মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দরুণ দাবী মিটাইয়াছে ৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। কমিশন ইত্যাদি সমেত কোম্পানী পরিচালনার খরচ পড়িয়াছে ১৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। খরচের আনুপাতিক অঙ্ক পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২·২ ভাগ কমিয়া ৩১·১ দাঁড়াইয়াছে। জীবনবীমা তহবিলে ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তদ্ব্যতীত আর একটি পৃথক রিজার্ভ ফাণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে ১ লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছে।

কোম্পানীর আলোচ্যবর্ষের ব্যালেন্স সীট্ হইতে জানা যায় যে, কোম্পানীর দেনার ঘরে রহিয়াছে জীবনবীমা তহবিলের ২ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা, অতিরিক্ত রিজার্ভ তহবিলের ১ লক্ষ টাকা, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের ৩॥ লক্ষ টাকা, দাবী মিটাইবার দরুণ ১১ লক্ষ টাকা ও অপরাপর চুটকো দেনার পরিমাণ ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। কোম্পানীর পাওনার হিসাবে 'গিল্টএজ সিকিউরিটী' ও শেয়ার ইত্যাদিতে লগ্নী আছে ৭১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা; তন্মধ্যে শুধু মাত্র 'গিল্ট এজ্ড্' সিকিউরিটিতে লগ্নী আছে ৫৮½ লক্ষ টাকা—পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা, এ বৎসর তাহা ২২॥ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি যে নূতন ইন্সিওরেন্স্ আইন পাশ হইয়াছে তদনুযায়ী কোম্পানী-গুলিকে শতকরা ৫৫ ভাগ গিল্ট্ এজ্ সিকিউ-রিটিতে লগ্নী করিতে হইবে; হিন্দুস্থানের আলোচ্য বর্ষের হিসাব নিকাশ দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই এধারে অগ্রসর হইতেছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান্ কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক সেয়ার-হোল্ডারদের বার্ষিক সভায় বলিয়াছেন যে ইন্সিওরেন্স্ আইনানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করিতে কোম্পানী অনায়াসেই সক্ষম হইবেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও অবগত হইলাম যে, ইতিমধ্যে অনুমোদিত সিকিউ-রিটিতে কোম্পানীর প্রায় ১ কোটি টাকা লগ্নী-কৃত হইয়াছে।

কোম্পানীর নূতন ভ্যালুয়েশন এখনও প্রকাশিত হয় নাই, উহা প্রস্তুত হইতেছে, শীঘ্রই তাহা বাহির হইবে। ইতিমধ্যে ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর আভাষে জানাইয়া-ছেন যে রিপোর্টের ফল অধিকতর সন্তোষজনক হইবে। কোম্পানীর পরিচালনার ভার বর্ত্তমানে মিঃ এন্, দত্তের উপর ন্যস্ত আছে, মিঃ দত্ত একজন অভিজ্ঞ কুশলী ব্যক্তি—ইতিপূর্ব্বে তিনি বোম্বাইস্থ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে ও হেড্ অফিসস্থ এজেন্সী ম্যানেজার হিসাবে দক্ষতার সহিত কাজ চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পরি-চালনায় কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

নাগপুর পাইওনিয়র কোম্পানী গত বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ টাকার নূতন কার্য্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

* * * *

এ্যাসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সাঁওতাল পরগণাস্থ পাকুড়ে নূতন ব্রাঞ্চ অফিস গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে। খাঁ সাহেব উমেদ আলী মুন্সী উক্ত উদ্বোধন উৎসবের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

* * * *

বঙ্গে লাইফ্ এ্যাসুরেন্স্ কোম্পানীর ময়মনসিংহস্থ জেলা কার্য্যালয় গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে খোলা হইয়াছে। কোম্পানীর বিভাগীয় চীফ্ এজেন্ট্ মিঃ জে, কে, সেন এম্, এ, মহোদয় উক্ত উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উক্ত ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন।

* * * *

আলিগড়স্থ প্রভিডেন্সিয়াল্ ইন্সিওরেন্স্ কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম্ জাফারুল্লা কোম্পানীর উক্ত পদে ইস্তফা দিয়া সম্প্রতি লাহোরের গ্রেট্ অরিয়েণ্ট্ ইন্সিওর কোম্পানী লিমিটেডে যোগদান করিয়াছেন। তিনি ঐ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার হইয়াছেন।

* * * *

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজার মিঃ এস, সি, রায় কোম্পানীর স্থানীয় কার্য্যালয় পরিদর্শনে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা গিয়াছিলেন। তিনি তথায় ইন্সিওরেন্স কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়াছিলেন।

স্কটিশ্ ইউনিয়ন ও ন্যাশনাল্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজ্যার মিঃ এচ্, এফ্, কিনেজ্ বর্ম্মা পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায়

ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

বম্বে মিউচুয়াল লাইফ্ এ্যাসুরেন্স্ সোসাইটির ডিরেক্টর মিঃ বি, কে, দেশাই বোম্বাই গভর্ণমেন্টের অফিসিয়াল রিসিভারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস, বি, মিত্র সংগঠন কার্য্যের জন্য গত মাসে মাদ্রাজ ভ্রমণে গিয়াছিলেন।

ইন্দোরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী রাজাভূষণ রায় বাহাদুর শেঠ্ হীরালাল তিলক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

এশিয়া মিউচুয়াল্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট্ মিঃ জে, এল, সাহা কোম্পানীর পাটনার ব্রাঞ্চ্ আফিস্ পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

অল্ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ রঘুবর সিং কতকগুলি সুগার মিলের কার্য্য ব্যাপারে সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তিনি কোম্পানীর কলিকাতাস্থ এজেন্সী আফিস পরিদর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন।

"বম্বে লাইফের" বাংলা দেশস্থ এজেন্সী অফিসের মিঃ বি, রায় চৌধুরী "ইষ্ট্ এ্যাণ্ড ওয়েষ্টে" যোগদান করিয়াছেন। তিনি উক্ত কোম্পানীর বাংলাদেশস্থ ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। রায় চৌধুরী মহাশয় ইন্সিওরেন্স কার্য্যে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহার পরিচালনায় 'ইষ্ট্ এ্যাণ্ড ওয়েষ্টের' কলিকাতা ব্রাঞ্চের উন্নতি হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।
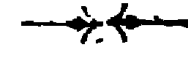
মুস্‌লিম্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ মহম্মদ সরিফ্ মুতাক্কী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে কলিকাতা ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে কোম্পানীর স্থানীয় চীফ্ এজেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহাকে এক ভোজ সভায় সম্বর্দ্ধিত করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্, মাননীয় শ্রম-মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন, ক্যাপ্টেন্ এন্, এন্ দত্ত, মিঃ এ, আর সিদ্দিকী, মৌলনা আক্রাম খাঁ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সর্দ্দার মঙ্গল সিং-এর এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের কমার্স সেক্রেটারী মিঃ এইচ, ডো, জানান্ যে, গত ১০ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ ভারতে কোন কোম্পানী অপর কোম্পানীর সহিত সম্মিলিত হয় নাই, কিন্তু ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে ৫টি কোম্পানী উক্তরূপ 'এ্যামাল্‌গামাসনে'র নোটিশ দিয়াছে। তিনি আরও জানান যে, উক্ত কোম্পানী সমূহকে পৃথক ভাবে জমার টাকা প্রদান করিতে হইবে।

মরিচের আমদানী রপ্তানীর বিবরণ.

প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপ ও অপরাপর স্থানের সংযোগ ছিল বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে—সে বাণিজ্য ছিল প্রধানতঃ রেশম ও মসলিন বস্ত্র ও মশলাদ্রব্যের। এটা ইতিহাসের কথা। তারপর নানান দেশের উত্থান পতনের দ্বারা বাণিজ্যজগতের রীতিমত ওলট্পালট্ হয়ে গেছে কিন্তু তথাপি ভারতের উক্ত বাণিজ্য ব্যাপারের মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতিই হয়নি। মশলাদ্রব্যের মধ্যে মরিচের রপ্তানী-বাণিজ্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে; মধ্যযুগে ইহার বাণিজ্য ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের মধ্যে একটি প্রধান অংশ হিসাবে গণ্য হত। ইতিহাসে কথিত আছে যে খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে ইহার বাণিজ্য অত্যধিক সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে—মরিচের ব্যবসা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের একেবারে একচেটিয়া ছিল। এইভাবে বহুশতাব্দী চলতে থাকে কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালয় দ্বীপপুঞ্জ এই বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রবল প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। তারপর থেকেই রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে কমে গেছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও বৃটিশ ভারত থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ ২৬ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মরিচ বিদেশে চালান যায়। এই পাউণ্ডের অঙ্কটি অর্থাৎ প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা মোটেই সোজা ব্যাপার নয়।

মরিচ হচ্ছে দ্রাক্ষাতুল্য একরকম লতানে গাছের ফল, সে গাছের উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের পরিভাষাগত নাম হচ্ছে "পাইপার নিগ্রাম্" (Piper Nigrum) মালাবার এবং ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলে উক্ত গাছকে বন্য অবস্থায় জন্মাতে দেখা যায় এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার পাদদেশে কারোয়ার থেকে কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে মরিচের চাষ করে থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান আর্দ্রতা সম্পন্ন স্থানে ও যে সমস্ত যায়গায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় মরিচ সেই সমস্ত যায়গায় ভাল জন্মায়। বাংলাদেশের যশোহর জেলার উত্তরাংশে অল্প পরিমাণ মরিচের চাষ হয়। আসামের শ্রীহট্ট জেলায় ও খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশেও কিছুটা জন্মায়। বোম্বাই প্রদেশে ১৯০৪-৫ সালে ৯,১৩৬ একর জমিতে ও ১৯০৫-৬ সালে ৭,৪৮৩ একর জমিতে মরিচের চাষ হ'ত। মাদ্রাজে মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে বহুলাংশে এবং কুর্গ্ ও দক্ষিণ কানাড়ায় অল্পাংশে মরিচের চাষ হয়ে থাকে।

চারা বেরুবার পর তৃতীয় বছরে ফল ধরে এবং সাধারণতঃ মার্চ্চ মাসে ফল পাকে। একটি ভাল গাছ থেকে ৪ পাউণ্ড্ আন্দাজ শুক্‌নো মরিচ পাওয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশের কয়েকটি যায়গার গাছ থেকে আরও বেশী ফল পাওয়া যায়। একটি গাছের মেয়াদ হ'ল শত

বছর। সাদা মরিচ পেতে গেলে ফল ছিঁড়ে নিয়ে প্রথমে সাত আট দিন ধরে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়, তারপর সেটাকে মাড়িয়ে আঁটি থেকে খোসা ছাড়াতে হয়। তৎপরে সেটাকে রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই সাদা মরিচ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই সাদা মরিচ আদৌ উৎপাদিত হয় কিনা সন্দেহ, যদি হয় ত অল্প পরিমাণেই হয়ে থাকে। কাল মরিচ পেতে গেলে কাঁচা মরিচকে গাছ থেকে পেড়ে স্তূপাকার করে শুকোতে দেওয়া হয় এবং শুকোলে তার গায়ের ছালটা কুঁচকে যায়। পশ্চিম উপকূলে দু'রকমের কাল মরিচ হয়—একরকমের নাম "এ্যালেপ্পি", ও অপর রকমের নাম "তেলিচেরী"।

১৯০০ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ মরিচ রপ্তানী হয়েছে, তার মূল্য হচ্ছে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড। ১৯১৩-১৪ সালে ১,৩৮,৮০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ মরিচ চালান গেছল, তার দাম হল ২ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড। ১৯২২-২৩ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছরে ১,১২,৯৮,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ মরিচ রপ্তানী হয়েছিল, তার মূল্য হচ্ছে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্য্যন্ত ৭ বছরে গড়ে প্রতি বছর ৯৬,২৬০০০ পাউণ্ড পরিমাণ মরিচ রপ্তানী হয়েছিল, তার মূল্য হচ্ছে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড। নিম্নে এতৎসমুদয়ের একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

বৎসর	রপ্তানীর পরিমাণ	মূল্য	গড়ে পাউণ্ড পিছু দর
১৯১৩-১৪	১৩,৮৭৯,৯৬৪ পাউণ্ড	২৮৯,৯৪৩ পাউণ্ড	৫·০ পেন্স
১৯১৮-১৯	১২,৮৪৬,৭৪৮ ,,	৪০৮,৮৮৯ ,,	৯·০ ,,
১৯৩১-৩২	১০,৫৩৮,৮৬৪ ,,	২৮০,৪১৪ ,,	৬·৪ ,,
১৯৩২-৩৩	৬,৬৮৯,২০০ ,,	১৭০,৩৫৫ ,,	৬·১ ,,
১৯৩৩-৩৪	৬,৫৯৭,৮০৮ ,,	১৩৬,৭৯৩ ,,	৫·০ ,,
১৯৩৪-৩৫	৮,২৯৫,৮৪০ ,,	১৮৩,৭৭৯ ,,	৫·৩ ,,
১৯৩৫-৩৬	২,৯৫৮,৪৮০ ,,	৫৭,২১৪ ,,	৪·৬ ,,

নিম্নে ১৯১৩-১৪ সালে ও ১৯৩৫-৩৬ সালে কোন্ দেশ কি পরিমাণ মরিচ ভারতবর্ষ থেকে ক্রয় করেছে তার একটা তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল :—

	১৯১৩-১৪ সালের হিসাব		১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব	
দেশ	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
যুক্তরাজ্য	১,৫৭৯,২৭৪ পাউণ্ড	৩২,৩৯৯ পাউণ্ড	১১৬,১৪৪ পাউণ্ড	২,৪৫১ পাউণ্ড
জার্ম্মানী	৩,১১০,৫৪১ ,,	৬৪,৫৭১ ,,	১৮,৪৮০ ,,	৪৯৫ ,,
ইতালী	২,৮৯৬,৬৬০ ,,	৬০,৭৩০ ,,	২,২৪১,৫৬৮ ,,	৪১,২২৫ ,,
ইরাক	৬৫০,৯৫৬ ,,	১৬,১৭২ ,,	১৪,২২৪ ,,	১৯৫ ,,
ইজিপ্ট	১৯২,২৮০ ,,	৪,২৯৬ ,,	৩৩৬ ,,	১০ ,,

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	২,৩৫২,২২৮ ,,	৪৫,৯৭৩ ,,	১৭৯,২০০ ,,	৪,১৫০ ,,
অপরাপর দেশ	৩,০৯৮,০২৫ ,,	৬৫,৮০২ ,,	৩৮৮,৫২৮ ,,	৮,৬৮৮ ,,
মোট—	১৩,৮৭৯,৯৬৪ ,,	২৮৯,৯৪৩ ,,	২,৯৫৮,৪৮০ ,,	৫৭,২১৪ ,,

তালিকা থেকে দেখা যায় যে, ১৯১৩-১৪ সালে জার্ম্মানীতে খুব বেশী মাত্রায় মরিচ রপ্তানী হয়েছিল, তার কারণ আমরা পরে জেনেছি যে, কামানের গোলা ফাটাবার ব্যাপারে তা' কাজে লাগে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইতালী ও আমেরিকা মোট রপ্তানীর যথাক্রমে শতকরা ৭৬ ভাগ ও ৬ ভাগ গ্রহণ করেছিল, যুক্তরাজ্য ও জার্ম্মানী নিয়েছিল যথাক্রমে ৪ ও ·৬ ভাগ মাত্র। এই রপ্তানী ব্যাপারে মাদ্রাজের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিম্নে ১৯১৩-১৪ ও ১৯৩৫-৩৬ সালে মরিচের রপ্তানী বাণিজ্যে কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ অংশ ছিল তার একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল :—

	১৯১৩-১৪ সাল		১৯৩৫-৩৬ সাল	
প্রদেশ	পরিমাণ	মূল্য	পবিমাণ	মূল্য
মাদ্রাজ	১২,০৬৫,৭৮৬ পাউণ্ড	২৪৬,১৭৭ পাউণ্ড	২,৭৯৩,১৬৮ পাউণ্ড	৫২,৯৯৩ পাউণ্ড
বোম্বাই	১,৬৮৩,০২৪ ,,	৪০,৬৩৬ ,,	১০১,৯২০ ,,	২,৩৫৪ ,,
সিন্ধু	৬,৭৪৮ ,,	১৪৪ ,,	৫,০৪০ ,,	৮৩ ,,
বাংলা	১২৩,৭৩৪ ,,	২,৯৫৯ ,,	৫৭,৪৫৬ ,,	১,৭৩৬ ,,
ব্রহ্মদেশ	৬৭২ ,,	২৭ ,,	৮৯৬ ,,	৪৮ ,,
মোট—	১৩,৮৭৯,৯৬৪ ,,	২৮৯,৯৪৩ ,,	২,৯৫৮,৪৮০ ,,	৫৭,২১৪ ,,

এই ত গেল মরিচের রপ্তানী বাণিজ্যের ইতিহাস। ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে কিছুটা পরিমাণ মরিচ আমদানীও করে থাকে, ষ্ট্রেটস্ সেটেল্‌মেণ্ট্‌ই তার অধিকাংশ যোগান দেয়। ১৯৩২-৩৩ সালে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল ১,৪২৭,০০০ পাউণ্ড; ১৯৩৩-৩৪ সালে তা' কমে গিয়ে ১,২৯০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়, ১৯৩৪-৩৫ সালে তা' আরও হ্রাস পেয়ে ৭১১,০০০ পাউণ্ড হয়।

ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন

কুইনাইনের নাম যে-লোক শোনেনি সে বাংলাদেশের অধিবাসীই নয়। পল্লীবাংলার এমন জেলা নেই যেখানে প্রত্যেকটি পরিবারে অন্ততঃ একটিও জীবনে একবার না একবার নাক মুখ টিপে দম বন্ধ করে কুইনাইন্ গলঃধ-করণ না করেছে। বস্তুতঃ, ম্যালেরিয়া হয়ে পড়েছে আমাদের নিত্যকার সাথী; ও না-চাইতেই আসে, কিন্তু চলে যেতে বল্‌লে যায় না। ভারতীয় ম্যালেরিয়া সার্ভের ডিরেক্টর লেফ্‌টেনান্ট্ কর্ণেল্ মিন্টন্ সাহেবের হিসাবে প্রকাশ যে, যে বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী না হয় সেই বৎসর ১০ লক্ষ লোক ম্যালে-রিয়ায় মরে, যে বৎসর এর বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে সে-বৎসর ১৩।১৭ লক্ষ মারা যায়। কর্ণেল্ মিন্টন্ সাহেব আরও বলেন যে, একমাত্র বৃটিশ ভারতে অন্ততঃ ১০ কোটি লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভোগে। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কী দুর্ব্বিসহ। ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে কুইনাইন, সেইজন্য কুইনাইনের, বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ লোকের কিছু জানা দরকার।

কুইনাইন্ সিঙ্কোনা নামক এক প্রকার গাছের ছাল হ'তে প্রস্তুত হয়। ঐ ছালের পরিভাষাগত ইংরাজী প্রতি শব্দ হচ্ছে সিঙ্কোনা লেজারিয়ানা (Cinchona Ledgeriana), সিঙ্কোনা অফিসিনালিস্ (Cinchona Officinalis). সিঙ্কোনা সাক্কিরব্রা (Cinchona Suc-cirubra)। ভারতবর্ষে ১৮৬২ সালে প্রথম সিঙ্কোনার চাষ সুরু হয়। উক্ত সালে সরকার দক্ষিণ আমেরিকা হতে সিঙ্কোনাবীজ আনয়ন করেন, কিন্তু চা ও কফি চাষীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ই এদেশে সিঙ্কোনার চাষ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলেই সিঙ্কোনার দর পড়ে যায়। ১৮৭৮ সালে আউন্স পিছু কুইনাইনের দর ছিল ২০৲ টাকা (১ পাঃ-ডসি-৮ পেঃ), ১৮৯০ সালে তা' ১২৲ টাকায় নামে (১৬ শিলিং)। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ নীলগিরি পাহাড়, কো-য়েম্বাটোর তিনাভেলি ও দার্জ্জিলিং জেলায়ই সিঙ্কোনার চাষ হয়ে থাকে, বর্ম্মামুলুকে মের্‌গুই জেলায়ও সিঙ্কোনার চাষ হয়। ১৯১৩-১৪ সালের হিসাব মতে বাংলা ও মাদ্রাজ প্রদেশে যথাক্রমে ২২০০ ও ২৪৫২ একর জমিতে সিঙ্কোনার চাষ হত। বাংলাদেশে সিঙ্কোনা লেজারিয়ানার চাষ বেশী হয়ে থাকে, দক্ষিণ ভারতে সিঙ্কোনা অফিসিনালিসের চাষ হয়। বাংলাদেশ ও বর্ম্মামুলুকের সমস্ত চাষই গভর্ণ-মেন্টের তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়, মাদ্রাজ প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট্ তত্ত্বধানে মাত্র ১৭৮৬ একর জমির চাষ হয়ে থাকে। বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে সিঙ্কোনা চাষের পরিমাণ হল ২৬৮৬ একর জমি

সাধারণতঃ বীজ থেকেই সিঙ্কোনা চারা উৎপন্ন হয়, ডাল পুঁতলেও গাছ হয়ে থাকে। চারা জন্মাবার ৩ থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রথম সিঙ্কোনা পাওয়া যায়। ঐ সময় মোট চায়ের এক চতুর্থাংশ ভাগ ছেঁটে নেওয়া হয় এবং সেই ডালপালার ছাল থেকেই কুইনাইন প্রস্তুত হয়ে থাকে। অবশ্য এটা ঠিক যে গাছ পোঁতবার পর ১০ বৎসর না গেলে ভাল সিঙ্কোনা পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে যে-সিঙ্কোনা উৎপন্ন হয় তা' হয় গভর্ণমেণ্ট্ কিনে নেয়; নয়ত বাইরে চালান যায়। সিঙ্কোনা থেকে কুইনাইন প্রস্তুত করবার গভর্ণমেণ্টের দু'টি কারখানা আছে, একটি নীলগিরিস্থিত উৎকামন্দ-এর নিকট—অপরটি দার্জ্জিলিং জেলার মাংপু নামক স্থানে। গভর্ণমেণ্টের কারখানায় যে কুইনাইন্ প্রস্তুত হয় তা' বেশীর ভাগ সরকারী প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয়ে যায়, অবশিষ্টাংশ সরকারী পোষ্ট্-অফিস্ ইত্যাদিতে জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হয়ে থাকে।

এইবার কুইনাইন্ বা সিঙ্কোনার আমদানী রপ্তানীর হিসাবটা আলোচনা করা যাক্। বাংলাদেশে যে পরিমাণ সিঙ্কোনা উৎপন্ন হয় তার সমস্তটাই আভ্যন্তরিক চাহিদা পূরণে লেগে যায়, রপ্তানীর জন্য কিছুই থাকে না। সুতরাং সমস্ত রপ্তানীই মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে সাধিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে একমাত্র বিলাতের উক্ত রাজ্যেই ৬ লক্ষ পাউণ্ড সিঙ্কোনা ছাল রপ্তানী হ'ত, তার মূল্য ছিল ১০ হাজার পাউণ্ড। নিম্নে রপ্তানীর একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

বৎসর।	পরিমাণ।	মূল্য।
১৯১৩-১৪	৬০৫,১০২ পাউণ্ড।	৮,২৮৯ পাউণ্ড।
১৯১৮-১৯	২৭,৪৬৮ ,,	৭০৬ ,,
১৯৩১-৩২	৮৯,০৩৮ ,,	২,৫২৮ ,,
১৯৩২-৩৩	৯,০২৯	১৮৮ ,,
১৯৩৩-৩৪	৯৪,৮৪১ ,,	২,২১৯ ,,
১৯৩৪-৩৫	১৪১,৭৯৮ ,,	৩,১৭৮ ,,
১৯৩৫-৩৬	২৪,১১৮ ,,	৪৭৩ ,,

কুইনাইনের আমদানী বাণিজ্যের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৫-৩৬ সালে ১০৩,৬১০ পাউণ্ড মাল আমদানী হয়েছে, তার মূল্য হল ১৯৬,৩৩৮ পাউণ্ড। জাভা, জার্ম্মানী, সুইজার-ল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্ যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশই আমাদের দেশে কুইনাইন যোগান দিয়ে থাকে তন্মধ্যে জাভার অংশই সর্ব্বপ্রধান।

কুইনাইন সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা কি ভাবে পরিচালিত হয় তাই এবার আলোচনা করা যাক্। এই নিবন্ধের প্রারম্ভেই এদেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে যে হিসাব উল্লিখিত হয়েছে তার থেকে পাঠক সম্প্রদায়ের এদেশে ম্যালেরিয়ার তীব্রতা সম্বন্ধে ধারণা করতে কিছুমাত্র অসুবিধাবোধ ঘট্বে না। ম্যালেরিয়া রাক্ষুসী আমাদের যে কী ক্ষতি করছে' তা' অবর্ণনীয়। সমাজ কিংবা প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যই হচ্ছে এই ক্ষতির হাত থেকে জনসমষ্টিকে রক্ষা করা। যে দেশের ১০ কোটি লোক বৎসরে ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং ১০ লক্ষ লোক মারা যায় সে-দেশের গভর্ণমেণ্টের ম্যালেরিয়া রাক্ষুসীকে বিতাড়ন কল্পে একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। ম্যালে-রিয়ার একমাত্র ঔষধ কুইনাইন, সুতরাং সেই কুইনাইনের ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণ

যাহাতে অধিকতর সজাগ হয় সে-সম্পর্কে প্রচার কার্য্য চালানো দরকার। জনসাধারণ-এর নিকট কুইনাইন খুব বেশী পরিচিত হয়ে উঠবে যদি গভর্ণমেণ্ট থেকে কুইনাইনের দর অতীব সুলভ করা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে কুইনাইন সম্পর্কে প্রেস অফিসারের এক বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল যার তাৎপর্য্য হচ্ছে যে, উৎপাদনের তুলনায় কুইনাইনের চাহিদা অনেক কম, কুইনাইনের দাম সস্তা করলেও তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় না এবং সেজন্য কুইনাইনের দর সুলভ করা সম্ভবপর নয়। প্রেস-অফিসারের উক্তরূপ বিবৃতি ভ্রমাত্মক ও সমর্থনের অযোগ্য। যে-দেশের দশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে সে-দেশে দেশী কুইনাইনের চাহিদা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে যদি দেশী কুইনাইন সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচারকার্য্য চালানো যায়। পূর্ব্বে দেশের লোকের দেশী কুইনাইনের ওপর আস্থা ছিল না বলেই দেশী কুইনাইনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়নি কিন্তু বর্ত্তমানে দেশী কুইনাইনের গুণাবলী স্বীকৃত হওয়ায় তা' বাজার ছেয়ে ফেলেছে। বাজারে মোট বিক্রীত কুইনাইনের বর্ত্তমান শতকরা ৪০ ভাগই দেশী কুইনাইন, মূল্য যদি সুলভ করা যায় ত এর চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই চাহিদা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রেখেই সরকারী স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতিতে (Central Advisory board of Health) অনেক বাদানুবাদের পর কুইনাইন সম্পর্কে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত কুইনাইনই ভারতে উৎপন্নের নীতি গ্রহণ করতে হবে। দেশী কুইনাইনের বাজারে চাহিদা না থাকতো তা'হলে নিশ্চয়ই ঐ প্রকার প্রস্তাব গৃহীত হ'ত না। কোন জিনিষের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা হ'লে তার চাহিদা বৃদ্ধি পায় (যদি অপরাপর অবস্থা ঠিক থাকে)। এই হ'ল অর্থনীতির মূলসূত্র; কুইনাইনের বেলায় এর ব্যতিক্রম হবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুতঃ, ১৯২২ সালের পূর্ব্বের পাউণ্ড প্রতি ৪৮৷৫০ টাকা দরকে ১৯২৬ সালে ১৮৷২০ হ্রাস করাতেই বর্ত্তমানে দেশী কুইনাইনের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলেই বাজারে মোট বিক্রীত কুইনাইনের শতকরা ৪০ ভাগই দেশী কুইনাইন। কুইনাইনের দর যে সুলভ করা যায় না এরও স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। কোন জিনিসের দর নির্ভর করে তার উৎপাদন খরচ ও লাভের মারজিনের ওপর। আমার কোন জিনিস উৎপাদন করতে যদি দশ টাকা খরচ পড়ে তবে সেই জিনিসের দর দশ টাকা যুক্ত আমার লাভের সর্ব্বনিম্ন মারজিনের হারেই স্থিরীকৃত হবে। তাই যদি ব্যাপার হয় ত কুইনাইনের উৎপাদন খরচ কি পড়ে সেটা দেখা যাক্। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট্ কোন সঠিক হিসাব জনসাধারণের নিকট দাখিল করবেন কিনা জানি না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনা পরম্পরা থেকে এটা স্থির করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয় যে, গভর্ণমেণ্টের কুইনাইন উৎপাদনের খরচ পাউণ্ড প্রতি ১২৲ টাকার ঢের কমে পড়ে। একথা সকলের জানা দরকার যে পৃথিবীর কুইনাইন উৎপাদন বাজারে একচেটিয়া অধিকার হচ্ছে জাভার— সেই একচেটীয়া অধিকার সংরক্ষিত করে "কেনাব্যুরো" নামে একটি সুবিখ্যাত ডাচ্ প্রতিষ্ঠান। তারাই কুইনাইনের বাজার দর নিয়ন্ত্রিত করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় পূর্ব্বক মোটা লাভ মারে। ভারতীয়

গভর্ণমেণ্ট্ যখন কুইনাইনের মূল্য কমিয়ে পাউণ্ড প্রতি ১৮।২০্ টাকা ধার্য্য করেন তখন ঐ "কেনাব্যুরো" ব্যবসার বাজার মাটি হবার আশঙ্কায় ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে যায় এবং তারা ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সংবাদপত্রে তখন এরূপ প্রকাশ পায় যে, "কেনাব্যুরো"র প্রতিনিধি ভারতবর্ষে এসে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এরূপ চুক্তি করেছে যে, গভর্ণমেণ্টের মজুত কুইনাইন তারা সব ১২্ টাকা পাউণ্ড দরে কিনে নেবে এবং সেটাই ২৭্ টাকা দরে বিক্রী করবে। এই সংবাদ প্রকাশিত হবারমাত্র দেশের মধ্যে রীতিমত আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তার ফলেই উপরোক্ত চুক্তি ফেঁসে যায়। উক্ত ব্যাপার থেকে এটা উপসংহার করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয় যে, দেশীয় কুইনাইন উৎপাদনের খরচ ১২্ টাকার ঢের কম পড়ে। তা যদি না হ'ত তাহ'লে গভর্ণমেণ্ট্ 'কেনাব্যুরোকে' পাউণ্ড পিছু ১২্ টাকায় বিক্রী করতে রাজী হ'ত না। এই ১২্ টাকার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের লাভের অঙ্কও ধরা আছে, কেননা, প্রেস অফিসারের বিবৃতিতেই প্রকাশ যে, সিঙ্কোনা চাষ ব্যবসা-নীতিতে পরিচালিত হয় এবং এতে বেশ লাভই হয়ে থাকে। সুতরাং এটা ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় হ'বে না যে, গভর্ণমেণ্টের উৎপাদন খরচ পাউণ্ড পিছু ১০্ টাকারও কম পড়ে। ব্যাপার যদি তাই হয় তাহ'লে কুইনাইনের দর বর্ত্তমান মূল্যের অর্দ্ধেকে পরিণত করলেও গভর্ণমেণ্টের কোন লোকসান যায় না।

আমরা উপরের বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা এটা দেখিয়েছি যে কুইনাইন সম্পর্কে প্রেস অফিসারের কোন উক্তিই সত্য নয়। দেশের যে রকম ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর ধ্বংসলীলা চলেছে তাতে কুইনাইনের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং সুলভ মূল্যে কুইনাইন যোগান দেওয়া প্রয়োজন। কুইনাইনের দর সুলভ করলে লোকের যে সুবিধা হবে সেটা সহজেই অনুমেয় এবং দেশের স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের সেটাই করা দরকার। এ সম্পর্কে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (Central Advisory Board of Health) যে সমস্ত প্রস্তাব করেছেন তা' প্রণিধান যোগ্য। তাঁদের মতে—

"ভারতবর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় কুইনাইন যাহাতে ভারতেই উৎপন্ন হয় এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

"ভারতের আর কোন্ কোন্ স্থান সিঙ্কোনা চাষের পক্ষে উপযোগী এবং এই সকল স্থানে সিঙ্কোনা-উৎপাদনের ব্যয় কিরূপ পড়িবে, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফণ্ড্ এ্যাসোসিয়েশন যে সিঙ্কোনা চাষ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্ম্মচারীকে ভূতত্ত্ববিদ্ একজন রাসায়নিকের সহযোগীতায় কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, বোর্ড তাহা সাগ্রহে সমর্থন করিতেছেন।

"বোর্ডের বিবেচনায় বর্ত্তমান ভারতবর্ষে অতি উচ্চ মূল্যে কুইনাইন বিক্রীত হইতেছে; এই মূল্য উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অনেক অধিক। ভারতের যে-সকল প্রদেশে কুইনাইন উৎপন্ন হয় ঐ সকল প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কুইনাইন একটি লাভজনক পণ্য দ্রব্য বলিয়া যেন মনে না করেন। যদি কুইনাইন বিক্রয় করিয়া

লাভ হয় তবে সেই লাভের টাকা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে হইবে।"

উক্ত উপদেষ্টা সমিতি কুইনাইন সম্পর্কে উপরের যে সমস্ত প্রস্তাব করেছেন তা' অবিলম্বে পালিত হওয়া দরকার। উক্ত সমিতির প্রস্তাব সমূহ প্রেস-অফিসারের বিবৃতি সমর্থন করে না; পরন্তু প্রেস-অফিসারের বিবৃতির প্রতিবাদকল্পে আমরা উপরে যে আলোচনা করেছি তাহাই সমর্থন করে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের অবিলম্বে কর্ত্তব্য উপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাব সমূহকে কার্য্যকরী রূপ দেওয়া। ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া-সমস্যা ভারতবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে প্রধান সমস্যা—এ সমস্যা কিছুতেই উপেক্ষনীয় নয়। প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ লোকক্ষয় কোন দেশের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়, বরং লজ্জার কথা। কোন স্বাধীন দেশে এই রকম হিসাবে কোন রোগে লোকক্ষয় হতে থাকলে সেখানে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দস্তরমত আন্দোলন উপস্থিত হ'ত—কিন্তু আমাদের দেশে কোন জন-আন্দোলন হবার উপায় নেই, কেননা, গবর্ণমেণ্ট সেটা সুনজরে দেখে না। অথচ দেশের রাজশক্তি এ সম্পর্কে বিশেষ কোন কার্য্যকরী প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। মাত্র সরকারী চিকিৎসালয় সমূহে বিনামূলে কুইনাইন বিতরণ করা, কিংবা এধার ওধার খণ্ড খণ্ড ব্যবস্থা করা ম্যালেরিয়া রাক্ষুসী বিতাড়নের আসল উপায় নয়। যে ফজলুল হক্ আজ প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন তাঁরই নির্ব্বাচনী বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে, এদেশে ১১০ বর্গমাইল অন্তর এক একটি চিকিৎসালয় আছে; সুতরাং দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে কুইনাইন বিলিয়ে পাঁচ কোটি জনসাধারণের মধ্যে আর ক'জনের উপকার করা যায়? যদি প্রকৃত ম্যালেরিয়া রাক্ষুসীর বিতাড়ন সম্ভব করতে হয় তাহলে গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা দরকার এবং একটি বিশেষ ম্যালেরিয়া-বিভাগ স্থাপন করা প্রয়োজন। উক্ত ম্যালেরিয়া বিভাগ দেশের প্রত্যেক থানায় এবং সম্ভব হ'লে প্রত্যেক ইউনিয়নে কেন্দ্র স্থাপন করে ম্যালেরিয়া দূর করবার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাবে এবং গরীব অধিবাসীদের বিনামূল্যে বা অতীব সুলভ মূল্যে কুইনাইন বিতরণ করবে। কুইনাইনের মূল্য এত সুলভ করা উচিত যাতে গরীব গ্রামবাসীরা অতি সহজেই তা' কিনতে সক্ষম হয়। এর জন্য এদেশে কুইনাইনের চাষ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট যদি এই সমস্ত ব্যবস্থা করতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহলে আর্থিক দিক দিয়ে দেশ ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্থ হ'য়ে থাকবে। যে সমস্ত লোক ম্যালেরিয়ার কবলে অকালে মারা যায় তাদের আয়হীনতা ও যে দশ কোটি লোক বছরে ম্যালেরিয়া ভোগে তাদের সাময়িক অকর্ম্মণ্যতা পরিবারবর্গকে গরীব করে তোলে। হিসাব নিলে দেখা যাবে যে এর জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। অর্থনীতির দিক দিয়ে সেটা দুর্লক্ষণ। দেশের অভিভাবক গভর্ণমেণ্টের কি এখনো এ সম্পর্কে অবহিত হবার সময় আসে নি?

ঘৃত ও মাখনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক মান নিরূপণ

ভারতবর্ষ যে অত্যন্ত গরীব দেশ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু তাহলেও এখনো ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে ঘি ও মাখনেব স্থান অত্যন্ত প্রধান ; মুসলমান ভায়েরাও খাদ্য হিসাবে ঘৃতের সংযোগ অতীব পছন্দ করে থাকেন। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা আমিষভোজী তাঁদের ততটা ঘৃতের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে কিন্তু যাঁরা নিরামিষভোজী তাঁদেব ঘৃত-পদার্থ না হ'লেই চলে না। ভারতের মধ্যে বাংলা দেশের অধিবাসী ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিষভোজী, সুতরাং তাঁরা গরীব হ'লেও ঘৃতের ব্যবহার তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য্য। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের বাংলা দেশে প্রবাসী হিন্দুস্থানীদের কথাই ধরুন। তাদের মধ্যে যারা বড়লোক তাদের কথা ছেড়ে দিলে অধিকাংশই দরোয়ানী, কনষ্টেবলী, পিয়নের কাজ প্রভৃতি করে থাকে। কিন্তু তবুও তাদের খাদ্য হচ্ছে ঘৃত আর রুটি ও ডাল। ঘৃতের চাহিদা এত বেশী যে বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া অতীব কষ্টকর—প্রায় অধিকাংশ ঘৃততেই ভেজাল পরিলক্ষিত হয়। এই ভেজালকার্য্য সীমাতিরিক্তভাবে প্রচলিত থাকার দরুন দেশের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড্ সমূহ ভেজাল দূরীকরণের জন্য অত্যন্ত যত্নবান হয়েছে, কেননা, ভেজাল খাদ্য থেকেই সহরের কিংবা পল্লীর স্বাস্থ্য দূষিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড সমূহ সেইজন্য ঘৃত পরীক্ষা করে দেখে থাকেন সেটা বিশুদ্ধ কিনা। এই ঘৃত পরীক্ষাকার্য্যের জন্য তাঁদের একটা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' আছে, অর্থাৎ যে ঘৃততে তাঁদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী পদার্থ বর্ত্তমান থাকে সেটাই বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হয় এবং যে ঘৃতর মধ্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী পদার্থের অভাব দেখা যায় তা ভেজালযুক্ত বলেই প্রমাণিত হয়। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে উক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ডএর মধ্যে প্রধান হল Reichert Meissl ও Refractive-index—কিন্তু গাভীদিগের স্বাস্থ্য, স্থানের জল হাওয়া, প্রজনন বৈষম্য, খাদ্যের তারতম্য প্রভৃতি ব্যাপারের জন্য বিভিন্ন গরুর দুগ্ধের মধ্যে বর্ত্তমান উক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড পদার্থের এতটা হেরফের হয় যে, ঘৃতের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের গাভীদিগের দুগ্ধে পৃথিবীর অপরাপর দেশের গাভীদিগের দুগ্ধের তুলনায় এত কম পরিমাণে উক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড পদার্থ পাওয়া যায় যে দেশীয় বৈজ্ঞানিকদিগকে মাঝে মাঝে ঘৃতের বিশুদ্ধতা নির্ণয়কল্পে মহা অসুবিধায় পড়তে হয়। সময় সময় দেখা

গেছে যে, দেশীয় ঘৃতে ২০র কাছাকাছি Reichert Meissl পাওয়া যাচ্ছে।

নিম্নে নিউজিল্যাণ্ডের পাঁচ প্রকার বিভিন্ন গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃতে কি পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড পদার্থ পাওয়া যায় তার তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রকার।		Saponification Value	Iodine Value	Reichert MeisslValue	Polenske Value	Kirschner Value
১ম	—	২৫৩·৩	৪১·৩	২৯·৬	১·৯	২৩·৭
২য়	—	২৪২·৭	৩১·৬	২৯·৩	৩·২	২৩·৭
৩য়	—	২৪৩·৩	৩৪·৮	৩২·৩	২·০	২৫·৫
৪র্থ	—	২৪৮·২	৪১·৬	২৫·৭	২·২	২০·৬
৫ম	—	২৪২·২	৩৪·৫	৩০·৩	২·৩	২৪·৭

উক্ত পরীক্ষাব্যাপারে একটা জিনিস জানা গেছে যে, গোচারণভূমিতে তৃণভুক্ত গাভী ও বাড়ীতে বাঁধা গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃতের মধ্যে Iodine Value ও Reichert Meisslএর পার্থক্য দেখা যায়। তৃণভুক্ত গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃতে Iodine Value বেশী থাকে পক্ষান্তরে বাড়ীতে বাঁধা গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃতে Reichert Meissl বেশী থাকে।

ভট্টাচার্য্য ও হিল্‌ডিচ্ সাহেব দেশীয় ঘৃতের পরীক্ষাকার্য্য দ্বারা যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন নিম্নে তা' উদ্ধৃত হ'ল :—

কোন্‌প্রকার ঘি।	Saponification Value	Iodine Value	Reichert Value	Polenske Value	Kirschne Value
মুরা মহিষজাত ঘৃত	২৫২·৩	৩২·৫	২৮·০	১·৪	২৪·৬
তৃণভোজী মহিষজাত ঘৃত	২৫১·০	৩৩·৫	৩০·৯	২·২	২৫·৬
গোজাত ঘৃত	২৫২·০	৩৫·২	২৫·২	১·৪	২০·৯
তৃণভোজী গোজাত ঘৃত	২৪৯·২	৩৬·০	২৬·০	১·৯	২০·৬

নিম্নে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর গরু ও মহিষের দুগ্ধজাত ঘি পরীক্ষা করে যে পরিমাণ পদার্থ পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

কোন্‌প্রকার ঘি।	Moisture value	Iodine value	Reichert value	Polenske value	Kirschner value	Saponification value	Refractive value
কানিগাম গোজাত	০·২	৩৬·৮	২৫·৫	১·৫	২৪·৯	২২৩·৭	৪৩·৫
সোন্‌চোরি গোজাত	০·১	৩৫·৩	২০·১	১·৪	১৭·০	২২১·৭	৪৪·৪
থর্‌পর্‌কর্ গোজাত	০·১	৩৬·৫	২৬·৬	২·২	২১·৭	২২৩·৮	৪৫·১
হারিয়ানা গোজাত	০·১	৩৬·০	২৬·০	১·৫	২১·৬	২২৪·০	৪৩·৮
কঙ্করেজ গোজাত	০·২	৩৪·২	২৬·১	২·০	২১·৫	২৩০·০	৪৩·৫

কোন প্রকার ঘি।	Mois-ture per-cen atge.	Iodin value.	Reichert Meissl Value.	Polsnske value	Kirschner Value	Saponifi-Value	Re-frative index
ধান্নি গোজাত—	০'১	৩৫'৯	২৬'৫	২'৩	২১'৮	২২৫'১	৪৩'৫
আসামী গোজাত—	০'১	৩৬'৫	২২'৬	১'৩	১৯'৪	২২৩'৪	৩৪'০
আয়াবসার গোজাত—	০'১	৩৭'৯	২৫'৭	১'৮	২২'৬	২২০'৪	৪৩'৫
নাগপুরী মহিষজাত—	০'১	৩৩'৬	৩১'০	১'০	২৮'৬	২২৯'০	৪৫'১
সুরতি মহিষজাত—	০'১	৩৩'০	৩১'৭	১ ১	২৮'৯	২৩০'৬	৪৪'০

বাজারে অতি পরিচিত, লবণযুক্ত, টিনে করে বিক্রীত তিন রকমের মাখন পরীক্ষা করে যে সমস্ত পদার্থ পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

	Mois-ture per-tcen age.	Iodine Value.	Reichert Meissl value.	Polenske Value.	Kirschner Value	Saponifi-cation Value.	Refractive index
১নং	০.১	৩৫'২	২৬'৯	০'৯	২৩'২	২২৬'১	৪৫'১
২নং	০'২	৩৩'৫	৩২'০	১'৭	২৯'১	২৩৫'৩	৪৩'৪
৩নং	০'১	৩৬'৭	২৫'৭	১'৩	২৩'১	২৲৪'১	৪৩'৭

আমরা উপরে বিভিন্ন স্থানের গোজাত নানা রকম ঘৃত ও মাখনের মধ্যে কি পরিমাণ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে তার তালিকা প্রদান করেছি। এটা নিঃসন্দেহ যে, উক্ত প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান থাকলে ঘৃত বা মাখন খাঁটি বলেই পরিগণিত হয়। এইবার দেখা যাক্ ঘৃত ও মাখনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়কল্পে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি ও স্বাস্থ্য বিভাগে কি রকম ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ মানদণ্ড নির্দ্দিষ্ট করেছেন। পাঞ্জাব প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি ও সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ ঠিক করে রেখেছেন যে, কোন ঘি-মাখনের শতকরা ২'৮ ভাগ এ্যাসিড্ ভ্যালু, ৪০ ও ৪২'৫-এর মধ্যে রিফ্রাক্টিভ্ ইন্ডেক্স এবং ২৪ ও ৩২-এর মধ্যে Reichert Meissl Value থাকলেই তা' বিশুদ্ধ বলে গৃহীত হবে।

মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ম একটু স্বতন্ত্র। সেখানকার বিশুদ্ধ ঘৃত বা মাখনে শতকরা ১ ভাগেরও কম জলীয় বাষ্প থাকে। ২০-র নীচে Reichert Meissl থাকলে তা' বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হয় না।

মধ্য প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের নিয়ম একটু স্বতন্ত্র। যেখানে বিশুদ্ধ ঘৃত ও মাখনের ১৯ ও ৩৬-এর মধ্যে Reichert Meissl Value থাকা চাই এবং Refractive index ৪০-ও ৪৬-এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের এ সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই তবে ১৯২৫ সালের ভেজাল নিবারণকল্পে সংশোধিত আইনানুসারে ঘৃত ও মাখনে ন্যূনপক্ষে ২৮ Reichert Meissl Value থাকা দরকার। সেখানকার স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক ঘৃত ও মাখনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়কল্পে এই নিয়মই প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

বাংলা সরকারের স্বায়ত্বশাসন বিভাগের নিয়ম স্বতন্ত্র। এখানকার বিশুদ্ধ ঘৃত ও মাখনের Refractive index ৪০ ও ৪২·৫-এর মধ্যে হওয়া চাই। গব্য ঘৃত হ'লে তার Saponification Value ও Reichert Meissl Value যথাক্রমে ন্যূনপক্ষে ২২০ ও ২৪ থাকা দরকার। ভয়সা ঘি হলে তার Saponification Value ও Reichert Meissl Value যথাক্রমে ন্যূনপক্ষে ২২২ ও ৩০ হওয়া চাই। গো ও মহিষজাত সংমিশ্রিত ঘৃত হলে তার Saponification Value ও Reichert Meissl Value ন্যূনপক্ষে যথাক্রমে ২২২ ও ২৮ হওয়া প্রয়োজন।

বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্টের (অধুনা উড়িষ্যা পৃথক গভর্ণমেণ্টের অধীন হয়েছে) রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের Refractive index ৪০ ও ৪২ এর মধ্যে হওয়া চাই, Reichert Meissl ন্যূনপক্ষে ২৪ হওয়া দরকার। ভয়সা ঘি হলে তার Reichert Meissl Value ন্যূনপক্ষে ৩০ এবং সংমিশ্রিত ঘৃত হলে তার ন্যূনপক্ষে ২৮ Richert Meissl থাকা প্রয়োজন।

উপরে যে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ও স্বাস্থ্যবিভাগ সমূহের ঘৃতের বিশুদ্ধতা নির্ণয় কল্পে মানপ্রদত্ত হ'ল, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে; এই মান নির্দ্দিষ্ট করণের পক্ষে কোন বিশেষ রীতি অবলম্বিত হয়নি, পরন্তু যে যার নিজেদের ইচ্ছামত মান নির্দ্দিষ্ট করেছেন। উপরে আমরা যে বিভিন্ন রকমের গো ও মহিষজাত নানা প্রকার ঘৃত ও মাখনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদার্থের উপস্থিতির তালিকা প্রদান করেছি তার থেকে একটা উৎকৃষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা চলে। উপরোক্ত তালিকা থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হবে যে, যে কোন প্রকারের ঘৃত কিংবা মাখন হোক্ না কেন তাতে এতটা পরিমাণের কম ও এতটা পরিমাণের বেশী বৈজ্ঞানিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকতে পারে না। Refractive index-এর কথাই ধরুন। উপরোক্ত সকল তালিকা থেকেই দেখা গেছে যে তা ৪২·৮ ও ৪৫·১ এর মধ্যে অবস্থান করে। এই রকম প্রত্যেকটি পদার্থের বিষয়ই বলা চলে। সুতরাং তার থেকে বৈজ্ঞানিক পদার্থ সমূহের অবস্থানের একটা আদর্শ মান লাভ করা যায়। নিম্নে ঐরূপ একটি মান প্রদত্ত হল :—

Moisture percentage—০·৭-এর অনধিক।
Refractive index—৪২ ও ৪৫·৫ এর মধ্যে।
Reichert Meissl Value—২০-র কম নয়।
Polenske Value —২·৫-এর অনধিক।
Kirschner Value —১৬-র কম নয়।
Saponification Value —২১৮-র কম নয়।
Iodine Value —৩০ ও ৩৮-এর মধ্যে।

উপরে যে সমস্ত তালিকা উল্লিখিত হয়েছে তা' কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষকের অনুসন্ধানের ফল। সুতরাং বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ যদি উক্ত মান অবলম্বন করে তাহ'লে ঘৃত ও মাখনের বিশুদ্ধতা নির্ণয় কার্য্যের অনেকাংশে সুবিধা হয়।

ভারতের দিয়াশালাই শিল্প

ভারতের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির মধ্যে দিয়াশালাই অন্যতম। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই ইহার সমান প্রয়োজন। সুতরাং দিয়াশালাই শিল্প যে একটি বৃহৎ শিল্প সে-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই অতি-প্রয়োজনীয় শিল্পটি আশানুরূপভাবে দেশীয় লোকের অধিকারে নেই, যদিও ভারতের চাহিদানুযায়ী দিয়াশালাই এর প্রায় সমস্তাংশ ভারতেই উৎপন্ন হয়। ভারতীয়রা যে এধারে প্রচেষ্টা চালাননি তা' নয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিযোগিতায় টি'কে থাকতে সমর্থ হ'ন নি; যাঁরা অতি কষ্টে টি'কে আছেন তাঁদের কারবারও আশানুরূপ ভাল চলে না।

স্বদেশী যুগে ভারতবাসীর মন প্রাণ যখন ঘরমুখো হয়ে ওঠে তখন অন্যান্য শিল্পের মতন দিয়াশালাই শিল্পের প্রতিও দেশবাসীর নজর পড়ে। মহা উৎসাহে কতকগুলি দিয়াশালাই এর কারখানা খোলা হয়, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে অন্যান্য স্বদেশী শিল্পগুলিও যে দশা প্রাপ্ত হয়েছিল, দিয়াশলাই শিল্পের ভাগ্যেও সেই অবস্থাই দেখা দেয়। অর্থাৎ, স্বদেশী আন্দোলন মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেশীয় শিল্পের সাথে দিয়াশালাই শিল্পও ফেল পড়ে।

এর কারণ আছে। স্বদেশী আমলের সময় দেশবাসী যখন দেশীয় দ্রব্যগুলিকে গ্রহণ করেছিল, তখন তারা তা' আগ্রহ ও স্বাদেশীকতার দিক দিয়েই করেছিল—ব্যবসার দিক দিয়ে করেনি। তাই বিদেশী ভাল দিয়াশালাই এর পাশে উপযুক্ত মসলা ও বারুদহীন ময়লা নীরস্ কাঠির দিয়াশালাই সাময়িকভাবে চললেও বেশী দিন চলল না। দেশী দিয়াশালাই-এর তখন প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে তার কাঠি ও বারুদ ভাল নয়; তার পাশে সুইডেন ও জাপানের দিয়াশালাই খদ্দেরকে সহজেই মোহিত করত—আর্থিক দিক দিয়েও বটে ব্যবহারিক দিক দিয়েও বটে। দেশী শিল্পের সমস্ত ত্রুটি দূরীভূত হয় ১৯২২ সালের পরে যখন গভর্ণমেণ্ট দেশী-শিল্পটিকে রক্ষা করবার জন্য নতুন ভাবে আয়োজন করেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তার পরে দেশীয় মূলধন দ্বারা চালিত দেশী শিল্পগুলি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করলেও গত কয়েক বৎসরে বিদেশী মূলধন চালিত দেশী শিল্পগুলি তাদের অধিকাংশের গলা টিপে মেরেছে।

গভর্ণমেণ্ট দিয়াশলাই শিল্পের রক্ষা কল্পে বিদেশী দিয়াশলাইয়ের উপর এরূপ উচ্চহারে ডিউটী বসাইলেন যে তাহার ফলে সুইডেন বা জাপানের পক্ষে ভারতের বাজারে দিয়াশলাই

বিক্রয় করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল; সেই সুযোগে দেশীয় দিয়াশলাইয়ের ছোট ছোট কারখানায় দেশ ভরিয়া গেল এবং সমগ্র বাংলা দেশ জুড়িয়া কুটীর শিল্পের আকারে দিয়াশলাইয়ের ব্যবসা বেশ ফালাও হইয়া উঠিল। তখন বিদেশী দিয়াশলাইয়ের মালিকগণ এক নূতন ফন্দী আটিলেন; তাঁহারা ভারতবর্ষেই মূলধন নিয়োগ করিয়া এ দেশেই দিয়াশলাইয়ের বিরাট কারখানা পত্তন করিতে সুরু করিলেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন তাঁহারা আমদানী শুল্কের দায় এড়াইয়া গভর্ণমেণ্টকে কদলী দেখাইলেন অপর দিকে ছোট ছোট কুটীর শিল্প গুলিকেও প্রতিদ্বন্দীতার চোটে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন। **WIMCO** মার্কা দিয়াশলাই না দেখিয়াছেন এমন লোক ভারতে বিরল। WIMCO মানে Western India Match Company। Sweden এ বহুকোটী টাকা মূলধন লইয়া এক Swedist Match Manufacturing Trust গঠিত হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীর Match এর বাজার দখল করিবার অভিযানে বাহির হইয়াছে। ভারতের নানাস্থানে ইহারা ম্যাচ প্রস্তুতের বিরাট কারখানা সকল স্থাপন করিয়াছে; এই সকল স্থানের মধ্যে ধুবড়ী অন্যতম।

পূর্ব্বেই বলেছি যে দিয়াশালাই ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, সুতরাং ভারতের এই পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের পক্ষে দৈনিক যে কী বিরাট পরিমাণ দিয়াশালাই-এর প্রয়োজন তা' সহজেই অনুমেয়। ১৯২১-২২ সালের হিসাব থেকে জানা যায় যে ভারতে বাৎসরিক প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ গ্রোস দিয়াশালাই প্রয়োজন হয়। তারপরে এর ব্যবহার নানান্ কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২১-২২ সালের পূর্ব্বে ঐ বিরাট পরিমাণ দিয়াশালাই-র প্রায় সমস্তটাই বিদেশ থেকে আমদানী হ'ত। নিম্নে বিদেশী দিয়াশালাই আমদানীর একটা তালিকা দেওয়া গেল:—

১৮৯৫-৯৬—	৩৬·১৪	লক্ষ টাকা
১৯০৫-০৬—	৫৮·৮৩	,,
১৯১৩-১৪—	৮৯·৬৪	,,
১৯১৮-১৯—	১৬৪·৭৫	,,
১৯২২-২৩—	১,৬১৮১	,,
১৯২৬-২৭—	৭৫·০৩	,,
১৯২৬-২৭—	৭৫·০৩	,,
১৯৩০-৩১—	৩·৯৬	,,
১৯৩১-৩২—	১·০৫	,,
১৯৩২-৩৩—	·৫৬	,,

উপরোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, ১৯২২ সালের পর থেকে বিদেশী আমদানী ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে, কেননা, উক্ত সাল থেকেই ভারতের দিয়াশালাই শিল্প বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। উক্ত বিস্তার লাভ করবার প্রধান কারণ হচ্ছে যে গভর্ণমেণ্ট, ঐ সালে বিদেশী দিয়াশালাই এর ওপর গ্রোস্ প্রতি দেড় টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করেছিলেন, এবং তার ফলেই দেশী দিয়াশালাই বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। এর পূর্ব্বে বিদেশী দিয়াশালাই-এর ওপর যে কোন শুল্ক ছিল না তা নয়; ১৯১৬ সালে পর্য্যন্ত শতকরা ৫৲ টাকা হারে শুল্ক স্থাপিত ছিল, ঐ সালের মার্চ্চ মাসে তা' শতকরা ৭॥০ টাকায় বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২১

সালে ঐ হার পরিবর্ত্তিত হয়ে গ্রস্ পিছু ৸৹ আনায় দাঁড়ায়।

১৯২২ সালের পূর্ব্বের যে ইতিহাস তা' বিদেশী দিয়াশালাইয়ের অধিকারে। সুইডেন অষ্ট্রীয়া, নরওয়ে, বিলাতী ও জাপানী দিয়াশালাইয়ের ভারতের বাজারে রাজত্ব ছিল। তন্মধ্যে জাপানী দিয়াশালাই গুণে নিকৃষ্ট হলেও অপেক্ষাকৃত সস্তা বলে তার ভয়ঙ্কর কাটতি ছিল। দেশী দিয়াশালাই এর কারখানা যে দেশে স্থাপিত হয়নি তা নয়, কিন্তু উপযুক্ত মূলধনও সুপরিচালনার অভাবে তা' টিঁকে থাকতে পারেনি। কেবলমাত্র গুজরাটে ১৮৯৫ সালে স্থাপিত 'গুজরাট্ ইসলাম ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী' বিদেশী প্রতিযোগিতার মধ্যেও কোন রকমে বেঁচে ছিল। ১৯২২ সালে গভর্ণমেন্ট্ কর্তৃক শুল্ক স্থাপনের ফলে এই কোম্পানীর অবস্থা ফিরে যায়।

একথা বললে বোধ হয় সত্যকে বিকৃতি করা হ'বে না যে ভারতের দিয়াশালাই শিল্পের উন্নতি সুরু হয়েছে ১৯২২ সালের পর থেকে। উন্নতির প্রথম যুগে এদেশে দিয়াশালাই-এর সমস্ত জিনিস উৎপন্ন হ'ত না; জাপান ও সুইডেন থেকে কাঠি আমদানী করা হ'ত এবং এখানে তাতে বারুদ লাগিয়ে বাক্সয় ভরে বিক্রী করা হ'ত। এই ব্যাপারেই ব্যবসায়ীদের প্রচুর অর্থাগম হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালে গভর্ণমেন্ট, তাঁদের রেভেন্যুর জন্য বিদেশী আমদানী কাঠীর ওপর পাউণ্ড প্রতি সাড়ে চার আনা ডিউটি ধার্য্য করেন। তাতে করে শিল্পের সাপে বর হয়ে যায়, কেন না, এদেশেই তখন কাঠি তৈরী সুরু হয়। বিদেশ থেকে এতৎসম্পর্কে ভাল ভাল যন্ত্রপাতি আসে এবং এই ভাবে দেশী শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। কাঠির জন্য কাঠ বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছিল; ক্রমে সেটাও হ্রাস পায়, এবং দেশী কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। এই রকম করেই দেশে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হ'তে সুরু করে, তন্মধ্যে 'এসাভি ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী,' ও রেঙ্গুনের 'আদামজী হাজী দাউদ' কোম্পানীই প্রধান। উক্ত দু'টি কারখানার দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে তিন হাজার ও ছয় হাজার গ্রস্। ১৯২৫-২৬ সালে স্থাপিত বাহোরের মহালক্ষ্মী ম্যাচ ফ্যাক্টরী এবং বেরিলীর ম্যাচ্ ওয়ার্কস্ এ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতে থাকে। এর ফলে এই হয় যে বিদেশী দিয়াশালাই-এর আমদানী একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভারতীয় বাজার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে সুইডেন আর স্থির থাকতে পারেনা। তারা তাদের লোকসানটা পুষিয়ে নেবার জন্য এদেশে ফ্যাক্টরী স্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হয় এবং এদেশের কয়েক স্থানে বড় বড় কারখানা স্থাপন করে। তারপর থেকেই দেশী কোম্পানীগুলির দুর্দ্দিন দেখা দিয়েছে; প্রভূত মূলধনবিশিষ্ট, উচ্চ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত যুগের চালিত বিদেশী কোম্পানীগুলির নিকট প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে না পেরে তারা একে একে ফেল পড়িতেছে। আজ বিদেশী মূলধনে স্থাপিত বিদেশী কোম্পানীগুলির দিয়াশালাই ভারতের বাজার একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। হিসাব হ'তে জানা যায় যে বর্ত্তমানে ভারতে প্রায় ৩৬টি কারখানা আছে এবং তাদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল ১ কোটি ৮০ লক্ষ গ্রস্; কিন্তু তাতে ভারতের গর্ব্ব করবার কিছু নেই, কেন না, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিদেশী মূলধনে চালিত।

এই হ'ল আমাদের দিয়াশালাই শিল্পের ইতিহাস। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, ভারতের বিরাট দিয়াশালাই শিল্পের লাভের অঙ্কের অধিকাংশ যায় বিদেশীর পকেটে, কেবলমাত্র মজুরী বাবদ ভারতবাসীরা যা' কিছু পেয়ে থাকে। অবশ্য এটা অস্বীকার করলে চলবে না যে গুটিকয়েক দেশী কোম্পানী এখনো টি'কে আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। দিয়াশালাই উৎপাদনকল্পে কাঁচা-মালের মধ্যে কাঠ ও বারুদই প্রধান। ভারতে সাধারণ দিয়াশালাই প্রস্তুতের জন্য কাঠের অভাব নেই, কিন্তু এ্যাস্পেন, পাইন, এ্যাল্ডার ও উইলো জাতীয় কাঠ পাওয়া কষ্ট সাধ্য। তারা যে ভারতে পাওয়া যায় না তা' নয়, কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থান থেকে তাদের আনবার খরচ অনেক পড়ে যায়। সুতরাং পড়তায় পোষায় না বলে ব্যবসায়ীরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। ভারতে সহজলভ্য এবং সস্তা কাঠ হচ্ছে কদম, পলাশ প্রভৃতি; কিন্তু ঐ সমস্ত কাঠ থেকে উৎপন্ন দিয়াশালাই-এর কোয়ালিটি ভাল হয় না, সেই জন্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে দেশী কোম্পানীগুলি বিদেশ থেকে শাদা কাঠ আমদানী করে। বারুদ এবং অন্যান্য মশলা অবশ্য সব পাওয়া যায় না, সেটা বিদেশ থেকে আমদানী করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এইটাই হ'ল দেশী শিল্পের পক্ষে একটা বড় প্রতিবন্ধক।

কিন্তু আমাদের পক্ষে আশার কথাও আছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে গভর্ণমেণ্ট্ শুল্ক স্থাপন দ্বারা বিদেশী শিল্পের হাত থেকে দেশী শিল্পকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং বিদেশী প্রতিযোগিতার কোন আশঙ্কা নেই। ভারতে যে প্রতিযোগিতা সেটা হচ্ছে বিদেশী মালিক ও দেশী মালিকের প্রতিযোগিতা। উভয়েরই কারখানা ভারতে অবস্থিত থাকার দরুণ কাঁচামালের দরুণ খরচের পড়তা উভয়ের সমান পড়া উচিত। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীগুলি অধিকতর সুপরিচালিত হওয়ার দরুণ এবং তাদের মূলধন বেশী থাকার দরুণ দেশী কোম্পানীগুলি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারে না। এইটাই হ'ল তাদের ফেল পড়বার একমাত্র কারণ। যে জন্য বড় বড় কোম্পানীগুলির কাছে ছোট ছোট কোম্পানীগুলি টি'কে থাকতে পারে না, এক্ষেত্রে ঠিক সেইটাই ঘটেছে। সুতরাং ভারতীয় কোম্পানীগুলি যদি এই ত্রুটির হাত এড়াতে পারে তাহ'লে দেশের টাকা সম্পূর্ণভাবে দেশে থাকতে পারে।

আমরা দেখেছি যে, বিদেশী কোম্পানী-গুলির কাছে দেশী কোম্পানীগুলির টি'কতে না পারার একমাত্র কারণ যথাযোগ্য সুপরিচালনা ও মূলধনের অভাব। দেশের ধনিগণ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে যদি সংযুক্ত প্রচেষ্টা চালান এবং সুপরিচালনার জন্য যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন তাহ'লে তাঁদের প্রতিযোগিতায় না টি'কবার কোন কারণ নেই। আমরা এ দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকেও বলছি যে তাঁদের গ্রস্ পিছু দু টাকা চার আনা হারে 'এক্সাইজ্ ডিউটি' স্থাপন দেয়াশালাই শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি করছে, কেন না, তাতে দিয়াশালাই-এর দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে;—তাঁরা এর প্রতীকার কল্পে সচেষ্ট হোন্।

ভারতে লবঙ্গ আমদানী রপ্তানীর বিবরণ

সংবাদপত্র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষে কিছুদিন ধরিয়া জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন সম্পর্কে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। সাধারণ লোকের ইহাতে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক যে, এত জিনিষ থাকিতে সহসা ভারতবাসীর লবঙ্গের উপর রোষনেত্র পতিত হবার কারণ কি? জবাবে বলা চলে যে, সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত লবঙ্গের মধ্যে জাঞ্জিবারে চারপঞ্চমাংশ লবঙ্গ উৎপন্ন হয়। অবশ্য ভারতবাসী কেন জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন করিতেছে সে প্রশ্নটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়। কিন্তু আজকের যুগে অর্থনীতি থেকে মাঝে মাঝে রাজনীতিকে আলাদা করা যায় না বলিয়াই রাজনীতি ও অর্থনীতির একত্র সমাবেশ দেখা যায়।

জাপান আজ চীনকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অপরাপর দেশ যারা জাপানীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধে যোগদান করার ইচ্ছা রাখে না তারা কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জাপানকে বয়কট্ করবার স্পৃহা রাখে; এক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির ঘনিষ্ট সংযোগ রহিয়াছে। ভারতবর্ষ যখন জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন করিবার জন্য আন্দোলন চালায় তখন তাতে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই পরিস্ফুট হয়। জাঞ্জিবারের গভর্ণমেণ্ট্ ভারতবাসীর প্রতি বিরূপ বলেই ভারতের জনসাধারণের তাহার উপর রাজনৈতিক চাপ দেওয়ার অধিকার না থাকায় তারা অর্থনৈতিক চাপ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

লবঙ্গ কত সামান্য জিনিষ, কিন্তু তার জন্যই একটা আন্দোলন খাড়া হইয়া গেছে। আর্থিক দিক দিয়ে ভারতের পক্ষে লবঙ্গ মোটেই সামান্য জিনিষ নয়, অথচ সাধারণ লোকে এ জিনিষটা কিছুতেই সহজে বিশ্বাস করিতে চাইবেনা। আমাদের দেশে বিদেশী লবঙ্গ আমদানীর পরিমাণের অঙ্কটা যদি লিপিবদ্ধ করি তাহলে সাধারণ লোকে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ভারতে জাঞ্জিবার থেকে ২ লাখ ৬৭ হাজার পাউণ্ড্ মূল্যের লবঙ্গ (৩৫ লক্ষ টাকার উপর) আমদানী হয়। ভারতবর্ষ থেকেও বিদেশে লবঙ্গ রপ্তানী হয় কিন্তু তার পরিমাণ অতিশয় সামান্য। ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানীকৃত লবঙ্গের মূল্য কোন কালেই ৬০০ পাউণ্ডের বেশী হয় না। নিম্নে ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন সালে লবঙ্গ রপ্তানীর একটা হিসাব দেওয়া গেলঃ—

সাল	পরিমান
১৯১৩—১৪	১০,০০০ পাউণ্ড
১৯১৫—১৬	২১,০০০ ”

১৯১৭—১৮	১৯, ০০০	”
১৯৩১—৩২	৫, ০০০	”
১৯৩২—৩৩	৭৮৪	”
১৯৩৩—৩৪	১১২	”
১৯৩৪—৩৫	—	”
১৯৩৫—৩৬	৭৮৪	”

উপরোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে গত কয়েক বছরে রপ্তানীর পরিমান একেবারে কমিয়া গিয়াছে কিন্তু আমদানীর পরিমাণ আছে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড।

লবঙ্গ হইতেছে একরকম ফুলের শুকনো কুঁড়ি যার উদ্ভিদশাস্ত্রগত নাম—'ইউজিনিয়া ক্যারিওফাইলাটা' (Eugenia Caryophyllata)। ফুলের কুঁড়িগুলি যখন গোলাপী রঙ্ প্রাপ্ত হয় তখন তাহাদের তুলিয়া নিয়া রোদে শুকাইতে হয়। এক একটা গাছ থেকে প্রায় ৬। ৭ পাউণ্ড ওজনের শুকনো লবঙ্গ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে লবঙ্গের উন্নতধরণের কোন চাষ নেই, কতখানি জমিতে চাষ হয় তাহারও কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায়না। সাধারণতঃ, মাদ্রাজ প্রদেশে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালার পাদদেশে লবঙ্গের চাষ হইয়া থাকে। লবঙ্গের শুকনো কুঁড়ি থেকে একরকম তেল পাওয়াও যায়, সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত ব্যাপারে এবং ঔষধার্থে তাহা খুব কাজে লাগে।

ভারতবর্ষে লবঙ্গের যে রপ্তানী বাণিজ্য তাতে কলিকাতার একচেটিয়া অংশ আছে। সাধারণতঃ, মরিসাস্, ফিজিদ্বীপ, ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেল্‌মেণ্টস্ প্রভৃতি যায়গায় ভারতীয় লবঙ্গ চালান যায়।

জাঞ্জিবারের এই একচেটিয়া লবঙ্গ ব্যবসায়ের এক ইতিহাস আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে আরব, পারস্য, গুজরাট এবং বোম্বাইর সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী দেশ সমূহের সাহসী বণিকগণ অকুল সমুদ্র পাড়ি দিয়া ভারত মহাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া বেচাকেনা করিতে যাইত এবং সুবিধা বোধ করিলে সেই সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এইরূপে আরব দেশের একদল মুসলমান জাঞ্জিবারে ব্যবসায় উপলক্ষে গিয়া সেই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া জাঞ্জিবার দখল করিয়া লয় এবং তাহাদিগের দলপতি সুলতান আখ্যা গ্রহণ করিয়া জাঞ্জিবার শাসন করিতে থাকে। তাহার পরেই আজ প্রায় ১৫০ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল ভারতীয় ব্যবসায়িগণ জাঞ্জিবারে ব্যবসায় উপলক্ষে গমন করে এবং সুলতানের অধীনে বসবাস করিতে সুরু করে। গুজরাটের ব্যবসায়িগণ পরিশ্রমী মিতব্যায়ী এবং অধ্যবসায়ী বলিয়া সমগ্র দেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। জাঞ্জিবারের আরবগণ যুদ্ধজীবী ছিল। ব্যবসায়ের বিশেষ কোনো ধার ধারিত না। সুতরাং দেশের সমৃদ্ধির দিক দিয়া জাঞ্জিবারের সুলতানের বিশেষ কোনো আয় ছিল না। কিন্তু গুজরাটি ব্যবসায়িগণ জাঞ্জিবারে যাওয়ার পর হইতে সুলতানের রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। এই জন্য সুলতান এই সকল ব্যবসায়িদিগকে জাঞ্জিবারে বসবাস করিবার জন্য নানারূপ অধিকার ও সুবিধা দিয়াছিলেন।

জাঞ্জিবারের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৫ হাজার। তন্মধ্যে আফ্রিকার আদিম নিবাসী ১ লক্ষ ৮৫ হাজার, আরব ৩৫ হাজার,

ভারতীয় ১৫ হাজার। এই ১৫ হাজার ভারত-বাসীকে জাঞ্জিবার হইতে উৎখাত করিবার করুণ ইতিহাস নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

আসামের চায়ের ব্যবসার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যেমন বনে জঙ্গলে চায়ের গাছ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জন্মাইত তেমনি ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জাঞ্জিবারে যাইবার পূর্ব্বে স্থানীয় আদিম অধিবাসিগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে লবঙ্গের চাষ করিত। পাহাড় পর্ব্বত কাটিয়া বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিবার জন্য তাহাদের শক্তি সামর্থ্য বা অর্থ বল কিছুই ছিল না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের অর্থে পরিশ্রমে এবং ব্যবসা বুদ্ধির ফলে এ দেশস্থ চা বাগিচার ন্যায় জাঞ্জিবারে হাজার হাজার একর জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লবঙ্গের চাষ সুরু হইয়া আজ ১৫০ শত বৎসরের চেষ্টায় উহা এখন বিরাট আকারে পরিণত হইয়াছে। জাঞ্জিবার হইতে এক ভারতবর্ষেই ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর লবঙ্গ রপ্তানী হয়। তাহা ছাড়া ইউরোপ এবং আমেরিকাতে লবঙ্গ রপ্তানী হইয়া থাকে। জাঞ্জিবারের সুলতানের সমগ্র রাজস্বের ⅔ অংশের আয় লবঙ্গের ব্যবসা হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

এই ব্যবসায়ের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমুদয় স্তরে এবং ধাপে একমাত্র ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের হাত ও কৃতিত্ব দেখা যায়।

বস্তুতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা না থাকিলে জাঞ্জিবারে লবঙ্গ ব্যবসায়ের কথা পৃথিবীর কেহ জানিতে পারিত কিনা সন্দেহের বিষয়। যাহারা এই ব্যবসার সৃষ্টি হইতে সুরু করিয়া বর্ত্তমানে ইহাকে এত বড় একটা পৃথিবীব্যাপী ফালাও কারবারে পরিণত করিয়াছে তাহা-দিগকে কি অন্যায় অত্যাচারে ধ্বংস করিবার আয়োজন করা হইতেছে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে কোন ইংরাজ জাঞ্জিবারে পদার্পণ করিবার বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় ব্যবসায়িগণ তথায় লবঙ্গের কারবার করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

Mr. Winston Churchill তাঁহার African Journey নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,

"The Indian was there, long before the first British officers. It is the Indian banker who supplied the largest part of the capital for business and to whom even the white settlers have not hesitated to go for financial aid."

জাঞ্জিবারের সর্ব্বপ্রথম British Consul General Sir John Kirk, ১৯১০ সালে Sanderson Committeeর নিকট সাক্ষ্য দিবার কালে বলিয়াছিলেন :—

"But for the Indians we would not be there now. It was entirely through gaining possession of these Indian merchants that we were enabled to build up the influence that eventually resulted in our possession of the Island."

যে সূত্র ধরিয়া জাঞ্জিবারে British Consulate প্রবেশ লাভ করিলেন, তাহা

চমৎকার। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ধুয়া ধরিলেন যে ভারতের বহু লোক ব্যবসায় উপলক্ষে জাঞ্জিবারে গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। তাহাদিগের স্বার্থ এবং সম্পত্তি বজায় রাখিবার জন্য ও নানারূপ আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাঞ্জিবারে British Consulate স্থাপনের প্রয়োজন। এই ধুয়া ধরিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জাঞ্জিবারে প্রথম British Consulate স্থাপিত হইল। পরে এই British Consulate কিরূপে ধীরে ধীরে British Protectorate এ পরিণত হইয়া জাঞ্জিবারের সুলতানকে একেবারে মুঠার মধ্যে আনা হইল সে ইতিহাস বর্ণনা করিবার স্থান ইহা নহে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে ভারতীয়েরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জাঞ্জিবারে আনয়ন করিয়া তাহাদের স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে জাঞ্জিবারকে British Protectorate এ পরিণত করিতে নানারূপে সাহায্য করিল, আজ সেই ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকেই British Imperialism এর চক্রান্তফলে জাঞ্জিবার হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ভারতীয়দিগকে জাঞ্জিবারের লবঙ্গ ব্যবসা হইতে উৎখাত করিবার জন্য যে সকল কঠোর আইন পাশ করা হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১। **Land Alienation Bill** :—এই বিলের মর্ম্ম এই—

দেশের যাহারা আদিম অধিবাসী জমিতে কেবলমাত্র তাহাদেরই অধিকার। বিভিন্ন দেশের লোকের এই সকল জমিতে বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। ইহার ফলে ভারতীয়েরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া আসামের চা বাগিচার ন্যায় যে সকল লবঙ্গের বাগিচা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার অধিকার এবং সত্ত্ব স্বামীত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

২। **লবঙ্গ উৎপাদনের জন্য কর্জ্জ দাদনের আইন** :—

লবঙ্গ উৎপাদন, প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়িগণ আদিম অধিবাসীদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দাদন দিয়াছেন। ভারতীয়গণ এই টাকা যাহাতে আদায় করিতে না পারেন সেজন্য প্রথমেই Moratorium ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের আদালত হইতে প্রাপ্ত প্রায় ক্রোর টাকার ডিক্রী পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কর্জ্জ দাদনের বা খতের টাকা আদায় করিবার কোনো উপায় নাই। ইহার ফলে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আচম্বিতে পথের ফকির হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ হতাশায় আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ বা বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছে। আবার অনেক পরিবার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া দেশীয় নৌকায় স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়া একশত বৎসর পরে আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছে।

৩। **লবঙ্গ রপ্তানীর আইন** :—এই আইনের ফলে জাঞ্জিবারের সমুদয় লবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের Warehouse এ আমদানী করিতে হইবে। কোনো ভারতীয় ব্যবসায়ী এক ছটাকও লবঙ্গ ক্রয় করিতে পারিবে না। জাঞ্জিবারের গভর্ণমেণ্ট এই লবঙ্গ ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে রপ্তানী করিবেন। ভারতবন্ধু এণ্ডরুজ দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে ভারতীয়

ব্যবসায়ীদিগের বিরাট গুদাম সমূহ এই আইনের ফলে শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

এই ত্রিশূলের আঘাতে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ শক্তিশেলাহত অবস্থায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এক আইনে জমির অধিকার হইতে তাহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত ও নিঃসত্ব করা হইল। দ্বিতীয় আইনে লবঙ্গের ব্যবসায় যাহাতে তাহারা না করিতে পারে তাহার জন্য দেশের সমস্ত লবঙ্গ সরকারী Warehouseএ আনিয়া পুরিবার ব্যবস্থা হইল। তৃতীয় আইনে এই লবঙ্গের ব্যবসায়ে এবং লগ্নী দাদনে ভারতীয়েরা আজ এতকাল ধরিয়া তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব যাহা লগ্নী করিয়াছিল তাহা যাহাতে আদায় করিয়া লইতে না পারে সেজন্য Moratorium আইন পাশ করা হইয়াছে।

১৫০ শত বৎসর পরে ভারতীয়েরা আজ হৃত সর্ব্বস্ব, পথের ফকির হইয়া রাস্তায় বসিয়াছে। তাহারা আজ এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে ভারতের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া আছে। ভারতীয়েরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য দুর্জ্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করে তবে Colonial Secretaryর হস্তের ক্রীড়া পুত্তলিকা জাঞ্জিবারের সুলতানকে দাঁতে কুটা কাটিয়া এই সকল জাতি-বিদ্বেষমূলক অন্যায় আইন অবিলম্বে রদ করিতে হইবেই হইবে।

কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাঞ্জিবারের লবঙ্গ ব্যবসায়ের ⅔ অংশেরও বেশী ভাগ, এক ভারতেই রপ্তানী হয় এবং সুলতানের রাজস্বের অধিকাংশ অর্থই এই ব্যবসায় হইতে সংগৃহীত হয়। আজ যদি ভারতীয় লবঙ্গ ব্যবসায়িগণ একবাক্যে জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বয়কট করে এবং দৃঢ়তার সহিত বলে যে যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল অন্যায় অধর্ম্মমূলক আইন উঠাইয়া না দেওয়া হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবসায়িগণ জাঞ্জিবারের লবঙ্গ স্পর্শও করিবে না, তাহা হইলে জাঞ্জিবারের সুলতান যাহাদের ইঙ্গিতে এই সব আইন পাশ করিয়াছেন তাহা সবই তুলিয়া দিতে বাধ্য হইবেন; কারণ ভারতে লবঙ্গের ব্যবসা যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে তাঁহার রাজস্বরও সর্ব্বনাশ হইবে।

ইতিমধ্যেই যে আংশিক বয়কট সুরু হইয়াছে তাহার ফলে ৩৫ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব কমিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ যেমন পার্টিসন রদ করিবার জন্য দুর্জ্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করিয়াছিল এবং দাম্ভিক লর্ড কার্জ্জনকে বাঙ্গালীর নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট পার্টিসনকে Settled fact বলিয়া জগতের সমক্ষে বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই Settled factকে Unsettled করিতে বাধ্য করিয়াছিল, আজ ভারতের লবঙ্গ আমদানী কারক ব্যবসায়িগণ যদি সেইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করেন তবে অচিরেই জাঞ্জিবারের এই ১৫ হাজার ভারতীয় অধিবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার মোচন হইতে পারে।

এই সংশ্রবে আমাদের আর একটি প্রস্তাব আছে। নীলগিরির পাদমূলে এবং মালাবার উপকূলে অনেকদিন হইতে লবঙ্গের চাষ বিক্ষিপ্ত ভাবে হইতেছে। জাঞ্জিবার হইতে যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন এমন কাহারো কাহারো সহিত আলোচনা করায় তাঁহারা বলিয়াছেন, আসাম এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল লবঙ্গ চাষের উপযোগী। আমরা বাংলা এবং আসামের ধনী জমিদার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদিগকে এই বিষয়ের পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি

সিগারেট শিল্প

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্বের একটি প্রবন্ধে সিগারেট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এবার তার প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করব। পূর্ব্বের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছিলাম যে, ভারতে সিগারেটের বিস্তৃত বাজার থাকা সত্ত্বেও দেশীয় উৎপাদন আশানুরূপ নয়, বিদেশী সিগারেটই আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এটা যতখানি দুঃখের ততখানি আশঙ্কার ব্যাপার। এই সিগারেট শিল্পের ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদন যদি কিছুমাত্র না থাকতো তাহ'লে হয়ত ততটা আফ্‌শোষের কিছু ছিল না, কিন্তু স্পষ্টতঃ দেখা গেছে যে, দেশীয় উৎপাদন সিগারেটখোরদের মন জয় করা ত দূরে থাক্‌, কাছেও ঘেঁসতে পারেনি। এর কারণ হ'ল দেশী সিগারেটের কোয়ালিটির অপকৃষ্টতা। সেই জন্যই আমাদের দেশের সিগারেটের বাজারে বিদেশীরাই আধিপত্য করে। অথচ আমাদের দেশে যে সমস্ত দেশী কোম্পানীরা নিকৃষ্ট সিগারেট উৎপন্ন করে তারা যদি একটু যত্ন নিয়ে উৎকৃষ্ট তামাক-পাতার সাহায্যে ভাল সিগারেট উৎপাদনে মনোনিবেশ লেগে যায় তা'হলে বিদেশীদের একাধিপত্য নষ্ট হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশী কোম্পানীগুলি এ পর্য্যন্ত সে ধারে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেননি।

অনেকের ধারণা আছে যে, ভারতে উৎকৃষ্ট সিগারেট বুঝি প্রস্তুত হ'তে পারে না, কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্যতা নেই। সিগারেটের গুণাগুণের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা নির্ভর করে ভাল মন্দ তামাক পাতার ব্যবহারের উপর। উৎকৃষ্ট সিগারেট প্রস্তুতের জন্য যে পাতা ব্যবহৃত হয় তা' আজকাল ভারতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, সুতরাং আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট সিগারেট উৎপাদিত না হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ভারতে তামাক পাতার চাষ হয় প্রায় ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট সিগারেটের জন্য আবশ্যকীয় তামাক পাতার চাষ হয় ১ লক্ষ একর জমিতে। উক্ত মোট তামাক চাষের উৎপাদন পরিমাণ হ'ল ৪৮৬৪২৮ টন এবং উৎকৃষ্ট সিগারেট প্রস্তুতের জন্য আবশ্যকীয় পাতার উৎপাদন পরিমাণ হ'ল ২৮ হাজার টন। এই ২৮ হাজার টন তামাক পাতার গুণাগুণ আমেরিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভার্জ্জিনিয়া ব্রাণ্ডের সমতুল্য। সুতরাং এই পাতা উৎকৃষ্ট সিগারেট প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

ভারতে যে পরিমাণ সিগারেট উৎপন্ন হয় তা' নিতান্ত সামান্য নয়। বিদেশী যে পরিমাণ সিগারেট ভারতে আমদানী হয়, ভারতীয় উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল তার এক তৃতীয়াংশ।

১৯২৯-৩০ সালে ৭৬ লক্ষ টাকার বিদেশী সিগারেট আমদানী হয়েছিল, ১৯৩২-৩৩ সালে তা' কমে গিয়ে ৩২ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। আমদানীর এই হ্রাস প্রাপ্তির কারণ হ'ল ১৯৩০-৩২ সালের দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন। এই বিরাট আন্দোলনের চাপে পড়েই সিগারেট-খোররা সিগারেট ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ভারতীয় মূলধনী সম্প্রদায়—বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশের মূলধনী সম্প্রদায় সেই সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার ফলেই বাজারে দেশী সিগারেটের প্রচলন ঘটে। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, দেশী মূলধনী সম্প্রদায়ের অর্থের লোভ ছিল বটে কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল না। এই ব্যবসা-বুদ্ধি না থাকার দরুণ তারা নিকৃষ্ট তামাক দিয়েই সিগারেট উৎপাদনে মনোনিবেশ করেছিল, ভাল সিগারেট উৎপাদনের দিকে

কিছুমাত্র মনোনিবেশ করেনি। এর ফল তখন না দেখা দিলেও এখন ফলছে। স্বদেশী আন্দোলন যতদিন বর্ত্তমান ছিল ততদিনই দেশী সিগারেটের প্রতি লোকের নিরুপায়-বশ্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সেই বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন মন্দীভূত হয়েছে তখনই সিগারেটখোরদের স্বদেশী প্রীতি উড়ে গেছে এবং সেইজন্যই আজ আবার বিদেশী সিগারেট বাজার ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু দেশী সিগারেট ব্যবসায়ীরা যদি তখন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি-সম্পন্ন হ'তেন তাহ'লে দেশী সিগারেটের গুণাগুণের উন্নতির ব্যবস্থা করতেন এবং তাহ'লে আজ আর বিদেশী সিগারেট তাদের লুপ্ত বাজার পুনরধিকার করতে পারত না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভারতে উৎকৃষ্ট সিগারেট প্রস্তুত হওয়াটা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। উৎকৃষ্ট সিগারেট প্রস্তুত হওয়ার পক্ষে আমাদের দেশে কোন বাধা বর্ত্তমান নেই, কেননা, উৎকৃষ্ট সিগারেট প্রস্তুত করণের জন্য যে তামাক পাতার প্রয়োজন তা' আমাদের দেশেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। সেই বিশেষ রকমের তামাক পাতাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে প্রায়োজনীয় অনুপাতে সংমিশ্রিত করাই হ'ল সিগারেট শিল্পের একটা আর্ট। এই আর্ট যার আয়ত্তের মধ্যে নেই তার দ্বারা শত চেষ্টা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট সিগারেট উৎপাদন সম্ভবপর নয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই আর্টকে কখনো আয়ত্তের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেনি, পরন্তু একটা অনুকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে বরাবর ফাঁকী দিয়ে এসেছে। সেইজন্যই দেশী সিগারেটের নাম শুনলেই সিগারেটখোরীদের নাক সিঁটকে ওঠে। দেশী সিগারেট-ব্যবসায়ীরা দেশী সিগারেটকে একটু সুগন্ধ মিশিয়ে বিদেশী সিগারেটের সমপর্য্যায় ভুক্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে কি আসল কোয়ালিটির কোন উন্নতি ঘটে? বরং সিগারেট পুরাণো হ'লে সেই সুগন্ধের বিকৃতির দরুণ কোয়ালিটি আরও খারাপ হয়ে যায়।

সুতরাং ভারতীয় সিগারেট শিল্পের কেউ যদি উন্নতি চান ত তার উৎপাদন প্রণালীর প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত করতে হ'বে। ভারতীয় সিগারেট শিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি মোটেই অবহেলার বস্তু নয়, কেননা, বৎসরে পৌনে এক কোটী টাকার উপর মূল্যের বিদেশী সিগারেট বাজারে বিক্রীত হয় (আন্দোলনের পূর্ব্বের হিসাব)। তার ওপর দেশী সিগারেটের বিক্রয় মূল্য যদি ধরা যায় ত টাকার অঙ্কের হিসাব আরও বেড়ে যায়। কাজেই যে শিল্প থেকে প্রায় এক কোটী টাকার সংস্থান হয় সেটা অমনোযোগের বস্তু নয়। তদুপরি সমাজে লোকের মধ্যে সিগারেটের নেশা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছে, সেধার দিয়ে দেখতে গেলে সিগারেটের বিক্রয় বাজার ক্রমশঃ বাড়ছে বই কমছে না। কাজে কাজেই সিগারেট শিল্প যে একটি লাভজনক কারবার সেবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি যে, সিগারেট শিল্পের প্রধান উৎপাদন হ'ল তামাক পাতা, এই তামাক পাতার গুণাগুণের উপর সিগারেটের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা নির্ভর করে। অনেকের ধারণা আছে যে, যে-রকমের হোক্ তামাক পাতা দিয়েই বুঝি সিগারেট প্রস্তুত করা যায় কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। পুরাতন পাতাই সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী, নূতন পাতা কিংবা ছোট গাছের পাতা সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী নয়।

পাতা গাছ থেকে ছিঁড়ে ২।৩ বছর গুদামে রেখে দিতে হয়। ২।৩ বছর এইরকমভাবে পাতাকে গুদামে ফেলে রাখা মানেই হ'ল মূলধনকে ২।৩ বছর আটকে রেখে দেওয়া। সাধারণ ব্যবসায়ীরা সেটা রাখতে রাজী হয়না, কিন্তু তা' না রেখেও উপায় নেই। আমাদের দেশী সিগারেট ব্যবসায়ীরা কোন সময়ই পুরাতন পাতা ব্যবহার করেন না, সেইজন্যই দেশী সিগারেট কোন মতেই ভাল হয় না। অনেকে পাতা ২।৩ বছর গুদামে ফেলে রাখার প্রথায় এই বলে আপত্তি করেন যে, তাতে মূলধন আটকে থাকার দরুণ কারবারে লোকসান হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাই মনে হলেও তাঁদের এ ধারণা ঠিক নয়। মূলধনকে আটকে রাখলে কিছু ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তার জন্য সিগারেটের কোয়ালিটি ভাল হওয়ার দরুণ দাম বেশী পাওয়া যায়, কাজে কাজেই সে ক্ষতি পুষিয়ে যায়। কিন্তু ঐ প্রকারে মূলধনকে আটকে না রাখলে সিগারেটের কোয়ালিটি ভাল হয় না এবং দামও তেমন পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রকারান্তরে লোকসান যায়। সেইহেতু, যাঁরা সিগারেট শিল্পকে ভালভাবে চালাতে চান তাঁদের উচিত পাতাকে ২।৩ বছর গুদামে রেখে পুরাতন করে নেওয়া। ভাল সিগারেট উৎপাদন মানসে পুরাতন পাতা ছাড়া flue-cured পাতা ব্যবহার করা দরকার। এই পাতা গুন্টুর জেলায় পাওয়া পাওয়া যায়। এর দাম একটু বেশী বটে কিন্তু এর ব্যবহারে সিগারেটের কোয়ালিটি ভাল হয়।

ক্রমশঃ।

ফরমুলা ও রিচিপি

বিনা ব্যাটারীতে গিল্‌টী করিবার উপায়।

নাইট্রিক অ্যাসিড্	২১ আঃ
জল	১৪ আঃ
স্বর্ণ	৫ আঃ

একত্র করিয়া গলাইয়া ফেলিতে হইবে। সমস্ত একত্রীভূত হইয়া দ্রব হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে জল ৪ গ্যালন, বাই কার্ব্বনেট অফ্ সোডা ২৩ আঃ দিয়া প্রায় ২ ঘণ্টা-কাল অগ্নিতে সিদ্ধ করিতে থাকিবে; এই জলে যাহা ডুবান যাইবে, তাহাই সোণার মত হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা কিছু ব্যয় সাপেক্ষ।

কাপড়ে মার্কার কালী।

ক্রিষ্টালাইজড্ নাইট্রেট্ অফ্ সিল্‌ভার	১ ড্রাম
লাঃ অ্যামোনিয়া সলিউশন্ বা অ্যামোনিয়াওয়াটার	৩ ড্রাম
ক্রিষ্টালাইজড্ গম আরেবিক, বা আরবীগম	১৷৷০ ড্রাম
সলফেট্ অফ্ কপার বা তুঁতে	৩০ গ্রেণ্
ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার	ওজনে ৪ গ্রেণ্

প্রক্রিয়া।

১টী কাচ পাত্রে নাইট্রেট্ অফ্ সিলভারকে অ্যামোনিযার জলের সহিত গুলিয়া রাখিবে।

অন্য পাত্রে ক্রিষ্টালাইজড্ গম আরেবিক ও সাল্‌ফেট্ অব্ কপারকে একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঘনঘন নাড়িয়া মিশ্রিত করিবে, ইহাদ্বারা নূতন পেনে করিয়া কাপড়ে লিখিলে দাগ উঠিবে না।

গোলাপের সার।

অয়েল টারকিস্ জিরানিয়ম	২ আঃ
,, বার্গামট	২ আঃ
এক্সট্রাক্ট ভ্যানিলা	২ আঃ
এক্সট্রাক্ট বেন্‌জইন	২ আঃ
এ্যালকোহল	২ গ্যালন
জল (পরিশ্রুত)	২ পাইট

একত্র একটা বড় কাচের জারে মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ কাল মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত করিয়া তাহার পর ফিল্‌টার করিয়া শিশিতে পুরিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার।

স্পিরিট অফ্ রোজ	৮ আঃ
এসেন্স অফ্ রোজ	৩ আঃ
এসেন্স ,, জেসমিন	৪ আঃ
এক্সট্রাক্ট ,, পাচৌলী	১ আঃ

এইরূপ এসেন্স প্রস্তুত করিতে ১ পাইটে

প্রায় ৭॥০ ৮॥০ টাকা ব্যয় পড়ে। জিনিস খুবই ভাল হয়।

কার্পাস বস্ত্রে চিতে ধরা পরিষ্কারের উপায়।

যে যে স্থানে কাপড়ে চিতে ধরে সেই সকল চিতে ধরা উঠাইবার উপায় অনেকেই জানেন না, সেই জন্য লিখিতেছি। ১॥ আউন্স ক্লোরাইড্ অফ্ লাইম্ (চুণ) প্রায় ৩ পোয়া গরম জলে ফেলিয়া দাও, এই জল থিতাইলে বা স্থির হইলে ছাঁকিয়া লইয়া চিতে ধরা স্থানগুলি তাহাতে ডুবাইয়া পরিষ্কার শীতল জলে কাচিয়া লইলেই সব চিতার দাগ উঠিয়া যাইবে।

ট্রেসিং পেপার তৈরী।

কাগজকে স্বচ্ছ করিয়া কোন ছবির বা নকসার উপর রাখিয়া ছবিখানার যে নকল তোলা হয়, তাহাকে ট্রেসিং পেপার বলে।

টার্পিন	৬ ভাগ
ম্যাষ্টিক গম	২ ভাগ

উত্তমরূপে মিশাইয়া ইহাতে কাগজ ডুবাইয়া শুষ্ক হইলেই ট্রান্সপেরেণ্ট বা স্বচ্ছ কাগজ হইবে। এইরূপে প্রস্তুত কাগজই বাজারে বিক্রয় হয়।

সাইকেল গাড়ীর ল্যাম্পের তৈল প্রস্তুত প্রণালী।

স্পারন্ অয়েল (Spern)	১৭ ভাগ
প্যারাফিন্ অয়েল	৩ ভাগ

ইহাতে ছোট এক টুকরা কর্পূর ফেলিয়া দিলে গলিয়া যাইবে। এই তৈলে যে ল্যাম্প জালান যায়, তাহার আলোক উজ্জ্বল এবং ধূম ও ভূষীবিহীন হইবে।

কলের তৈল বা মেসিন অয়েল।

কলের জন্য মোটা ভারি Spern Oil স্পারন্ অয়েল ব্যবহার কবিলেই চলিবে, কিন্তু সেলায়ের কল, টাইপ রাইটীং মেশীন প্রভৃতি সূক্ষ্ম কল সমূহের জন্য ভাল অলিভ অয়েল ১ ভাগ, প্যারাফিন্ অয়েল ২ ভাগ একত্র মিশাইয়া ব্লটীং দ্বারা ছাকিয়া লইলেই মেশীন অয়েল হইবে।

বাজারে যে সমুদয় মেশীন অয়েল বিক্রয় হয়, তাহার মূল্য অত্যন্ত বেশী। ইহা বেশ দরে বিক্রয় হয়। কোন উদ্যোগী যুবক এইরূপ তৈল প্রস্তুত করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পারেন।

ক্যামিলিয়ন টুথ-পাউডার।

কোচিনিল—১৫ গ্রেণ

ফট্‌কিরি—৩০ গ্রেণ

এই উভয় পদার্থকে সযত্নে মিশ্রিত করিয়া ইহার সহিত নিম্ন লিখিত দ্রব্য গুলি যোগ কর।

অরিস রুট চূর্ণ—১ আঃ

ক্রিম অফ টারটার—১০ ড্রাম

কার্ব্বনেট অফ মাগনেসিয়া—১/৪ ড্রাম

কটল ফিস্ পাউডার—৫ ড্রাম

এই গুলিকে সমস্ত একত্র পিষিয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর ৫ মিনিট অয়েল অফ রোজ, বা অটোডিরোজ বা আতর দিয়া ঐ চূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিয়া মিশাইতে হইবে। এই টুথ পাউডার দন্তরোগে এবং প্রত্যহ দন্ত মার্জ্জনে বিশেষ হিতকর। ইহা শুষ্কাবস্থায় দেখিতে শ্বেতবর্ণ, কিন্তু জল সংযুক্ত হইলে আরক্তবর্ণ ধারণ করে।

কাশীর লজেঞ্জেস প্রস্তুত প্রণালী।

Lactucarium—১২০ গ্রেণ

(ল্যাকচুকেরিয়াম)

ইপিক্যাক—৬০ গ্রেণ

স্কুইল—৪৫ গ্রেণ

এক্সট্রাক্ট্ অফ্ গ্লিসিরিজা (Extract of Glycyrrhiza) ২ আউন্স,

সুগার বা চিনি ১২০ গ্রেণ

উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য গুলিকে একত্র মিশাইয়া প্রত্যেক লজেঞ্জেসটী ওজনে ২০ গ্রেণ পরিমান করিতে হইবে। ইহা কঠিন কফকে

তরল করিয়া দিবে, কাশী সরল হইবে। অনায়াসে ইহাকে পেটেণ্টও করা যাইতে পারে।

কুইনাইন হেয়ার টনিক।

সল্‌ফেট্‌ অফ কুইনাইন ... ২০ গ্রেণ।
টীং কান্থারাইডিস্‌ ... ২ ফ্লুড্‌ ড্রাম।
একষ্ট্রাক্ট অফ
জাবারাণ্ডী ... ২ ফ্লুড্‌ ড্রাম।
অ্যাল্‌কোহল বা সুরাসার ২ ঐ আঃ।
গ্লিসারিণ ... ... ২ ফ্লুঃ আঃ।
বে—রম ... ... ৬ ফ্লুড্‌ আঃ।
গোলাপজল ... ... ১৫ আঃ।

প্রথমে কুইনাইনটাকে সুরাসারে গলাইয়া ফেলিতে হইবে, সুরাসারে কুইনাইন দিয়া ঈষৎ উত্তাপ দিলেই গলিয়া যাইবে; তাহার সহিত অপরাপর দ্রব্য মিশাইয়া বোতলে কর্ক করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাদ্বারা মধ্যে মধ্যে কেশ ধৌত করিলে কেশের দৃঢ়তা জন্মিবে এবং প্রচুর নূতন কেশগুচ্ছের উৎপত্তি হইবে। যাহাদের অকালে কেশ পতন হয়, টাক পড়িতে থাকে, তাহাদের এইরূপ হেয়ার টনিক ব্যবহার করা ভাল। ইহাকে পেটেণ্ট করিয়া কেশ-তৈলের ন্যায় বিক্রয় করা যাইতে পারে; ইহা আধুনিক কেশ-তৈল অপেক্ষা অনেক ভাল জিনিস।

ফ্রুট্‌সল্ট্‌ প্রস্তুত প্রণালী।

ফ্রুট্‌ সল্ট একপ্রকার মৃদুজোলাপ, কোষ্ঠ পরিষ্কারক। আজকাল অনেকেই ফ্রুট্‌ সল্ট এত অধিক ব্যবহার করিতেছেন যে ইহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক বলিলেও চলে।

প্রস্তুত প্রণালী।

কার্ব্বনেট অফ সোডা ২ আঃ।
টারটারিক অ্যাসিড্‌ ২ আঃ।
ক্রিম্‌ অফ্‌ টারটার ২ আঃ।
এপ্‌সম্‌ সল্ট ২ আঃ।
সিফ্‌টেড্‌ সুগার ২ আঃ।

প্রথমে উপরোক্ত লবন গুলিকে অগ্নির উত্তাপে গরম করিতে বা একটু ভাজিয়া লইতে হইবে এবং গুঁড়াইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি এক গ্লাস শীতল জলে এক ডেজার্ট চামচের এক চামচ দিবা মাত্রই ফুটিয়া উঠিবে এবং তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে এক বার মাত্র দাস্ত হইয়া অন্ত্র পরিষ্কার হইবে। ইহা খাইতেও মুখপ্রিয়। ফ্রুট সল্টের প্রকার ভেদ আছে। উপরোক্ত এক চামচ পূর্ণবয়স্কের মাত্রা।

Fruit Bottling
বা বোতলে ফল রক্ষা প্রণালী - -

Wealth of India নামক মাসিক পত্রে মিঃ পি, এম্, ভেন্‌কাটারাম আয়ার মহাশয় ফল সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ফল সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেকবার প্রবন্ধ লিখিয়াছি, পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। অদ্য ভেন্‌কাটারাম আয়ার মহোদয়ের প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। আমাদের প্রদত্ত প্রণালী এবং ইহার প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য নাই, পাঠকগণ পাঠ করিয়া তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ফলকথা, ভারতের বিবিধ প্রকারের ফল অন্যদেশে দুর্লভ, যদি ফল সংরক্ষণ করিয়া ভারত হইতে বিদেশে সেই সকল সংরক্ষিত ফল চালান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। সেইজন্য কথাটার পুনরায় অবতারণা করিতে চাহি। ইহা যে বিশেষ লাভ-জনক শিল্প এবং ব্যবসায়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আম, আনারস, লিচু, পেয়ারা, জাম এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার ফলের সংরক্ষণ করিতে পারিলে ইউরোপে পাঠাইয়া প্রচুর ধনাগমের পন্থা করা যাইতে পারে। এদেশের আমের চাটনী প্রভৃতি বিলাতে সাদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। শিল্পের আলোচনার দিকে আদৌ দেশটার প্রবৃত্তি নাই, শিল্প সাহিত্য এদেশে সাহিত্য মধ্যে গণ্যই হয় না, সেই জন্য নাটক নভেলের সাহিত্যিক অপেক্ষা শিল্প সাহিত্যিকের সংখ্যা এদেশে একেবারে কম। টাউন হলে সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে একদিন আমরা উপস্থিত ছিলাম, সেখানে শিল্প বিষয়ক সাহিত্যের কোন গবেষণাই হয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাঁহার একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয় পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, অনেক জন-সমাগম, বড় বড় প্রবন্ধ পাঠের আড়ম্বড়ে বালক কিছুই বুঝিতে পারে নাই বোধ হয়। তাহার দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, দাদু, "সাহিত্যিক" কাহাকে বলে, দাদা মহাশয় বিপদে পড়িলেন, আমরাও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া-ছিলাম—বালকের এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর দিলে বালক বেশ স্বচ্ছন্দে বিষয়টা বুঝিতে পারে, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। ইত্যবসরে বৃদ্ধ দাদা মহাশয় বলিলেন, কি জান সতু বাবু! যাঁহারা ভাষার গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারাই সাহিত্যিক, আর সরল ভাষাকে যাঁহারা বড় বড় দুর্ব্বোধ্য কথায় বেশ জটিল করিয়া দিতে পারেন, তাঁহারাই হইলেন বড় সাহিত্যিক। দুর্ভাগ্য, সতু বাবু বৃদ্ধের কথাটা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, বলিলেন, দাদু আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দাদা মহাশয় বলিলেন—আমিও ভাল

বুঝিতে পারি নাই, তা তোমাকে বুঝাইব কি! চল বাড়ী যাই। দেশের সাহিত্যচর্চ্চা নিশ্চয়ই দেখিতে শুনিতে দেখাইতে শুনাইতে ভাল কথা সন্দেহ নাই, সাহিত্যের উন্নতি আর কে না চায়, কিন্তু শিল্প বিষয়ক সাহিত্যের আলোচনা কি একেবারেই অস্পৃশ্য? পাশ্চাত্য দেশের শিল্প বিষয়ক সাহিত্য হইতে এদেশের সাহিত্য ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করা উচিত। ক্রমাগত অসার উপন্যাস এবং নাটকে দেশটা পরিপূর্ণ করিবার প্রশ্রয় দেওয়ায় দেশে এক শ্রেণীর অলস অকর্ম্মণ্য লোক গঠিত হয় মাত্র। এটা কথা প্রসঙ্গে তুলিলাম মাত্র।

ফল সংরক্ষণের জন্য অধিক মূলধন এবং যন্ত্রাদির সাহায্য না লইলেও কতকগুলি মোটামুটি প্রণালী জানিলে সাধারণ লোকেও ছোট রকমের কারখানা করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই কার্য্য চালাইতে হইলে একটা সস্প্যান বা কড়াই, একটা কেট্‌লী অথবা সেইরূপ কোন একটা জল গরম করিবার পাত্র আবশ্যক।

বোতলের কথা।

বিদেশে দেশের সংরক্ষিত ফল চালাইতে হইলে বোতলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাদান, দীর্ঘকাল ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে বোতলগুলি সম্পূর্ণভাবে এয়ার টাইট্ বা বায়ু অবরোধক হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভিতরে বাতাস ঢুকিলে সংরক্ষিত ফল নষ্ট হইয়া যায়। এই কাজের জন্য মুখে রবার দেওয়া কাচের ছিপি যুক্ত বোতল বাজারেও খরিদ করিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বোতল ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বারম্বারও ব্যবহৃত হইতে পারে।

সিরাপ বা সরবতের কথা।

অনেকের ধারণা আছে যে, ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে সিরাপ একটা অপরিহার্য্য সামগ্রী।

সাধারণ বিশুদ্ধ জলও সিরাপের ন্যায় উপযোগী। স্বচ্ছ সিরাপেরও আর একটি দোষ এই যে ইহা যথেষ্ট তরল এবং স্বচ্ছ হইলেও ফলের স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট করিয়া দেয়। সেইজন্য সিরাপ বা চিনি একেবারে না ব্যবহার করিলেই ভাল হয়, যদি বা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এক কোয়ার্ট অর্থাৎ ৩ পোয়া আন্দাজ জলে মাত্র এক পাউণ্ড অর্থাৎ অর্দ্ধ সের চিনি দেওয়াই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। আরও একটা কথা, যদি চিনি ব্যবহারই করিতে হয়, তাহা হইলে কখন Raw Sugar বা অপরিষ্কৃত চিনি ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা যে সরবৎ বা সিরাপ হইবে, তাহা অপরিষ্কার হইবে। যাহাকে বাজারে পরিষ্কৃত চিনি বা White Lump Sugar বলে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। ইহা দ্বারা প্রস্তুত সিরাপ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া থাকে।

ফলের কথা।

ফল সংরক্ষণ করিতে হইলে কি প্রকার পরিপক্ক ফল ব্যবহৃত হওয়া উচিত, তাহাও আলোচ্য বিষয়। কারণ ফলের পক্কাবস্থার উপর সংরক্ষিত ফলের আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে। যে সকল ফল বোতলে সংরক্ষিত হইবে, সে ফল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়া উচিত নয়, একটু ডাঁটো থাকা ভাল, তাহা হইলে যখন চিনিতে পাক হইয়া দানাদার হইবে, তখন সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে না। আবার ফল

একেবারে কাঁচা হইলেও সুবিধা হয় না এবং খুব সুপক্ক হইলেও চলে না।

যে জলে ফলগুলিকে সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা অবশ্যই কোনক্রমে ফারণহিটের ২০০° ডিগ্রীর অধিক উত্তাপ বিশিষ্ট হওয়া উচিত নহে। ১৯০° উত্তাপ হইলেই ভাল হয়। সেইজন্য জলের এই উত্তাপ স্থির করিবার জন্য একটা থার্মোমিটার অতি অবশ্যই দিতে হয়।

ফলের অবস্থা।

যে সমুদয় ফলকে সংরক্ষণ করিতে হইবে সে সকল ফল বেশ পুষ্ট, নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, পচা, কাঁচা, অপরিপক্ক ফল সংরক্ষণের অযোগ্য। ফলগুলিকে সংরক্ষণ করিবার পূর্ব্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, তাহার বোঁটা বাদ দিতে হইবে, তাহার পর সমস্ত ফলগুলিকে বাছাই করিয়া সমান আকৃতির ফলগুলিকে পৃথক করিতে হইবে; কারণ একই বোতলে ছোট বড় ফল সংরক্ষণের অনেক অসুবিধা হইয়া পড়ে। দেখিতেও ভাল হয় না এবং যখন চিনির রসদ্বারা Sterilize বা দানাদার করা হয়, তখন সমান আকৃতির ফল না হইলে কোন স্থানে রস বা সীরাপ অধিক জমা হইয়া পড়ে; কোন স্থানে রস সমান পায় না। এই একটি বিশেষ দোষ হইয়া পড়ে সুতরাং সমান আকৃতির ফল বাছাই করিয়া লইলে অনেক সুবিধা।

বোতল বা টিন পূর্ণ করিবার প্রণালী।

এইটিই এই কার্য্যের বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়। কারণ এই কার্য্যের সুচারু বন্দোবস্তের অভাবেই সংরক্ষিত ফল অল্প দিনেই নষ্ট হইয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, ফলধারী বোতল পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে বায়ু প্রবেশ রোধ করা যাইতে পারে, এরূপ গ্লাস ষ্টপার দেওয়া বোতলের আবশ্যক; বোতলের মুখেই কাচের স্ক্রু দেওয়া ছিপি বিশিষ্ট এবং রবার দেওয়া বোতল বীজ ও ফল সংরক্ষণের জন্য বাজারেও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার চীনা বাজারে শিশি বোতলের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

এই বোতলের ভিতর সমান আকৃতির ফলগুলি বিশেষ সুবন্দোবস্তের সহিত সাজাইয়া লইতে হইবে, একটা কাষ্ঠ খণ্ডের শলাকা প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহা দ্বারা স্তরে স্তরে সাজাইয়া লইতে হয়, কারণ বোতলের ভিতর হাত প্রবেশ করান সম্ভব নহে।

বোতলের গলা পর্য্যন্ত ফলগুলিকে সাজাইতে হইবে এবং তাহার পর শীতল জল দ্বারা অথবা সীরাপ দ্বারা বোতল পূর্ণ করিতে হইবে। সীরাপ না দিবার বাসনা হইলেই শীতল জল দিয়া উপরের স্ক্রু ওয়ালা ছিপি আঁটিয়া দেওয়া উচিত, যাঁহারা সীরাপ দিয়া ফল সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায়ে সীরাপ বা রস প্রস্তুত করিয়া ঐ সুসজ্জিত ফলের উপর ঢালিয়া দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিতে পারেন।

লোফ সুগার বা
দানাদার সাদা চিনি—১ পাউণ্ড বা অর্দ্ধ সের
জল (পরিষ্কার) ১ কোয়ার্ট বা আন্দাজ ৩ পোয়া

অগ্নিতে একটা এনামেলের কটাহে বা মৃত্তিকা পাত্রে দিয়া গলাইয়া ইহার গাদ কাটিয়া রস বা সীরাপ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে; রস যতদূর সম্ভব পাতলা রাখা ভাল।

STERILIZATION.

—

একটা সস্‌প্যান বা কটাহ সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা এরূপ পরিমান গভীর হওয়া উচিত, যেন বোতলের গলা পর্য্যন্ত এই কটাহের জলে নিমগ্ন থাকিতে পারে। তাহার পর একখানা অর্দ্ধইঞ্চি পরিমিত মোটা কাষ্ঠের তক্তাকে উপরোক্ত প্রকারের কটাহের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, যদি তক্তা না দিয়া কটাহের উপরই বোতল স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলে বোতল উত্তাপে ফাটিয়া যাইতে পারিত, যাহাতে উত্তপ্ত কটাহের সম্পূর্ণ তাপ বোতলে না লাগিতে পারে, একখণ্ড তক্তা দেওয়ার ব্যবস্থা সেইজন্য। উক্ত তক্তার উপর যখন বোতলগুলি স্থাপিত হইবে, তখন যেন কোনরূপে বোতলগুলি গায়ে গায়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য বোতলগুলির মধ্য স্থলে খড় দিতে হইবে। এখন স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লৌহ কটাহের জল এবং বোতলের মধ্যে সীরাপের বা জলের উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কেটলীর জল ৫০ ডিগ্রি ফারনহিট্ হয়, তাহা হইলে বোতলের ভিতরের ৪০' ডিগ্রি হইবে। সেইজন্য উত্তাপ মৃদুভাবে বৃদ্ধি হওয়া উচিত। এখন উপরোক্ত উপায়ে বোতলে সীরাপ দিয়া কটাহের মধ্যস্থ কাষ্ঠের তক্তার উপর বোতলগুলির কর্ক বা ছিপি যথাযোগ্য আঁটিয়া স্থাপন করিয়া তাহার পর কটাহে এরূপ পরিমাণ জল দিতে হইবে, যেন সেইজল বোতলের গলদেশ বা ছিপির ঠিক নিম্ন পর্য্যন্ত আসিতে পারে। তাহার পর কটাহের নিম্নে অগ্নির উত্তাপ দিয়া ১৬৬° ডিগ্রি হইতে ১৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া তুলিতে হইবে। ফলের পক্কতা অনুযায়ী কখন কখন উত্তাপের তারতম্য করিয়া লইবার আবশ্যক হয়; তবে ১৬০° ডিগ্রি হইতে ১৯০° উত্তাপ সর্ব্বাবস্থাতেই যথেষ্ট। উত্তাপ ১৯০ পর্য্যন্ত উঠিবামাত্রই কটাহকে অগ্নি হইতে নামাইয়া যদি স্ক্রু বিশিষ্ট বোতল হয়, তাহার স্ক্রুগুলি টাইট করিয়া আটিয়া দিতে হইবে, তাহার পর ১৫।২০ মিনিট—১৬৫° ছোট ফলের জন্য এবং ১৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত বড় ফলের জন্য উত্তাপ ঠিক রক্ষা করা উচিত।

এইরূপ করিলে ভিতরের বায়ু প্রবেশ বন্ধ হইবে। বায়ু প্রবেশ রোধ না করিতে পারিলে ফল সংরক্ষণ সুসম্পন্ন হইল না, বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, চিনি বা জল উভয় দ্বারাই ফল উপরোক্ত উপায়ে সংরক্ষণ করিতে পারা যায়।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন

বিগত ২২শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পঞ্চষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রতনপুরের নবাব স্যার মহিউদ্দীন ফারোকী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কলিকাতাস্থ বহু গণ্যমান্য লোক ও ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ী মহলের নেতৃস্থানীয় এম্পায়ারের চীফ্ এজেণ্ট মিঃ এ, সি, সেন নবাব বাহাদুরকে সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উপস্থিত মহিলাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। সভায় নানা প্রকার সঙ্গীত এবং ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন করা হইয়াছিল।

আমরা সাধারণতঃ এই সকল সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করি না। কিন্তু ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার এক বৈশিষ্ট আছে যাহা সহজে উপেক্ষা করা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানটি পঁয়ষট্টি বৎসর একাদিক্রমে বাঁচিয়া আছে; বাংলাদেশের কোথাও এরূপ দীর্ঘজীবন সম্পন্ন সভার অস্তিত্বের কথা আমরা জানিনা, তারপর শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, বৎসরের পর বৎসর এই সভার কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং কৃতিত্বের কথা শুনিয়া সমগ্র দেশবাসী আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এইখানে তাই মিঃ এ, সি, সেন ও নবাব বাহাদুরের বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

মিঃ এ, সি, সেনের অভিভাষণ

ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ,

আজ আমরা ত্রিপুরাবাসীর শ্লাঘার মূর্ত্তিস্বরূপ ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পঞ্চষষ্টিতম বার্ষিক উৎসব সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত হইয়াছি। আমি রতনপুরের নবাব যশস্বী কর্ম্মকুশল স্যার মহিউদ্দীন ফারোকী সাহেবকে অদ্যকার এই মিলন সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছি। স্যার মহিউদ্দীন ফারোকী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতিসন্তান। ত্রিপুরাবাসীর নিকট অথবা সমগ্র বাংলাদেশবাসীর নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র। আমাদের হিতসাধিনী সভা ত্রিপুরাবাসী সকলের একত্র সমবেত হওয়ার মহা কেন্দ্রস্থল। আমরা বর্ষের পর বর্ষ এই উপলক্ষটির জন্য আদরের সহিত

প্রতীক্ষা করিয়া থাকি—আমাদের জেলার যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে, আমাদের সভা যাহাতে কর্ম্মের জন্য নূতন প্রেরণা ও নূতন পন্থার সন্ধান পাইতে পারে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে প্রেম ও প্রীতির আদান প্রদান করিতে পারি, তজ্জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। এই উপলক্ষে আমাদের নেতৃস্থানীয় মনীষীদিগের নিকট হইতে উৎসাহ ও সুচিন্তিত অভিভাষণের আশা করিতে থাকি। আমরা কখনও বিফল মনোরথ হই নাই—আজও ফারোকী সাহেব তাঁহার বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতার ফল আমাদিগকে বিতরণ করিবেন, আমরা তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইব, সন্দেহ নাই।

নবাব ফারোকী সাহেব ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার একজন আজীবন হিতৈষী। বহুবর্ষ পূর্ব্বে তিনি নবীনতর বয়সেও এই সভার জন্য জেলা বোর্ডের বৃত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে তিনি সভার কার্য্যে আগ্রহ প্রকাশ ও প্রেরণা দান করিতে পরাঙ্মুখ হ'ন নাই। আমি সভার পক্ষ হইতে সভার প্রতি তাঁহার যে গাঢ় অনুরাগ তাহা জ্ঞাপন করা একটি আনন্দময় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এইজন্য আজ আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত ফারোকী সাহেবকে সভাপতির আসনের জন্য বরণ করিতেছি।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমার মনে আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেশবাসীর নিকট গুরুতর চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের জেলায় এই সমস্যার তীব্র তিক্ত অনুভূতি কখনও বিশেষ স্থান পায় নাই। বস্তুতঃ সকল দেশহিতকর কাজে আমাদের জেলায় আমরা নেতৃস্থানে যেমন মনস্বী হিন্দুদিগকে পাইয়াছি, তেমনি মহানুভব মুসলমানদিগকেও লাভ করিয়াছি। আমাদের হিতসাধিনী সভার বিশেষত্ব এই যে, হিন্দু মুসলমান সমভাবে ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া আসিতেছে। আমরা সর্ব্বদাই মুসলমান মনীষীবৃন্দের সহায়তা ও নেতৃত্বলাভ করিয়া আসিতেছি। পরলোকগত সহৃদয় নবাব সিরাজুল ইস্‌লাম, তীক্ষ্ণধী নবাব স্যার সৈয়দ সাম্‌সুল হুদা, তেজস্বী দেশপ্রেমিক আবদুল রসুল প্রমুখ ত্রিপুরার ও বাংলার গৌরবস্থানীয় বহু সদাশয় ব্যক্তির স্মৃতি ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার ইতিহাসে অতুলনীয় উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিয়াছে।

মিঃ এ, সি, সেন।

আজ আমরা নবাব স্যার মহিউদ্দীন ফারোকী সাহেবকে আমাদের মধ্যে পাইয়া এবং আমাদের কর্ম্মিশ্রেণীভুক্ত দেখিয়া ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত হইতেছি। তাঁহার ন্যায় উদারপ্রাণ ব্যক্তির সাহায্যে আমাদের জেলার প্রতিবেশী প্রীতি ও হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি অক্ষুন্ন ও অটুট থাকিবে এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে উদার সহানুভূতি দ্বারা ঐক্যের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সভাপতি নবাব স্যার মহিউদ্দীন ফারোকী সাহেব বাহাদুরের অভিভাষণ

বন্ধুগণ,

আমি বাল্যকালেই ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার নাম শুনিতে পাই। তারপর যখন কতকটা জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন আমার রাষ্ট্র-নৈতিক শিক্ষাগুরু স্বদেশ প্রেমিক মরহুম মিঃ রসুলের নিকট এই সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানের হিতকরী প্রচেষ্টা সমূহের বিবরণ অবগত হই। আমাদের জেলার গৌরব নবাব সিরাজুল ইসলাম খাঁ বাহাদুর, নবাব স্যার সৈয়দ সামসুল হুদা, পরলোকগত গোবিন্দ চন্দ্র দাশ ও মিঃ রসুল এই হিতসাধিনী সভা পরিচালনায় কিরূপ ধৈর্য্য ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষ ভাবেই অবগত আছি। তখন হইতেই জেলার গৌরবস্থানীয় এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সহযোগীতা করার অভিলাষ আমার হৃদয়ে জাগ্রত হয়; ফলে কর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করিয়াই আমি সভার আজীবন সভ্য শ্রেণীভুক্ত হই।

পয়ষট্টিবৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী-শিক্ষা ভিত্তি করিয়াই ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার জন্ম হয়। প্রাচীনত্বে এই সমিতির সমকক্ষ এ প্রকার আর কোনো অনুষ্ঠান বাংলা দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া প্রথমতঃ এই সভা গঠিত হইলেও ক্রমে ত্রিপুরার নানাবিধ অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টি দিয়া বহু জনহিতকর কার্য্য এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করার প্রেরণা দ্বারা এই সভা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সকল দেশপ্রেমিক, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনীষীবৃন্দের ত্যাগ ও সেবা দ্বারা এই সভা গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেছি।

নবাব ফারোকী

ত্রিপুরা প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর নিকটই গর্ব্বের বস্তু, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ত্রিপুরার বীরত্ব, সমরনিপুণতা, সাহিত্য সেবা, কবিত্ব প্রতিভা, ধর্ম্মানুরাগ এবং ত্রিপুরার উর্ব্বর প্রজনন শক্তিসম্পন্ন দিগন্তব্যাপী শ্যামল প্রান্তর অতুলনীয়।

স্ত্রী শিক্ষায় ত্রিপুরা

বর্ত্তমানে ত্রিপুরার অধিবাসীর সংখ্যা ৩১ লক্ষেরও উপর। এই ৩১ লক্ষ মনুষ্য-সন্তানের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই নিরক্ষর; ইহা নারী-

পুরুষের মিলিত হিসাব। যে স্ত্রী-শিক্ষা ভিত্তি করিয়া ত্রিপুরা হিতসাধিনী প্রতিষ্ঠিত—তাহার কথা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। হাজারের মধ্যে ৯৯৫ জন নারীই নিরক্ষর। অবশ্য ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা যে এই দীর্ঘকালের চেষ্টায় নারী শিক্ষা বিষয়ে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক জেলা মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তবুও হাজারে ৯৯৫ ভাগ এখনও শিক্ষা পাইতে বাকী রহিয়াছে।

নারী ও পুরুষ লইয়াই মানব সমাজ গঠিত, ইহার এক অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিলে অপর অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইবেই। সুমাতার পক্ষেই সুপুত্র সৃষ্টি করা সম্ভবপর। সুতরাং নিরক্ষর, অজ্ঞ, অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বিরাট মাতৃজাতির হৃদয় যতদিন আমরা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কোনো ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের আশা করিতে পারি না। অতএব এই বিরাট কর্ত্তব্যে আমাদিগকে আরও অধিকতর অবহিত হইতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নারী ও পুরুষ লইয়াই মানবের পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠিত। সুতরাং আমাদিগকে পুরুষের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। কেবল পুরুষের হিসাব করিলে ত্রিপুরার অধিবাসীদের শতকরা ৯২ জনই নিরক্ষর। মানব জীবনের পক্ষে মূর্খতাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম বটে, কিন্তু অজ্ঞানকে জ্ঞান দান তুলনাহীন মহান্ পুণ্য কার্য্য। গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন না করিবেন তাহা না ভাবিয়া আমরা যে যতটুকু পারি এই কার্য্যে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। নৈশ বিদ্যালয় দ্বারা সামান্য চেষ্টায়ও অনেকেরই নিরক্ষরতা দূর করা যাইতে পারে এ দিকে সভার কর্ম্মিবৃন্দের একান্ত আবশ্যক।

সভায় বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা

আমি বিগত বৎসরের কার্য্যবিবরণীখানা পাঠ করিয়া সভার বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে বস্তুতঃই সবিশেষ প্রীত হইয়াছি। সেবা বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মপ্রচেষ্টা যদিও মুখ্যতঃ কলিকাতা প্রবাসী ত্রিপুরাবাসিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তথাপি এই সকল কার্য্যের ফল ত্রিপুরা জেলার উপরও পরোক্ষভাবে কার্য্য করিয়াছে। আমি জানি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সভার ষষ্টিতম জয়ন্তী উপলক্ষে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তদ্বারা একজন সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরণ করিয়া ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত কতিপয় গ্রামে বিনা ব্যয়ে প্রায় পাঁচশত রোগী চিকিৎসা করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করা হইয়াছিল। এ বৎসরও পুনরায় এ প্রকার একটী সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনা সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতেছে। আমি আশা করি, আমার উৎসাহী কর্ম্মিবন্ধুগণ পুনরায় জেলামধ্যে এ প্রকার কার্য্যাদি করিয়া দুঃস্থ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাহারা কোনোপ্রকার জনহিতকর কর্ম্মসম্পাদন কিম্বা কর্ম্মে সহযোগীতা করিতে ক্বচিৎ অগ্রসর হন, পরন্তু অপরের জনহিতকর প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করিয়া ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া থাকেন। সেই শ্রেণীর কেহ কেহ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া সভা কোন্ কার্য্য সম্পাদনের

জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা দ্বারাই সভার কার্য্যকরী শক্তির পরিমাপ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সভা সমিতির কার্য্যশক্তি যে কেবল ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে না তাহা তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন না।

জেলার একদল বিজ্ঞ চিকিৎসক সভার আহ্বানে জেলাবাসীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য উৎসাহ সহকারে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা সভার চিকিৎসা বিভাগের কোনো কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির চেষ্টায় ও সাহায্যে জেলাবাসী রোগিগণ বিভিন্ন হাসপাতাল সমূহে প্রবেশ করিয়া চিকিৎসিত হওয়ার যে সুযোগ লাভ করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ দিতে হইলে তাহার পরিমাণ সহস্রের কোঠায় পৌছাইত।

এতদ্ব্যতীত দেশমধ্যে সেবার জন্য এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করার জন্য যে প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে তাহারও কোন মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। সভা সমিতির কার্য্য কেবল অর্থ দান নহে, পরন্তু অর্থদান করাইবার জন্য এবং বিনা অর্থ গ্রহণে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করাইবার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে ত্রিপুরাবাসী যেরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল বিগত ৩০ বৎসরের চেষ্টায় ত্রিপুরাবাসিগণ তদপেক্ষা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষা ব্যপদেশে পরিভ্রমণ

সভার কর্ম্মিগণ ত্রিপুরার যুবকদিগকে লইয়া বিবিধ কল, কারখানা, সমুদ্রগামী জাহাজ, বর্ত্তমান কালোপযোগী উন্নত ধরণের যন্ত্রাদি পরিচালিত সংবাদপত্রের আফিস প্রভৃতি দর্শনের যে সুন্দর ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়। এ প্রকার পরিদর্শনে কেবল যে দর্শকগণের আনন্দবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধি হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিবিধ প্রকারের শিল্প সংসৃষ্ট যন্ত্রপাতির কার্য্য প্রণালী দর্শন করিয়া নিজেদের কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করা সম্বন্ধেও সহায়তা লাভ করেন। ইউরোপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রকার সভা, সংঙ্ঘ ও সম্মিলন রীতিমত ভাবে এ প্রকার শিক্ষা ব্যপদেশে পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতা নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার যে জয়ন্তী উৎসব হইয়া গেল তাহার প্রতিনিধিগণের জন্যও এ প্রকার বহু পরিভ্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দেশের দারিদ্র্য দুঃখ যেরূপ শোচনীয় আকার প্রাপ্ত হইতেছে তাহা ভাবিলে নৈরাশ্যে দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ত্রিপুরাবাসীর দারিদ্র্য

দারিদ্র্য মানুষের নৈতিক চরিত্রের মেরুদণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। উপবাসশীর্ণ পুত্র কন্যার মলিন মুখ দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া মানুষ ধর্ম্ম, নীতি ও আইনের বেড়ী বন্ধন ডিঙ্গাইয়া চুরি করিতেছে, সামান্য অর্থের লোভে পথিকের বুকে ছুরি বসাইতেছে, সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ও সহানুভূতির পাত্র যে প্রতিবেশী তাহার গৃহেই সিঁদ কাটিতেছে। ইহাই সমাজের সাধারণ স্তরের চিত্র। কিন্তু এই সাধারণ স্তরই সমাজ দেহের রক্ত, মাংস, এমন কি সবই। কৃষক ও শ্রমিক লইয়াই এর স্তর গঠিত। ত্রিপুরা জেলার কৃষক সমাজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই যে তাহাদের ভ্রাতা,

ভগ্নী বা পুত্র কন্যাগণ অন্নাভাবে উপবাসী থাকিবে এবং অর্থাভাবে বস্ত্র জুটাইতে পারিবে না। দেশের সম্পদ্ নানাভাবে শোষিত হওয়ার দরুণই এই প্রকার মর্ম্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা ছাড়া কৃষকগণ অতি প্রাচীন কালের প্রথায় কৃষিকর্ম্ম করিতেছে বলিয়াই ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি দিন দিনই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ বাসের ব্যবস্থা করার জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

ত্রিপুরার কৃষকগণের অর্থাভাবের অন্যতম প্রধান কারণ পাটের মূল্য হ্রাস। ত্রিপুরা পাট প্রধান জেলা, কিন্তু কৃষকগণ লক্ষ লক্ষ মণ পাট উৎপাদন করিয়াও গতরের খাটুনীর মজুরীও পাইতেছে না; সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের প্রতি প্রত্যেক দেশহিতকর্ম্মী ব্যক্তিরই মনযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আংশিকভাবে সফল হওয়ায় পাটের মূল্য কতকটা উঠিয়াছে। উক্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকমত গঠন করিতে পারিলে এবং বিশেষ বিবেচনা সহকারে একটা ন্যূনতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে গৃহস্থগণের অবস্থার কতকটা উন্নতি হইতে পারে।

জল প্লাবন ও কচুরী পানা

বর্ত্তমানে ত্রিপুরা জেলায় কৃষির দুইটি অন্তরায় জল প্লাবন ও কচুরী পানা। প্রায় প্রতি বৎসর গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলরাশি কৃষকের সর্ব্বস্ব প্লাবিত করিয়া দেয়। ত্রিপুরার উত্তর ও পশ্চিম সীমায় প্রায় প্রতি বৎসরই জলপ্লাবন গ্রামবাসীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। নৈসর্গিক কারণে ঘটিলেও ইহার প্রতিকার একেবারে অসম্ভব নয়। ইউরোপে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ সমুদ্রের জলে প্লাবিত হইত, কিন্তু সেই সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া এবং বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতিকারের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে নৈসর্গিক কারণও বিজ্ঞানের বলে আয়ত্তে আসিয়াছে। জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বরফ গলিয়া যে জলপ্লাবন ঘটিত তাহা বন্ধ করার জন্য নদী সমূহের উপনদী ও শাখানদী খনন করিয়া দিয়া সেই সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট জলপ্লাবন প্রতিরোধ করিয়াছেন। আমাদের জেলার গোমতীর বাঁধ, তিতাস নদীর অবরোধ, কুরুলিয়া খাল, উত্তর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্লাবন ও চাঁদপুরে মেঘনার ভাঙ্গন সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতিগণ নানা প্রকার পন্থার বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় কুরুলিয়া খাল দেশবাসীর প্রচেষ্টায়ই খনন হইয়াছে। বস্তুতঃ দশের চেষ্টায় কি না সম্ভবপর হয়? অল্প সংখ্যক লোকের একপ্রাণতা ও একাগ্রতা জগতে বহু বিস্ময়কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। এ বিষয়ে কোন বৃহৎ দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করিয়া এই ক্ষুদ্র বিষয়টীর প্রতিই আপনাদের স্মৃতি আকৃষ্ট করিতেছি!

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সন্নিকটবর্ত্তী কুরুলিয়া খালের বিষয় সম্ভবতঃ আপনারা এত শীঘ্রই বিস্মৃত হন নাই। উহা অবরুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত হইবার উপক্রম হইতেছিল এবং বহুস্থানের অধিবাসীবৃন্দ স্বাস্থ্যহীন হইতেছিল। কিন্তু খাল খননের জন্য যত টাকার প্রয়োজন ছিল সরকার হইতে তত টাকা পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার তদানীন্তন মহকুমা হাকিম মিঃ এন্, এম্, খাঁ

এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হইয়া নাছোরবান্দা স্বরূপ তৎপর হইলেন। মন্ত্রীভাবে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা হাকিম এবং আরও শত শত সরকারী ও বেসরকারী লোক উপস্থিত। মহকুমা হাকিম মাটি কাটিয়া ঝুড়ি ভরিলেন, আমি এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ঝুড়ি মাথায় বহন করিলাম। যে সকল ভদ্রসন্তান পুরুষানুক্রমে কখনও কায়িক শ্রম করেন নাই তাহারাও দেখাদেখি মাটীর ঝুড়ি মাথায় বহন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে সাধারণ কৃষকগণের মধ্যেও এই উচ্চভাব সংক্রামিত হইল। আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে ত্রিশ হাজার লোক নিজেদের গতর খাটাইয়া তিন মাইল লম্বা একটী খাল কাটিয়া ঐ অঞ্চলের দীর্ঘকালের একটী গুরুতর অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে হাজার বিঘা জমিতে ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা ও অধিবাসীবৃন্দের স্বাস্থ্যসম্পদও ফিরিয়া পাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে।

এই ভাবের প্রচেষ্টায় দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হইলে আমি মনে করি তিতাসের চরা কাটান এবং গোমতীর শাখা নদী খনন ইত্যাদি কোন কার্য্যই অর্থাভাবে অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত থাকিবে না।

সেইরূপ কচুরীপানা। ইহা অনেক চাষবাসযোগ্য উর্ব্বরা ভূমিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে। কৃষকগণ কচুরী পানার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া কেবলই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে এবং হা হুতাশ করিতেছে। এই কচুরী পানা ধ্বংস করার জন্য কৃষকদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ভাব জাগাইয়া দেওয়া একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য এইরূপ প্রচেষ্টা ব্যতীত এই ব্যাধির প্রতিকার দুঃসাধ্য।

আমরা যাহারা নিজদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে করি এবং কার্য্য ও বিষয়ান্তরে বিদেশে বাস করিতে বাধ্য হই, তাহারা যদি ছুটির সময়ে পল্লীতে গিয়া গ্রামোন্নতিমূলক কার্য্য সমূহের আদর্শ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক কৃষকদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্ম-চেষ্টার ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে কেবল পানা ধ্বংস নয়, ত্রিপুরার আরও বহু অভাব বিমোচিত হইতে পারে।

(আগামী বারে সমাপ্য

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনিক্ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্।

গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে যে সকল বীমা কোম্পানী ভারতীয় বীমা আইনের আমলে আসিয়া নানারূপ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সরকারী এ্যাক্চুয়ারীর আদেশ মত ভ্যালুয়েশন তৈরী করিয়া তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ দিতে দিতে হয়রাণ হইতেছে, ইউনিক তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কোনও কোনও কাগজে ইউনিকের বিরুদ্ধে রীতিমত দুরভিসন্ধিমূলক নানারূপ প্রচারকার্য্যও চলিয়াছিল। ইহার ফলে ইউনিকের ভবিষ্যৎ "কি হয় কি হয়" ভাবিয়া অনেকেই আতঙ্কিত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা দেশের এবং দশের কল্যাণ কামনা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহাতে আতঙ্কিত হইবারই কথা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং নির্ভীক, স্বদেশপ্রেমিক সলিসিটর কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় দ্বয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত ১৯১২ সালে ইউনিক প্রতিষ্ঠিত হয়; সেই হইতে আজ ২৬ বৎসর কাল নানারূপ অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়া ইউনিক সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও আপনার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক এই কোম্পানীতে জীবনবীমা করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রিমিয়াম দিয়া আসিতেছে; সুতরাং এইরূপ একটী প্রাচীন বীমা কোম্পানীর সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে খবরের কাগজের মারফতে যদি নানারূপ সন্দেহজনক সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকে তবে তাহা কি উদ্বেগের কথা নহে?

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইউনিক যেরূপ wreckless ভাবে খরচের মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছিল এবং বর্ত্তমান বীমা আইনের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সরকারী এ্যাক্চুয়ারীর আপত্তি করার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সরকারী এ্যাক্চুয়ারীর নিকট কৈফিয়ৎ দিবার মত কারণ উপস্থিত হওয়া এক কথা, আর কোম্পানী 'গেল গেল' বলিয়া রব তোলা এবং সেই অজুহাতে পুরাতন ঋণ মিটাইবার সুবিধা পাইয়া দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার কার্য্য চালানো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কোন কোম্পানীকে কোনও বিশেষ কারণে কিম্বা কোনও কারণ পরম্পরার জন্য হয়ত সরকারী এ্যাক্চুয়ারী কৈফিয়ৎ দিতে

আদেশ করিলেন; বহু বীমা কোম্পানীকে সদা সর্ব্বদা এইরূপ কৈফিয়তের তলায় কাজ করিতে হয়; কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে হইলেই সেই কোম্পানীকে যে "গঙ্গাজলী" করিতে হইবে ইহার কোন মানে নাই।

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে সরকারী এ্যাক্‌চুয়ারী ইউনিকের কর্ত্তৃপক্ষীয়-দিগের কৈফিয়তে আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং এ্যাক্‌চুয়ারীর নির্দ্দেশ মত ভ্যালুয়েশন প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছেন। আরও সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স ইষ্টার্ণ এজেন্সী কোম্পানী ইহার ম্যানেজিং এজেন্সী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ডিরেক্টরগণ স্বয়ং নিজহস্তে কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফল হাতেহাতেই দেখা দিয়াছে।

কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আমাদিগের নিকট যে বিবরণ সহি করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পাঠে জানা যায় যে ডিরেক্টরগণ কার্য্যভার গ্রহণ করার পরে কোম্পানীর Renewal প্রিমিয়ামের শতকরা মাত্র ২৩% পারসেণ্ট খরচ হইয়াছে; এই খরচের মাত্রা পূর্ব্বে ছিল শতকরা ৬২% পারসেণ্ট। কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার খরচ কমাইয়া ২৩% পারসেণ্টে নামাইয়া আনা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীদের অনেকের খরচের মাত্রা ২৫ হইতে ৩০ পারসেণ্ট পড়িয়া যায়। এক্ষেত্রে ইউনিকের খরচের মাত্রা ২৩% পারসেণ্টের মধ্যে আনা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই।

ইউনিক বহুদিন আগেই দুইলক্ষ টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী জমা দিয়াছে।

কোম্পানীর Assets বা সম্পত্তি বাড়াইবার জন্য ইউনিক বেহালার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক দিগের জন্য যে Colony বা নূতন নগর রচনা করিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী ১০০ বিঘা জমি লইয়া তাহার মধ্যে পাকারাস্তা, ড্রেন, আলো, নলকূপ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া জন সাধারণের মধ্যে জমি বিক্রয় এবং বিলি করিতেছেন।

বেহালা কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপর অবস্থিত। বেহালার Train Line হইতে এবং বেহালার স্কুল, পোষ্টাপিশ, থানা প্রভৃতি হইতে এই স্থানের ব্যবধান মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। বেহালা বরিষা কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার মধ্যে অতি প্রাচীন, বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী বলিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে যাতায়াতের জন্য ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, গাড়ী ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে; ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য ইংরাজী স্কুল, হাটবাজার, পোষ্টাপিশ, থানা, খেলার মাঠ, চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারী, সিনেমা ইত্যাদি কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। আমরা শুনিলাম এই সকল কারণে বেহালার জমি জন সাধারণের মধ্যে থৈ থৈ করিয়া বিক্রয় হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে কোম্পানীর তহবিল পরিপুষ্ট হইয়া উহার যে deficit বা ঘাটতি ছিল তাহা ক্রমেই পূরিয়া আসিতেছে।

নানারূপ সন্দেহাকুল এবং আশঙ্কাজনক অবস্থার মধ্য হইতে যাঁহারা ইউনিককে টানিয়া তুলিয়া উহার মধ্যে নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং উহার ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য নিজেদের সকল স্বার্থ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া বীমাকারী এবং অংশীদিগের ভবিষ্যৎ মেঘমুক্ত করিয়া দিলেন আজ আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

মডার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ্ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী

বিগত ৪৩ সালের বীমাবার্ষীকিতে এই কোম্পানীর নাম আমরা "Warning List" এ উঠাইয়াছিলাম এবং ইহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়া ছিলাম :—

"গত ১৯২৯ সালে কলিকাতায় এই কোম্পানিটি স্থাপিত হয়। গত ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সালে ইহার যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রতি বৎসরই যথাক্রমে ২২, ৩৬, ৩২ ও ২৫ হাজার টাকা লাইফ ফাণ্ডে ঘাটতি দেখা যায়। ৩১ সালে কোম্পানী তাহার সাড়ে নয় মাসের কার্য্যকলাপের যে বিবরণ গভর্ণমেণ্ট এ্যাক্চুয়ারীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রিমিয়াম আদায় হইয়াছে মাত্র নয় হাজার টাকা, অথচ খরচ হইয়াছে সাতাইশ হাজার টাকা। যেখানে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায় সেইখানেই বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠে। সম্প্রতি তিন হাজার টাকার একটী দাবী মিটাইতে বয়সের প্রমাণ সন্তোষজনক নহে এই অজুহাতে কোম্পানী দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার করে। এইজন্য হাইকোর্টে কোম্পানীর নামে এক মামলা রুজু হয়। জজ খরচা সমেত সম্পূর্ণ দাবীর টাকা ডিক্রী দিয়াছেন এবং রায়ে বলিয়াছেন যে বাদীপক্ষ বীমাকারীর বয়স সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ কোম্পানীর নিকট দাখিল করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট এবং এই প্রমাণের উপর দাবীর টাকা কোম্পানীর দেওয়া উচিত ছিল। কোম্পানীর প্রথম পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও কোম্পানী কোনও ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশ করে নাই।"

আমরা যখন বীমাবার্ষিকীতে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলাম তখন মডার্ণ ইণ্ডিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগের উপর খুব উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্য অতীব কঠোর এবং facts figures লইয়া Jngglery বা যাদু খেলা যায় না; সুতরাং ৪৪ সালে যখন ভারত গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর উপর নোটিশ জারী করিলেন এবং ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম্মের অংশীদিগের নামে মোকর্দ্দমা আনিবার হুমকী দেখাইলেন তখন সকলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কোম্পানীর এইরূপ সঙ্গীন অবস্থায় শ্রীহট্টের আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানী মডার্ণ ইণ্ডিয়ার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় বিজ্ঞাপনাদি ১৪ই এপ্রেল তারিখের আসাম গেজেট ও কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। আর্য্য ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী মডার্ণ ইণ্ডিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার সকল দায়ীত্ব গ্রহণ করায় আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশান্বিত হইলাম। ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমরা পরে বিস্তৃত বিবরণাদি প্রকাশ করিব।

মামলা মোকদ্দমা

ইন্সিওর কোম্পানীর আপীল ডিস্মিস্

হেমন্ত কুমার দাশ নামে এক ব্যক্তির পিতা এ্যালায়েন্স এণ্ড্ ষ্টার্টগাটার নামক ইন্সিওর কোম্পানীতে ৫০০০৲ টাকার জীবনবীমা করিয়াছিলেন এবং নিজের বয়স ৫৪ বৎসর বলিয়া জানাইয়াছিলেন। কোম্পানী তাঁহার ঠিকুজী দেখিয়া তাঁহার বয়স মিলাইয়া লইয়া বীমাপত্রে উক্ত বয়স ৫৪ বৎসর লিখিয়া তাঁহার নামে একখানি বীমাপত্র বিলি করেন। পরে বিধিমতে উক্ত হেমন্ত কুমার দাস বীমার পাওনা টাকা দাবী করিলে কোম্পানী এই বলিয়া তাহা দিতে অস্বীকার করেন যে, বীমাকারী তাঁহার বয়স ১০ বৎসর ভাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার যে filarial scrotum আছে তাহা তিনি জানান্ নাই। এসম্পর্কে দাবীদার মামলা রুজু করায় বিচারপতি মিঃ লর্ট উইলিয়াম কোম্পানীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন।

কোম্পানী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় বিচারপতি কষ্টেলো ও প্যাঙ্করিজের এজলাসে আপীল করে, কিন্তু মাননীয় বিচারপতিদ্বয় উক্ত আপীল খরচা সহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রায়ে বিচারপতিদ্বয় বলিয়াছেন যে, বীমাপত্রে একবার বয়স লিপিবদ্ধ হইয়া কোম্পানী ও বীমাকারী উভয়তঃ পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হইলে পর সে সম্পর্কে পরে আর আইনগত কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, দাবীদারের টাকা মিটাইবার পক্ষে বীমাপত্রে উল্লিখিত বয়সই চূড়ান্ত ও আইনসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রতারণার অভিযোগে কেরাণী অভিযুক্ত

ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ লুইসের এজলাসে ইণ্ডিয়ান পেপার পাম্প কোম্পানীকে বিশ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগে এস্, কে, মুখার্জ্জী; এস্, পি, ব্যানার্জ্জী ও এল্, কে, সেন নামক তিন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছেন।

মামলার শুনানীতে মিলের ম্যানেজার মিঃ জেমস্ ম্যাকেঞ্জী বলেন যে তিনি ১৯২৩ সাল থেকে উক্ত মিলের ম্যানেজার আছেন এবং এণ্ড্রু ইয়ুল, কোম্পানী উহার ম্যানেজিং এজেন্ট। আসামী এল, কে, সেন উক্ত মিলের একজন নিম্নপদস্থ কেরাণী এবং সে ৫।৬ বৎসর ধরিয়া কাজ করিতেছে। অপর দুইজন আসামী হইতেছে মিলের কণ্ট্রাক্টর। কিছুদিন হইতে তিনি অপর একজন কণ্ট্রাক্টর মিঃ বিশ্বাসের নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ শুনিতেছিলেন যে, মিঃ বিশ্বাস রেলওয়ে মালগাড়ীতে যে পরিমাণ মাল পাঠাইতেছিলেন তাহা তিনি পাইতেছিলেন না। ইহাতে তিনি মিঃ বিশ্বাসকে মালের ওজন লইবার জন্য মিলে আমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা একদিন মালের ওজন গ্রহণ করেন এবং তাহাতে ওজন কম দেখা যায়। এইভাবে ওজন লিপিবদ্ধ করিবার খাতা ঘাঁটাঘাঁটিতে দেখা যায় অপরাপর কণ্ট্রাক্টরদের মালের ওজনও ঠিকভাবে লিখিত হয় নাই। আসামী সেন উক্ত ওজনের খাতা রক্ষা করিত, ম্যানেজার মহাশয়ের সন্দেহ হওয়াতে তিনি উক্ত আসামীকে রেলের ওজনের হিসাব তালিকা আনিতে বলেন কিন্তু আসামী জবাব দেয় যে, তাহা পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে ম্যানেজার অপর উপায়ে রেল অফিস হইতে উক্ত হিসাব আনয়ন করেন এবং তাহার সহিত কোম্পানীর হিসাবে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয় এবং আরও দেখা যায় যে ওজনবইতে কাটাকুটি, পাতা ছেঁড়া ইত্যাদি রহিয়াছে। আসামী সে অপরাধ স্বীকার করে, ইহাতে ম্যানেজার মহাশয় তাহাকে বরখাস্ত করেন।

শুনানী মুলতুবী আছে।

ঘৃত ও চাউল ব্যবসায়ীকে প্রতারণার অভিযোগ

পুলিশ কোর্টের উত্তর বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাসের এজলাসে ঘৃত ব্যবসায়ী মোহনলাল সারোগী ও চাউল ব্যবসায়ী হংসরাজকে প্রতারণার অভিযোগে বঙ্কিম সাহা, পশুপতি বিশ্বাস, হীরালাল সাহা নামে তিন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীরা কুমারটুলীস্থ নিয়োগী লেনে বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা ও বঙ্কিম চন্দ্র সাহা কোং নাম দিয়া এক দোকান খুলে এবং ফরিয়াদীদ্বয়ের নিকট হইতে এই বন্দোবস্তে মাল গ্রহণ করে যে মাল বুঝিয়া পাইলে তাহারা টাকা মিটাইয়া দিবে। এইরূপে মাল গৃহীত হইলে পর আসামীরা ফরিয়াদীদ্বয়ের নিকট চেক্ পাঠায় কিন্তু উহা ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে গেলে তাহা ফেরৎ আসে। ইতিমধ্যে দেখা যায় যে আসামীরা পলাতক হইয়াছে কিন্তু পরে তাহারা ধরা পড়ে ও বিচারার্থ চালান যায়।

শুনানী মুলতুবী আছে।

নোটীশ
কলিকাতা কর্পোরেশন

গাড়ী ও ঘোড়ার ট্যাক্স
প্রথম বর্ষার্দ্ধ ১৯৩৮-৩৯

এতদ্বারা ঘোড়ার গাড়ী, জিন রিক্সা, রেসের ঘোড়া, ঘোড়া, পনি বা খচ্চর ইত্যাদির মালিকদিগকে বা ঐ সমস্তের ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে জানান যাইতেছে যে, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৭ (১) ও (২) ধারা অনুসারে তাঁহাদের নিজস্ব বা তাঁহাদের অধীনে যে সমস্ত গাড়ী বা পশু আছে, তাহাদের সংখ্যা, তজ্জন্য দেয় ট্যাক্স ইত্যাদি সম্বলিত বিবরণী, ১৯৩৮ সালের ১লা মে তারিখের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে তাঁহাদিগকে দাখিল করিতে হইবে। সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলেই ঐরূপ বিবরনীর মুদ্রিত ফরম পাওয়া যাইবে। আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ঐরূপ বিবরণী দাখিল না করিলে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগের ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। যাঁহারা স্ব স্ব আবাসস্থলে থাকিয়া ট্যাক্স দেওয়া সুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা ইন্‌স্পেক্টার তাগিদে গেলেই তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকা দিতে পারেন; তাঁহার সেইস্থানেই টাকা গ্রহণ ও লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা আছে। গাড়ী ব্যবহৃত হয় নাই—এই কারণ দর্শাইয়া ট্যাক্স মাপ পাওয়ার দাবী ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের পর গৃহীত হইবে না।

গো-মহিষাদির গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুসারে বর্ষার্দ্ধের জন্য গো-মহিষাদির গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন চল্‌তি বর্ষার্দ্ধের জন্য ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গো-মহিষাদির গাড়ী এবং হাতে-ঠেলা গাড়ীর (যাহা মানুষ বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় না) মালিকগণ অবিলম্বে তাঁহাদের গাড়ী রেজিষ্টারী করাইবেন। প্রত্যেক গাড়ী রেজিষ্টারী করার বাবত ৪৲ টাকা ফী দিতে হইবে। গাড়ীতে যে নম্বর প্লেট লাগাইয়া দেওয়া হইবে, তজ্জন্য প্রত্যেক স্থলেই আরও অতিরিক্ত এক টাকা হিসাবে লাগিবে।

গাড়োয়ানদের টিকিট

উক্ত আইনের ১৮৭ ধারা অনুসারে গাড়োয়ানদিগকে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত গাড়োয়ান হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দেওয়া টিকিট লইয়া চলিতে হইবে (উহা এমনভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে সকলে দেখিতে পায়)।

কুকুরের উপর ট্যাক্স

উক্ত আইনের ১৭৩ ধারা অনুসারে কলিকাতায় কুকুর পালন করিলে প্রত্যেক কুকুরের জন্য বার্ষিক ৫৲ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। কুকুরের মালিকগণ বা যাঁহাদের অধীনে কুকুর আছে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কুকুরের তালিকা ১লা মের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দাখিল করার জন্য এবং সেই সময় প্রত্যেক কুকুরের জন্য দেয় ট্যাক্স কর্পোরেশনে দেওয়ার জন্য বলা যাইতেছে। ফী দিলেই চল্‌তি বৎসরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং একটি নম্বর টিকিট দেওয়া হইবে, তাহা কুকুরের গলায় বগলেসে আঁটিয়া বা ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কোন কুকুরের গলায় ঐরূপ নম্বর টিকিট আঁটা না থাকিলে বা ঝুলান না থাকিলে উহা ধৃত হওয়া বা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী, সেক্রেটারী। ৪।৪।৩৮

কলিকাতার বাজার দর

ব্যবসা ও বাণিজ্য

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৮

সোনার দর

টাকশালবার		৩৪৸/০
বড়ালের		৩৪৸০
গিনি	একখানি	২২৸৶১০

রূপা—পাইকারী ও খুচরা

রূপা ১০০ ভরি	৪৯৶০
খুচরা	৪৯৶০

আটা ময়দা—প্রতিমণ

পেটেন্ট ময়দা	৫৸৶০—৬৲
সুপারফাইন	৫॥৶০ ৬৸০
সুজি	৫।০—৫।৶০
আটা বি	৫॥৶০—৫৸০
ঐ ২নং	৫॥৶০—৫৸০
ঐ এস	৫৲ - ৫৶০
আটা কে	৪।৶০—৪॥০
ঐ ৩নং	৩৸০—৩৸০

তৈল

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৬৶০—১৬॥০
ঐ খুচরা	১৭॥০ - ১৮৲
আশুমার্কা	১৫॥৶০
ঘানিমার্কা	১৫॥০
নারিকেল তৈল	১২৶০
রেড়ির তৈল	১৩৲—১৩।০

চাউল—প্রতিমণ

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৭৲—৭।০
বাকতুলসী	৫৲
নাগরা পুরাতন	৪৸০
ঐ নূতন	৪৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০
নূতন আতপ	৪।০—৪॥০
পেশোয়ারী	৯॥০—১০৲
বাঁকতুলসী আতপ	৫৲—৫৸০
ঐ মাঝারী	৪॥০—৫৲
পাটনাই আতপ	৪॥০
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

ঘৃত—প্রতিমণ

শ্রী—	৫'
ভারতী—	৫১৲
খুরজা—	৫২৲
সিকোয়াবাদ (খুরজা)—	৪৮
দেশলক্ষ্মী—	৪৬৲
বাঁদা সাগর—	৪১৲
অভয়া—	৫৮৲
বুটল	৪৩৲

চিনি

সাদা (১নং দোবরা)	৭।০—৭৸০
লাল (২নং দোবরা)	৬৸০—৭৲
কানপুর হাতোয়া	৮৸০
কানপুর সমস্তিপুর	৬।/১৫

মসলা—প্রতিমণ

হরিদ্রা	৯৲, ১০৲—১১৲
জিরা	১৫॥০, ১৭॥০, ১৯॥০
মৌরী	৬॥০—৭।১০
মরিচ	১৫।০, ১৬৲, ১৬॥০
ধনে	৪॥০, ৫৲, ৫॥০
লঙ্কা	১৮॥০, ২২॥০
সরিষা	৫৸০, ৭।০
মেথী	৬৸০, ৭॥০
কালজিরা	১০॥০, ১১৲
পোস্তদানা	১৩৲, ১৪৲
দেশী সুপারী	১৩॥০, ১৭৲
জাহাজী কাটা সুপারী	১১৸০, ১২৲
,, গোটা ,,	১১।০, ১১৸০
পিনাং কেশুয়া	৬৸০, ৭।০
পাল কেশুয়াদানা	৭।০, ৭৸০
জাবা কেশুয়া	৮৸০, ৯।০
১নং কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৭৸৶০, ৮৲
২নং কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫।৶০, ৬।০
ছোট এলাচ	৪॥০,—৫৲ সের
বড় এলাচ	৩৫৲, ৩৭৲, ৩৮৲
দারচিনি	১৪৶০, ১৫৲

লবঙ্গ	৬২৲, ৬৮৲
ধনের চাল	৬॥০, ৭॥০, ৮॥০
চন্দনী	৪৷০, ৫৷০ মণ
কর্পূর	৩৸০ সের

ডাল কলাই

	প্রতি মণ
অড়হর কানপুর	৬৷৵০ হইতে ৭৲
ঐ দেশী	৫৷০—৫৷৵০
থাঁড়ী মশুর	৪৷০—৫৷০
মশুর ডাইল পাটনাই	৪৷০—৫৲
ছোলার ডাল	৩৸৵০—৪৷৵০
মটর ডাল	৩॥০—৪৲
সোনামুগ	৫৷০—৬॥০
হালীমুগ	৪৷০—৫॥০
বিউলি কড়াই ডাল	৫৲—৫৷৵০
কাঁচা মুগের ডাল	৫৲—৫৷০
ভাজা মুগের ডাল	৬॥০—১০॥০
পাটনাই বুট	৩৷৵০—৩৸৵০
ঐ দেশী	২॥৵০—২৸৵০
সাদা মটর	৩৷৵০ ৪৷০
খেঁসারী ডাল	২৸৵০—৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার বাজার দর

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৮ সন, কলিকাতা।

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৲—৮৸০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৮॥০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম) ঐ	৮৷০—১০৲
বরগা (টী-আয়রণ)	৮৸০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৸০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন। জাপানী গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—১১॥০
২৬ গেজ—১২৸০
২৮ গেজ—

টীন প্লেন শীট।
৩০ গেজ ঐ পীস দর
৬ ফুট ১৵০
৭ ফুট ১৷৵০
৮ ফুট ১॥৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।
২৪ গেজ—১১৸৵০
২৬ গেজ—১২৸৵০
২৮ গেজ—

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট
২৪ গেজ ১২৸০
২৬ গেজ—

আর, পি, ডি, মার্কা ইং
২৪ গেজ—১৪৸৵০

করগেট ১২৫ বা তদূর্দ্ধ লইলে হন্দরে ৵০ আনা কম হইবে।
২৪ গেজ—১৬৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০	পীস—৷৵৫—৸৶০
গ্যাঃ কাটাতার ৫০০ গজ	বাণ্ডিল ১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা	৩৷০—৩৸০ মণ
পাটী কাটিং ৩ হইতে ৯ ফুট	হন্দর ৫॥০—৬৷০
ষ্টীল পাটী বোল্ট গরাদে	৬৸০—৭৷০
গোল রডরি ইনফোর্স কনক্রিটের জন্য	৬৸০—৭৸০
,, ,, ৶০—৷৶০ সূতা	৬৸০—৭৸০
,, টানা রড চৌকা ৶০—৷৵০	ঐ ৮॥০—১১॥০
,, বাণ্ডিল হাল (নূতন)	৮॥০—১০॥০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৯৲—৯৷০
,, চাদর ৩—১৬ খানি বাণ্ডিল	১॥০—১০৸০
ষ্টঃ ইস্পাত আসল—২৫৲	নকল—২৩॥০
চটকলের হাল মণ—৫৷০	গাঃ হাল মণ—৬॥০
তুলার হাল মণ—৪॥০	করগেট ছোট—৪৸০
গোল বোল্টু ধুরা বিদ করা	১॥০, ১৸০—৭৷০
চৌকা গরাদে ধুরা তৈঃ ১॥, ১৸ পীস	৩॥৵০—৪॥৵০
তারের পেরেক—১—৬ ইঞ্চি	১৪৷৵০
পেটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২॥০—১৯॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ৬নং সাট	১৷/১০—১৷৶১০
কোদাল ৪, ৫, ৬নং	৯৵০, ১০৵০ ডজন
তিন পাউণ্ড ৬৸৵০ দেঃ বিঃ	৭৷৵০ ,,
গ্যাঃ রিভিট বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২৸০—৭৸০
ঐ রিভিট ,, ৭—৮ ইঞ্চি	২৸০—৩৸০
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	১০৲
ঐ হালের লোহার সিট	২২৲
ঐ তেরেণ্ডা (কাঠের সিট)	২৪৲
লোহার স্ক্রুপ ॥০—৩ ইঞ্চি	৵১০—১৲ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩নং ১॥০—৪ ইঞ্চি	৷৵০—১৵০পেঃ ডঃ
গ্যাঃ তার ১৬—২২নং (গেজ)	১৫॥০ হন্দর
গ্যাঃ বোল্ট নট ৸০—৩ ইঞ্চি ৩×।	॥০—৸৵০ গ্রোঃ
ঢালাই রেলিং বাঃ সিড়ির জন্য	৬৲ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩—৪ ইঞ্চি	১৫—৷৵১০ ফুট
নূতন পাইপ পোষ্ট ২—৪ ইঞ্চি	৷৵০—১/১০
ঐ সেকেণ্ড কোয়ালিটি	৶১৫, ৸১০
কোলাপসিবল লোহার গেট স্কোয়ার ফুট	১৵০—১৶০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ।

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট,

লোহপটি, বড়বাজার, কলিকাতা।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ---১৩৪৫ { ২য় সংখ্যা

অন্ন সমস্যায় বৃটেন ও বাংলা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

শ্রীরামানুজ কর।

গ্রেট বৃটেন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের দেশ ছিল। বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানী করিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হইত। দেশে যে শস্য উৎপন্ন হইত, তাহাতে দেশবাসীর তিন মাসেরও আহার কুলাইত না। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হইত। ডিম, মাংস, পনিরও বিদেশ হইতে আমদানী হইত। গত মহাযুদ্ধের সময় জাহাজ গমনাগমনে নানা বাধা ঘটায় গ্রেট বৃটেনে খাদ্যাভাব হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ইউ-রোপের সকল দেশেই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা হইতেছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে যাহাতে খাদ্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়, সকল দেশেই সেইরূপ চেষ্টা হইতেছে। ইংল্যাণ্ডে দুগ্ধোৎপাদনের পরিমাণ চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বিদেশ হইতে দুগ্ধজাত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে পনিরের বদলে মাখনের কাটুতি বৃদ্ধি হইয়াছে। গত দু'বৎসরে উৎপন্ন মাখনের পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কাজে ১২ কোটী গ্যালন দুগ্ধের প্রয়োজন হয়। ইহাতে ৪ লক্ষ ৩১ হাজার হন্দর মাখন প্রস্তুত হয়। ১৯৩৩-৩৪ সালে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার হন্দর মাখন প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন একশত বৃহৎ কারখানা চলিতেছে, ক্ষুদ্র কারখানাও অনেক আছে। ১৯৩৩-৩৪ সনে ৩ কোটী

৪০ লক্ষ গ্যালন দুগ্ধ হইতে ১২ লক্ষ ১৬ হাজার হন্দর জমাট দুগ্ধ হইয়াছিল। ইহা বাজারে বিক্রীত দ্রব্যের শতকরা ৭৬ ভাগ ছিল। ১৯৩৫-৩৬ সালে ৫ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন দুগ্ধে ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার হন্দর জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা বাজারে বিক্রীত দ্রব্যের শতকরা ৮৭ ভাগ ছিল। গৃহে উৎপন্ন জমাট দুগ্ধের পরিমাণ ৬০ হাজার হন্দর বৃদ্ধি হইয়াছে। আমদানীর পরিমাণ ৪৫ হাজার হন্দর হ্রাস পাইয়াছে।

বাংলাদেশে লোকসংখ্যা ৫ কোটীর উপর। আবাদী জমির পরিমাণ ২ কোটী ৩৫ লক্ষ। ইহার মধ্যে ১ কোটী ৭০ লক্ষ একর জমিতে হৈমন্তিক ধান্য হয়। ৭০ লক্ষ একরে ভালই ফসল হয়। ৩ লক্ষ একরে ইক্ষু চাষ হয়। ৮৩ হাজার একরে চা হয়। স্কটল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষ। আবাদী জমির পরিমাণ ৪৮ লক্ষ একর। উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ৩ কোটী ৬০ হাজার পাউণ্ড। কৃষি কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১ লক্ষ। কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য অনেকগুলি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। লর্ড ম্যানসফিল্ড স্কটল্যাণ্ডের কৃষি চেম্বারের সভাপতি, বা কলের ডিউক, কণ্ট্রোজের ডিউক, লর্ড লোথিয়ান, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড লিনলিথগো, লর্ড ষ্টেয়ার, লর্ড কোচরান ও লর্ড রোয়ালন ইহার সহকারী সভাপতি। এদেশের জমিদার সম্প্রদায় কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কৃষির প্রতি বড়লোকের মনও আকৃষ্ট হইয়াছে। চিনির জন্য লিঙ্কণশায়ারে বিটের চাষ হইতেছে। অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বিট চাষে কৃষকগণের বৎসরে ১০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইতেছে। গত বৎসরে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে বার্ষিক গড় পড়তা উৎপন্ন আলুর পরিমাণ ৩১ লক্ষ ২০ হাজার টন। ১৯৩৬ সালে মূলজাতীর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৪৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টন ছিল।

এবার্ডিনে ব্যাপকভাবে শূকর ও গো-পালনের কাজ চলিতেছে। গত ১৯১৯ সাল হইতে এবার্ডিন হইতে লণ্ডনে ৯৮০০ টন গো-মাংস আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে ১৪ হাজার টন আমদানী হইয়াছে। চারিটী নিলামের আড়তে বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের গরু ও শূকর বিক্রী হয়। বালমোরাল এ এমারজেন্সী মেন্সএ রাজকীয় পশুশালায় গরু ও শূকর পালন হয়। ইংল্যাণ্ডেশ্বর স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করেন। এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নতধরণে পশুপালন হয়। গত বৎসর বড়দিনের সময় এই পশু-শালা হইতে ১৮টি গরু ও বাছুর এবং ৪টি মোটা শূকর এবার্ডিনে নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল। গরু বাছুর ১৮ টীর ৬৪৯॥ গিনি এবং শূকর ৪টী ৪৭ গিনিতে বিক্রয় হইয়াছে। গরুর মূল্য ৩৯ এবং শূকরের মূল্য ১৫ গিনি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বেকন ফ্যাক্টরীতে বৎসরে ২৫ লক্ষ শূকরের প্রয়োজন। পশুপালনে উৎসাহ দিবার জন্য গত বৎসর পর্য্যন্ত মোট ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষি কমিশনের সভাপতি হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। কৃষি কাজে ও পশুপালনে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের দেশের জমিদারদের মত একেবারে অজ্ঞ নহেন। এ দেশের জমিদারগণ জমির মালিক বলিয়াই গর্ব্ব অনুভব করেন।

কৃষি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। ১৯৩৫ সালে অগষ্ট মাসে বাঁকুড়া কলেজে দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের জন্য একটী সভা হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার উদয়চন্দ্র সভাপতি হইয়াছিলেন। এ জিলায় বর্দ্ধমান রাজার বিস্তৃত জমিদারী আছে। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার পৈতৃক জমিদারীতে বাকী খার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই। তিনি এইমাত্র বলিলেন যে, এ জিলায় ধান্য অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ হয়। কৃষকগণ ধানের বদলে অন্য ফসলের চাষ করিলে হয়ত দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে, কিন্তু ধানের বদলে কোন্ ফসলের আবাদ করিলে তাহাদের অন্নকষ্ট রোহিত হইবে তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই।

মিঃ আলেকজাণ্ডার সিমসনের পিতা ১৮৯৪ সালে এস সিমসন লিঃ নামে পুরুষের পোষাক সেলাইয়ের কারবার পত্তন করেন। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর মূলধন ৩।০ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে মিঃ আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার পরিবারের লোক এক লক্ষ পাউণ্ডের অংশীদার। বার্ষিক আয় ৬০ হাজার পাউণ্ড। পিকাডিলীতে ১ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে উক্ত কোম্পানীর পোষাক বিক্রয়ের জন্য আধুনিক বয়নের একটি দোকান খোলা হইয়াছে। এই নূতন কোম্পানী ৪ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ লইয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবসা বর্ত্তমানে লাভজনক হইয়াছে। নানা ফ্যাসানের রুচি অনুযায়ী পোষাক তৈয়ার করিতে পারিলে লাভ হয়। পুরাতন মামুলী প্রথায় দর্জ্জির কাজে আর লাভ নাই। এবিষয়ে মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে মোটর, বাস, সাইকেল প্রভৃতি প্রচলন হওয়ায় রবারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রেট বৃটেনে রবার চাষ হয় না। দক্ষিণ ভারত,
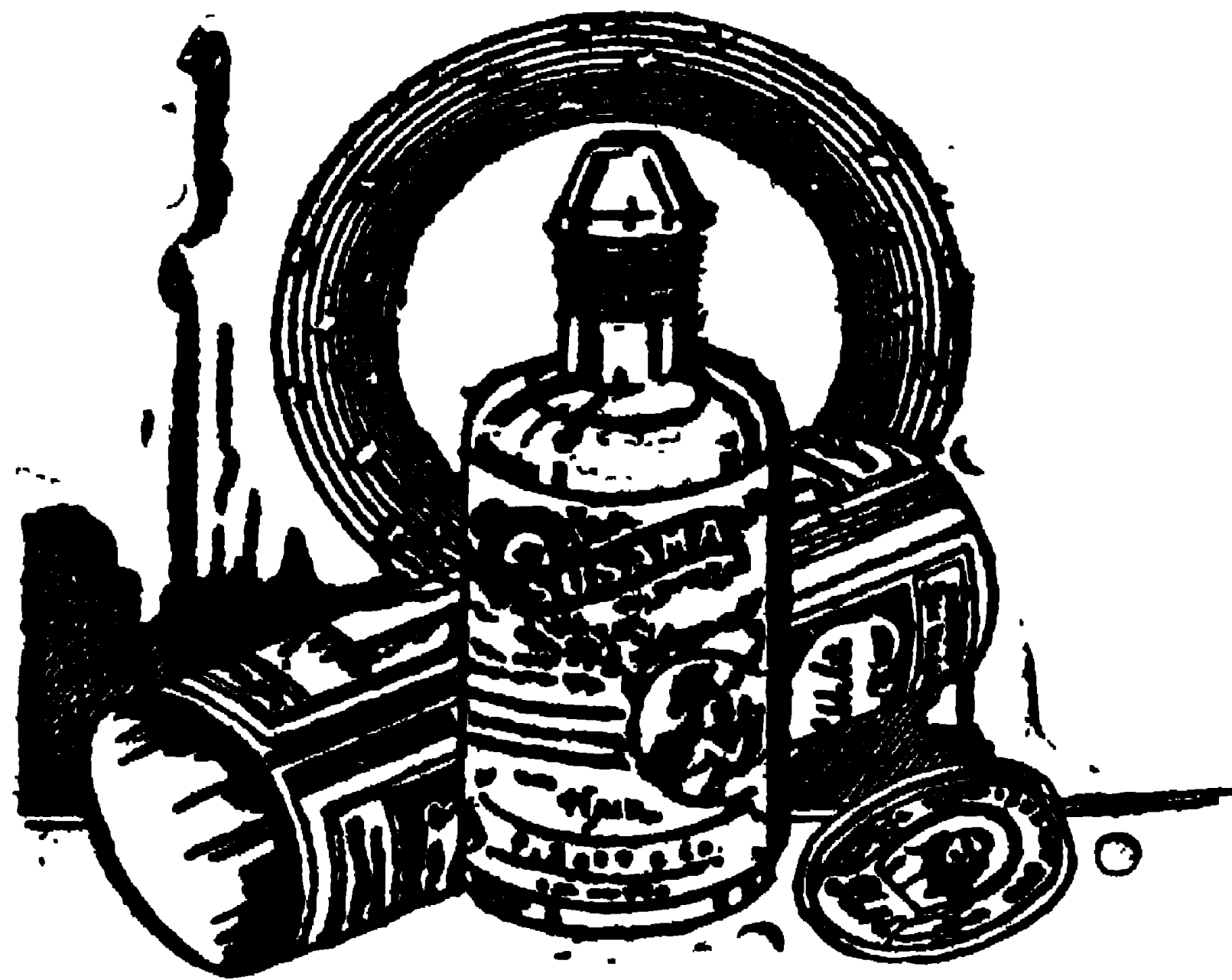
সিংহল, মালয়-প্রণালী-উপনিবেশ প্রভৃতি দেশে দ্রুত রবারের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে। এই রবারের চাষে ইংরাজ কোটি কোটি টাকা ঢালিয়া প্রচুর লাভ করিতেছে। গত বৎসর লণ্ডনে ব্যাডেনক রবার ষ্টেট ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে গঠিত হইয়াছে। মালয় দেশের কোদায় এই ষ্টেট অবস্থিত। ৭ হাজার একর জমিতে রবারের চাষ হইতেছে।

চায়ের প্রচলনও সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হইয়াছে। টী সোপ কমিটি সর্ব্বত্র চা প্রচলনের জন্য প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। যে সকল জেলায় কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় মদ্য বর্জ্জন বোহিত হইতেছে, সেই সকল জেলার গ্রামে গ্রামে চায়ের দোকান খুলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। মদ্য বর্জ্জন সফল হইলে চায়ের কাট্তি বৃদ্ধি হইবে।

বিলাতের গ্যাস কোইসাস লিঃ ডেয়ারীর যন্ত্রপাতির ইঞ্জিনীয়ারিং মূলধন ৫০ হাজার পাউণ্ড। বিলাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে দুগ্ধ দোহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোম্পানী এই সকল যন্ত্রাদি নির্ম্মান করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছে। গত ১৯৩৪ সালে ৪ হাজার, ১৯৩৫ সালে ৮ হাজার ৭ শত, ১৯৩৬ সালে ১৩॥ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছে। কোম্পানীর কাজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রেট বৃটেনের ডেয়ারীগুলিতে ৩৩ লক্ষ গাভী আছে। গড়পড়তা প্রত্যহ দেড় লক্ষ গাভী দুগ্ধ দেয়।

ডিক্টোগ্রাম টেলিফোন লিঃ ১৯১৪ সালে স্থাপিত হয়। টেলিফোনের দ্রব্যাদি নির্ম্মান করিয়া বিক্রয় করাই এই কোম্পানীর কারবার। গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডে ইহাদের যন্ত্র-পাতির কাটতি আছে। কোম্পানীর মূলধন ২ লক্ষ পাউণ্ড। গ্রেট বৃটেনের অধিকাংশ সহরে ইহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দোকান আছে। বিদেশেও ইহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। গত ১৯৩৬ সালে ২৬ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছে।

উলসওয়ার্থ কোম্পানী বহু ষ্টোরের মালিক। গত ১৯৩৬ সালে ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড লাভ হইয়াছে। অংশীদারগণ শতকরা ১২০ হারে লভ্যাংশ পাইয়াছে। ১৯৩৫ সালে একশত হারে লভ্যাংশ বিতরণ হইয়াছে।

আমাদের দেশে লোকের ধারণা হোটেল রেষ্টুরেণ্ট, ধোপানাপিত, দর্জ্জি, গো-পালন, কৃষি প্রভৃতি কাজে তেমন অর্থাগম হয় না। অর্থাৎ এই সকল ব্যবসায়ে বড়লোক হওয়া যায় না, কিন্তু বিলাতে এই সকল কাজেও অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন। এ, মিলার পশুপালনের কাজ করিতেন তিনি মৃত্যু-কালে ৫৬ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। পেশোয়ারের কৃষক এক বাকলী ২০ হাজার এবং এম, বাকলী ৭ হাজার পাউণ্ড, এবার্ডিন শায়ারের কৃষক এ, মার ৭ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। উইরল হোটেলের চেয়ার-ম্যান এইচ, উইলগন ৫০ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। অব্যবহার্য্য তুলাব্যবসায়ী ই, হুন্ট ৩০ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন।

সারের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অনেক বিচিত্র তথ্যের হদিস্ পাওয়া যায় এবং মনে এই বলে বিস্ময় জাগে যে ভারতবর্ষ এত বিভিন্ন জিনিস উৎপন্ন করতে পারে অথচ তার কোনটাই এদেশের কাজে লাগে না, কেবল পরদেশীয়দেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত হয়! এদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সারের ব্যবহার একপ্রকার নেই বললেই হয়, কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে করবার কোনই কারণ নেই যে, এদেশে সার বুঝি পাওয়া যায় না। বস্তুতঃপক্ষে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে সার উৎপন্ন হয়ে থাকে কিন্তু ভারতীয় চাষীদের সঙ্গতির অভাবে তা' এদেশে ব্যবহৃত না হয়ে বিদেশে চালান যায়। ভারতীয় চাষীরা পয়সার অভাবে গোবর, পাঁক, পচাপাতা ইত্যাদি দিয়েই অধিকাংশ সারের কাজ চালিয়ে দেয়। শুধু মাত্র চা-বাগানে ও কফির চাষে উপযুক্ত সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশীয় সার ছাড়াও সেখানে বিদেশ থেকে আমদানী কৃত ৫০২৯১৩ পাউণ্ড মূল্যের ৬৬ হাজার টণ পরিমাণ বিভিন্ন সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহার কারণ নির্ণয়ে বলা যায় যে, চায়ের চাষ ও কফির চাষের ভার দেশীয় দরিদ্র চাষীদের ওপর নেই, সে ভার ধনীদের হাতে আছে। এদেশীয় ও বিদেশীয় ধনিগণ চা-বাগানের মালিক হওয়ার দরুণ তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভাবে সার প্রদানের উপযোগীতা সহজেই বুঝতে পারেন এবং তাঁহাদের সামর্থ্য থাকার দরুণ তাঁরা সহজেই সার প্রদান কার্য্যে ব্রতী হ'ন। পক্ষান্তরে গরীব চাষীদের ইচ্ছা থাকলেও সঙ্গতির অভাবে তারা জমিতে সার প্রদানে সমর্থ হয় না। সেইজন্যই ভারতে উৎপাদিত সার অমন ভাবে বিদেশে চালান যায়, যেটা এদেশেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল।

ভারতে উৎপাদিত জান্তব সারের মধ্যে মৎস্য ও হাড় সম্ভূত সার প্রধান। এসম্পর্কে মালাবার উপকূলের মৎস্য হতে সার প্রস্তুত ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। নিম্নে আমরা মৎস্য সংক্রান্ত সার পদার্থের রপ্তানীর তালিকা দিলাম:—

বৎসর।	পরিমাণ।	মূল্য।
১৯১৩-১৪	১৬,২৮৪ টণ।	৬৪,০৪৪ পাউণ্ড।
১৯১৮-১৯	১৮,১৮৫ ,, ।	১,৪৩,৪১৫ ,,
১৯৩১-৩২	৫,৬৪৬ ,, ।	৪১,২০৫ ,,
১৯৩২-৩৩	৩,১৯৪ ,, ।	১৮,৫৬১, ,,
১৯৩৩-৩৪	৭,২২৭ ,, ।	৩৫,৭৩৩ ,,
১৯৩৪-৩৫	৬,৩৮৩ ,, ।	৩৫,৮৩৮ ,,
১৯৩৫-৩৬	৬,৩০৪ ,, ।	৩৩,২৪৯ ,,

উক্ত সার পদার্থের অধিকাংশই সিংহল এবং ষ্টেটস্ সেটল্‌মেণ্টস্ এ রপ্তানী হয়ে থাকে। এই বাণিজ্য ব্যাপারে বোম্বাই এবং বাংলার

প্রায় কোন অংশ নেই ; মাদ্রাজ, ব্রহ্মদেশ এবং সিন্ধুদেশই এই ব্যবসাকে অধিকার করে আছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে দক্ষিণ কানাড়ায় ৯ হাজার ৬ শত টন ও মালাবারে ৪ হাজার টন মৎস্য জাত সার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছিল। উক্ত সালে ইহার দর ছিল টন পিছু ১০ সিলিং থেকে ৩ পাউণ্ড।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ফরাসী দেশে ও বেল্‌জিয়ামে অস্থিচূর্ণের খুব চাহিদা ছিল, তা দিয়ে বোতাম, বোন্‌-ব্ল্যাক্‌ ইত্যাদি প্রস্তুত হত। হামবুর্গে ও তখন হাড়ের গুঁড়ো চালান যেত, লিভার পুল-এ চালান যেত উক্ত বস্তুরই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সংস্করণ। তা' দিয়ে সুপারফস্‌ফেট্‌ স্‌ তৈরী হত। যুদ্ধের সময় বাইরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার ফলেই দেশের মধ্যে উক্ত বস্তুর চাহিদা বাড়ে। এই জন্যই ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে ২১টি Bone Millএর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। কলগুলির মধ্যে মাদ্রাজে ৬টি, বোম্বাইতে ৫টি; বাংলায় ৮টি; যুক্তপ্রদেশে ১টি ও হায়দ্রাবাদে ১টি কারখানা বর্ত্তমান ছিল। মাদ্রাজের ৬টি কলে ৫৫৩ জন বোম্বাই-এর ৬টি কলে ১০০৯ জন, বাংলার ৮টি কলে ১৩৮৬ জন যুক্ত প্রদেশের ১টি কলে ২১০ জন ও হায়দ্রাবাদে ১টি কলে ৫৬ জন শ্রমিক কাজ করত। নিম্নে যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ও যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের উৎপাদনের একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল :—
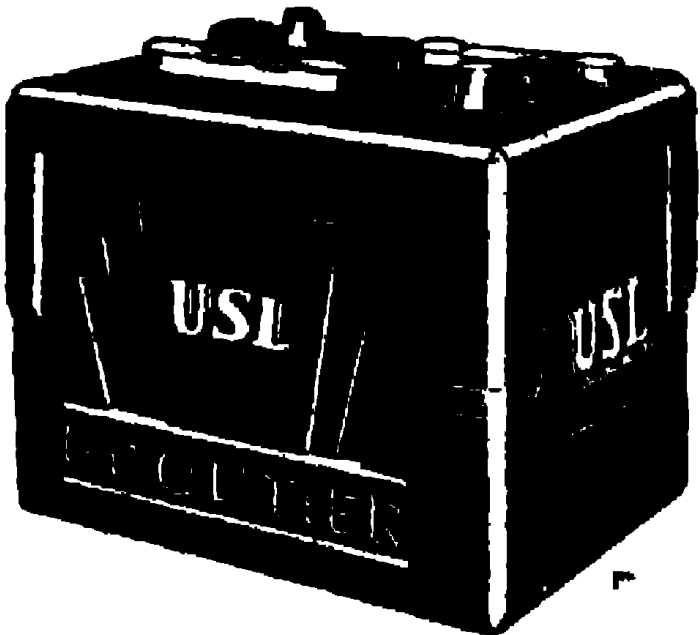
বৎসর।	পরিমাণ।	মূল্য।
১৯১৩-১৪	১০৫,৪১৩ টন।	৫২২,২২৩ পাউণ্ড।
১৯১৮-১৯	১৬,৭৩৪ ,,।	৮৪,৪০৯ ,,
১৯৩১-৩২	৩৭,৭৭৮ ,,।	১৭৪,০৬২ ,,
১৯৩২-৩৩	২১,৫৬৩ ,,।	১০১,১৯৪ ,,
১৯৩৩-৩৪	২৪,৮১৯ ,,।	১০৮,৬১৪ ,,
১৯৩৪-৩৫	৩৬,৪৭৪ ,,।	১৫১,৭৭১ ,,
১৯৩৫-৩৬	৪২,৮৯৪ ,,।	১৭৯,৯৫৮ ,,

যুদ্ধের পূর্ব্বে সার ক্রয়ের ব্যাপারে ভারত-বর্ষের প্রধান খদ্দের ছিল যুক্তরাজ্য, ফরাসীদেশ, বেলজিয়াম, জার্ম্মানী ও জাপান; যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের খদ্দের হচ্ছে যুক্তরাজ্য, সিংহল ও বেলজিয়াম। নিম্নে যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের সার রপ্তানী বাণিজ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অংশ গ্রহণের তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রদেশ।	যুদ্ধের পূর্ব্বে।	যুদ্ধের পরে।
বাংলা	৪৩,৩৩৭ টন।	১২,৯৫৯ টন।
বোম্বাই	২৫,৩৬৪ ,,।	১,৫১৪ ,,।
মাদ্রাজ	৯,৪২৫ ,,।	৪,৯৬৯ ,,।
সিন্ধু	২৫,৫০৬ ,,।	৪,২৬৭ ,,।
ব্রহ্মপ্রদেশ	১,৬৮১ ,,।	১,১৬০ ,,।

এ ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ হাজার টন শিং-এর গুঁড়ো রপ্তানী হয়, তার মূল্য হ'ল প্রায় ১২ হাজার পাউণ্ড। এই রপ্তানী বাণিজ্যে বাংলার বেশ মোটামুটি অংশ আছে, সিন্ধুদেশ ও বোম্বাই-এর বাংলার পরেই স্থান। খদ্দের হচ্ছে যুক্তরাজ্য ও জাপান।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সার হিসাবে সোরা বিদেশে চালান যায়। ১৯২৪ সালের হিসাব হতে এদেশে ৮,৫৪২ টন সোরা উৎপন্ন হয়েছিল। তন্মধ্যে কতকাংশ দেশে ব্যবহারের জন্য কাজে লাগে, বাদবাকী বিদেশে চালান যায়। ১৯৩৩ সালে ১,৮৯,৫৬৭ হন্দর পরিমাণ সোরা বাইরে চালান গেছল, তার মূল্য হচ্ছে ১,১৭,১৩৬ পাউণ্ড। যুক্তরাজ্য, সিংহল ও মরিসাস্‌ই এ সম্পর্কে প্রধান ক্রেতা। অপরাপর খনিজ সার দ্রব্যের মধ্যে সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ এ্যামোনিয়া, সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ পটাস, কেয়োনাইট্‌ ইত্যাদি প্রধান। নিম্নে সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ এ্যামোনিয়া উৎপাদনের ক্রমোন্নতির একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

বছর	পরিমাণ
১৯৩২	৯,৪৭৪ টন
১৯৩৩	৯৮৮৫ ,,
১৯৩৪	১১,৭৭৫ ,,
১৯৩৫	১৫,৩৯৮ ,,

১৯৩৪-৩৫ সালে ৩,০৫৩ টন মাল বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল, তার মূল্য হচ্ছে ১৯,৮৫১ পাউণ্ড। এই রপ্তানী বাণিজ্য একরকম বাংলারই হাতে, সিংহল হচ্ছে প্রধান ক্রেতা। রপ্তানীকৃত অপরাপর সারদ্রব্যের মধ্যে খইল, তিসি, রেড়ী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেকার সমস্যা

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা আজকাল আর একটি গুরুতর সমস্যা। প্রত্যেক দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে মধ্যবিত্ত সমাজ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই মধ্যবিত্ত সমাজ কৃষ্টী ও উচ্চ ভাবধারা এবং প্রতিভার ধারক ও বাহক। এই শ্রেণীর অপচয়ে সমাজ দেহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমাদের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শত শত শিক্ষিত যুবক বিষাদপূর্ণ বেকার জীবন যাপন করিতেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, চাকুরীর জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বিষাদক্লিষ্ট পিতা মাতার আনন স্মরণ করিয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া নৈরাশ্য পূর্ণ জীবনের অবসান ঘটাইতেছে। কেবলমাত্র চাকুরী দ্বারা এই বিরাট অভাব পূর্ণ হইবার নহে। এই জন্য চাই দেশময় শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলা। কিন্তু ইহা সহজ কার্য্য নহে। আমি মনে করি আমাদের মধ্যে যাহার যতটুকু সাধ্য আছে তিনি যদি তদনুসারে যোগ্যতা-সম্পন্ন বেকার যুবকদিগকে নানাবিধ কর্ম্মে ঢুকাইবার চেষ্টা করেন তবে বহু যুবকদিগের কর্ম্ম সংস্থান হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার ইহাও মনে হয় যে সভার কর্ম্ম সংস্থান বিভাগটী যদি বস্তুতঃ সভার সকল সভ্যের সহযোগীতা ও সাহায্য লাভ করে এবং সকলেই চতুর্দ্দিকে কর্ম্মের অনুসন্ধান করার জন্য শক্তি নিয়োগ করেন তবে বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য সংস্পৃষ্ট কার্য্যাদিতে অন্ততঃ শিক্ষানবীশ ভাবেও বহুসংখ্যক কর্ম্মান্বেষী যুবক প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। নবাগত যুবকদিগের মধ্যে নিতান্ত অভাবগ্রস্তদিগকে কিছু সময় ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য কিছু কিছু অর্থ সময় সময় দান না করিলে চলিবে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই বেকারগণের জীবন রক্ষার সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র দান (Dole) এর ব্যবস্থা আছে। তাহা আমরা এখনও কল্পনাও করিতে পারি না সত্য, কিন্তু এই কলিকাতা নগরীতে আগত কর্ম্মপ্রার্থী যুবক-দিগের মধ্যে নিতান্ত অসহায় যাহারা তাহা-দিগকে কিছুকাল রক্ষা করিয়া কোনো একটা কার্য্য শিক্ষা দিতে না পারিলে কর্ম্মসংস্থান হওয়া দুরূহ ব্যাপার। অবশ্য তাহাদের শ্রমে মর্য্যাদার হানি হয় না—এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া সর্ব্ব-প্রকার শ্রম করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। আমি জানি আমাদের জেলার গৌরব শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক সময়ে বহু যুবককে নানাবিধ কর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ও তাঁহার

বিভিন্ন ব্যবসা ও বিস্তৃত কারখানার সংস্রবে শত শত ত্রিপুরাবাসী যুবককে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য শিক্ষা দিয়া এক একটী সংসার প্রতি-পালনের উপযোগী করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বৌবাজারের পোসাক পরিচ্ছদ-কারবারে, চাঁদনী চকে, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে, বড়বাজার মশলা পট্টিতে ত্রিপুরার যে সকল ব্যবসায়ী ব্যবসা করিতেছেন তাঁহাদের ব্যবসার সংস্রবেও বহুশত ত্রিপুরাবাসী জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। আপনারা হয়ত সকলেই জানেন যে কলিকাতার ফার্পো, পেলেটী, গ্র্যাণ্ড হোটেল প্রভৃতি ভোজনাগার সমূহে এবং খিদিরপুর ডক ও সহরতলির বিবিধ কল কারখানাতে শত শত ত্রিপুরাসন্তান কর্ম্ম করিতেছে। সুতরাং কর্ম্ম-সংস্থান বিভাগ হইতে যদি বেকারগণের তালিকা সংরক্ষণ করিয়া উক্ত সকল স্থানে কিম্বা আরও বিভিন্ন দিকে তাহাদিগকে শিক্ষা নবীশ ভাবে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করা হয় তবে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই কথা অবশ্যই সত্য যে দিন দিন বেকার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতেছে চাকুরী তত সৃষ্টি হইতেছে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল দিকে লোকের কল্পনাও জাগে নাই, আজ সেই সকল দিকে বহুযুবকের অন্ন সংস্থান হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে কে কল্পনা করিতে পারিত যে শতাধিক ত্রিপুরা সন্তান কলিকাতা সহরে সঙ্গীতের চর্চ্চায় জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে? আবার কেইবা কল্পনা করিতে পারিত যে দেখিতে দেখিতে ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ কলি-কাতার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে একটির পর একটি শাখা স্থাপন করিয়া শিক্ষিত ত্রিপুরাবাসীর কর্ম্মশক্তি প্রদর্শনের সুযোগ করিয়া দিবে এবং কতকগুলি পরিবারের অন্ন সংস্থান হইবে? ত্রিপুরাবাসীর উদ্যমে কলিকাতায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধাদি প্রস্তুতেরবিরাট কারখানা, হোসিয়ারী, মিল, ইন্‌সিওরেন্স ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সুগঠিত হইতেছে। ত্রিপুরার ব্যাঙ্ক সমূহের অর্থে ঢাকায় কাপড়ের কল,

মিঃ এ, সি, সেন।

আসাম, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের চা বাগান পরি-চালিত হইতেছে। বাংলার সর্ব্বত্র ত্রিপুরা সন্তানের উদ্যম ও একাগ্রতা প্রসংশিত হইতেছে দেখিয়া আমি গর্ব্ব ও আনন্দ লাভ করি। আমার বিশ্বাস এই উদ্যোগী ত্রিপুরা সন্তানেরই আত্মীয় কুটুম্ব অথবা স্বজেলাবাসী কর্ম্মহীন বেকারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে বিলম্ব হইবে না, যদি সকলে চেষ্টা করি।

আজ কাল আর একটি সমস্যা বিকট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সাম্প্রদায়িক সমস্যা। আমাদের দেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মুছলমান ও হিন্দু পরস্পরের সহযোগীতা ও সাহচর্য্যে স্ব স্ব ধর্ম্মাচার অক্ষুন্ন রাখিয়া ঐক্য ও সখ্যের মধ্যে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মমতে ও আচার অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ বর্ত্তমান যুগের প্রগতিশীল নরনারী হইতে অধিক রক্ষণশীলই ছিলেন। সেই সময়ে মুছলমান ভূম্যধিকারিগণ হিন্দুকে দেবমন্দির প্রস্তুত করিতে এবং দেব বিগ্রহের পূজা অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহ কবিতে

নবাব ফারোকী সাহেব

নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। অপর পক্ষে হিন্দু ভূম্যধিকারিগণও মুছলমান-দিগের মস্‌জিদ, কবর খোলা প্রভৃতির জন্য স্থান দান করিয়া গিয়াছেন, সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কুমিল্লা সহরের উপরে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসখ্যাত সা সুজার মস্‌জিদ যেমন হিন্দু মুছলমান প্রীতির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে—নারায়ণপুরে মুন্সী হোসেন আলি প্রতিষ্ঠিত মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে কালীমন্দিরও তেমনই প্রীতি ও উদারতার সাক্ষ্য দিতেছে। আখাউরার সন্নিকটে খরমপুর দরগায় যেমন হিন্দুদের মধ্যেও কেহ কেহ উপস্থিত হইয়া সিন্নি দেয়, আরুয়াইল আখড়ায় তেমনই মুছললানের মধ্যেও কেহ কেহ কামনা করিয়া "মানসী" দেয়। আপনারা সকলেই হয়ত জানেন যে বিগত বৎসর আমাদের এই সভার পৃষ্ঠপোষক ত্রিপুরাধিপতি শ্রীযুত মহারাজ স্যার বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর আগরতলাতে মহারাজা মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি হিন্দুর বিবাহ উৎসবে আমাদের মুছলমান পরিবার হইতে মাছ, খাসী, পাঠা ও শিউলী গিয়াছে, আবার হিন্দু পরিবার হইতেও আমাদের মুছলমান পরিবারে উপঢৌকন ও শিউলী আসিয়াছে। এই প্রথা এখনও লুপ্ত হয় নাই। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ তাঁহাদের ধর্ম্ম মত, আচার সংস্কারগত পার্থক্য থাকা সত্বেও সহনশীলতা (toleration) ও মতসহিষ্ণুতা নিবন্ধন প্রীতি ও প্রেমের সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এই মাত্র আপনাদিগকে বলিতে পারি যে আমাদের কর্ত্তব্য দেশবাসীকে পরিষ্কার ভাবে এই সত্যটী বুঝিতে দেওয়া যে আমরা দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাস করিয়াছি এবং চিরকাল এক সঙ্গেই বাস করিব। গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিলে গোমতী হিন্দু ও মুছলমান প্রজা বিবেচনা করিয়া গৃহ বা জমি প্লাবিত করেনা; ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর বা বসন্ত সাম্প্রদায়িক গণ্ডী মানিয়া আক্রমণ ও ধ্বংস করে না।

কুরুলিয়া খাল খননে, মেঘনার পুল নির্ম্মাণে, তিতাসের অবরোধে কিম্বা মেঘনার ভাঙ্গনে, উভয় সম্প্রদায়ের ইষ্ট বা অনিষ্ট সমভাবেই হইতেছে, সুতরাং স্বার্থ উভয়ের সমান। কুমিল্লার কলেজে উভয় সম্প্রদায় শিক্ষা পাইতেছে; ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ও চাঁদপুরে কলেজ হইলেও উভয় সম্প্রদায়ই, শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইবে। সুতরাং উভয় সম্প্রদায় মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে যাহাতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে তজ্জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দু এবং মুছলমান এই সত্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

আমার আর একটী বিশেষ বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। সভা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই কলিকাতা নগরীতে একটী নিজস্ব আবাস গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছে। এইরূপ একটী আবাসগৃহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতি-গণ বিশদভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আবাসগৃহ নির্ম্মাণে আপনারা সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন, যেন অচিরে এই নগরীর বক্ষে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইতিহাসখ্যাত ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই কার্য্যের জন্য আমার সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমি পণ্ডিতও নই, বক্তাও নই; ত্রিপুরার একজন দীন সন্তান ও সেবক হিসাবে দেশের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যে সামান্য চিন্তা করিয়া থাকি তাহাই সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিলাম; আপনাদিগকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই এবং কোন প্রকার কর্ম্মতালিকা উপস্থিত করিবার প্রগল্‌ভতাও আমার নাই। ত্রিপুরার এই সুপ্রাচীন জনহিতকর অনুষ্ঠানের একজন নগণ্য সদস্য হিসাবে প্রবীণ, প্রাচীন, অভিজ্ঞ সুধীবৃন্দ আপনারা—আপনাদের নিকট শিক্ষালাভের জন্যই আজ আপনাদের সন্নিধ্যে আসিয়াছি।

উপসংহারে নিবেদন করিতেছি, সেবাই মানবের পরম ধর্ম্ম। সেবা দ্বারা মানুষের মন উদার হয় ও পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, এবং সেবা ধর্ম্ম মানুষের নৈতিক চরিত্রকে সুদৃঢ় করিয়া—আত্মার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। চিন্তা ও কর্ম্মের মূলাধার বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি—তাঁহার দয়া ও আশীর্ব্বাদে যেন আমাদের মন সেবা ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়।

বাংলা সরকারের বাজেট

১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য বাংলা সরকারের নতুন বাজেট প্রস্তত হইয়াছে। উক্ত বাজেটের আয় ব্যয়ের হিসাব সংক্ষেপে এইরূপ :—

আয়।

গত বৎসরের উদ্‌বৃত্ত ১,৯০,৮৪ হাজার টাকা।
রাজস্ব —১[illegible],১২,৭৩ ,,
ঋণ ডিপজিট্‌ প্রভৃতি—১৬,৭২,৯৬ ,,

ব্যয়।

রাজস্ব খাতে—১৩,২৪,২৭ হাজার টাকা
স্থায়ী কার্য্যে ২,৯৮ ,,
ঋণ ডিপজিট প্রভৃতির
জন্য—১৬,৮০,২৬ ,,
উদ্‌বৃত্ত— ১,৭৪,৯৮ ,,
রাজস্ব খাতে ঘাটতি ১১,৫৪ ,,
অন্যান্য খাতে ঘাটতি—৪,৩২ ,,
মোট ঘাটতি—১৫,৮৬ ,,

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আগামী বৎসরের (১৯৩৮-৩৯) বাজেট হইয়াছে ঘাটতির বাজেট। ঘাটতির বাজেট হওয়া কোন রকম ভয়াবহ বা দোষাবহ নহে, কংগ্রেসী শাসিত কোন প্রদেশেও ঘাটতির বাজেট রচিত হইয়াছে। কিন্তু যে কোন রকম বাজেটই হউক না কেন তাহার ফল কল্যাণকর হওয়া চাই। সে হিসাবে দেখিতে গেলে বাংলা সরকারের বাজেটে অভিনবত্ব কিছুই নাই। পূর্ব্বাপর বাজেটের তুলনায় নূতন বাজেটে কোন কোন বিভাগে কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার আভাষ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহাতে নীতি হিসাবে বাজেট রচনার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় না। বাংলা দেশের অধিবাসীদের ট্যাক্সের বোঝা কিছুমাত্র কমে নাই; বরং তামাক প্রভৃতি গুটি কয়েক দ্রব্যের উপর আরোপিত ট্যাক্সের মেয়াদান্তে তাহা চিরস্থায়ী করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং নূতন করিয়া অতিরিক্ত শিক্ষাকর যে ধার্য্য হইবে তাহা একরূপ নিশ্চিত। পক্ষান্তরে গুটি কয়েক লোককে চাকুরি দিবার ব্যবস্থা করা ছাড়া বাজেটে জনসাধারণের কল্যাণ করিবার কোন ব্যবস্থাই সূচিত হয় নাই, বাংলাদেশের অধিবাসীবৃন্দ এই বাজেটের কল্যাণে নূতন করিয়া কিছুমাত্র লাভবান হইবে না। এমতাবস্থায় আগামী বাজেটকে আমরা 'বিপ্লবমুখী' বলিয়া অভিহিত করিতে পারিলাম না, আমরা মাননীয় অর্থ সচিবের নিকট হইতে আরও অনেক কিছু আশা করিয়াছিলাম।

কয়েক মাস পূর্ব্বে এই 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র পৃষ্ঠায় বাংলা সরকারের গত বাজেটের সমালোচনা করিবার আমাদের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন আমরা প্রধানতঃ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, বাংলা দেশের পক্ষে আজ প্রধান সমস্যা হইল এখানকার অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতাহীনতার সমস্যা।

আর্থিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই ক্রয়-ক্ষমতাহীনতা একটি শোচনীয় ব্যাপার ; ইহারই জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে ঐ ব্যাপারই ঘটিয়াছে। পণ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক পড়িয়া যাওয়ার দরুণ দেশের, সকল শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহারই ফলে কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফেল পড়িতেছে, কেহ কেহ বা লোক ছাঁটাই করিতেছে। সেই জন্যই দেশের বেকার সমস্যা আরও প্রবল আকার ধারণ করিতেছে।

দেশের ঐ দুরবস্থা দূরীভূত করিবার জন্য আমরা গতবারে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, অবিলম্বে নিম্নলিখিত বিষয় দু'টির প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক :— প্রথমতঃ, দেশের পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির আয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির

ব্যবস্থা। পূর্ব্বেরটী সাধিত হইলেই যে পরেরটি স্বতঃই সাধিত হইবে সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। পণ্যমূল্যের মধ্যে কৃষিজাত পণ্যমূল্যই প্রধান। এগ্রিকাল্‌চারাল্ ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট্ ও মার্কেটিং বোর্ড গঠন দ্বারা এই কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সরকার অবশ্যই বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে। আমাদের অভিমত হইতেছে যে, হ্যাঁ, আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহাকে আরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা দরকার। বড় বড় এক্স্‌পার্টদের দ্বারা নীতি নির্ণীত হয় সত্য কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্ল্যান কার্য্যকরী হয় না। তজ্জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে ছায়া চিত্রযোগে প্রচার কার্য্য আবশ্যক ও ও অন্ততঃ ইউনিয়নে ইউনিয়নে শাখা-কার্য্যালয় থাকা দরকার। আমাদের দেশে বিঘা পিছু ফসলের পরিমাণ অত্যন্ত কম; তাহার অনেক কারণ আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা আমরা যদি বর্ত্তমান জমিতে বিঘা পিছু বেশী ফসল ফলাতে পারি তাহা হইলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায়। এই আয় বৃদ্ধির ব্যাপারটা সামান্য নয়; ইহার প্রতিক্রিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উপর ছড়াইয়া পড়ে। এবং তাহার ফলেই ব্যবসা বাণিজ্য চালু থাকার দরুণ দেশের বেকারের সংখ্যাও হ্রাস পায়। আমাদের দেশের বেকার দুই রকমের হইয়া থাকে :—

(১) পল্লীগ্রামের বেকার।

(২) সহরে বেকার।

কৃষিকার্য্য ভালভাবে চালু হইলে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে পল্লীগ্রামের বেকাররা কাজ লাভ করে। পল্লীগ্রামের লোকের অবস্থা ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ পত্রের চাহিদা বৃদ্ধি হেতু সহরের শিল্প বাণিজ্যও উন্নীত হয় এবং তদ্দরুণই সহরের বেকাররাও কাজ লাভ করিতে পারে।

আমরা উপরে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিলাম, বাজেটে তাহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, অথচ ইহারই প্রয়োজন ছিল। কৃষি বিভাগে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ঢাকায় এগ্রিকাল্‌চারাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠার জন্য ও বিভিন্ন গ্রামে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ১৬ হাজার টাকা এবং মেদিনীপুরে জেলা কৃষিশালা প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৯ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। কৃষি সম্বন্ধীয় প্রচার কার্য্যের জন্য ৬ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। মোটমাট অন্যান্য ব্যাপার লইয়া কৃষি খাতে ৯২ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা কি সমুদ্রে বারি বিন্দুর তুল্য নয়? ইহার দ্বারা প্রজা সাধারণের কি উপকার সাধিত হইতে পারে? অবশ্য একটা সুখের বিষয় এই যে, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে।

বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত নয় বলিয়াই হয় ফসল একেবারে হয় না, নয় ত প্লাবনের জন্য ফসল হাজিয়া যায়। ইহার একটা সুব্যবস্থা করার রীতিমত প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেচ সার্ভের জন্য মাত্র ৫৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাংলাদেশের নদী নালা ও বড় বড় খাল বিল এক বিশিষ্ট সম্পদ, ইহাতে মৎস্য চাষ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করিলে প্রভূত অর্থাগম হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ নদী ও খাল বিল মজিয়া থাকার দরুণ

দেশের একটি বিশিষ্ট সম্পদ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অচিরে তাহার যে সুসংস্কার প্রয়োজন সেটা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই ব্যাপারে মাত্র ২॥ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে বহু ব্যাপারেই এই রকম দানের অকিঞ্চিৎকরত্ব বর্ত্তমান। বাংলা দেশে গড় পড়্‌তা প্রতি বৎসর ৩॥ লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ঘটে; অথচ সেই ম্যালেরিয়া নিধনের জন্য মাত্র কিঞ্চিদধিক ২॥ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পল্লী বাংলার স্বাস্থ্য যে কতখানি হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহা কাহাকেও বোধ করি বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, অথচ গ্রাম সমূহের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য মাত্র ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে!

ইহাই হইল বাজেটের আসল স্বরূপ। ইহাতে সবই আছে কিন্তু দেশের লোকের 'ডালভাত' সমস্যার সমাধান নাই, অথচ সেই-টারই ত অগ্রে প্রয়োজন ছিল। মাত্র একটা ব্যাপারের জন্য আমরা মাননীয় অর্থসচিবকে অভিনন্দিত করিতেছি, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বাজেট কার্য্যকরী হইলে ৫২৮২ জন লোক কাজ পাইবে বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু বাদ বাকী লক্ষ লক্ষ বেকারের কি হইবে সেই প্রশ্নটা আমরা সবিনয়ে মাননীয় অর্থসচিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

আর্থিক সংবাদ

ভারতীয় "কমার্সিয়্যাল্ ইন্‌টেলিজেন্ট ও ষ্টাটিস্‌টিকস্ পরিষদ" এর সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ৬৭টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে ; উহাদের সমষ্টিগত মোট মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে ৮৮টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের সমষ্টিগত মোট মূলধন ছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সালে অর্থাৎ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ সময় ১০৩টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের সমষ্টিগত মোট মূলধন ছিল ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। উক্ত নতুন রেজেষ্ট্রিকৃত কোম্পানী সমূহের মধ্যে বিহারের ইণ্ডিয়ান সিমেণ্ট্ ও পেপার মার্কেটিং কোম্পানীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেবলমাত্র উহারই মূলধন হইতেছে ১ কোটি টাকা।

উক্ত অক্টোবর মাসে ২৪টি কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে, উহাদের সমষ্টিগত মোট মূলধনের পরিমাণ হইল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

উক্ত মাসে ভারতে প্রচলিত জয়েণ্ট্ ষ্টক্ কোম্পানী সমূহের মঞ্জুরীকৃত মূলধন, বিক্রীত মূলধন ও প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৮ লক্ষ, ৭২ লক্ষ ও ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এবারকার কেন্দ্রীয় কমিটির বাজেটে চেকের উপর ষ্টাম্প ডিউটি প্রস্তাবিত হইয়াছিল। ইহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তরফ হইতে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী ১৯২৭ সালে উক্ত ডিউটি উঠিয়া যায়—উহার উদ্দেশ্য ছিল এদেশে ব্যাঙ্কিং কার্য্যে উৎসাহ দান করা। ব্যাঙ্কিং এনকুয়ারী কমিটিও ষ্ট্যাম্প ডিউটী তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তা' সত্ত্বেও ১৯৩৩-৩৪ সালের বাজেটে উহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা হয় ; কিন্তু সেখানেও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিবাদে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এবারেও জনমতের চাপে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তবুও বারে বারে জনমতের বিরোধিতা করিবার সরকারের এ প্রচেষ্টা কেন ?

গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্সের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা মিঃ এম্, এল্, সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নতুন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

সভাপতি—মিঃ এ, আর, দালাল (টাটা কোং) সহঃ সভাপতি—মিঃ জি, এল, মেটা (সিন্ধিয়া নেভিগেসন্) সহঃ সভাপতি—জে, কে, পুরোহিত (মেসার্স্ বাটলিবয় এ্যাণ্ড পুরোহিত)

সদস্যগণ—মেসার্স এম্, এল্, সাহা; বি, এম্; বিরলা; এ, এল্, ওঝা; ডি, পি, খৈতান; এন্ এল্, পুরী; কে, এল্, জেটিয়া; লালা করমচাঁদ থাপ্পার; সাবু, বদ্রীদাশ গোয়েঙ্কা; ফৈজুল্লা গাঙ্গজী; বি, ডি, ভাট্টার; কাসিম এ মোহাম্মদ; এম, জি, ভগৎ; প্রাণজীবন জেঠিয়া; এন্, এন্, খ্যাণ্ডেলওয়াল; দেবেশচন্দ্র ঘোষ; এ, এন, ঝাঝারিয়ার, আর, এস, সিংহী; মাংটুরাম জয়পুরিয়া।

গত জানুয়ারী মাসে ভারত গভর্ণমেণ্টের 'সি এ্যাণ্ড্ ল্যাণ্ড্ কাষ্টমস্ রেভেন্যু এর মোট আয় হইয়াছে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে লবণ শুল্কজনিত আয় ধরা হয় নাই। ডিসেম্বর মাসে উক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৭ সালের অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের জানুয়ারী মাসে উক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দশ মাসে উক্ত শুল্ক খাতে আয় দাঁড়াইয়াছে ৪৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত সময়ের আয়েব পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। দেখা যাইতেছে এই বৎসর আয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। উপরোক্ত আয়ের মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ পাওয়া গিয়াছে ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ পাওয়া গিয়াছে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, আবগারী হইতে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন দফা হইতে ৫১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

বোম্বাই চেম্বার অব্ কমার্সের বিবরণী হইতে তুলা রপ্তানীর একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে। গত তিন মাসে ভারত হইতে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ তুলা রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

বিলাতে	২৭,৩৮২	গাঁইট্
ইউরোপের অন্যান্য দেশে	৯৮,৪২৭	,,
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৭,৫৭০	,,
চীনদেশে	২৮,২২৩	,,
জাপানে	৫৩,৮৯৪	,,
অপরাপর দেশে	৪,০২৪	,,
মোট	২১৮,৫৮০	,,

উপরোক্ত হিসাবের সঙ্গে পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব মিলাইলে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময় মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫৭৭, ২০৮ গাঁইট্।

ভারতীয় লৌহ উৎপাদনের ব্যাপারে টাটা কোম্পানীর স্থান সর্ব্বোপরি সুপ্রতিষ্ঠিত। বিগত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিন মাসে উক্ত কোম্পানীর উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

পিগ্ আয়রণ	২৫১,৯০০	টন।
ষ্টীল্ ইঙ্গট্	২৩২,১০০	,,।
সেমি ফিনিস্ড ষ্টীল	৩৪,৫০০	,,।
ফিনিস্ড্ ষ্টীল	১৩৪,৪০০	,,।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে কোম্পানী প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছে।

এই বছরের জানুয়ারী মাসে ১ কোটি ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকার পোষ্ট্ আফিস ক্যাশ্ সার্টিফিকেট্ বিক্রীত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে জানুয়ারী মাসে উক্ত বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৯৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এবং ১৯৩৬ সালে জানুয়ারী মাসে উক্ত বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভাবতবর্ষে যে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নিত্য নূতন কোম্পানী পত্তনের হিসাব হইতে বোঝা যায়। সম্প্রতি যে সমস্ত নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়েব একটা তালিকা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

দি কেমিক্যাল্ কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ।

আফিস—১৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা।

মূলধন—২ কোটী টাকা।

উদ্দেশ্য—কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদন

ল্যাংরিন্ সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী লিঃ।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সিমেণ্ট ট্রেডিং কোম্পানী।

আফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—সিমেণ্ট, চূণ ও পাথরের ব্যবসা।

বেঙ্গল অটোমবিল্ ওনার্স কর্পোরেশন লিঃ।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—এন্, এন্, দে এণ্ড কোং লিঃ।

আফিস—১৪, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—পেট্রোল্ ও মোটর সরঞ্জামের ব্যবসা।

মতি প্রেস লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এফ্, ডি, চন্দ্র।

আফিস—৫০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—মুদ্রণ কার্য্য।

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—ইষ্টার্ণ কর্পোরেশন লিঃ।

আফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—নানাপ্রকাব সিমেণ্ট উৎপাদন।

দি বেঙ্গল হেল্থ্ এ্যাণ্ড কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস লিঃ।

এক্স্ অফিসিও ডিরেক্টর—ডাঃ হরিপদ সরকার।

আফিস—৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—২ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—কেমিক্যাল, ড্রাগ ও সুগন্ধীদ্রব্য উৎপাদন।

হিন্দুস্থান কটন মিলস্ লিঃ।

ডিরেক্টর—আর, কে, চৌধুরী।

আফিস—১৪।৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—সূতা ও বস্ত্রাদি উৎপাদন।

কালিকা প্রেস লিঃ।

ডিরেক্টর—এম, চক্রবর্ত্তী।

আফিস—২১, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—মুদ্রণকার্য্য ও পুস্তক প্রকাশ।

কালিকা টাইপ্ ফাউণ্ডারী লিঃ।

ডিরেক্টর—এম, চক্রবর্ত্তী।

আফিস—পি ৪০, মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা।

মূলধন—২ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—ছাপার টাইপ ও সরঞ্জাম প্রস্তুত।

ছোটনাগপুর সিউইং মেসিন কোম্পানী লিঃ।

ডিরেক্টর—জে, কে, দত্ত।

অফিস—৬সি, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা।

মূলধন—২ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—সকলপ্রকার সেলাই কলের ব্যবসা পরিচালন।

রস্ পেটেন্ট্ ইকুইপ্‌মেন্ট্‌স্ লিঃ।

ডিরেক্টর—শ্রীযুত আলামোহন দাস।

আফিস—৩৭, ষ্ট্রাণ্ড্ রোড, কলিকাতা।

মূলধন—৫ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—লৌহ ঢালাই ও ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ।

দি রিয়াল রাণীগঞ্জ কোল কোম্পানী লিঃ।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—ঝুণ ঝুণওয়ালা এণ্ড কোং।

আফিস—রাণীগঞ্জ।

মূলধন—৩ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—কয়লাখনি পরিচালন।

সুন্দরদাস এ্যাণ্ড কুমার লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—সুন্দরদাস।

আফিস—১০৩।৭, প্রিন্সেপ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—সঙ্গীতযন্ত্র, গ্রামোফন, রেডিও ইত্যাদির ব্যবসা।

দি ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল রিভার সার্ভিস লিঃ।

ডিরেক্টর—মোহনলাল বৈদ্য।

আফিস—৩০, কটন ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

মূলধন—৫ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির ব্যবসা পরিচালন।

দোস্ত মোহম্মদ এষ্টেট্ লিঃ।

ডিরেক্টর—মহম্মদ রফিক্।

আফিস—১৯, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—সম্পত্তি ও জমিদারী ক্রয় বিক্রয় লীজ্, ভাড়া ইত্যাদি।

ন্যাশন্যাল্ ডিস্কাউণ্ট্ লিঃ।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—জি, ডি, লয়ালকা এ্যাণ্ড কোং।

আফিস—৯, রয়াল্ এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

মূলধন—৫ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—কোম্পানীর কাগজ, সেয়ার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়।

ভারত ন্যাশনাল্ প্রভিডেণ্ট্ বীমা কোং লিঃ।

ডিরেক্টর—পি, ডি, হিম্মৎসিংকা।

আফিস—১১৮ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ; কলিকাতা।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—প্রভিডেণ্ট্ ইন্সিওরেন্স্।

পপুলার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেডিং কোং লিঃ।

ডিরেক্টর—অনঙ্গ মোহন সাহা।

আফিস—চৌমুহনী, নোয়াখালী।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—সাধারণ ব্যবসাকার্য্য পরিচালন।

ঝাওর ব্রাদার্স লিঃ।

ডিরেক্টর—গিরিধারিলাল ঝাওর।

আফিস—লালমণিহাট, রংপুর।

মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—জেনারেল মার্চ্চেণ্ট ও কমিশন্ এজেণ্ট।

কে, সি, কোঠারী এণ্ড কোং লিঃ।

ডিরেক্টর—কে, সি, কোঠারী।

মূলধন—৫ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালনা।

কোঠারী এ্যাণ্ড সুখানী কোং লিঃ।

ডিরেক্টর—কে, সি, কোঠারী।

মূলধন—৫ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালন।

দি ক্যালকাটা সণ্ট্ ওয়ার্কস্ লিঃ।

ডিরেক্টর—ডি, এম্, মেহতা।

আফিস—৮৪-এ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

মূলধন—৩ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—লবণ উৎপাদন।

লাধা সিং বেদি এণ্ড্ সন্স্ লিঃ।

ডিরেক্টর—এস্, অনুপ সিং বেদী।

আফিস—ষ্টিফেন্স্ হাউস, কলিকাতা।

মূলধন—২ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালনা।

কেশরী লিঃ।

ডিরেক্টর—ধীরেন্দ্র নাথ বসু।

আফিস—৭, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

মূলধন—২ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য—সংবাদপত্র প্রকাশ ও মুদ্রন কার্য্য।

এইখানে একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে, নূতন কোম্পানী সমূহ জন্ম নিলেও গত অক্টোবর মাসে ৯৬টি, কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে।

বাংলাদেশে লবণ শিল্প ও লবণের ব্যবসায়

বাংলাদেশের গবর্ণমেণ্ট ২৪ টী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ৭ জন লোককে লবণ তৈয়ারী করার জন্য অস্থায়ীরূপে অনুমতি দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪টী মাত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১৯৩৬-৩৭ সালে লবণ শিল্পের কারবার করিয়াছিল। এই চারিটী কোম্পানীর নাম এই,—

(১) প্রিমীয়ার সল্ট্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড; মেদিনীপুর।

(২) বেঙ্গল সল্ট্ কোম্পানী লিমিটেড; মেদিনীপুর।

(৩) পাইয়োনীয়ার সল্ট্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী লিমিটেড; ২৪ পরগণা।

(৪) চিটাগং ট্রেডিং ইউনিয়ন্ লিমিটেড; চট্টগ্রাম।

প্রিমীয়ার সল্ট্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর গোলায় পূর্ব্ব বৎসরের অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৬ সালের ২৯০ মণ লবণ মজুত ছিল। ঐ কোম্পানী ১৯৩৬-৩৭ সালে ১১২৩ মণ লবণ প্রস্তুত করে এবং ১১৫০ মণ বিক্রয় করে। ২৬৩ মণ লবণ জোয়ারের জলে ধুইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

বেঙ্গল সল্ট্ কোম্পানীর গোলায় পূর্ব্ব বৎসরের ১৪২ মণ ১০ সের লবণ মজুত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ১২০ মণ লবণ প্রস্তুত হয় এবং ১৫০ মণ বিক্রয় হয়। ৪০ মণ শুকৃতি বাদ যায়।

এই দুই কোম্পানী মোট ১৩০০ মণ লবণ বিক্রয় করে এবং তদ্দরুণ প্রায় ১৯০০ টাকা শুল্ক দেয়। পূর্ব্ব বৎসরে ১৫০ মণ লবণ বিক্রয় করিয়াছিল এবং তদ্দরুণ শুল্ক দিয়াছিল ২৩৪ টাকা।

পাইয়োনীয়ার সল্ট্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী সামান্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করে। এই কোম্পানীর গোলা হইতে আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৩০ মণ লবণ বিক্রয় হইয়াছে এবং তদ্দরুণ রীতিমত শুল্ক ও আদায় হইয়াছে।

চট্টগ্রামের কোম্পানী এযাবৎ মাত্র ৩৫ মণ লবণ প্রস্তুত করিয়াছে। বর্ষাকাল আগেই আরম্ভ হওয়াতে এবং আব্-হাওয়ার অবস্থা সুবিধাজনক না থাকায় কোম্পানীর কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে নাই। আগামী বৎসরের জন্য সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট্ এই কোম্পানীকে কিছু টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

লবণের আমদানী

সালকিয়া গোলাতে এবং চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট গোলাতে পূর্ব্ব বৎসরের ১৭০০০০০ মণ (১৭ লক্ষ) লবণ মজুত ছিল। মোট আমদানী হইয়াছে প্রায় এক কোটী ৪৫ লক্ষ মণ;—পূর্ব্ব বৎসর (১৯৩৫-৩৬) অপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ মণ

কম। বিদেশ হইতে লবণ আমদানী এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কেবলমাত্র হামবার্গ্ (জার্ম্মানী) এবং লিভার-পুল (ইংল্যাণ্ড্) হইতে সামান্য পরিমাণ লবণ আমদানী হইয়াছে। মোট আমদানীর শতকরা ৯৩ ভাগ (১৩ কোটী ৫০ লক্ষ মণ) কলিকাতা বন্দরে আসিয়াছে। অবশিষ্ট আসিয়াছে চট্টগ্রাম বন্দরে।

লবণ বিক্রয়ের পরিমাণ

আলোচ্য বৎসরে চাঁদপুর ২টী, নারায়ণ গঞ্জে ১টী, কমলাঘাটে (ঢাকা) ২টী, ভৈরবে (ময়মনসিংহ) ৪টী,—এই মোট ৯টী আভ্যন্তরীণ গোলা ছিল। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের গোলা—১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই ৯টী গোলাতে মোট প্রায় ৪৪৪০০০ মণ লবণ প্রেরিত হয়।

কলিকাতা ও চট্টগ্রামের প্রধান গোলা হইতে মোট ১ কোটী ৪৫ লক্ষ মণ লবণ বিক্রয় হয়। পূর্ব্ব বৎসরে বিক্রয় হইয়াছিল ১ কোটী ৩৫ লক্ষ মণ। গড়ে প্রতি মণের পাইকারী দর ছিল ২৸/১০ পাই। পূর্ব্ব বৎসরে এই দর ছিল ২৸/৮ পাই।

লবণ আইন ভঙ্গের অপরাধ

আলোচ্য বৎসরে লবণ আইন ভঙ্গের দরুণ ১০৯টী মামলা উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব বৎসরের মূলতবী মামলা ছিল ৪২টী। এই ১৫১টী মামলার মধ্যে ১০৪টীতে আসামীদিগকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪৭টী মামলায় আসামিগণকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

লবণ শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবী

ভারতীয় লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য যে সংরক্ষণ শুল্ক নিয়োজিত আছে তাহার মেয়াদ শীঘ্রই উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ী মহলের দৃঢ় অভিমত এই যে, লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য আরও উচ্চহারে সংরক্ষণ শুল্ক নিয়োজিত করা অতীব প্রয়োজন। কারণ; বাংলা দেশের লবণ শিল্প একেবারে শৈশব অবস্থায় রহিয়াছে, সংরক্ষণ শুল্ক ব্যতীত উহার উন্নতি একেবারে অসম্ভব। ১৯৩২ সালে মিঃ পিট্ দেশীয় লবণ শিল্প সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নয় এবং পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ মিঃ পিটের মন্তব্য সমর্থন করে না। সুতরাং এ সম্পর্কে নূতন ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। বৎসর বৎসর ট্যারিফের লীজ বর্দ্ধিত হওয়ায় লবণ শিল্পের উন্নতি না ঘটিয়া তাহা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। গভর্ণ-মেণ্টের তরফ হইতেও উক্ত শিল্পের উন্নতি-কল্পে কোন প্রচেষ্টা চালানো হয় নাই। এ সমস্ত ব্যাপার সত্ত্বেও এসম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং লবণ শিল্পের উন্নতিকল্পে উচ্চহারে সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপন করা দরকার।

সেই জন্যই বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স্ লবণ শিল্পের উপর সংরক্ষণ শুল্ক বৃদ্ধি করিবার দাবী জানাইয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে চেম্বার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ, অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট পলিসি অনুযায়ী সংরক্ষণ শুল্ক নিয়োজিত হউক; দ্বিতীয়তঃ, শুল্কের হার রীতিমত বর্দ্ধিত হউক; তৃতীয়তঃ শুল্ক লব্ধ আয় যাহা বাংলার বরাতে পড়িবে তদ্দ্বারা এ দেশের লবণ শিল্পের উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা চালানো হউক; চতুর্থতঃ, শুল্কলব্ধ আয় হইতে শুধুমাত্র ভারতীয় কোম্পানী-গুলির উন্নতি প্রচেষ্টা চালিত হইবে, এডেনের জন্য তাহা হইতে কিছুমাত্র ব্যয়িত হইতে পারিবে না এই ব্যবস্থা করা হউক।

শিল্প-প্রসঙ্গ

পান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সিগারেট প্রস্তুত করতে গেলেও কিয়ৎ পরিমাণ ভার্জ্জিনিয়া তামাক দরকার হয়। সুগন্ধ কিংবা কেমিক্যাল দিয়ে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না, বরং বেশী দিন থাকলে তা সিগারেটের ক্ষতি করে। সুতরাং কেমিক্যাল্ যদি ব্যবহার করতেই হয় ত তা' অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, বিভিন্ন প্রকার তামাক পাতার সংমিশ্রণের কৌশল আয়ত্ত করাটা একটা বিদ্যা। এই বিদ্যা যে কোম্পানী যত বেশী আয়ত্ত করেছে, সে-কোম্পানী সিগারেট শিল্পকে তত ভালভাবে চালাতে পারছে। কোন্ কোয়ালিটির সিগারেট প্রস্তুতের জন্য কি প্রকার Blending আবশ্যক সেটা সর্ব্বপ্রথম জানা দরকার, তাতে উৎপাদন খরচা কম পড়ে। ধরুণ, উৎকৃষ্ট ধরণের সিগারেট প্রস্তুত করতে হবে। তাতে পুরাপুরি খাঁটি ভার্জ্জিনিয়া দিতে হবে কি, শতকরা ৭৫ ভাগ খাঁটি ভার্জ্জিনিয়া ও ২৫ ভাগ সাধারণ ভার্জ্জিনিয়া দিলে চলবে সেটা জানলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। কারণ, যিনি শতকরা পুরাপুরি ভার্জ্জিনিয়া দিবেন তাঁর খরচ বেশী পড়বে এবং যিনি ভালভাবে আনুপাতিক হিসাবে ব্লেণ্ডিং করতে পারবেন তাঁর খরচ কম পড়বে। অথচ ভালভাবে আনুপাতিক হিসাবে ব্লেণ্ডিং করতে পারলে শতকরা পুরাপুরি ভাগের সঙ্গে তার কোয়ালিটির বিশেষ কোন তফাৎ হয় না। এই ব্লেণ্ডিং এর অনুপাতটা বিভিন্ন কোম্পানীর 'ট্রেড্ সিক্রেট্'। ব্লেণ্ডিং এর সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু কেমিক্যাল্ তা' দিয়ে দিতে হয় কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে, কেমিক্যালের মাত্রা অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্লেণ্ডিং অর্থাৎ সংমিশ্রনের পূর্ব্বে পাতার বোঁটা ছেঁটে দেওয়া দরকার—ওটা বাদ চলে যায়। ওটা বাদ দিলে মসলার পরিমাণ কম হয়ে যায় বলে অনেক কোম্পানী ওটাকে কাজে লাগাবার এক উপায় উদ্ভাবন করেছে। ঐ বোঁটাকে একটা মেসিনে ফেলে এমন ভাবে 'কম্প্রেস্ড্' করা হয় যাতে করে

ঐ বোটা পাতার মত চওড়া হ'য়ে বেরিয়ে আসে। যাঁরা সোনার পাত তৈরী করা দেখেছেন তাঁরা ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। ঐ ছাটকাট বোঁটা মেসিনের সাহায্যে পাতায় পরিণত হবার পর তাকে কুচি কুচি করে কেটে তামাক পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম উপায় অবলম্বিত হওয়ার দরুণ মসলার পরিমাণ প্রায় শতকরা ১০।১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের পাতাকে কাটবার এবং সংমিশ্রিত করবার পূর্ব্বে আরও একপ্রকার উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে, ইংরাজীতে তার নাম হ'ল পাতাগুলির রিকণ্ডিসানিং (Re-Conditioning)। ব্যাপারটি আর কিছুই নয়, শুকনো মড়্‌মড়ে পাতাগুলিকে ঈষৎ ভিজিয়ে নরম করে নেওয়া। এইজন্য Steaming ও Humidifying মেসিন আছে। বিভিন্ন প্রকার পাতা বিভিন্ন অনুপাতে নরম হয়, সুতরাং উক্ত মেসিনে সব পাতাগুলিকে এক সঙ্গে না ফেলে, পৃথক পৃথকভাবে স্থাপনা করা দরকার। এই রকম ভাবে নরম করে না নিলে পাতাগুলি গুঁড়িয়ে যাওয়ার দরুণ ম্যানুফ্যাক্‌চারার্সদের ক্ষতি হয়।

পাতাগুলি ভালভাবে ব্লেণ্ডিং অর্থাৎ সংমিশ্রিত করবার পর সেগুলিকে ২৪ ঘণ্টা স্তূপাকার করে ক্যাম্বিস চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। তৎপরে সেগুলিকে টোব্যাকো কাটিং মেসিনে (Tobacco cutting machine) চড়ানো হয়ে থাকে। কাটিং মেসিনের ছুরি সব পাতাগুলিকে ঠিক সমভাবে কাটবার জন্য ভাল করে যেন শান দেওয়া থাকে। ছুরি উত্তমরূপে শানানো না থাকলে মসলার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। কাটিং মেসিন যখন চালু থাকবে তখন ১০।১৫ মিনিট্‌ অন্তর তার ছুরি পাল্‌টে দেওয়া দরকার, সেইহেতু অনেক জোড়া শানানো ছুরি রিজার্ভ থাকা আবশ্যক। সিগারেট উৎপাদনকারীদের সব সময়ই একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যে ধরণের সিগারেটই হোক্‌ না কেন, প্রত্যেকটির রং যেন চটকদার থাকে, সিগারেটের রং ঠিক সোনালী ধরণের না হলে খদ্দেরে তা পছন্দ করে না, সুতরাং সিগারেট প্রস্তুতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এটা যেন নজর দেওয়া হয় যে, তার রং ঠিক থাকছে কিনা।

কাটিং মেসিন খারাপ থাকলে কিংবা অযত্ন সহকারে মসলা নাড়াচাড়া করলে সিগারেটের রং খারাপ হয়ে যায়।

পাতাগুলি কাটিং মেসিন থেকে কেটে বেরিয়ে আসবার পর আবার তাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য দস্তা বুলানো এক বিশেষ প্রকারের বাক্সর মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। এই রকম ভাবে ২৪ ঘণ্টা রেখে দেওয়ার একটা সুবিধা এই যে, ভাল ভাল পাতাকে টুক্‌রো টুকরো করে কাটার দরুণ তার মধ্যে থেকে যে উত্তম তামাকগন্ধ-সুলভ তৈলপদার্থ নির্গত হয় সেটা সকল পাতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার দরুণ সমস্ত মসলাটাই এক অপূর্ব্ব 'ফ্ল্যাভার্' প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মসলা-গুলিকে নিয়ে রোষ্টিং মেসিনে (Roasting machine) ফেলা হয়—বেশ করে শুকোবার জন্য। তারপরে আবার তাকে কুলিং মেসিনে চড়ানো হয়ে থাকে। কুলিংমেসিন থেকে বেরিয়ে আসবার পর মসলাগুলিকে আবশ্যকমত সুগন্ধ বা কেমিক্যাল দ্বারা সুরভিত করবার নিয়ম, সেটাও মেসিন সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমনি সাধারণভাবে সুগন্ধযুক্ত করলে এরকম হ'তে পারে যে, মসলার কোথাও বা গন্ধযুক্ত হ'ল—কোথাও বা হ'ল না। কিন্তু যদি স্প্রে-র (Spray) সাহায্যে সুগন্ধ ছড়ানো যায় তাহ'লে বিন্দু বিন্দু ভাবে তা' সমস্ত মসলার গায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এ পর্য্যন্ত কেবল সিগারেটের মসলা প্রস্তুতকরণের বিষয় বলা হয়েছে, এইবার সেই মসলা দিয়ে সিগারেট প্রস্তুতের বিবরণ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করা যাক্। মসলা তৈরী শেষ হ'লে পরই সিগারেট প্রস্তুতের প্রক্রিয়া সুরু হয়। সিগারেট প্রস্তুতের যে মেসিন তা' নানা রকম জটিল বিভাগে বিভক্ত। সংক্ষেপে সে মেসিনের কার্য্য-প্রণালী বোঝাতে গেলে বল্‌তে হয়, যে মেসিনের কাজ ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, একধারে সিগারেটের কাগজ থাকে, তা' ছাপা হয় এবং 'টিপ্‌ড্' হয়; দ্বিতীয়তঃ, অন্যধারে মসলা থাকে—তা' পেন্সিলের মত দড়ি পাকিয়ে যায় এবং তার ওপর কাগজ জড়ানো হয়ে থাকে; তৃতীয়তঃ, অপরধারে সেই লম্বা কাগজ জড়ানো দড়ির মত রিল সিগারেটের সাইজানুযায়ী কাটা হয়ে বেরিয়ে এসে ট্রেতে জমা হয়। তাহলে'ই দেখা যাচ্ছে যে, একটি মেসিনেই কাগজ ছাপা, 'টিপ্‌ড্' হওয়া, পরিষ্কার ভাবে কাগজে মসলা জড়ানো, পর পর এক একটী—সিগারেট কেটে বেরিয়ে আসা প্রভৃতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। উক্ত মেসিনে সাধারণতঃ মিনিটে ৩০০ সিগারেট উৎপন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু খুব ভাল স্পিডের মেসিনে ৭৫০—১৫০০ পর্য্যন্ত তৈরী হ'তে পারে।

ট্রেতে সিগারেট জমা হবার পর সেটা প্যাক্ করবার পূর্ব্বে ভাল করে শুকানো হয়। তারপর তাকে টিনে বা প্যাকেটে প্যাক্ করে চালান দেওয়া হয়ে থাকে।

আমরা সিগারেট প্রস্তুত প্রণালীর সমস্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করলাম। ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি এধারে নিপতিত হলে তাঁরা লাভবান হবেন। তবে এটা আমরা বলে রাখছি যে, কম মূলধন নিয়ে এ-কারবারে নামা যায় না। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কম মূলধন নিয়ে নামেন বলে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে পারেন না। সুতরাং মূলধনের ব্যাপারটাও ব্যবসায়ীদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

চাউলের উপর আমদানী শুল্ক

একথা সকলেই অবগত আছেন যে, বাংলা-দেশের ফসলের মধ্যে ধানই সর্ব্বপ্রধান। সমগ্র চাষের শতকরা ৩১ ভাগই ধানের জন্য নিয়োজিত হয়। সুতরাং এই ফসলের বিক্রয় মূল্য যদি পড়িয়া যায় তাহা হইলে চাষীরা যে মরণাপন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। কাজে কাজেই ফসলের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে আমদানীকৃত চাউলের উপর যে আমদানী শুল্ক ধার্য্য ছিল তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু ধান-চাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীভূত করিতে হইলে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। বিদেশী চাউল ছাড়াও বর্ম্মামুল্লুক হইতে প্রচুর চাউল আমদানী হইয়া আমাদের বাজার মাটি করিয়া দেয়; অথচ বর্ম্মার চাউলের উপর কোন আমদানী শুল্ক নিয়োজিত নাই। সুতরাং স্বতঃই মনে হয় যে, গভর্ণমেণ্টের এতৎ সম্বন্ধে একটি সুসামঞ্জস্যমূলক পলিসি গ্রহণ করা দরকার। এ সম্পর্কে 'প্যাডি মার্চ্চেণ্ট্স্ এ্যাসোসিয়েশনের' সভাপতি ও 'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকাল্‌চারাল্ রিসার্চ্চের' সভ্য মিঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

চাউল ভারতবর্ষের একটি প্রধান ফসল-সম্পদ, ভারতের মোট চাষের শতকরা ৩১ ভাগ জমিতেই ধানের চাষ হইয়া থাকে। শস্য সম্পদে চাউলের পরই গমের স্থান, কিন্তু গমের তিন গুণ জমিতে ধানের চাষ হয়। ধানের চাষ কোন একটি মাত্র স্থানে নিবদ্ধ নয়, বৃটিশ ভারতে ও দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশেই ধানের চাষ হইয়া থাকে, এমন কি বহু স্থান দেখা যায়, যেখানে কেবলমাত্র ধানই চাষের একমাত্র শস্য। ভারতের অধিবাসীদের শতকরা ৮৭ জনই কৃষীজীবী, সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, চাউল শস্যের সঙ্গে সঙ্গে বহু ভারতবাসীর ভাগ্য বিজড়িত। কয়েক বৎসর ধরিয়া ধান ও চাউলের দর ভয়ানক ভাবে পড়িয়া গিয়াছে—এতটা পড়িয়া গিয়াছে যে অন্য কোন রকম কৃষি সম্পদের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় নাই। অপরাপর শস্যের দর পড়িলেও তাহা আবার উল্লেখযোগ্য ভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়াছে, কিন্তু চাউলের বেলায় তেমনটি ঘটে নাই। চাউলের মূল্যের উঠানামার দিক দিয়া উহার index number অর্থাৎ মূল্য পরিমাপক সংখ্যা ১৯৩৩-৩৪ সালে ৩৮-এ নামিয়াছিল, তাহার পর ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা ৫৫-এ চড়িলেও ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে তাহা আবার ৪২-এ নামিয়াছে।

ভারতীয় কৃষিজীবীদের উপর ইহার ফল মারাত্মক ভাবে ফলিয়াছে। চাউল উৎপাদনের ব্যাপারে বাংলার স্থান সর্ব্বাগ্রে; ১৯৩৩-৩৪ চাউলের দর যে রকম নামিয়াছে আধুনিক ইতিহাসে তাহা আর দেখা যায় নাই, ১৯৩৭ সালেও যে দর ছিল তাহা আশানুরূপ নয়, এমন কি তাহাতে উৎপাদনের খরচা পোষায় নাই। এক্ষেত্রে ইহা ধরিয়া লইতে বিলম্ব হয় না যে, চাউলের দর বৃদ্ধি করিতে পারিলেই চাষীদের দুঃখ, দুর্দ্দশার কিঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যেই ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের নিকট বিদেশী ও বার্ম্মার ধানও চাউলের উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সমগ্রভাবে সেই আবেদন কর্ণপাত না করিয়া আংশিক ভাবে সে আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন অর্থাৎ কেবলমাত্র বিদেশী broken rice এর উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। বর্ম্মা হইতে আমদানীকৃত কোন প্রকার চাউলই উক্ত শুল্কের আমলে পড়ে নাই, কেননা, ভারত ও ব্রহ্ম-দেশের মধ্যে প্রচলিত চুক্তির জন্য সাময়িক-ভাবে উক্ত শুল্ক স্থাপন করা যাইতে পারে না।

স্যার্ জাফরুল্লা খাঁ সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, উক্ত শুল্ক স্থাপনের ফল ফলিয়াছে; যেহেতু বিদেশী ধান ও চাউলের আমদানী তদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারই দরুণ চাউলের দর কিঞ্চিৎ চড়িয়াছে। ইহা সত্য বটে যে, শ্যামদেশ ও ইন্দো চীন হইতে চাউলের আমদানী কমিয়াছে, কিন্তু বর্ম্মা মুল্লুক হইতে প্রচুর চাউল আমদানী হইবার দরুণ কোন উন্নতি দেখা যায় নাই বরং অবনতি দেখা গিয়াছে। আমদানী শুল্ক নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বেও শ্যামদেশ ও ইন্দোচীনের চাউলের অপেক্ষা ব্রহ্মদেশের চাউলেই অধিক পরিমানে আমদানী হইত। প্রথমোক্ত দেশ সমূহের রপ্তানী হ্রাস পাইবার কারণ হইতেছে যে, তাহারা ইউরোপের অপরাপর দেশের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার দিকে তাহাদের নজর ততটা বর্ত্তমান ছিল না। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশের চাউল অপেক্ষাকৃত কম আমদানী হইয়াছে, বিদেশী চাউল আমদানী হয় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু তাহার কারণ আমদানী শুল্ক প্রবর্ত্তন নহে। উক্ত সালে ভারতবর্ষে প্রচুর ফসল ফলিয়াছিল, ইউরোপীয় দেশ সমূহে তেমন ফসল ফলে নাই। সুতরাং ব্রহ্মদেশ নির্ব্বিবাদে পৃথিবীর অপরাপর দেশের চাহিদা যোগাইয়াছে, ভারতীয় বাজারে মাল রপ্তানী করিবার তাহার প্রয়োজন ঘটে নাই।

জাফরুল্লা খাঁ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে উক্ত শুল্ক একেবারে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিত কিন্তু এ বছর চাষের পূর্ব্বাভাষ হইতে জানা যায় যে ফসল কম ফলিবে, সুতরাং আমদানী বৃদ্ধির আশঙ্কায় উক্ত শুল্ক পুনঃ প্রবর্ত্তিত কবিতে হইয়াছে। খাঁ সাহেবের যুক্তিটা খুব পরিষ্কার না হওয়ার দরুন সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। ফসল কম ফলিয়াছে সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বাংলাদেশে স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইয়াছে; আমদানী শুল্ক বর্ত্তমান থাকিলেও বিগত চার মাস ধরিয়া দর অত্যন্ত কম ছিল। দর যদি বৃদ্ধি পায় তাহা আমদানী শুল্কের দরুণ বৃদ্ধি পাইবে না পরন্তু আভ্যন্তরিক যোগান অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই তাহা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে কি হইবে দেখা

যাউক। চাষীদের হাতে যখন ফসল ছিল তখন দরও কম ছিল ; সেই কম দরেই তাহারা মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। পরে যখন তাহার নিজের পেটের খোরাকের জন্য তাহাকে চাউল ক্রয় করিতে হইবে তখন দর বেশী হওয়ার দরুণ বেশী দিয়াই তাহাকে তাহা ক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উক্ত আমদানী শুল্ক তাহার লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিই করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট যদি সত্যই ফসলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া চাষীদের কল্যাণ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিদেশীয় ও ব্রহ্মদেশীয় সকল প্রকার ধান চাউলের উপর সমান আমদানী শুল্ক স্থাপন করিতে হইবে, নচেৎ কোন লাভজনক ফল ফলিবে না।

১৯৩৪ সালে যে ক্রপ্ প্ল্যানিং কন্‌ফারেন্স্ (Crop planning Conference) হইয়াছিল তাহারই সুপারিশ অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট্ এক রাইস্ কমিটি (Rice Committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত আমদানী শুল্ক স্থাপনের ব্যাপারে ঐ কমিটির কোন মতামতই গ্রহণ করা হয় নাই। বাংলা সরকারও ধান চাউলের দর বৃদ্ধি করণের মানসে একটি প্যাডি কমিটি (Paddy Committee) নিয়োগের সঙ্কল্প করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট্ যদি সত্যই কোন মঙ্গল সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি বা প্রাদেশিক কমিটি সকলকেই এ সম্পর্কে সমস্ত বিষয় আলোচনার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে এবং তাহাদের সুপারিশ মত কার্য্য করিতে হইবে।

চয়ন

বাংলার কার্পাস

বেশী দিনের কথা নহে, ১৮০ বৎসর পূর্ব্বেও বস্ত্র বয়নশিল্পের জন্মভূমি বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিত; এবং সেই 'বাঙ্গি' (বঙ্গীয় শব্দের অপভ্রংশ) তুলায় প্রস্তুত বাংলার গৌরব ঢাকাই মস্‌লিন বিশ্বের অতি বিস্ময়ের জিনিষ ছিল। তৎকালেও অর্থাৎ তুলা-চাষের সেই ক্রমাবনতির দিনেও যে বাংলার প্রায় অর্দ্ধ কোটী টাকার একমাত্র মস্‌লিন কাপড়ই পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে রপ্তানি হইয়াছিল, সেই বঙ্গদেশেই আজ তুলা নাই! এ অভাবনীয় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে কেন, তৎসম্বন্ধে অর্থাৎ বাংলার কার্পাস চাষের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

বঙ্গের কার্পাস-কথায় ঢাকার কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিতে হয়। কারণ, সূত্র ও বস্ত্রের উৎকর্ষে ও সৌন্দর্য্যে ঢাকা-ই জগতে অদ্বিতীয় ছিল; এবং কার্পাস-তুলার উৎকর্ষে ও প্রাচুর্য্যেও ঢাকা-ই প্রধানতম বলিয়া পরিচিত ছিল। ঢাকাই কাপড় ইউরোপের অভিজাত-সম্প্রদায়ের সুদুর্ল্লভ সখের সামগ্রী ছিল। খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও ঢাকার মস্‌লিন, মলমল প্রভৃতি কাপড় ইউরোপকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ঢাকার আব্‌-রোয়ান (আব্‌=জল, রোয়ান=প্রবাহ) নির্ম্মল জল প্রবাহের মত। উৎকৃষ্ট আব্‌রোয়ান জলে ফেলিয়া দিলে তাহাতে কাপড় আছে কিনা বোঝা যাইত না। একদিন এই বস্ত্র-পরিহিতা জেবুন্নিসাকে দেখিয়া, তাঁহার পিতা সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে আবরুহীনা মনে করিয়া ভর্ৎসনা করাতে, জেবুন্নিসা বলিয়াছিলেন যে—"আমি কাপড়খানি সাতবার ঘুরাইয়া পরিয়াছি।" ঐ কাপড় মস্‌লিনেরই প্রকার বিশেষ; ২০ গজ লম্বা এবং উহার ওজন প্রায় ১০ আউন্স ছিল। ঢাকাব আব্‌রোয়ান বা অতি সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র দেখিয়া, তৎকালীন শতকুবেরবিজয়ী রোম-সম্রাটদিগকেও বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হইত। ঢাকার মস্‌লিন জগদ্বিখ্যাত ছিল। ইহা প্রকারবিশেষে বহু বিচিত্র নামে, যথা—মেঘডম্বুর, বিজয়চিহ্ন, সন্ধ্যাশিশির, নয়নসুখ,

জলপ্রবাহ, গঙ্গাজলী, বাতাসের জাল, বদনখাস, ঝুনা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।

ঝুনা—ইহা মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম; দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৮॥ আউন্স। ধনবান বিলাসী ব্যক্তির অন্তঃপুরে এবং নর্ত্তকী, গায়িকা প্রভৃতির গৃহেই ইহার সমধিক আদর হইত।

বাতাসের জাল বা সব-নম্—এই জাতীয় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রকে জনৈক ইংরেজ কবি a web of woven wind (বায়ুতে বোনা-জাল) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন! পারশী ভাষায় ইহাকে সান্ধ্য-শিশির' (evening dew) বলা হইত। ঘাসের উপর পাতিয়া রাখিলে শিশির সিক্ত দুর্ব্বাদল বলিয়া ভ্রম হইত।

ঝুনা, সব্-নম্, আব্‌রোয়ান প্রভৃতি মস্‌লিনের প্রকারবিশেষ হইলেও, এই সকল বস্ত্রাপেক্ষা খাঁটী মস্‌লিন আরও সূক্ষ্মবস্ত্র ছিল। "কুলভা" নামক একখানি তিব্বতীয় গ্রন্থে

লিখিত আছে যে, Gtsing Dgahmo নাম্নী জনৈক ধর্ম্মযাজিকা মস্‌লিন পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি উলঙ্গ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্তা হইয়াছিলেন। টেলর সাহেবের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয়দের মতে, "ঢাকার মস্‌লিন মানুষের শিল্পজাত নহে, উহা দেবলোকের পরীদের হাতের কাজ।" বোল্ট সাহেব তাঁহার "Consideration on the affairs of India" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"রোমের মেয়েরা মস্‌লিনের ভান করিয়া স্বীয় নগ্নদেহ সাধারণের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন (A dress under whose slight veil our women continue to show their shapes to the public)।" ডাঃ উরে বলেন—"রোমের গৌরবময় যুগে ঢাকার মস্‌লিন তথাকার সুন্দরীদের সর্ব্বপ্রধান ও প্রিয় বিলাসের বস্তু ছিল।" (Cotton Manufacture of Great Britain by Dr. Ure)। একদিকে চীন, তুরস্ক, সিরিয়া, আরব এবং পারস্য দেশের সহিত ঢাকাই মস্‌লিনের বাণিজ্য চলিত, এবং অন্যদিকে ইটালী, রাশিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় সভ্যদেশে ইহা রপ্তানী হইত। অবনতির দিনেও, অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, ঢাকায়, ৪,৫০,০০০৲, সোনারগাঁয়ে ৩,৫০,০০০৲, ডেমরাতে ২,৫০,০০০৲, এবং তিতিবর্দ্ধিতে ১,৫০,০০০৲ টাকার অর্থাৎ ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকার মস্‌লিন বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও ঢাকায় ১৫০০, সোনারগাঁ ও ডেমরাতে ৯০০, তিতিবর্দ্ধিতে ১০৬০ এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানে ৭০০ মোট ৪১৬০ খানি তাঁতে একমাত্র ঢাকা জেলাতেই মস্‌লিন; জামদানী মল্‌মল প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্ত্রবয়নকার্য্য চলিত। তদ্ভিন্ন মোটা ও মাঝারী কাপড় তৈয়ার করিবার জন্য যে কত তাঁত চলিত, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা তৎকালেও দুষ্কর ছিল। আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে মস্‌লিনের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হয় নাই; এবং তাহা কখন হইবেও না। সেদিনও ওয়াট্‌সন্ বলিয়া গিয়াছেন—"With all our machines and wonderful inventions we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air' of Dacca." কেবল ঢাকা অঞ্চলে নহে, বঙ্গের টাঙ্গাইল, বাজিতপুর, শান্তিপুর, কালনা, লালবাগান, হাওড়া প্রভৃতি নানা স্থানই উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। বঙ্গের নানা স্থানেরই তন্তুবায়কুলতিলকেরা আপনাদের করকৌশলে সভ্যদেশবাসীমাত্রকেই মুগ্ধ করিত।

শুধু বস্ত্র নহে, কার্পাস-তুলার ব্যবসায়ের জন্যও সেকালে বাংলার ঢাকা অঞ্চলই সুবিখ্যাত ছিল। ঢাকা-সোনারগাঁ হইতে ইউরোপের নানা দেশে প্রচুর কার্পাসের রপ্তানি হইত। ঢাকার কাপাসীয়া যে সেকালে কার্পাস-তুলার অতি প্রকাণ্ড গঞ্জ ছিল, তাহা এখনও ঢাকা-বাসীরা ভুলিয়া যায় নাই। কাপাসীয়ার ন্যায় বহুসংখ্যক কার্পাসগঞ্জ বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদ্ভিন্ন বহু তুলার আড়ং বাংলার সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান ছিল; এবং তুলার হাটও ছিল অসংখ্য। বাংলার কাপাসীয়া,

কাপাসডাঙ্গা, কাপাসবেড়ে, কাপাসটীকুরী, কাপাসখোলা, কাপাসতলা, কাপাসবনী, কাপাস-পাড়া প্রভৃতি অনেক গ্রামই এখনও সেকালের কার্পাস-চাষের পরিচয় ও সাক্ষ্য দিতেছে।

পর্য্যটক লুইলিয়ারের ১৭২৬ সালের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কার্পাস তুলা উৎপন্ন হইত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে, ঢাকার কমার্শিয়েল রেসিডেণ্ট বেব (Mr. Bebb) সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দরবারে ঢাকার যে বিবরণ পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছেন—"ঢাকা অঞ্চলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্পাস উৎপন্ন হয়। এই সকল কার্পাসের সূত্র যেমন চিক্কণ তেমনই সুন্দর। ঢাকাই কার্পাস-সূতার বিশেষ গুণ এই যে, এই সূত্রে-বপিত-বস্ত্র 'কাচে কাচে' মিহি হয়। কেন এরূপ হয় তাহা সকলে জানেন না। আমি দেখিয়াছি ঢাকাই সূতা কাচে-কাচে ফুলে না বলিয়াই, ঐ সূতার কাপড় যত পুরাতন হয় ততই অধিক সূক্ষ্ম সুকুমার হয়। পক্ষান্তরে, ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের সূতা কাচে-কাচে ফুলিয়া উঠে, সুতরাং ম্যাঞ্চেষ্টারের সূক্ষ্মবস্ত্রও কাচে-কাচে মোটা হইয়া পড়ে।" মিঃ হেনরী সেণ্ট জর্জ্জ টাকার (Mr. Henry St. George Tucker) ব্রিটিশ-ভারত হইতে বিদেশে কার্পাস রপ্তানি করা সম্বন্ধে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই—"ঢাকার কার্পাস অত্যন্ত উৎকৃষ্ট; কিন্তু এ জেলার উত্তর ও পশ্চিমভাগে যে কার্পাসের চাষ হয়, তাহা অন্তভাগের তুলনায় অল্প হইলেও, উহার সমকক্ষ উৎকৃষ্ট কার্পাস পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দুর্ল্লভ এই উৎকৃষ্ট কার্পাসের নাম 'বৈরাতি' (Bairati)। ইহার সূতা রেশমের ন্যায় কোমল, মসৃণ, শক্ত ও সুন্দর; কিন্তু আঁশ ছোট। বীজের সহিত তুলা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহে।" বাঙ্গলার —বিশেষতঃ ঢাকার তুলার শ্রেষ্ঠতা-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই,—ইহা যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই নানা কারণে ঢাকার কার্পাস-শিল্পের অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করে। যে দিন বাঙ্গলার বস্ত্র-সংগ্রহের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলার চারিদিকে কুঠি স্থাপন করিয়া ও বাঙ্গলার তন্তুবায়দিগকে দাদনে আবদ্ধ করিয়া প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় অর্থাৎ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাঙ্গলার কার্পাস-শিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল। বাঙ্গলার তাঁতিরা যে হস্তাঙ্গুলির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিত, তাহা কাটিয়া ফেলিবার কথা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইহার ফলে, লক্ষ লক্ষ তাঁতিকে যে তাঁত ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিতে হইয়াছিল, সে সকল ইতিহাসের কথা বা প্রবাদ-বাক্য আজিও প্রাচীন-দের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পের অবনতির সূত্রপাতেই অর্থাৎ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশে বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইতে আরম্ভ করে। ইহার কিয়ৎকাল পরেই, আমাদের দেশে মার্কিন-কাপড়ের আমদানী হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার ও মার্কিন-কাপড় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঐ সকল আপাত-মনোহর সুলভ মূল্যের বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি;—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' আমরা মাথায় তুলিয়া লইয়া সন্তুষ্ট

রহিতে পারি নাই। ফলে, বাঙ্গলার তুলার চাষ ও বস্ত্র-শিল্পের যে সর্ব্বনাশ হয়, এ সব ঐতিহাসিক কথা ;—সুতরাং উল্লেখ অনাবশ্যক।

বিগত ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৪৩ বৎসর যাবৎ বিলাত হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র এবং উহারই কিছুকাল পর হইতে সূত্র আমদানী হওয়াতে এবং অন্যান্য ক'একটি কারণে কিরূপভাবে বাঙ্গলার কার্পাসের ও বস্ত্র-শিল্পের বিলোপ ঘটিয়াছে, সে সকল ইতিহাসের কথা আমরা বলিব না। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পরমুখাপেক্ষীর ভাবী-দুর্দ্দশা যে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য, ইহা যদি বাঙ্গালী সম্যকরূপে বুঝিতে পারিত এবং দেশের চিরস্থায়ী উন্নতির কথা ভুলিয়া গিয়া তাহারা যদি হঠাৎ বিলাসী হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের তাঁতি, জোলা ও যুগীদিগকে কখনও পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইত না; এবং বাঙ্গলা হইতে বাঙ্গলার নিজস্ব বাঙ্গি-(বঙ্গীয়-শব্দের অপভ্রংশ) কার্পাসের চাষ ও চরকায় সূতা-কাটার প্রথাও অত্যল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া পড়িত না। মোটকথা, নানারূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াই বাঙ্গালার কৃষকেরা কার্পাসের চাষ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

নানা কারণে দেশে ও বিদেশে বাঙ্গলার তুলার কাটতি কমিয়া গেলে, বাঙ্গলার কৃষকেরাও ক্রমশঃ তুলার চাষ কম করিতে আরম্ভ করে। তৎকালে বাঙ্গলার—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকেরা কার্পাসক্ষেতে নীলের চাষ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কেন, সে সকল ইতিহাসের কথা বলিব না। তারপর কার্পাসের ক্ষেতে কুসুম-ফুলের চাষ করিলে আয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইত বলিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই কার্পাসের জমিতে কুসুমফুলের চাষ-প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই পৃথিবীর হাটে কুসুমফুলের অতি অনাদর এবং পাটের মূল্য ও চাহিদা অধিক হইলে পাট-চাষের প্রতিই বাঙ্গলার কৃষকদিগের দৃষ্টি পড়ে। তাহারা পাটের চাহিদা বুঝিয়া কুসুমফুলের সঙ্গে সঙ্গে কার্পাসের চাষও একেবারেই ছাড়িয়া দেয়; এবং ক্রমশঃ অধিক পরিমাণ জমিতেই পাটের চাষ করিতে আরম্ভ করে, ফলে, গত ৭০।৭২ বৎসর মধ্যেই পাটের চাষ ও ব্যবসায় বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(কৃষিসম্পদ)

ভেজাল ঔষধ প্রচলনের পরিণাম

আমাদের দেশে অনেক রকমের জুয়াচুরী দেখা যায় যা' মানুষকে বাহ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে—কিন্তু তা' ছাড়াও এমন জুয়াচুরী আছে যা' মানুষকে একেবারে মরণের পথে ঠেলে দেয়। এই শেষোক্ত ব্যাপার যে সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক তা' ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কোন লোকের যখন কেউ গাঁট কাটে কিংবা কেউ যখন মারাত্মক ভাবে প্রতারিত হয়, তখন তার ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাতে তার মৃত্যু ঘটে না। এই প্রকার প্রতারণা মানুষের ঐশ্বর্য্য নষ্ট করতে পারে, প্রতিষ্ঠা নষ্ট করতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট করে না। তবুও এইসব প্রতারণা দূরীকরণের জন্য পুলিশ আছে, আইন আছে, সুবিচার রক্ষার্থ আদালত পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু যে প্রতারণায় মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় তার জন্য সামান্য আইন পর্য্যন্ত রচিত হয়নি। ঔষধে ভেজাল প্রদান হ'ল সেই রকমের প্রতারণা।

বাংলাদেশ—শুধু বাংলাদেশ কেন সারা ভারতবর্ষ, আজ পেটেণ্ট ঔষধের জয়ঢাকে মুখরিত। কত হাজার রকমের ঔষধ, মাদুলী, মলম, চর্ণ, সর্ব্বরোগহর ঘৃত যে নিত্য নূতন আবিষ্কৃত হচ্ছে তার সীমা নেই। অথচ সেগুলির মধ্যে কতগুলি খাঁটী ও কার্য্যকরী হয়ে থাকে ? তবুও ত লোকে পয়সার অপচয়ের হাত হতে নিষ্কৃতি পায় না। এতে দোষ ততখানি ব্যক্তির নেই যতখানি আছে রাষ্ট্রের। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই যে অত্যন্ত গরীব সেবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তার ওপর দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হক্ সাহেব, প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বাংলাদেশে ১১৪ বর্গ মাইল অন্তর অন্তর এক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এমতাবস্থায় লোকে সস্তার পেটেণ্ট ঔষধের প্রতি যে আকৃষ্ট হবে সেবিষয়ে সন্দেহের কি থাকতে পারে ? সেই-জন্য দেশে পেটেণ্ট ঔষধ, দৈব মাদুলী, মলম, চূর্ণ, ঘৃত প্রভৃতির কাট্‌তি অসম্ভব রকম বেড়ে চলেছে তা' সে স্বাস্থ্যের যত মারাত্মক রকম ক্ষতিই করুক না কেন।

এই রকম যখন অবস্থা তখন দেশের ও দশের কল্যাণ করণার্থে একটিমাত্র পথ খোলা আছে—সেটি হচ্ছে যে, যে সমস্ত ঔষধ বা অনুরূপ দ্রব্য ভেজালে পরিপূর্ণ বা অকার্য্যকরী সেগুলির প্রচার গভর্ণমেণ্ট থেকে বন্ধ করে দেওয়া। দেশের লোকের মন যাতে না গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যায় তজ্জন্য রাজদ্রোহজনক পুস্তক প্রচার বন্ধ করবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা আছে, দেশের লোকের স্বাস্থ্য যাহাতে না খারাপ হয় তজ্জন্য ভেজাল খাদ্য দূরীকরণের জন্য

সরকারী আইন আছে; সুতরাং লোককে আত্মঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ভেজাল ঔষধের ব্যবহার ও বিক্রয় বন্ধ করবার মানসে কেন না ব্যবস্থা সম্ভবপর হবে?

আমরা সবাই ভেজাল খাদ্যের উপকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হয়েছি, কিন্তু ভেজাল ঔষধের মারাত্মক বিষক্রিয়া সম্পর্কে এখনও ততটা অবহিত হয়ে উঠতে পারিনি। এর কারণ হচ্ছে যে, ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে চারিধারে যথেষ্ট আলোচনা হয়; সংবাদপত্র সমূহ এসম্বন্ধে বড় বড় শিরোনামায় বহু সংবাদ ছাপে; জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদি ভেজাল খাদ্য পরীক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট লোক নিয়োগ করে; শুধু এই সমস্তই নয়, এসম্পর্কে নিরন্তর বহু গবেষণা ও কন্‌ফারেন্স ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভেজাল ঔষধের ক্ষেত্রে সেরকম কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমান নেই; সেখানে প্রত্যেক আবিষ্কারকের ঔষধই অব্যর্থ ও অমোঘ বলে ক্রেতাদের সম্মুখে প্রবল প্রতিযোগীতা সহকারে তারস্বরে চীৎকার সুরু করে দেয়,—লোকে এতগুলো ঔষধ সমান বিশুদ্ধ ও অব্যর্থ দেখে মুহূর্ত্তের জন্য কোন্‌টা কিনবে ঠিক করতে না পেরে হতচকিত হয়ে পড়ে, তারপর বরাত ঠুকে সামনে যেটা পায় সেটাই কিনে নেয়। ভেজাল ঔষধ ব্যবহার নিবারণ করবার জন্য প্রচারকার্য্য দূরে থাক, ভেজাল ঔষধই যে খাঁটী, তা' ব্যবহারে যে হাতে হাতে রীতিমত ফল পাওয়া যায় এসমস্ত বলবার, বোঝাবার ও লোকের মনের মধ্যে বিঁধিয়ে দেবার জন্য কুশলী, মিথ্যাশ্রয়ী প্রচারকের অভাব নেই, তারা ট্রামে, ষ্টীমারে, রেলগাড়ীতে সর্ব্বত্র অশেষ নৈপুণ্য সহকারে প্রচারকার্য্য করে বেড়ায়।

এরই জন্য ভেজাল ঔষধের ব্যবহার আমাদের দেশে ক্রমশঃ বাড়ছে। দেশের জনসাধারণ ও চিকিৎসকস্থানীয় ব্যক্তিগণ এরূপ অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং তারই ফলে কমমাত্রার ঔষধ বেশী মাত্রার বলে চলে যাচ্ছে। মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বাহ্যাড়ম্বরের বিরুদ্ধে সেইজন্য এতটুকু প্রতিবাদ বাণী উচ্চারিত হয় না। সেরা, ভ্যাক্‌সিন, অর্গানিক্ আর্‌সেনিক কম্পাউণ্ড প্রভৃতি বিনা পরীক্ষায় বাজারে রীতিমত চালু হয়। এই ভেজাল ঔষধ পরীক্ষা করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সালে চোপ্‌রা কমিটী (Chopra committee) নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা সারা ভারতবর্ষময় ঔষধ সমূহ পরীক্ষা করে দেখে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ঔষধই ভেজালযুক্ত। চোপ্‌রা কমিটির এরূপ রিপোর্টের পর 'সেণ্ট্রাল ড্রাগ কণ্ট্রোল কমিটি' ভারতের সমস্ত ঔষধের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কণ্ট্রোল ল্যাবরেটরীর উপরোক্ত পরীক্ষাকার্য্য চোপ্‌রা কমিটির মন্তব্য সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করে। ব্যাপার যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে যে শুধু স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে তা' নয়, পরন্তু ঔষধ দ্রব্য প্রস্তুত করণ শিল্পেরও ভয়ঙ্কর দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। আমরা নিয়তই দেখতে পাচ্ছি যে, ভেজাল ঔষধের আবির্ভাব যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, খাঁটি ঔষধের বিক্রয় তত কমে যাচ্ছে। এতে করে এই হচ্ছে যে, খাঁটি ঔষধ উৎপাদনকারকেরা ভেজাল ঔষধ উৎপাদনকারকদের নিকট প্রতিযোগীতায় মোটেই দাঁড়াতে পাচ্ছে না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই দেখা দেবে যে, খাঁটি ঔষধ উৎপাদনকারকদের ব্যবসা ফেল

পড়বে। সুতরাং এই অবস্থা থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আইন দ্বারা ভেজাল ঔষধের চলন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া।

বাজারে এমন বহু ঔষধ আছে চিকিৎসকগণ যাদের গুণাগুণের সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ পোষণ না করে তা' রোগীর ব্যবহারের জন্য নির্দ্দেশ দেন। অথচ সেগুলি আসলে খাঁটি নয় কিন্তু খাঁটি বলে চলে যায়। কতকগুলি কুইনাইন বড়ি আছে যাদের লেবেলে যা' শক্তির কথা লেখা আছে তার চেয়েও কম শক্তি ধরে কিম্বা তাতে একেবারে কুইনাইন পদার্থ থাকেই না। জরুরী ক্ষেত্রে রক্তস্রাব বন্ধ করবার জন্য লিকুইড্ এক্সট্রাক্ট্ অব্ আরগট্ (Liquid extract of Ergot) ব্যবহার করে অনেক সময় দেখা যায় যে তাতে শক্তিশালী খার পদার্থ মোটেই নেই। বহু নির্য্যাস শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক ভেজাল মিশ্রিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত ঔষধ রোগীর কি উপকারে আসতে পারে? অপরাপর ক্ষেত্রে ভেজাল প্রদান আর্থিক ক্ষতি করে কিন্তু ঔষধের ব্যাপারে ভেজাল অনুষ্ঠিত হ'লে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে নাকি?

আমাদের মনে হয় এধারে গভর্ণমেণ্টের অবিলম্বে দৃষ্টি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমরা শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি না, পরন্তু ঔষধ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্যায় প্রতিযোগীতা প্রতিরোধ করবার জন্য দেশের সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভেজাল ঔষধের আবির্ভাবের দরুণ দেশের খাঁটি ঔষধ উৎপাদনকারীদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ে সম্মিলিতভাবে আইন প্রণয়ন দ্বারা যদি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা'হলে ভেজাল দূরীভূত হ'তে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

শ্রীমতী শৈলবালা শূর

বন্দীপুর

ভক্তি বিশ্বাস দুটি ধন,
রাখবে প্রাণে অনুক্ষণ।

*

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট
গিন্নীর পাপে গৃহ নষ্ট।

*

ভক্তির দ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া যায়;
প্রেমের দ্বারা ভগবান নিজে আসেন।

*

মানুষে কাজ দেখে,
কিন্তু ভগবান অভিপ্রায় দেখেন।

*

রিপুর বেগ যে সহ্য করে
কোন ব্যাটা তার আয়ু হরে?

*

যখন যার কপাল বাঁকে,
দুর্ব্বাবনে বাঘ ডাকে।

*

পাপ কল্লে পাপীর ভয়,
সাধু লোকের কিসের ভয়?

*

পরের মন্দ করতে গেলে
নিজের মন্দ আগে হয়।

*

মায়ের মায়াই মায়া,
বটের ছায়াই ছায়া।

*

যে সয় সেই রয়,
যে না সয় সে নাশ হয়।

*

ক্ষুদ কুঁড়ো যে না খাবে
তার কপালে অন্ন আছে।

*

পরের দেখে তোল হাই
যা আছে তাও থাকবে নাই।

*

কুমীরের সঙ্গে ক'রে আড়ি
জলে বাঁধবে ঘর বাড়ী?

গোয়ালে গরু না বয় হাল,
তার দুঃখ চিরকাল।

*

যার বিয়ে তার মনে নাই
পাড়ার লোকের বাটনা কামাই।

*

নদীর কূলে চাষবাস
তার ভাবনা বারমাস।

*

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
এ দিন সকলের আসে।

*

অতি বড় হবে না ঝড়ে পড়ে যাবে,
অতি ছোট হবে না ছাগলে মুড়াবে।

*

ধার করিলে হবে ঋণ উপোস কর্ত্তে যাবে দিন।

*

পর নিন্দায় নরকে বাস যুগে যুগে সর্ব্বনাশ।

*

অতি বড় সুন্দরী না পায় বর
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।

*

কাল কাপড় রুক্ষ মাথা
দুঃখ বলেন যাব কোথা।

*

যার জন্য করি চুরী সেই বলে চোর
হায় বিধাতা এমনি পোড়া কপাল মোর।

*

মা হওয়া কি মুখের কথা?
যে মা জানে না সন্তানের ব্যথা।

*

নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায়ে হেঁসে।

*

নেই চাল নেই ডাল
গিন্নি বিনে আল্ থাল্।

*

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝেনা।

*

দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

*

ক্ষমার বড় গুণ নাই
দানের বড় পুণ্য নাই।

*

কু-চিন্তা যার নিশিদিন
শরীর তার হয় ক্ষীণ।

*

তলোয়ারে রাজ্য জয়
স্নেহেতে হৃদয় জয়।

*

দুঃখের কথা যত চিন্তা করবে।
দুঃখ ততই ভারি হতে থাকবে।

*

অনেক খেতে করে আশা,
তার নাম বুদ্ধি নাশা।

*

থাকো সয়ে পাবে রয়ে
দিন নয় যে যাবে বোয়ে।

*

ছেলে মারো কাপড় ছেঁড়ো
আপনার ক্ষতি আপনি কর।

*

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু জানিবে নিশ্চয়।
লোভে পোড়ে মানুষের সব নষ্ট হয়।

*

মা খায় ধান ভেনে
ছেলে খায় এলাচ কিনে।

*

যার কপালে আছে দুঃখ
ফাটালে মাথা হয় না সুখ।

*

যদি কন্যা সুপাত্রে পড়ে
শত পুত্রের কাজ করে।

*

আপন ধন পরকে দিয়ে
বৈষজ্ঞ বেড়ান হাবাতে হয়ে।

*

চক্ষু মানবের পরম শত্রু
আবার শ্রেষ্ঠ মিত্র।

*

মিছা কথা সেঁচা
জল কতক্ষণ রয়।
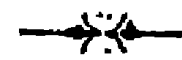
*

ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছ রোপণের উপকারিতা

এ দেশে ম্যালেরিয়ার কারণ যাহাই হউক না কেন, ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত যে বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং যাহাতে ম্যালেরিয়া প্রশমিত হয়, তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ইণ্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স গেজেট' পত্রে নীলগিরিতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছের পত্তন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠে জানা যায় যে এই গাছ অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হয়; এবং ইহারই কল্যাণে নীলগিরিতে জ্বালানী কাঠের যত সুবিধা আর কোন পার্ব্বত্য সহরে তত সুবিধা নাই। আবার ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রশমিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের বন-বিভাগ এই গাছ চাষের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল জানা যায় নাই। ব্রহ্মে জ্বালানী কাঠের অভাব নাই বটে, কিন্তু তথায় এক ম্যালেরিয়ায় যত লোক মরে—কলেরা, বসন্ত, প্লেগএ সব রোগে তত মরে না। সুতরাং এই গাছে যখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রশমিত হয়, তখন ইহার চাষ করা ভাল। বাংলায় ইউ-ক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছ বেশ বাড়ে—দেখা গিয়াছে। বাংলায় জ্বালানী কাষ্ঠের যেমন অভাব, ম্যালেরিয়ার প্রকোপও তেমনিই প্রবল। এ অবস্থায় বাংলার গৃহস্থেরা যদি গৃহসংলগ্ন জমিতে এই গাছ লাগান, তবে ভাল হয়। মিউনিসি-প্যালিটি ও জেলাবোর্ড রাস্তার ধারে এই গাছ লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহার তৈল সর্দ্দি কাশীর ঔষধ—ইহার ফুলের গন্ধও মনোরম। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে লোকে নিম্বতরু রোপন করিত; লোকের বিশ্বাস ছিল—নিম্বতরু দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করে। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বাস, সকারণ কি অকারণ, বিচার না করিয়াই আমরা সে সব কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকি। তাই এখন রাস্তার ধারে রেনট্রি গোল্ডমোহর ট্রি প্রভৃতির বাহার খুলিতে দেখা যায়। যে সব গাছে লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, সে সব গাছের আদর না করিয়া আমরা পাতাবাহারের ও রঙ্গিলা ফুলের গাছেরই আদর করি—রজত ফেলিয়া রাঙ্গের পশরা মাথায় তুলিয়া লই। প্রাচীন সংস্কার সবই কুসংস্কার—ইহাও যে একটা কুসংস্কার। আমরা জানি, বাংলার মাটিতে এই গাছ বেশ বাড়িয়া থাকে। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাংলায় যাহাতে এই গাছের চাষ হয়, তাহার চেষ্টা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এবিষয়ে সরকারের মুখ চাহিয়া থাকিতেও হয় না।"

ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ বৃক্ষের শাস্ত্রীয় নাম ইউক্যাপ্‌টস গ্লোবিউলস। অষ্ট্রেলিয়া ও ট্যাস্‌মেনিয়ার অরণ্যে জাত মার্টেণী জাতীয় বৃক্ষ। যে জলে ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি জীবাণ থাকে, ইউক্যালিপ্‌টাস সংস্পর্শে তাহা বিশোধিত হয়, এমন কি, কোন জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী ইউক্যালিপটাস বৃক্ষের পত্র সেই জলাশয়ে পতিত হইলে তাহার জল দূষিত হওয়া দূরের কথা, সেই জল পান ম্যালেরিয়া জরের প্রতিষেধক। নিম্নতল, আর্দ্র, ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে এই বৃক্ষ রোপিত হইলে সেই স্থান স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। যে স্থানে এই বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না। ইউক্যালিপ্‌টাসের পত্র চর্ব্বণ করিলে দন্তের রোগজনিত রক্তস্রাব বন্ধ ও দন্তমুল দৃঢ় হয়। ইহার পত্রের ধুমপান করিলে হৃদরোগ জনিত শ্বাসের উপশম হইয়া থাকে।

কাঁসাই নদীতে 'এনিকট' নির্ম্মাণ করায় নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া গিযাছে। তাহার ফলে মেদিনীপুরের মত স্বাস্থ্যকর নগর ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস,—যদি মেদিনীপুরের বড় বড় রাস্তাগুলির ধারে ও আবদ্ধ কাঁসাই তীরে ইউক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষ রোপিত হয়, তবে মেদিনীপুরে আর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থাকে না। যদি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মফঃস্বলের বড় বড় রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে ইউক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষ রোপন করিবার ব্যবস্থা করেন তবে মফঃস্বলের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে। যখন সরপাই নদীতে জোয়ার ভাটা খেলিত, তখন কাঁথিতে ম্যালেরিয়ার নামগন্ধ ছিল না। সরপাই নদী কেনেলে পরিণত করতঃ তাহা লক দ্বারা আবদ্ধ করার পর হইতে কাঁথিতে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। যদি পূর্ত্ত বিভাগ কেনেলগুলির উভয় পার্শ্বে ইক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষ রোপণ করেন তবে এ অঞ্চল আবার স্বাস্থ্যকর স্থান হইতে পারে। আমরা এই অত্যাবশ্যক বিষয়ের দিকে মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ও পূর্ত্ত বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আজকাল ইউক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষের চারা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নার্শারিতে ও চারা ওয়ালাগণের নিকট পাওয়া যায়। এক একটি চারার মূল্য এক আনা দুই আনার অধিক নহে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ পর্য্যন্ত এ চারা ক্রয় করিয়া আপনাদের বাটীর সংলগ্ন ভূমিতে লাগাইতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের বাটীও স্বাস্থ্যজনক হইবে, জ্বালানী কাষ্ঠেরও অভাব দূর হইবে। ইউক্যালিপ্‌টাসের বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে চারা উৎপন্ন করিলে অতি অল্প ব্যয়ে কাজ হয়।

তৈলে পুষ্প গন্ধ নিষিক্ত করিবার প্রণালী

বাজারে যে সমস্ত সুগন্ধি তৈল বা অন্য গন্ধ দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহাদের অধিকাংশই পুষ্প হইতে সংগৃহীত হয় না। নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে বর্ত্তমানে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ কিরূপে নিজ নিজ ব্যবহারের তৈল সুগন্ধযুক্ত করিতে পারেন, এই প্রবন্ধে তাহাই লিখিত হইতেছে। কলিকাতায় এরূপ করা গৃহস্থগণের পক্ষে সম্ভব নহে; কেননা পুষ্প সংগ্রহ ব্যাপার কলিকাতা-বাসীর নিকট অসম্ভব। পল্লীর প্রশস্ত গৃহ প্রাঙ্গণে নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ উৎপাদিত হইতে পারে। এই সমস্ত পুষ্প স্বচ্ছন্দে তৃপ্তিকর ও নির্দ্দোষ বিলাসের উপাদানে ব্যবহৃত হইতে পারে। গৃহস্থের স্ত্রী ও কন্যাগণ একটু চেষ্টা করিলেই অনায়াসে এই সমস্ত পুষ্পের সৌরভ তৈলে নিষিক্ত করিতে পারেন। মোটামুটি যে সমস্ত পুষ্পে কোনরূপ সৌরভ আছে, সেই পুষ্প হইতেই তৈল সুগন্ধ করা যায়। তবে কোন কোন পুষ্পে তৈল উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত হয়, কোন কোন পুষ্পে সেরূপ হয় না। কেননা কোন কোন জাতীয় ফুলের সুগন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কর্ষণ করা যাইতে পারে না। গোলাপ, বেল, যুঁই মল্লিকা, বকুল, শেফালী প্রভৃতি ফুলে গন্ধ অতি শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে চোয়ান যায়। প্রথমে এই সমস্ত ফুল লইয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুষ্প চয়ন করিবার সময় স্থির করিয়া লওয়ার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কেননা প্রত্যেক পুষ্পই তাহার জীবনের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েই অতিশয় সৌরভময় হইয়া উঠে। সেই সময় পুষ্প চয়ন করা প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে সদ্য মুকুলিত কুসুমই অতিশয় সৌরভময়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ নাও হতে পারে। কাজেই দুই একবার পরীক্ষা করিয়া কোন্ সময়ে কোন্ পুষ্পের গন্ধ অধিক আমোদজনক হইয়া উঠে, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে হইবে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, যে, সদ্য মুকুলিত ফুল অপেক্ষা যখন পুষ্পের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ দল, পরাগ কেশর, গর্ভ কেশর ইত্যাদি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই গন্ধে দিক আমোদিত হইয়া উঠে। তখনই পুষ্প চয়নের শ্রেষ্ঠ সময়। দিবা দ্বি-প্রহরের পূর্ব্বে পুষ্প চয়ন কর্ত্তব্য, কেননা আমাদের দেশের দারুণ সূর্য্যতাপে পুষ্প অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। অথচ প্রভাতেই চয়ন করা উচিত নহে; কেননা ফুলের গাত্রে শিশির বা কোনরূপ জলীয় পদার্থ লাগিয়া থাকিলে, তাহা হইতে সুন্দররূপে গন্ধ নিষিক্ত করা যায় না। পুষ্প সঞ্চয় করিবার পরেই যদি তাহাতে জল লাগিয়া আছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত পুষ্প "চালুনী" বা লোহার জালের কোনরূপ চৌকা

কাঠাম বা ঐরূপ কোন পাত্রে ফুলগুলি ধীরে ধীরে সাজাইয়া আস্তে আস্তে চালুনী বাতাসে দোলাইলেই জল বাষ্পীভূত হইয়া যায়। চালুনীর ছিদ্রগুলি যেন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, অর্থাৎ যেন সর্ব্বদিক দিয়া পুষ্পের গাত্রে বাতাস লাগিতে পায়। এক একটি চালুনীতে এক স্তরের অধিক পুষ্প কখনই রাখা উচিত নহে। চয়ন করিবার পরেই যতশীঘ্র সম্ভব পুষ্পগুলিকে জল হীন করা প্রয়োজনীয়। নতুবা ফুলের পাপড়ীগুলি ঝিমাইয়া পড়ে ও বিবর্ণ হইয়া যায়, কাজেই সুগন্ধও অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। তাড়াতাড়ি ফুলের চালুনী কয়েকবারমাত্র দোলাইলেই পুষ্পসমূহ প্রায় বেশ জলহীন হইয়া যায়। আর তৈল সম্বন্ধে এই যে, যে তৈলে কোনরূপ স্বাভাবিক গন্ধ আছে তাহা তত ভাল হয় না। সরিষার তৈলে একটা বিশেষ গন্ধ আছে; কাজেই সরিষার তৈলে কোন কার্য্য হইবে না। বাজারের নারিকেল তৈলের স্বাভাবিক গন্ধ দুরীভূত করা অসম্ভব। গন্ধহীন স্বচ্ছ নারিকেল তৈল ক্রয় করিতে পারা যায়। উহার মূল্য কিছু অধিক। অতি পরিষ্কৃত, স্বচ্ছ, জলবৎ তরল, গন্ধহীন রেড়ীর তৈলও সুলভ। শেষোক্ত তিন প্রকার তৈলে বেশ কাজ চলিতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ "লাক্কা" তৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লাক্কা তৈল অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা বিশুদ্ধ অলিভ (olive oil) ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোনরূপ জান্তব বা খনিজ তৈল মিশ্রিত থাকিলে আদৌ ভাল হয় না। অত্যুৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ তৈলে কোনরূপ

গন্ধ থাকে না, কাজেই এই সমস্ত তৈলে পুষ্পের সৌরভ অতি শীঘ্র নিষিক্ত হইয়া যায়। ইহার পরে কতকগুলি তুলার কোমল গোলাকার "নুটি" প্রয়োজন। নুটিগুলি যেন অত্যধিক মোটা পাতলা না হয়। অতঃপর কতকগুলি প্রশস্ত মুখ পাত্র প্রয়োজন। পাত্রগুলি কাচের হইলেই ভাল হয়। ৪ ইঞ্চ প্রশস্ত মুখ ৭ ইঞ্চ লম্বা বোতলের মূল্যও অধিক নহে। তুলার নুটি গুলি যেন বোতলের মুখ দিয়া অনায়াসে প্রবেশ করান যাইতে পারে। কোনরূপ ধাতব তৈজসের সম্পর্ক না রাখাই ভাল। বহুসংখ্যক তুলার নুটি প্রস্তুত করিয়া রাখা ভাল। একটা এনামেল বা চীনা মাটির গামলায় তৈল ঢালিয়া তাহাতে নুটিগুলি সিক্ত করিয়া লইতে হইবে। তৈলে নুটিগুলি রীতিমত ভিজিয়া যাওয়া প্রয়োজন। কাজেই তৈলের গামলায় নুটী-গুলিকে কিয়ৎকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ইতি-মধ্যে ফুলগুলিকে বাছিয়া ফেলা যাইতে পারে। ফুলগুলি একটি একটি করিয়া চালুনী হইতে তুলিয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হইবে। ফুলের গাত্রে কর্দ্দম বা ময়লা যেন লাগিয়া না থাকে। যদি লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্তগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে, ধুইয়া লইলে চলিবে না। ফুলের সহিত পাতা বা অন্য কিছু যেন আসিয়া না পড়ে। ফুলগুলি পাত্রান্তর করিবার সময় পাপড়িগুলি যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিতে হইলে খানিকটা লবণের প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত মুখ বোতলগুলি রীতিমত পরিষ্কৃত না থাকা আবশ্যক। যদি পরিষ্কত না থাকে, তবে সাবান দিয়া বা অন্য উপায়ে রীতিমত ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া জলহীন করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর একটি বোতলের তলায় সামান্য লবণ ছড়াইয়া দাও। সেই লবণের উপর এক স্তবক পুষ্প রক্ষা কর। তাহার উপর তৈলসিক্ত তুলার নুটি চাপাইয়া দাও, তাহার উপর আবার লবণ ছড়াইয়া দাও, তাহার উপর আর এক স্তবক ফুল চাপাইয়া দাও, তাহার উপর তৈল সিক্ত নুটি দাও, তাহার উপর আবার লবণ দাও, ইত্যাদি। এইরূপে বোতল পূর্ণ হইয়া যাইলে, অতি সামান্য চাপ প্রয়োগে আরও দুই এক স্তবক লবণ, ফুল ও নুটি চাপা-ইয়া বোতলটি নুটি ও ফুলে ঠাসিয়া ফেলিতে হইবে। ক্রয় করিবার সময় সেই সমস্ত প্রশস্ত মুখ বোতলের জন্য কাচের ছিপি পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ছিপির পাশ দিয়া প্রায়ই ফাঁক থাকে। সেই জন্য প্রথমে বোতলের মুখে আলগা করিয়া একখণ্ড কাগজ চাপা দিয়া তবে এই ছিপি আঁটিয়া দিতে হইবে,—অর্থাৎ বোতলের ভিতর যেন বায়ুর সংস্পর্শে না আসে। পার্চ্চমেণ্ট অথবা যে কাগজে তৈল লাগিলে কাগজ খারাপ হইয়া যায় না এইরূপ কাগজ হইলেই ভাল হয়। বোতল পূর্ণ করা হইয়া যাইলেই বোতলের মুখ বন্ধ করা, দরকার। কেননা খোলা থাকিলে ভিতরের জিনিস খারাপ হইয়া যায়। এইবার বোতলগুলি এমন স্থানে রাখিতে হইবে, যেখানে এগুলি সর্ব্বদা রৌদ্র পায়। ফলতঃ বোতলে যত রৌদ্র লাগিবে, ফলও ততই ভাল হইবে। যদি এরূপ স্থানের নিতান্তই অভাব হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃতি উত্তপ্ত, রৌদ্রের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রাখিলেও চলিতে পারে। এইরূপে বোতল-গুলিকে নিম্ন পক্ষে দশ, উর্দ্ধ পক্ষে একপক্ষ রাখা প্রয়োজন। এই সময়ের পরে বোতল-

গুলির ছিপি খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং বোতলের মুখে শুভ্র পুরাণ ছিন্ন-উড়ানী খণ্ড বা কোনরূপ পরিষ্কৃত পাতলা ন্যাকড়া বাঁধিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ছাঁকিবার পূর্ব্বে হাতা বা চামচের দ্বারা মুটিগুলি টিপিয়া তৈল নিঙ্গাড়ইয়া ফেলিতে হইবে। দেখিবে এই তৈল মনোরম সৌরভময় হইয়া উঠিয়াছে। অকৃত্রিম পুষ্প গন্ধে মন বাস্তবিকই তখন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তবে ফুলের গন্ধ যদি ক্ষীণ হয়, তবে তৈল গন্ধও অতি ক্ষীণ হইবে। বাজারে যে সমস্ত সুগন্ধী তৈল পাওয়া যায়, তাহাদের অপেক্ষা এই সমস্ত গৃহে প্রস্তুত তৈলের গন্ধ অধিকতর কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। তৈল বাহির করিয়া লইয়া বোতলে বেশ রীতিমত ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। সময়ে সময়ে দুই তিন প্রকারের পুষ্প মিশ্রিত করিয়া তৈল সুগন্ধ করা যায়। কিন্তু কোন্ ফুলের সহিত কোন্ ফুল মিশিতে পারে, এবং কোন্ ফুলের কোন পরিমাণ মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত সমস্ত ফুলের গন্ধ সমান থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পুষ্পের সহিত কোন পদার্থ মিশাইয়া দিলে আরও অধিকতর সুগন্ধ হয়। অনেকে পুষ্পের সহিত লবঙ্গ মিশাইয়া দেন; তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে তৈলের গন্ধ বাস্তবিকই অতি মনোহর হইয়া উঠে। তৈল গন্ধময় হইবার পরেই ব্যবহার করা উচিত নহে। অন্ততঃ এক সপ্তাহ রাখিয়া ব্যবহার করিলে দেখা যায় যে, তৈলের গন্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সময়ে সময়ে এরূপ হয় (অথবা প্রায়ই হয়) যে তৈল বোতল হইতে ছাঁকিয়া লইবার সময় বেশ গন্ধ ছিল, কিন্তু ৭।৮ দিন পরে ব্যবহার করিবার সময় গন্ধ হয় একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, বা অতি সামান্য আছে। কিন্তু গন্ধের এরূপ তিরোধান সাময়িক মাত্র। আর ২।৪ দিন অপেক্ষা করিলেই দেখা যায় যে, গন্ধ দ্বিগুন বা ত্রিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার কারণ কি আজ পর্য্যন্তও নির্ণীত হয় নাই। তৈলের শিশির ছিপি আদৌ খুলিয়া রাখা উচিত নহে। ব্যবহার করিবার পরেই ছিপি আঁটিয়া রাখা ভাল। নতুবা অনেক সময়ে গন্ধ হ্রাস হয় এবং অনেক কাল থাকে না।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ
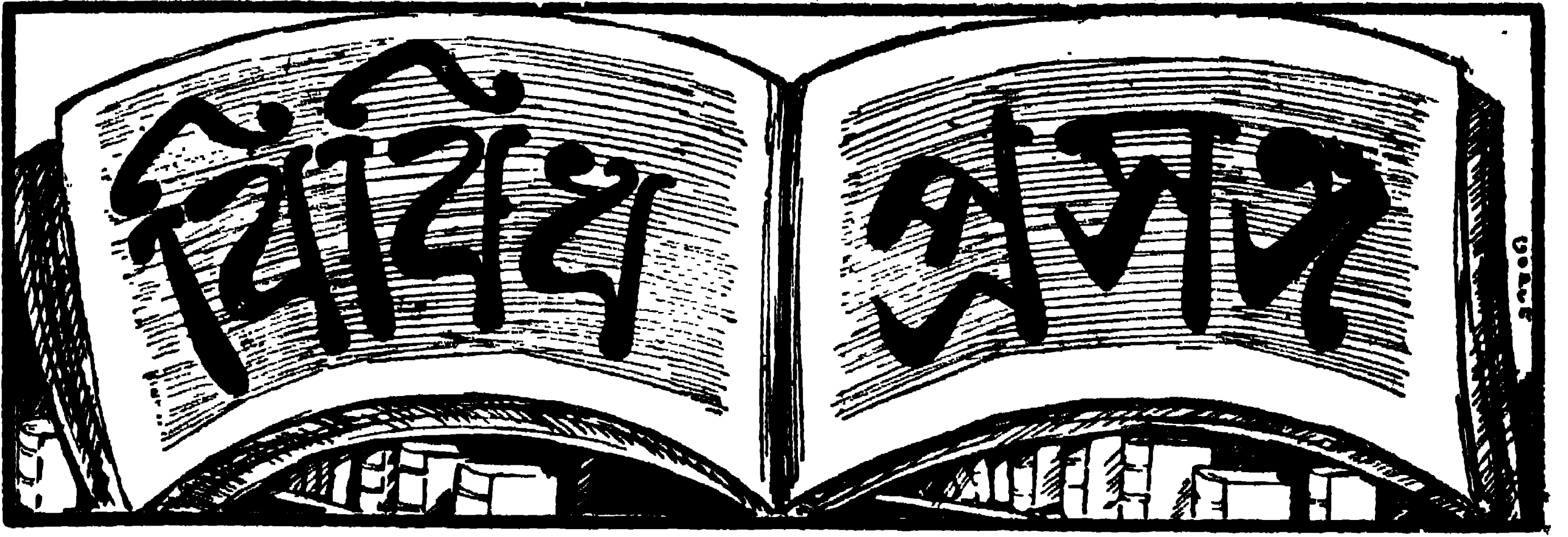
জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন

ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন যে, কিছুদিন হইতে জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন সম্পর্কে ভারতময় তীব্র আন্দোলন চলিতেছে এবং ঐ আন্দোলন কিছুমাত্র কমে নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথমে বণিক সমিতি একবাক্যে স্থির করিয়াছিল যে, তাহারা প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী পুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত জাঞ্জিবারের লবঙ্গ আমদানী করিবে না। বোম্বাই-এর ডকে মাল আসিয়া পৌছিলেও কোন কুলি তাহা খালাস করে নাই, কলিকাতার ডকেও ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বণিক সমিতির নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া বেনামীতে মাল আমদানী করিতেছে। ইহারই জন্য বোম্বাইতে পিকেটিং সুরু হইয়া গিয়াছে, বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস তাহার তদারক করিতেছেন।

লবঙ্গ বর্জ্জন সংক্রান্ত বোম্বাই-এর এক সভায় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রত্যেকটি পরিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত। লবঙ্গ সাধারণতঃ একটি বিলাসের সামগ্রী; সুতরাং ভারতবাসীর আত্মসম্মানের প্রশ্ন যেখানে সেখানে বিলাসের দ্রব্য বর্জ্জন করিলে কিছুই আসে যায় না। নিখিল ভারত লবঙ্গ বর্জ্জন কমিটি সারা ভারতময় 'বর্জ্জন দিবস' পালন করিবার জন্য শীঘ্রই একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বোম্বাই-এর দুইটি ডকে যথাক্রমে পাঁচশত ও নয়শত গাঁইট লবঙ্গ পড়িয়া আছে।

ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর জাঞ্জিবার হইতে বড় কম পরিমাণ লবঙ্গ আমদানী করে না। প্রতি বৎসর গড়ে ৩৫ হইতে ৪০ লক্ষ টাকার লবঙ্গ জাঞ্জিবার ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আমদানী হয়। পক্ষান্তরে প্রতি বছর ভারতের লবঙ্গ রপ্তানীর পরিমাণ হইল মাত্র ৮ হাজার টাকার। কাজেই বর্জ্জন আন্দোলন চালাইয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া আমরা যদি জাঞ্জিবার গবর্ণমেণ্টকে চাপ দিতে পারি তাহা হইলে প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী পূরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বরোদা রাজ্য হইতে বাংলায় লবণ আমদানী

লবণ যে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় ও

অপরিহার্য্য সামগ্রী একথা শিশুতেও বোঝে। উক্ত সামান্য লবণ দ্রব্য প্রস্তুতের অধিকার লইয়া ১৯৩০ সালে যে দেশব্যাপী আন্দোলন হইয়া গেল তাহা লোকে ভুলে নাই। তাহারই ফলে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী লোকেরা লবণ প্রস্তুতের অধিকার পাইয়াছে। আমরা জানি যে, মেদিনীপুর অঞ্চলের বহু গরীব অধিবাসী আজকাল আর লবণ ক্রয় করে না, নিজেদের লবণ নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। এমনও দেখা যায় যে, তাহারা লবণ বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা লাভ করিতেছে। বস্তুতঃ, আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকার লবণ প্রতি বৎসর প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা যদি আমরা নিজ দেশে উৎপাদন করিতে পারি তবে সেই টাকাটা দেশে থাকিয়া যায়। লিভারপুর ও এডেন হইতে যে, আমাদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ লবণ চালান আসে সেকথা অনেকেই জানেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে কয়েকটি কোম্পানী লবণ উৎপাদনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্য তাঁহারা সেরূপ সুবিধা করিতে পারিতে ছিলেন না। সেইজন্য লবণ

শুল্ক স্থাপনের জন্য তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

আমাদের এই দেশেই যে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতে পারে সে-সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। বরোদা রাজ্য হইতে যে বিরাট পরিমাণ লবণ বাংলাদেশে চালান আসে তাহা হইতে উক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। বেঙ্গল সল্ট্ ম্যান্থফ্যাকচারিং কোম্পানী ও অপর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও উৎকৃষ্ট লবণ উৎপন্ন করিতেছে। বরোদা রাজ্যের ওখা সল্ট্ ওয়ার্কস্-এ (Okha Salt Works) ৫৮,৮৯০ টন লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল তন্মধ্যে ৫১,৩২২ টন বাংলাদেশে চালান আসিয়াছে।

বরোদা রাজ্যে শিল্পোন্নতি

বরোদা রাজ্যে যে ক্রমশঃ শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে তাহা সেখানকার সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায়। বরোদার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ১৯৩৬-৩৭ সালের বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে, সেখানে ১৫টি সূতা ও কাপড় প্রস্তুতের কল চলিতেছে। সেগুলিতে ৭৯,৩৩৪ গাঁইট তূলা ব্যবহৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ৫০,২৯৪ গাঁইট ভারতীয় তূলা ও ২৯,০৪০ গাঁইট্ বিদেশীয় তূলা।

দ্বারকার ওখা (Okha) সিমেণ্ট কোম্পানীর ৮৭,২১৭ টন সিমেণ্ট বিক্রীত হইয়াছিল। ওখা বন্দরে সর্ব্বসমেত ৪২,৫২৬ টন মাল আমদানী ও ১,৩৬,৩৬৫ টন মাল রপ্তানী হইয়াছিল, তাহা হইতে শুল্ক বাবদ ১০,৭৯,১৬৮ টাকা আয় হইয়াছে।

সমস্ত শিল্প ব্যাপারে ২৭,৫৩৭ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ১০৭ জন কম। চারটি কাপড়ের কলে মালিকেরা মাহিনা কাটার ব্যবস্থা করায় দীর্ঘকালের জন্য ধর্ম্মঘট হয় এবং ঐ ধর্ম্মঘটে ২৩,৮৯,৫০০ ঘণ্টা কাজ নষ্ট হইয়াছে। বৃটিশ ভারতের সংশোধিত ফ্যাক্টরী আইন এখানে প্রবর্ত্তিত করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

কাঁচশিল্পের জন্য সংরক্ষণী শুল্ক দাবী

সকলেই জানেন যে দেশীয় কাঁচশিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। এই শিল্পটি আমাদের দেশের শিশু শিল্প বলিয়াই গণ্য হয়, সুতরাং ইহার সহায়তা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ১৯৩৫ সালে এই শিল্পটি বিদেশী প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য সংরক্ষণী শুল্ক দাবী করিয়াছিল, কিন্তু এসম্পর্কে ট্যারিফ বোর্ড সুপারিশ করা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট সেই দাবী গ্রাহ্য করেন নাই। এই দাবী অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য ছিল যে, যেহেতু কাঁচ প্রস্তুত করিবার জন্য কাঁচামাল 'সোডা য়্যাশ' বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় সেই হেতু দেশীয় কাঁচ-শিল্পের উপর সংরক্ষণী শুল্ক স্থাপন করা চলিতে পারেনা। তাহার পর এই শিল্পের তরফ হইতে বহুবার আবেদন করায়ও সরকার তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করেন নাই। অবশ্য সরকার কাঁচশিল্পের সামান্য সুবিধার জন্য বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সোডা-য়্যাশের উপর একটা রীবেট প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোন সুবিধা হয় নাই। কারণ গভর্ণমেণ্টের শুল্ক বিভাগের ব্যাপার এত জটিল যে, রিবেট লাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে দেশীয় কাঁচশিল্পের অধিকাংশ শক্তি আত্মরক্ষার্থেই

ব্যয়িত হইয়াছে এবং সেই জন্যই এই শিল্প এখনো আত্মনির্ভরশীল হইয়া ভালভাবে দাঁড়াইতে পারে নাই। বিদেশী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জাপানই হইল দেশীয় শিল্পের সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। অপরাপর ব্যবসার ক্ষেত্রে জাপান যেমন দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে, কাঁচ শিল্পের ব্যাপারেও ঠিক তেমনটি ঘটিতেছে। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে, এই শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণী শুল্ক স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক।

এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট বেঙ্গল

গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারার্স এ্যাসোসিয়েসন্স্-এর তরফ হইতে পুনরায় এক আবেদন প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কাঁচ-শিল্পের উপাদান সোডা-য়্যাস বিদেশ হইতে আমদানী হয় এই অজুহাতে গভর্ণমেণ্ট যে দেশীয় শিল্পের উপর সংরক্ষণী শিল্প স্থাপন করেন নাই তাহাতে দেশীয় শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কোন শিল্পের একটি উপাদান বিদেশ হইতে আমদানী হয় বলিয়াই যে সেই শিল্প সংরক্ষণী শুল্কের সুবিধা পাইতে পারিবে না এইরূপ সিদ্ধান্তের মধ্যে দারুণ মতবিরোধ আছে। কিন্তু কাঁচশিল্পের ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে এতটা অবস্থান্তর ঘটিয়াছে যাহাতে গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব অজুহাত আর টিঁকে না। বর্ত্তমানে এইদেশেই সোডা-য়্যাশ প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের মত বিখ্যাত কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে সোডা-য়্যাশ উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দেশীয় কাঁচশিল্পের উপর সংরক্ষণী শুল্ক স্থাপন করতঃ এই শিল্পটির সহায়তা করা উচিত।*

লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলে ডাঃ মেঘনাদ সাহা

সম্প্রতি ডাঃ মেঘনাদ সাহা এ্যাডিশনাল্ ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ্ মিঃ এফ, কে. গুপ্ত; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের রীডার কেদারেশ্বর বন্দোপাধ্যায়; কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের এজেণ্ট মিঃ এফ, সি, নাগ; সোনার বাংলা পত্রিকার সম্পাদন নলিনী কিশোর গুহ ও আরও অনেকের সমভিব্যাহারে লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে মিলের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী দেখানো হয় এবং তাঁহারা মিলের আধুনিক উন্নতপ্রবণের যন্ত্রপাতির কার্য্যের প্রভূত প্রশংসা করেন।

* আমাদিগের এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার পর আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দেশীয় কাচ শিল্প রক্ষাকল্পে সংরক্ষনী শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে দেশীয় কারখানা সমূহ রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা হইল। সম্পাদক

গোচারণ ভূমি

"ডাইয়েরি মেন" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশ যে, যে জমিতে সার দেওয়া হয়, সেই জমিতে দুগ্ধবতী গাভী চরিলে দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। হার্পার আডাম এগ্রি-কাল্চার কলেজে ইহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল, সেই পরীক্ষার ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যে জমিতে সার দেওয়া হয়, তাহার ঘাস খাইলে প্রত্যেক গাভী সপ্তাহে ২০ পাউণ্ড দুগ্ধ প্রদান করে, সার না দেওয়া জমিতে চরিয়া সেই সকল গাভীর দুগ্ধ মাত্র ১৭ পাউণ্ড হয়। পার্থক্য অনেক। এদেশের গোচারণ ভূমি প্রায় মরু সদৃশ্য জমিই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, গোচারণের বিশিষ্ট জমির অভাবেই এদেশে প্রচুর অনাবাদী জমি থাকিতেও দুগ্ধ কষ্ট। সাধারণের ইহা জানা উচিত, আবাদী জমির সতেজ তৃণ ভক্ষণে যে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি? ভারতের গাভীর ন্যায় দুর্দ্দশা অন্য কোন দেশেই নাই। অর্থলোভী ভারতবাসী এখন গোচারণের জমি নষ্ট করিয়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই জমি চাসের করিয়া লইতেছে। গরু চরিবার স্থান লোপ হইয়া যাইতেছে, প্রতিবিধান করে কে?

আম্র

মিঃ ডি, এল, নারায়ণ রাও হায়দ্রাবাদের নরসারী গার্ডেনের স্বত্বাধিকারী। ইনি বলেন যে, নিম্ন এবং উচ্চ উভয় প্রকার ভূমিতেই আম্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে কিন্তু একথা ঠিক নহে। যে সকল জমি সাধারণ জমি অপেক্ষা প্রায় ৫ ফিট গভীর, অথচ জল নিকাশের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে, অথচ মাটি নরম, এইরূপ জমিতেই যাবতীয় উৎকৃষ্ট আম্রের সুন্দর ফলন দেখা যায়। আমরাও একথা মিথ্যা মনে করি না। দামোদর প্রভৃতির গর্ভজাত চড়ার জমি সাধারণ জমি অপেক্ষা বিলক্ষণ নিম্নভূমি কিন্তু এই সকল নিম্নভূমির আম্র বৃক্ষ সাধারণ বাগানের আম্র বৃক্ষ অপেক্ষা সতেজ এবং সুমিষ্ট ফলপ্রদ। সরস ভূমির আম্র আকৃতি এবং প্রকৃতিতে ভাল হইয়া থাকে।

রঞ্জনশিল্পের ইতিহাস

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক জগতে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই আধুনিক কালে তাঁহাদেরই প্রতিভা বলে সম্পাদিত, এক কথায়, প্রাচ্যদিগের গৌরব করিবার কিছুই নাই। উক্তরূপ সিদ্ধান্তের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, এবং উহা অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা বা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু প্রতীচ্যগণ নিজেদের জ্ঞান-গৌরব ঘোষনায় যতই একদেশ-দর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখান না কেন, একটি বিষয়ের জন্য তাঁহারা যে প্রাচ্যজাতি সমূহের নিকট ঋণী, তাহা অম্লানভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। সে বিষয়টি "রঞ্জন বিদ্যা"।

কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের প্রবৃত্তি কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে। উক্তরূপ প্রবৃত্তি হইতেই রঞ্জন কলার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে মানবজাতির সভ্যতালোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নানাপ্রকার বৃক্ষপত্র পুষ্প বল্কল বা মূলের ক্বাথ্ এবং বিভিন্ন প্রকার ফলের রস দ্বারা অস্থায়ী (fugitive) রঞ্জন কার্য্য সম্পাদিত হইত, এবং উহা গৃহকার্য্যের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। গৃহস্থ ললনাগণ সূত্র প্রস্তুত এবং বস্ত্র-বয়নের ন্যায় স্ব স্ব পরিবারের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি স্বহস্তে রঞ্জিত করিতেন। এখনও নিউজিল্যাণ্ডের (New Zealand) "মেওরিদের" মধ্যে এবং অন্যান্য আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে উক্তরূপ রঞ্জন প্রথা প্রচলিত আছে। কালে রং স্থায়ী করিবার জন্য রঞ্জন উপকরণের সঙ্গে রংবন্ধকারী (mordant) রূপে লৌহ বা ফিটকারী সংযুক্ত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত। এইরূপে অতি প্রাচীন কালেই রঞ্জন-কলার সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু রঞ্জন-কলা প্রকৃত শিল্পরূপে ভারত-বর্ষেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার সুন্দরবর্ণে স্থায়ীভাবে রঞ্জন করিবার বিধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং রঞ্জিত বস্ত্রাদি ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই ও সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইত। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হোমার, ষ্ট্রেবো, হেরোডোটাস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকগণও এ বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেবতাদিগের মধ্যে কেহ সর্ব্বদা পীতবর্ণে রঞ্জিত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন বলিয়া পীতাম্বর আখ্যা প্রাপ্ত

হইয়াছেন ; কেহ নীলবর্ণের পোষাকে শোভিত হইতেন বলিয়া নীলাম্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আজীবন পীতবর্ণ কৌপীন পরিধান করিতেন। বৈষ্ণবগণ গেরুয়া রঙ্গের রঞ্জিত কাপড় পরিতেন, আবার অনেকে কমলা রঙ্গে রঞ্জিত কাপড় ও চাদর ব্যবহার করিতেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রঞ্জিত বস্ত্রাদি বর্ণের স্থায়ীত্ব এবং উজ্জ্বলতার জন্য পশ্চিমে পারস্য ও আরব হইতে পূর্ব্বে শ্যাম ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এশিয়ার সমগ্র দক্ষিণাংশেই আদৃত এবং উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রমে ভারতবর্ষের রঞ্জিত বস্ত্রাদি আরববণিকদিগের দ্বারা পারস্য ও আরব উপসাগরের পথে ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশে প্রেরিত হইতে থাকে। এইরূপে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ এবং মিশর দেশে বিশেষ লাভজনক একটি ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষ হইতে রঞ্জন উপকরণসমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় রঞ্জন-প্রণালী অনুকরণ করিয়া মিশরীয়গণ নিজেরা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে আরম্ভ করে। ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মিশরীয়গণ কি কি উপায়ে রঞ্জন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিত, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রঞ্জন-বিদ্যা বা রঞ্জন শিল্প কোনও সময়ে কোনও একস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক দেশে অল্পাধিক মাত্রায় রঞ্জন কলায় জ্ঞান ছিল। প্রকৃত অর্থকরী শিল্পরূপে রঞ্জন ব্যবসায় যখন যে দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

খৃষ্ট জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ফিনিসিয়া দেশের টায়ার (Tyre) নামক সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জনপদ হইতে এক প্রকার বেগুনী রং আবিষ্কৃত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই উহা টাইরিয়েন পারপ্‌ল (Tyrian Purple) নামে চতুর্দ্দিকে সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। উক্ত রঙ্গের ব্যবসায়ে অনতিকাল মধ্যেই টায়ার একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়া উঠে, এবং টায়ার ও সিডন (Sidon) নামক নগরদ্বয় বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সমৃদ্ধি এবং ধন গৌরবে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার আদর্শ স্থান ছিল। প্লিনি বর্ণনা করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় টায়ার নগরে এতটা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে ঐ স্থানে তৎকালে সাধারণ লোকের বাসের কোনও সুবিধার সম্ভাবনা ছিল না।

প্লিনি এবং তৎসমসাময়িক লেখকগণ টাইরিয়েন পারপ্‌ল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিবার প্রণালী সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মিশরে শক্তিরূপিণী আইসিস (Isis) দেবী ও ভৈরব অসাইরিস (Osiris) দেবের মন্দিরের সেবাইৎগণ নিজেদের পদমর্য্যাদা প্রকাশের জন্য টাইরিয়েন পারপ্‌ল দ্বারা রঞ্জিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে যখন রোমকগণ পূর্ব্বদেশ-সমূহ জয় করেন, রাজকীয় বিধান অনুসারে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্য মধ্যে একমাত্র রাজপরিবারস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অপর সকলের পক্ষে টাইরিয়েন পারপ্‌ল দ্বারা রঞ্জিত পোষাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

উক্ত কঠোর রাজবিধানই টাইরিয়ান পার-প্‌ল শিল্পের অবনতি এবং শেষে লুপ্ত হইবার অন্যতম কারণ। টায়ারের বণিকগণ নিজেদের অধীত বিদ্যা অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। এইরূপে ক্রমে ফিনীসীয়দের অধঃপতনের সঙ্গে উক্ত শিল্প সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়। প্লিনি বর্ণিত পন্থানুসরণে, বহু চেষ্টায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ "টাইরিয়ান পারপ্‌ল" দ্বারা বস্ত্র রঞ্জন প্রণালীর পুনরাবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ইতিহাস-বিশ্রুত রঙ্গ ঔজ্জল্য এবং স্থায়িত্ব উভয় হিসাবেই আধুনিক অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয় সাধ্য রঙ্গসমূহ অপেক্ষাও নিম্নতর স্তরের। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঔজ্জল্য এবং স্থায়ীত্ব হিসাবে টাইরিয়ান পারপ্‌ল অতি নিম্নস্তরের রং হইয়াও প্রাচীনকালে কি প্রকারে এতটা প্রতিপত্তি এবং প্রসার লাভ করিল ?

এ প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে তৎকালীন সভ্যজগতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থার বিষয় মনে করিতে হইবে। সে সময় দক্ষিণ এসিয়ার বহির্ব্বাণিজ্য যেরূপ অনেকটা আরব বণিকদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, ভূমধ্যসাগর-কুলস্থিত দেশসমূহের বাণিজ্যও সেইরূপ অনেকটা ফিনীসীয় বণিকদের আয়ত্তে ছিল। এরূপ অবস্থায় স্বদেশজাত পণ্যের প্রচলনে যে তাহারা সমধিক চেষ্টা করিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, ২।৩ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন সভ্যজগতে ভারতবর্ষ এবং চীন ব্যতিরেকে অন্য কোনও দেশে প্রকৃত অর্থকরী শিল্পরূপে রঞ্জন-শিল্পের প্রচলন ছিল না। কাজেই গ্রীস ও মিশর দেশের অতি সন্নিকটবর্ত্তী টায়ার নগরে আবিষ্কৃত এক মাত্র রং ফিনীসীয় বণিকদের হস্তে যে আশাতীত প্রতিপত্তি লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে রঞ্জিত বস্ত্রাদি সে সময়ে গ্রীক, রোমক্ প্রভৃতির নিকট বিশেষ সহজ-লব্ধ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণী যেরূপ রঞ্জন-শিল্পের কেন্দ্রস্থান, খৃষ্টজন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফিনীসীয় দেশের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ ছিল। উক্ত কারণেই টায়ার নগরের রঞ্জন-শিল্প সম্বন্ধে এস্থলে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা গেল।

পাশ্চাত্য লেখকগণের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে যাহারা রঞ্জিত পোষাক পরিধান করিতেন, তাঁহারা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দৃষ্ট হইতেন, এবং কেবল বিশিষ্ট অনুষ্ঠান উপলক্ষেই রঞ্জিত বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত। আগাষ্টাইন যুগের রোমক লেখকগণের রচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে রঞ্জিত বস্ত্রাদির মহার্ঘতা নিবন্ধন সাধারণ লোকে উহা ব্যবহার করিতে পারিত না।

টমসন (Thomson) এবং সাঙ্ক (Shunk) নামক পুরাতত্ত্ব-সত্যানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকদ্বয় মিশর দেশীয় প্রাচীন শবাধারে সংরক্ষিত শবের পরিধান-বস্ত্রের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে মিশরীয়গণ নীল ও মঞ্জিষ্ঠা (Alizarin) দ্বারা বস্ত্র রঞ্জন প্রণালী অবগত ছিলেন। ঐ শবসমূহ (mummy) যে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বের তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত বস্ত্রাদি মিশর দেশেই অথবা ভারতবর্ষে রঞ্জিত হইত তাহা জানিবার কোনও

উপায় নাই। আফ্রিকায় নানা প্রকার বন্য নীল গাছ পাওয়া গেলেও অতি প্রাচীন-কালে মিশরবাসিগণ কোনও প্রকার রঞ্জনপ্রণালী জানিতেন না। এমন কি কোনও রঙ্গের বিষয়ও তাঁহারা অবগত ছিলেন না। ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে রঞ্জন উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় প্রণালীর অনুসরণে রঞ্জন কার্য্য শিক্ষা করিতেন।*

ফিনীসীয় এবং আলেকজেণ্ড্রিয় বণিকগণ দ্বারা ক্রমে রঞ্জন উপকরণসমূহ এবং রঞ্জন প্রণালী গ্রীসে নীত এবং প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু গ্রীস বা রোমে কি ভাবে এবং কি প্রণালীতে রঞ্জনকার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহার কোনও বিবরণ পাইবার উপায় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপ যে বর্ব্বরতার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিঘাতে তৎকালীন পাশ্চাত্য রঞ্জন শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, এবং রোমক বা গ্রীকদিগের এবিষয়ে যাহা অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল, কালে তাহাও বিস্মৃতির তিমির গর্ভে ডুবিয়া যায়। কিন্তু ইটালিদেশে, বিশেষতঃ সিসিলিতে, রঞ্জনশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই।

নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তবাসী ইহুদিগণ রঞ্জন ব্যবসায়টা তাহাদের নিজস্ব বা একচেটীয়া করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা কোনও মতেই

* Encyclopædia Britanika 10th Ed. 27th Vo P. 555.

তাহাদের রঞ্জন প্রণালীর বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিত না। মিসেস মেরিফিল্ডের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পরিব্রাজক ইহুদী-বৈশ্যকুল-তিলক, টুডেলা (Tudela) নিবাসী বেঞ্জামিন (Benjamin) স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন ১১৬০ হইতে ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে জেরুজালেমে (Jerusalem) ভ্রমণ করিতে যান, তখন ঐ নগরে মাত্র ২০০ জন ইহুদি বাস করিত। তাহারা সকলেই পশমী বস্ত্রাদি রঞ্জনের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিল এবং উহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের করায়ত্ত ছিল। (Beckmen) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ইটালির রঞ্জন ব্যবসায় ইহুদীদিগের (Israelites) অধিকারে ছিল। ক্রমে সিসিলিয়-দের নিকট হইতে ইটালিবাসিগণ রঞ্জনপ্রণালী-সমূহ পুনরায় শিক্ষা করেন। সিসিলি হইতেই ইউরোপে রঞ্জনশিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভেনিসের বণিকগণ প্রাচ্য রঞ্জন-দ্রব্যসম্ভার আমদানী করিয়া পাশ্চাত্য রঞ্জনশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন। ঐ সময় হইতে রঞ্জন শিল্প অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করে ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ফ্লোরেন্স (Florence), ভেনিস (Venice) প্রভৃতি নগরে রঞ্জন ব্যবসায়িদের নূতন নূতন দলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

প্রায় ঐ সময়েই রুবেলেই (Rucellai) নামক জনৈক ফ্লোরেন্সনিবাসী বৈজ্ঞানিক পশ্চিম এসিয়ার উপকূলজাত সামুদ্রিক আগাছা বিশেষ হইতে অরচিল (Orchill) নামক বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালীর পুনরাবিষ্কার করেন। ইটালি হইতে ক্রমে জার্ম্মাণী ফ্রান্স ও ফ্লানডার্সে (Flanders) রঞ্জন শিল্প বিস্তৃত হয়। শেষোক্ত স্থান হইতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এড্ওয়ার্ড একদল শিল্পী আনাইয়া লণ্ডন নগরে রঞ্জন ব্যবসায়ের একটি কোম্পানী স্থাপনের বিশেষ সহায়তা করেন।

ফরাসী দেশের জাতীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত কয়েক খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণী পাওয়া যায়। এই হস্তলিখিত পুঁথিসমূহের অধিকাংশগুলিতে সাধারণ চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি, চিত্রকরের রঙ্গ প্রস্তুত এবং তাহাদের প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। অবশ্য ২১খানা পুঁথিতে রঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী এবং তাহাদের ব্যবহারও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আল্ক্রীয়াস (Alchreus) লিখিত পুঁথিখানাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, ঐ পুস্তকখানা অন্ততঃ ১৪১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং উহার কিয়দংশ তাহারও ৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখি

আলক্রিয়াস্ ব্রেজিল কাষ্ঠ (Brazil wood) অরচিল, নীল কারমেস (Kermes) প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জন প্রণালীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎব্যতিরেকে উক্ত পুঁথিতে রং পাকা করিবার জন্য ফিটকারী ও লৌহ, শির্কাম্ল' এবং কষায়িন (Tannin) প্রভৃতি পদার্থের উল্লেখ আছে। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে ভেনিস হইতে রঞ্জনবিদ্যা সম্বন্ধে ইউরোপে প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকে তৎকালে প্রচলিত রঞ্জন প্রণালীসমূহের বিশদ বিবরণ সংগৃহীত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সংশো-

ধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৫৪৮ সনে রসেটি (Rosetti) ভেনিস্ হইতে তৎকালীন রঞ্জনবিদ্যা সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মেরিফিল্ড (Merrifield তৎপ্রণীত প্রাচীন রঞ্জন পদ্ধতি (Ancient Prctice of Dying) নামক গ্রন্থে বোলাগণা (Bologana) নগরস্থ সেণ্ট সেলভেডর ধর্ম্ম মন্দিরে সংরক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত কয়েকখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতে আলক্রিয়াস বর্ণিত রং সমূহ ছাড়া ওয়ার্ড (Word) বাগাদান বা বাগাডেল (Bagadon or Bagadel নামে অভিহিত ভারতবর্ষজাত নীল, চন্দনকাষ্ঠ, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি কতকগুলি রংএর বিশেষ উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিল্পিগণ নানাপ্রকার রংএর ব্যবহার জ্ঞাত ছিলেন। (ক্রমশঃ

গৃহস্থালীর কথা

পুরাতন অয়েল ক্লথকে নূতন করিবার উপায়।

তারপিণ তৈল ... /৩ সের।

প্যারাফিণ ... ।০ সের।

অল্প অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে পুরাণ অয়েল ক্লথ খানায় পোঁচড়া দিয়া সমস্ত দিন রাত বাতাসে শুষ্ক হইবার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়, শুষ্ক হইলে ফ্লানেলের টুকরা দিয়া ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল হইবে।

—০—

আরসোলার উপদ্রব নষ্ট করিবার উপায়।

সোহাগার সূক্ষ্ম চূর্ণ (Borax) যে সকল স্থানে আরসোলার বসবাস, সেই সকল স্থানে ছড়াইয়া রাখিলে আরসোলা পলাইয়া যায়। পরীক্ষা করা উচিত।

চিতিপড়া মুক্তা পরিষ্কারের উপায়।

মুক্তা বিজড়িত অলঙ্কার অনেক দিন ব্যবহার করিলে মুক্তায় চিতি ধরে ও নিষ্প্রভ হয়, শসার জলে মুক্তাগুলি ভিজাইয়া কোমল ব্রস দ্বারা ধৌত করতঃ পরিষ্কার জলে ধুইলে পুনরায় উজ্জ্বলতা ফিরিয়া আইসে।

—০—

জুতার কড়া।

কসা জুতা পরিয়া পায়ের অঙ্গুলীতে বড়ই কদাকার কড়া পড়ে। এই কড়া নষ্ট করিতে হইলে প্রথমতঃ কড়ার উপরে তুলা দিয়া জুতা পায়ে দেওয়া উচিত। জুতার ঘসড়ানি যতই কম লাগিবে, ততই কড়াও কম হইবে; নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে কড়া একেবারে দূর হইতে দেখা গিয়াছে:—স্যালিসিলিক এসিড—৩০ গ্রেণ; ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (ইণ্ডিয়ান হেম্প) ৫ গ্রেণ; রেড়ির তৈল,—৷৷০ ড্রাম, কলোডিয়ান ৷৷০ আউন্স। এই পদার্থ কয়েকটী মিশ্রিত করতঃ সন্ধ্যায় ও সকালে কড়ার উপরে লাগাও, পরে নাতিশীতোষ্ণজলে পা বেশ করিয়া নিমজ্জিত কর এইরূপে পা অন্ততঃ ১০ মিনিট রাখা উচিত। যদি জল ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তবে সামান্য গরম জল মিশ্রিত করিয়া উষ্ণতা সমান রাখা

কর্ত্তব্য। এইরূপ ৫।৬ দিন নিয়ম মত করিলেই কড়ার দাগ বিদূরিত হইবে। উক্ত ঔষধ বড়ই উড়িয়া যায়। এইজন্য শিশিতে করিয়া বেশ করিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখা উচিত।

অন্য উপায়। লিকুইড এন্টীমনি টায়ক্লারাইড —২ ড্রাম; টিংচার আয়োডিন—২ ড্রাম; আইরন প্রোট-আইওডাইড—৭ ড্রাম; মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছিপি আঁটিয়া শিশিতে রাখিয়া দাও; ৫।৬ বার লাগাইলেই কড়া সারিয়া যায়। ইহা সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। কড়ার স্থান অতিক্রম করিয়া নীরোগ চামড়ায় লাগিলে ঘা হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহা কড়ার ঔষধ বলিয়া বাজারে বিক্রিত হয়।

ধাতব পাত্রে নাম লিখিবার সহজ উপায়।

ধাতব পাত্রে নাম লিখিবার সহজ উপায়।

অনেক সময়ে ধাতব পাত্রে নাম লিখিবার জন্য পাত্র খোদাই-কারককে দিতে হয়। অবশ্য সেরূপ করিলে অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু অযথা মূল্য দিতে হয়। নিম্নের উপায়ে বেশ পরিষ্কার লেখা যায়। ধাতব পাত্রের যে স্থানে নাম লিখিতে হইবে, সেই স্থানটি অগ্নির উত্তাপে অথবা স্পিরিট ল্যাম্পে গরম করিয়া লও। সেই উত্তপ্ত স্থানে মোম আস্তে আস্তে ঘসিতে থাকে। দেখিবে মোম গলিয়া যাইতেছে ও পাত্রের গায়ে লাগিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ পাতলা এক "পোঁচ" মোম লাগাইয়া দিয়া পাত্রটি রাখিয়া দিবে। যখন পাত্র শীতল হইবে, তখন একটা সরু মুখ সুচ বা ঐরূপ কোন যন্ত্র দ্বারা সেই মোম লাগা স্থানে নাম লিখিবে; এরূপ জোরে লিখিতে হইবে যেন মোম ভেদ করিয়া ধাতব পাত্রের গায়ে সুচের অগ্রভাগ স্পর্শ করে। পরে একটী পাথর বাটীতে একটু (প্রায় অর্দ্ধ ছটাক) নাইট্রিক অ্যাসিড রাখ এবং তাহাতে ঐ এসিডের সিকি অংশ জল ঢালিয়া দাও। একটা সরু কাঠিতে একটু তুলা জড়াইয়া তুলির মত কর। পরে ঐ তুলির দ্বারা ধাতব পাত্রের গায়ে মোমের উপর লিখিত ঐ জল-মিশ্রিত নাইট্রিক এসিড লাগাইতে থাক। ৬।৭ মিনিট এইরূপে লাগাইলে পর পুনরায় উত্তপ্ত করতঃ ঐ মোম মুছিয়া ফেলিবে। দেখিবে সুন্দর নাম লেখা হইয়া গিয়াছে। এক পয়সার নাইট্রিক এসিড ও দুই পয়সার মোম হইলে প্রায় ৫০।৬০ খানা পাত্রে নাম লেখা যায়। এসিড যেন পাত্রের অন্যত্র কুত্রাপি না লাগে, তাহা হইলে সে স্থানটিতে একটা গর্ত্ত হইয়া যাইবে।

বিস্কুট প্রস্তুত প্রণালী।

মাল মসলা :—

ময়দা আধ সের।

Baking powder. ২ চামচে,

দুগ্ধ অর্দ্ধ পাইট।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমে ময়দা এবং বেকিং পাউডার শুষ্ক অবস্থাতেই হাত দ্বারা উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর যতটুকু দুগ্ধ বেশ আমাদের দেশী রুটীর ময়দা মাখার মত করিবার জন্য আবশ্যক, ততটুকু দুগ্ধ দিয়া খুব দলিয়া দলিয়া যখন বেশ নরম লেচি প্রস্তুত হইবে, তখন একখানা টীনের উপর একটা বেলুন দিয়া রুটী বেলার মত করিয়া সেই লেচিটাকে সমস্ত টিন খানার উপর প্রশস্ত করিয়া

ফেলিতে হইবে। অবশ্য তৎপূর্ব্বে টীন খানায় একটু তৈল মাখাইয়া লইতে হয়, নচেৎ টীনে ময়দা লাগিয়া যাইতে পারে। যখন ময়দাটা বেশ প্রশস্ত হইয়া গেল, তখন একটা ছোট ঔষধ খাবার গ্লাস বা একটা টীনের কৌটার ঢাকণী খুলিয়া লইয়া উবুড় করিয়া ঐ ময়দার উপর চাপ দিয়া গোল গোল দাগ করিয়া যাইতে হইবে। এমন চাপ দিতে হইবে, যেন প্রত্যেক চাপে গোলাকার খণ্ডগুলি পৃথক হইয়া সেই প্রশস্ত টীনের উপরই অবস্থিত থাকে। তাহার পর পাউরুটি প্রস্তুত করা উনান বা হাপরের মধ্যে সেই টীন সমেৎ ময়দার খণ্ড গুলি ঢুকাইয়া দিতে হইবে। প্রায় ১৫ মিনিট ভিতরে থাকিলেই বিস্কুট ভাজা হইয়া যাইবে। ঠিক ১৫ মিনিটই যে রাখিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বিস্কুট কাঁচা না থাকে, অথচ পুড়িয়া না যায় সেটুকুতে লক্ষ্য রাখাই বিস্কুট প্রস্তুতের কৃতীত্ব। কেহ কেহ বিস্কুটকে মিষ্ট বা লবণাক্ত প্রভৃতি আস্বাদের করিবার জন্য চিনি ও লবন ময়দায় মিশ্রিত করিয়া থাকেন। ময়দা, সুজী অথবা আরারুটের দ্বারা বিস্কুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রক্রিয়া সকলেরই একরূপ। এখন সমস্ত বিলাতি বিস্কুট বেকিং পাউডার সংযোগে প্রস্তুত হয়। কারণ ইহাদ্বারা প্রস্তুত বিস্কুট পাউরুটী সহজেই পরিপাক হইয়া থাকে। বেকিং পাউডারের মধ্যে Goodalls baking পাউডার শুনিয়াছি ভাল, ইহা প্রায় সমস্ত Oilmans store এ পাওয়া যায়। পাঁউরুটী এবং বিস্কুটের এদেশে প্রচলন কম নহে। সহর হইতে পল্লীতে পল্লীতে এখন সহরের বাসি রুটী ফেরিওয়ালারা ফেরি করিয়া বিক্রয় করে, এবং পল্লীবালকগণ ক্রয় করিয়া থাকে। উদ্যোগী পল্লীবাসী ইহা করিলে পাঁউরুটী ও বিস্কুটের কারবার যে সুন্দররূপে চালাইতে না পারেন এমন নহে। তাড়ী ও ইয়েষ্ট নামক একপ্রকার দ্রব্য আগে রুটী প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হইত, এখন বেকিং পাউডার দ্বারা প্রস্তুত হওয়ায় ইহা সহজ সাধ্য হইয়াছে। এদেশেও ২।৪টা বিস্কুটের কারখানা বেশ চলিতেছে, কিন্তু দেশের লোক সংখ্যার তুলনায় তাহা মুষ্টিমেয় সন্দেহ নাই। বাজারে নানা-প্রকারের বেকিং পাউডার পাওয়া যায়। তাহাতেও কাজ হইবে।

মুষ্টিযোগ

১ সর্পদংশন চিকিৎসা :—

গোয়ালিয়র রাজ্যের টাগার নামক স্থান হইতে রেসিডেণ্ট এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি "বসুমতী" পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে, এক জন ডেপুটি কালেক্টর লিখিয়াছেন, সর্পদষ্ট রোগীর দষ্ট স্থান চিরিয়া দিয়া তথায় কুক্কুটের পশ্চাদ্ভাগ চিরিয়া সেই স্থানে চাপিয়া ধরিলে একটীর পর একটী কুক্কুট মরিয়া যায় ও সর্পদষ্ট রোগী বাঁচিয়া উঠে। আমি এই চিকিৎসা-পরীক্ষা করিতে উৎসুক ছিলাম। গত ১৭ই আগষ্ট একদল কুলী কাজ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে ৩০ বৎসর বয়স্কা একজন রমণী বিষধর সর্প-কর্তৃক দষ্ট হয়। তখন বেলা দশটা। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কুলীরা তাহার চিকিৎসা করে। তাহার অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠে ও বেলা ২টার মধ্যে সে ২।৪ বার মুচ্ছিতা হয়। যখন সকলে মনে করিল, সে আর বাঁচিবেনা, তখন আমি ডাক্তার মহাশয়কে ডাকাইয়া ৬টী মুর্গী আনাই। আমার সম্মুখে আমার নির্দ্দেশমত ডাক্তার সর্পদষ্ট স্থান চিরিয়া তথায় মুর্গীর পশ্চাদ্ভাগ চিরিয়া চাপিয়া ছিলেন। ৪।৫ মিনিটের মধ্যে একটির পর একটি মরিয়া ৪টী মুর্গী মরিয়া যায়। এদিকে রোগী ক্রমে সারিয়া উঠে। আমি তাহাকে যতক্ষণ সম্ভব বেড়াইতে বলি ও রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে বারণ করি। সে আরও দুইবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। পরদিন সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

—০—

সোঁয়াপোকা লাগার ঔষধ ২

কোন স্থানে সোঁপোকা লাগিলে কাঞ্চন ঢোলার পাতার রস লাগাইয়া দিবামাত্র সোঁপোকার সুঁয়াগুলি গলিয়া যায়। চুলকাইয়া ক্ষত হইলে সেইস্থানে পাতা বাঁটিয়া দিবে তাহা হইলে ক্ষত আরোগ্য হইবে, ইহা পরীক্ষিত। যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটী কচুর পাতায় সোঁপোকা রাখিয়া নাড়া দিবে, তাহা হইলে কচুর পাতার সোঁয়াগুলি লাগিবে তাহাতে কাঞ্চন ঢোলার পাতার রস দিবে ও একটু পরে দেখিতে পাইবে যে সোঁয়াগুলি গলিয়া গিয়াছে।

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, এতদ্দেশে ছাতারে, দয়াল প্রভৃতি পক্ষীরা সোঁপোকা খাইয়া ঢোলার পাতা খায়, তাহার কারণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

—০—

পায়ের তলা জ্বালা নিবারণের উপায়।

যে কোন কারণে পায়ের তলা অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক জ্বালা করিলে তেলাকুচার পাতার রস মাখাইয়া দিবে, তাহা হইলে একেবারে জ্বালা নিবারণ হইবে। পরীক্ষিত।

মাকড়সা চাটার ঔষধ।

আরসুলা, মাকড়সা চাটিয়া ঘা হইলে কিম্বা বালকদিগের কাণের পাতায় কাণচটা হইলে তাহাতে ঢোলা কাঞ্চনের পাতা অল্প হরিদ্রার সহিত বাঁটিয়া লাগাইলে ২।১ দিনেই আরোগ্য হয়। কাঞ্চন ঢোলার পাতা দেখিতে পান পাতার ন্যায়, আকৃতি ও ধারগুলা অল্প কোঁকড়া, কোকড়া ঈষৎ শ্বেতবর্ণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেগুনীয়া রঙ্গের ফুল হয়। অনেকেই জানেন, ঢোলা ও কাঞ্চনঢোলা একই কিন্তু তা নয়, ঢোলা পাতা লম্বা ও কাল বর্ণের হয়।

———

মৃদু-বিরেচন।

পরিষ্কার এবং সুপক্ক, তেঁতুল একটুখানি একটা পাথর বাটীতে একটু গাঢ় করিয়া গুলিয়া লও; অতঃপর দেড়পোয়া আন্দাজ দুধ উনানে চাপাইয়া ফুটাইতে থাক; যখন দুগ্ধ গাঢ় হইতে আরম্ভ করিবে, সেই সময় উক্ত তেঁতুলের জল দুই চামচ আন্দাজ উক্ত দুগ্ধে ঢালিয়া দাও; দুধ তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ছানা হইয়া যাইবে; এইরূপ হইবার পর ক্রমাগত ফুটাইতে থাক। যখন জল মরিয়া আসিবে, তখন ইচ্ছানুরূপ চিনি মিশ্রিত করিয়া উক্ত ছানা ও ছানার জলকে হালুয়ার মত করিয়া লও। শীতল হইলে উক্ত দ্রব্য খাওয়া উচিত। উহা অতি মুখরোচক, অধিকন্তু মৃদু বিরেচক। ইংরাজিতে ইহাকে (Tamarind whey) বলে।

—০—

সর্দ্দি।

গলায় বসিয়া যাইলে বা কফ অতি শক্ত ও আঠাল হইলে, সন্ধ্যায় একটা ন্যাকড়ায় আধপোয়া আন্দাজ মিছরি বাঁধিয়া একপোয়া আন্দাজ পানীয় জলে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দাও; প্রাতে সেই মিছরীর সরবত গরম করিয়া শুধু পেটে খাইয়া ফেল। দেখিবে কফের উপশম হইতেছে এবং গয়ের বা কফ নরম হইতেছে; এইরূপ ৬।৭ দিন করিলে সাধারণ সর্দ্দি নির্ব্বিবাদে আরোগ্য হয়। বিঃ
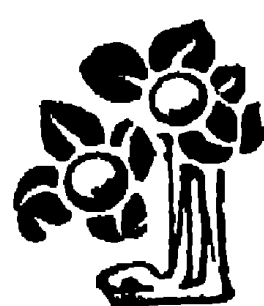
ফরমুলা ও রিসিপি

অনারেবল লেস্‌লি ষ্টকব্রিজ্‌ আমহার্ষ্টের কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ; তিনি জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ফরমূলাগুলি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কৃষকেরা অনায়াসে ঘরে প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত সারগুলি জমিতে দিয়া উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে পারেন। ক্রয় করিয়া প্রস্তুত সার দিতে অনেক ব্যয় হয়, ঘরে প্রস্তুত করিলে অনেক কম ব্যয়ে সেই কাজই হইবে।

১। Nitrogen ৬৪ পাউণ্ড, সলফেট অফ আমোনিয়ার আকারে।

২। পটাশ—৭৭ পাউণ্ড ক্লোরেট অফ পটাসের আকারে।

৩। ফস্‌ফরিক অ্যাসিড—৩১ পাউণ্ড, মিউরিয়েট অফ্‌ সুপার ফসফেট আকারে।

৪। নাইট্রোজেন ৩৬ পাউণ্ড, সল্‌ফেট অফ আমোনিয়ার আকারে ৩৬ পাউণ্ডে নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে নাইট্রোজেন আবশ্যক, সলফেট অফ্‌ আমোনিয়ার যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকায় সেই কার্য্য সাধিত হয়, জমির পাঠ করিয়া উত্তমরূপে চাষ দেওয়ার পর এই সারগুলি ছড়াইতে হয়। সর্ব্বস্থলে সমানভাবে প্রদান করিতে হয় একস্থানে জমা হইয়া থাকিলে গাছ জ্বলিয়া যায়। উপরোক্ত পরিমাণ এক একর জমির উপযুক্ত। জমির পরিমাণ বুঝিয়া অনুপাতানুসারে দেওয়া উচিত। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যত শস্য হয়, তাহাপেক্ষা প্রতি একর জমিতে ৫০ বুশেল শস্য অধিক হইয়া থাকে।

উর্ব্বরতা বৃদ্ধি কারক সারের গুড়া।

হাড়ের গুড়া (সূক্ষ্মচুর্ণ—৯ ভাগ

প্যারিস প্লাষ্টার—অর্দ্ধ ভাগ

সল্‌ফেট অফ্‌ আমোনিয়া—অর্দ্ধ ভাগ

বীজগুলিকে প্রথমে যে স্থান হইতে গোবর অথবা গোয়ালের জল বাহির হইয়া যায়, সেই জলে ভিজাইয়া বীজ শুষ্ক না হইতে হইতে ঐ বীজের উপরে উপরোক্ত পাউডার ছড়াইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, সেই বীজ বপন করিলে সমস্ত বীজ হইতে সতেজ চারা বাহির হইয়া থাকে। ইহা আমেরিকান পদ্ধতি।

সুলভ সার প্রস্তুত প্রণালী

সল্‌ফেট অফ্‌ এ্যামোনিয়া—	৬০ পাউণ্ড
নাইট্রেট অফ্‌ সোডা—	৪০ ,,
হাড়ের গুড়া—	২৬০ ,,
প্লাষ্টার—	২৫০ ,,
লবণ—	৷৹ বুশেল
কাষ্ঠের ছাই—	৩ বুশেল

সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিলে ৬ একর জমির উপযুক্ত সার হইবে। ইহাতে ১৫ ডলার ৫২॥ টাকা খরচ পড়ে, কিনিতে হইলে ১৭০টাকার উপর ব্যয় পড়ে। ইহা জমিতে সমপরিমাণে ছড়াইয়া পুনরায় চাষ দিয়া দিতে হয়, তাহার পর বৃষ্টি হইলেই সমস্ত জমিতে সমান সার হইয়া যায়।

মুখের জন্য শ্বেতবর্ণ লোশন।

ইহা পাউডার অপেক্ষা ভাল, বিলাতে ও আমেরিকায় অনেক অভিনেত্রী ইহা ব্যবহার করেন।

জিঙ্ক অক্সাইড্—	॥০ আঃ
গ্লিসারিণ—	২ আঃ
গোলাপজল—	২ আঃ

একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশিতে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

WATER PROOF কালী।

এই কালী জলে উঠিবে না।

ভার্ডি গ্রিস—১ আউন্স
স্যাল আমোনিয়াক—১ আউন্স
ল্যাম্প ব্লাক—॥০ আউন্স
জল—আধ পাইট

একটা মাটীর পাত্রে সমস্ত গুলিকে মিশাইবে, যেন কোন ধাতব দ্রব্য দ্বারা স্পর্শ করা না হয়। এই কালীতে কুইলপেন ব্যবহার করিতে হয়। লিখিবার পূর্ব্বে কালীটাকে নাড়িয়া লইতে হয়।

ঘোর লোহিত বর্ণ কালী প্রস্তুত প্রণালী

ভাল গারানসীন ১—আউন্স

ইহাকে ১ আউন্স লাইকার এমোনিয়ায় ফেলিয়া রাখ, তাহার পর ইহাতে শীতল ডিস্টীল্ড ওয়াটার বা পরিশ্রুত জল ঢালিয়া দাও। সমস্তগুলি লইয়া একটা মরটারে উত্তমরূপে ঘুটিয়া মিশাইয়া ফেল। তাহার পর ফিলটার করিয়া ইহাতে অৰ্দ্ধ আউন্স গঁদের জল মিশাও, ইহাতে কার্‌বাইন ২০ গেন্, লিকুইড্ আমোনিয়া ৩ আউন্স দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া দাও। ২ ঘণ্টা পরে ইহাতে ১৮ গ্রেণ আরবী গঁদ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আর একবার ছাঁকিয়া লইলেই উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ লিখিবার কালী প্রস্তুত হইবে।

২য় প্রকার।

ব্রাজিল উড্ চূর্ণ—৪ আউন্স
এলম (ফটকিরি)—॥০ আউন্স

একটা এনামেলের পাত্রে অগ্নির উত্তাপে এক ঘণ্টা ফুটাইয়া লও, তাহার পর ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে আরবীগঁদের জল খুব সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত কর। উৎকৃষ্ট লাল কালী হইবে।

৩য় প্রকার

লাল স্কারলেট এনিনিল—১ অউেন্স

ইহা ম্যাজেণ্টারের ন্যায় রং, কলিকাতার খোঁড়াপটীতে পাওয়া যায়।

ইহাকে ফুটন্ত গরম জলে গলাইয়া ফেলিয়া ১ আউন্স গঁদ মিশাইয়া ছাঁকিয়া ফেলিয়া ৫০ ফোঁটা লবঙ্গের তৈল মিশাইলে সুন্দর লাল কালী হইবে;

৪র্থ প্রকার

কচিনীল চূর্ণ— ১ আউন্স

গরম জল—আধ পাঁইট

ভিজাইয়া ১ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর ঠাণ্ডা হইবে—

Spt. Heart horn ১-২ পাঁইট্ অথবা লাইকার এনোনিয়া ৪ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া এবং ৭।৮ দিন এইরূপ থাকিবে পরে আস্তে আস্তে লাল জলটুকু ঢালিয়া লইবে, তলানীটা পড়িয়া থাকিবে।

৫ প্রকার

কার মাইন— ১২ গ্রেণ

এ্যাকোয়া আমোনিয়া— ৩০ আউন্স

মৃদু জ্বালে ৭।৮ মিনিট রাখিয়া ছাঁকিয়া ১৮ গ্রেণ আরবী গঁদ মিশাইলেই হইল। এই কালী ভাল করিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

—০—

উৎকৃষ্ট কপিং কালী ।

গলনট	২৪ আউন্স
ভিনিগার	১৬ আঃ
লগ্ উড্	৮ আঃ
তুতেঁ বা কপেরাস্	২ আঃ
গ্লিসারিণ	২ আঃ
জল	৯৬ আঃ

একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে একঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া তাহার পর শীতল হইলে ফিল্টার করিতে হইবে। এই সলুইশনকে একটু গাঢ় করিতে হইলে ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ ভাল মাত গুড় মিশাইয়া দিতে হয়। এই উপায়ে উৎকৃষ্ট কপিং কালী প্রস্তুত হইবে। ইহা বিক্রয়োপযোগী। ভাল লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

Black Lacquer for Iron or Steel.

লৌহ বা ষ্টীলের জন্য উৎকৃষ্ট কাল ল্যাকার।

Sulpher বা গন্ধকচূর্ণ ১ ভাগ

টার্পিন (ভাল) ১০ ভাগ

এই দুইটী দ্রব্যকে মিশাইয়া আলকোহল বা সুরাসারের লাম্পের জলন্ত শিখার উপর ধরিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বার্ণিসের ন্যায় হইয়া না যায়, সেই পর্য্যন্ত ঐ শিখার উপর রাখিতে হইবে। কাল হইয়া আসিলেই নামাইয়া লৌহ দ্রব্যকে পরিষ্কার ও মরিচা শূন্য করিয়া তুলি দ্বারাই খুবই পাতলা ১ পোঁচ মাত্র লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই "লেকার" করা হইয়া যাইবে। ইহা আবশ্যকীয় সামগ্রী।

হস্তি-দন্তের উপর রৌপ্যের কলাই করিবার সহজ উপায়।

হস্তি-দন্তের কোন দ্রব্যের উপর রৌপ্যের কলাই করিতে হইলে প্রথমে নাইট্রেড্ অফ-সিলভারের কম শক্তি বিশিষ্ট সলুইশনে জিনিষটাকে চুবাইয়া লইতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তিদন্তের দ্রব্যটী হরিদ্রাভ না হইয়া যায়, ততক্ষণ চুবাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর তাহাদিগকে তুলিয়া পরিষ্কার শীতল জলে চুবাইয়া রৌদ্র কিরণে শুষ্ক করিতে হইবে। তখন হস্তিদন্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু এই কৃষ্ণবর্ণটাকে বস্ত্রদ্বারা বা সাময় চর্ম্ম দ্বারা রগড়াইলেই তখন রৌপ্যবর্ণ বাহির হইবে। হস্তিদন্তের অনেক দ্রব্যে এইরূপে রৌপ্য জল ধরান হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন

নিম পাতা চূর্ণ	॥৵০
চিকি সুপারী	১ সের
বকুল ছাল চূর্ণ	২ তোলা
তামাকের গুল চূর্ণ	১ ,,
হরিতকী চূর্ণ	১ ,,
মাজুফল চূর্ণ	১ ,,
একাঙ্গী	॥০ ,,
কর্পূর	।০ ,,
ফিটকিরি খৈ	।০ ,,
পোড়া তুঁতে	৵০ ,,
গোল মরিচ চূর্ণ	।০ ,,
চা খড়ি	৮ ,,

একত্রে মিশাইয়া বকুল ছালের রস দিয়া মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শিশিতে রাখিতে হইবে।

বৃদ্ধের বচন।

পাশ্চাত্য মনিষীগণ বলেন,—

"A good dinner is better than a fine coat"

অর্থাৎ ভাল পোষাক অপেক্ষা ভাল খাদ্য ভাল" এ দেশের তথাকথিত বাবুরা কিন্তু পেটে না খাইয়াও পোষাকই ভাল বাসেন। ইয়া পাম্প্‌শু, লম্বাটেরী, আর সৌখীন পোষাক! এই রোগেই ত দেশটার এত দুর্দ্দশা।

পাশ্চাত্য নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন,—

A good dinner sharpens wit and softens the heart.

অর্থাৎ ভাল খাইলে হৃদয় কোমল হয়, আমোদ কৌতুকাদি ও ধারাল হয়; আর এ দেশের ফোতো বাবুরা বলেন, তা হউক, খালি পেট দেখ্‌বে কে? উপরে চিকন চাকন সভ্যতার লক্ষণ, এ সকল চাই এদেশে প্রবাদই রহিয়াছে, ঘরে ছুঁচোর কেত্তন্, বাইরে কোঁচার পত্তন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেছেন,—

"Frugality makes an easy chair for old age"

মিতব্যয়িতা দ্বারা বৃদ্ধ বয়সের আরাম কেদারা প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ প্রথম বয়সে যদি বুঝে সুঝে ব্যয় কর, তাহা হইলে বৃদ্ধ বয়সে সুখে বসিয়া জীবন কাটাইতে পার। এদেশের বাবুরা সাহেবী অনুকরণ করিতে যাইয়া আগেই দেনা করিয়া আরাম কেদারা কিনিয়া সাহেবদের মত সিগারেট ফুকিতে লাগিলেন, যখন বয়স হইল, উপার্জ্জন করা দায় হইল, তখন আরাম কেদারায় সুখে ঘুমানত দূরের কথা, দেনার জ্বালায় শয্যা-কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়।

—০—

পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন,—

"Knowledge talks lowly, but ignorance talks loudly"

অর্থাৎ জ্ঞানীগণ মৃদুভাষী, কিন্তু অজ্ঞান চেঁচায়। যেমন আমাদের দেশে প্রবাদ আছে,—স্বল্প সলিলে করে সফরী ফর্ ফর্।

—০—

সেইজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন,—

Birds are entangled by their feet, men by their tongues" পাখীরা ফাঁদে পা জড়িয়ে ধরা পড়ে, আর মনুষ্যগণ বচন ছড়িয়ে ধরা দেয়। কথাটা খুব ঠিক।
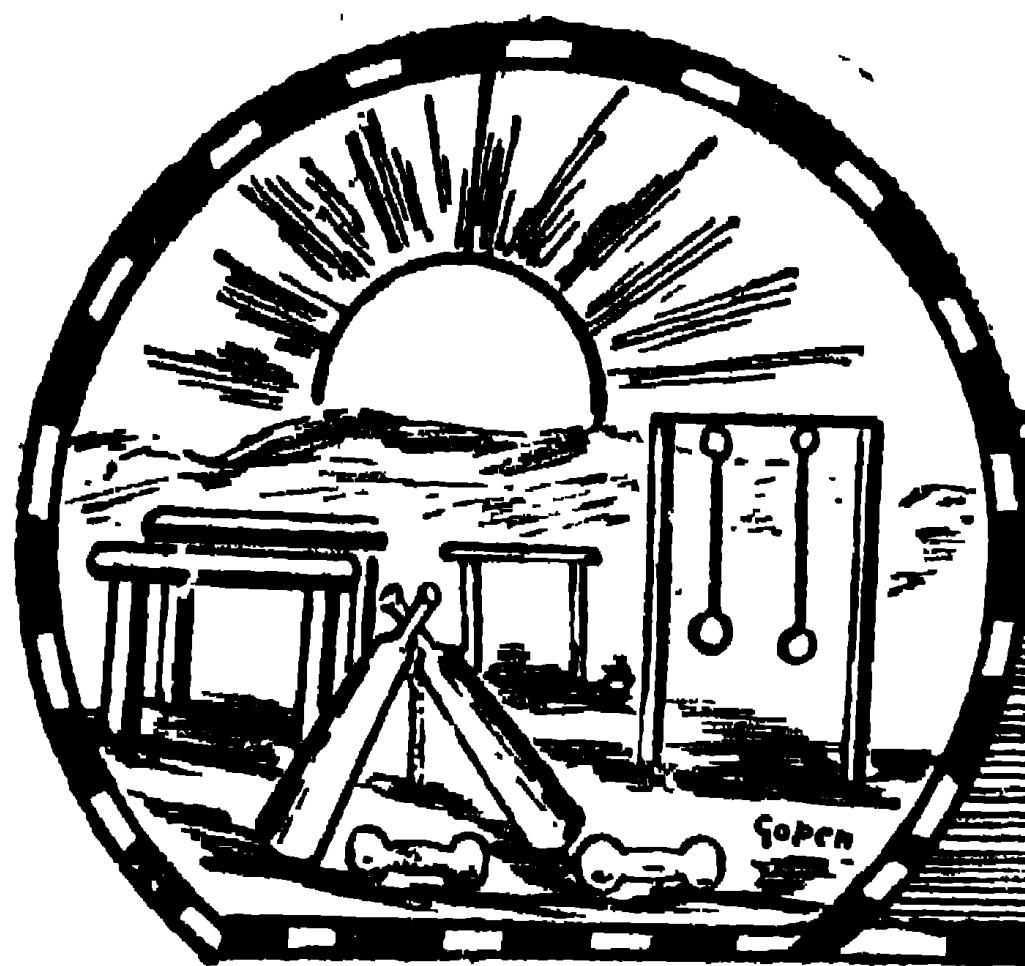
স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

দধির অপব্যবহার ও প্রয়োগ বিচার।

(ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দাস
এল্, এম্, এস্,)

এদেশটার মত হুজুকে দেশ, বোধ হয় পৃথিবীতে খুব কমই আছে। "হাতে কাজ না থাকিলে খুড়ার গঙ্গা-যাত্রা করার" মত এক একটা হুজুক সৃষ্টি করা যেন এদেশের লোকের একটা মস্ত বাতিক। আমরা পল্লীবাসী এমনই অন্ধ যে, হুজুকের ভালমন্দ বিচার না করিয়াই আমরা তাহাতে মাতিয়া উঠি। এই গৌর চন্দ্রিকা গাইবার কারণ কি জানেন ? কিয়দ্দিবস হইতে চিকিৎসক সমাজে দধি সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড হুজুকের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এ হুজুকের প্রথম সৃষ্টি এদেশে হয় নাই। কিন্তু এদেশের চিকিৎসক বৃন্দের মধ্যেই হুজুকটির বেশী রকম প্রাবল্য উপস্থিত হইয়াছে। পল্লী-চিকিৎসকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও বাতিক সীমা অতিক্রম করিয়াও বসিয়াছে। সহরে ডাক্তারগণ আজকাল দধির যথেষ্ট ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন ; বলা বাহুল্য ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ চিকিৎসকই অবশ্য উপযুক্ত স্থানে ইহার ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু বাতিক বৃদ্ধি হইয়াছে—সর্ব্বাপেক্ষা পল্লীগ্রামের এক শ্রেণীর হুজুকে চিকিৎসকবৃন্দের। সহরে ডাক্তারদের দেখাদেখি ইহারা যেখানে সেখানে দধি প্রয়োগ করিতেছেন। যখনই যে দ্রব্যের বহুল প্রচলন হয়, তখনই তাহার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে এইরূপ দধির অপব্যবহার এবং তজ্জনিত কুফলের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত দধি-পথ্য দ্বারা মহোপকার সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এই উপযুক্ত ক্ষেত্র নিরূপণার্থ, যে যুক্তি ও বিবেচনা প্রয়োজন, আমাদের তাহা আদৌ নাই—অথবা হুজুকের বাতিকে সে সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার আদৌ অবসর পাইতেছি না। আমাদের বাতিকটা একটু বেশী রকমেরই হইয়াছে কিনা—তাই বর্ত্তমানে আমাদের একটা

ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল মত প্রকাশ করেন, উহাই বেদবাক্য, আর আমাদের চিরন্তন সনাতন মতামতগুলি অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারমূলক—সুতরাং অবিশ্বাস্য। বিষম বাতিকে আমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া গিয়াছে, তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত বিষয়গুলি মাত্রেই অভিনব তথ্য মনে করিয়া আমরা তাহাতে মাতিয়া উঠি। কিন্তু যদি একবার এই সকল নবাবিষ্ক্রিয়ার মূলদেশ অনুসন্ধান করিবার শক্তি থাকিত বা চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে সক্ষম হইতাম যে, ঐ সকল নবাবিষ্ক্রিয়ার মূলদেশ আমাদেরই আর্য্য ঋষিগণের বহু যুগ যুগান্তর পূর্ব্বের আবিষ্কৃত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

এই যে আজকাল দধি সম্বন্ধে যে হুজুকের সৃষ্টি হইয়াছে—যে হুজুকে মাতিয়া আমরা আজকাল দধি পথ্যের এত পক্ষপাতি হইয়াছি এবং এই দধি প্রয়োগকে পাশ্চাত্য ভিষকগণের এক অভিনব আবিষ্কার মনে করিয়া তাহাদিগকে ধন্য ধন্য করিতেছি—একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, ইহার মূল ভিত্তি কোথায় স্থাপিত। যদি চক্ষুষ্মান হইতাম,—তাহা হইলে অবশ্যই দেখিতে পাইতাম—দধি পথ্যের

ব্যবস্থা নূতন নহে—আবহমানকাল হইতে এই ব্যবস্থা এতদ্দেশের আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। সর্ব্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের মধ্যে দধি যে দেশে সর্ব্বপ্রধান দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত, সে দেশে দধির প্রয়োগ নূতন আবিষ্কাররূপে গণ্য করা বাতুলতা নহে কি? অথবা রোগ বিশেষে দধি পথ্য এদেশে অনেক দিন হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সাহেবরা কথাটা একটু নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই যা।

পথ্যহিসাবে দধি প্রয়োগ সম্বন্ধেই আমাদের বক্তব্য। সাহেবরা পথ্য সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করেন, প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় লোকেদের প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের সেই সকল মতের মূল্য কতদূর; ইহা একটি বিশেষ ভাবিয়া দেখিবার কথা। আমি বিবেচনা করি—পথ্য সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় মতামতই মূল্যবান। পাশ্চাত্য প্রদেশবাসিগণের আহার্য্য এবং আমাদের আহার্য্যের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আহার্য্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা-গবেষণাদি করিয়া থাকেন, তৎসমুদয় তাহাদের দেহ-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। সুতরাং এই সকল অভিমত, আমাদের পক্ষে কতদূর উপযোগী, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। দধি সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের দেহ-প্রকৃতির বিভিন্নতা বিচার না করিয়াই, আমরা তাহাদের নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহা বাতিকের চরম লক্ষণ নহে কি?

অবশ্য আমাদের ইহাও স্বীকার্য্য যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া, দধি সম্বন্ধে যে সকল অভিমত ও উপকারিতার বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন; উহার সবগুলিতেই যে, আমাদিগকে অনাস্থা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা কখনও মনে করা উচিত নহে। পরন্তু এই পরীক্ষার ফলে অনেক নূতন তথ্য বিদিত হইবার সুবিধা হইয়াছে—অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে। বক্তব্য এই যে, কোন হুজুকে—দিশেহারা হইয়া মাতিয়া, সদসদ্ বিবেচনা ও উপযুক্ত প্রয়োগ ক্ষেত্র বিচার না করিয়া, ঔষধ পথ্যের প্রয়োগ করা উচিত নহে। দধি সম্বন্ধে যথাযথরূপে এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে, একদিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের প্রকৃত অভিপ্রায় ও মতামত গ্রহণ করিতে হইবে এবং অন্যদিকে এ সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত বিধি ব্যবস্থাগুলির প্রতিও সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহারা এই উভয় দিক বিচার না করিয়া, কেবল হুজুকে মাতিয়া দধি প্রয়োগ করিবেন, তাহাদের দ্বারা ইহার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে এই কারণেই দধির অপব্যবহার লক্ষিত হইতেছে।

দধি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত এবং আর্য্য-ঋষিগণের বিধি ব্যবস্থাগুলির আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দধি সম্বন্ধীয় হুজুকের প্রধান কর্ত্তার নাম অনেকেই বোধ হয় জানেন আজ তবুও আবার বলি—ইনি একজন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক—নর-শরীর-তত্ত্বে ইনি অতীব অভিজ্ঞ। ইহার নাম মেকনীকফ (Mechnikoff)।

ডাক্তার মেকনীকফ মহোদয় বুলগেরিয়ায় থাকার সময়ে তথায় বিস্তর সবল সুস্থ বৃদ্ধলোক দেখিতে পান। তাহাদের অনেকের বয়স শত

বর্ষেরও বেশী; অথচ অত্যন্ত পরিশ্রমী। তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, তজ্জন্য তাহারা এমন সুস্থ সবল পরিশ্রম-পরায়ণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে যে, শতবর্ষেও তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, এসমস্ত লোকের নিত্য খাদ্যের মধ্যে দধি সহ পাটল বর্ণের রুটিই প্রধান।

বুলগেরিয়ার লোকেরা যে দধি ব্যবহার করে, তন্মধ্যে কেবল ক্ষীরাম্ল-জীবাণুই (ল্যাকৃটিক এসিড ব্যাসিলাই) থাকে, তাহা নহে; পরন্তু নানাপ্রকার কোকাই, অভিষব অর্থাৎ ইয়েষ্ট প্রভৃতি আরও অনেক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। এই সমস্ত জীবাণুর সম্মিলিত ক্রিয়াফলেই দধির উপকার পাওয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাই কর্ত্তৃক অনেক সাধারণ জীবাণু, রোগজীবাণু এবং পচনোৎ-পাদক জীবাণুব বৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ হয়, এ তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। অন্ত্রস্থিত নানা প্রকার রোগজীবাণু হইতে যে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস যদি সেবন করান যায়, তাহা হইলে অন্ত্রস্থিত উক্ত জীবাণু সমূহ বিনষ্ট বা হীনতেজ হইলে সমুৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ কর্ত্তৃক উৎপাদিত রোগ লক্ষণ আরোগ্য বা উপশম হইতে পারে। ইহা তৎপরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত। এই কল্পনা সিদ্ধান্ত, পরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

দইর মধ্যে ল্যাকৃটিক এসিড ব্যাসিলাসের পরেই উল্লেখ যোগ্য পদার্থ "ইয়েষ্ট" অর্থাৎ অভিষব। এই পদার্থও প্রাচীনকাল হইতে চিকিৎসকদিগের নিকট পরিচিত ছিল, তবে তাহা দইয়ে নহে। বিয়ার নামক মদ্য প্রস্তুত সময়ে যে গন্ধ উপরে উঠে, এ সেই পদার্থ এবং তাহা হইতেই এতৎ বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল; ইহা উদ্ভিদজাত খণ্ড ও কৌষিক্ পদার্থ—কোষাবরণে শ্বেতসার এবং তন্মধ্যে প্রোটীন ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। এই পদার্থও পচন নিবারক, উত্তেজক, এবং বলকারক বিধায় অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রয়োজিত হইয়া আসি-তেছে—আন্ত্রিক জ্বর এবং অতিসার, শিশু-দিগের সবুজ বর্ণের মলযুক্ত উদরাময়, উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগে আভ্যন্তরিক এবং পচা ক্ষত প্রভৃতিতে পচন নিবারণ উদ্দেশ্যে স্থানিক প্রয়োজিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই অভিষব যে বাহ্য এবং অন্ত্র মধ্যস্থিত রোগ জীবাণুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ল্যাকৃটিক এসিড ব্যাসিলাস ও ইয়েষ্ট ব্যতীত আরো কোকাই শ্রেণীর অনেক জীবাণু বর্ত্তমান থাকে, এবং দেশ, কাল পাত্র বিশেষে আরও নানা প্রকার রোগোৎপাদক ও সাধারণ জীবাণু দুয়ের মধ্যে অবস্থান করে।

অন্ত্র মধ্যে নানা প্রকার রোগ, পচন এবং উৎসেচনোৎপাদক জীবাণু বর্ত্তমান থাকে। এই সমস্ত জীবাণু অন্ত্রের ক্ষারাক্ত রসে পরিবর্দ্ধিত হয়; অনেকে মনে করেন যে উহার মধ্যে কোন জীবাণু পরিপাকের সাহায্য করে। কিন্তু কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়া পরিপাকের সাহায্য করে, তাহা জানা নাই। সম্ভবতঃ শরীর বর্দ্ধন

এবং পরিপোষণ কার্য্য উক্ত জীবাণুর অভাবেও সুশৃঙ্খলারূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। অন্ত্রের নিম্নাংশ মধ্যে—সিকম এবং কোলনের অংশের রস অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষারাক্ত—এই জন্য উক্ত শ্রেণীর জীবাণু উক্ত অংশেই সংখ্যায় অধিক বৰ্দ্ধিত হয়। কিন্তু কোন ঘটনায় যদি এই রস বিষমাসিত হয় ও তাহা ক্ষারাক্ত না হইয়া অম্লাক্ত হয়, তাহা হইলে অতিসারের লক্ষণ উপস্থিত হয়। শিশুদিগের সবুজ মলযুক্ত অতিসার পীড়ায় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

সাধারণ অবস্থায় অন্ত্র হইতে প্রত্যহ অন্ততঃ-পক্ষে ৮ গ্রাম জীবাণু বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু অজীর্ণ পীড়াগ্রস্ত লোকের আরও অধিক—এমন কি প্রত্যহ ২০ গ্রাম পর্য্যন্ত ঐরূপ জীবাণু বহির্গত হইয়া যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের রস ঈষদম্লাক্ত; শর্করা মূলক পদার্থ এই স্থানে জীবাণুর ক্রিয়া ফলে বিষমাসিত হইয়া যায়। বৃহদন্ত্রের স্রাব ঈষৎ ক্ষারাক্ত, এই স্থানে যবক্ষার মূলক পদার্থ বিশ্লেষিত হয়। খাদ্যের এইরূপ বিষমাসিত হওয়ার সময়ে—বিশেষতঃ যবক্ষারজান মূলক পদার্থের বিষমাসিত হওয়ার সময়ে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়; তাহা শোষিত হইয়া ব্যাপক শোণিত সঞ্চালন সহ মিশ্রিত হয়। কোন কোন চিকিৎসকের মতে ইহা হইতেই অনেক পীড়ার উৎপত্তি হয়। ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফলে অনেক পীড়ার উৎপত্তি ও প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস হয়।

অন্ত্রস্থিত উক্ত জীবাণু সমূহের অবস্থান ফলে অবস্থা বিশেষে তাহার কোন কোনটি রোগোৎপাদক হইয়া সংক্রামক পীড়া এবং পূযোৎপন্ন করিয়া থাকে।

অন্ত্রের পদার্থের ক্ষারাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে উক্ত জীবাণু সমূহ বিনষ্ট বা তাহার বৃদ্ধি রোধ হইয়া থাকে। কেবলমাত্র অম্ল প্রয়োগ করিলে এইরূপ ফল হয়। কিন্তু এই ক্রিয়া অনিশ্চিত। যেস্থানে বীজাণু বর্ত্তমান থাকে, সেইস্থানে অম্ল উৎপন্ন করিতে পারিলে ফল অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত হইতে পারে. এবং এই প্রণালীর পরীক্ষার জন্যই ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাসের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, এই ব্যাসিলাস অন্ত্র মধ্যে পরিবৰ্দ্ধিত হইতে পারে; এমন কি শতকরা দুই অংশ শক্তির রসের মধ্যে ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাসের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জীবাণুও জীবিত থাকে। কিন্তু সকল চিকিৎসক এই মত সমর্থন করেন না। কারণ দধি সেবনে মল অম্লাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা অন্ত্র মধ্যে ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলাস প্রস্তুত করিয়া তথাকার পচন দোষ নিবারণ করিতে পারি—এ আশা পাইয়াছি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমাদের অন্ত্রের পচন নিবারণের উদ্দেশ্যে আমাদের বিশ্বাস যোগ্য বিশেষ কোন ঔষধ ছিল না। অন্ত্রের পচন নিবারক বলিয়া যে সমস্ত ঔষধের নাম প্রচারিত ছিল, তাহার কোন একটিও প্রয়োগ করিয়াই বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই।

চিঃ প্রঃ

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

১৯৩৮ সালের সংশোধিত বীমা আইন

ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আগ্রহশীল ও উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, ১৯৩৮ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর—ইহার মূল কারণই হইতেছে যে, এই বৎসর প্রচলিত বীমা আইন সংশোধিত হইয়া নূতন আকারে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারী গেজেটে তারিখ ঘোষিত হইলেই সেইদিন হইতে ইহা বলবৎ হইবে। এই বীমা আইন সম্পর্কে ব্যবসা জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে ভারতীয় আইন সভার ইতিহাসে তাহা ইতিপূর্ব্বে আর দৃষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় উভয় আইন পরিষদেই এই আইন পঠিত ও গৃহীত হইবার কালে অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল—এতৎসম্পর্কে বিভিন্ন কোম্পানী ও ইন্‌সিওরেন্স প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে সরকারের নিকট কত যে ডিপুটেশন্ প্রেরিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাতি ও বিদেশী কোম্পানীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদেশ হইতে দুইজন বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদের কোম্পানী সমূহের বক্তব্য জানাইতে আসিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটিবার কারণ হইতেছে যে, বর্ত্তমান সংশোধিত আইন বীমা জগতে একেবারে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে—সেইজন্যই বীমা কোম্পানী, প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলি, পলিসি-হোল্ডার ও অংশীদারগণ এবং ম্যানেজিং এজেণ্টদের দল একেবারে সচকিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই যে এতটা আলোড়ন তাহার কারণ কি অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের দেশে ১৯১২ সালের পূর্ব্বে ইন্‌সিওরেন্স সংক্রান্ত কোন

পৃথক আইন ছিল না, সুতরাং ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ ১৮৮২ সালের কোম্পানী আইন অনুসারেই পরিচালিত হইত। ১৯১২ সালে যে আইন পাশ হইয়াছিল তাহার আমলে দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানী ও প্রভিডেন্ট কোম্পানী-গুলিই পড়িত; বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী বা অপরাপর বীমা কোম্পানীগুলি ইহার আমলে আসিত না। সেইজন্যই দেশবাসীর তরফ হইতে বারংবার এই দাবী উত্থিত হইতে থাকে যাহাতে সকল বীমা কোম্পানীগুলিকেই একই আইনের কবলে ফেলা যায়। ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে এদেশে জীবনবীমা ছাড়া অপরাপর বীমা কার্য্য করিবার কোন দেশী কোম্পানী ছিল না, কাজেই ঐ সমস্ত বীমাকার্য্য একচেটিয়া ভাবে বিদেশী কোম্পানীর দ্বারাই সাধিত হইত। অথচ বিদেশী কোম্পানীগুলি তাহাদের কার্য্য বিবরণাদি বা হিসাব নিকাশ প্রকাশ করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল না। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ফলে এবং ভারতের জনসাধারণের একটা স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশী প্রীতি জাগরিত হওয়ার জন্য দেশীয় কোম্পানীগুলির কার্য্য বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা জীবনবীমা ছাড়াও অপরাপর বীমা কার্য্য করিতে সুরু করে। ভারতীয় বীমা ব্যবসার এই প্রসারতার ব্যাপার সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভাল জিনিসের সঙ্গে যেমন মন্দটাও লুক্কায়িত থাকে, বীমা রাজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছিল। সেখানে খাঁটি বীমা কার্য্যের পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা মেকী বস্তু চালাইয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করিতেছিল—সেইটাই বন্ধ করিবার জন্য জনসাধারণের তরফ হইতে বারংবার দাবী উত্থিত হইতে থাকে। ১৯১২ সালের আইনানুযায়ী ২৫ হাজার টাকা জমা দেখাইতে পারিলেই একটি বীমা কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা যাইত এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ কোনরকমে ২৫ হাজার টাকা জমা দেখাইয়া কোম্পানী খুলিয়া বীমাপত্র বিলি করিতে সুরু করিত। ফলে বীমাকারীদের দেয় চাঁদার টাকা হইতে কোম্পানীর প্রাথমিক সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইত এবং বীমা ভাণ্ডারে উল্লেখ-যোগ্য জমা থাকিত না। ইহার ফলে বীমা কারিগণ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। শুধু তাহাই নয়, বীমাকারীদের টাকা হইতেই ম্যানেজিং এজেন্টগণ মোটা টাকা পকেটস্থ করিতেন। ইহারই ফলে অনেকগুলি বীমা কোম্পানীকে ফেল পড়িতে দেখা গিয়াছে।

ইহা ছাড়া দেশে বহু প্রভিডেন্ট কোম্পানী গজাইয়া উঠিয়াছিল। কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মোটেই আশঙ্কার কথা নহে, কিন্তু সে কোম্পানীর কার্য্য বীমানীতি সম্পন্ন হওয়া উচিত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশের প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির অধি-কাংশের মধ্যেই দুর্নীতি জড়াইয়া ছিল। এই দুর্নীতি জড়াইয়া থাকার কারণই হইল প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির কার্য্য "ডিভাইডিং প্রিন্সিপাল" (Dividing Principle) অনুযায়ী পরিচালন করা। উক্ত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার দরুণ বীমাকারীর প্রাপ্তব্য টাকার কোনই স্থিরতা ছিল না। অথচ তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা যোগাইতে হইত। আবার এই চাঁদার পরিমাণ বয়সের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া সকলেরই জন্য একই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল এই নীতির অসুবিধা বহু এবং ইহাতে দুর্নীতি দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণ

স্বরূপ ধরুন কোন কোম্পানীর ১৯৩০ সালে ১৫টি দাবী এবং ১৯৩১ সালে ৩০টি দাবী উপস্থিত হইয়াছে। কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী ১৯৩০ সালের প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের টাকা ১৫ জনের মধ্যে ও ১৯৩১ সালের প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের টাকা ৩০ জনের মধ্যে বিতরিত হইবে। ইহাতে ১৯৩০ সালের দাবীদার অপেক্ষা ১৯৩১ সালের দাবীদার অর্দ্ধেক পাইবে। তাহা ছাড়া কোম্পানী বেশী সংখ্যক দাবী দেখাইয়া দাবীদারকে ফাঁকী দিতে চেষ্টা করে। ইহাই হইল দুর্নীতি জড়াইবার হেতু। এই প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলি ঘর ঘর বৃদ্ধি পাইয়া বহু লোককে প্রতারিত করিয়াছে। সুতরাং প্রতারণা বন্ধ করিবার জন্য ও ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স কার্য্যকে নিয়মানুমোদিতভাবে সুপরিচালিত করিবার জন্য নূতন আইনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

১৯২৫ সালে গভর্ণমেণ্ট একটি আইনের পাণ্ডুলিপি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন কিন্তু নানান্ কারণে তাহা লইয়া আর অগ্রসর হয়েন নাই। ১৯২৮ সালে ইন্‌সিওরেন্স আইন সংক্রান্ত একটি ধারা পাস হইয়াছিল কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নহে, উহাতে কেবল বিদেশী কোম্পানীদের বিবরণ ও হিসাবাদি প্রকাশের ও জীবন বীমা সম্পর্কে কয়েকটি কার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেইজন্যই ১৯৩৮ সালে ব্যাপকভাবে এই নূতন আইন পাশ হইয়াছে—ইহার আমলে দেশী বিদেশী বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ট কোম্পানী সকলেই পড়িবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আগে আগে ২৫ হাজার টাকা জোগাড় করিয়া যে কেহ বা কাহারা কোম্পানী খুলিয়া বসিত ও বীমাকারীর টাকা ধ্বংস করিত; নূতন আইনে আর তাহা চলিবে না—ইহাতে জমার টাকার পরিমাণ এক লক্ষ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয়াদির জন্য ৫০ হাজার টাকা কার্য্যকরী মূলধন রাখিতে হইবে। পূর্ব্বের মত ইহা আর কাগজে কলমে রাখিলে চলিবে না, কোম্পানীর সকল ব্যাপার ও ব্যবস্থাপত্র ভালভাবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার পর তবে রেজিষ্ট্রেশন মিলিবে। বিদেশী কোম্পানীগুলিও এই ধারার কবল হইতে রেহাই পাইবে না, তাহাদেরও ভারতীয় কার্য্যের সকল হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে এবং ভারতীয় কাজের পরিমাণের নির্দ্দিষ্টাংশ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করিতে হইবে। বিদেশে দেশীয় কোম্পানীগুলির প্রতি আর বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলিবে না, কেননা, তাহা হইলে এদেশেও উক্ত বিদেশের কোন কোম্পানীর প্রতি নিষেধ-সর্ত্ত আরোপিত করা চলিবে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ বীমাকারীর টাকা হইতে আর মোটা লাভ মারিতে পারিবেন না, কারণ ভবিষ্যতে ম্যানেজিং এজেন্সীর পদ রহিত করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেণ্টগণের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন কোম্পানীতে বেশী হারে রিবেট্ ও কমিশন প্রদান করিয়া অন্যায় প্রতিযোগীতা চালানো চলিবে না, যেহেতু, রিবেট্ ও কমিশনের হার নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কোম্পানীসমূহ যাহাতে কোন ঝুঁকির উপর গিয়া অন্যায় ভাবে সম্পত্তি লগ্নী করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থানুযায়ী সকল কোম্পানীকেই নির্দ্দিষ্ট

সংখ্যক টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্সের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তিনি সকল সময় সমস্ত কোম্পানীর কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে পারেন এবং আইনগুলি সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়। প্রভিডেণ্ড সোসাইটী গুলিরও আর পূর্ব্বেকার মত আইনের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই—ঘর ঘর কোম্পানী খোলা আর চলিবে না। তাহাদেরও জমার টাকা চাই, কার্য্যকরী মূলধন চাই; পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র রেজিষ্ট্রেশন চাই, সঠিক হিসাব রক্ষিত হওয়া চাই এবং সর্ব্বোপরি সম্পত্তি ঠিকভাবে লগ্নীকৃত হওয়া চাই। বীমা কোম্পানীর ন্যায় প্রভিডেণ্ট কোম্পানী গুলিকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হইয়াছে।

এই সব যুগান্তকারী ব্যাপারের জন্যই বীমা জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। আইনের উপরোক্ত ব্যবস্থা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, যেখানেই ফাঁক বা গলদ ছিল তাহাই টিপিয়া মারা হইয়াছে। ইহাতে কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘণ্টা বাজাইবার দরুণ তাহারা তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। উক্ত কায়েমী স্বার্থবিশিষ্টদের মধ্যে ম্যানেজিং এজেণ্টস্, ডিরেক্টর ও প্রভিডেণ্ট্ কোম্পানীগুলি পড়ে—তাই তাঁহারাই এই ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন বেশী। নিরর্থক গলদঘর্ম্ম হইয়া তাঁহারা দিল্লী-সিমলা ছুটাছুটি করিয়াছেন এই আইন পণ্ড করিতে, কিন্তু তাঁহাদের সে-চেষ্টা সফল হয় নাই। ম্যানেজিং এজেন্সী তুলিয়া দিবার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে, পরিচালন ব্যবস্থার অত্যন্ত কড়াকড়ি করার দরুণ ডিরেক্টরদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে—তাঁহারা আর কোম্পানী হইতে ঋণ পাইবেন না, বেনামীতে ম্যানেজিং এজেন্সী তাঁহাদের আর চলিবে না, সর্ব্বোপরি বীমাকারীর টাকা আত্মস্থ করিয়া নিজেকে ফাঁক কাটিয়া কোম্পানীর গণেশ উল্টাইবার কাযেও নিরঙ্কুশ সুবিধা হইবে না; প্রভিডেণ্ট্ কোম্পানিগুলি ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কেননা, তাহাদের নিত্য নূতন প্রতারণার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবুও আমরা এই আইন পাশ হওয়াতে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারি নাই। আইন যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত অর্থাৎ বীমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য একথা আমরাও মানিয়া থাকি। ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ব্যবসার দিকটাও ভুলিলে চলিবে না। বড় বড় ব্যাঙ্ক্ যেমন দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর টাকাকড়িও দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে লগ্নীকৃত হইয়া দেশের শিল্পোন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু নূতন আইনানুযায়ী কোম্পানীর মোট সম্পত্তির শতকরা ৫৫ ভাগই গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটিতে লগ্নী করিতে হইবে—ইহাতে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য মূলধন অভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাপরিষদে মূল বিলের বহু সংশোধন ঘটিয়াছে, এতদ্সংক্রান্ত ধারাটিরও সংশোধন ঘটিলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম।

আমরা পূর্ব্বে যে আলোড়নের উল্লেখ করিয়াছি পাঠক সাধারণ এইবার বুঝিতে পারিবেন কেন তাহা ঘটিয়াছে। দুর্নীতি নিবারণকল্পে যে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা

হইয়াছে তাহাতে আলোড়ন ওঠাই স্বাভাবিক। দেশীয় বীমাকার্য্য যাহাতে উত্তমরূপে পরিচালিত হয় সেইটাই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। উত্তমরূপে পরিচালিত হওয়ার মানেই হইল যাহাতে বীমাকারী দাবীর সঙ্গে সঙ্গেই অনায়াসে তাহার টাকা পাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা। পূর্ব্বে আমরা জানি তাহা হইত না। এই না হওয়ার কারণই হইল যে, বীমা তহবিলের ও চাঁদার টাকা অন্যায় ভাবে খরচ হইয়া যাইত। সেইজন্যই নূতন আইনে পৃথক-ভাবে ৫০ হাজার টাকার কার্যকরী মূলধন সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া জমার ১ লক্ষ টাকা বীমা তহবিলের জন্যত আছেই। এই বীমা তহবিলেব টাকা অন্য কোনভাবেই খরচ করা যাইবে না--ইহাতে বীমাকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে। পূর্ব্বে কোম্পানীগুলি রীতি-মত ঝুঁকি সহকারে নিরাপদ নহে এমন স্থানেও টাকা লগ্নী করিত—বর্ত্তমানে আর তাহা হইবার উপায় নাই কারণ শতকরা ৫৫ ভাগই গভর্ণ-মেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করিতে হইবে। অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক রিবেট ও কমিশনের ব্যাপার বন্ধ করিয়া তাহার হার নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বক এবং ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রথা তুলিয়া দিয়া কোম্পানীর ব্যয় হার যথেষ্ট হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোম্পানী হইতে ডিরেক্টর, ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট ও অপরাপর প্রবলশালী কর্ম্মচারীরা ঋণ গ্রহণ করিয়া অপরের পক্ষে ঋণ গ্রহণের অসুবিধা সৃষ্টি করিত—তাহা বর্ত্তমানে দূরীভূত হইয়াছে। পলিসি হোল্ডারদের পক্ষে রিপোর্ট, কার্য্যব্যবস্থা প্রভৃতি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া ও তাঁহাদের বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্-এ আসন পাইবার সুবিধা দিয়া তাঁহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন গোলযোগ থাকিলে কোম্পানী সে টাকা মারিয়া দিত, বর্ত্তমানে আর তাহা চলিবে না—কোম্পানীকে টাকা কোর্টে জমা দিতে হইবে। সামান্য ব্যাপার লইয়া কোম্পানী দুই বছর পরেও দাবী অস্বীকার করিতে পারিত, বর্ত্তমান আইনে কোম্পানী আর তাহা করিতে পারিবে না। প্রভিডেণ্ট সোসাইটিগুলির কার্য্যেরও কড়াকড়ি বিধান করা হইয়াছে—ডিভাইডিং প্রিন্সিপল্-এ কার্য্য আর চলিবে না। এ্যাকচুয়ারীর দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পর উদ্বৃত্ত থাকিলে তবেই ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা যাইবে। বিদেশী কোম্পানীগুলির উপর কড়াকড়ির বিধান করিয়া আইনগতভাবে দেশী-বিদেশীকে সমান মর্য্যাদা দান করা হইয়াছে। বিলাতী কোম্পানী ছাড়া অপরাপর বিদেশী কোম্পানীর ভারতীয় কাজের সমস্তটাই এদেশীয় গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটিতে লগ্নীকরণের ব্যবস্থা করিয়া পলিসিহোল্ডারদের স্বার্থ নিরাপদ করা হইয়াছে—আন্তর্দেশিক যুদ্ধ লাগিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা ইহাতে বিদূরীত হইবে। সর্ব্বোপরি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সকল প্রকার ফাঁকীর পথ বন্ধ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিধান অবলম্বিত হওয়ার দরুণ বীমাকারীর দাবী মাত্রই টাকা পাইতে আর কিছুমাত্র ভাগ করিতে হইবে না।

বীমা প্রসঙ্গ

আমরা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী বর্ত্তমান ১৯৩৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের মধ্যে ৭৫, ২৩, ৬২৫ টাকার নূতন কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মাত্র কয়েক বৎসর হইল মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর আশাতীত উন্নতি এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে বম্বে লাইফ্ য্যাস্থর‍্যান্স্ কোম্পানীর ডিষ্ট্রীকট্ আফিস খোলা হইয়াছে। ডিভিসন্যাল্ চীফ্ এজেন্ট্ মিঃ জে, কে, সেন এম্ এ উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

আলীগড়ের প্রভিডেন্স্যাল্ ইন্‌স্থর‍্যান্স্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস্ জাফরুল্লা বি এ, সেই কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লাহোরের গ্রেট্ অরিয়েণ্ট্ ইন্‌স্থর‍্যান্স্ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার হইয়াছেন।

হিন্দুস্থান-কো-অপারেটিভের কর্ম্মচারী মিঃ অশোক রঞ্জন সেন এম্ এ, এ সি আই আই (লণ্ডন) অস্থায়ীভাবে উক্ত সোসাইটীর নাগপুর শাখায় প্রেরিত হইয়াছেন।

* * *

লাহোরের ভারত ইন্‌স্থর‍্যান্স কোম্পানীর ঢাকা ব্রাঞ্চে ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকার নূতন বীমার কারবার হইয়াছে। মিঃ জে সি বসু এম্ এ, বি এল এই ব্রাঞ্চের চার্জ্জে আছেন। তিনি পূর্ব্বে আহমদবাদের ওয়ার্ডেন ইন্‌স্থর‍্যান্স্ কোম্পানীতে কার্য্য করিতেন।

দেশকল্যাণ ইন্‌স্থর‍্যান্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ এইচ্ এন্ রায় চৌধুরী বি এ, উহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ওয়েল্‌থ্ অব্ ইণ্ডিয়া ইন্‌স্থর‍্যান্স্ কোম্পানীর এজেন্সী ম্যানেজার হইয়াছেন।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সার্ভেণ্ট্ অব ইণ্ডিয়া ইন্‌স্থর‍্যান্স্ কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং ভবনগর ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার প্রভাশঙ্কর পত্তনী কে, সি, আই, ই, অকস্মাৎ এবং অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

লক্ষ্মী ইন্‌স্থর‍্যান্স্ কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী মিঃ শচীন বাগ্‌চী ফেডারেসন্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার্স অব্ কমার্সের সভায় যোগদান করিবার জন্য দিল্লীতে গিয়াছিলেন। গত ৪ঠা এপ্রিল তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গত ১৫ই এবং ১৬ই মার্চ্চ লাহোর লক্ষ্মী ইন্সুর্‌যান্স কোম্পানীর আফিসে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স অফিসেস্ য়্যাসোসিয়েশনের দশম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—মিঃ এস্ বি কার্ড মাষ্টার (নিউ ইণ্ডিয়া)—প্রেসিডেণ্ট্। মিঃ পি সি রায় (হিন্দু মিউচুয়্যাল)—ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট্। মিঃ কে সি দেশাই (ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল য়্যাণ্ড্ প্রুডেনসিয়াল)—অনারারী সেক্রেটারী।

—✲—

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর ঢাকা ব্রাঞ্চ গত বৎসর (১৯৩৭) ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে খোলা হইয়াছে। শুনিলাম এই অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ব্রাঞ্চ আফিসে ৩ লক্ষ টাকার বীমার কারবার হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত ব্রাঞ্চের কর্ম্মিগণ কোম্পানীর ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। ইতিমধ্যে উহার ৩ নং জনসন রোড্স্থিত আফিস্ গৃহে স্থানীয় পরামর্শ সমিতি এবং কর্ম্মিগণের বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

—✲—

বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যাইতেছে, ইণ্ডো-এশিয়াটিক ইনসুর‍্যান্স্ কোম্পানীর পরিচালকগণ ফ্রি-ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইবার সংকল্প করিয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কিছুকাল পূর্ব্বে লাহোরের একটী কোম্পানী এবং এলাহাবাদের একটী কোম্পানী ফ্রি ইণ্ডিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। ফ্রি-ইণ্ডিয়া একটী ক্রমোন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান। কানপুরে ইহার হেড্ আফিস এবং শ্রীশ্রীপ্রকাশ এম্ এল এ মহাশয় ইহার ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

—✲—

পণ্ডিত কে শান্তনম্ লাহোরে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ অফিসেস্ য়্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট-রূপে যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে য়্যাক্‌চুয়ারীদের সম্বন্ধে অপ্রিয় এবং আপত্তিজনক উক্তি করায় বীমা ব্যবসায়ী মহলে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিমধ্যে কেহ কেহ তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার য়্যাক্‌চুয়ারী মিঃ পি ভি কৃষ্ণমূর্ত্তি এফ্ আই এ, এবং কলিকাতার মিঃ এইচ্ কে সেন এফ এফ এ, এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। নিম্নলিখিত য়্যাকচুয়ারিগণও পণ্ডিত শান্তনামের নিকট এক প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, —

(১) মিঃ বি কে সাহ এফ্ আই এ ;
(২) মিঃ কে আর শ্রীনিবাস এফ্ আই এ ;
(৩) মিঃ এস্ এন্ বৈদ্য এফ্ আই এ ;
(৪) মিঃ এল এস্ বৈদ্যনাথান এফ্ আই এ।

—✲—

ইণ্ডিয়ান ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর ফিল্ড্ ওয়ার্কার্স্ য়্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এন্ প্রামানিক দীর্ঘ ৯ মাস কাল কঠিন রোগ ভোগের পর পুনরায় সুস্থ হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। য়্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিলের সদস্যগণ গত ২২শে এপ্রিল তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্ত্তমান নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ন্যাশন্যাল ইন্সুর‍্যান্স ১,৬৯,২৩,৯০৯ টাকার এবং বম্বে মিউচুয়্যাল ২,০২,০২,০০০ টাকার নূতন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই আশাতীত, সাফল্যের জন্য আমরা উভয় কোম্পানীকেই আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স আফিসেস্ য়্যাসোসিয়েশনের কার্য্যালয় বোম্বাইয়ের ফোর্ট অঞ্চলের ফিরোজ শাহ মেটা রোডে "লক্ষ্মী বিল্ডিং" ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মহিলা কর্ম্মী মিস্ ইন্দুমতী সিংহ "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স্" কোম্পানীর কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, ইউনিক য়্যাস্যু-র‍্যান্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্‌গণ পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ডিরেক্টরগণ উহার পরিচালন ভার লইয়াছেন।

গত ২৪ শে মার্চ্চ মোটর যান সম্বন্ধীয় বিল্ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সিলেক্ট্ কমিটীর নিকট বিবেচনার্থ দেওয়া হইয়াছে। মোটর যান বীমা বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিটী বাধ্যতামূলক তৃতীয় পক্ষের বীমা (Third party insurance) প্রচলনের যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা উক্ত বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং সিলেক্ট কমিটীর বিচারে উহা টিকিবে কিনা সন্দেহ।

আমরা অবগত হইলাম, গত এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে প্রভিডেণ্ট্ ইন্সুর‍্যান্সের হেড্ আফিস্ রংপুর হইতে কলিকাতায় (১৭নং ম্যাঙ্গো লেনে) স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের কারবার বৃদ্ধিই ইহার কারণ।

মিঃ সমরেশ চক্রবর্ত্তী এযাবৎ ন্যাশন্যাল ইন্সুর‍্যান্সের হেড্ অফিসে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত কোম্পানীর পাটনা ব্রাঞ্চের অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ চক্রবর্ত্তীর যোগ্যতার আদর হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম।

ব্যবসায়ের সন্ধানে

Gopen. K. Shaha

(১)

ধানের চালানী কারবার

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত নীলামবাজার মোকামের একজন ধান্যব্যবসায়ী ধান চালানী কারবারে অংশীদার চাহেন। তিনি আমাদের পত্রিকার একজন গ্রাহক। তাঁহার একখানি পত্র এই পুস্তকের পত্রাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে (১নং পত্র) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কারবারের কথা বিস্তারিত লিখিত আছে। কোন মূলধন দাতা ব্যবসায়ী তাঁহার সহিত মিলিয়া কারবার করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার নিকট সাক্ষাৎভাবে পত্র লিখিয়া সমস্ত অবগত হইতে পারেন।

(২)

তেঁতুল বীচির ও করঞ্জা বীচির খরিদদার

আমাদের পত্রিকার গ্রাহক শ্রীযুক্ত নবকুমার অধিকারী তেঁতুলবীচি ও করঞ্জার বীচি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। তিনি ঐ দুইটী জিনিসের খরিদদারের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন। ব্যবসায়িগণ শ্রীযুক্ত নবকুমার বাবুর নিকট সাক্ষাৎ ভাবে চিঠি লিখিতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা,—গ্রাম খাঞ্জাপুর, পোঃ গোপমহল, জেলা মেদিনীপুর।

পত্রাবলী

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** ব্যবসায়েব সন্ধান দিবার এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য ৫৷৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,"—ফ্যাও,—ফ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। **কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে এবং পোষ্টেজ না পাঠাইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।**

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি **আমাদের যে সকল যাঁহারা গ্রাহক আছেন গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ১৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিবরণ অবগত হইয়া আমাকে একজন মূলধনদাতা সহযোগী সংগ্রহ করিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

সিলেট ও কাছাড় জেলা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ ধান্য বাঙ্গালার নানা মোকামে রেলপথে রপ্তানি হয়। কমিশন লাভে অনেক দিন যাবৎ আমি ধান্য রপ্তানির কাজ করিয়া আসিতেছি। এই কাজে মূলধন দাতারূপে আমার একজন অংশীদার সহযোগী ছিলেন। অধিক লাভাশায় তিনি পৃথক হইয়া কলিকাতা গিয়া অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন। সাধারণ ভাবে আমার কাজ এখন চলিলেও আশানুরূপ চলিতে মূলধনের অভাবে অসুবিধা হইতেছে।

প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে এখানে ধান্য ১৲ টাকা, ১৵০ আনা মণ দরে পাওয়া যায়। দাদন প্রথায় অনেকে আরও অনেক সুবিধা মূল্যে ধান্য কিনিয়া থাকেন। আমি দাদন প্রথায় কাজ করি না। পৌষ মাসের শেষ ভাগে সামান্য কতক মণ ধান্য কিনিয়া রাখিয়াছিলাম। উপস্থিত বাজার দরে বিক্রি দিলে শতকরা ৪০৲ টাকা হিসাবে লাভ হইতেছে। আমদানী মরসুমে রাখি করিলে নিম্নঙ্কাটে ভাল ব্যবসা হয়। নিলাম বাজার, বারই গ্রাম ও কানাই-বাজার এই তিনটী স্থানে যথেষ্ট ধান্য আমদানী করা যায়। তিনটি স্থানই একটির অনতিদূরে অন্যটি অবস্থিত। তিনটি স্থানেই রেল ষ্টেশন আছে। আমি ঐ সমুদয় স্থান হইতেই ধান্য রপ্তানি দিয়া থাকি। এই

ব্যবসায়ে লোকসানের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য কাজের তুলনায় এদেশে এই কাজটি সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ও নিরাপদ ব্যবসা। সর্ব্বদা ক্যাশ টাকায় মাল বিক্রি হয়। সিলেটের অন্যান্য লাভজনক ২।১টি রপ্তানি ব্যবসাতেও আমার অভিজ্ঞতা আছে। মূলধন সাহায্যে কেহ এই ব্যবসায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক থাকিলে পত্রালাপ দ্বারা ব্যবসার সবিশেষ বিবরণ তলাইয়া দেখিতে পারেন। মূলধন যোগাড় হইলে কার্য্য বিস্তৃতি করাই আমার উদ্দেশ্য। ইতি—

বিনীত—

শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দাস
পোঃ মোঃ নিলাম-বাজার, শ্রীহট্ট।
গ্রাহক নং ৫৯১১

১নং পত্রের উত্তর

আপনার ধান চালানী কারবারে মূলধন দাতারূপে যে অংশীদার চাহিতেছেন, তাহা আপনার স্থানীয় লোকের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। আপনার সঙ্গে যার জানা শুনা নাই, সে কখনও এইরূপ সাধারণ ছোট খাট কারবারে আপনার অংশীদার হইতে চাহিবে না। কারবার যদি বৃহৎ ও লিমিটেড্ কোম্পানী হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। অপরিচিত স্থল হইতেও তার অংশীদার জুটে। যাহা হউক, আমরা আপনার পত্রের মর্ম্ম এই পুস্তকের "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশ করিলাম। তদ্দৃষ্টে কোন মূলধন দাতা আপনার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। নিম্নে আপনাকে কয়েকজন বড় বড় ধান্য ব্যবসায়ীর ঠিকানাও লিখিয়া জানাইলাম। ইঁহাদের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া দেখিতে পারেন। এতদূর স্থান হইতে আমরা আপনাকে ইহার অতিরিক্ত আর কোন সাহায্য করিতে অসমর্থ।

ধান্য ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা :—

(১) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ৬৯।১ চেত্‌লা রোড, কলিকাতা (২) বিজয় কুমার আঢ্য ও অমূল্যধন আঢ্য ৭৪নং চেত্‌লা রোড, কলিকাতা (৩) হরিপদ ঘোষ ২নং চেত্‌লা রোড, কলিকাতা (৪) ইন্দ্রচাঁদ তোলারাম; গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া আসাম (৫) যাদব চন্দ্র কৈলাস চন্দ্র সুরুপেটা, কামরূপ (৬) কেশবচন্দ্র সামন্ত এণ্ড সন্স ২০, চেতলা রোড, কলিকাতা (৭) এম্ এম্ ইস্পাহানি ১০৮, চেত্‌লা রোড, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উল্টাডিঙ্গি, দাস পাড়া, টালা, গোসাবা, হিংলাগঞ্জ, সন্দেশখালী প্রভৃতি স্থানে বহু ধান্য ব্যবসায়ীর গদি আছে। ইহাদের সঙ্গে কারবার করিতে হইলে আপনাকে একবার এদিকে আসিতে হয়। শুধু চিঠি পত্রে এ-সব গুরুতর কাজ হয় না।

নোটীশ

কলিকাতা কর্পোরেশন

ঋণ গ্রহণার্থ বিজ্ঞপ্তি

শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৭,৫০,০০০৲ টাকার জন্য টেণ্ডার।

১৯৩৮-৩৯ সালের ডিবেঞ্চার লোন, ১৯৬৮ সালের ১লা জুন পরিশোধ-যোগ্য হইবে।

১৯২৩ সালের ৩ আইনের (বঃ ব্যঃ ৯৭ ধারা অনুসারে, কলিকাতা কর্পোরেশন, ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে ধার্য্য ও নির্দ্ধারিত কর (rates), ট্যাক্স ও অন্যান্য পাওনাদি জামীন রাখিয়া, ৪৭,৫০,০০০৲ টাকা ডিবেঞ্চার লোন গ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া ১৭,৫০,০০০৲ টাকার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন এবং বাকী টাকা সমমূল্যে (at par) নিজেদের মধ্যেই ইস্যু করার অধিকার কর্পোরেশনের বিজার্ভ রহিল।

২। ১৯৩৮ সালের ১লা জুন হইতে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর এই ডিবেঞ্চার বলবৎ থাকিবে এবং বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ চলিবে এবং উহার ষাণ্মাসিক সুদ কলিকাতায় প্রতি বৎসর ১লা জুন ও ১লা ডিসেম্বর দেওয়া হইবে। এই ঋণ ১৯৬৮ সালের ১লা জুন তারিখে সমমূল্যে (at par) কলিকাতায় পরিশোধযোগ্য হইবে।

৩। ১০০৲ টাকা বা উহার গুণিতক পরিমাণ ডিবেঞ্চার ইস্যু করা হইবে।

৪। সমগ্র ঋণের বা তাহার যে কোন অংশের টেণ্ডার, **১৯৩৮ সালের ২৩শে মে, সোমবার হইতে ১৯৩৮ সালের ৩০শে মে, সোমবার মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা (স্থানীয় সময়) পর্য্যন্ত, কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক বা কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী** কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

৫। **প্রত্যেকটি টেণ্ডার** এই বিজ্ঞপ্তির সহিত সংলগ্ন ফরমে অবশ্য করিতে হইবে এবং উহা **শীল মোহরাঙ্কিত খামে ভরিয়া** সেক্রেটারী ও ট্রেজারার, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা বা সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা ঠিকানায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং **খামের উপর—"১৯৩৮-৩৯ সালের মিউনিসিপ্যাল লোনের জন্য টেণ্ডার"** লিখিয়া দিতে হইবে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে অথবা কলিকাতাস্থিত সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে কলিকাতা

কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর নিকটও টেণ্ডার ফর্ম্ পাওয়া যাইবে।

৬। যে পরিমাণ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইবে, তাহার অন্ততঃ শতকরা ৫৲ টাকা—কোম্পানীর কাগজ, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, কারেন্সী নোট বা চেক দ্বারা—প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে বায়নাস্বরূপ অবশ্য জমা দিতে হইবে।

৭। টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার পর বিলিকরণ (allotment) কার্য্য সম্পন্ন হইলে বায়নাস্বরূপ আমানতী টাকা বাদে যে পরিমাণ টাকা দিতে হইবে, তাহা ১৯৩৮ সালের ১১ই জুন বা তৎপূর্ব্বে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে কারেন্সী নোট (currency notes) দ্বারাবা চেক্ দ্বারা অবশ্য আদায় দিতে হইবে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে যে তারিখে, ঋণ বিলির পর দেয় টাকা (allotment money) গৃহীত হইবে, সেই তারিখ হইতে ডিবেঞ্চাবের সুদ চলিবে। যদি ঐ টাকা (allotment money) চেক দ্বারা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে যে তারিখে ঐ চেক ভাঙ্গান হইবে, সেই তারিখই টাকা গ্রহণের তারিখ বলিয়া ধরা হইবে। বায়নাস্বরূপ যে টাকা নগদ বা চেক দ্বারা জমা দেওয়া হইবে, তাহার উপর শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ, টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে অথবা চেক ভাঙ্গাইবার তারিখ হইতে হিসাব করিয়া ঋণ বিলির (allotment) পর যে টাকা দিতে হইবে, সেই টাকা আদায় দেওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত সুদ পৃথকভাবে চেক দ্বারা ডিবেঞ্চার ইস্যু করার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হইবে; অবশ্য ঋণ বিলির পর দেয় টাকা ১৯৩৮ সালের ১১ই জুন বা তৎপূর্ব্বে দিলেই ঐরূপ সুদ দেওয়া হইবে। ১৯৩৮ সালের ৩০শে নবেম্বর যে কিছু কম (broken) ছয় মাস পূর্ণ হইবে, সেই ছয় মাসের বাবদ ডিবেঞ্চারের সর্ব্বপ্রথম সুদ ১৯৩৮ সালের ১লা ডিসেম্বর দেওয়া হইবে।

৮। যে সমস্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে না, তাহার জন্য যে টাকা বায়নাস্বরূপ জমা দেওয়া হইবে, তাহা দরখাস্ত করিলেই ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং ঐ বাবত আমানতী টাকার উপর কোন সুদ দেওয়া হইবে না। ঋণ বিলির পর যদি উহা গৃহীত না হয় বা ১৯৩৮ সালের ১১ই জুন মধ্যে বিলির পর দেয় পুরা টাকা আদায় না দেওয়া হয়, তবে বায়নাস্বরূপ আমানতী টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। যে দরে (rate) টেণ্ডার দেওয়া হইবে সেই দর টাকা বা টাকা ও আনায় উল্লেখ করিতে হইবে, কিন্তু উহা কোনক্রমেই আনার ভগ্নাংশে দিলে চলিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে দেওয়া দর আনার ভগ্নাংশে দেওয়া হয়, তবে ঐ ভগ্নাংশ কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং দরে আনার ভগ্নাংশ যেন ছিল না, সেইরূপ ভাবে টেণ্ডারটিকে ধরিয়া লওয়া হইবে; যে টেণ্ডারে দর টাকা বা টাকা ও আনার উল্লেখ থাকিবে না তাহা বাতিল ও অসিদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে।

১০। ১৯৩৮ সালের ৩০শে মে সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কর্পোরেশনের ফাইনান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্ত্তৃক টেণ্ডারসমূহ খোলা হইবে।

১১। সর্ব্বোচ্চ বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কমিটি বাধ্য নহেন এবং সমগ্র বা অংশতঃ যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করার ও

তদনুসারে ঋণ বিলি করার (allotment) অধিকার কমিটীর রিজার্ভ রহিল।

১২। ব্রোকার্স ও ব্যাঙ্কের মারফৎ যে সমস্ত টেণ্ডার পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে যাহা গৃহীত হইবে তাহার উপর শতকরা চারি আনা হারে দালালী দেওয়া হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী,
কর্পোরেশনের সেক্রেটারী।

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিস,
কলিকাতা।

১৮ই মে, ১৯৩৮।

দরখাস্তের ফরম

১৯৩৮ সালের ১লা জুন তারিখে ১৭,৫০,০০০৲ টাকার জন্য শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৩৮-৩৯ সালের ডিবেঞ্চার লোন।

মাননীয়—

শ্রীযুক্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মহোদয় সমীপে—

আমি বা আমরা.................................
....এতদ্দ্বারা ১৯৩৮ সালের ১লা জুন তারিখের ৩০ বৎসরের জন্য শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৩৮-৩৯ সালের মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোনের বাবত.........................
.........................টাকার (কথায়) জন্য টেণ্ডার দিলাম এবং ১৯৩৮ সালের ১৮ই মে তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সর্ত্তানুসারে আমাকে বা আমাদিগকে যে পরিমাণ ঋণ বিলি করা হইবে, তাহার প্রতি একশত টাকার জন্য ....টাকা........আনা হারে উহার টাকা আদায় দিতে রাজী আছি।

আমি বা আমরা বায়নাস্বরূপ এতৎসঙ্গে ....টাকার

(১) কোম্পানীর কাগজ
(২) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার
(৩) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার
(৪) কারেন্সী নোট
(৫) চেক

দিলাম।

(স্বাক্ষর)
....

ঠিকানা.................................

তারিখ.................................

নোটীশ
কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ ইজারা (lease) বা লাইসেন্স লওয়ার জন্য সেলামীর (premium) প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে; উহা শীলমোহরাঙ্কিত খামে ভরিয়া, খামের উপর "কর্পোরেশনের সম্পত্তি সমূহের জন্য সেলামী বা খাজনা" লিখিয়া দিতে হইবে এবং ১৯৩৮ সালের ২৩শে মে সোমবার বা তৎপূর্ব্বে চীফ ভ্যালুয়ার ও সার্ভেয়ার কর্তৃক তাহার অফিসে গৃহীত হইবে:—

(১) সুগার ওয়ার্কস্ লেনস্থ (এ প্লট) ও (বি প্লট) ২৪ বর্গফুট পরিমিত জমির, (২) প্রিয়নাথ মুখার্জ্জী রোডস্থ ১৬ বর্গফুট পরিমিত জমির, (৩) রামগোপাল ঘোষ রোডস্থ (এ প্লট) ২৭ বর্গফুট পরিমিত জমির ও (বি প্লট), (৪) কৃপানাথ দত্ত রোডস্থ ৬০ বর্গফুট পরিমিত জমির এবং (৫) তপসিয়া রিফিউজ ক্যানেলের দক্ষিণস্থ ৭ বিঘা ৮কাঠা পরিমিত জমির ইজারার (lease) জন্য এবং (৬) হাজরা পেল ডিপো (Pail Depot) স্থিত ৫টী তাল গাছের জন্য, (৭) মানিকতলা অঞ্চলস্থিত বৃক্ষাদির ফল আহরণের জন্য, (৮) বজ্‌বজ্‌ ডিপোস্থিত চারিটি গাছের ফল আহরণের জন্য এবং (৯) বেলেঘাটা রোড ও লোয়ার সারকুলার রোডের সংযোগ স্থলে একটি বিজ্ঞাপনের বোর্ডের জন্য লাইসেন্স। ১নং হইতে ৪নং দফা বাবত ৬ মাসের খাজনা, ৫নং দফা বাবদ এক বৎসরের খাজনা এবং ৬ হইতে ৯নং দফা বাবদ ছয় মাসের ফী জামীন স্বরূপ জমা দিতে হইবে। এষ্টেটস্ এণ্ড জেনারেল পার্পাসেস্ কমিটি প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করা মাত্রই জামীনস্বরূপ আমানতী টাকার মধ্য হইতে তিন মাসের খাজনা বায়নাস্বরূপ (earnest money) ঘটনাস্থলে অবশ্য দিতে হইবে। ইজারা ও লাইসেন্সের সর্ত্তাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণাদি যে কোন দিন অফিস খোলা থাকিলে উপরোক্ত অফিসারের অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী
সেক্রেটারী
১১।৫।৩৮

ব্যবসা ও বাণিজ্যের নিয়মাবলী।

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য

মূল্য

"ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ নগদ ৫।৵০ ভিঃ পিঃ তে লইলে ৫॥৵০; প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য হাতে হাতে ॥০, নমুনা চাহিলেও ঠিক ঐরূপ মূল্য লাগে। কিন্তু নমুনা বলিয়া আমরা কোন বিশেষ সংখ্যা ছাপাই না। হালের যে কোন সংখ্যা পাঠাই। বিনা মূল্যে কিংবা ভিঃ পিঃ ডাকে কাহাকেও নমুনা পাঠান হয় না। অগ্রিম মূল্য বাবদ আট আনার পোষ্টেজ পাঠাইলে তবে পাঠান হয়। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়; এবং বৎসরের যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হ'ন না কেন, **বৎসরের প্রথম হইতে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে কাগজ লইতে হয়।**

অপ্রাপ্ত সংখ্যা

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের মধ্যেই অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে ও আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগকে জানাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ডাক বিভাগে তাহার তদন্ত করিয়া সেই তদন্তের মর্ম্ম এবং ফলাফল আমাদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে; নতুবা গ্রাহকদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যাখানির জন্য মূল্য ও ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন অথবা ঠিকানা পরিবর্ত্তন

বিজ্ঞাপন কিংবা ঠিকানা বদলাইতে হইলে পূর্ব্ববৎ বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যেই জানানো চাই, নচেৎ কাগজ না পাইলে কিংবা বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত না হইলে আমরা দায়ী নহি।

পত্রোত্তর

রিপ্লাই কার্ড এবং টিকিট না পাইলে সাধারণতঃ কোন চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

প্রবন্ধাদি

টিকিট দেওয়া থাকিলে কিম্বা পাঠাইয়া দিলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়। প্রবন্ধ "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা প্রবন্ধ পাঠাইবার এক পক্ষকাল পরে রিপ্লাই কার্ডে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

"ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী" অধ্যায়ে যাঁহারা মফঃস্বলে নানা বন্দর, বাজার, গঞ্জ, মোকাম এবং আড়তদারদিগের নাম ঠিকানা এবং সেই সকল স্থানের আমদানী রপ্তানী দ্রব্যাদির বিশেষ বিবরণ সঠিক সংগ্রহ করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশের জন্য পাঠাইবেন, ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হইলে, তাঁহারা একখানি বিনামূল্যে উপহার পাইবেন কিন্তু অন্ততঃ চারিটী মোকামের বিবরণ পাঠানো চাই।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

মলাটের ১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৫০৲	মলাটের ২য় এবং ৩য় পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ স্থানের চার্জ্জ—	৩০৲
মলাটের ২য় পৃষ্ঠা	৫০৲	পুস্তকারম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠার চার্জ্জ—	৬০৲
মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা	৫০৲		
মলাটের ৪র্থ বা শেষ পৃষ্ঠা	৭০৲	পুস্তকের ভিতর প্রবন্ধাদির মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে তাহার পুরা পৃষ্ঠার চার্জ্জ—	৩০৲
বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রকাশ করিলে সাধারণ পৃষ্ঠা।	২০৲		

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ | আষাঢ়---১৩৪৫ | ৩য় সংখ্যা

চিনির কথা

সভ্যজগতে শর্করার আদর সর্ব্বত্র। ইহার আস্বাদনে রসায়ন তৃপ্তি সাধন করে নাই এরূপ বাল-বৃদ্ধ-যুবা ক্কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শর্করার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা অতি অল্পদিন হইল মানবজাতি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু এই অল্পদিন অর্থে কেহ যেন ৫০০।৭০০ বৎসর মনে না করেন। অল্প অর্থে মানবের প্রথম সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যতকাল অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় শর্করার উৎপত্তি ইতিহাসে অতি অল্পকালব্যাপী। ভারতের আর্য্যঋষিগণ শর্করার ব্যবহার জানিতেন বটে, কিন্তু তাহা দেবকার্য্যে বা ঐরূপ গুরুতর কার্য্যেই বা ঔষধার্থেই ব্যবহৃত হইত।

আমরা আজকাল চিনি ব্যতীত একদিনও চালাইতে পারি না, আমাদের খাদ্যের কোন না কোন অংশে চিনি মিশ্রিত থাকে। কিন্তু প্রাচীনলোকেরা চিনি ব্যতীতও বেশ স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারিতেন। মধু ভিন্ন স্বাভাবিক অবস্থায় চিনি পাওয়া যায় না। আমাদের চিনি কৃত্রিম। অতএব অতি প্রাচীন কালে চিনির পরিবর্ত্তে মধুই ব্যবহৃত হইত। পরে যখন কৃত্রিম উপায়ে গুড় প্রস্তুত হইল, তখন মধু ও গুড়ের গুণগত, রূপগত ও আস্বাদগত অনেকটা মিল দেখিয়া মধুর পরিবর্ত্তেও ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় চিনির আদর অধিক। কেননা সেখানকার অধিকাংশ লোকই চা, কোকো ইত্যাদি চিনি মিশ্রিত পেয় পানে অনুরক্ত। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, অত্যধিক চিনি ব্যবহারে বিষক্রিয়ার লক্ষণ উপস্থিত হয়। কোন শিশু অধিক

পরিমাণে চিনি বা মিষ্টরস আস্বাদনে অনুরক্ত হইলে তাহার শরীর শক্তিহীন হয়, সে রুগ্ন হয়, অজীর্ণাদি পীড়ায় অতি শীঘ্র আক্রান্ত হয়। কাজেই চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা প্রমাণ করিয়াও দেখিয়াছেন যে, শিশুর পক্ষে অত্যধিক চিনি ব্যবহার বড়ই কুফল প্রদ। এমন কি তাঁহারা দেখিয়াছেন যে অত্যধিক চিনি ভক্ষণে অনুরক্ত অনেক শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। চিনির এই অপকারিতা মানব কতকাল পূর্ব্বে ঠিক করিতে পারিয়াছে, তাহা স্থির করা সহজ নহে। ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবেথের সময় হেনজ্-

নার নামক জনৈক জার্ম্মান পর্য্যটক ইংলণ্ডে আসিয়া মহারাণীর দন্তপংক্তি কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, অত্যধিক চিনি ব্যবহারে ক্ষয়-কাশ উপস্থিত হইতে পারে, দন্ত বিনষ্ট হইতে পারে; এবং ডিস্‌পেপসিয়া বা আন্ত্রিক বহুবিধ পীড়ার মূল অত্যধিক চিনি ভোজন। সেইজন্য সকলেরই চিনি ব্যবহারে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

দেখা যাউক, আজকাল সভ্যজগতে চিনি কিরূপ ব্যবহৃত হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অফ্ আমেরিকায় প্রতি লোকে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১ মণ চিনি ব্যবহার করেন। ইংলণ্ডেও প্রায় ঐরূপ। জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং হলাণ্ডে অর্দ্ধমণ অপেক্ষাও কম। ইটালী, ফ্রান্স এবং টার্কিতে অতি অল্প,—গড়ে প্রতি লোক প্রতি বৎসর ৵৪ সের মাত্র ব্যবহার করে। ভারতবর্ষে সেরূপ কোন সংখ্যা নির্দ্ধারণ হয় নাই। তবে লোকেরা যেরূপ ভাবে চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে গড়ে প্রত্যেক লোক বৎসরে ১০।১২ সের অপেক্ষা অধিক চিনি ব্যবহার করে না। ইউরোপাদি দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা অধিক পরিমাণে খাদ্যার্থে অলিভ তৈল ব্যবহার করে, তাহাদের চিনিও তত অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, প্রতি বৎসর সমগ্র সভ্যজগতে ৩৮,০০০০,০০০ মণ চিনি ব্যবহৃত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, চিনি কিরূপ পদার্থ। ইহা অঙ্গারমূলক। ইংরাজীতে ইহাকে কারবোহাইড্রেট বলে,—অর্থাৎ ইহার অঙ্গারের সহিত এমন পরিমাণে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিশ্রিত রহিয়াছে যে, যদি অঙ্গার না থাকিত, তাহা হইলে এই হাইড্রোজেনও মিলিত হইয়া জল উৎপাদন করিত। অতএব অঙ্গার, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিলিত হইয়াই চিনি উৎপাদিত হয়। রাসায়নিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, ২ ভাগ হাইড্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া জল উৎপাদিত হয়। এক্ষনে হাইড্রোজেন এই ইংরেজী কথার আদ্য অক্ষর H দ্বারা ও অক্সিজেনের আদ্য অক্ষর O দ্বারা যথাক্রমে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নির্দ্দেশিত হইলে, H. O. নির্দ্দেশিত হয়,—অর্থাৎ রাসায়নিক জলকে H. O. এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সূচিত করেন। কারবো-হাইড্রেটে জল প্রস্তুত করিবার উপযোগী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এবং কারবন রহিয়াছে, এক্ষণে যদি কারবন দ্বারা সূচিত করা যায়, তাহা হইলে কারবোহাইড্রেটাকে C দ্বারা সূচিত করা যায় তাহা হইলে Cn (H. O), অথবা (Cn) HyO, এইরূপে লেখা যাইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিনি আর কিছুই নহে, কেবল অঙ্গারের বিকার মাত্র। আমরা চিনি ভক্ষণ করি, প্রকারান্তরে অঙ্গারই খাইয়া থাকি। অঙ্গার বাস্তবিক অতি অদ্ভুত পদার্থ, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গারের রূপান্তর। মানবের উন্নতির যাবতীয় কারণ পাথুরিয়া কয়লা বা অঙ্গার। যদি পাথুরিয়া কয়লা আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে মানবের সভ্যতা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। আমরা যে খাদ্য দ্বারা রসনার পরম তৃপ্তি সাধন করি, তাহাও অঙ্গার। অঙ্গারের ন্যায় কুহেলিকাময় পদার্থ জগতে অতি বিরল।

চিনি অঙ্গার কিনা তাহা বুঝিবার এক সহজ উপায় আছে। যদি গাঢ় চিনির দ্রাবকে জল-

মিশ্রিত নহে এরূপ (Concentrated) সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পলাইয়া গিয়াছে, এবং চিনির পরিবর্ত্তে একতাল অঙ্গার পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের শরীরের গঠনে অঙ্গার অধিকাংশ হইলেও, জীবন রক্ষা, কেবল মাত্র বিশুদ্ধ অঙ্গারের দ্বারা সম্ভবপর নহে। নাইট্রোজেন মূলক খাদ্য এবং অন্যান্য ধাতব যৌগিক খাদ্যও প্রয়োজনীয়। অতএব চিনি দ্বারা আমাদের শরীরের গঠন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। চিনি দ্বারা কেবল শরীরের চর্ব্বি উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু শরীরের যে আধারের চর্ব্বি সংরক্ষিত থাকে, তাহাও চিনি উৎপাদন করিতে পারে না। চিনি দ্বারা কেবল মাত্র চর্ব্বি উৎপন্ন হয়, শরীরের অন্য কোন পদার্থ নহে।

একটা ইঞ্জিনে কয়লা যে কার্য্য করে, চিনিও আমাদের শরীরে সেইরূপ কার্য্য করে। কয়লা পুড়িয়া ইঞ্জিনকে শক্তিমান করিয়া তুলে, চিনিও সেই পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরকে শক্তিশালী ও কার্য্যক্ষম করে। কয়লা ইঞ্জিনকে শক্তিপূর্ণ করে বটে; কিন্তু যদি ইঞ্জিনের স্ক্রু নষ্ট হয়,

তাহা হইলে কয়লা দ্বারা ইঞ্জিনের কোন উপকার হয় না। চিনি আমাদের শরীরকে কর্ম্মক্ষম করে বটে, কিন্তু শরীর যন্ত্রের কোন অপচয় হইলে, তাহার কোন কিছুই করিতে পারে না।

লাওয়েজ কৃত "Physiology" নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। তিনি কোন কুকুরকে কেবলমাত্র চিনি প্রদান করিতে লাগিলেন, অন্য খাদ্য একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে কুকুরের সমস্ত ক্ষুধা তিরোহিত হইল। অল্প পরেই তাহার চক্ষু নিষ্প্রভ হইল, চক্ষুর আচ্ছাদন ঘোলাটে হইয়া যাইল, চক্ষুর অবস্থা দেখিয়াই মনে হইল যে, ইহার নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বড় বড় নগরের দরিদ্র ব্যক্তিগণ প্রায়ই পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। তাহাদের চক্ষুতে পুষ্টির অভাব বেশ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব চিনি কেবলমাত্র শরীরে শক্তি সংস্থান করিতেই সমর্থ, শরীর গঠনে ও শরীরের পুষ্টি সাধনে আদৌ উপযোগী নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, চিনি প্রধানতঃ কয় প্রকার। প্রথমতঃ ইক্ষু, শর্করা—আমরা চিনি বলিলেই ইক্ষুশর্করা বুঝিয়া থাকি। ইহাকে বৈজ্ঞানিকগণ সাক্রোজ বা স্যাকারোজ (Sucrose or Saccharose) বলেন। ইক্ষু-শর্করা বলিলে ইক্ষুরস হইতে যে শর্করা পাওয়া যায় তাহা নহে, ইক্ষু শর্করার অনুরূপ সমস্ত শর্করাই ইক্ষু শর্করা। ইহা নানাবিধ তৃণ জাতীয় বৃক্ষের পত্রে, কাণ্ডে, যেমন ইক্ষুদণ্ডে, সরগমে; নানাবিধ বৃক্ষের মূলে, যেমন বীট, গাজর, টারনিপ, লাল আলু; নানাবিধ বৃক্ষের রসে যেমন তাল রসে, খেজুর রসে এবং আখ-রোট, ওয়ালনাট লেবু ইত্যাদি নানাবিধ ফলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আঙ্গুরে ইহার একটি কণা মাত্র থাকে না। স্বভাবতঃ নানা স্থানে প্রচুর পাওয়া যাইলেও, প্রধানতঃ তিনটী উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেই ইহা উৎপাদিত হয়—ইক্ষু, বীট, এবং মেপল্। প্রতি বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৩৮,০০,০০০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ২১,৫০,০০, ০০০ মণ অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও চিনি এক বীট হইতে এবং অবশিষ্ট ইক্ষু হইতেই উৎপাদিত হয়। মেপল্ হইতে মাত্র ১,৩৫,৭০০ মণ চিনি উৎপাদিত হইয়া থাকে; কাজেই মেপলের চিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। ইক্ষুশর্করা দানাদার, জলে অতি সহজে ও সম্পূর্ণরূপে এবং সুরাসারে অতি অল্প দ্রবনীয়। ইহা ক্ষার পদার্থের সহিত সহজে মিলিত হয়। তাম্র যৌগিকের ক্ষারগুণ বিশিষ্ট পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে যৌগিকের তাম্র অধঃস্থ হয় না। এই কয়েকটি ধর্ম্মই ইক্ষু শর্করার বিশেষত্ব।

গ্লুকোজ। এই জাতীয় চিনিও নানাবিধ ফলের ইক্ষুশর্করার সহিত মিশ্রিত থাকে। আঙ্গুরে কেবল এই শর্করাই বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণতঃ বাজারে গ্লুকোজ নামে যে চিনি পাওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ নহে, অর্থাৎ আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলে যে বিশুদ্ধ গ্লুকোজ পাওয়া যায়, উহা তাহা নহে; সেই জন্য বাজারের গ্লুকোজ হইতে বিশুদ্ধ গ্লুকোজকে পৃথকরূপে বুঝাইবার জন্য, বিশুদ্ধ গ্লুকোজকে দ্রাক্ষাশর্করাও বলা হয়। বাজারের গ্লুকোজে ম্যালটোজ ও ডেক্সট্রিন নামক দুইটি পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহা সাধরেণতঃ ধান্যাদি শস্যের শ্বেতসার অংশকে হাইড্রোক্লোরিক দ্রাবক দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া উৎপন্ন করা হয়। কাজেই ইহাকে

গ্লুকোজ না বলিয়া শ্বেতসারশর্করা বলাই উচিত। ২॥০ মণ শ্বেতসার মাত্র ৵১ এক সের হাইড্রোক্লোরিক দ্রাবক দ্বারা এইরূপ চিনিতে পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা সাধারণ খাদ্যার্থে গ্লুকোজ প্রায় ব্যবহার করি না। তবে সিরাপ, জেলি ইত্যাদি নানারূপে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। ইক্ষু শর্করার ন্যায় গ্লুকোজ জলে সহজে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু সুরাসারে অতি শীঘ্র গাঁজিয়া উঠে। ভাত, ডাল ইত্যাদি সেইজন্য অল্পকালের মধ্যে গাঁজিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইক্ষুশর্করা অপেক্ষা ইহার মিষ্টতা মাত্র অর্দ্ধেকের তৃতীয়াংশ।

অনেকে বলেন, অধিক চিনি ভক্ষণে দাস্ত পরিষ্কার হয় না এবং ক্ষয় রোগ উপস্থিত হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব? তবে ক্রমাগত বা অত্যন্ত অধিক চিনি ভক্ষণে আমাদের নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্যের অভাব হয়, কাজেই রীতিমত পুষ্টির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে, সেইজন্য পেশী সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে রোগ প্রতিরোধে তাহাদের সামর্থ্য থাকে না এবং শরীরে নানাবিধ রোগ বীজাণু প্রবেশ করিবার অবসর পায়, আমরাও নানা পীড়ায় আক্রান্ত হই। আবার যদি বেশী চিনি খাইতে আরম্ভ করি, তাহা হইলেই স্বতঃই আমাদের চিনিতে এরূপ অরুচি হইয়া পড়ে, যে চিনি দেখিলেই আমাদের আসক্তি কিছুতেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না কাজেই চিনি দ্বারা ক্ষয় রোগ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব।

অনেক লোকে বলিয়া থাকেন যে, অত্যধিক চিনি ভক্ষনে দন্তমূল শিথিল ও দন্ত বিশ্রী হয়। কিন্তু নানারূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন যে, দন্ত নষ্ট করিবার উপযোগী ধর্ম্ম চিনিতে বিদ্যমান নাই। যাহাদের মুখ গহ্বর অপরিষ্কৃত, তাহাদের মুখে চিনি স্বতঃই থাকিয়া যায়; এরূপ অবস্থায় চিনি পচিয়া দন্ত কেন মুখের সমস্ত স্থানই খারাপ করিতে পারে। এরূপ স্থলে চিনির দোষ নাই, লোকের অপরিচ্ছন্ন স্বভাবই অনিষ্টের মূল। পৃথিবীতে যত খাদ্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে চিনিই বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বদা ময়লা শূন্য অবস্থায় পাওয়া সম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরিমিত চিনি ভক্ষণে শরীর কর্ম্মক্ষম হয়, শরীরের অবসাদ বিদূরিত হয় এবং লোকের কর্ম্মশক্তি পরিপুষ্ট হয়। পল্লী অঞ্চলে পথশ্রাম ক্লান্ত আগন্তুককে গৃহস্থ অন্য মিষ্ট না পাইলে অন্ততঃ "গুড়" ও জল দিয়া অভ্যর্থনা করেন। ইহার যথেষ্ট উপকারিতা রহিয়াছে।
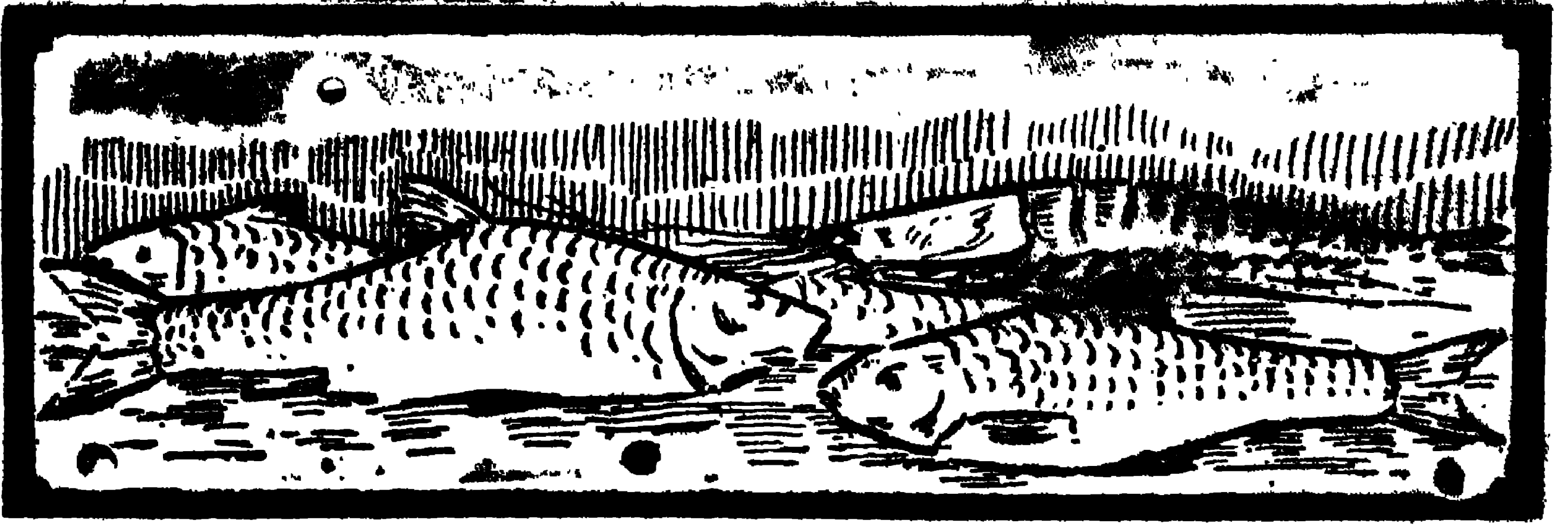
রোহিত জাতীয় মৎস্য পালন

সমুদ্র, নদী, হ্রদ, তড়াগ, খাল, পুষ্করিণী, প্রভৃতি মধ্যে মৎস্য থাকে। এ স্থলে কেবল পুষ্করিণীর মৎস্যের বিষয় উল্লেখ করা হইল। মৎস্য পালনে, রোহিত বা রুই জাতীয় মৎস্য (রুই, কাতলা, মৃগেল, ও কাল্‌বাউশ) পালন করাই লাভজনক; তজ্জন্য কেবল এস্থলে ঐ জাতীয় মৎস্য পালন সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করা গেল। রুই বলিলে সাধারণতঃ ঐ জাতীয় সমস্তগুলি মৎস্যই বুঝিতে হইবে। মৎস্যের মধ্যে রুই বা রোহিত মৎস্যই সর্ব্বোত্তম। ইহা প্রায় ক্ষুদ্র ছাগ শাবকের মাংসবৎ পুষ্টিকর, লঘুপাক, ও সুস্বাদু। বৃহৎ স্রোতস্বতী নদীর রোহিত, পুষ্করিণী কি অন্য কোনও বদ্ধজলের রোহিত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু রোহিতের বংশবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন বিষয়ে পুষ্করিণীই নিরাপদ ও উপযোগী বটে। স্রোতজলে খাদ্যাভাব, এবং সর্ব্বত্রই রোহিত মৎস্যের ডিম্ব ও ক্ষুদ্র ছানার অনেক বিপদ ঘটে। ইহারা জলজ উদ্ভিজ্জ ও জান্তব খাদ্য দ্বারা শরীর পোষণ করে। তজ্জন্য মনুষ্যের তত্ত্বাবধানে পুষ্করিণীতে ইহাদিগকে পালন করিয়া জার্ম্মানি ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ হইতে অধিক পরিমাণ মৎস্য সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে স্থানে স্থানে সামুদ্রিক মৎস্যের কারবার আছে। বঙ্গদেশের নদী ও বঙ্গোপসাগরে মৎস্য বৃদ্ধি ও ধরার উন্নতি সাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল্‌ ফিশারীজ্‌ ডিপার্ট্‌মেণ্ট্‌ (Bengal Fisheries Department) স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে মৎস্য ভক্ষণ অধিক পরিমাণে প্রচলিত, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, খাল, বিল, প্রভৃতি ভরাট হওয়ায় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রেল্‌ওয়ে যোগে মৎস্য দূরবর্ত্তী স্থান সকলে রপ্তানী হওয়ায় তথায়ও এখন মৎস্যের অভাব হইয়াছে। এখন বর্ষাকালে বঙ্গদেশে অনেক সময়ে বিশেষরূপে মৎস্যের অভাব দৃষ্ট হয়। তখন পুষ্করিণীর পালিত রোহিত মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভজনক হয়। বৃহদ্ব্যাপারে মৎস্যের আবশ্যক হইলে অনিশ্চিত নদীর মৎস্য সংগ্রহ করার উপর নির্ভর করা যায় না, সেরূপ স্থলে পুষ্করিণীর মৎস্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নিউ ইয়র্ক্‌ ও চিকাগো নামক দুই মহানগরীতে রোহিত মৎস্য যে মূল্যে বিক্রয় হয় বঙ্গদেশে কলিকাতা ও মফঃস্বলে তাহার চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও অনেক সময়ে তাহা পাওয়া যায় না। পুষ্করিণীর মৎস্য ভক্ষণে কোনও সংক্রামক রোগের আক্রমণ আশঙ্কা থাকে না, কারণ নদী, ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে

অনেক সময়ে সংক্রামক রোগে মৃত প্রাণীর দেহ নিক্ষিপ্ত হওয়ায় মৎস্যেরা তাহা ভক্ষণ করে এবং ঐ সকল মৎস্য ভক্ষণে মনুষ্যের পীড়া জন্মে। গঙ্গার, কচ্ছপ, শৈল, বোদালিকা, চিতল্, উদ্ প্রভৃতি পালিত মৎস্য নষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্য পুষ্করিণীতে তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে যাহা নদীতে করা অসম্ভব। এই সকল কারণে বঙ্গদেশে পুষ্করিণীতে রোহিত মৎস্য পালন করা নিতান্ত আবশ্যক ও তাহা একটী বিশেষ লাভজনক কার্য্যও বটে। কিন্তু ইহাও বৈজ্ঞানিক নিয়মে অনুষ্ঠিত ও চালিত হওয়া আবশ্যক। যেমন গৃহপালিত পশু ও পক্ষীকে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানে স্থূলকায় করা যায় সেইরূপ পালিত মৎস্যকেও প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত, মাংসল ও সংখ্যায় অধিক করা যাইতে পারে। কোন্ মৎস্য কি খাদ্য খাইয়া থাকে তাহা স্থিরীকরণ জন্য তাহার পরিপাক যন্ত্র অর্থাৎ আমাশয় ও নাড়ীভূড়ী কাটিয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

বসন্ত ঋতুতে জলের সর্ব্বনিম্ন তাপাঙ্ক ৬১¼ ফাঃ (= ১৬¼ সেন্টিগ্রেড) হয়, এবং আকাশ নির্ব্বাত মেঘশূন্য থাকে তখন স্ত্রী রোহিত ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও যে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ডিম্ব জন্মান যায় তাহার অবস্থা যতই অনুকুল হয়—ডিম্বগুলিও ততই সতেজ হয়। স্ত্রী রোহিত ডিম্ব প্রসব করিয়া জলজ উদ্ভিজ্জের উপর রাখে; শুক্র দেখিতে দুগ্ধবৎ এবং দুগ্ধের ন্যায় জমাট বাঁধে। তজ্জন্য ইংরাজীতে তাহাকে "মিল্ক" (milk = দুগ্ধ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র পোণা বাহির হইয়া ভাসমান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট কি কীটের ডিম্ব ভক্ষণ করে। ডিম্ব প্রসবকারী স্ত্রী রোহিত চতুর্থ বৎসরে পরিপক্কতা লাভ করে। পুং রোহিত তৃতীয় বৎসরে পরিপক্কতা লাভ করে। ইহার পর হইতে পুং রোহিতের শুক্র পরিমাণ ও স্ত্রী রোহিতের ডিম্বোৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া অনেক বৎসর যাবৎ স্থায়ী হয়। প্রত্যেক স্ত্রী রোহিতের বয়স ও প্রকৃতি অনুসারে তাহাতে কয়েকটী হইতে ৭ লক্ষ ডিম্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকা দৃষ্ট হয়। এই ডিম্ব সংখ্যা অন্যান্য মৎস্যের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক; কারণ, খোলা জলে রোহিতের ডিম্ব ও পোণার অনেক বিঘ্ন তজ্জন্য তাহার বংশ লোপ না পায় এই অভিপ্রায়ে প্রকৃতির এই সতর্কতা মূলক বিধান। একারণ মনুষ্যের সংরক্ষণে থাকিলে অল্প সংখ্যক মৎস্য হইতে বহু সংখ্যক মৎস্য উৎপন্ন হইতে পারে। অল্প গভীর ও জলজ উদ্ভিদ্‌পূর্ণ জলেই রোহিত ডিম্ব ও পোণার বিপদ অধিক।

রোহিতের স্বাভাবিক খাদ্য ও কৃত্রিম খাদ্য।

পুরাতন কাল হইতে লোকের দুইটী ভ্রমাত্মক ধারণা চলিত আছে যে শরীরের পুষ্টিসাধন জন্য, রোহিত মৎস্য (১) আটাযুক্ত কর্দ্দম ভক্ষণ করে ও (২) গলিত উদ্ভিদ ভক্ষণ করে* কারণ তাহার অন্ত্র মধ্যে কদাচিৎ ঐ কর্দ্দম কি উদ্ভিদ পচা দ্রব্য পাওয়া যায়। তবে ঐরূপ কর্দ্দম মধ্যে লুক্কায়িত যে সকল ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিয়া রোহিত ভক্ষণ করে ঐ সকল মৎস্য ধরার সময়ে কর্দ্দম রোহিতের উদরস্থ হইতে পারে; আর কখন রোহিতের অন্ত্র মধ্যে যে জীর্ণীকৃত খাদ্য পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে যে কতকাংশ গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা তাহার শরীর পোষণ হয় না। যাহা হউক, উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকায় যে অল্প গভীর জল দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সেই জলে রোহিত থাকে না, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। মনুষ্য যেমন অন্ন রুটী কি মাংসের

* জেলা পাবনার সদর সাব্‌ ডিভিসানের কয়েক স্থানে ধীবরেরা বর্ষাকালে হিজল, বন্যা প্রভৃতি জলজ পাদপের শাখা কাটিয়া কতকটা স্থান ব্যাপিয়া জল মধ্যে স্থাপিত করে। মৎস্যগণ তাহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে পরে শীতকালে জালদ্বারা ঐ সকল স্থান বেষ্টন করিয়া তাহার গলিত বৃক্ষ শাখাগুলি বাহির করিয়া মৎস্য ধরে। ইহার মধ্যে রোহিত মৎস্যই অধিক এবং তাহা বহু পরিমাণে কলিকাতায়ও প্রেরিত হয়। ঐ স্থানকে স্থানীয় কথায় "কাঠা" বা "কাটা" বলে। ঐ গলিত শাখাগুলিতে অনেক শেওলা জন্মে এবং ক্ষুদ্র মৎস্য ও তথায় আশ্রয় লয়। সাধারণ বিশ্বাস, মৎস্যগণ গলিত শাখার ত্বক ভক্ষণ করে; রোহিত সম্ভবতঃ ঐ শেওলা, ক্ষুদ্র মৎস্য ও গলিত বৃক্ষত্বক ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পায়।

সঙ্গে শাক সব্জী ভক্ষণ করে, রোহিত মৎস্যও তদ্রূপ জান্তব খাদ্যের সঙ্গে জলজ উদ্ভিজ্জ খাদ্য ভক্ষণ করে। নাইট্রোজেন্ প্রধান খাদ্য মনুষ্যের যেরূপ মাংস বৃদ্ধি করে, রোহিত মৎস্যের পক্ষেও তাহা তদ্রূপ। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। তজ্জন্য জলজজীবই রোহিতের একটী প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য বলিতে হইবে।

যে সকল ক্ষুদ্র জল জন্তুর খোল বা গাত্রাবরণ কঠিন কি দুর্ভেদ্য নয় সেই সকল ক্ষুদ্র জল জন্তুই রোহিতের স্বাভাবিক খাদ্য। রোহিতের চর্ব্বণ করিবার উপযুক্ত দন্তাদি নাই, তজ্জন্য গলাধঃকরণের পূর্ব্বে যে সকল খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিতে হয় সেই সকল খাদ্য ইহারা ভক্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু যে সকল ক্ষুদ্র জল জন্তুর খোল বা গাত্রাবরণ কোমল তাহাদিগের খোল (Shell শক্ত খোলা) মাড়ির দাঁত দ্বারা ভাঙ্গিয়া রোহিত অনায়াসে ভক্ষণ করে; ঐ খোলের উপাদানে রোহিতের অস্থি গঠনের সাহায্য করে।

রোহিত মৎস্য

যে সকল ক্ষুদ্র জন্তুর শরীর ভক্ষণ করে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিষয়।

রোহিতের বৃদ্ধি ও পোষণ জন্য, রোহিত যে সকল ক্ষুদ্র জল জন্তু ভক্ষণ করে, জল মধ্যে সেই সকল ক্ষুদ্র জন্তু বৃদ্ধিকরণ ও তাহাদের খাদ্য যোগানও আবশ্যক হইয়া উঠে।

রোহিতের জান্তব প্রধান খাদ্য (১) খণ্ড দেহ-সন্ধিপদ খোলধারী (Arthropoda = সন্ধিপদ) (১) কোমল খোলযুক্ত শম্বক (mollusca) বর্গের জলজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব
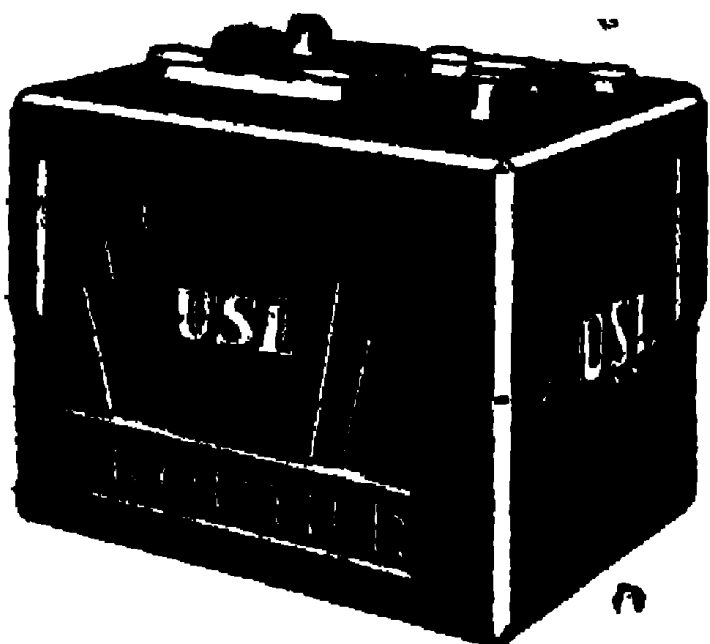
যেমন গুগ্‌লী ইত্যাদি।

(১) খণ্ড দেহ-সন্ধি পদ জীব বর্গ মধ্যে চিঙ্‌ড়ী, কাঁকড়া ইত্যাদি। ইহাদের দেহ খোলযুক্ত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত এবং পদ, ফাঁপা খোলের মধ্যে শরীরের মাংসপেশী প্রবিষ্ট হইয়া নির্ম্মিত। ইহাদিগকে খোলধারী জীব (Crustaceous) বলে। ইহাদের মধ্যে পত্রপদ (Phyllopoda) শ্রেণীর রোহিতের প্রধান খাদ্য ও তাহা অসংখ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(২) মেরুদণ্ড বিহীন মাংস পিণ্ডবৎ কোমল দেহ বিশিষ্ট শম্বুকাদি জীববর্গ soft-shell mollusca = কোমল চোগে শম্বুক জাতীয় জীব।

পত্র-পদ (Phyllopoda) শ্রেণী মধ্যে ওয়াটার ফ্লী" (water fleu) জল পিসু) অধিক পরিমাণে রোহিতের অন্ত্র মধ্যে প্রায়শঃ দেখা যায়। যে সকল খোলধারী খণ্ড দেহ সন্ধিপদ জীব জলের মধ্যে বাস করে তাহাদিগকে "ব্র্যাঙ্কিপাস্" (Branchipus) বলে। কোন একটী পুষ্করিণীর রোহিত মৎস্য কেবল এই গুলি খাইয়া জীবিত থাকে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক এই সকল খোলধারী খণ্ড দেহ সন্ধিপদ জীব বর্গ উদ্ভিজ্জভোজী নয়, আমিষ ভোজী; তজ্জন্য ক্ষুদ্র জীব যে খাদ্যে তাহারা বৃদ্ধি পায় সেই খাদ্য যাহাতে প্রচুর পরিমণে পুষ্করিণীর মধ্যে জন্মে—মৎস্য পালনকারীকে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। নাইট্রোজেন্ প্রধান উপাদানযুক্ত খাদ্য উদ্ভিজ্জ ও জন্তু এই দুইটীর পক্ষেই তুল্যরূপ আবশ্যক। যে সকল ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ মধ্যে "এ্যাল্‌বুমেন্" (albumen ডিম্বের শ্বেতাংশ) বা অণ্ডলাল্ সহজে পাওয়া যায় সেই সকল উদ্ভিদ ভক্ষণে অতি ক্ষুদ্র জলজ জীবগণ বৃদ্ধি পায় এবং এই গুলিকে খোলধারী খণ্ড দেহ সন্ধিপদ জল জীবেরা ভক্ষণ করিয়া শরীর পোষণ করে, আবার শেষোক্তগুলিকে রোহিত মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পায়। এক কারণ এই শ্রেণীর উদ্ভিদ মধ্যে যেগুলি সহজে পচিয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র জীবের খাদ্য নাইট্রোজেন্‌যুক্ত পদার্থে পরিণত হয় সেই সকল উদ্ভিদ পুষ্করিণীতে জন্মিতে দেওয়া কি তাহার তলদেশে সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ ভাবে আবাদ করা আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মোটা আগাছা, বিশেষতঃ, শক্ত নল খাগড়া—জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়, তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। যে সকল উদ্ভিদে অণ্ডলাল নাই, কিন্তু কোমল অংশও অল্প, এবং তদ্ব্যতীত ফ্লুও সিলিসিক্ এ্যাসিড্" (fiuo silicic acid) এর আবরণযুক্ত, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই পুষ্করিণীতে জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ ক্ষুদ্র জল জলজীবগুলি যে উপাদান গ্রহণ করে এই সকল উদ্ভিদ ও তাহা গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। রোহিতের খাদ্য, খোলধারী ও অন্যান্য জলজীবের বৃদ্ধি জন্য যে সূর্য্য কিরণ আবশ্যক, ঐ সকল জলজ উদ্ভিদে তাহারও বাধা জন্মায়।

বৃষ্টির জলে অনেক পচা জান্তব ও উদ্ভিদ পদার্থ মৃত্তিকা সঙ্গে ধৌত হইয়া মৎস্য পালন পুষ্করিণী মধ্যে পতিত হওয়ায় উপকার আছে কারণ তাহার মধ্যে অনেক নাইট্রোজেন প্রধান উপাদান থাকায় খোলধারী জলজীবগণ তাহা খাইয়া পুষ্টিলাভ করে। তজ্জন্য পয়ঃপ্রণালী ধৌত ময়লা ও মলমূত্রাদি পুষ্করিণী মধ্যে পতিত হইলেও ঐরূপ উপকার হয়। যে মৃত্তিকায় কি

জলে চুণের উপাদান না থাকে সেস্থলে এই সকল খোলধারী জল জীব দ্বারা রোহিতের শরীরের পঞ্জরস্থি গঠন বিষয়েও উপকার হয়। কারণ চুণের প্রধান উপাদান ক্যালশিয়াম ধাতু দ্বারা শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির অস্থি নির্মাণে ক্ষয় হইলে রোহিতের পঞ্জরাস্থি বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

সন্ধ্যাকালে বিশেষতঃ যখন নির্ব্বাত অবস্থায় জল জীব সমাজ আমোদ প্রমোদে সুখে জীবন ভোগ করে; তখন তাহারা জলের উপরিভাগে উপস্থিত উদ্ভিদের দৃঢ় স্থানের উপর সকলে একত্রিত হয়। এই সময় জলের উষ্ণতা থাকায় তাহারা (ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে খোলধারী জীব ও তদুচ্চ শ্রেণীর জীব মৎস্য পর্য্যন্ত) সকলেই, নানা উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও ঐরূপ এক একস্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিত হয়। তখন তাহাদের সকলেরই স্ফূর্ত্তি ও খাদ্যলালসার চরম সীমা দৃষ্ট হয়। খোলধারী ক্ষুদ্র জলজীবগণ কীটাণুগুলিকে খপ্ করিয়া ধরিয়া খায় এবং মৎস্য, খোলধারী জলজীবগণকে একদৌড়ে আসিয়া গিলিয়া ফেলে। রোহিত ছানা যদি তাহার ধৃত খাদ্য লইয়া জলের উপরিভাগে উঠে তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা নাই; ক্ষুদ্র বোয়াল মাছ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে; আবার বৃহৎ বোয়াল ঐ ক্ষুদ্র বোয়ালকে

পরক্ষণেই গ্রাস্ করে। জল মধ্যে এবং দুঃখের বিষয় অন্যত্রও জীবন সংগ্রাম এইরূপই বটে।

জীবন সংগ্রামে অত্যধিক পরিমাণে ধ্বংস হওয়ায় প্রকৃতির বিধানে খোলধারী জল জীবগণের বংশ বৃদ্ধি এত অধিক হয় যে, জীবজগতে অন্য কাহারও মধ্যে তাহাদের সমান কেহ নাই এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ ক্ষুদ্র জল-পিস্থর (water flea) দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জল পিস্থর দুই প্রকার ডিম্ব। এক প্রকার শীত ঋতুর ও অপর প্রকার গ্রীষ্ম ঋতুর। শেষোক্তগুলি মাতৃগর্ভেই পরিপক্ব হয়; তাহাতে গ্রীষ্ম ঋতুতে জীবন্ত ছানা প্রসব হয়। এই ছানাগুলি ৮ হইতে ১৪ দিন মধ্যে পূর্ণ কলেবর হইয়া ছানা উৎপাদন করিতে থাকে। বসন্ত হইতে শরৎ ঋতু পর্য্যন্ত কেবল স্ত্রী-জলপিস্থ উৎপন্ন হয়; ইহারা পুং-জলপিস্থর সংশ্রবে ছানা প্রসব করে। বসন্ত ও শরৎ ঋতুর প্রথমে ইহারা প্রত্যেক চতুর্থ ও সপ্তম দিবসে, ছানা প্রসব করে। এই সকল বিবেচনায় ইহা বলা যাইতে পারে যে একটী জল-পিস্থ (water flea) তাহার জীবিত কাল দুই মাস মধ্যে কয়েকটি হইতে ৩০০০ কোটী ছানা উৎপন্ন করিতে পারে।

অনেক জাতীয় কীট পতঙ্গের ডিম্ব ও রোহিতের প্রিয় খাদ্য। মশকের ডিম্ব যদিও ক্ষুদ্রতা হেতু মনুষ্যের চক্ষের অগোচর হইতে পারে তথাপি তাহা অনেক ক্ষুদ্র জল জীবের তুলনায় অতিকায় বলিয়া গণ্য হয়। মশক ডিম্বও রোহিতের উপাদেয় খাদ্য।

গুগ্‌লী জাতীয় নানাপ্রকার ক্ষুদ্র জলজ গেড়ি বা শামুক ক্ষুদ্র থাকা কালে নরম থাকায় রোহিতের একটী প্রিয় খাদ্য। এই সকল ক্ষুদ্র গুগ্‌লী পুষ্করিণীর তলদেশে মৃত্তিকার উপর থাকে, কারণ তথায় ক্ষুদ্র জলজীব আটাযুক্ত পাঁক মধ্যে ধরিয়া খাইতে তাহাদের সুবিধা হয় এবং তাহারা এক স্থানে স্তূপাকারে অনেকগুলি একত্র থাকে; রোহিত তাহাদিগকে মৃত্তিকা সমেত একগ্রাসে উদরস্থ করে। তজ্জন্য এই জলজ ক্ষুদ্র গুগলী সকলও পূর্ব্বোক্ত খোলধারী জলজ জীব ও মশক ডিম্বের ন্যায় রোহিতের প্রধান খাদ্য।

(ক্রমশঃ)

কতকগুলি করিবার বিষয়

বেহালার তার বা ষ্ট্রীং

বেহালায় যে সকল তন্তুময় ষ্ট্রীং বা তার আছে তাহা কচি মেষশাবকের নাড়ীকে পাক দিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বড় বড় ভেড়ার নাড়ীকেও পাক দিয়া যে মোটা তার বা ষ্ট্রীং প্রস্তুত হয়, তাহা আধুনিক সিউইং মেসিন বা সেলাইয়ের কল চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেহালায় যে তাঁত ব্যবহার হয়, তাহা মেষ শাবকের নাড়ীকে পাক দেওয়া। ইহাও বিদেশ হইতে বহুলক্ষ টাকার আমদানী হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশের লোক করণীয় উপার্জ্জন করিবার কাজ খুঁজিয়া পায় না।

চামড়া ট্যান করিবার উপাদান

ভারতের বহুদ্রব্য হইতে চামড়ার রং করিবার উপাদান পাওয়া যায়, যথা, হরিতকি, বহেড়া, বাবলার সুটি এবং ছাল, সোনারীর ছাল, অর্জ্জুন নামক গাছের ছাল প্রভৃতি। চামড়া ট্যানিং করিতে এই সকল সামগ্রী বিলাতে চালান হইয়া যায়। সাধারণতঃ দুই প্রণালীতে চামড়া ট্যান্ করা হইয়া থাকে বা পাকানো হয়। এক ক্রোম্ ট্যানিং (chrome tanning) বা নানারূপ কেমিক্যালের সাহায্যে ট্যান্ করা, অথবা Bark Tanning বা গাছের ছাল প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের দ্রাবনে ডুবাইয়া রাখিয়া চামড়া পাকানো। যেখানে Heavy tanning এর দরকার, যেমন জুতার sole, ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম; যুদ্ধের গোলাগুলি transport করার জন্য leather bag ইত্যাদি ভারী জিনিষ প্রস্তুত করিতে Bark এবং কষায় দ্রব্যের দ্রাবন ছাড়া আর গতি নাই। এইজন্য হরিতকী, বাবলার ছাল ইত্যাদির লক্ষ লক্ষ মণ কাটতি ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত এবং ইউরোপে রপ্তানী হয়। এখন ভারতের নানাস্থানে অনেক সুপরিচালিত Tannery স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল Tanneryতে পূর্ব্বোক্ত কষায় মাল সমূহের যথেষ্ট চাহিদা আছে। উদ্যোগী যুবকেরা চেষ্টা করিলে এই সকল মাল সরবরাহ করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতে পারেন।

আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ এই কাজে নামিতে চাহিলে আমরা তাঁহাদিগকে ভারতীয় Tannery সমূহের ঠিকানা ও মাল প্রাপ্তির source সমূহের সন্ধান জানাইতে পারি।

কর্পূর

কর্পূরের বিবিধ প্রকার ব্যবহার সাধারণ

লোকের জানা থাকিলেও অধিকাংশ কর্পূর সেলুইলয়েড প্রস্তুতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমগ্র জগতে প্রায় ১১০০০ পাউণ্ড কর্পূর খরচ হয়, ইহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ সেলু-লয়েড প্রস্তুতে, গানকটন প্রস্তুত কার্য্যে শতকরা ২ ভাগ, ১৫ ভাগ ডিস্ইনফেক্‌টিং প্রভৃতি কার্য্যে এবং ৪৩ ভাগ ঔষধাদি প্রস্তুতে খরচ হইয়াছিল। এই কর্পূর প্রধানতঃ চীন, জাপান, ফরমোজা দ্বীপ সমূহ হইতে প্রস্তুত এবং আমদানী হইয়া থাকে। জাপান হইতে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ রপ্তানী করিয়া থাকে। জগতের মধ্যে জার্ম্মানী এবং আমেরিকাই অধিক পরিমাণ আমদানী করিয়া থাকেন, কর্পূর বিক্রয়ে জাপানের বেশ ভাল আয় আছে। আমাদের দেশে অনেকগুলি সেলুলয়েডের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; সেই সকল কারখানা হইতে আয়না, চিরুণী, সোপ কেস্, ছেলেদের পুতুল, খেলনার দ্রব্য, নানাবিধ মনোহারী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া

বাজারে খুব আদরের সহিত বিক্রয় হয়। কিন্তু সে সেলুলয়েড তৈরী হয় কর্পূর ও তুলা হইতে। আমাদের দেশে তুলা যথেষ্ট আছে কিন্তু কর্পূর এক ছটাকও নাই। সুতরাং কর্পূরের চাষ যতদিন এদেশে না হইবে ততদিন জার্ম্মানী ও জাপান এই সেলুলয়েডের ব্যবসায়ের চাবীকাটী নিজেদের পকেটে রাখিয়া দিবে। উহারা ইচ্ছা করিলে সেলুলয়েডের দাম এত বাড়াইয়া দিতে পারে যে এদেশের কারখানাগুলি তখুনি বন্ধ হইয়া যাইবে। এইজন্য চা বাগিচা, রবার বাগিচা, নারিকেলের বাগিচা প্রভৃতির ন্যায় কর্পূরের বাগিচা স্থাপন করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ যখন যশোহরে চিরুণী, বোতাম প্রভৃতির ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন তখন স্বর্গত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট হইতে বহুটাকার সাহায্য পাইয়াছিলেন; তাঁহার তদানীন্তন কালের অনুষ্ঠান পত্রের মধ্যে কর্পূরের গাছ তৈরী করিয়া সেলুলয়েডের Key industry যাহাতে এদেশেই গড়িয়া তোলা যায় তাহার প্রস্তাবনা ছিল এবং যতদূর স্মরণ হয় কর্পূরের গাছও তিনি কিছু লাগাইয়াছিলেন; কিন্তু এদেশের লোকের যাহা ব্যাধি—To place too many irons on fire—তাহার দোষেই তাঁহার আরব্ধিত কার্য্য শুধু ভূমিকাতেই শেষ হইয়া গেল। আমরা ধনীদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

চীনে সিঁন্দূর এবং মিনার কাজ

জগতের ২টী গূঢ় তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই; কিন্তু যদি কোনরূপে তাহা কেহ জানিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বড়লোক হইয়া যাইবে। এই দুইটীর মধ্যে একটী চিনের সিন্দুর, অপরটী তুরস্কের কঠিনতম ইস্পাতের দ্রব্যের সহিত স্বর্ণ বা রৌপ্যের সূক্ষ্ম পাত সংলগ্ন করা। এই দুইটী প্রস্তুত প্রণালী জগতের কোন জাতিই এ পর্য্যন্ত করায়ত্ব করিতে পারে নাই। সেদেশে যাইয়া কেহ যদি এই দুইটী দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রথমেই তাহাকে কঠিন শপথ গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার পর প্রকাশ না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য অনেক টাকা, গ্যারাণ্টি স্বরূপ প্রদান করিতে হয়, তুরস্ক এবং চীনের সংসারের প্রত্যেক লোক ও এ রহস্য জানে না, পিতা মৃত্যুকালে একজনমাত্র পুত্রকে শপথ গ্রহণ করাইয়া বলিয়া মহাপ্রস্থান করে, পুত্র জন্মেও এ রহস্য আর কাহাকে বলে না। এইরূপে শত সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু জগতের কোনজাতি এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিল না। চিনের সিন্দুর এবং তুরস্কের ইস্পাত পাত্রের ভিতর স্বর্ণ ও রৌপ্যের মিনার কাজ সমগ্র জগতেই আদর আছে, কেহ জানিলে যে তাহার সৌভাগ্য ফিরিয়া যাইবে, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু জানিবার কোনও উপায় নাই।

কলিকাতা ও লণ্ডনে দুগ্ধ ব্যবসায়ের রহস্য

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের মুখপত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ বেরিয়েছিল যে, লণ্ডনে টাকায় সাত সের করে দুধ বিক্রী হয় অথচ কোল্‌কাতায় দর টাকায় চার সের। খবরটা শুনে অনেকেই আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, আশ্চর্য্য হবারই কথা বটে! লণ্ডন! পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর, ৪০ লক্ষ লোকের বাস, ধনতান্ত্রিক আভিজাত্যের লীলাক্ষেত্র—সেখানে দুধ কিনা বিকোয় টাকায় সাত সের করে; আর কোলকাতা! বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে লণ্ডনের পরেই তার স্থান হলেও আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক দিয়ে যা' এখনো অতি নিম্নস্তরে পড়ে আছে, সেখানকার ১১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশেরই ক্রয় ক্ষমতা একেবারে নেই বললেই হয়—লণ্ডনের তুলনায় সেখানে দুধের দর টাকায় ৪ সের কি করে সম্ভব? এই রকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হয়?

ব্যাপারটা সত্যই ভাববার, সেইজন্যই তখন অনেকে চিন্তাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিছুদিন এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখিও চলেছিল কিন্তু তারপর সব ঠাণ্ডা। লণ্ডন ও কোলকাতার দরে এই নিদারুণ পার্থক্যের মূল অনুসন্ধানের দিকে কেউ আর মনোযোগ দেন নি। অথচ এই দুগ্ধ সমস্যা যে সহরের কত বড় সমস্যা তা' ভুক্তভোগী মাত্রই টের পান। সত্যই উল্টো-পাল্টা লাগে না কি? অর্থনীতির সূত্রানুসারে আমরা জানি যে, যে সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা কম থাকে সাধারণতঃ সে সব যায়গায় জিনিসের দাম কম থাকে। কিন্তু লণ্ডন ও কোল্‌কাতার দুধের দরের ব্যাপারে আমরা ঠিক এর উল্টোটি প্রত্যক্ষ করি। লণ্ডনের লোকের ক্রয় ক্ষমতা ভারতীয়-দের তুলনায় বহুগুণ বেশী, কিন্তু তা' সত্ত্বেও লণ্ডনে দুধের দর টাকায় ৭ সের। আর কোল্‌কাতার লোকের ক্রয় ক্ষমতা লণ্ডনের লোকের তুলনায় বহুগুণ কম, তথাপি কোল্‌কাতায় দুধের দর টাকায় ৪ সের। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে দর কম হওয়া উচিত ছিল সেখানে বেশী হয়েছে, আর যেখানে দর বেশী হওয়া উচিত ছিল সেখানে কম হয়েছে।

এর কারণ যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, লণ্ডনে দুধের যোগানের (Supply) পরিমাণ আমাদের দেশের চেয়ে বহুলাংশে বেশী এবং এইজন্যই সেখানে দুধের দর এত সস্তা হওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী দ্রব্যের দর শুধুমাত্র চাহিদার ওপর নির্ভর করে না, পরন্তু চাহিদা ও যোগানের আনুপাতিক হিসাবের সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। লণ্ডনে
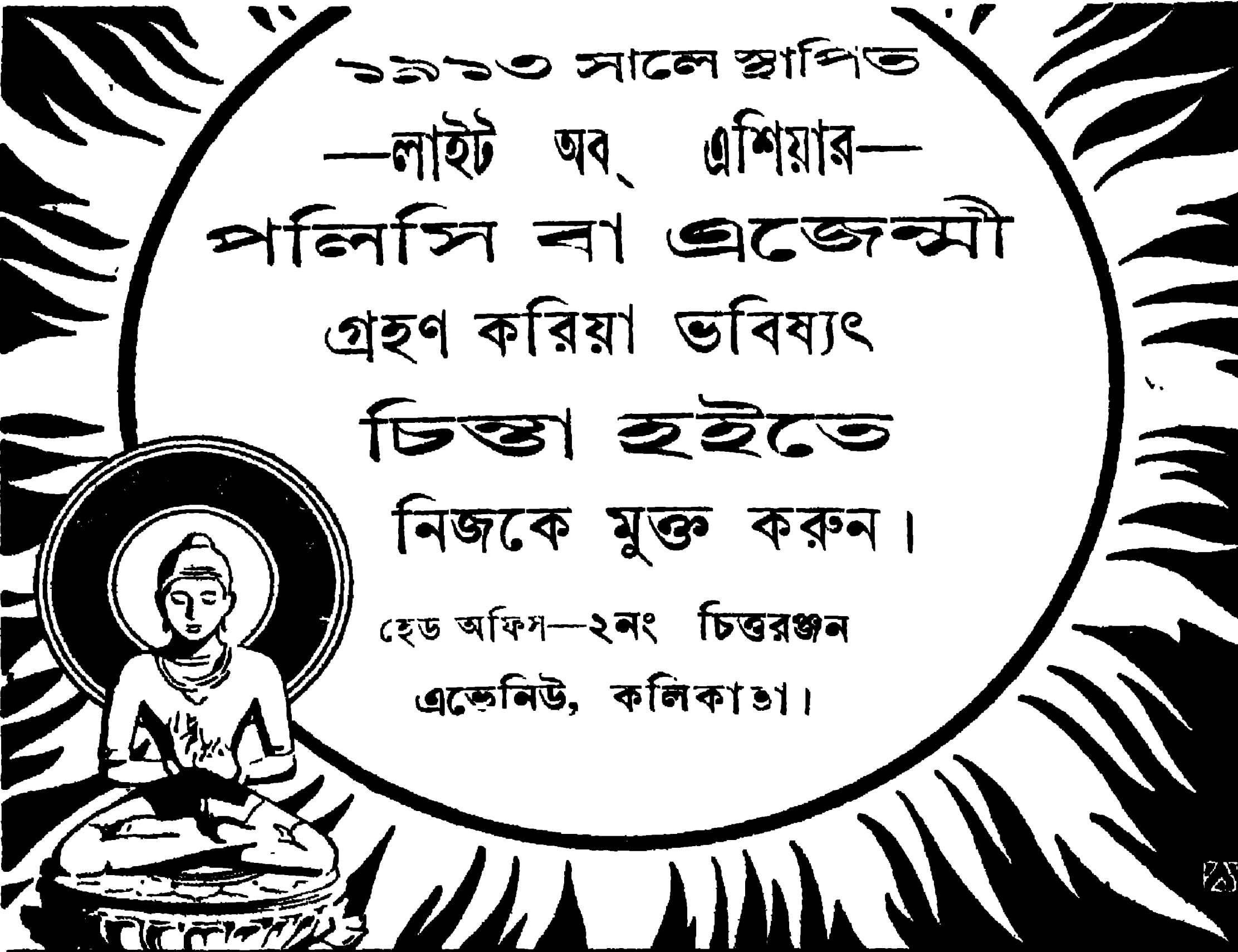
দুধের চাহিদা যে প্রচুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সেখানে সমভাবে যোগানও বর্ত্তমান থাকার দরুণ সাধারণ লোকের পক্ষে দুগ্ধ সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। কোলকাতায় কিন্তু সে অবস্থা বর্ত্তমান নেই। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এখানকার শতকরা বহুলাংশ লোকের ক্রয় ক্ষমতা একেবারেই নেই, তদুপরি দুগ্ধের যোগানও অপেক্ষাকৃত কম। এরই জন্যই যে পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় তা' ঐ ক্রয় ক্ষমতা বিশিষ্ট ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরাই ক্রয় করে, গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বরাতে কিছুই জোটে না। যে অত্যন্ত গরীব তার পক্ষে দুগ্ধ ক্রয় করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু সহরের ঐ বহু সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দুগ্ধ ক্রয় করতে পারত যদি কি'না দুধের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা হ'ত। কিন্তু দুধের দর সস্তা হওয়ার পক্ষে প্রবল বাধা হচ্ছে যোগানের অভাব; যে পরিমাণ দুধ প্রতিদিন পাওয়া যায় তা' ঐ বড়লোক ও উচ্চ মধ্যবিত্তের দলই ক্রয় করে,—সেইজন্যই দর কোনক্রমেই নিম্নগামী হ'তে পারে না। এই হ'ল লণ্ডন ও কোল্‌কাতার দুগ্ধব্যবসায়ে দরের অসামঞ্জস্যতার আসল কারণ।

আমাদের দেশে যে দুধের দর সস্তা হয় না এমন নয়, কিন্তু সে সহরে নয়, পল্লীগ্রামে। আমাদের এই বাংলাদেশের বিভিন্ন দূর পল্লী থেকে এমন খবরও পাওয়া যাবে যে, দুধ সেখানে

টাকায় ১৬ সের পর্য্যন্ত বিকোচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে, সেখানে দুধের যোগান আছে কিন্তু চাহিদা নেই। পল্লীতে লোকের বসবাস কম, যাঁরা থাকেন তাঁদের ঘরে প্রায়ই গরু আছে—সুতরাং তাঁদের দুধ কিনতে হয় না। কাজে কাজেই সেখানে চাহিদা না থাকার দরুণ দর ঐ রকম সস্তা থাকে। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যেখানে দুধের দর কম হওয়া উচিত সেখানে দর কম হয় নি, পরন্তু যেখানে দর কম হওয়ার প্রয়োজন ছিল না সেখানেই কম হয়েছে।

এরই ফল আমাদের পুরোমাত্রায় ভোগ করতে হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য যে কত খারাপ তা' বর্ণনা করা যায় না। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থার দরুণ ভারতীয়দের পুষ্টিকর খাদ্য জোটবার পক্ষে রীতিমত বাধা উপস্থিত হয় এবং এরই প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ে তাদের আয়ুর ক্ষেত্রে। স্বল্পায়ু হয়েও যে কয় বছর আমরা বাঁচি তাতেও যদি আমাদের কার্য্যক্ষমতা বজায় থাকতো তা' হলে হয়ত ততটা দুঃখের কিছু ছিল না, কিন্তু তা' হয় কই? আমরা কোন রকমে ধুকতে ধুকতে জীবনের জের টেনে চলি, কার্য্য করবার শক্তি আমাদের আর থাকে না।

আমাদের এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, নিজেদের যাই অবস্থা হ'ক না কেন, খাদ্য হিসাবে যদি আমরা কিয়ৎ পরিমাণ দুগ্ধ পাই তাহ'লে আমাদের স্বাস্থ্য এতটা খারাপ হয় না। কোল্‌কাতার ঘন বসতির কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে লোকের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই জন্যই এখানকার প্রতি সাতজন লোক পিছু এক জনের হয় যক্ষ্মা রোগ। এইরকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, জীবন অতিবাহিত হওয়ার দরুণ আমরা শুধু বর্ত্তমান পুরুষকে ধ্বংস করি না, পরন্তু উত্তর পুরুষকেও ধ্বংস করে থাকি। সুতরাং আমাদের জাতিগত কল্যাণের জন্য দুগ্ধ উৎপাদন ও তার বণ্টন-ব্যবস্থার প্রতি আমাদের অধিকতর সজাগ হতে হ'বে।

এ কথাটা আজ আর কাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে না যে, দুগ্ধ হচ্ছে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য। লোকে শুধুমাত্র ফলমূল বা মৎস্য মাংস কিংবা ভাত ডাল খেয়ে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারে না; কিন্তু কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, দুধ খাদ্য হিসাবে শিশু যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই সমান উপযোগী। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মানুষের দেহ গঠন ও পুষ্টির পক্ষে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন তা' স্বাভাবিক ভাবেই দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে। দুগ্ধের মধ্যে নিম্নলিখিত বস্তুগুলিকে বর্ত্তমান আছে :—

জল	শতকরা	৮৭'০২ ভাগ
চিনি (Lactose)	,,	৪'৮৩ ,,
মাখন	,,	৩'৫ ,,
ছানাজাতীয় প্রোটিন	,,	৩'৪৫ ,,
ছাই ও চুন জাতীয় ধাতব পদার্থ		'৭৫ ,,
শ্বেতসার	,,	'৪৫ ,,
		১০০'০০ ,,

অতএব এই দুগ্ধকে যদি আমরা সস্তা ও অনায়সলব্ধ করে তুলতে পারি তাহলে পুষ্টিকর খাদ্য সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা জটিল বিষয়ের সমাধান করা হবে। পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক সভ্য দেশেই খাদ্যসমস্যার দিকে রীতিমত নজর পড়েছে; বিভিন্ন স্থানের আধুনিক উন্নত মিউ-নিসিপ্যালিটীগুলি যে সহরের দুগ্ধ সমস্যার প্রতি অধিকতর নজর দিচ্ছে তা' থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, দুগ্ধ জীবন ধারণের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় বস্তু। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ নির্ব্বাসনকালে অষ্ট্রিয়ার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ পরিদর্শন করে যে তথ্য জনসাধারণের গোচর করেছিলেন তার থেকে বোঝা যায় যে অষ্ট্রিয়ার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সেখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের প্রতি কতটা যত্নশীল।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি যে ভারতবর্ষ অত্যন্ত গরীব দেশ। সহরের মধ্যে সেই সেই অংশগুলি অত্যন্ত জনবহুল যেখানে বস্তী বর্ত্তমান এবং বস্তীর অধিবাসীদের মত দরিদ্র বোধ হয় আর কেউ হয় না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বস্তীতে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, বস্তীর লোক পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হয় না বলেই তাদের দেহের সংগ্রামশীলতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। অবশ্য আরও অনেক কারণ আছে। সেইজন্যই কলিকাতার পরলোকগত মেয়র দেশবন্ধু দাশ মহাশয় বস্তীতে বস্তীতে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণের আবশ্যকতার কথা নগরপতিদের হৃদয়ঙ্গম

করতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বস্তীউন্নয়নের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে, কাজ আর এগোয় নি।

এই বস্তীর ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর একটি বিষয়ের কথা মনে পড়ে। কোলকাতার এবং আশেপাশের স্থানসমূহের নিম্নমধ্যবিত্তের গৃহও আজ বস্তীতে পরিণত হয়েছে। সংসারের কর্ত্তার হয়ত উপার্জ্জন ৩০।৪০ টাকা, জন দশেক পোষ্য। বাড়ী ভাড়া দিতে হয়; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত চক্ষুলজ্জার দরুণ ছেলেপুলেদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়—তারও মোটা খরচ আছে। তার ওপর আছে বংশমর্য্যাদাগত কুটুম্বিতা, ভাত-পৈতে-বিবাহ ইত্যাদির ব্যয় বাহুল্য। তারপর রোগ, সংসারের নিত্যসাথী রৌদ্রহাওয়ার মত। এই রকম অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতে যাহারা বাধ্য হয় তাহাদের বাইরের ভদ্র ঠাট বজায় থাকলেও ভেতরটা বস্তী জীবনের দীনতার মতই কদর্য্য আকার ধারণ করে। প্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিদ এঙ্গেলস্ জীবন যাত্রার খরচের একটা তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাতে দেখা গেছে যে, মধ্যবিত্তসংসারে বাড়ীভাড়া, শিক্ষার ব্যয়, ভদ্রতা বজায় রাখবার খরচ ইত্যাদি খাদ্যের ব্যয় অপেক্ষা ঢের বেশী। যে সংসারের উপার্জ্জনশীল কর্ত্তার আয় মাত্র ৩০।৪০ টাকা সেখানে খাদ্যের দরুণ যে কী সামান্য পরিমাণ টাকা ব্যয় হয় সেটা সহজেই অনুমেয়। অথচ এই খাদ্যের দিকটাতেই ত বেশী খরচ হওয়া উচিত ছিল।

আমরা দুধের দর কমানো হোক্ বলে তারস্বরে চীৎকার জুড়ি। আমাদের দেশে যে গরুর সংখ্যা কম এমন নয়, বরং লোকসংখ্যার অনুপাতে তা' অধিক না হ'লেও যথেষ্ট। কিন্তু তাদের উৎপাদন এতটা অকিঞ্চিৎকর যে, অপরাপর দেশের উৎপাদনের তুলনায় আমাদের লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়া উচিত। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের গরু গড়ে ১ সের দুধ দেয় কিনা সন্দেহ, সহুরে ব্যবসায়ীর গরু গড়ে ৫ সের দুধ দিলে তা' যথেষ্ট। অথচ বিলিতী গরু ৪০।৪৫ সের পর্য্যন্ত দৈনিক দুধ দিয়ে থাকে; সেইজন্যই সেখানে দুধের দর সস্তা হওয়া সম্ভবপর হয়। ব্যাপারটা আমাদের কাছে নিতান্ত অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হবে, কেননা ঐরূপ দুগ্ধবতী গাভীর কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, পল্লীগ্রামে দুধ সস্তা কিন্তু সেখানে খদ্দের নেই। দুগ্ধের ব্যবসা সেখানে অচল, উৎপাদন কম হওয়ার দরুণ অধিবাসীদের পুষ্টির পক্ষেও তা' আশানুরূপ ভাবে কাজ করে না। সেইজন্যই গোজাতীয় পশুর সংখ্যাধিক্য আমাদের পক্ষে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ পল্লীগ্রামের গরুগুলির দুগ্ধ উৎপাদন আমরা যদি বৃদ্ধি করতে পারি তাহ'লে পুষ্টির পক্ষে তা' ত সহায়ক হবেই, উপরন্তু ঘৃত মাখন ও দধির ব্যবসা আমাদের জেঁকে উঠবে। সেটাও ত আমাদের কম লাভ নয়! অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, বাংলা দেশের প্রয়োজনীয় পাতে খাবার লুচি ভাজার ঘৃতের প্রায় চৌদ্দ আনা ভাগই ঘৃত ভিন্ন প্রদেশ থেকে আমদানী হয়—ব্যবসার দিকদিয়ে এটা যে কতবড় ক্ষতি তা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবিয়ে দেখার বিষয়।

এটা গেল পল্লীগ্রামের ব্যবসার দিক। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো সহরের অধিবাসীদের পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ কি

পরিমাণ অংশ গ্রহণ করতে পারে। সহরের লোক যদি ভাত ডালের মত দুগ্ধকেও সস্তাদরে পায় তাহ'লে খাদ্য হিসাবে দুগ্ধকেও যে অতি মাত্রায় গ্রহণ করবে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। দুগ্ধকে সস্তা করতে গেলে কোলকাতার উপকণ্ঠে বড় বড় ডেয়ারী ফার্ম্ম স্থাপন করা দরকার। আমাদের দেশে যে সমস্ত দুগ্ধের ডেয়ারী আছে তারা আসলে ডেয়ারী পদবাচ্যই নয়। যে-ডেয়ারী থেকে দৈনিক হাজার হাজার মণ দুগ্ধ উৎপন্ন না হয় তাকে ডেয়ারী বলে না। বিলাতের এক একটি বড় ডেয়ারীতে দৈনিক ৪।৫ হাজার মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে প্রথম প্রথম সেরকম ডেয়ারী যে স্থাপিত হবে না সেটা বলাই বাহুল্য; কিন্তু যে ডেয়ারীতে দৈনিক প্রায় ২০ মণ দুধ উৎপন্ন না হয় তাতে ভাল লাভ হয় না। দেশের ব্যবসায়ীরা ডেয়ারীশিল্পের দিকে নজর দিন না কেন—তাতে তাঁদের লাভ ত হবেই, উপরন্তু দেশের বেকারদের কাজ জুটবে। ডেয়ারী শুধু দুধের জন্যই প্রয়োজন নয়, ঘৃত, মাখন, দই, ছানা, ক্ষীর, হরলিক্স, জমাটদুধ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত ব্যাপারেই ডেয়ারী নানান্ ভাবে সাহায্য করে। সুতরাং ডেয়ারী স্থাপনের সঙ্গে আমাদের দেশের আরও কয়েকটি শিল্পের জন্ম নেওয়ার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ডেয়ারী স্থাপনের পক্ষে রীতিমত মূলধনের প্রয়োজন, কেননা, তজ্জন্য যন্ত্রপাতি দরকার। কিন্তু যাঁরা সেই মূলধন সংগ্রহ করতে পারবেন না তাঁদের পক্ষেও দুধের ব্যবসা করবার উপায় আছে। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ নানা কারণে চাকরীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের অন্তর ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছে—অথচ বেশী মূলধনের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবার তাঁদের সামর্থ্য নেই। তাদের পক্ষে দুধের ব্যবসায় লাভজনক। আজ কোলকাতার দুধের ব্যবসা হিন্দুস্থানী গোয়ালারা পরিচালন করছে, সুতরাং বাঙ্গালী কেন পারবে না? দৈনিক অন্ততঃ পাঁচ মণ দুধ উৎপন্ন হ'তে পারে এমনি একটি গো-শালা স্থাপন করে কেউ যদি কারবার রাখেন তাহ'লে তাঁর ২৫০৲ টাকা লাভ থাকতে পারে। এরকম পরিমাণ উৎপাদন নিয়ে কারবার করা লাভজনক নয়।

আমরা উপরে যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করলাম মূলধনী সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ধনবিজ্ঞান ও জাতীয় উন্নতি

অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জার্ম্মান্ জাতি দরিদ্র ছিল; কিন্তু দরিদ্র হইলেও বহু ভাষা জানিত বলিয়া ইংরেজেরা তাহাদিগকে "জার্ম্মাণ পণ্ডিত" বলিয়া উপহাস করিতেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে জার্ম্মাণ জাতি, প্রিন্স্ বিস্মার্ক প্রবর্ত্তিত শাসন নীতি গুণে যেরূপ ধনী ও সর্ব্বতোমুখী বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা তাহাদের জার্ম্মাণ মহাসমরের ব্যয় বহন করিবার ক্ষমতায়ই প্রকাশ পায়। জাপানের উন্নতিও জার্ম্মান জাতির উন্নতির ন্যায় আকস্মিক এবং আদর্শস্থানীয়। অধিক দিন পূর্ব্বের কথা নয়, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যকে কৃষি-প্রধান দেখিয়া তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট্ মিষ্টার রুজ্‌ভেণ্ট (Mr. Roose Velt) বলিয়াছিলেন—"কেবল কৃষির উন্নতির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনও করিতে হইবে, কারণ উত্তর কালে বাণিজ্য সমরই প্রধান সমর বলিয়া গণ্য হইবে"।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ; শতকরা প্রায় ৭০ জন অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট এগ্রিকাল্‌চারাল্ ডিপার্টমেণ্ট" (Agricultural Department) স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু অতি অল্প লোককেই তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এদেশের অলস প্রকৃতির লোকেরা এবং তাহাদের সংখ্যাও অত্যধিক, প্রায় সকল কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী; কিন্তু আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে, রঘুবংশে কবিবর্ণিত প্রজাবৎসল-শাসন-নীতি-সম্পন্ন প্রজাতন্ত্র প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রধান প্রধান শাসন সংস্কারের সূত্রপাত লোক হিতৈষী বেসরকারী সমিতি সকল দ্বারা সাধিত হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মদ্য বিক্রয় ঘটিত রাজবিধি ও ঐরূপ লোক হিতকর অন্যান্য অনেক রাজবিধি উল্লেখযোগ্য। ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক উন্নতি কতকালব্যাপী চেষ্টার পর কত বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া সাধিত হইয়াছে তাহা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়। বস্তুত "God helps those who help themselves" (যাহারা নিজেকে সাহায্য করে ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন); আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে,—"দৈব পুরুষকারের অধীন, এবং পুরুষকারও দৈব উভয়ের মিলনে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়।" আবার ইহাও মনে করা আবশ্যক যে, "A bad people drags down a good government and a good people pulls up a bad government" (মন্দ প্রজা দিগের দ্বারা ভাল গবর্ণমেণ্টেরও অবনতি এবং

ভাল প্রজার দ্বারা মন্দ গবর্ণমেণ্টেরও উন্নতি সাধন হয়। "Man is the architect of his own fortune" (মনুষ্য নিজেই তাহার ভাগ্য গঠনকারী) "দৈবমিতি কাপুরুষা বদন্তি" (কাপুরুষেরাই "দৈব" কথাটী বলে)। নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলিতেন "Take away the word 'impossible', from the dictionary' ("অসম্ভব" শব্দটী অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও) "মানুষে যাহা সম্পন্ন করিয়াছে সকল মানুষই তাহা করিতে পারে" (What man has done man can do")।

বর্ত্তমান সময়ে যে যে দেশ যে যে উপায়ে উন্নতির সোপানে উঠিয়াছে তাহাদের পদানুসরণে এদেশেরও উন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

এ দেশের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায়, দরিদ্রতা, আলস্য, বিলাসিতা, নানা প্রকার পীড়া, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, কাপুরুষতা, আত্মকলহ, ইত্যাদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই সকল ব্যাধির নিদান অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ না হওয়ায় চরিত্র বলের-অভাবই মূলকারণ।

যদিও চরিত্র বল দ্বারাই মনুষ্য-জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, যদিও প্রাচীন কালের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ "অর্থকে অনর্থের মূল" বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, তথাপি, বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্য সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের অর্থই যে একটী প্রধান সহায় তাহা অস্বীকার করা যায় না। কবি বলেন,—

"When to virtuous hands 'tis given,
It blesses like the dews of heaven"*

*(ধন যখন ধার্ম্মিক লোকের হস্তে থাকে তখন তাহা আকাশের শিশিরবৎ মঙ্গল প্রদ হয়")।

বস্তুতঃ অর্থের অপব্যবহার জনিত অনিষ্টের জন্যই লোকে অর্থকে দোষারোপ করিয়া থাকে। যে অস্ত্রের সাহায্যে মানুষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, দস্যু প্রভৃতি শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে, সেই অস্ত্র বালকের হাতে থাকিলে অনিষ্টকর হয়; কিন্তু তজ্জন্য কি লোকে অস্ত্রকে দোষ দেয়? গৃহীর পক্ষে ধন প্রয়োজনীয় এবং দরিদ্রতা একটি সামাজিক ব্যাধি।

মনুষ্যত্ব বিকাশোপযোগী শিক্ষা সর্ব্বত্রই জাতীয় উন্নতির কারণ; এবং তজ্জন্য এদেশে তাহার বহুল বিস্তার হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়কেই সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। জাপানে বরং শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা শতকরা তিন কি চার জন অধিক।

দারিদ্র্য ও ব্যাধি-প্রপীড়িত-অশিক্ষিত লোক-সমাজের ধর্ম্ম চিন্তা ও নৈতিক বল থাকিতে পারে না। † "অভাবে স্বভাব নষ্ট" এবং "ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি" (ক্ষীণ ব্যক্তিরা নির্দ্দয় হয়) বলিয়া জন বাক্য আছে।

ম্যালেরিয়া ও (Kala-Azar) কালা-জর রোগে

† (ভারতবাসীদের নানাপ্রকার ব্যাধির প্রধান কারণ উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বলিয়া অনেক চিন্তাশীল ভারতবন্ধু ইংরেজ (যেমন ডাক্তার রাদার ফোর্ড, স্যার স্ক ল্যাম্পটন্, প্রভৃতি) মত প্রকাশ করিয়াছেন; বৎসর ব্যাপী অর্দ্ধাশনে কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের শরীরে রোগাক্রমণের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকিতে পারে না ইহা সহজেই বুঝা যায়।)

রক্তাল্পতা জন্মাইয়া এদেশে লোকের যেরূপ জীবনীশক্তি হ্রাস করে, দারিদ্র্য ব্যাধিও তদ্রূপ ধনাল্পতা জন্মাইয়া জাতীয় সঞ্জীবতা ক্রমশ হ্রাস করিতেছে।

দেশের ধন বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল না জানায় দেশের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির অনেক বিঘ্ন ঘটিতেছে। বাল্যবিবাহ স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার পক্ষে অনিষ্টকর। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকে না, তজ্জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও অর্থোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে। অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা ও নৈতিক বল সঞ্চয় জন্য ধর্ম্ম শিক্ষাও আবশ্যক।

ধন বিজ্ঞানে, "ধন" শব্দে সম্পত্তি বুঝায়, কেবল চলিত মুদ্রা বুঝায় না। মানুষের জীবন ধারণ জন্য কি সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য যাহা আবশ্যক এবং যাহার বিনিময় শক্তি অর্থাৎ যাহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে ধন বলে; যেমন, গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি গৃহ পালিত পশু, শস্য, ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রভৃতি ধাতু, মুদ্রা, ইত্যাদি ধন শব্দ বাচ্য, কিন্তু জল, বায়ু, সূর্য্য কিরণ ইত্যাদি জীবন ধারণ জন্য নিতান্ত আবশ্যক হইলেও ধন শব্দ বাচ্য হয় না।

মুদ্রা দুই প্রকার, ধাতু মুদ্রা ও কাগজ-মুদ্রা (Currency note) কারেন্সী নোট্। ধাতু মুদ্রা-সোণা, রূপা, তামা, কি নিকেল প্রভৃতি নির্ম্মিত; যেমন পাউণ্ড, মোহর, গিনি ইত্যাদি স্বর্ণ নির্ম্মিত; টাকা, শিলিং ইত্যাদি রৌপ্য নির্ম্মিত; আনি দুয়ানি, প্রভৃতি নিকেল নির্ম্মিত; পয়সা ইত্যাদি তাম্র নির্ম্মিত প্রচলিত মুদ্রা। গবর্ণমেণ্টের টাকশালে (mint-মিণ্ট) বিদেশী একটী চিহ্নযুক্ত হইয়া যে স্বর্ণ * রৌপ্যাদি ধাতুতে টাকা আনা প্রভৃতি মুদ্রিত হয় সেই সকল ধাতুর নিজের গুণের তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য আছে; কিন্তু কাগজ মুদ্রার কাগজের ঐরূপ কোনও মূল্য নাই; গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধের অঙ্গীকার থাকাই তাহার মূল্য; অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট ঐ দলিল সম্পাদন করিয়া টাকা ধার করেন। 'গবর্ণমেণ্ট পেপার" (Grovernment paper) যাহাকে লোকে কোম্পানীর কাগজ বলে তাহাও ঐরূপ টাকা ধার করার দলিল, তবে ঐ টাকা দলীলে চাহিবা মাত্র দিবার অঙ্গীকার না থাকিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে যখন গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন তখন তাহা পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেন; তজ্জন্য তাহাকে গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোটও (Grvernment Promisary note) বলে। "কারেন্সী নোট" গবর্ণমেণ্টের সম্পাদিত, কিন্তু বে-সরকারী কোনও ব্যক্তি ঐরূপ দলিল সম্পাদন করিলে তাহাকে

* (ধাতু সকলের মধ্যে স্বর্ণের নানা প্রকার গুণ থাকায় এবং তাহা উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়ায় স্বর্ণ দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হয়। অর্থনীতি বিশারদগণ বলেন, ভবিষ্যতে নির্দ্দিষ্ট ওজনের নির্দ্ধারিত বিশুদ্ধতার অমুদ্রিত স্বর্ণ খণ্ড সকল আন্তর্জাতীয় (international) ইণ্টারন্যাশান্যাল। বিনিময়ের (exchange) ও ঋণ শোধে হইবে এবং দেশ মধ্যে প্রচলিত কাগজ মুদ্রা, আবশ্যকমত, স্বর্ণের মূল্যে পরিশোধ জন্য স্বর্ণ মজুত থাকে। এক দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত মুদ্রা অন্য দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত করিতে, মুদ্রার ও মূল্যের অতিরিক্ত যাহা দিতে তাহাকে বট্টা (exchange rate) বলে, তাহা সময়ে সময়ে কম বেশী হয়)।

হ্যাণ্ডনোট (handnote) বলে। তবে পার্থক্য এই যে হ্যাণ্ডনোটে সুদ দিবার সর্ত্ত থাকে কিন্তু কারেন্সী নোটে তাহা থাকে না।

কিন্তু মনুষ্য সমাজে সভ্যতা প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। শিল্পযুগে ধাতু মুদ্রা ও তৎপরে বাণিজ্য-ব্যবসায় যুগে তৎসঙ্গে কাগজ মুদ্রাও প্রচলিত হয়।

আদিম অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যের কোনও ধন সম্পত্তি ছিল না; মৃগয়ালব্ধ হত প্রাণীর মাংস দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। বর্ত্তমান সভ্যতাযুগেও উত্তর হিমমণ্ডলবাসী এস্কুইমো (Esquimo) জাতি বরফের ঘরে বাস করে বলিয়া বিখ্যাত আফ্রিকার বুশমেন (Bushmen) ও কঙ্গোরাজ্যের খর্ব্বকায়

বামন মনুষ্য সকল (Pigmies পিগমিজ) মৃগয়াবৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করে। তজ্জন্য মনুষ্য সমাজের এই আদিম অসভ্য মানুষকে মৃগয়াজীবী বলা হয়। তৎপরে শিকার লব্ধ প্রাণীকে ভবিষ্যৎ অভাবপূরণ জন্য (যেমন পীড়িত অবস্থায় শিকার করিতে অপারগ হইলে) জীবিত অবস্থায় মজুত করিয়া রাখিবার জন্য গৃহপালিত পশু পক্ষীর প্রচলন সুরু হয়। এই সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ ও গো-মহিষাদির দুগ্ধ পান হইতে যাযাবর (pastoral) অবস্থার সৃষ্টি হয়; কারণ পশুর খাদ্য জোগাইবার জন্য তৃণযুক্ত চারণ স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে যাযাবর জাতি সমূহকে সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়াইবার আবশ্যক হয়। এই অবস্থায় তাঁবুতে বাস এবং নানাপ্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ লোকে দলবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে এবং গৃহপালিত পশু সকল তাহাদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। ইহা হইতেই ল্যাটিন্ ভাষায় ধাতু মুদ্রাকে "পিকুউ" (pecu, বহুবচনে pecudes পিকিউডিস্ = cattle ক্যাটল্ = গবাদি পশু) বলে। এই যাযাবর অবস্থায় বিনিময় প্রথাও প্রচলিত হয়। এই বিনিময় প্রথায়, যে ব্যক্তির নিকট যে আবশ্যকীয় দ্রব্যটী অধিক থাকে সেই ব্যক্তি তাহার আবশ্যকের অতিরিক্ত দ্রব্য অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার নিকট হইতে তাহার আবশ্যকের অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই বিনিময় প্রথার অনেক অসুবিধা ছিল এবং সেই সকল অসুবিধা দূরীকরণ জন্য কালক্রমে ধাতুমুদ্রা ঐ বিনিময় সাধনের মধ্যবর্ত্তী উপায় স্বরূপ প্রচলিত হয়। যাযাবর অবস্থার পর, কৃষিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ প্রচলিত হয় এবং তৎপরে ক্রমশঃ শিল্প ও সর্ব্বশেষে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত হইতে দেখা যায়।

বাণিজ্য দুই প্রকার, অন্তর্বাণিজ্য (দেশ মধ্যে) ও বহির্বাণিজ্য (বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য)। বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকদিগকে 'মধ্যবর্ত্তী' লোক শ্রেণী মধ্যে ধরা হয়; এই শ্রেণী মধ্যে পাইকারী, ব্যাপারী, মহাজন, আড়তদার, হাউস্ওয়ালা, প্রভৃতি বুঝায়। ইহারা লাভের আশায় পণ্য খরিদ করিয়া পরে সুযোগমত পণ্য বিক্রয় করে। পণ্য উৎপাদক ও বিক্রেতা, পণ্য ব্যবহারকারী খরিদ্দার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে উপরোক্ত মধ্য শ্রেণীর লোক (middle man) সকল থাকায় তাহাদিগকে "মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী" বলে।

প্রকৃত ধন ও মুদ্রা ইত্যাদি অন্যান্য মূল্যবান পদার্থ সকলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যে বহুব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে অনেক লোকের হাতে টাকা থাকিতেও তাহারা খাদ্য দ্রব্য খরিদ করিতে না পারায় মরিয়া যায়। এক পার্শী গ্রন্থে এরূপ একটী গল্প আছে যে, একজন বণিক কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া গমনকালে জলাভাবে তৃষ্ণায় মরিয়া যাইবার সময় বালুকার উপর লিখিয়া যান—"আমার সঙ্গে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা থাকা সত্ত্বেও তাহা দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা হইল না, কেবল এক পেয়ালা জলাভাবে আমার মৃত্যু হইল"। বর্ত্তমান রেলওয়ে, ষ্টীমার ও পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য যুগে অর্থের দুর্ভিক্ষ, কিন্তু খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নাই।

ধনোপার্জ্জনে, মনুষ্য সমাজ গঠিত হওন হইতে ভূমি, শারীরিক পরিশ্রম ও বুদ্ধি কৌশল এই তিনটীর আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। ক্রম বিকাশ, সৃষ্টির মূল নিয়ম। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মনুষ্য সমাজ ও মনুষ্য সমাজের প্রতিষ্ঠান সকলও ক্রম বিকাশের নিয়মাধীন। তজ্জন্য মানব সমাজের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধনোপার্জ্জনে ভূমির সঙ্গে মূলধন স্বরূপ মুদ্রা, শারীরিক পরিশ্রমের অনুপ্রেরক স্বরূপ কল কৌশল, ও বুদ্ধি কৌশলের পৃষ্ঠপোষক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, স্থান লাভ করিয়াছে।

শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ভূমি হইতে যে কৃষি-জাত কি আকরিক দ্রব্য, কিম্বা জলকর উপস্বত্ব পাওয়া যায় তৎ সকলকে কাঁচা মাল (raw goods or materials) বলে। শিল্প কি কলাবিদ্যা দ্বারা কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত পণ্যকে পাকামাল বলে (finished goods)। এই সকল মাল বিক্রয়ার্থ উপযুক্ত বাজার সকল market মার্কেট, গোলা, গঞ্জ, বন্দর, হাট, বাজার মেলা, ইত্যাদি আছে। ঐ সকল মাল খরিদ করিয়া বিক্রয়ার্থ উপযুক্ত বাজারে যাহারা প্রেরণ করে কিম্বা লইয়া যায় তাহা-দিগকে 'মধ্যবর্ত্তী' লোক (middle men) বলে। এই সকল মাল বহন করিয়া লইয়া যাইতে উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দ্দভ, বলদ, শকট, নৌকা জলযান আদি ব্যবহৃত হয়; এখন রেলওয়ে ও ষ্টীমার ও অর্ণব পোত সকল হওয়ায় মাল বহনের সুবিধা হইয়াছে। মাল বহন জন্য রাস্তা, কাটা খাল, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি আবশ্যক হয়†। মনুষ্য সমাজের সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি প্রচলিত হইতে দেখা যায়। এদেশীয় প্রাচীন অর্থনীতিজ্ঞেরাও বলেন,—

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।"*

বর্ত্তমান সময়ে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এই তিনটীই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক; মাতৃ ভাষায় ঐ সকল বিষয়ে বহুল গ্রন্থপ্রচার এবং শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

দেশের ধন বৃদ্ধি ও সাক্ষাৎ ভাবে ধন লাভ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংখ্যায় কয়েকটী আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

* "বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, কৃষিকার্য্যে, বাণিজ্যের অর্দ্ধেক ধনলাভ; রাজ সেবায় (চাকুরীতে) কৃষিকার্য্যের অর্দ্ধেক ধন প্রাপ্তি হয়, কিন্তু ভিক্ষা বৃত্তিতে কিছুই হয় না")।

†(বাণিজ্যের সঙ্গে সভ্যতা বিস্তার হয়। যে:দেশের সমুদ্র তীর সীমা রেখা (coast line) যত আঁকা বাঁকা তাহা তত সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও সভ্য, যেমন প্রাচীন গ্রীস্, ইটালী ও বর্ত্তমান সময়ে ইংলাণ্ড, জাপান ইত্যাদি)।

(ক্রমশঃ)

সিগারেট শিল্প

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

সিগারেট প্রস্তুত করতে গেলে আসল ভার্জ্জিনিয়া তামাকের সামান্য পরিমাণ পাতা মিশিয়ে দিলেও কাজ চলে যায়। কিন্তু সে সিগারেট যে উৎকৃষ্ট ধরণের হয় না সেটা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের দেশী সিগারেট ব্যবসায়ীরা নিকৃষ্ট তামাক পাতার সঙ্গে একটু সুগন্ধ মিশিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়ে থাকে। কারণ সুগন্ধ ক্ষণিকের জন্য হয়ত সিগারেটের বাইরের আস্বাদ ভাল করে তোলে কিন্তু তদ্দ্বারা সিগারেটের কোয়ালিটী উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে না। দেশী ব্যবসায়ীদের একটা বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখা উচিৎ যে, যেটা নেশার জিনিস সেখানে ফাঁকী চলে না ; কেননা, নেশাখোরদের আসল বস্তুটি না হ'লে মন ভেজে না। মানুষ অন্য দিক দিয়ে অনেক রকম ভেজাল সইতে পারে বটে কিন্তু নেশার ক্ষেত্রে রাজৈশ্বর্য্য না হ'লে লোকের চলে না। তাই ব্যবসায়ীদের নেশার বস্তুটি যাতে পরিপাটি হয় সেধারে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশী ব্যবসায়িগণ আসল যায়গাতেই ভুল করেছিলেন, তাই ১৯৩০-৩২ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় সিগারেট ভারতীয় বাজার খানিকটা অধিকার করলেও তা' বেশীদিন রাখতে পারে নি। আবার বিদেশী সিগারেট দেশীয় বাজার একেবারে ছেয়ে ফেলেছে।

আমরা এতক্ষণ সিগারেটের বাজার সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এবার তার প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক্। পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভাল সিগারেটের পক্ষে উৎকৃষ্ট ভার্জ্জিনিয়া তামাক পাতা প্রয়োজন, কিন্তু সমস্তটাই যদি উৎকৃষ্ট তামাক পাতা দেওয়া যায় তাহ'লে ব্যবসায়ীরা পড়তায় পোষাতে পারে না। সেইজন্যই ভাল ভার্জ্জিনিয়ার সঙ্গে মাঝারি রকমের তামাক পাতা মিশানো হয়ে থাকে। এই মিশ্রণ কার্য্যটাই সিগারেট শিল্পের আসল ব্যাপার। ব্যবসার ক্ষেত্রে এই আসল ব্যাপারটি যার রীতিমত আয়ত্তের মধ্যে থাকে ব্যবসার পড়তায় সে-ই লাভ মারে বেশী, অথচ জিনিষটাও ভাল দাঁড়ায়। এই মিশ্রণ কার্য্যের পূর্ব্বে তামাক পাতাকে একটু ভিজিয়ে নিতে হয়, টেক্‌নিক্যাল্ ভাষায় যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল reconditioning। বড় বড় ফ্যাক্টরীতে এর জন্য Steaming এবং Humidifying plants থাকে। এই সব মেশিনের সাহায্যে তামাক পাতাকে ভিজিয়ে না নিলে পাতা শুকনো মড়মড়ে থাকার দরুণ ভেঙ্গে যায় এবং তাতে

পাতা নষ্ট হয়। বিভিন্ন জাতীয় পাতাকে বিভিন্ন রকমে ভিজোতে হয়, কেননা, সকলের বাষ্প আহরণ করবার শক্তি সমান নয়।

'রিকন্‌ডিসনিং যন্ত্র' থেকে পাতা ঠিক হয়ে বেরিয়ে আসবার পর তার বোঁটা এবং শির ছেঁটে দেওয়া হয়। অনেক ফ্যাক্টরীতে এগুলো বাদ যায় আবার অনেক ফ্যাক্টরীতে এগুলিকে পেষণযন্ত্রে ফেলে পাতলা পাতার মত নিয়ে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এগুলোকে কাজে লাগালে মাল মশলা শতকরা ১০।১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তার পরেই মিশ্রণ কার্য্যের পালা, তার জন্য আলাদা যন্ত্র আছে; এই মিশ্রণ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ বৃদ্ধির জন্য সামান্য পরিমাণে কেমিক্যাল দ্রব্যও মেশানো হয়ে থাকে। এই কেমিক্যাল দ্রব্য মেশানোর ব্যাপারে রীতিমত সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কোন ক্ষেত্রেই কিছুতেই মাত্রাধিক্য দেওয়া উচিত নয়, কেননা, তাতে কোয়ালিটির ক্ষতি হয়ে থাকে।

উপরোক্ত ব্যাপারের পরে পাতা গুলোকে বাক্সে ক্যাম্বিস মুড়ে ২৪ ঘণ্টা ফেলে রাখা হয়—এই রকম ভাবে রেখে দিলে সুগন্ধ পাতার সর্ব্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। তার পরেই পাতাগুলোকে কেটে কুঁচোবার পালা। এর জন্য কাটাই মেসিন আছে; তাতে ফেলে পাতা কাটাই হয়ে থাকে। এই কাটাই কার্য্যটা ভালভাবে সাধিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এই কাটাই-এরই উপর পাতার রং এবং ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। কাটাই যদি খারাপ হয়ত মশলার সোনালী রং ভাল খোলে না এবং তজ্জন্য সিগারেট-খোরীরা সে-সিগারেট পছন্দ করে না। ভালভাবে কাটাই হওয়ার জন্য কাটাই মেসিনের ছুরি ১০।১৫ মিনিট অন্তর অন্তর পাল্টে দিতে হয়।

কাটাই হওয়ার পর পাতাগুলোকে এক রকমের দস্তা-মোড়া বাক্সে আবার ২৪ ঘণ্টা ধরে ফেলে রাখা হয়। এই রকম ভাবে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাতার সুগন্ধ চারধারে সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। সকলেই জানেন যে, তামাক পাতার নিজস্ব এক রকম সুগন্ধ আছে; পাতা গুলোকে কুঁচিকুচি করে কাটবার পর পাতার প্রত্যেক অঙ্গ হতে নিজস্ব সুগন্ধ সূক্ষ্ম রসাকারে নির্গত হতে থাকে। সেগুলিকে ২৪ ঘণ্টা উক্ত বাক্সে রাখলে পর সেই রস পাতার সর্ব্বাঙ্গে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে সিগারেটের কোয়ালিটি ভাল হয়।

এই রকম ভাবে ২৪ ঘণ্টা থাকবার পর কুঁচো পাতা গুলিকে কিঞ্চিৎ ভাজা হয়। তার জন্য এক রকমের 'রোষ্টিং মেসিন' (Roasting machine) আছে। তারপরে সেই পাতাকে আবার শীতল করা হয়। এইভাবে শীতল করবার পর পুনরায় একটু কেমিক্যাল সুগন্ধ 'স্প্রে'-র সাহায্যে পাতাগুলির উপর ছিটানো হয়। এইবারের এই সুগন্ধ প্রদান দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকে।

এতক্ষণ ধরে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তা সিগারেটের মশলা প্রস্তুত সম্পর্কে; এবার সিগারেট প্রস্তুত সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যাক্। সিগারেট প্রস্তুতের জন্য বৃহৎ মেশিন আছে, তাতে একাধারে কাগজ ছাপা, কাগজে মশলা জড়ানো, সিগারেট কাটাই প্রভৃতি সমস্তই হয়ে থাকে। সাধারণ মেশিন থেকে মিনিটে ৩০০ সিগারেট প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসে, খুব ভাল মেশিনে মিনিটে ১০০০।১৫০০ সিগারেট প্রস্তুত হতে পারে। মেশিনের একধারে রিলে কাগজ জড়ানো থাকে, সে কাগজ আবশ্যক মত ছাপা হয়। আর

একধারে মশলা লম্বা দড়ির মত পেন্সিলের আকারে পাকিয়ে থাকে, তারপর ঐ ছাপা কাগজ দিয়ে সেটা জড়ানো হয়। পরে মেশিনের আর এক স্থানে ঐ লম্বা রিলকে সিগারেটের আকারে কেটে ট্রেতে সাজানো হয়। উক্ত ট্রেতে একটি গরম ঘরে নিয়ে গিয়ে সিগারেট গুলিকে উত্তমরূপে শুকানো হয়,—তারপর সেই সিগারেট প্যাকেট ভর্ত্তি হয়ে বেরিয়ে আসে। এই হ'ল সিগারেটের সংক্ষিপ্ত প্রস্তুত প্রণালী।

আমরা উপরে সিগারেট প্রস্তুত ব্যাপারের সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করলাম। এর থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হবে যে, এটা অল্প মূলধনের কারবার নয়—এর জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। আমাদের দেশে অল্প মূলধন নিয়ে কেউ কেউ সিগারেট প্রস্তুতের কারবার সুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু কেউই সুবিধা করতে পারেন নি। উল্টে তাঁদের সেই মূলধন একেবারে নষ্ট হয়েছিল। সিগারেট শিল্প যে একটী চালু শিল্প

সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। দিনের পর দিন এর কাটতি বেড়েই চলেছে। এই কাটতি বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ সৌখীন হয়ে উঠেছে এবং ক্রমশঃ হয়ে উঠবেও। তারই পাশাপাশি মানুষের অবসরের পরিধিও দিন দিন সঙ্কীর্ণ হতে সঙ্কীর্ণতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় আলবোলা সাজবার তার সময়ও নেই, ধৈর্য্যও নেই। এই কারণেই সিগারেটের চাহিদা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বিড়ি ও তামাকের প্রচলনই যে বেশী সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ সৌখীন হয়ে উঠেছে—এর প্রকাশ যে কেউ দেখতে পাবে শিল্প প্রসারিত ক্ষেত্র সমূহে। যে সমস্ত যায়গা পূর্ব্বে কৃষি প্রধান ছিল অথচ আজ শিল্প প্রধান হয়ে উঠেছে সেখানে বর্ত্তমানে আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসিতার বিস্তার সম্ভব হয়েছে। বাংলা দেশের মফঃস্বলের চটকল সমূহে যারা কাজ করে তারা আজও কৃষক পরিবারের সন্তান; কিন্তু সৌখীনতার আবহাওয়ার প্রভাবে পড়ে তারা বেশীর ভাগই সিগারেটের ভক্ত হয়ে উঠেছে। এই রকম ভাবেই একদিন অধিকাংশ তামাকখোর ও বিড়িখোরই সিগারেটখোরে পরিণত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের ভাষণের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে দেশের শিল্প প্রসারের ক্রমপরিণতি। ভারতবর্ষে শিল্প বিস্তারের অগ্রগতিকে কেউ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, সুতরাং মানুষ যে ক্রমশঃ সৌখীন হয়ে উঠবে এটা অবশ্যম্ভাবী সত্য। এবং সেইজন্যই বিড়ি ও তামাককে পশ্চাতে ফেলে সিগারেটের জয়যাত্রার অধিকতর সম্ভাবনা।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশী সিগারেট ব্যবসায়ীরা এদিকটা কেউই ভেবে দেখেন নি।

সিগারেটের বাজার সম্বন্ধে বর্ত্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ কোন ধারণা না থাকায় তাঁরা অধিকৃত বাজার হারিয়েছেন। অথচ দেশে পৌণে এক কোটী টাকার বিদেশী সিগারেট বিক্রী হচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি সিগারেট-ব্যবসা কম মূলধনে ফাঁকীবাজীর কারবার নয়, এর জন্য উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত মূলধন আবশ্যক। ভারতের ব্যবসায়ী ধনী সম্প্রদায় বিদেশী সিগারেটের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াবার মানসে যদি উপযুক্ত বলসঞ্চয় ক'রে আবির্ভূত হ'ন তাহ'লে তাঁদের হঠে যাবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, সিগারেটের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কাঁচা মাল তামাক পাতা তা' আমাদের দেশেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। শুধু তাকে কাজে লাগাবার জন্য উপযুক্ত শিল্প-বুদ্ধির অভাব রয়েছে। আমরা আশা করি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এধারে সচেষ্ট হবেন। সমাপ্ত।

পুস্তকের দোকান সজ্জা

আমাদের দেশে আজকাল পুস্তকের দোকানের আর অন্ত নেই। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের দোকান বাড়িয়া চলিতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতাও যথেষ্ট দেখা দিয়াছে। এখন নিতান্ত সেকেলে এবং মামুলী ধরণের বইযের দোকান দিলে ব্যবসায়ে লাভ করা কঠিন।

পুস্তকের দোকান করিতে হইলে প্রশস্ত দোকান হওয়া উচিত, গ্লাস দেওয়া জানালা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেই জানালায় পুস্তক সাজাইয়া রাখিতে পারিলে রাস্তার লোকেরও ক্রেতা হইবার অধিক সম্ভাবনা; ইহার নাম Window dressing. এটি জামা কাপড়ের, পুস্তকের, সখের দ্রব্যাদি এবং ডাক্তারখানার অতি অপরিহার্য্য উপকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমেরিকান কোন এক উদ্যোগী যুবক অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায়কেই উৎকৃষ্ট ব্যবসায় বলিযা পছন্দ করিয়াছিলেন এবং যেখানে অসংখ্য পুস্তকের দোকান, তাহারই নিকট দোকান করিয়াছিলেন। আমেরিকার পুস্তকের দোকানদারগণ পুস্তক বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়াটাকে বরাবরই ঘৃণা করিয়া আসিতেছিলেন—তখন আমেরিকায় পুস্তকের কেহ বিজ্ঞাপন দিত না; যুবক দেখিল চারিদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী, দোকানে বসিয়া কেবল রাস্তার পথিকের মুখপানে তাকাইয়া বসিয়া থাকায় কোন সুফলের আশা নাই। একমাস পরেই তিনি দোকানের পার্শ্বের একটি কক্ষ সুসজ্জিত করিলেন, সেই কক্ষের দ্বারে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলেন।

FREE READING ROOM!

বিনামূল্যের পাঠাগার! দ্বারদেশে বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হইল—পরিশ্রান্ত পথিক মাত্রই এইস্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামলাভ করিয়া যাইতে পারেন—তাঁহার কোন ব্যয়ই নাই।

একজন ভৃত্য আগন্তুকের আদর অভ্যর্থনার জন্য নিয়োজিত হইল—সম্মুখের একটা টেবিলে পুস্তকের তালিকা, পুস্তক, ও সংবাদ পত্র পড়িয়া রহিল। প্রায় এক সপ্তাহ কেহ এ কক্ষে প্রবেশ করিল না, কেবল দেখিয়া যাইতে লাগিল মাত্র। তাহার পর দুই একজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আদর আপ্যায়ন পাইতে লাগিল, পুস্তকরাশি দেখিতে লাগিল, ক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার যশঃ সৌরভ আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরে এত শীঘ্র প্রচারিত হইয়া পড়িল—পূর্ণ এক বৎসরের কাৰ্য্যে এমন আশাতীত লাভ করিলেন যে, তিনি নিজে পুস্তক প্রকাশক হইয়া পড়িলেন। সমগ্র জগতের সংবাদ পত্রে তাঁহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে

লাগিল। শুদ্ধ আমেরিকা কেন, জগতের সমস্ত স্থানের পুস্তকপ্রিয় লোক মাত্রেই তাহার ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইল। মৌলিকত্বের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

শুধু Local অর্থাৎ স্থানীয় ক্রেতার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য সফল হয় না, অবশ্য দিনগত পাপক্ষয়ের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র কথা। আমাদের পুস্তক বিক্রেতা, যাঁহারা বড় বড় দোকান করিয়া ফুটফুটে বাবুটী সাজিয়া বসিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহাদিগের অপেক্ষা বটতলা অঞ্চলে যাঁহারা বিজ্ঞাপনাদি দিয়া ডাকে, পুস্তকের কাজ করে, তাহারা অনেক অধিক কাজ করে ইহা আমরা দেখিয়াছি। বিজ্ঞাপন কখন বৃথা যায় না। সেই জন্য আমরা মনে করি, যে, পুস্তকের দোকানমাত্রেরই বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহার পুস্তকালয়ের পুস্তকের বিক্রয় বৃদ্ধি করা শুধু উচিত নহে, নিতান্ত আবশ্যক। কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বে এবং মান্দ্রাজের পুস্তক ব্যবসায়ীগণ বেশী বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। আপনার পুস্তকের দোকানে যে কি পুস্তক আছে, লোকে যদি তাহাই না জানিতেই পারিল, তবে পুস্তক কিনিবে কে? পুস্তকের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত—নিতান্ত অবহেলায় মামুলী বন্দোবস্তে ফেলিয়া রাখা ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

পরলোকে শেঠ সুরাজমল

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী শেঠ সুরাজমল পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মেসার্স সুরাজমল নাগরমল নামক বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিকানীর রাজ্যের রতনগড় গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই তিনি তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার খুল্লতাতের কারবারে (মেসার্স গুরুমুখ রায়, শিওদৎ রায়) কাজ শিখিতে থাকেন। তখন তাঁহার বয়স ৯ বৎসর মাত্র। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে (যখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর) তিনি স্বয়ং পৃথক ভাবে কাঁচা পাটের কারবার আরম্ভ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "সুরাজমল নাগরমল" নামে আর একটি কারবারের পত্তন করেন। উহাই বর্ত্তমানে বিরাট আকার ধারণ করিয়া মেসার্স সুরাজমল নাগরমল নামে সমগ্র পৃথিবীময় পরিচিত হইয়াছে। পাট এবং শনের (Jute and hemp) কারবারই এই কোম্পানীর প্রধান কার্য্য। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়া জুট্ প্রেস নামক একটী চল্‌তি কারবার খরিদ করেন এবং ১৯১৭ সালে হনুমান্ জুট্ প্রেস স্থাপন করেন। ১৯২৮ সালে হনুমান জুট মিল খোলা হয়। ১৯৩৩-৩৪ সালে তাঁহার "য্যাট্‌লাস্ এণ্ড ইউনিয়ন জুট্ প্রেস, নর্থ বেঙ্গল সুগার ফ্যাক্টরী, সিতাবগঞ্জ সুগার মিল্‌স্" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

একদিকে শেঠজী যেমন ব্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি লক্ষ লক্ষ টাকা দেশের ও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে এক লক্ষ টাকা, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী হাসপাতালে ৫০ হাজার টাকা, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২৫ হাজার টাকা,—এই কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার নিজ গ্রামে ২০টী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নানাস্থানে বহু সংখ্যক দেবমন্দির, ধর্ম্মশালা, পুস্তকাগার, ব্যায়াম চত্বর, অনাথ-আশ্রম, উপদেশ ভবন, টিউব ওয়েল, স্নানের ঘাট প্রভৃতি স্থাপন করিয়া জনসাধারণের হিতসাধন করিয়াছেন।

৫৬ বৎসর বয়সে শেঠ সুরাজমলের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জীবনে ব্যবসায়ীদের,—বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে। অতি অল্প বয়সে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অক্লান্ত চেষ্টা, পরিশ্রম এবং সাধুতার বলে কিরূপে উন্নতি লাভ করা যায়, শেঠ সুরাজমলের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কলিকাতায় ৬১নং হ্যারিসন রোডে তাঁহার বিপুল প্রাসাদসম আবাস গৃহ। তাহাতেই তাঁহার সকল কারবারের অফিস অবস্থিত রহিয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র মোহন লাল জালান এখন সমগ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটী পরিচালনা করিতেছেন।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

পেশোয়ারে 'ওরিয়েণ্ট্যালের' যে ইন্‌স্পেক্টরেট অফিস ছিল, তাহা গত ১লা মার্চ্চ হইতে পুরাদস্তুর ব্রাঞ্চ অফিসে পরিণত হইয়াছে।

মিঃ এস্ পি দাস পুরকায়স্থ ক্রেসেণ্ট ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিমালয় য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ এইচ্ সি ঘোষ বেঙ্গল ইনসুর‍্যান্স য়্যাণ্ড রিয়্যাল প্রপার্টি কোম্পানীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

রায়বাহাদুর বিজয়চন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের পুত্র মিঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র সেন বি এ, আর্য্যস্থান ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর (আসাম প্রদেশের জন্য) চীফ্ এজেন্সী লইয়াছেন।

লক্ষ্মী ইন্‌সুর‍্যান্সের ঢাকা সাব-অফিস্ ১৬০নং নবাবপুর রোড্ হইতে ৬২নং লক্ষ্মী বাজার (ঢাকা) এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

নব ভারত ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ্ অফিস ১সি, চৌরঙ্গী রোড্, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রভিডেণ্ট্ ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানীস্ য়্যাসোসিয়েশনের অফিস্ ২নং রয়্যাল্ এক্‌চেঞ্জ্ প্লেস্ হইতে ৯নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট্, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়্যাল বেনিফিট্ সোসাইটীর প্রথম ভ্যালুয়েশন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে তাহার ফলাফল জানা যাইবে। যতদূর আন্দাজ হয়, ভ্যালুয়েসনে কোম্পানীর আর্থিক দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইবে।

বোম্বাইর শ্রী-লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স্ 'কোম্পানী মেসার্স্ চ্যাটার্জ্জি য়্যাণ্ড্ কোম্পানীকে তাঁহাদের কলিকাতাস্থিত চীফ্ এজেণ্ট্স্ নিযুক্ত করিয়াছেন।

জেনিথ্ ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ঢাকা ব্রাঞ্চের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ এস্ এন বসু গার্জ্জিয়ান অব ইণ্ডিয়া ইন্স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর (নিম্ন আসাম ও ঢাকার জন্য) ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন

কার্য্য প্রসার হেতু য়্যাসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়া ইন্স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর অফিস ২নং রয়্যাল্ একচেঞ্জ প্লেস্ হইতে ৯ নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট্ কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।
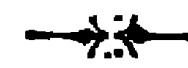
বিখ্যাত বীমা কর্ম্মী মিঃ কুমুদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র মিঃ জে ভট্টাচার্য্য ওরিয়েণ্ট্যাল (প্রভিডেণ্ট্ ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা এলেকায়) চীফ্ অর্গানাইজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি উক্ত কোম্পানীতে প্রথমতঃ সাধারণ অর্গানাইজাররূপে যোগদান করেন। অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য দক্ষতা দেখাইয়া তিনি এই উন্নত পদলাভ করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, আর্য্যস্থান ইন্স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানী ১৯৩৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১৩৮১৫০০ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ১১৭২৫০০ টাকার প্রস্তাবের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে।
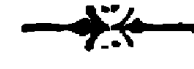
গত ২৩ শে এপ্রিল অমৃতসরের রামবাগ স্থানে ওরিয়েণ্ট্যালের একটী ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইয়াছে। তদুপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় তাহাতে পৌরহিত্য করেন।

মিঃ এম্ জি চিৎনবীশের স্থলে মিঃ এম্ আর পুরী নাগপুর পাইয়োনীয়ার ইন্স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ক্যালকাটা ইন্স্যুর‍্যান্সের কণ্ট্রোলার মিঃ পি আর গুপ্ত এম্ এ, এফ্ সি আই ই, প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার পূর্ব্বেকার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। মিঃ গুপ্ত ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন প্রুডেনসিয়াল য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর হেড্ অফিসে কার্য্য শিক্ষা করেন। সান্-লাইফ্ অব্ ক্যানাডার লণ্ডন অফিসেও তিনি কিছুকাল শিক্ষানবীশ-রূপে কার্য্য করিয়া বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। চার্টার্ড ইন্স্যুর‍্যান্স ইন্ষ্টিটিউট্ এবং ইন্ষ্টিটিউট্ অব য়্যাকচুয়ারীস্, লণ্ডন প্রভৃতি বিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠানের বিবিধ আলোচনা সভায় ও বক্তৃতায় যোগ দিয়া তিনি অধিকতর

জ্ঞান লাভের সুযোগ পাইয়াছেন। আমরা আশা করি মিঃ গুপ্তের উপদেশে ও পরিচালনায় ক্যালকাটা ইন্সুর‍্যান্স্ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

বিগত ১০ই এপ্রিল শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিরলা সাতারার ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর বোম্বাই বিল্ডিং এর দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। বোম্বই সহরের ফিরোজশাহ মেটা রোডে এই প্রাসাদ-সম অফিস গৃহ অবস্থিত।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ১২ই মে বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতার বিখ্যাত সলিসিটার মিঃ নৃপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী পরলোক গমন করিয়াছেন। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুর‍্যান্স্ সোসাইটীর ডিরেক্টার ছিলেন। বেঙ্গল রিভার সার্ব্বিস্ কোং লিমিটেডের চীফ্ এজেন্ট এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চ্যাম্বার অব কমার্সের এক্‌জিকিউটিভ্ কমিটির সদস্যরূপে তিনি ব্যবসা বাণিজ্য মহলে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী নয়া দিল্লীর ষ্টার্লিং ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। গত ২৯ শে এপ্রিল আদালত কর্ত্তৃক উভয় কোম্পানীর এই স্বেচ্ছাসংযোগ মঞ্জুর হইয়াছে।

মেট্রোপলিটান ইন্সুর্যান্স্ কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩০ সালে মেট্রোপলিটান ইন্সুর্যান্স্ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং দুই এক বৎসরের মধ্যেই উহা খুব দ্রুত উন্নতি করিতে থাকে। ইহাতে আমরা উক্ত কোম্পানীর পরিচালক ও ম্যানেজিং এজেন্ট্গণের বিশেষ প্রশংসা করি। কিন্তু আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন লোকের অভাব নাই যাহারা ব্যক্তিগত আক্রোশে অন্ধ হইয়া জাতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং নিজেদের হীন প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। বীমা আইনানুসারে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে পাঁচ বৎসর অন্তর ভ্যালুয়েশন করাইয়া গভর্ণমেন্টের নিকট ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পেশ করিতে হয়। এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট না করা পর্য্যন্ত বীমা কোম্পানীর পাঁচ বৎসরের ক্রিয়াকলাপ বা আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য কেহ করিতে পারে না ; কারণ বীমা ব্যবসায় কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং সংখ্যাতত্ত্বমূলক (Statistical) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। Actuary কর্ত্তৃক এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা অসম্ভব ; তবে "fools rush in where angles fear to tread." মেট্রোপলিটান সবেমাত্র তিনবৎসর পূর্ণ করিয়া চতুর্থ বৎসরে পড়িয়াছে ; তাহার কোনও ভ্যালুয়েশন তখনও পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ "কমার্শিয়াল গেজেট" নামক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাণ্ড এক প্রবন্ধ লিখিয়া মেট্রোপলিট্যানের কার্য্যপদ্ধতির নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করতঃ তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া লিখিয়াছিলেন যে মেট্রোপলিট্যানের যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে এই কোম্পানী বীমাকারীদিগের নিকট যে সকল পলিসি বিক্রয় করিয়াছে তাহার টাকা দিতে পারিবে না অতএব বীমাকারীগণ সাবধান। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমার্শিয়াল গেজেট মেট্রোপলিটানের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা নিজ মন-গড়া হিসাব ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া আগা-গোড়া বিরুদ্ধ সমালোচনায় পরিপূর্ণ ছিল। আমরা যথা সময়ে "কমার্শ্যাল গেজেটের" ভ্রম দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। মেট্রোপলিটানের কর্ত্তৃপক্ষও নীরব ছিলেন না। তাঁহারা "কমার্শ্যাল গেজেটের" বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণের এক মামলা করেন। ঐ মামলা হাইকোর্টে উত্থাপিত হইলে "কমার্শ্যাল গেজেটের" পক্ষ হইতে মেট্রোপলিটানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। মেট্রোপলিটানের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের চরিত্রগত উদারতার গুণে মামলা তুলিয়া লইয়াছেন। এই সূত্রে

"কমার্শ্যাল গেজেটে" যে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

COMMERCIAL GAZETTE

(VOL XX. NO 18)

Metropolitan Insurance.

We had published a review of the Metropolitan Insurance Company Limited on their working for the period ended 31st December, 1933 in the issue of our journal of the 12th September, 1934. We are sorry to say that we made some adverse remarks regarding the working of the Company and the results of its work We find from the facts before us that those remarks were based on misapprehension of facts and on miscalculation. We regret the publication of those remarks and are sorry if any harm was done, as no harm was really intended.

বঙ্গানুবাদঃ—আমরা আমাদের পত্রিকার ১৯৩৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় মেট্রোপলিটান ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর ১৯৩৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এই রিপোর্টে আমরা কোম্পানীর কার্য্য ও তাহার ফল সম্বন্ধে কতকগুলি বিরুদ্ধ সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করি। কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত ঘটনা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা হইতে বুঝিলাম, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্য অসত্য সংবাদ এবং ভ্রান্তগণনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত প্রকার মন্তব্য প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বিশেষ দুঃখিত। কোম্পানীর কোন ক্ষতি করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। সেইজন্য আমাদের প্রকাশিত মন্তব্যের দ্বারা যদি কোম্পানীর কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তাহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত আছি।

ডমিনিয়ন ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী

নিজেদের জ্ঞাতসারে ১৯৩১-৩৪ সালে মিথ্যা হিসাবপত্র (ব্যালেন্স সিট ও রেভিনিউ য়্যাকাউন্ট) দস্তখত ও দাখিল করার অপরাধে ডমিনিয়ান ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টর ইউ এন ব্যানার্জ্জি, এইচ এন রায় চৌধুরী ও জে এন্ ঘোষ এই তিনজনের প্রত্যেককে কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত ৮০০ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯১২ সালের ভারতীয় বীমা-আইনের ৩৫ ধারা অনুসারে চারি দফা অভিযোগ উপস্থাপিত হয়।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ

ঐ ধারা অনুসারে দুই দফা অভিযোগে উক্ত কোম্পানীর আর একজন ডিরেক্টার কেদারনাথ বসুর (১৯৩১-৩৪ সালের মিথ্যা হিসাব পত্র সম্পর্কে) ২০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় জাগরণের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। উহার ফলেই স্বদেশী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং দেশীয় শিল্পের তখনই পত্তন হয়। উক্ত স্বদেশী আন্দোলনের ফলস্বরূপই অপরাপর দেশীয় শিল্পের সঙ্গে ১৯১৩ সালে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়—এই প্রতিষ্ঠা ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বিখ্যাত ব্যবহারজীবি ও দেশসেবক মিঃ ডব্লু, জি, চিমূলকর। প্রথমাবস্থা হইতেই এই কোম্পানীকে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দ্বারা ভারাক্রান্ত হইতে হয় নাই এবং তাহার ফলেই কোম্পানী পলিসি হোল্ডারদের শতকরা ৯০ ভাগ লাভ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে ও অদূর ভবিষ্যতে ৯৫ ভাগ লাভ প্রদান করিবার আশা রাখে। কোম্পানীর অংশীদারগণ লাভের শতকরা ৫ ভাগ মাত্র পাইয়া থাকেন; ইহার দ্বারা বোঝা যায় কোম্পানী পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে কতটা সজাগ। এইরূপ পরিচালনার দরুণই কোম্পানী আ-জীবন বীমায় হাজার করা ২৫৲ টাকা ও মেয়াদী বীমায় হাজার করা ২০৲ টাকা লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে।

কোম্পানীর টাকা লগ্নীর প্রণালীও সম্পূর্ণ নিরাপদ। জীবন-বীমা তহবিলের ৮০ লক্ষ টাকাই গিল্ট্‌ এজ্‌ সিকিউরিটীতে লগ্নী আছে। কোম্পানীর লগ্নীকৃত সম্পত্তির আয়ও অপেক্ষাকৃত অধিক; কেননা, যে সমস্ত ব্যাপারে উহা লগ্নী আছে, বাজারে তাহাদের যথেষ্ট আর্থিক সুনাম বর্ত্তমান। লগ্নীকৃত সম্পত্তির নির্দ্ধারিত মূল্য (Book value) হইল ৭৭ লক্ষ টাকা, কিন্তু উহার চলতি মূল্য (Face value) হইল ৮৮ লক্ষ টাকা। এইজন্যই কোম্পানী উহা হইতে শতকরা ৫¾ ভাগ লাভ পাইয়া থাকে।

কোম্পানী অন্যায় প্রতিযোগীতা দ্বারা যে রকম ভাবেই হোক্ কাজ সংগ্রহের চেষ্টা করেন না, এইজন্যই মৃত্যুহার ও কোম্পানীর খরচের হার সামান্য। কোম্পানী সম্প্রতি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বোম্বাইতে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। কোম্পানীর পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত।

কোম্পানীর বাংলাদেশস্থ চীফ্‌ এজেন্সির ভার মেসার্স দাস রায় এণ্ড কোম্পানীর উপর ন্যস্ত আছে। বাংলাদেশে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার সাফল্যের প্রধান কৃতিত্ব দাস রায় কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসের; ইঁহারা সম্প্রতি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তাঁহাদিগের কাজকর্ম্ম এরূপ প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহারা ২নং লায়ন্সরেঞ্জ হইতে তাঁহাদের আফিস ৩০শে মে তারিখে ২১নং ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটের গ্রস্‌ভেনর হাউজে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

ফরমুলা ও রিসিপি

বিনা ব্যাটারীতে ধাতু দ্রব্যকে গিল্টী করিবার উপায়।

বিশুদ্ধ স্বর্ণ—৫ ড্রাম।

বিশুদ্ধ তাম্র—১ ড্রাম

একোয়া রিজিয়া—১০ আঃ

তাম্র এবং রৌপ্যকে এই একোয়া রিজিয়াতে গলাইয়া ফেলিয়া তাহাতে খুব পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া সমস্ত সলুশনটাকে শোষণ করিয়া লইয়া সেই ন্যাকড়া বা বস্ত্রখণ্ডগুলিকে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর সেই বস্ত্রখণ্ডগুলিকে অগ্নিতে খুব সাবধানে দগ্ধ করিয়া ভস্মগুলিকে অতি যত্নে কাচের শিশিতে পুরিয়া রাখিতে হইবে। এই ভস্মে সুক্ষ্মভাবে স্বর্ণ মিশ্রিত আছে, সুতরাং এক কণা ভস্ম নষ্ট হওয়া উচিত নহে। তাহার পর যাহাকে গিল্টী করিতে হইবে, সেই জিনিষকে উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া এক খণ্ড বস্ত্রকে লবণাক্ত জলে ভিজাইয়া উপরোক্ত ভস্ম চূর্ণে স্পর্শ করিয়া জিনিষটীর উপর ঘর্ষণ করিলেই গিল্টী হইয়া যাইবে। এই গিল্টী ধরাইবার পরই Blood stone বার্নিসার দ্বারা ঘষিয়া বার্নিস করিতে হয় এইরূপ গিল্টী কিছু দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, তাম্র, রৌপ্য ও পিত্তলের যে জিনিসকে গিল্টী করিতে হইবে তাহাকে প্রথমে খুব পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করিয়া লইয়া তাহার পর উপরোক্ত ভস্ম চূর্ণ দ্বারা ঘষিতে হয়, তাহার পর একবার ক্ষণিকের জন্য অগ্নির তাপের উপর দিতে হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত সংমিশ্রনে যে কিঞ্চিৎ পারদ বিদ্যমান থাকে, তাহা অগ্নির উত্তাপে উড়িয়া যায়। তাহার পর জিনিসটাকে কড়া ব্রস দ্বারা ঘষিয়া প্রথমে ভিনিগার এবং জল মিশ্রিত সলুইসানে ডুবাইয়া তাহার পর শীতল জলে ধৌত করিয়া লইতে হয়।

আসল গোলাপ জল প্রস্তুত প্রণালী।

নিম্নলিখিত উপায়ে আসল গোলাপ জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ডামাস্ক বা শতদল গোলাপের শুষ্ক পত্র বা পাপড়ীগুলিকে একটা মাটির জারে খুব ঠাসিয়া ঠাসিয়া পুরিয়া তাহার মুখে সাধারণ লবণ এক স্তর দিয়া জারটার মুখ বন্ধ করিয়া একমাস কাল রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পর এই জার হইতে গোলাপের পাতা ৬ পাউণ্ড আন্দাজ বাহির করিয়া অন্য একটা মৃত্তিকার

হাড়ীতে দিয়া তাহাতে যথেষ্ট জল দিতে হইবে যেন অগ্নির উত্তাপে চড়াইলে পুড়িয়া না যায়। এখন হাড়ীটার মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইতে হইবে এবং যেরূপে মদ চোলাই হয়, সেইরূপে চোলাই করিয়া যখন ১ গ্যালন পরিস্রুত জল পাত্রান্তরে জমিবে তখন উৎকৃষ্ট গোলাপ জল হইবে।

বড় বড় ডাক্তারখানায় এক প্রকার প্রণালীতে গোলাপজল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও বলিতেছি। ইহার ৬ ড্রাম গোলাপী আতরকে এক ইম্পিরিয়াল পাইট খুব কড়া উষ্ণ রেকটিফায়েড্ স্পিরিটে দ্রব করিয়া ফেলুন; তাহার পর সেই রেক্টীফায়েড্ স্পিরিটটাকে কারবয় (Carboy) নামক পাত্রে ঢালিয়া দিন; এই পাত্রটাতে যেন ১২ গ্যালন জল ধরিতে পারে, এরূপ আয়তনের হওয়া উচিত। তাহার পর ইহাতে ১০ গ্যালন ডিস্টীল্ড ওয়াটার ঢালিয়া দিয়া ফারণহিটের ১৮০° হইতে ১৮৫° ডিগ্রি উত্তাপ দিয়া পাত্রের মুখ আল্গা করিয়া ছিপি-বন্ধ করিয়া ক্রমাগত আলোড়িত করিয়া যখন শীতল হইবে, তখন ইহাতে সদ্য প্রস্ফুটিত কতকগুলি গোলাপ ফুল ফেলিয়া দিয়া দুই চারি ফোঁটা অয়েল ভিট্রিয়াল বা সল্ফিউরিক অ্যাসিড দিয়া পাত্রের মুখে টাইট্ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং স্থানান্তরে রাখিয়া দিতে হইবে। কয়েক দিনের মধ্যেই এই জল সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ গন্ধে সুবাসিত হইয়া যাইবে এবং এই কৃত্রিম গোলাপ জলের গন্ধ সহজে যাইবে না। তবে ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে করা সহজ সাধ্য কিনা বলিতে পারি না।

কৃত্রিম গোলাপজল প্রস্তুত।

গোলাপী আতর
বা ভাল অটোডি রোজ—১৫ ফোঁটা
কার্ব্বোনেট অফ পটাস—১ ড্রাম
ডিস্‌টীল্‌ড ওয়াটার— ১ পাইট

প্রথমে অটোডি রোজটাকে কার্ব্বোনেট পটাসে ময়দা মাখার মত ভাল করিয়া মাখাইতে হইবে, তাহার পর ইহাতে ১ পাইট ডিস্‌টীল্‌ড ওয়াটার ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া ফিল্‌টারিং ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

ফিল্টার করিবার প্রণালী

একটা মুখ চওড়া কাচের বোতলের মুখে কাচের ফনেল, যাহাকে কারীগরেরা ফুন্দীল বলে, তাহা দিয়া তাহাতে গোলাকার ফিল্‌টারিং ব্লটীং কাগজ দিয়া যে জিনিসকে ফিলটার করিতে হইবে, তাহা ঢালিয়া দিবে; তখন দেখিবে, ঐ ফুন্দিল দিয়া টোপ্ টোপ্ পরিস্কৃত জলীয় অংশ বোতলের ভিতরে যাইতেছে। ইহাই ফিল্‌টারিং করিবার প্রণালী। সমস্ত মাল মসলা বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। আজকাল বাজারে যে সুলভ গোলাপ জল বিক্রয় হয়, তাহা প্রায়ই এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত। গোলাপ জল যে সকল কার্য্যে ব্যবহার করা হয়, ইহাও সেই সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডিস্টীলড্ ওয়াটার দ্বারা প্রস্তুত এবং আসল চোলাই করা গোলাপ জলের গুণের বড় বিশেষ তারতম্য হয় না। অধিক মূল্যে বিক্রয় করণার্থ গোলাপ প্রস্তুত করিতে হইলে অটোডি-রোজের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে।

সুবাসিত ধূপ প্রস্তুত প্রণালী

এই ফরমূলানুযায়ী ধূপ প্রস্তুত করিলে তাহা মহা সুগন্ধযুক্ত হয় এবং পূজা পার্ব্বন ও সভা

সমিতিতে জ্বালাইলে সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়।

শ্বেতসাদা ধূপ	৵১ সের	৵॥০ সের
গুগ্গুল	৵০ ছটাক	২ ছটাক
রুমীমুস্তফী	৵০ ,,	২ ,,
লোবান্	৵০ ,,	২ ,,
শ্বেত চন্দনের গুঁড়া	৶০ ,,	৵০ ,,
দারচিনি	২ ,,	একখাঁচ্ছা
বিড়ঙ্গ	৵০ ,,	২ ,,
লাক্ষা	৵০ ,,	২ ,,

কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত প্রণালী

রাবারের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে এরূপ একটি জিনিস তৈরী করিবার জন্য বহুকাল পূর্ব্বে চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই চেষ্টা সফলও হইয়াছে। অষ্টিন্ জি ডে নামক একব্যক্তি শত শত প্রকারের পরীক্ষার দ্বারা রাবারের গুণ-সম্পন্ন অনেক জিনিস তৈয়ারী ও পেটেন্ট করেন। তন্মধ্যে কেরাইট্ (Kerite) নামক জিনিসটিই বাজারে খুব চলতি হয়। ১৮৬৬ সালে তিনি তাঁহার কতকগুলি পরীক্ষার ফল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। নিম্নে তাহার প্রধান কয়েকটি দেওয়া হইল ;—

(১) লিন্সিড্ বা তিসির তৈল	২ পাউণ্ড
তুলার বীজ তৈল	১ ,,
পেট্রোলিয়াম	২ ,,
কাঁচা তার্পিণ তৈল	২ ,,
গন্ধক	২ ,,

এই মশলাগুলি একত্র মিশাইয়া ২ ঘণ্টা যাবৎ অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লউন।

(২) লিন্সিড্ বা তিসির তৈল	২ পাউণ্ড
তুলার বীজ তৈল	১ ,,
পেট্রোলিয়াম	১ ,,
কাঁচা তার্পিণ তৈল	২ ,,
রেড়ির তৈল	১ ,,
গন্ধক	২ ,,

এই মশলা গুলিকে মিশাইয়া অগ্নির উত্তাপে আধঘণ্টা কাল ফুটাইয়া লউন।

(৩) তুলার বীজ তৈল	১৪ পাউণ্ড
তিসির তৈল	১৪ ,,
য়্যাসফাল্টাম্	৮ ,,
আলকাত্রা	৮ ,,
গন্ধক	১০ ,,
কর্পূর	অর্দ্ধ ,,

এই মশলা গুলির মধ্যে প্রথমে আলকাত্রা ও য়্যাস্ফাল্টাম্ লইয়া তুলা বীজ তৈলের সহিত মিশ্রিত করুন। তারপর উহার সহিত তিসির তৈল ও কর্পূর মিশান। সর্ব্বশেষে গন্ধক মিশাইবেন। এই সময়ে উহার উত্তাপ ২৭০° ডিগ্রী ফারেনহীট্ হওয়া দরকার।

বেয়ারিং-এর জন্য হোয়াইট্ মেটেল

কল কব্জার বেয়ারিং যাহাতে শীঘ্র ক্ষয় না যায়, সেইজন্য উহা হোয়াইট্ মেটেল নামক এক প্রকার মিশ্র ধাতুতে নির্ম্মিত হয়। নিম্নে এই হোয়াইট্ মেটেল তৈয়ারীর কয়েকটী ফরমূলা দেওয়া গেল ;—

(১) জার্ম্মাণ ;—(হাল্কা চল্তি মেশিনের জন্য)

টিন	৮৫ ভাগ
য়্যান্টিমনি	১০ ,,
তামা	৫ ,,

(২) জার্ম্মাণ (ভারী চল্তি মেশিনের জন্য)

টিন	৯০ ভাগ
য়্যান্টিমনি	৮ ,,
তামা	২ ,,

(৩) ইংলিস্ (ভারী চল্তি মেশিনের জন্য)

টিন	১৭·৪৭ ভাগ
দস্তা	৭৬·১৪ ,,
তামা	৫.৬২ ,,

(৪) ইংলিস্ (মাঝামাঝি চল্তি মেশিনের জন্য)

টিন	৭৬·৭০ ভাগ
য়্যান্টিমনি	১৫·৫০ ,,
তামা	৭·৮০ ,,
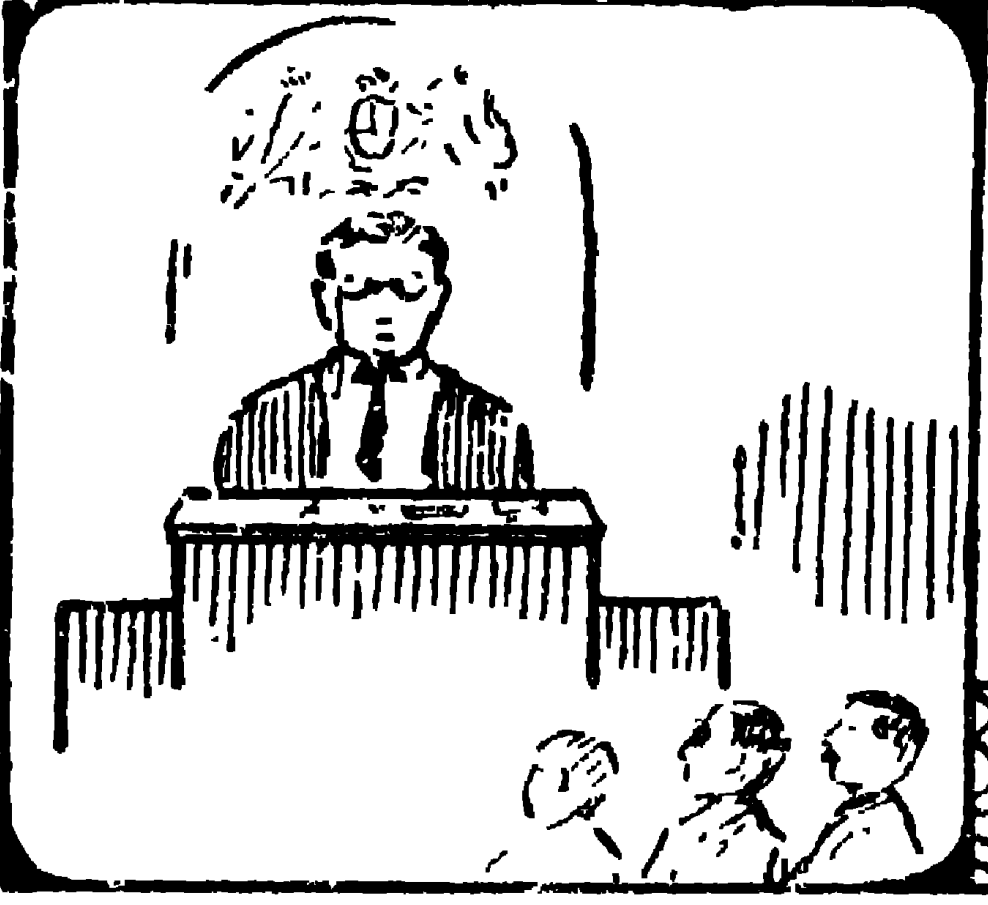
মামলা মোকদ্দমা

মাখন সাহা নামক এক ব্যক্তি মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়ান জেনারেল এ্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর নিকট হইতে ৫০০০ টাকার জীবন বীমা করিয়া পলিসি লইয়াছিল। কিছুকাল পরে জগদীশ সাহা, বিশ্বনাথ সাহা এবং আর এক ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া মাখন সাহা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে জগদীশ সাহারও মৃত্যু ঘটে। ফলে, জগদীশের সর্ত্তের মালিক বিশ্বনাথ ও আর এক ব্যক্তি হয়। বীমাকারীর মৃত্যুর সংবাদ ও প্রমাণ যথাসময়ে কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছিল। পলিসির টাকা দাবী করিলে কোম্পানী তাহা দিতে অস্বীকৃত হয়। তখন ব্যাপারটী আদালতে যায়। বিশ্বনাথ মামলায় বাদী হইতে সম্মত হয় না। অগত্যা ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটী বাদী হইয়া মামলা রুজু করে। টাকা না দিবার কারণ দেখাইয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হয়, যে বীমাকারীর মৃত্যু হইবার বহু পূর্ব্বেই জীবন বীমা পত্র যথা সময়ে বীমার প্রদত্ত চাঁদার টাকা না দেওয়ায় বাতিল হইয়া যায়। প্রিমিয়ামের টাকা মাসের প্রথম তারিখে দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এবং ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়। এই ১৫ দিন অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে প্রিমিয়ামের টাকা না দেওয়া হইলে বীমা পত্রের সমস্ত সর্ত্ত বাতিল হইয়া যাইবে এবং বীমাকারীর প্রদত্ত সমুদয় চাঁদা হিসাবে দেয় প্রিমিয়ামের টাকা কোম্পানী কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে। অতএব বর্ত্তমান পত্রে বাদীর টাকা দাবী করিবার কোনই ন্যায় সঙ্গত যুক্তি নাই। কলিকাতার হাইকোর্টের বিচারপতি ম্যাক্-নেয়ারের এজলাসে মামলার বিচার হয়।

বিচারপতি তাঁহার রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে মৃত বীমাকারী বরাবরই বীমার চাঁদার টাকা দেরীতে প্রদান করিয়াছে; চাঁদার টাকা দেরীতে প্রদান করিলে বীমাকারীর যে অনিষ্ট ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আইনতঃ কোম্পানী বাধ্য না থাকিলেও নৈতিক কর্ত্তব্য হিসাবে কোম্পানীর তাহা করা উচিত ছিল। বীমাপত্র প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে বীমাকারী একজন সাধারণ অবস্থার লোক। কোম্পানীর এজেণ্টগণ দুই দফায় বীমাকারীর নিকট হইতে ৫০০০৲ ও ৩১০০৲ টাকার বীমাপত্রের প্রস্তাব পত্র গ্রহণ করিয়াছে। এতগুলি টাকার বীমাপত্র যখনই বীমার চাঁদা যথাসময়ে না দেওয়ায় বাতিল হইয়া

যাইতেছে দেখা গেল তখনই কোম্পানীর উচিত ছিল যে বীমাকারীর চাঁদার টাকা যথা সময়ে না দেওয়ায় যে ক্ষতি হইতে পারে সে সম্বন্ধে বীমাকারীকে সাবধান করিয়া দেওয়া। কোম্পানী সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব নিকাশের বিবরণী কোর্টে দাখিল করা হয়। উক্ত বিবরণীতে দৃষ্ট হয় যে, কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত। কোম্পানীর অনুমোদিত (authorised) মূলধন ১০ লক্ষ টাকা ও অঙ্গীকৃত (subscribed) মূলধন ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এবং প্রদত্ত (paid-up) মূলধন ৬৯,০০০৲ হাজার টাকার উর্দ্ধে। এই টাকার অধিকাংশ কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করা আছে। ১৯৩৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত চল্‌তি বীমা পত্রের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকা এবং পরিশোধিত দাবীর পরিমাণ মাত্র ৫০০৲ টাকা। ঐ সালের ৪৬১, ৫০০৲ টাকার নূতন বীমা পত্র কোম্পানী প্রদান করিয়াছে। বিচারপতি উভয় পক্ষকে নিজ নিজ খরচা বহন করিবার আদেশ দিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন। বিচারপতি তাঁহার রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা দেখিয়া শুনিয়া কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে কোম্পানী বীমাকারীদের নিকট হইতে মোটা টাকা বীমার চাঁদা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দিবার বেলায় বেশী টাকা খুব কমই দিয়াছেন।

[২]

শিবচন্দ্র মোদক নামে এক ব্যক্তি পাবনা জেলার ভুঁইয়া গাঁতি গ্রামে হাতুড়ে ডাক্তারী করিত। সে গ্রাম্য ডাকঘরের পোষ্ট-মাষ্টারও ছিল। পুনশ্চ কলিকাতার জেনুইন্ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্টের কাজও সে করিত। শিবচন্দ্র ঐ জেনুইন্ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে অম্বিকা সুন্দরী দাসী নাম্নী এক মহিলার জীবন বীমা করাইয়া দেয়। মহিলাটির পৌত্র সুবল চন্দ্র দাস ঐ পলিসির এ্যাসাইনী হয়। এক বৎসর প্রিমিয়াম চলিবার পর কোম্পানীর নিকট সংবাদ যায় যে বীমাকারিণীর মৃত্যু হইয়াছে।

কোম্পানী দুই কিস্তিতে ৫৭৲ টাকা মণি অর্ডারে প্রেরণ করে। অভিযোগে প্রকাশ, সুবলের দ্বারা মনি অর্ডার স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া শিবচন্দ্র ঐ টাকা আত্মসাৎ করে। সুবল ও সুবলের পিতার মনে সন্দেহ হওয়ায় তাহারা উক্ত বীমাকোম্পানীর নিকট পত্র লেখে। বীমা কোম্পানী সকল ঘটনা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের উপর তদন্তের ভার দেন। পুলিশ এই মর্ম্মে রিপোর্ট দেয় যে, উক্ত মহিলা জীবিত আছেন, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। এ্যাসাইনী নাবালক। শিবচন্দ্র ধাপ্পা দিয়া ফর্ম্মে ও মনি অর্ডারে এ্যাসাইনীর স্বাক্ষর লইয়াছে। পুলিশের রিপোর্ট মূলে শিবচন্দ্রকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। শিবচন্দ্র বলে যে, গ্রাম্য ঝগড়ার ফলে তাহার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে। প্রতারণার অপরাধে সিরাজগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক শিবচন্দ্রের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ টাকা জরিমানা হয়।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে শিবচন্দ্র মোদক কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ বার্ট্‌লী ও মাননীয় বিচারপতি মিঃ খোন্দ-

কারের এজলাসে দরখাস্ত করে। বিচারপতিদ্বয় দণ্ড সম্পর্কে রুলজারী করিয়াছেন।

[৩]

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাইশগাঁও ইউনিয়ান বোর্ডের অধীন কোন গ্রামে সিরাজুল্লা নামক এক ব্যক্তি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ৪৫০০৲ টাকার জীবন-বীমা করে। বাইশগাঁও ইউনিয়ান বোর্ডের কেরাণী আবদুল হামিদ সেই বীমার প্রস্তাব পত্রে সাক্ষী হয়। দুইটি মাত্র প্রিমিয়াম পাইবার পর কলিকাতার হেড আফিসে হাফিজুল্লা নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ আসে যে, সিরাজুল্লার মৃত্যু হইয়াছে এবং সংবাদদাতা হাফিজুল্লা বীমাকারী সিরাজুল্লারই পিতা। কোম্পানী যথারীতি একখানি চেক্ দিয়া পলিসির দাবী শোধ করেন।

কিছুদিন পরে কোম্পানী কতকগুলি বেনামী চিঠিতে খবর পাইলেন যে ব্যাপারটা আগা গোড়া একটা ঠগ্-বাজী। অনুসন্ধানে জানা গেল হাফিজুল্লার পুত্র সিরাজুল্লা বলিয়া কোন লোকই ছিল না। বীমার প্রস্তাব পত্রের সাক্ষী আবদুল হামিদের ভ্রাতা আবদুল জব্বরের এক পুত্র সিরাজুল হক্। প্রস্তাব পত্রে সিরাজুল্লা বলিয়া নাম স্বাক্ষর করে। সিরাজুল হক এখন পলাতক।

যথা সময়ে কুমিল্লার সাব্ ডিভিসান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আবদুল হামিদ এবং অন্যান্য কয়েক জনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা উত্থাপিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে, বাস্তবিক সিরাজুল্লা নামে একজন লোক ছিল এবং যথার্থই তাহার মৃত্যু হইয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আবদুল হামিদের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০৲ জরিমানা হয়।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আবদুল হামিদ কলিকাতা হাইকোর্টে মিঃ জাষ্টিস্ জ্যাক এবং মিঃ জাষ্টিস্ খোন্দকারের এজলাসে দরখাস্ত করে। বিচারপতিগণ এই সম্পর্কে রুলজারী করিয়াছেন।

---

(৪)

বোম্বাইর জুপিটার ইন্‌স্যুরান্স্ কোম্পানীতে মিঃ পুরুষোত্তমদাস বিষ্ণুদাস তাঁহার পত্নীর জীবন-বীমা করাইয়া ছিলেন। এই কোম্পানী বণ্টন প্রথায় বীমার-কারবার করিয়া থাকে। পুরুষোত্তমদাসের পত্নী ১৯৩২ সালের জুন মাসে মারা যান। কিন্তু কোম্পানীর খাতাপত্রে দেখা যায় ঐ মৃত্যু পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে স্বীকৃত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুরুষোত্তম দাস এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে তিনি তাঁহার পত্নীর জীবন-বীমার দরুণ পলিসির দাবীর টাকা বণ্টন প্রথার প্রচলিত নিয়মানুসারে জুন মাস হইতে হিসাব করিয়া পাইবেন। কিন্তু কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে কোম্পানীর পরিবর্ত্তিত নূতন নিয়মানুসারে যে মাসে কোম্পানীর আফিসের খাতায় মৃত্যু স্বীকৃত ও লিপিবদ্ধ অর্থাৎ রেজেষ্টারী হইয়া থাকে সেই মাস হইতেই দাবীর টাকা হিসাব করা হয়। নিম্ন আদালতে কোম্পানী মামলায় হারিয়া যায় এবং আহমদাবাদের জজ্-আদালতে আপীল করে। কিন্তু আপীলেও কোম্পানীর পরাজয় হইয়াছে। বিচারক রায়ে এই মন্তব্য করেন যে কোম্পানী দাবীদারকে রীতিমত নোটিশ দিয়া পরিবর্ত্তনের বিষয় জানায় নাই,—দাবীদার বাস্তবিক এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের বিষয় যে জানিতেন, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আপীল ডিস্‌মিস্ করা গেল।

(৫)

মাদ্রাজের সেনগটিয়া নামক এক ব্যক্তি বেঙ্গল ইন্‌স্যুর‍্যান্স্ য়্যাণ্ড রিয়্যাল প্রপার্টি কোম্পানীতে ৫০০০ টাকার একটী মেয়াদী বীমা করেন। এই বীমার প্রস্তাব-পত্রে লিখিত ছিল যে, মেয়াদ অন্তে পলিসির টাকা সেন্‌গটিয়া স্বয়ং অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী বিলাইয়াম্মল পাইবেন। কিন্তু পলিসি-পত্রে এরূপ কিছু লেখা ছিল না; তবে ইহা লিখিত ছিল যে, বীমার প্রস্তাব-পত্র এবং বীমাকারীর উক্তি পত্র সমস্তই পলিসির অন্তর্গত এবং ঐ সকল কাগজপত্রকেও চুক্তি-নামার অংশ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

সেনগটিয়ার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা ঐ পলিসি খানাকে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি স্বরূপ দাবী করিয়া মামলা করে। কিন্তু সেনগটিয়ার বিধবা পত্নী বিলাইয়াম্মল তাহার দাবীর বিরোধিতা করিয়া মামলায় জয়লাভ করেন। এদিকে সেন্‌গটিয়ার একজন পাওনা-দার মামলায় ডিক্রী পাইয়া ঐ পলিসি ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে। নিম্ন আদালতে পাওনাদারের দরখাস্ত এই বলিয়া অগ্রাহ্য করা হয় যে, উক্ত পলিসি সম্পর্কে (বিবাহিতা নারীর সম্পত্তি বিষয়ক আইনের ৬ষ্ঠ ধারা অনুসারে) একটী ট্রাষ্ট গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সেন্‌গটিয়ার দেনার দরুণ উহা ক্রোক্ করা যাইতে পারে না।

নিম্ন আদালতের এই আদেশের বিরুদ্ধে পাওনাদার হাইকোর্টে আপীল করে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের ফুল-বেঞ্চ বিচারে নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল থাকে। সুতরাং পলিসির টাকা বিধবার পৃথক সম্পত্তিরূপেই গণ্য হয়। উহা স্বামীর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত না হওয়ায় পাওনাদার, উহার উপর ডিক্রীজারী করিতে অসমর্থ হয়।

(৬)

বোম্বাইর মাগনলাল ছোটলাল নামক এক ব্যক্তির একটা বড় মুদীখানার কারবার

মেসার্স কক্স্ য্যাণ্ড কিংস্ (ইন্সুর‍্যান্স্) লিমিটেডের নিকট অগ্নিবীমা করা ছিল। একদা মাগনলাল উক্ত কোম্পানীর আফিসে খবর দেয় যে তাহার মুদীখানা পুড়িয়া গিয়াছে এবং বীমার সর্ত্ত অনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা দাবী করে। কোম্পানীর তরফ হইতে ই ডব্লু ফ্লাওয়ার নামক একজন য্যাসেসারকে এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত এবং ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই ব্যক্তি মাগনলালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া অগ্নিকাণ্ড যথার্থ বলিয়া মিথ্যা রিপোর্ট এবং ক্ষতির পরিমাণের একটা হিসাব দেয়। কোম্পানী পুনশ্চ সন্দেহ বশে নিজ ম্যানেজার মিঃ রবিন্সনকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পাঠান। তখন সকল রহস্য প্রকাশ পাইল। অগ্নিকাণ্ড একেবারে মিথ্যা; সমস্তই মাগনলাল ও ফ্লাওয়ারের কারসাজী!

বোম্বাইয়ের চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে প্রত্যেক আসামীর ৯ মাস কারাদণ্ড

(৭)

হেমন্তকুমার দাস নামক এক ব্যক্তির পিতা য্যালায়্যান্স্ য্যাণ্ড ষ্টার্ট গাটার কোম্পানীতে জীবন-বীমা করিয়াছিলেন এবং প্রস্তাব পত্রে নিজের বয়স ৫৪ বৎসর লিখাইয়া ছিলেন। কোম্পানীর তরফ হইতে ঠিকুজী পরীক্ষা করিয়া ঐ বয়স স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। বীমাকারীর মৃত্যু হইলে হেমন্তকুমার দাস কোম্পানীর নিকট পলিসির দরুণ পাঁচ হাজার টাকা দাবী করেন। কোম্পানী যথাসময়ে টাকা না দেওয়ায় তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অরিজিন্যাল্ বিভাগের বিচারপতি লর্ট্ উইলিয়াম্সের এজলাসে অভিযোগ উপস্থিত করেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে বীমাকারীর যে ফাইলেরিয়া রোগ ছিল, প্রস্তাব পত্রে তাহা গোপন করা হইয়াছে এবং তাঁহার বয়স বাস্তবিক ৬৪ বৎসর ছিল,—৫৪ নহে। বিচারপতি মামলা ডিক্রী দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে কোম্পানী আপীল করেন। বিচারপতি কষ্টেলো এবং বিচারপতি প্যাংক্রিজের এজলাসে আপীলের বিচার হয়। ফলে আপীল খরচা সহ ডিস্মিস্ হইয়াছে। রায়ে এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে বীমাকারী তাঁহার পুত্রকে পলিসি 'এসাইন' করিয়া গিয়াছেন। যে বয়স কোম্পানী একবার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোম্পানী আর কোন সন্দেহজনক প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং কোম্পানীকে পলিসির দাবীর সমস্ত টাকা মামলার খরচা সমেত দাবীদার হেমন্তকুমার দাসকে দিতে হইবে।

(৮)

কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি ম্যানুফ্যাক্চারার্স লাইফ্ ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীতে জীবন-বীমা করিয়া ১৯৩৪ সালের ১২ই জুন একখানি পলিসি গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই ৩রা আগষ্ট কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মারা যান। অতঃপর তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী হরিদাসী দেবী উক্ত কোম্পানীর নিকট পলিসির দরুণ ১৮ হাজার টাকা দাবী করেন। কোম্পানী টাকা না দেওয়ায় শ্রীমতী হরিদাসী দেবী কলিকাতা হাইকোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগের বিচারপতি লর্ট্ উইলিয়াম্সের এজলাসে অভিযোগ উপস্থিত করেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে আপত্তি করা হয় যে, বীমাকারী

কোম্পানীর স্বাস্থ্য পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সত্য গোপন করা হইয়াছে। বিচারপতি তাহা অবিশ্বাস করিয়া মামলা ডিক্রী দেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে কোম্পানী বিচারপতি কষ্টেলো এবং বিচারপতি প্যাংক্রিজের এজলাসে আপীল করেন। এই বিচারপতিদ্বয় সাব্যস্ত করেন যে বাস্তবিকই বীমাকারী স্বাস্থ্য পরীক্ষকের নিকট সত্য গোপন করিয়াছে। তদনুসারে তাঁহারা খরচা সহ আপীল মঞ্জুর করিয়াছেন।

বাংলাদেশের চটকল ও পাট ব্যবসায়ের অবস্থা

(শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্ সি)

পৃথিবী-ব্যাপী আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের পাটের ব্যবসায়ে একটা নিদারুণ আঘাত লাগে। বিদেশে পাটের ও পাট নির্ম্মিত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় পাটের দর একেবারে পড়িয়া যায়। চটকলের গুদামে মাল জমিয়া উঠে এবং তাহার ফলে পাট নির্ম্মিত দ্রব্য,—হেসিয়ান, চট প্রভৃতির মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এমন অবস্থায় পাটের দর পুনরায় যাহাতে উঠে, সেই উদ্দেশ্যে একদিকে কৃষকদের মধ্যে পাটের চাষ কমাইবার আন্দোলন আরম্ভ হইল; অন্যদিকে চটকলের মালিকেরা কম সময় ব্যাপিয়া কল চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয় লইয়া চটকলের মালিকদের মধ্যে মতভেদ হয়। ইতিমধ্যে আর এক সমস্যা পাকাইয়া উঠে। স্কট্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডাণ্ডী সহরের পাট-শিল্প বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী। সেখানকার কলের মালিকদের স্বার্থের সহিত ভারতস্থিত ব্রিটিশ পরিচালিত চটকল সমূহের খুব নিকট সম্বন্ধ। ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে ভারতীয় চটকল সমূহের তৈয়ারী দ্রব্য সস্তায় বিক্রয় হয় বলিয়া ডাণ্ডীর চটকলের মালিকেরা চিন্তিত হইয়া উঠেন। এমন কি ভারতীয় চটকলের সহিত প্রতিযোগিতায় ডাণ্ডীর চটকল অনেক স্থলে হারিয়া যায়। সেইজন্য ডাণ্ডীর চটকলের মালিকেরা তাঁহাদের ভারতীয় চটকলের বন্ধুগণকে উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে অনুরোধ করেন। সুতরাং ভারতবর্ষে যে সকল বৃটিশ চটকল আছে, তাহার মালিকেরা দুই কারণেই কম সময় ব্যাপিয়া কল চালাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভারতীয় চটকলের মালিকদের স্বার্থের সহিত ডাণ্ডী জুটমিলের স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, পরন্তু বিরোধিতাই আছে। সুতরাং তাহারা কম সময় ব্যাপিয়া কল চালাইতে রাজী হইলেন না।

ভারতবর্ষে মোট ৮২টী চটকলে হেসিয়ান চট প্রভৃতি পাট নির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহাদের মোট তাঁতের সংখ্যা ৬৬০০০। এই ৮২টী চটকলের ৭১ টী বাংলাদেশে অবস্থিত। ইহাদের তাঁতের সংখ্যা ৬৩০০০। বাংলাদেশের এই ৭১টী চটকলের মধ্যে ৫৭ টী ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ য়্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের তাঁতের সংখ্যা ৫৭০০০। অবশিষ্ট ১৪টী (তাঁতের সংখ্যা ৬০০০) উক্ত য়্যাসোসিয়েশনে যোগদান করে নাই। যে ১১টী চটকল বাংলার বাহিরে, তাহাদের তাঁতের সংখ্যা ৩০০০।

যে সকল চট্‌কল এসোসিয়েশানের সদস্য-ভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কল চালাইতে সম্মত হন। ইহাদের মধ্যে পুনশ্চ কয়েকটি চট্‌কলের মালিক এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। অবশেষে ইহা স্থির হয় যে কম সময় কল চালাইয়া যে ক্ষতি হইবে, তাহা তাঁতের সংখ্যা বাড়াইয়া পরিপূরণ করা যাইতে পারে। তদনুসারে ১৯৩৬ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখ হইতে তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতে থাকে। এইরূপে এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত ৫৭টী চট্‌কলের তাঁত সংখ্যা ৫৬৮৭২ হইতে ৫৭৩১৩ হয়। যে সকল চট্‌কল এসোসিয়েশানের সদস্যভুক্ত নহে, তাহার মালিকগণ দুই অথবা তিন সিফ্‌টে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার বেশী কল চালাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহাদের তাঁতের সংখ্যা মোট প্রায় ৯০০০।

১৯৩৪-৩৭ সালে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আন্দাজ করা হইয়াছিল (গভর্ণমেণ্ট এষ্টিমেট্) তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা এক পক্ষে ভালই দেখা যায়, কারণ সেই সময়ে পৃথিবী ব্যাপী বাণিজ্যের একটা পুনরুত্থান ঘটে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। পুনশ্চ ১৯৩৬ সালের ৩রা আগষ্ট হইতে এসোসিয়েশানের সদস্যভুক্ত চট্‌কলের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়। ক্রমশঃ দেখা যায়, কাঁচা পাট ও পাট নির্ম্মিত দ্রব্য উভয়েরই রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে। ১৯৩৪ সাল হইতে এই রপ্তানীর একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল,—

	কাঁচা পাট	পাট শিল্প-দ্রব্য	মোট
সাল	টন	টন	টন
১৯৩৪	৭২১০০০	৬৬৯০০০	১৩৯০০০০
১৯৩৫	৭৯০০০	৭৫২০০০	১৫২৭০০০
১৯৩৬	৭৬৮০০০	৯১২০০০	১৬৮০০০০
১৯৩৭	৮৩০০০০	১০৩১০০০	১৮৬১০০০

১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতা বন্দর হইতে হেঁসিয়ান রপ্তানীর পরিমাণ বেশ সন্তোষ জনকই ছিল; তাহার পর রপ্তানী কিছু কমিতে আরম্ভ করে। তথাপি মোটের উপর ১৯৩৬ সাল অপেক্ষা ১৯৩৭ সালে ১০ কোটি গজ অধিক হেঁসিয়ান, রপ্তানী হইয়াছে। উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ সালে সমগ্র রপ্তানীর অর্দ্ধেকেরও বেশী ছিল কাঁচা পাট। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে পাট নির্ম্মিত দ্রব্যের পরিমাণই ছিল অধিক,—মোট রপ্তানীর শতকরা ৫৫ ভাগ। গত বৎসরে (১৯৩৭) ভারতীয় চট্‌কল-সমূহে যে পরিমাণ মাল তৈয়ারী হইয়াছিল তাহার শতকরা ২০ ভাগ ভারতেই ব্যবহার হইয়াছে। নিম্নে গত চারি বৎসরের ভারতীয় জুটমিলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হইল;—

সাল	টন
১৯৩৪	৯৩২০০০
১৯৩৫	৯৯১০০০
১৯৩৬	১১৮৩০০০
১৯৩৭	১২৭১০০০

১৯৩৭ সালের প্রথম ভাগে যদি চট্‌কলের মজুরদের ধর্ম্মঘট না হইত, তবে ঐ বৎসরে উৎপাদন আরও বেশী হইত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমস্ত চট্‌কলে একমাসে যে পরিমাণ মাল উৎপাদন করে, ধর্ম্মঘটের দ্বারা সেই পরিমাণ মাল কম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে রপ্তানীর

পরিমাণ কিছু কমিয়া যাওয়ায় এবং চট্‌কলের উৎপাদনের পরিমাণ কিছু বাড়্‌তি থাকায় কলিকাতার গুদামে হেঁসিয়ানের ষ্টক্ বাড়িয়া উঠিয়াছে। নিম্নের তালিকায় ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গত চারি বৎসরের ষ্টকের হিসাব দেওয়া হইল। ইহাতে এসোসিয়েশানের সদস্যভুক্ত ৫৭টী মিলের এবং বাহিরের ৪টী মিলের হিসাব ধরা আছে।

দ্রব্যের নাম	১৯৩৪ লক্ষ গজ	১৯৩৫ লক্ষ গজ	১৯৩৬ লক্ষ গজ	১৯৩৭ লক্ষ গজ
হেঁসিয়ান	৬৩৩	৪৫৭	৯২৫	১৮৫৯
চট্	৭৫০	১০৩৭	৮২২	৮১০
মোট	১৩৮৩	১৪০৪	১৭৭৭	২৬৬৯

পাট-শিল্প দ্রব্যের ষ্টক্ এইরূপে বাড়িয়া যাওয়াতে চট্‌কলের মালিকেরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ ঐ বাড়্‌তির পরিমাণ এখনও চলিতেছে, কারণ একদিকে য়্যাসোসিয়াশনের সদস্যভুক্ত চট্‌কলের মালিকেরা যদিও সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কল চালাইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা তাঁতের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। অন্যদিকে য়্যাসোসিয়ানের বহির্ভূত চট্‌কলের মালিকেরা দুই অথবা তিন সিফ্‌টে কল চালাইতেছেন। তাহার ফলে ঐ সকল মিলে প্রকৃতপক্ষে সপ্তাহে ১০৮ ঘণ্টা, কোন কোন স্থলে ১৬২ঘণ্টা কাজ হইতেছে। সমগ্র ভারত-বর্ষে ১৯৩৬ সালের ৩১ শে মার্চ্চের পর হইতে পাট নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য হেঁসিয়ান ও চটের ষ্টক্ কিরূপ প্রবলভাবে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা হিসাব করিলে বিশেষ চিন্তিত হইতে হয়। নিম্নে ইহার একটা তালিকা দেওয়া গেল ;—

১৯৩৬ সালের ৩১ শে মার্চ্চ		
	হেঁসিয়ান	৬৩০০২৮৩৬ গজ
	চট্	৯৮০৯৪৭৩৯ গজ
	মোট	১৬১০৯৭৫৭৫ গজ

১৯৩৭ সালের ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে এই ষ্টকের পরিমাণ শতকরা ২৮ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ উহার পরিমাণ বাড়ে শতকরা ৩৩৯। ১৯৩৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল ষ্টকের হিসাব এই ;—

হেঁসিয়ান	৩৯৭২৫৮২৯৪ গজ
চট্	১৩৪১১২৭১৮ ,,
মোট	৫৩১৩৭১০১২ গজ

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত চট্‌কলে ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল। তাহা না হইলে এই ষ্টকের পরিমাণ আরও ভীষণরূপে বেশী হইয়া উঠিত। সুতরাং দেখাযায় ধর্ম্মঘট কারীরা পরোক্ষে চট্‌কলের মালিকদের উপকারই করিয়াছে।

এইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় চট্‌কলের মালিকেরা একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতে-ছেননা। ব্রিটিশ মূলধনীদের টাকায় যে সকল চট্‌কল ভারতে চলিতেছে, তাহার কর্ত্তারা ভারতী জুটমিল ওয়ালাদের মুখ চাহিয়া চলেন। ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয়দের পরিচালনায় নূতন চটকল স্থাপিত হউক ইহা তাঁহাদের একান্ত অনিচ্ছা। ভারতীয় চট্‌কলগুলি হইয়াছে তাঁহাদের চক্ষুশূল। সুতরাং একদিকে ভারতীয় চটকল এবং অন্য-দিকে বিদেশী চটকল এই দুইয়ের মধ্যে বাধিয়াছে বিরোধ। আবার ছোট চটকল ও বড় চটকলের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে। এইসকল কারণে চটকলের মালিকদের মধ্যে একটা মিটমাট ও ঐকমত্য কিছুতেই হইতেছে না। ইণ্ডিয়ান জুটমিল্‌স্ য়্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান্ মিঃ বার্ণ এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং একটা খসড়া মীমাংসা পত্র তৈয়ারীও হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

ভারতীয় লবণ শিল্পের আসন্ন সঙ্কট

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী লবণের উপর ১৯৩১ সালে মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল কিন্তু এডেন (Aden) হইতে আমদানী লবণের উপর শুল্ক চাপান হয় নাই; কারণ এডেন তখন বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল। এইরূপ রক্ষণ শুল্ক বসাইবার ফলে ভারতের বাজার হইতে লিভারপুলের এবং অন্যান্য বিদেশী লবণ একেবারে উঠিয়া যাইবার দাখিল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ভারতীয় লবণ শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যায় নাই। কারণ এডেনের লবণ ভারতবর্ষে বরাবরই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তদুপরি বিদেশী লবণের আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং এডেনের লবণের উপর শুল্ক না বসাতে, ঐ লবণ ভারতের বাজার আরও ভালরূপে দখল করিয়া লইল। সুতরাং ভারতীয় লবণ শিল্প প্রতিযোগীতায় ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। রক্ষণ শুল্কের পরিমাণ বৎসর বৎসর কমিয়া ১৯৩৬ সাল হইতে মণ প্রতি ছয় পয়সাতে নামিয়াছে। এই কারণে প্রতিযোগীতার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশকেই বিদেশী লবণের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। এত কঠোর প্রতিযোগীতা এবং বাধাবিঘ্ন সত্বেও বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় লবণ হইতে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় মোট লবণের শতকরা ৪৫ ভাগ পাওয়া যায়। ইহা কম আশার কথা নহে। ভারতীয় লবণ শিল্পের এই শৈশবাবস্থায় এতদূর সফলতা শিল্প ব্যবসায়ীদের পক্ষেও প্রশংসার বিষয়। বাংলাদেশের অবশিষ্ট ৫৫ ভাগ লবণ এডেন হইতে আসে। রক্ষণ শুল্কের সুযোগে বাংলাদেশে এডেনের লবণ গত সাত বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ আমদানী হইয়াছে।

১৯৩১ সালের পর হইতে ভারতীয় লবণ শিল্পের কারখানাসমূহ আশাতীত উন্নতি করিয়াছে। এমন একদিন আসিতে পারে যখন বাংলাদেশকে আর এডেনের লবণের উপর নির্ভর করিতে হইবে না, একথা ট্যারিফ বোর্ডের সদস্যগণ অথবা ভারত গভর্ণমেণ্ট কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতীয় লবণ শিল্প যদি দশ বৎসর পর্য্যন্ত মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা হিসাবে (বিদেশী লবণের উপর) রক্ষণ শুল্কের সাহায্য পায় তবে, বাংলাদেশ শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের লবণের চাহিদা মিটাইতে পারিবে।

এডেন আর ভারত গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত নহে। এক্ষণে উহা একটি ক্রাউন কলোনী

(Crown Colony) অর্থাৎ সম্রাটের অধীনস্থ উপনিবেশ বলিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এডেনের লবণ কারখানার মালিকগণ জমির খাজনা বাবদ বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে টাকা দিতেন, এবং ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স বাবদেও ভারত গভর্ণমেণ্টকে টাকা দিতেন। এখন আর সেসব কিছুই দেন না। সুতরাং পূর্ব্বে যে কারণে এডেনের লবণ শিল্পকে রক্ষণ শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে আর সেই কারণ নাই। এক্ষণে আর ভারতের সহিত এডেনের স্বার্থ জড়িত নহে, এডেনের লবণ মালিকেরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহারা এখন নানা উপায়ে ভারতীয় বাজারের দখলটী বজায় রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সংবাদ পত্রে এডেনের ভেষ্টেড্ ইণ্টারেষ্টের (Vested Interest) কথা খুব জোর কলমে লেখা হইতেছে। অর্থাৎ এডেনের লবণ শিল্পে ইংরাজ জনসাধারণের বহু টাকা মূলধন নিয়োজিত আছে, সেই স্বার্থকে রক্ষা করিতে হইবে। এডেনের লবণ কারখানার মালিকগণ এখন খুব সস্তা দামে লবণ ভারতবর্ষে পাঠাইতেছেন;—সেই দামে মাল পাঠাইবার জাহাজ ভাড়া পর্য্যন্তও পোষায় না। তাঁহারা জানেন, এখন কিছু ক্ষতি হইলেও অবিলম্বে যখন তাঁহারা বাজার দখল করিয়া বসিবেন, তখন সেই ক্ষতি সুদ শুদ্ধ কড়ায় গণ্ডায় পরিপূরণ হইয়া যাইবে। তাঁহারা ভারতীয় জনসাধারণকে এই বলিয়া ফুস্‌লাইতেছেন যে, এডেনের লবণের উপর রক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হইলে ভারতীয় লবণের দাম চড়িয়া যাইবে, সুতরাং তাহাতে জন-সাধারণেরই অমঙ্গল। কিন্তু এই "পয়োমুখ বিষ কুম্ভদের" কথায় ভারতবাসী ভুলিবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের লবণের মূল্যের তুলনা করিলে দেখা যাইবে বাস্তবিক রক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হইলে, ভারতীয় লবণের মূল্য বৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে রক্ষণ শুল্ক বসান হইলে ভারতীয় লবণের মূল্য প্রতি ১০০ মণ ৫৭ টাকার বেশী হয় না। ১৮৬০ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই ৭০ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে বিনা শুল্কে বিদেশী লবণ আমদানী হইয়াছে। তখন বাংলাদেশ কিরূপ উচ্চমূল্যে লবণ কিনিয়াছে তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। সেই তুলনায় দেখা যাইবে, রক্ষণশুল্কের সময়েই ভারতীয় লবণের মূল্য কম হইয়াছে।

যত বৎসরের জন্য	প্রতি ১০০ মণের মূল্য
৫	৪০ টাকা হইতে ৫০ টাকা
১৭	৫০ ,, ,, ৬০ ,,
১৪	৬০ ,, ,, ৭০ ,,
৮	৭০ ,, ,, ৮০ ,,
৫	৮০ ,, ,, ৯০ ,,
৬	৯০ ,, ,, ১০০ ,,
১১	১০০ ,, ,, ২০০ ,,
২	২০০ ,, ,, ৩০০ ,,
১	৩০০ ,, ,, ৪০০ ,,
১	৪০০ টাকার উপর
৭০ বৎসর	

উপরোক্ত তালিকা হইতে গড় মূল্য বাহির করিলে দেখা যায় এই ৭০ বৎসরের মধ্যে লবণের মূল্য প্রতি ১০০ মণ ৮০ টাকা হইয়াছে ১৯০৩ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরের মধ্যে এডেনের লবণ বাংলার বাজার দখল

করিয়া বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে লিবারপুল ও অন্যান্য বিদেশীয় লবণও বাংলাদেশে খুব আমদানী হইতে থাকে। সেই ৩০ বৎসরে মূল্য গড়ে দাঁড়াইয়াছে প্রতি ১০০ মণ ৯২ টাকা। ইহার মধ্যে কেবল মাত্র একবৎসর (১৯১৩সালে) বাংলাদেশের লোকেরা প্রতি ১০০ মণ লবণ ৫৭ টাকায় কিনিতে পারিয়াছিল। ১৯১৩ সাল হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে এডেনের লবণ কারখানার মালিকেরা বাংলাদেশে লবণ বিক্রয় করিয়া প্রায় ২০ কোটী টাকা লাভ করিয়াছে। সেই বিপুল লাভের টাকার সামান্য অংশমাত্র ব্যয় করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এডেনের লবণ কারখানার মালিকেরা এত সস্তাদরে লবণ দিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু তাহারা একবার বাজার দখল করিয়া বসিলে, এবং ভারতীয় লবণ-শিল্পকে বিনষ্ট করিতে পারিলে আবার দাম চড়াইয়া দিবে। সুতরাং জন সাধারণের সুবিধার দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় রক্ষণ-শুল্কের ফলে ভারতীয় লবণের মূল্য বৃদ্ধির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। পরন্তু ঐ রক্ষণশুল্কের দ্বারাই এডেনের লবণ ও অন্যান্য বিদেশী লবণকে বাংলার বাজার হইতে দূর করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে ব্যবসা বাণিজ্যে যাহাদের vested interest বা স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে তাহারা তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য না করিতেছে এবং না করিতে পারে এমন কাজ নাই। আইন সভার সভ্যদিগকে হাত করিয়া ইহারা তাহাদের স্বার্থানুকূলে আইন পাশ করাইয়া লয় এবং তাহার ফলে যে সুবিধা অর্জ্জন করে তাহাদ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়া লয়।

এক একটা ব্যবসায়ের উপর ডিউটী বসাইলে অথবা তুলিয়া লইলে যখন লাখ লাখ টাকা লাভ করার উপায় করা যায় তখন এই সকল বণিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য যে দুই এক লাখ টাকা খরচ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এইজন্য প্রায়ই দেখাযায় রক্ষণশুল্ক বসানো অথবা তুলিয়া দিবার জন্য দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভার যখনই কোনও অধিবেশন হয় তখনই এই সকল স্বার্থপর লোক আইন সভার সভ্য-দিগের নিকট Canvans করিতে সুরু করে এবং সীলেক্ট কমিটি বসিলে সেখানে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহা আর বিবরিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—"বুঝ যে জান সন্ধান"।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের বাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

(শ্রীমতী শৈলবালা শূর

বন্দীপুর

বোঝার ওপর শাকের আঁটী।

*

দাদাও কানা
আমি ও চোখে দেখিনে।

দাদা বড় হাউড়ে (লোভী)
পাতাতা কাটতে গেছে
আমাকে চারটা মাটীতেই দেও।

*

এক মাঘে শীত যায় না।

*

ভদ্রলোকের এক কথা।

*

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে
সীতা রামের পিসি।

*

রাবনে হরিল সীতা [illegible]
কেঁদে মোলো দুর্য্যোধ[illegible]

*

লাভে লোহা বয়
বিনা লাভে তুলাও বয়না।

*

যত হাসি তত কান্না
বলে গেছে রাম শর্ম্মা।

*

রাম বড় না রহিম বড়।

*

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে
বাধাল জঞ্জাল সে
এঁড়ে গরু কিনে।

*

সীতার মত সতী নাই
রামের মত রাজা নাই।

*

যার ভাতারে করে হেলা
তারে রাখালে মারে ঠেলা।

*

দশ পুত্র সম কন্যা
যদি পাত্র বুঝে পড়ে।

*

স্বাতী নক্ষত্রের জল
পাত্র বিশেষে ফল।

*

দই আছে খৈ দাও।

*

মামার বাড়ীর আবদার।

*

মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর।

*

গলা নেই গান গায়
মাগ নেই [illegible] যায়।

*

সোণার ওপর মীনার কাজ।

*

ধন চেয়ে মান বড়।

*

ফলেন পরিচীয়তে।

*

সব ফাঁকি জুকি,
ষোল আনাই কাণা।

*

যত বড় মুখ নয়
তত বড় কথা।

*

গতস্য শোচনা নাস্তি।

*

তিলে তাল করা।

*

ছুঁই চুরি ক'রলে
কুড়ুল হারায়।

*

আয়নায় মুখ যেমন দেখাবে
তেমনি দেখতে হবে।

*

সোণা চিরদিন খাটীই থাকে।

*

যে বেশী কথা কয়
সে বড় বাচাল।

*

কাহারো সর্ব্বনাশ
কাহারো পৌষ মাস।

*

যার যত আয়
তার তত ব্যয়।

*

দুঃখ করলেই সুখ মেলে।

*

যদি থাকে জন
লাঙ্গে আনে ধন।

*

পশুপালন

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার

কৃষি কার্য্যের জন্য, গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি আবশ্যক। এদেশে, চাষ আবাদে, সাধারণতঃ গরু এবং মহিষ ব্যবহৃত হয়। ঐ কার্য্যে ইউরোপে অশ্ব ব্যবহৃত হয় এবং আমেরিকায় মোটোর-ট্র্যাক্টার প্রভৃতি কলে চালিত যন্ত্র সকল অধিকাংশ বড় কৃষি ফারমে (farm) ব্যবহৃত হয়। অশ্ব, গো, মহিষ দ্বারা গভীর কূপ হইতে শস্য ক্ষেত্রের জলোত্তলন এবং শকট বহন ও ভার বহন কার্য্য চলে। শেষোক্ত কার্য্যে গাধাও ব্যবহৃত হয়।

কৃষির আনুসঙ্গিক, অন্যান্য পশুপালনও লাভজনক। মাংসাশী ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে খাদ্যের জন্যও পশু পালন করা হয়। অনেক পশুর দুগ্ধ মনুষ্যের পুষ্টিকর খাদ্য ও রোগীর পথ্য। পশুর মলমূত্র, অস্থি ইত্যাদি দ্বারা অনেক সার হয়; তাহাদের বৎস বিক্রয়ও লাভজনক। পাহারা কার্য্যের জন্য কুকুর রাখাও আবশ্যক।

সর্ব্বোচ্চ মূল্যের পশু সকল

সুপরিচিত, বংশানুক্রম-কুলজী-বিশিষ্ট, গো, অশ্ব, মেষ ইত্যাদি পালন করতঃ বিদেশীয়দের নিকট বিক্রয় করিয়া-লাভজনক ব্যবসায় পরিচালনের জন্য, ইংল্যাণ্ড অনেক দিন হইতে বিখ্যাত। এই উৎকৃষ্ট জাতীয় পশুগুলির বংশাবলীর কুলজী রাখা হয়। তজ্জন্য তাহাদিগকে ইংরাজীতে "পিডিগ্রী" পশু (Pedigree cattle and sheep) বলে। আরব দেশেও অশ্বের বংশাবলীর কুলজী রাখায় বহুকাল হইতে তথাকার অশ্ব উৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত।

নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌সের যে বিস্ময়কর মেষটি একবার ছাঁটায় ৪৫॥ পাউণ্ড (1 lb = প্রায় আধ সের) ওজনের "উল্" (wool = লোম) প্রদান করে তাহার পূর্ব্ব পুরুষ বিলাতী জাতের। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার গভর্ণমেণ্ট, ইংল্যাণ্ডের শূকর পালকদের (breeders of pigs) নিকট হইতে ২৫০টী "পিডিগ্রী" শূকর খরিদ করেন।

লর্ড উইন্টন নামক একটি হেয়ারফোর্ড শায়ার (Hereford shire) জাতীয় ষাঁড় ৩৮০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড = ১৫৲) মূল্যে এবং তৃতীয় রুথ্ ব্লসম্" (Routh Blossom III) নামের একটি বকনা বাছুর ১৭৮৫ পাউণ্ড মূল্যে একজন আমেরিকাবাসী খরিদ করেন। একটি "ব্রিটিশ ফ্রিজিয়ান্ গাভী" (British Friessian Cow-- জার্ম্মাণ সাগরের ফ্রিজিয়ান দ্বীপের গাভী জাতীয় একটি বিলাতী গাভী) দৈনিক ১০ গ্যালন্ (১ গ্যালন = ৩ সের) দুগ্ধ দিত; তাহা ৩৬৭৫ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়। [illegible] নগরের পশু প্রদর্শনীতে এক ভেড়া এক [illegible] গিনি মূল্যে (১ গিনি = ১৬ টাকা) বিক্রয় [illegible] আর্জেন্টীনে (Argentine) প্রেরিত হয়।

পৃথিবীর সকল দেশের লোকই ঘোড়-দৌড়ের অশ্ব (Race-Horse) ইংল্যাণ্ড হইতে অত্যধিক মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া যায়। "সীলি"

(Cyllene) নামক অশ্বটি ৩১৫০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়া আর্জেন্টীনে প্রেরিত হয়। "ফ্লাইং ফক্স" (Flying Fox) নামক অশ্বটি ৩৭৫০০ পাউণ্ড মূল্যে একজন ফরাসী খরিদ করেন। "দি হোয়াইট্ নাইট" (The White Knight) ৪০ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ৬ লক্ষ টাকা) মূল্যে অন্য একজন বিদেশীয় খরিদদার খরিদ করেন।

একটি "পোলো পনী" (Polo Pony) ৭০০ গিনি মূল্যে, একটি "ট্যামওয়ার্থ" শূকর ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে এবং একটি শশক ১০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

ভারত, কৃষি প্রধান দেশ; তজ্জন্য কৃষিকার্য্যের সহায় গো, মহিষাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের সংখ্যা যেমন ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে তাহাদের শক্তি সামর্থ্যও তেমনি লোপ পাইতে বসিয়াছে। ভারত গভর্ণমেন্টের প্রকাশিত বিবরণীতে, ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে, সমগ্র ভারতে, গৃহপালিত গো-মহিষাদি পশু সংখ্যা, ১৪ কোটী ৭০ লক্ষ থাকা প্রকাশ; কিন্তু ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে, ঐ সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৩ কোটী ৫০ লক্ষ হয়। ইহাতে ভারত-বাসীদের প্রতি একশতে ৫৯টি পশু থাকা বুঝা

যায়। কিন্তু ঐ হিসাবে, ঐ সংখ্যা, ডেনমার্কে ৭৪, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৭১, কানাডায় ৮০, কেপ্ কলোনীতে ১২০, নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় ১৫০। গো—জাতির অবনতি ভারতের দারিদ্র্য ও মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ।

নানা কারণে, এদেশে, এই সকল পশুর সংখ্যা হ্রাস ও অবনতি হইতেছে।

১। গোচারণ স্থান সকল আবাদী জমিতে পরিণত হওয়া।

২। পশু খাদ্য ফসল আবাদ না করা।

৩। নানা প্রকার মারাত্মক সংক্রামক রোগের পশু-মড়কে রীতিমত চিকিৎসা না করা।

৪। কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত পশুগুলিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করান ও তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যত্ন গ্রহণ না করা।

৫। উৎকৃষ্ট জাতীয়, ষাঁড় ও উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী পালনে অবহেলা।

৬। প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটীর অধিক গো-হত্যা।

কমলার প্রিয় সন্তান মাড়োয়ারিগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইলেও জৈন ধর্ম্মের দীক্ষায় "জীবে দয়া" তাঁহাদের আচরণে যথেষ্ট প্রকাশ পায়। ইঁহারা নিরামিষ ভোজী; এবং রুগ্ন, বৃদ্ধ, কি অকর্ম্মণ্য পশুদের (গো-মহিষের) জন্য ইঁহাদের স্থাপিত পিঞ্জিরা পোল্ * (পশু চিকিৎসার হস্‌পিটাল) ও গো-রক্ষিনী সভা সমিতি অনেক স্থানে আছে।

মুক্তেশ্বর নামক স্থানে গভর্ণমেণ্টের যে "ইম্পিরিয়াল্ ব্যাকটিরিওলজিক্যাল্ লেবরেটারী" (Imperial Bacteriological Laboratory) আছে তথায় ১৯২২ সালের মার্চ্চ হইতে পশু চিকিৎসা ও পশু জাতির উন্নতি কল্পে নানা প্রকার গবেষণা চলিতেছে। তথায়, "রিণ্ডার পেষ্ট" (Rinder pest), রোগ প্রতিষেধক টীকার "সিরাম্" (Serum), গো-জাতির নানা প্রকার মারাত্মক সংক্রামক পীড়ার প্রতিষেধক "সিরাম্" ও "ভ্যাকসিন্" (Vaccine—গো-বীজ) "ব্ল্যাক্ ওয়াটার ভ্যাকসিন্" (Black water vaccine—রক্ত প্রস্রাব জ্বরের গো-বীজ), "এন্থ্রাক্স সিরাম্" (Anthrakx Serum), "টিউবার কিউলিন্" (Tuberculine) ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

গো-মহিষ-ছাগ ইত্যাদির উন্নতির জন্য, ভিন্ন দেশ হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় পুং ও স্ত্রী পশু আনিয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করা, তাহাদের খাদ্যের জন্য ঘাসের ও ফসলের আবাদ করা, এবং বৎসকে প্রচুর দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। এখন উদ্ভিদের সঙ্কর উৎপাদনের ন্যায়, গবাদিরও সঙ্কর উৎপাদন করা হয়। এক প্রকার ডাঁসের দংশনে, পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, গো, অশ্ব, ভেড়া, ছাগ প্রভৃতি মরিয়া যাইত। ঐরূপ [illegible] দংশনে মরে না এরূপ এক জাতীয় গরু জ[illegible]ছে। ঐরূপ গরু ও পুরাতন জাতীয় শৃঙ্গহ[illegible] সংযোগে এক প্রকার শৃঙ্গহীন গরু উদ্ভব হইয়াছে।

* কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সৈদপুর (ই, বি, আর) ষ্টেশনের নিকটে একটি বড় এবং ঐ লাইনের কুষ্টিয়া কোর্ট ষ্টেশনের নিকট ছোট একটি "পিঞ্জিরাপোল্" আছে। প্রত্যেক পশুর জন্য অল্প কিছু প্রবেশ ফী দিলেই ঐরূপ পশু অনেকেই তথায় প্রেরণ করিতে পারেন এবং তাহা কসাইর নিকট বিক্রয় করণের অকৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতার পাপ হইতে সহজে রক্ষা পাইতে পারেন।

এস্থলে ইহাও মনে রাখা উচিত, যদিও বিলাতী গরুর সঙ্গে সঙ্কর উৎপাদন করিলে, অধিক দুগ্ধবতী গাভী জন্মে, তথাপি ঐরূপ উৎপন্ন গাভী সহসা রোগাক্রান্ত ও অল্প কষ্টসহিষ্ণু হয়; কিন্তু, দেশীয় গরু অধিক কষ্টসহিষ্ণু এবং সহসা রোগাক্রান্ত হয়না। দেশীয় উৎকৃষ্ট ষাঁড় ও উৎকৃষ্ট জাতের গাভীর সংযোগে বৎস জন্মানই ভাল।

ভাল ষাঁড়ের লক্ষণ, পায়ের খুর কাল, গোল ও অল্প ফাঁক যুক্ত; চক্ষু, কালবর্ণ ও উজ্জ্বল; কপাল, খাড়া; গ্রীবার উপরের মাংসপেশী স্থূল ও তাহার উপরিভাগ প্রশস্ত, এবং গ্রীবা নত করিলে একটি নিম্নস্থানের ন্যায় দেখাইবে, অন্যরূপ গ্রীবা হইলে তাহা দুর্বলতার লক্ষণ। বক্ষঃস্থল প্রশস্ত; লেজ সরু, গাত্রের বর্ণ ধূসর। শুভ্রবর্ণ লেজের চামর, কাল হওয়া, স্কন্ধদেশ ও দেহের পশ্চাৎভাগ অপেক্ষা সম্মুখের ভাগ অধিকতর বড় হওয়া আবশ্যক। ষণ্ড ও গাভী, উভয়ই অধিক আহারকারী হওয়া ভাল।

(৪) অর্থাভাব বশতঃ অনেক কৃষকেরই, অধিক মূল্য দিয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় গো-মহিষ খরিদ করা ঘটে না। সুতরাং গো-মহিষের উন্নতি সাধনার্থ উৎকৃষ্ট জাতীয় গো মহিষাদি পালন করা আবশ্যক। খর্ব্বকায়, দুর্ব্বল, রুগ্ন পশুর দ্বারা অধিক কাজ পাওয়া যায় না; পশুগুলি অল্পদিনের [illegible] মরিয়া যায় এবং তাহাতে [illegible] হয়। তজ্জন্য, তাহাদিগকে [illegible] পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় [illegible] পরিশ্রমের পর বিশ্রাম দেওয়া, রোগ হইলে চিকিৎসা করা, রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম ও শীত হইতে রক্ষা করণ, তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা, এবং মশা, মাছি, ডাঁশ, আটালু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে রক্ষা করণ কর্ত্তব্য। এবং তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার ও খাদ্য সংস্থান করাও আবশ্যক নচেৎ তাহাদের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য এবং এই অবস্থা chronic হইয়া পড়িবার জন্যই এদেশের গৃহপালিত পশু নিস্তেজ, নির্জ্জীব এবং লয়ের পথে চলিয়াছে।

গরুর দাঁত

দন্ত পরীক্ষা দ্বারা গরুর বয়স নির্ণয় করা যায়। নিম্নের মাড়ীতে ৮টী ছেদন আছে; উপরের মাড়িতে কোনও দন্ত নাই; আড়াই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধ-দন্ত থাকে; আড়াই ও তিন বৎসর বয়স মধ্যে, মধ্যের এক জোড়া দুধের দাঁত পড়িয়া যায় ও তাহার স্থানে এক জোড়া স্থায়ী দাঁত উঠে। তিন হইতে সাড়ে তিন বৎসর বয়স মধ্যে দ্বিতীয় এক জোড়া দুগ্ধ-দন্ত পড়িয়া যাইয়া নূতন আর এক জোড়া স্থায়ী দন্ত উঠে এবং পঞ্চম বৎসরের শেষে ছয় বৎসর বয়সে তৃতীয় জোড়া দুগ্ধ-দন্ত পড়িয়া তাহার স্থানে নূতন আর এক জোড়া স্থায়ী দন্ত উঠে। তখন সমস্তগুলি স্থায়ী দন্ত উঠা শেষ হয়। ঐ ছয়টি দন্ত উঠার পর তাহাদের দুই প্রান্তে দুইটী দন্ত অল্প কিছু উঠে। ঐ আটটি দন্ত সমান উচ্চ হইলে গরু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তাহার পর দুই তিন বৎসর ব্যাপিয়া মধ্যের দুইটি দন্তের অগ্রভাগ ক্ষয় পায়। তৎপর, ক্রমশঃ মধ্যের ৪টি, ৬টী, ৮টী দাঁতের অগ্রভাগ ক্ষয় পায়। তাহার ৪।৫ বৎসর পর গরু মরিয়া যায়। যত্ন করিলে গরু ২০।২১ বৎসর বাঁচে। ষাঁড় ও গাভী অপেক্ষা বলদ অধিক দিন বাঁচে। ৬ বৎসর বয়সের পর, শৃঙ্গের বৃত্তাকার চিহ্ন দেখিয়া বয়স

স্থির করিতে হয়; কিন্তু বয়স স্থির করণে ইহার উপরও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। গাভীর শৃঙ্গের বৃত্তাকার চিহ্নের সংখ্যা তাহার সন্তান প্রসবের সংখ্যার নিদর্শন।

মুষ্কচ্ছেদন।

ষাঁড়কে ৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ও ৬ বৎসর বয়সের পর জনন কার্য্যে নিয়োজিত করিবে না। আড়াই বৎসর বয়সের এঁড়ে বাছুরের শীতকালে মুষ্কচ্ছেদন করিবে। অণ্ড কোষের বীচি বাহির না করিয়া "কেণ্ডলস্ ইমাস্কুলেটার" (Kendall's Emasculator — কেণ্ডলের উদ্ভাবিত পুরুষত্বহীন কারক যন্ত্র) যন্ত্রের সাহায্যে "স্পার্ম্মাটিক কর্ড" (Spermatic cord - যে বাঁধা নিঃসারক শিরাগুচ্ছ বা পৈশিক রজ্জু দ্বারা অণ্ডকোষ ঝুলান থাকে) ও রক্তবহা নাড়ী পেষিয়া দিলেই ভাল হয়। মুষ্কের ক্ষতস্থানে ২০ ভাগ উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে ১ ভাগ কার্ব্বলিক্ এ্যাসিড্ মিশাইয়া প্রত্যহ মালিশ করিতে হইবে। মুষ্কচ্ছেদন ও শৃঙ্গ উঠা বন্ধ করণে পশু শান্ত প্রকৃতির হয়। শৈশব হইতে আদর যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইলেও ঐরূপ হয়।

শৃঙ্গ উঠা বন্ধ করণ (Dehorning)।

শৈশবে শিং উঠার সূচনায় সেই স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ লোম কাটিয়া, সেখানে কয়েক ফোঁটা এ্যামোনিয়া মিশ্রিত জল দ্বারা ভিজাইবে; তাহা হইলে, তাহাতে যে কষ্টিক্ পটাশ্ প্রয়োগ করা যায় তাহা শৃঙ্গের গায় লাগিয়া থাকে। কষ্টিক পটাশের এক প্রান্ত কিছু সময় জল মধ্যে রাখিয়া তাহা নরম করিয়া নরম প্রান্ত শৃঙ্গের উপর ঘষিতে হইবে; এইরূপ ৭।৮ বার করিবে। তৎপরে শৃঙ্গের উপর একখণ্ড খোসাবৎ পদার্থ জন্মিবে।

বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের গরু বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। প্রতি বৎসর কাশীর মেলা ও হরিহর ছত্রের মেলা হইতে, বঙ্গদেশে বহু সংখ্যক গরু আমদানী হয়।

ক্রমশঃ

প্রশ্নাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। [illegible]াহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, [illegible]থচ বিনামূল্যে [illegible]বাদ পাইতে ইচ্ছা [illegible]য়িসা লাভ হয়। তাঁহাদের [illegible] **একটি হরিতকিও [illegible]ক্ষণা দিব না,— কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** ব্যবসায়ের সন্ধান দিবার এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য

৫।৶০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,"—ন্যাও,—থ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-সুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে এবং পোষ্টেজ না পাঠাইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি,—**আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ১৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি [illegible] **আজকাল** [illegible] হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁ[illegible] চাকরী বড় আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে** [illegible] তাসিং-**পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু **গ্রাহকের নাম এবং নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

শ্রীযুত 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

আমাদের এখানে "বাব্‌লা ছাল" পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত জিনিষের কিরূপ মূল্য তাহা জানি না। যদি অনুগ্রহ করিয়া উহার দাম ও ব্যবসা সম্বন্ধে সুযোগ সুবিধা লিখিয়া জানাইতে পারেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব। আমিও আপনার উল্লিখিত ট্যানারিতে উক্ত বিষয়ে সংবাদ লইবার জন্য পত্র লিখিয়াছি। প্রদত্ত ৩টী ঠিকানার মধ্যে কোন্‌টীতে ব্যবসা করিলে সুবিধা হইতে পারে? উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্যক্‌রূপে জানাইয়া আমার কাজের সহায়তা করিয়া দিলে অত্যন্ত উপকৃত ও বাধিত হইব।

আপনার গ্রাহক
শ্রীনবকুমার অধিকারী
গ্রাম খাঞ্জীপুর, পোঃ গোপমহল
জেঃ মেদিনীপুর
গ্রাহক নং ৫৯৭৬

১নং পত্রের উত্তর

বাবলার ছাল চামড়া কসাইবার জন্য ট্যানারীতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আপনি আমাদের উল্লিখিত ঠিকানা অনুসারে [illegible] সকল ট্যানারীতে পত্র লিখিয়াছেন, [illegible]হাদের নিকট [illegible] নিশ্চয়ই পাইবেন, [illegible] মধ্যে কোন্‌টী ভাল, [illegible] লেখালেখি না করিলে অথবা [illegible] আসিয়া সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা না বা[illegible] কিরূপে বুঝিবেন? আমরা "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে আপনার বাবলার ছালের বিষয় প্রকাশ করিলাম। ব্যবসায়ীরা আপনার সহিত সরাসরি পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

আমাদের নাম করিয়া রায় বাহাদুর বি, এম, দাস এম্‌-এ (Leeds) Superintendent, Govt. Tanning Institute, পাগ্‌লা ডাঙ্গা, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন এবং আপনার মাল কোথায় কাটিতে পারে তাঁহার ঠিকানার জন্যও লিখিবেন। মিঃ দাসকে সম্প্রতি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাঞ্জাবের ট্যানারীর উন্নতি সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে এবিষয়ে মিঃ দাসের তুল্য লোক আর নাই। আপনি বাবলার ছালের গুঁড়ার এবং আস্ত ছালের নমুনা সহ এখানে আসিলে আমি মিঃ দাসের নিকট আপনাকে পাঠাইয়া এই ব্যবসায়ের সম্বন্ধে সৎপরামর্শ এবং সকল সংবাদ যাহাতে আপনি পান তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। বাবলার ছাল কিন্তু গুঁড়া অবস্থায় ছাড়া বিক্রয় হয় না। উহা শুকাইয়া ঢেঁকিতে গুঁড়া করিতে হয়। পাঞ্জাবে বাবলার ছাল গুঁড়াইবার জন্য বড় বড় কারখানা আছে। সেখানে Disintegrating machine দ্বারা বাবলার ছাল গুঁড়া করা হয়। যে জিনিষ যে অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয় সে অবস্থায় প্রস্তুত করা চাই নচেৎ কেহ লইবে না।

২নং পত্র

শ্রীযুত 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' মাসিক পাঠ করিয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করি জানিবেন।

পত্রোত্তরে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সবিশেষ জানাইয়া সুখী করিবেন।

১। ধান কলের সঠিক মূল্য কি; Fanning machine-এর মূল্য কি? উহা চালাইয়া চাউল প্রস্তুত করিতে কত Power crude oil Engine লাগিবে ইত্যাদি বিষয় সবিশেষ জানাইবেন। কত মণ চাউল কত ঘণ্টায় প্রস্তুত হইবে জানাইবেন।

২। গুলি সূতার কল কত টাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে জানাইবেন। অন্যান্যের তুলনায় এই গুলি সূতা Fine হইবে কিনা এবং Singer machine-এ চলিবে কিনা, সূতা কোথায় কি ভাবে পাইব তাহাও জানাইবেন। গুলি সূতা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইলে কোথায় চালান দিব ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে জানাইবেন।

৩। ভারতবর্ষে তৈলের মিল বলিতে কয়টী Limited concern আছে এবং কে কি Dividend দিয়াছে ও Established কোন্ সনে তাহাও সবিশেষ জানাইবেন।

৪। যে কোন প্রকারের তৈলের গাদ কলিকাতায় কি দরে বিক্রী হয় এবং কে ক্রয় করে সবিশেষ জানাইবেন। ইতি—

শ্রীশচীন্দ্র কুমার বসু
৯নং রাজার দেউড়ী, ঢাকা

২নং পত্রের উত্তর

১। ধান কল ও ফ্যানিং মেসিন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে জানিতে পারিবেন। কলের মূল্য আকৃতি ও মেকার (Maker) অনুসারে নানা রকম হইয়া থাকে। কত শক্তির ইঞ্জিন দরকার এবং কত ঘণ্টায় কত মণ চাউল হয়, সমস্তই কলের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। ঠিকানা এই ;—

(1) A. S. Abdullabhoy & Co., 81, Clive Street Calcutta. (2) Bery Bros. 15, Clive Street, Calcutta. (3) International Trading Co., 13, Clive Street, Calcutta. (4) Marshal Sons & Co.. (India) Ltd. 99, Clive Street, Calcutta.

২। আমাদের গুলি সূতার কলের মূল্য ৮০ টাকা। এই কলে সূতা কাটা হয় না,—সূতার গুলি পাকান হয়। সিঙ্গারের মেশিনে সেলাই করিবার জন্য Alexander-এর সূতার ন্যায় সূতার গুলি, বিড়ি বাঁধবার সূতা ইত্যাদি যাবতীয় সূতার গুলি প্রস্তুত হয়। যেরূপ ফেটী কিনিবেন সূতার গুলিও ঠিক সেইরূপ সরু, মোটা, শক্ত বা নরম হইবে। সুতরাং সূতা ফাইন হইবে কিনা এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। কলিকাতা বড়বাজারে সূতা পট্টি হইতে সরু, মোটা, রঙ্গীন যেমন ইচ্ছা সূতা কিনিয়া গুলি পাকান যায়।

৩। বিখ্যাত শেয়ার ব্রোকার Place Siddons & Gough কর্ত্তৃক প্রকাশি[illegible] Investor's Gu[illegible] পুস্তকে তৈলে[illegible] কলের সমস্ত বিব[illegible] অসংখ্য লিমিটেড্ কোম্প[illegible] মূলধন, ডিভিডেণ্ডের হার প্রভৃতি [illegible] বিষয় প্রকাশিত হয়। আপনি স[illegible] কলের বিবরণ চাহিয়াছেন, তা[illegible] পাঠাইতে গেলে ছোট খাটো এক খানি বই হইয়া যায়। কোনও বিশেষ বিশেষ কলের কথা জানিতে

চাহিলে তাহা জানানো যায়। যাহা হউক Royal Exchange Place, Calcutta. এই ঠিকানায় উক্ত শেয়ার ব্রোকারের ফাবমে চিঠি লিখিয়া পুস্তক খানি আনাইয়া দেখিবেন। পুস্তক খানির মূল্য ১০ টাকা।

৪। তেলের গাদ কোথায়ও বিক্রয় হয় না। উহাতে ধুলো বালি ময়লা ছাড়া আর কিছুই নাই। সরিষার ওজন বাড়াইবার জন্য ব্যবসায়ীরা তাহাতে ধুলো বালি মিশায়। তৈলের কলের মালিকগণ সরিষার সেই ধুলো ঝাড়িয়া ঘানিতে দেয় না। কারণ ধুলা মিশ্রিত সরিষা কিনিয়া ধুলা ঝাড়িয়া বিক্রয় করিলে ব্যবসা চলে না। কাজেই কলে যে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহার তলায় ঐ ধুলা বালির ময়লা গাদ স্বরূপ জমে। স্থতরাং সেই গাদের কোন মূল্য থাকিতে পারে না। খইল বিক্রয় হইয়া থাকে। কারণ উহা হইতে পুনরায় এক্স্‌পেলারের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ তৈল বাহির করা যায়। কলের ঘানিতে সরিষা পিষাই হইলে উহা হইতে সমস্ত তৈল বাহির হয় না। কাঠের ঘানি অধিক চাপ দিয়া চালাইতে গেলে ফাটিয়া যায়। লোহার ঘানিতেও ইঞ্জিনের শক্তির একটা সীমা থাকে, তার বেশী চাপ দেওয়া অসম্ভব। স্থতরাং কলের ঘানিতে [illegible] পাওয়া যায়, তাহা [illegible] হির করিবার জন্য এক্স্‌- [illegible] সাহায্য লইতে হয়। এই যন্ত্র [illegible] ত হইয়াছে। এই তৈল বাহির [illegible] তবে উহা জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিবার যোগ্য হয়। স্থতরাং সরিষার খৈইল ছাড়া তেলের গাদ কেহ কেনে না, অবশ্য যাহারা ভেজাল দিতে চায় তাহারা কিনিতে পারে।

খইলের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণও তৈল থাকিলে উহা জমিতে সাররূপে ব্যবহার করা যায় না।

---
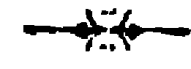
৩ নং পত্র

সবিনয় নিবেদন মিদং

মহাশয়,

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে নিম্ন ঠিকানায়, রসা এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস অথবা অন্য কোন কোম্পানীর রাইস হালার ও ইলেক্‌ট্রিক্‌ মোটর প্রভৃতির একখানি ক্যাটালগ ও মূল্য তালিকা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদন ইতি
শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী
রাণীগঞ্জ রোড্‌, বাঁকুড়া

৩ নং পত্রের উত্তর

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে আপনার প্রার্থিত ক্যাটালগ পাইবেন,—(1) T. E. Thomson & Co Ltd. 9, Esplanade, Calcutta. (2) Oriental machinery Supplying Agency Ltd. 20, Lalbazar Street, Calcutta. (3) Bery Bros. 15, Clive Street, Calcutta. (4) Balmer Lawrie & Co, Ltd. 103, Clive Street, Calcutta.

কৃষি তত্ত্বের কথা

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ হইতে মোট ৪২৫৬৪৪ গাঁইট পাট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৫মণ হিসাবে) বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪১৬৫১৭ গাঁইট কলিকাতা হইতে এবং ১১১২৭ গাঁইট চট্টগাম বন্দর হইতে চালান যায়। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে মোট রপ্তানী হইয়াছিল ৪৮৩৭৯৫ গাঁইট এবং ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে রপ্তানী হইয়াছিল ৩২৯২৩৫ গাঁইট্।

১৯৩৬—৩৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১৯৬ কোটী টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৫—৩৬ সালের তুলনায় ইহা ৩৬ কোটী টাকা অধিক এবং ১৯৩২-—৩৩ সালের তুলনায় ইহা ৬৪কোটী টাকা অধিক। ১৯২৮--২৯সালের তুলনায় ১৯৩৬—৩৭ সালের রপ্তানীর পরিমাণ ১৩৪ টাকা কম। রপ্তানী পণ্যের মূল্য হ্রাসই ইহার কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৩৬—৩৭ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৬ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৬ সালে অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে ১৭২৫৬০০০ বিঘা জমিতে আউশ ধান্যের চাষ হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের সেই অক্টোবর মাসে ১৭৫৬৫০০০ বিঘা জমিতে আউশ ধান্যের চাষ হয়। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি হওয়ায় মে মাসে কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে অনাবৃষ্টির দরুণ বপন কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। জুন ও জুলাই মাসে অল্প বৃষ্টিপাতহেতু উচ্চজমির ফসলের কিছু ক্ষতি হয়। বাখরগঞ্জ ও অন্যান্য কয়েকটী জেলাতে কীটের উপদ্রবে কিছু ফসল নষ্ট হয়। মোটের উপর জলবায়ুর অবস্থা নিম্নভূমির শস্যের পক্ষে অনুকূল ছিল।

১৯৩৬ সালে বাংলাদেশে ৪৬৪৬১০০০ বিঘা জমিতে আমন ধান্যের চাষ হইয়া ছিল। ১৯৩৭ সালে ৪৭৩৯৭০০০ বিঘা [illegible] ধান্যের চাষ হয়। অনেক জেলায় [illegible] বড় ভাবে বৃষ্টিপাত এবং জুন ও জুলা[illegible] অনাবৃষ্টি হয়। তৎপর আগষ্ট ও [illegible] মাসের প্রথম ভাগে বৃষ্টি হওয়াতে পুনঃ [illegible]নের সুবিধা ঘটে। চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জ জেলায়

অতিবৃষ্টির দরুণ ফসলের ক্ষতি এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের দরুণ ফসলের প্রাচুর্য্য হয়। সমগ্র বাংলায় এই আমন ধান্যের ফসল শতকরা ৮৬ ভাগ নর্ম্ম্যাল অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণে হয়।

চা-রপ্তানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ভারতবর্ষ, সিংহল এবং নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া (অর্থাৎ হল্যাণ্ডের অধিকৃত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ), এই তিনটী দেশের মধ্যে যে পাঁচ বৎসরী চুক্তি হইয়াছিল, ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য নূতন চুক্তি হইয়াছে। তদনুসারে কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ চা-রপ্তানী হইবে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল,—

ভারতবর্ষ (সমুদ্রপথে)	৩৭৭১৪১৮৮৫ পাউণ্ড
,, (স্থলপথে)	৫৪৫২৮৯৪ ,,
সিংহল	২৫১৫২২৬১৭ ,,
নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া	১৭৩৫৯৭০০০ ,,
মোট	৮০৭৭১৪৩৯৬ পাউণ্ড

মধ্যপ্রদেশে সিন্দি বৃক্ষের রস হইতে জ্যাগারি (Jaggery) নামক একপ্রকার গুড় তৈয়ারী হয়। ঐ গুড় হইতে মদ্য প্রস্তুত করা যায় বলিয়া উহার জন্য লাইসেন্স্ লইতে হইত। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে ওয়ার্দ্ধা জেলার এরণ্ডগাঁও নামক গ্রামে ঐ গুড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট উহার লাইসেন্স্ তুলিয়া লইয়াছেন।

আবাদী ও অনাবাদী জমি

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংখ্যা ও ভূমির পরিমাণ নিম্নের তালিকায় দেখান হইল ;—

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	ভূমির পরিমাণ	কষিত ভূমি	প্রতিজনের প্রাপ্তব্য জমি	প্রতিজনের প্রাপ্ত জমি
		বিঘা	বিঘা	বিঘা	বিঘা
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৫৫,০৭,৭২৩	২৫,৩৭,৯৯,৯২০	৭,৬৭,২৭,৫৫৩	১৭·৭	৪·১৯
বোম্বাই	২,১৮,৫৪,৮৪১	২৯,৩৬,৩৮,৯২৮	৯,৮৬,৭৭,৯২০	১৩·৯	৪·১
পাঞ্জাব	২,৩৫,৮০,৮৫৩	২০,৩৩,১৮,৭০	৮,০৭,১৭,৬৪৪	৪·১২	৩·৪
মাদ্রাজ	৪,২৫,৭৫,৬৭০	২৯,৬১,৫৯,৬০০	১০,৩৪,৬৯,৭১২	৬·৭	২·৪
যুক্তপ্রদেশ	৪,৮৪,০৮,৭৬৩	২১,৭১,০১,৭৭৬	১০,৭৫,১৫,৭৬০	৪·১	২·৪
আসাম	৮৬,২২,২৫১	১৩,০৩,৫৮,৬২৪	১,৮০,৯৭,৭১৮	১৫·২	২·২
বিহার-উড়িষ্যা	৩,৭৬,৭৬,৫৭৬	২১,৬২,৫৬,০৭২	৭,৪০,২৪,৮৯৬	৫·১৪	২·২
বঙ্গদেশ	৫,০১,২২,৫৫০	১৬,০৬,০০,৮৮০	৭,০৯,৬৬,০১৬	৩·৪	১·৮

এই তালিকা হইতে দেখা যায় বাংলাদেশে লোক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিন্তু প্রতি জনের প্রাপ্ত জমির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। অথচ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই কৃষি-কার্য্য প্রধান। এখানে বৃষ্টিপাত, বায়ু-প্রবাহ, মৃত্তিকার প্রকৃতি, নদনদীর অবস্থান,—সমস্তই কৃষি-কার্য্যের অনুকূল। এমন অবস্থায় বাংলা-দেশে ১৬ কোটী বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ৭ কোটি বিঘা (অর্দ্ধেকেরও কম) জমিতে কেন চাষ হইতেছে ? বাংলায়, পার্ব্বত্য-অঞ্চল এবং মরুদেশ নাই। সুন্দরবনে জঙ্গল এবং স্থানে স্থানে বিল ও জলা আছে বটে কিন্তু সে-সব এমন বিশাল নহে যে সমগ্র ভূমির অর্দ্ধেক হইতে পারে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে আবাদী জমির পরিমাণ অধিক হইলেও জন-পিছু ভাগে খুব কম। সুতরাং বাংলা-দেশে আরও অধিক পরিমাণ জমির আবাদ হওয়া দরকার এবং তদুদ্দেশ্যে কৃষি-কার্য্যে আরও অধিক লোক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

সম্পাদকের দপ্তর

G K Shaw.

বাণিজ্য-সংবাদ।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ইংলণ্ডের এক ব্যবসায়ী সমিতি ভারতবর্ষে তুলার চাষ করিতে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়াছেন। আপাততঃ ইহারা ত্রিশ হাজার বিঘা জমি লইয়া চাষ করিবেন, প্রয়োজন হইলে আরও জমি বাড়াইয়া লওয়া চলিবে। রাজনৈতিক জগতে সকলেই জানেন যে Tixtile Industryর সর্ব্ব প্রধান কাঁচা মাল (raw material হইতেছে তুলা; ল্যাঙ্কাসায়ারের তাঁতিদের কলের খোরাক যোগাইবার জন্য তাই ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট মিশরকে হাতে রাখিয়াছেন; ইতালী তাই আবিসিনিয়া দখল করিবার জন্য অকাতরে কোটী কোটী টাকা খরচ করিয়াছে এবং অন্যূন পঞ্চাশ হাজার সৈনিক আবিসিনিয়ার যুদ্ধে প্রাণ [illegible]। মিশর গভর্ণমেণ্ট [illegible] পাইয়াই তুলারউপর (Export duty) বসাইয়াছে। [illegible] ফলে ল্যাঙ্কাসায়ারের তাঁতিদের কাপ[illegible] বোনার পড়্‌তা আরও বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং বাজারে প্রতিযোগীতা করা আরও কঠিন হইয়া উঠিবে। "তুলা" "তুলা" করিয়া জগতের Textile Industries সমূহ পাগল হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানী তাই তাহার উপনিবেশগুলি ফিরিয়া চাহিতেছে। ইংরাজ চারিদিক হইতে যেরূপ শক্তির মধ্যে পড়িয়াছে তাহাতে তুলার জন্য তাহারা যে ভারতবর্ষের দিকে লোলুপ নেত্রে চাহিবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

আমরা গত পাঁচ বৎসর হইতে এদিকে বাংলার জমিদার ও ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কিন্তু সে সব অরণ্যে রোদন সার হইয়াছে। এবার Bengal Mill Owners Association এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন, দেখা যাউক কি হয়। কেশোরাম কটনমিলের ম্যানেজিং এজেণ্টস্ বিরলাব্রাদার্স তিনবৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে দীর্ঘতন্তু বিশিষ্ট তুলার চাষের পরীক্ষা করার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের হাতে দশহাজার টাকা দিয়াছিলেন। কৃষি বিভাগ মেদিনীপুরে পরীক্ষা চালাইয়াছিলেন এবং সেবার দারুণ অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও তুলার পরীক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছিল।

মাড়োয়ারীদের কেবল আমরা গালাগালি দিতেই খুব মজবুত। কিন্তু সকলরকম ব্যবসায়েই ইহাদের যেরূপ ভবিষ্যৎদৃষ্টি আছে তাহার তুলনা ভারতের অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; তাই মাড়োয়ারীরা এমন লক্ষ্মীমন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুইয়া শুইয়া ল্যাজ নাড়িতেছি আর অপরের ধন দৌলত দেখিয়া জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছি, আর কাউকে বলিতেছি "মেড়ো", কাউকে বলিতেছি "ছাতু"। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমরা তুলার চাষের জন্য জমিদার এবং ধনীদের প্রবুদ্ধ করিতেছি তা' কে' বা কা'র কথা শোনে! এ ঠিক যেন সেই "রবি কেন জলে?"— "আরে, কে-বা আঁখি মেলে!" অথবা বঙ্কিমি ভাষায় বলিতে হয়,—আরে তুমিও যেমন,— ঢালো, সাজো, খাও; আবার ঢালো, সাজো, খাও।

এদিকে বাংলা দেশে ধীরে ধীরে ২৭ টা কাপড়ের কল মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে; ইহার মধ্যে ২০টী কলের কাপড় বাজারে বাহির হইয়া বেচা কেনা চলিতেছে। এইসকল কলের সুতার জন্য বোম্বাই ধারোয়ার, নাগপুর, প্রভৃতি বাজারে বাঙ্গালী মিল-মালিকদিগকে ছুটাছুটি করিতে হয়। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে তুলার চাষ না করিলে বাংলার বস্ত্রশিল্প বোম্বাই এবং বিদেশীয় কটন মিল সমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিয়া টিঁকিতে পারিবে না। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং আসামের জঙ্গলে তুলা এখনও বন্যজাত ভাবে জন্মাইতেছে এবং সেই তুলা চীন ও জাপানে রপ্তানী হইতেছে; যে বাংলায় একদিন মস্‌লীনের উপযোগী সরু সুতা তৈয়ারী হইত, সেখানে লম্বা তন্তু (long stapled), রেশমের ন্যায় জেল্লাযুক্ত (silky), এবং strong সুতা যে আবার তৈরী হইতে পারে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং বাংলায় যে সকল বিরাট অনাবাদী জমি, পাহাড়, টীলা প্রভৃতি পতিত রহিয়াছে তাহাতে এত তুলা জন্মাইতে পারে যে বাংলার অভাব মিটাইয়া তাহা রপ্তানী করা যাইতে পারে। আমরা ধনী ও জমিদার দিগের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

সুইডিশ্ ম্যাচ্ কোম্পানী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটী দিয়াশালাইর কারখানা স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের সাধারণ নাম "ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী"। কলিকাতার বাজারে চল্‌তি পান-পাতা মার্কা ও টেক্কা মার্কা দিয়াশলাই এই কোম্পানীর তৈয়ারী। কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে (বালী ব্রিজের গোড়ায়) 'ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্প্যানী'র সুবৃহৎ কারখানা চলিতেছে। বোম্বাইয়ে এবং আসামের ধুবড়ীতেও উহাদের বড় বড় কারখানা আছে। সম্প্রতি সুইডিস্ ম্যাচ্ কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান্ মিঃ জি বি খ্রীজ্ কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে আর কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে সুইডেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য এবং [illegible] সংযোগ স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। 'ওয়ে[illegible] আজকাল [illegible] ম্যাচ কোম্পানী'র অর্দ্ধেক মূলধ[illegible] চাকরী বড় তুলিবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন। [illegible]সিং- বলেন "ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত[illegible] মনে করি এখন শুধু বৈদেশিক মূলধনে[illegible] সাহায্যে ভারতীয় ব্যবসা পরিচালিত হওয়া উচিত নহে।"

মিঃ প্রীজ্ তিন সপ্তাহকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া প্রয়োজনানুরূপ সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপানে যাইবেন।

—※—

মাননীয় অর্থসচীব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার গত বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট জাতি গঠনের (Nation building) যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে বাংলাদেশে দশ হাজার লোকের চাকুরী জুটিবে। সম্প্রতি এই বাজেটে যে একটা হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় আরও ২৭০ জন অফিসার, ৯৩ জন টেকনিক্যাল্ য্যাসিষ্টাণ্ট্, ২৫৪৪ জন অতিরিক্ত কেরাণী, ২৫ জন অতিরিক্ত টাইপিষ্ট্, এবং ২২৮০ জন পিয়ন নিযুক্ত হইবে। ইহাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইল ৫২১২ জন। গভর্ণমেণ্টের আরও কয়েকটা স্কীম্ বা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে এই ৫২১২ জনের উপর আরও প্রায় ৫ হাজার লোকের কাজের ব্যবস্থা হইবে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে পল্লী উন্নয়নই প্রধান। পল্লী বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক, পল্লী গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহের জন্য চিকিৎসক ও সহকারী প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম্মীরূপে বহু লোকের চাকুরী জুটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা রাজস্ব সচিব মহাশয়ের উক্তিতে আশান্বিত [illegible] বটে, কিন্তু তথাপি [illegible] বেকার সমস্যার সমাধানের [illegible] মেণ্টের চাকুরীর একটা সীমা আছে। [illegible] সত্য যে, যদি ১০ হাজারের স্থলে অন্ততঃ [illegible] হাজার লোকের চাকুরী হয়, তাহা দেশের সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ঘরে অভাবের হাহাকার ঘুচাইয়া দুঃখের অন্ধকারে কিঞ্চিৎ আলোকরশ্মি দেখাইবে।

ময়মনসিংহের "দয়াময়ী সুগার মিল্স্" নামক চিনির কল উঠিয়া গেল। কোম্পানীর পরিচালকগণ স্বেচ্ছায় কারবার গুটাইয়াছেন। লিকুইডেটর কর্তৃক পাওনাদারগণকে যথারীতি নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। বিহার, ইউ. পি. এবং পাঞ্জাবে এতগুলি চিনির কল দশ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টাকা Paid-up Capital লইয়া কাজ করিতেছে এবং আমাদের দেশে একটি দেশবন্ধু সুগার মিলের টাকা তুলিবার দিবার জন্য আজ কয় বৎসর ধরিয়া ক্যান্‌ভাসার-দের মুখে গ্যাজা উঠিয়া গেল তবুও এখনও পর্য্যন্ত সব শেয়ারই বিক্রয় হইল না; আর "দয়াময়ীও" চক্ষু মুদিলেন। হবে কি করিয়া ?—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্যাট্রিওটিজম্ আছে কিন্তু পেটে ভাত নাই সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে ১০ টাকা পচিশ টাকার শেয়ার কিনিয়া কি দশ লক্ষ টাকা মূলধন তোলা সম্ভব ?—যাহারা ইচ্ছা করিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহারা ৩ টাকা সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ কিনিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া উঠিবে কি করিয়া ?—

বাণিজ্য ব্যাপারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই যে ব্রিটিশ ও জাপানী স্বার্থের সংঘাত ঘটিতেছে, তাহা নহে। সমগ্র পৃথিবীর নানা স্থানেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব্ব আফ্রিকার বাজারে জাপানী বাণিজ্যের প্রসার দিন দিন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ইংল্যাণ্ডের বনিক সম্প্রদায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। গত ২৭শে এপ্রিল লণ্ডন চ্যাম্বার

অব কমার্সের পূর্ব্ব আফ্রিকা বিভাগে এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। তাহাতে স্থির হইয়াছে, অবিলম্বে ব্রিটিশ কাপড়ের কলের মালিক এবং বস্ত্র ও তুলা ব্যবসায়ীদের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্ব আফ্রিকায় যাহাতে বৃটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন, পূর্ব্ব আফ্রিকায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বৃটিশ প্রতিনিধি সংঘ প্রেরণ করা আবশ্যক। জাপানী প্রতিনিধি সংঘ পূর্ব্ব আফ্রিকায় যেরূপ সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে, ব্রিটিশ প্রতিনিধি সংঘেরও সেইরূপ সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার।

—•—

ভারতের বাহিরে অবস্থিত সিংহল, মালয়, ষ্ট্রেট্‌ সেটেলমেণ্ট্‌ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর নারিকেল ও নারিকেল-জাত দ্রব্য ভারতে আমদানী হয়। উহাদের সহিত মূল্যের প্রতিযোগীতায় ভারতীয় নারিকেল ব্যবসায়ীগণ পারিয়া উঠে না। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলই ভারতীয় নারিকেলের প্রধান উৎপত্তি স্থান। বিদেশী নারিকেলের উপর রক্ষণ শুল্ক স্থাপনের জন্য কিছুকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্টের চীফ্‌ সেক্রেটারী রাও বাহাদুর ডাঃ এন্‌ কুঞ্জন পিলাইর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি সংঘ ভারত গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের বাণিজ্য সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। বিদেশী নারিকেলের উপর শুল্ক স্থাপনের জন্য তাঁহারা বাণিজ্য সদস্য মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করিবেন।

আজ বাংলার দুর্ভাগ্য, নারিকেলের মত মূল্যবান্‌ ফল সম্পদের অধিকারী হইয়াও নারিকেলের ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান নাই। ভারতে নারিকেলের শিল্প ও নারিকেলের ব্যবসায় যেরূপ প্রসারিত হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর কোন হাত নাই। নোয়াখালী. বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগণা,—বঙ্গোপসাগর কূলের এই চারিটী জেলায় প্রচুর নারিকেল জন্মে। বন জঙ্গলের আগাছার মত বাংলার এই নারিকেল ফসল বিনা যত্নেই ফলিয়া থাকে। যদি বাঙ্গালী যথার্থ ফল চাষীর মত যত্ন করিয়া নারিকেলের চাষ করিত,—তবে আজ আসাম যেমন চা'য়ের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে,—বিহার যুক্তপ্রদেশ যেমন ইক্ষু চাষের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে,—মধ্যপ্রদেশ বোম্বাই যেমন তুলার জন্য বিখ্যাত হইয়াছে, বাংলাদেশও তেমনি ধান ও পাটের সহিত নারিকেলের জন্য বিখ্যাত হইত। শাসন পরিষদের বাণিজ্য সদস্যের নিকট এই প্রতিনিধি সংঘ আজ আমরা বাঙ্গালীকে দেখিতে পাইতাম।

—•—

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতির মত পঙ্গপাল শস্যের এক মহাশত্রু। ইহারা এক প্রকার উড্ডীয়মান ক্ষুদ্র কীট,—ঝাঁকে ঝাঁকে শস্য ক্ষেত্রের উপর পড়িয়া শস্য খাইয়া ফেলে। কখনও কখনও এই পঙ্গপালের ঝাঁক এত বৃহৎ হয় যে, উহাতে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলে,—মনে হয় যেন চারি[illegible] মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। বাংলাদেশে বিরাট আ[illegible] না গেলেও অনেক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষু[illegible] পড়িয়া শস্য নষ্ট করিয়া দেয়।

আরব, সুদান প্রভৃতি দেশ হইতে [illegible] সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্ট জানিয়াছেন যে, দুই এক বৎসরের মধ্যে

ভারতবর্ষে পঙ্গপাল অসিবার আশঙ্কা আছে। ইম্পিরিয়াল্ কাউন্সিল অব্ এগ্রিকাল্‌চারাল্ রিচার্চ্চ-এর তত্ত্বাবধানে বেলুচিস্থানের উপকূলে পাস্‌নী নামক স্থানে পঙ্গপাল সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য একটি পরীক্ষাগার আছে। সেখানে পঙ্গপাল প্রজনন হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে, এই বৎসরে বেলুচিস্থানের উপকূলের সমান্তরাল উপত্যকা ভূমিতে, লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী স্থানে এবং আফ্রিকার উপকূল প্রদেশে পঙ্গপাল বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই সকল স্থানের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশ এবং রাজপুতানার মরুভূমিতেও পঙ্গপালের জন্ম হয়। ১৯৩৫ সালে একবার পঙ্গপাল আসিবার আশঙ্কা ঘোষণা করা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ বলেন, এবারেও সেইরূপ হইতে পারে।

গান্ধী-আরউইন্ চুক্তির ২০ ধারা অনুসারে গভর্ণমেণ্ট গ্রামবাসী গৃহস্থগণকে নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য লবণ তৈয়ারী ও লবণ সংগ্রহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহার সর্ত্ত এইরূপ ছিল যে, কেহ তৈয়ারী লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র নিজ ব্যবহারে লাগাইবে। খাদ্য দ্রব্যে মিশ্রিত করা ব্যতীত কৃষিকার্য্যে [illegible] কার্য্যে, বিবিধ শিল্প [illegible] মাংস সংরক্ষণ কার্য্যেও সেই [illegible]ার করা যাইতে পারে। গ্রামবাসিগণ [illegible]য়া গ্রামের মধ্যে লবণ তৈয়ারীর ছোট কারখানা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে গ্রামের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ তৈয়ারী করা যাইবে না এবং সেই গ্রামের তৈয়ারী লবণ অন্য গ্রামে বিক্রয় করা যাইবে না। গ্রামবাসীরা লবণ সংগ্রহও করিতে পারে। বোম্বাই, সিন্ধুদেশ, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি অঞ্চলে বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে লবণ ও লবণযুক্ত মৃত্তিকা জমিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকেরা ঐ লবণ অথবা নোনা মাটী সংগ্রহ করিয়া নেয়। এই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, কেহ কোন গাড়ীতে করিয়া লবণ অথবা নোনা মাটী লইয়া যাইতে পারিবে না,—মাথায় বোঝা করিয়া যে পরিমাণ লবণ নেওয়া সম্ভব, সেই পরিমাণ মাত্র একজন লোক নিতে পারিবে। এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অসাধু উপায়ে লবণ প্রস্তুত ও সংগ্রহ করাতে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে উক্ত গান্ধী-আরউইন্ প্যাক্টের ২০ ধারা তুলিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় ঐ সকল গ্রামের অধিবাসিগণকে লবণ প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বাংলাদেশেও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে এইরূপে গৃহস্থগণ লবণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। তবে বাংলাদেশে পশ্চিম ভারতের মত মাঠের মধ্যে লবণ-মৃত্তিকার স্তর দেখা যায় না। সমুদ্রের জল শুকাইয়া লবণ তৈয়ারী কিঞ্চিৎ ব্যয় সাধ্য এবং তাহা বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করা আরও কঠিন।

খুলনা-বরিশাল-মাদারীপুর রেলপথ ঃ—

নয়া দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক অধিবেশনে ফরিদপুর বরিশালের সদস্য মৌলবী সিকন্দর আলী চৌধুরী খুলনা-বরিশাল-মাদারীপুর রেলপথ সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন,

তদুত্তরে গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের যাতায়াত বিভাগের সদস্য (Communication member) স্যার টমাস্ ষ্টুয়ার্ট বলেন, জনসাধারণের যাতায়াত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খুলনা, বরিশাল ও মাদারীপুরকে রেলপথে সংযুক্ত করা যদি বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, এবং সে বিষয়ে যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট্কে জানান, তবে রেলওয়ে বোর্ড্ সেই প্রস্তাব বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।"

এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ করা আবশ্যক যে, এবম্বিধ নূতন বেল-লাইন খোলাব প্রস্তাব আজ নূতন নহে। ১৯১৬ সালে খুলনা-বরিশাল বেল-লাইনেব প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। কাবণ আপত্তি উঠে এবং দেখাও যায় যে তাহাতে দেশেব স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথে বাধা জন্মিবে। ১৯২৭ সালে ববিশাল-মাদাবীপুব রেললাইন খুলিবাব প্রস্তাব পরিত্যাগ করা হয় এই কাবণে যে তাহাতে কোন প্রকার আয় বা লাভের সম্ভাবনা নাই।

খুলনা, ববিশাল, মাদারীপুরকে রেলপথে যুক্ত কবিবার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি না। বাংলাদেশের এই দক্ষিণাংশে জল-পথই প্রশস্ত। উচ্চ রেলপথ নির্ম্মিত হইলে তাহাতে বাস্তবিকই স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ বন্ধ হইয়া যায়। বাংলাদেশের জমি দক্ষিণ দিকে ঢালু; সুতরাং পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা রেল লাইন তৈয়ারী হইলে নদীসমূহকে সেতুর শৃঙ্খলে বাঁধিতে হয়; তাহার ফলে নদীতে অবিলম্বে চড়া পড়িয়া নদী মজিয়া যায়। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ রেলপথ নির্ম্মিত হইলেও তাহাতে জল-প্রবাহের যাতায়াতেব জন্য অনেক পুল রাখা দরকার। অবিচারিতভাবে বাংলাদেশে রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায়, ইহার নদীসমূহের দুরবস্থা হইয়াছে, একথা মিশরের বিখ্যাত নদীবিদ্যা বিশারদ, অধুনা পরলোকগত স্যার উইলিয়াম উইলকক্স্ বলিয়া গিয়াছেন। খুলনার ঠিক পূর্ব্বদিকে বরিশাল। সুতরাং খুলনা-বরিশাল রেললাইন তৈয়ারী হইলে পদ্মার দক্ষিণ বাহিনী শাখাগুলি একেবারে মজিয়া যাইবে। মাদারীপুর হইতে ববিশাল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নদীর ধারে ধারে সমান্তবালভাবে রেললাইন তৈয়ারী করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে নদীর পশ্চিম দিকের জল-নিকাশ বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার প্রতিকারের জন্য লাইনের মধ্যে পুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু তাহাহইলে ব্রড্-গেজ বা মিটার-গেজ্ কোন প্রকাব লাইনই তৈয়ারী করা যায় না। আমবা দেখিতেছি, মাদারীপুর ও বরিশালের মধ্যে জলপথই প্রশস্ত। যদি অধিকতব দ্রুত গমনাগমনের জন্য রেললাইন করিতে হয়, তবে আমাদের মতে লাইনের মধ্যদিয়া পশ্চিমেব জল যাহাতে সহজে বহিয়া গিয়া নদীতে পড়িতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পুলের সংখ্যা বাডাইয়া লাইট্-রেলওয়ে তৈয়ারী করিলে ভাল হয়।

খুলনা হইতে [illegible]পর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। সেই দি[illegible] আজকাল [illegible]য়ারী করিলেও জল-নিকাশের [illegible] চাকরী বড় সুতরাং আমাদের প্রস্তাব, এই অঞ্চলে [illegible]ভাসিং- জলপথে চলাচলের সুবিধা হয়, [illegible] মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

পরলোকে পুন্যাত্মা মাধব গোবিন্দ।

কর্ম্মময় জীবনের অবসান

আলিসাকান্দার প্রসিদ্ধ রায় বংশের মাধবগোবিন্দ রায় মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলার ব্যবসা ক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হইল তাহা অপরিপূরণীয়। তিনি জীবন-ব্যাপী সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নানাদিক দিয়া বাংলার বিবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চরিত্রের উদারতা আত্মভোলা ভাবে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আলিসাকান্দার প্রসিদ্ধ রায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে স্বগ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার মধ্যে অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। উত্তরকালে শৈশবের এই অঙ্কুরিত প্রতিভারই বিকাশ আমরা তাঁহার জীবনে লক্ষ করিয়াছি। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আইনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৮ সনে কলিকাতা হাই-কোর্টের এড্‌ভোকেটরূপে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তিনি প্রভূত যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে তাঁহাকে ওকালতী ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পরিবারের সমস্ত ভার ও নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার প্রতিভা ও অধ্যাবসায় ছিল অসাধারণ, সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিজেকে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলেন। তিনি ক্রমাগত ২৫ বৎসর ব্যাপী হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের একজন ডিরেক্টার রূপে মৃত্যুকাল অবধি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বাংলার বর্ত্তমান অর্থসচিব নলিনীরঞ্জন সরকার মাধববাবুর মৃত্যুপোলক্ষে অনুষ্ঠিত শোক সভার সভাপতিত্ব করার সময় বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানের শৈশব ও নগণ্য অবস্থা হইতে যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ইহাকে উন্নতির এত উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মাবধবাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সোসাইটীর নিতান্ত শিশু অবস্থা [illegible] আজকাল [illegible] ডিরেক্টর হিসাবে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট [illegible] চাকরী বড় নিজে ডিরেক্টর হইয়াও ইহার [illegible]সিং-জন্য নিম্নতম কেরানীর কার্য্য হইতে [illegible] কার্য্য নিজেদের তত্ত্বাবধানে করিতে[illegible] তাহা ছাড়া নলিনীবাবু জীবনের পথে যে প্রতিষ্ঠা

লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার মূলে মাধববাবুর একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও ঐকান্তিকতা ছিল ইহা নলিনী বাবু শোক সভায় স্বীকার করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতে সংকোচ বোধ করেন নাই। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের যখন নিতান্ত দুরবস্থা তখন যাঁহাদিগের অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে ঐ

স্বর্গীয় মাধব গোবিন্দ।

মিলটী রক্ষা পাইয়াছিল মাধবগোবিন্দবাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইহা ছাড়া বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিরও একজন সভ্য হিসাবে তিনি প্রায় বিশ বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে আরও বহু প্রসিদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

বাল্যকাল হইতে[illegible] ও ধর্ম্মের উপর তাঁ[illegible] শ্রদ্ধা ছিল। জীবনে [illegible] ও ধর্ম্মের আদর্শ হইতে [illegible] বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার [illegible]শুর ন্যায় ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি আ[illegible] হইত। কেহ কোন দিন সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার কলিকাতার বাসস্থানে বহু দরিদ্র ছাত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

জীবনের সকল দিক হইতেই বিবেচনা করিলে তাঁহার চরিত্রের সংযম ও আদর্শের প্রতি অনুরাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁহাদের বিরাট একান্নভুক্ত পরিবারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বর্ত্তমান কালের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুযায়ী দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি কুগ্রহ ঢুকিয়া যাহাতে একান্নভুক্ত পরিবারের কোন ক্ষতি না পারে এই কারণে তিনি স্বয়ং কখনও নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন জিনিসের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন না। পরিবারের ও সমাজের সরল মতি যুবকেরা ভবিষ্যতে তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন যাপন কবিতে পারে এই-জন্য তিনি নিজের পরিবাবের আদর্শ সংযম ও নিষ্ঠাব উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বগ্রামে Purity association (সুনীতি সঙ্ঘ) নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। তিনি উক্ত সমিতির আজীবন সভাপতির পদে বৃত ছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি বাংলার খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দ এই সমিতি সম্পর্কে তাঁহার আলি-সাকান্দার বাস ভবনে পদার্পণ করেন। বিধবা পত্নী, ৪টী পুত্র ও বহু আত্মীয়স্বজনকে পিছনে রাখিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করিয়া-ছেন। সন্ন্যাস রোগের আকস্মিক আক্রমণই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার বিয়োগ ব্যথায় আজ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব শোকে মুহ্যমান। আমরা পুণ্যবান পুরুষের আত্মার শান্তি কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

পঞ্চদশ বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব

আমরা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের পঞ্চদশ বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ যে নৈরাশ্যজনক নহে,—কাপড়ের কলের শেয়ার ক্রয় করা যে একটি লাভজনক লগ্নীর কারবার,—কটন মিল পরিচালনায় যে এই দুর্দ্দিনের বাজারেও বাঙ্গালী বোম্বাই আহমদাবাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে,—ঢাকেশ্বরীর এই রিপোর্ট ও হিসাব তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আমরা নিম্নে উহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নানাদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের দুরবস্থা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে (১৯৩৭ সালে) ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মোট ৮৮৭১২১৪ টাকা লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই লাভের পরিমাণ ছিল ৭৮৭৪৫২ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে ৯৯৭৬২ টাকা বেশী লাভ হইয়াছে। মিলের বাড়ী ঘর, যন্ত্রপাতি, আসবাব পত্র প্রভৃতির মূল্য হ্রাস এবং ইনকামট্যাক্স ও কে, এল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফণ্ড রিজার্ভের জন্য মোট ৩৭২৯৬০ টাকা পৃথক রাখিয়া নিট্ লাভ পাওয়া গিয়াছে ৫১৪২৫৪ টাকা। ইহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের ব্যালান্স্ যোগ করিয়া মোট হইয়াছে ৫৪৪৮৮০ টাকা। এই টাকা নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে;—

(১) শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে
রিজার্ভ ফাণ্ড ১২৮৫৬৩ টাকা

(২) শতকরা ১০ টাকা হিসাবে
অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড্ ২৬২৯২৫ টাকা

(৩) ডিভিডেণ্ড্ সমীকরণ ফাণ্ড ১[illegible]০০০০ „

(৪) বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবে
আনা হয় ৩৩[illegible]১ টাকা

আলোচ্য বৎসরের আরম্ভে মিলের গুদামে কাপড় সূতা ও অব্যবহার্য্য তুলা প্রভৃতিতে ৫২৬৯৫৪ টাকার মাল মজুত ছিল। বৎসরের মধ্যে মিলে আরও ৪০০৬৭৪৮ টাকার জিনিস উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে পুনশ্চ ৩৭৭৪০৩৬ টাকার মাল বিক্রয় হইয়া বৎসরের শেষে গুদামে কাপড় সূতা প্রভৃতিতে [illegible] টাকার মাল মজুত থাকে।

আলোচ্য বৎসরে ঢাকেশ্বরী ক[illegible] বর্ত্তমান রুচি ও চল্‌তি ফ্যাশন অনুয[illegible] রকম সুন্দর নক্সাদার চওড়া পাড়ের শা[illegible]তে করিবার জন্য ৬৫৪৭ টাকা মূল্যে ১২ খানা জেকার্ড মেসিন ক্রয় করা হইয়াছে। মিলের

কর্ম্মচারী ও কুলীদের বাসস্থানের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বর্ত্তমান ফ্যাক্টরী আইনের নির্দ্দেশানুসারে ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্লাজ্ প্ল্যাণ্ট (Sludge Plant) অর্থাৎ ময়লা অপসারণের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বসান হইয়াছে।

ইষ্টবেঙ্গল জুট এণ্ড কটন মিলের সহিত ঢাকেশ্বরীর মিলিত হইবার প্রস্তাব পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। আলোচ্য বৎসরে ২৫-৪-৩৭ তারিখ হইতে ঢাকেশ্বরী কটন মিল ইষ্টবেঙ্গল জুট এণ্ড কটন মিলের সহিত যুক্ত হইয়া

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং এজেণ্টস্

শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, রজনীমোহন বসাক এবং সূর্য্যকুমার বসু।

গিয়াছে। সেইদিন হইতে ইষ্টবেঙ্গল জুট এণ্ড কটন [illegible] ছে ঢাকেশ্বরী কটন মিল [illegible] লাক্ষী নদীর অপর (পশ্চিম) [illegible] বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। এই [illegible] মিলে ৬০ হাজার টাকু ও ১৫০০ তাঁতে [illegible] মিহি সূতা ও কাপড় প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫৬০০ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট বিরাট আকারের একটি ষ্টিম্ টারবাইন্ যন্ত্রের সাহায্যে এই নূতন মিল পরিচালিত হইবে। এই টারবাইন্ যন্ত্রে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে তাহার দ্বারা দুইটি মিলই চালান যাইতে পারে। এই দুইটি মিল শীতলাক্ষীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীরে অবস্থিত, সুতরাং ২নং মিল হইতে তড়িৎশক্তি বহন করিয়া ঢাকেশ্বরী

কটন মিলে নিবার জন্য নদীর মধ্য দিয়া মোটা তার (Cable) বসান হইবে। সম্প্রতি শক্তি উৎপাদনের ষ্টীম, টারবাইন্, ২১২৮০ টাকু এবং ৫০০ তাঁতের অর্ডার দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রাদি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং আশা করা যায় আগামী জুলাই মাসের মধ্যে নূতন মিল চালু হইবে।

আমরা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের উন্নতি সূচক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ঢাকেশ্বরীর আরও গৌরবের বিষয় এই যে, উহা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মূলধনে, বাঙ্গালীর পরিশ্রমে এবং বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি কৌশলে পরিচালিত। এক সময়ে শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করিয়া যেমন গঙ্গার দুই ধারে এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে কাপড়ের কল, কাগজের কল, পাটের কল প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল;—বর্ত্তমান সময়ে তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া শীতলাক্ষীর উভয় তীরে এবং সেকালের মস্‌লিনের জন্মভূমি ঢাকা সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কাপড়ের কল,—একটির পর আর একটী ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে। অচিরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নানাবিধ কলকারখানায় জম্-জমা হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং সেই শিল্প সমৃদ্ধির মূল,—সকলেই স্বীকার করিবেন,—বাঙ্গালীর গৌরবশ্রীমণ্ডিত ঢাকেশ্বরী এবং তাহার কর্ম্মকর্ত্তাগণ যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং কর্ম্মনৈপুণ্যের গুণে ঢাকেশ্বরী আজ বস্ত্রশিল্পে এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ্ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

১৯৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

গত ৯ই মে (১৯৩৮) তারিখে এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার হেড্ আফিসে অংশীদারদের এক-চত্বারিংশৎ (৪১শং) বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ১৯৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কোম্পানীর এক বৎসরের কার্য্য বিবরণ ও হিসাব আলোচিত এবং গৃহীত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন কারবার :—

আলোচ্য বৎসরে ২৪৬৩৪৯৬০ টাকা মূল্যের ১৫৪১৮টি বীমার প্রস্তাব পাওয়া যায়। ১৮৭২৮৫১৮ টাকা মূল্যের ১২০৭৮টী প্রস্তাব গৃহীত এবং তাহাদের উপরে পলিসি ইস্থ করা হয়। ইহার [illegible] [illegible]ক প্রিমিয়াম আয় [illegible] [illegible]ককালীন প্রদত্ত প্রিমিয়াম [illegible] টা[illegible] হইয়াছে।

আয়-ব্যয় :—

[illegible]চ্য বৎসরে কোম্পানীর আয়ের ঘরে দেখা যায় মোট ৫০৯১৪৬৫৪ টাকা। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের জীবন-বীমা তহবিল (অংশীদারদের বোনাস্ এবং জীবন-বীমা রিজার্ভ ফাণ্ড বাদে) ছিল ৪২৬০৫১৫৩ টাকা। প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ৬১০৯৬৯০ টাকা। এ্যান্থুইটীর মূল্য বাবতে পাওয়া গিয়াছে ২০০০ টাকা। সুদের আয় হইয়াছে ২১৬৩৯৭৪ টাকা। পলিসির উদ্ধার, এ্যাসাইন্‌মেণ্ট, এনডর্স্‌মেণ্ট প্রভৃতির ফিস্ পাওয়া গিয়াছে ২৮৩৭৭ টাকা। সিংহল ও মহীশূরে প্রদত্ত ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স্ হইতে ফেরৎ পাওয়া গিয়াছে ৫৪৫৮ টাকা।

নিম্নলিখিত কয়েকটি দফায় ব্যয় হইয়াছে মোট ৬৪৯৪১৬৩ টাকা।

মৃত্যুজনিত দাবী শোধ	১৩৭২৯৪৬	টাকা
মেয়াদ শেষ জনিত দাবী শোধ	৩১০৩৯২৫	,,
সারেণ্ডার বা প্রত্যর্পণ	৩৬০৩২১	,,
এ্যান্থুইটী বা বার্ষিক বৃত্তি	২০১৮	,,
আসবাব পত্রের মূল্য হ্রাস	৭৭০৬	,,
ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স	৭০৩৬০	,,
পরিচালন খরচ	১৫৭৬৮৭৮	,,

জীবন-বীমা তহবিল ঃ—

উপরোক্ত খরচ বাদে বৎসরের শেষে জীবন-বীমা তহবিল ৪৪৪২০৪৯১ টাকায় উঠিয়াছে। বৎসরের আরম্ভে ইহার পরিমাণ ছিল ৪৩২৫৫৫০৭ টাকা।

সম্পত্তি ও দায় ঃ—

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫০৬৮৭৯০৩ টাকা। তন্মধ্যে পলিসি বন্ধকী ঋণ ৬৫৩৭৩১৬ টাকা। গভর্ণমেণ্ট, লোন, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট, বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা করপোরেশন, করাচী পোর্ট ট্রাষ্ট বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিবিধ সিকিউরিটীতে লগ্নী আছে ৪০৫৩৯০০৫ টাকা। ভারতীয় গৃহসম্পত্তির মূল্য ৯১৯০০০ টাকা। আসবাব পত্রের মূল্য ৮০৬০০ টাকা। ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আফিসে ব্যালান্স রহিয়াছে ১৬৮১৫৯ টাকা অনাদায়ী প্রিমিয়াম ৫৭২৫৪২ টাকা এবং অনাদায়ী সুদ আছে ৭৬৪০৮ টাকা।

দায়ের ঘরে দেখা যায় জীবন-বীমা তহবিল জীবন-বীমা রিজার্ভ ফাণ্ড, ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ফাণ্ড, সারেণ্ডার ভ্যালু এবং গৃহসম্পত্তির রিজার্ভ ফাণ্ড, প্রভৃতি মিলাইয়া মোট ৪৮২৩০৪৭৭ টাকা; অংশীদারদের আদায়ী মূলধন ৫১৫০০০ টাকা, এবং অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড ও বোনাস্ ফাণ্ডের পরিমাণ ৪৬১৭৯৯ টাকা; জ্ঞাত ও স্বীকৃত দাবীর পরিমাণ ১২০৮৫৬১ টাকা। প্রিমিয়াম বাবতে অগ্রিম জমা আছে ১৭৮৩৯ টাকা। বিবিধ দেনা বাবতে পাওনাদারেরা পাইবে। ২০৩১৩৭ টাকা। কর্ম্মচারীদের ডিপজিট আছে ৩৮০৭৫ টাকা। গ্যারাণ্টী দাবী শোধের বাকী এবং গ্যারাণ্টি রিজার্ভ মিলাইয়া ১০০০ টাকা।

চলতি পলিসি ঃ—

আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত মোট চলতি পলিসির সখ্যা ৭৫০০১। ইহার মধ্যে ভারতে ৭২২৫৭ টী এবং ভারতের বাহিরে ২৭৪৪ টী। এই সকল পলিসিতে বোনাস্ ও য়্যান্যুইটী সহ মোট ১৩৯৭০০৭৬৯ টাকা বীমা করা আছে। তন্মধ্যে ভারতে ১৩২৯৯৩৮৪১ টাকা এবং ভারতের বাহিরে ৬৭০৭৫২৮ টাকা।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার বাংলাদেশস্থ চীফ্ এজেন্সী ফা[illegible] কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এ, সি, [illegible]

আজকাল [illegible] চাকরী বড়

খরচের অনুপাত ঃ— [illegible]াসিং-ভ্যালুয়েশনের খরচ এবং পরিচা[illegible] মিলাইয়া দেখাযায় প্রিমিয়াম আয়ে[illegible]তকরা ২৫.৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বিভিন্ন তহবিলের পরিমাণ :—

নিম্নে কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ লিখিত হইল ;—

জীবন-বীমা তহবিল	৪৪৪২০৪৯১	টাকা
জীবন-বীমা রিজার্ভ ফাণ্ড	৫৬৫৬৫৮	,,
ইনভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ফাণ্ড	২৮০৬৯১৮	,,
সারেণ্ডরে ভ্যালু রিজার্ভ ফাণ্ড	২১২৪১০	”
গৃহসম্পত্তির রিজার্ভ ফাণ্ড	২২৫০০০	,,

ভ্যালুয়েশন :—

১৯৩৭ সাসের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর অষ্টম (পঞ্চ-বার্ষিক) ভ্যালুয়েশন হয়। তাহাতে ৪৪২৯৩৯৭ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায়। উহাতে পলিসিহোল্ডারগণকে বেশ সচ্ছল রকমের বোনাস্ দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের মন্তব্য।

এই হিসাব ও রিপোর্ট আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি, এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার আর্থিক অবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় এবং ইহা উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইয়াছে। নূতন কারবারের পরিমাণ দেখা যায় এক কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার উপর। এতবেশী টাকার বীমা আর কোন বৎসরে সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু ব্যালান্স সিটে নূতন কারবারের বড় বড় অঙ্কই কোম্পানীর উন্নতির পরিচয় অথবা দৃঢ় ভিত্তির প্রমাণ নহে। সাধারণ লোকে [illegible] কেটো টাকার অঙ্ক [illegible] কোম্পানীর অবস্থা খুব [illegible]ন কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে [illegible] তহবিল, লাইফ ফাণ্ড প্রিমিয়াম আয়, [illegible]ভৃতি বিষয়ে সমানুপাতিক উন্নতি দেখা যায়, [illegible]বই কোম্পানীর অবস্থাকে যথার্থরূপে [illegible] বলা চলে। এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার হিসাবের আলোচনায় আমরা তাহাই দেখিতেছি। একদিকে যেমন নূতন কারবার বাড়িয়াছে,—অন্যদিকে তেমনি জীবন বীমা তহবিল, লগ্নী, প্রিমিয়াম আয়,—সকল বিষয়েই কোম্পানীর উন্নতি হইয়াছে। এই জন্যই বীমাকারী জনসাধারণ এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার উপর এত বিশ্বাসবান্।

খরচের অনুপাত হইয়াছে শতকরা ২৫'৮। ইহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও, কোম্পানীর কারবার বৃদ্ধির তুলনায় নগণ্য। জীবন বীমা তহবিল ৪৩২৫৫৫০৭ টাকা হইতে ৪৪৪২০৪৯১ টাকায় উঠিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার তহবিল মোট হইয়াছে ৪৮২৩০৪৭৭ টাকা। ব্যালান্স্ সীটে লগ্নীর যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় গভর্ণমেণ্ট লোন্, পোর্ট ট্রাষ্ট্ ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি নিরাপদ সিকিউরিটীতে কোম্পানীর টাকা লগ্নী করা রহিয়াছে। কোম্পানীর ষ্টক্ একচেঞ্জ্ সিকিউরিটী সমূহ নির্দ্দিষ্ট তারিখে সমমূল্যে খালাস করা যাইবে। Redeemable at per, অর্থাৎ দশ হাজার টাকার ষ্টক্ একচেঞ্জ্ সিকিউরিটী নির্দ্দিষ্ট তারিখে খালাস করিলে কোম্পানী তাহার মূল্য স্বরূপ দশ হাজার টাকাই পাইবেন, —যদিও সে সময় তাহার বাজার দর কম থাকিতে পারে; সুতরাং ঐ সকল সিকিউরিটীতে কোম্পানীর ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই।

হিসাবের খাতায় সিকিউরিটী সমূহের যে মূল্য ধরা হইয়াছে, তাহা বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। শুধু তাহাই নহে, সিকিউরিটী সমূহ খালাসের সময় যে মূল্য পাওয়া যাইবে, হিসাবের খাতায় ধরা মূল্য তাহা অপেক্ষা খুব কম। এইরূপ কড়াকড়িতেও যে কোম্পানীর তহবিল এত বাড়িয়াছে, ইহাই উহার আর্থিক

অবস্থার পরিচায়ক। ১৯৩৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর যে অষ্টম ভ্যালুয়েশন হয় তাহাতেও উহার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এত কম প্রিমিয়ামের হার ধরিয়াও যে কোম্পানী উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে পলিসি-হোল্ডারদিগকে মোটা বোনাস্ দিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায়, উহার আর্থিক অবস্থা কিরূপ স্বচ্ছল ও সুদৃঢ়।

ঠিক সময়ে বার্ষিক হিসাব নিকাশ করা, এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার স্বভাবসিদ্ধ। এই সুনামটি কোম্পানী চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নূতন বীমা আইনে নিয়ম হইয়াছে ৩১শে ডিসেম্বর হিসাবের বর্ষ শেষ করিতে হইবে। তদনুসারে ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর আগামী বৎসর শেষ হইবে। সুতরাং আগামী ব্যালান্স্ সীটে কোম্পানীর দশ মাসের হিসাব থাকিবে।

আলোচ্য বৎসরের শেষে মেসার্স্ আলম্ বরুচা এণ্ড কোং কোম্পানীর সহিত একমত হইয়া ম্যানেজারগণের পদে ইস্তাফা দিয়াছেন। সেইস্থলে ১৯৩৮ সালের ৫ই মে হইতে মিঃ ই, ই, আলম্ ম্যানেজার, মিঃ এ, ই, আলম্ এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এবং মিঃ এম্, আর, বরুচা সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মেসার্স্ আলম্ বরুচা এণ্ড কোম্পানীর সুদক্ষ পরিচালনায় গত ৪১ বৎসর ধরিয়া এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রধান ধুরন্ধরগণই নূতন ভাবে এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা আশা করি এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া পূর্ব্বের মতই অপ্রতিহত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

জগতের দুইটী গুপ্ততত্ত্ব

জগতের ২টী গূঢ় তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই; কিন্তু যদি কোনরূপে তাহা কেহ জানিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বড়লোক হইয়া যায়। এই দুইটীর মধ্যে একটী চীনের সিন্দুর, অপরটী তুরস্কের কঠিনতম ইস্পাতের দ্রব্যের সহিত স্বর্ণ বা রৌপ্যের সূক্ষ্ম পাত সংলগ্ন করা। এই দুইটীর প্রস্তুত প্রণালী জগতের কোন জাতিই এ পর্য্যন্ত করায়ত্ব করিতে পারে নাই। সেদেশে যাইয়া কেহ যদি এই দুইটী দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রথমেই তাহাকে কঠিন শপথ গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার পর প্রকাশ না হইয়া পড়ে, তজ্জন্ত অনেক টাকা, গ্যারাণ্টী স্বরূপ প্রদান করিতে হয়, তুরস্ক এবং চীনের কারিগরদিগের পরিবারস্থ সব লোক এ রহস্য জানে না, পিতা মৃত্যুকালে একজনমাত্র পুত্রকে শপথ গ্রহণ করাইয়া বলিয়া যান পুত্র জনমেও যেন এ রহস্য আর কাহাকেও বলে না। এইরূপে শত সহস্র [illegible] রাহিত হইয়া গেল, কিন্তু জগতের [illegible] তাহা জানিতে পারিল না। [illegible] এবং তুরস্কের ইস্পাত পাত্রের উপর [illegible] রৌপ্যের মিনার কাজের সমগ্র জগতে [illegible] আছে; কেহ জানিলে যে তাহার [illegible] ফিরিয়া যায়, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু জানিবার কোনও উপায় নাই।

আজকাল ক্যাণ্ডারের [illegible] চাকরী বড় [illegible] ভোসিং-

বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের অবস্থা

(বেঙ্গল মিলওনার্স্‌ এ্যাসোসিয়েসানের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতার সারমর্ম্ম)

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে নূতন বাণিজ্য চুক্তির কথা গত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার কোন শেষ সিদ্ধান্ত না হওয়ায় ভারত গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, পুরাতন চুক্তিই এখন বলবৎ থাকিবে। বর্ত্তমান বৎসরের আরম্ভে ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পের মালিকগণ এই বলিয়া খুব জোর আন্দোলন চালাইলেন যে, "এক্ষণে আমরা ভারতীয় কাঁচা তুলা প্রচুর পরিমাণে কিনিতেছি, সুতরাং ভারতবর্ষে আরও অধিক পরিমাণে কাপড় রপ্তানী করিবার অধিকার আমাদিগকে দেওয়া হউক।" ল্যাঙ্কাশায়ারের এই দাবীর যে কোন মূল্য নাই, তাহা বেঙ্গল মিল্‌ওনার্স্‌ এ্যাসোসিয়েশানের ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস্‌, এন্‌, মিত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সুযুক্তি পূর্ণ একটি প্রবন্ধে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের মালিকেরা ভয় দেখাইতেছে যে, "জাপান এখন চীনে[illegible] ব্যাপৃত থাকায় বেশী [illegible] তুলা কিনিতে পারিবে না। [illegible] তুলা বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষকে [illegible]ারের কলওয়ালাদের মুখ চাহিয়া [illegible] হইবে।" ভারতীয় জনসাধারণ শিল্প [illegible]াপারে ইংরাজদিগের সহিত কোন প্রকার মনোমালিন্য রাখিতে ইচ্ছুক নহে। পরন্তু ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধুত্ব বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এমন কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি না, যাহাতে ষোল আনা ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষিত হয়,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ ঘটে। চীন জাপানের যুদ্ধ ভারতীয় তুলার ব্যবসায়ের পক্ষে এমন ভয়ের কিছু নহে ; কারণ যুদ্ধ চিরকাল থাকিবে না। আমরা আশা করি, এই সকল তাল-বাহানা ও মিথ্যা অজুহাত না করিয়া ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পের মালিকগণ ন্যায় ও যুক্তির পন্থায় চলিবেন, যাহাতে বৃটিশ ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবিক উভয় জাতির পক্ষে কল্যাণ জনক হয়।
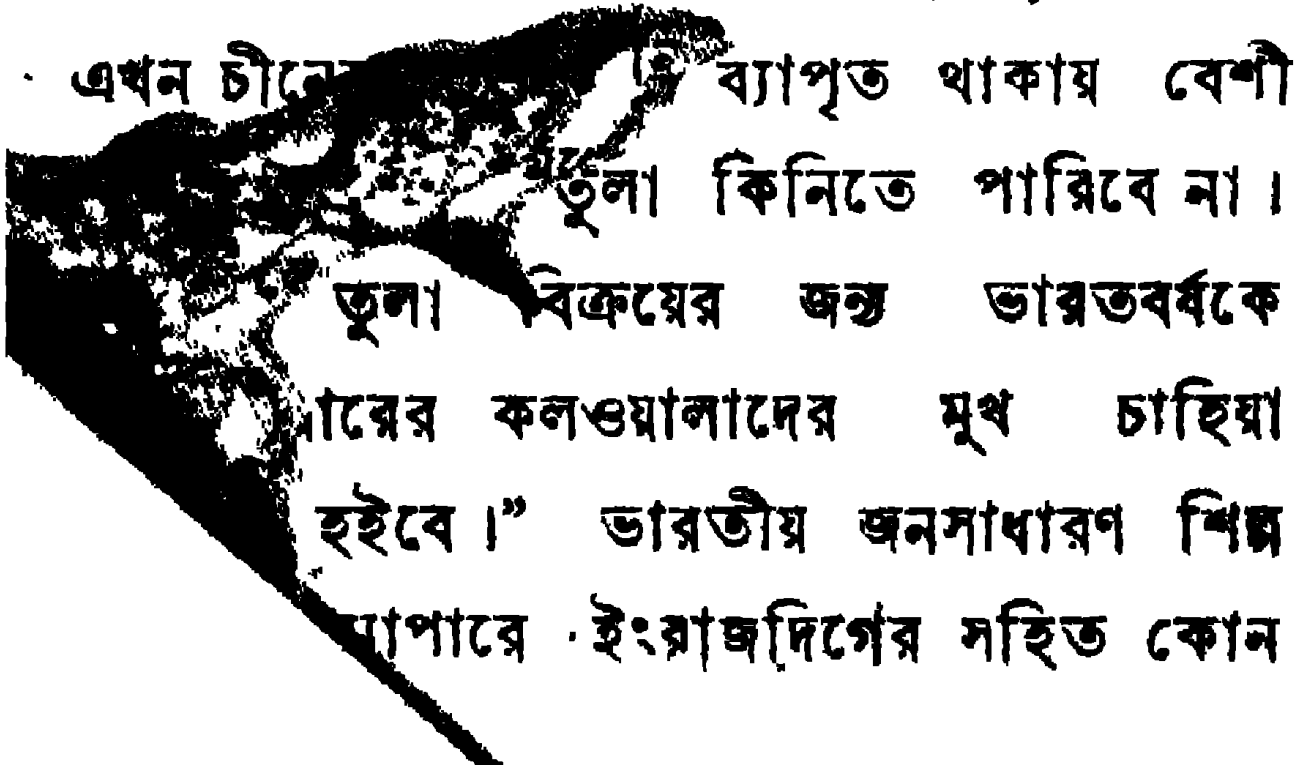
১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে কলকারখানা-সমূহে শ্রমিকদের মধ্যে অনেক স্থলে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তাহার ফলে কয়েকটি মিলে গুরুতর ধর্ম্মঘট হয়। বাংলাদেশের শ্রমিকদের অবস্থা যে খুব ভাল একথা বলা যায় না। তাহাদের অবস্থা যে আরও উন্নত করিবার চেষ্টা করা উচিত, তাহাও সত্য বলিয়া বুঝি। দেশের উন্নতি করিতে হইলে এই অনশন অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট দুঃখ দুর্দ্দশা গ্রস্ত শ্রমিকদের মুখের অন্ন

যোগাইতে হইবে,—তাহাদের পরিধান বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—তাহাদের মাথা রাখিবার জায়গা দিতে হইবে। দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার,—অপ্রতিহত ভাবে কলকারখানা পরিচালন,—এই বেকার সমস্যা ও

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

নিদারুণ দারিদ্র্য দূর করিবার প্রধান উপায়,—একথা সকল সভ্যদেশেই স্বীকৃত এবং এই পন্থা, যেখানেই সম্ভব, অবিলম্বে অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য প্রসার এবং কলকারখানা স্থাপন কার্য্যে [illegible] বহু বিলম্বে নিযুক্ত [illegible] বর্ত্তমান সময়ে নানা বাধা [illegible] বাংলাদেশকে শিল্প বাণিজ্য [illegible] ত হইতেছে।

[illegible] র সহিত তীব্র প্রতিযোগীতা, [illegible] রখানায় ও শিল্প বাণিজ্যে টাকা যোগাইতে মূলধনীদের অনিচ্ছা, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ লোকের অভাব, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সহানুভূতি না পাওয়া, এই সব সেই বিপুল বাধা বিঘ্নের কয়েকটি মাত্র। বাংলায় শিল্প ব্যবসায়ের এখনও শৈশব অবস্থা। এই সময়ে [illegible] প্রকার দুই একটি বাধাতেই কোন শিল্পোদ্যম নষ্ট, ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। যাঁহারা সমাজের জনসাধারণের হিতকল্পে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহী ও অধির হইয়া কলকারখানার শ্রমিকগণকে মিথ্যা উত্তেজনায় বিপথে পরিচালিত করেন, তাঁহারা একদিকে যেমন শিল্পোন্নতির পথে অধিকতর প্রবল বাধার সৃষ্টি করেন, তেমনি অন্যদিকে শ্রমিকদেরও দারিদ্র্য বৃদ্ধির এবং বেকার অবস্থা সৃষ্টি করার সহায় হন।

অবশ্য এ কথা আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, শ্রমিকদের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি এবং যাহারা সমাজের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানে অবশ্যই মনোযোগী হইতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি কোন অবিচারিত কার্য্য করিলে হিতে বিপরীত হয়। সুতরাং যাঁহারা সমাজের প্রকৃত হিতকারী, তাঁহাদিগকে সকল দিক বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের অবস্থা কিরূপ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের জীবন যাত্রার আদর্শ কিরূপ বিভিন্ন;—একই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পুনশ্চঃ বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক প্রয়োজনীয়তা কত বিভিন্ন;—শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম্মভেদে পারিবারিক গঠন ও ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির পার্থক্য কিরূপ,—এই সকল নানা বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থা দূরীকরণার্থে অনেক আইন রচিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে আমদানী শিল্প দ্রব্যের উপর রক্ষণ শুল্কও কমান হইয়াছে। এই দুইটী পরস্পর বিরোধী কার্য্যের ফলে ভারতীয় শিল্পের আর্থিক দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীরা এমনিধারা বোঝার উপর বোঝা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। এক এক সময় মনে হয়, বুঝি ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস হইতে আর বিলম্ব নাই। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের উপার্জ্জন কিরূপ এবং দেশের লোকের গড়ে জন প্রতি আয় কত তাহা ভাবিয়া দেখিলে নিরপেক্ষভাবে এই কথাই বলিতে হয়—আমাদের শ্রমিকদের উপার্জ্জন কোন মতেই নিতান্ত কম নহে। বিশেষতঃ যখন হিসাব করা যায়, কল-কারখানার মালিকেরা আইনতঃ এবং স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, পানীয় জল, বিদ্যালয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, দোকান-বাজার, ক্রীড়া-চত্বর, আমোদ-গৃহ,—প্রভৃতি নানাবিধ হিতজনক অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন বুঝা যায় শ্রমিকদিগকে যত দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া বর্ণনা করা হয় বাস্তবিক তাহারা তদ্রূপ নহে। শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে কল-কারখানার আয় কমিয়া যায়,—সুতরাং পরিণামে যখন ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হয়, তখন শ্রমিকেরা পুনরায় কম বেতনে কাজ লইতে বাধ্য হয়; কোন কোন স্থলে তাহারা পূর্ব্বের কাজটীও হারায়।

এই সব ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মজুর খেপাইয়া ধর্ম্মঘট করানই যাঁহাদের ব্যবসা;—রাজনীতিক চালবাজী খেলায় নিরক্ষর অবুঝ শ্রমিকদেরে নাচানই যাঁহাদের আনন্দ—তাঁহারা সমাজ হিতৈষণার ছদ্মবেশ ধরিয়া বাস্তবিক সমাজের সর্ব্বনাশ সাধনই করিয়া থাকেন। আমি মনে করি একথা মিথ্যা নয় যে, এই বাংলা দেশে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে শ্রমিক আন্দোলনের বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বাংলাদেশে শিল্পোন্নতির প্রবল বাধা জন্মাইবে।

১৯৩৫ সালের ফ্যাক্টরী আইন সম্বন্ধীয় কয়েকটী নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে ফ্যাক্টরীসমূহের [illegible] ইন্‌স্পেক্টারের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হইবে যদ্দারা তিনি ফ্যাক্টরী বিল্ডিং তৈয়ারী [illegible]য়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ইহাতে কারখানার মালিকদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। এইরূপ আরও কয়েকটী ফ্যাক্টরী আইনের নিয়ম আছে, যাহা বাংলাদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে প্রবল অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। ঐ সকল নিয়ম যাহাতে রহিত হয়, সে বিষয়ে মিল ওনার্স্ অ্যাসোসিয়েসানের বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

১৯৩৬ সালে বাংলাদেশে ২৪টী কাপড়ের কল ছিল। ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জন কটন মিল, বিদ্যাসাগর কটন মিল এবং শ্রীদুর্গা কটন মিল কার্য্য আরম্ভ করাতে ১৯৩৭ সালে মিলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৭টী। ইহা অনেকটা আশার কথা ও সুখের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে এই ২৭টী মিলে মোট ৩৫২৩৬৮ [illegible] আজকাল কাপড়[illegible] চলিতেছে। পূর্ব্ব বৎসর অপের. চাকরী বড় ৫৮০৮ এবং তাঁতের সংখ্যা ৭০০ বাড়িয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পে বাধা কিছু উন্নতি করিতে পারে নাই। [illegible] কাপড় ও জাপানী কাপড়ের আমদানী ১৯[illegible] সালের জানুয়ারী হইতে [illegible]

মাসে কিরূপ কমিয়া গিয়াছে, তাহা নিম্ন-তালিকায় ১৯৩৬ সালের এই ১১ মাসের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে,—

সাল	বিলাতী	জাপানী
	লক্ষ গজ	লক্ষ গজ
১৯৩৬	৩৩৭৬	৪৩০৬
১৯৩৭	২৭২৭	২৬৫০

১৯৩৬ সালে (জানুয়ারী হইতে নবেম্বর) ভারতবর্ষে মোট বিদেশী কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৭৭৯৪ লক্ষ গজ। ১৯৩৭ সালে ঐ সময়ে উহার পরিমাণ কমিয়া ৫৫২৫ লক্ষ গজে নামিয়াছে। বঙ্গদেশে আমদানীর পরিমাণও ২৪৮০ লক্ষ গজ হইতে ১২৬০ গজে নামিয়াছে। এত সুবিধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা বাজার দখল করিতে পারেন নাই। কারণ তাহারা চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়াইতে অসমর্থ হইয়াছেন। ১৯৩৬ সালে (জানুয়ারী হইতে আগষ্ট) ৮ মাসে বাংলাদেশের কাপড়ের কলে ১০৭৮ লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে সেই ৮ মাসে ১০০৫ গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে কলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাজারে বিদেশী কাপড়ের আমদানী হ্রাস হেতু চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান দুইটী কারণ দেখা যায় এই যে, বাংলাদেশের অনেক কাপড়ের কলে প্রচুর এবং যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি নাই,—দ্বিতীয়তঃ শ্রমিক আন্দোলনের দরুণ কয়েকটী মিলকে কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং তদ্দরুণ ক্ষতি সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রমিক আন্দোলনের অবিমৃষ্যকারী নেতারা নিজেদের অনুচিত কার্য্যের ফল দেখুন,—তাহাতে কোন পক্ষেরই লাভ হয় নাই,—উপরন্তু বাংলাদেশের শিল্প-ব্যবসায়ের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং বাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ | শ্রাবণ---১৩৪৫ | ৪র্থ সংখ্যা

ক্যানভাসিং কাজের টেকনিক

একদিন একজন লোক আব একজনকে প্রশ্ন কবছিল—"বাংলাদেশেব ৪ খানি প্রধান সংবাদপত্রেব পৃষ্ঠায় দৈনিক কৰ্ম্মখালিব সংবাদ থাকে অন্ততঃ প্রায় ২৫০ শত। যদি বোজ আড়াই শো লোক চাকবী পায় ত দেশে এত বেকাবের সংখ্যা কেন?"

প্রশ্নটা সত্যই ভাববাব। সংবাদপত্রে নিত্য যে কৰ্ম্ম খালিব বিজ্ঞপ্তি থাকে তাতে যে প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও অপরাপব প্রতিষ্ঠানে আড়াইশো কবে লোকের প্রয়োজন হয় সেবিষয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পাবে না। অথচ এটাও সত্য যে প্রতিদিন আড়াইশো কবে লোক চাকরীও পায় না। তা' যদি পেত ত দেশে বেকারদের এত হাহাকার জাগত না।

আসলে ব্যাপার হচ্ছে এই যে, চাকরী খালি থাকে এটা সত্য, কিন্তু সে চাকবী বাঁধা মাইনেব কেরাণীগিবি বা মাষ্টাবী নয়। আড়াইশো চাকবীব মধ্যে সওয়া দু'শোব ওপর থাকে ক্যানভাসিং বা দালালীর। কাজেই কলম-পেশা বাঙ্গালীব সে চাকরীতে মন উঠে না, যদি বা নিরুপায়ে কাবও মন উঠে ত কাজে সুবিধা কবতে না পেবে দু'দিন পবে সে কাজে ইস্তফা দেয়। তাইতেই আবার সেই আড়াইশো চাকবী খালির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।

আমাদেব উপবোক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই দেখানো যে, আজকাল ক্যানভাসিং এব চাকবী ছাড়া অপরাপর চাকরী বড় একটা খালি থাকে না। কিন্তু ক্যানভাসিং-এর চাকরীর মজা এই যে, তাতে বাঁধা মাইনে অধিকাংশ স্থলেই পাওয়া যায় না, কমিশনের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এই

অনিশ্চিত আয়ের জন্যই বাঙ্গালীরা বড় একটা সে-চাকরীর দিকে ঘেঁসে না; অথচ ক্যানভাসিং-এর কাজে চাকরীর চেয়ে যে ঢের বেশী পয়সা মেলে একথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালীর মধ্যে একান্ত নিরুপায় যারা, ক্যানভাসিং-এর কাজে আত্মনিয়োগ করে তারা; এ-কাজের আর্ট সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকার দরুণ তাহারা অধিক রোজগারে করিতে সমর্থ হয় না, ফলে অন্য সকলেও ভাবে বুঝি ক্যানভাসিং-এর কাজে পয়সা নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখেছি গুটিকয়েক বাঙ্গালী, এবং অধিকাংশ মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী ক্যানভাসিং দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে এবং করছে।

একথা কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমাদের দেশ ক্রমশঃ শিল্পমুখী হয়ে উঠছে। এর ফল এই যে অপরাপর চাকরীর চেয়ে ক্যানভাসিং-এর কাজের জন্যই বেশী লোকের প্রয়োজন হবে। দেশে যতবেশী

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হবে ততবেশীই তাকে বাজারে পরিচিত এবং চালু করবার জন্য লোকের দরকার হয়ে পড়বে। শিল্প প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি কার্য্যের বিস্তার ঘটবে, সুতরাং এক্ষেত্রেও ক্যান্‌ভাসার এজেণ্ট প্রভৃতির চাহিদা বাড়বে। কাজে কাজেই ক্যান্‌ভাসিং কার্য্যটাকে আর উপেক্ষা করা চলে না—যদি আমরা উপেক্ষা করি ত জীবিকার্জ্জনের সংগ্রামে ক্রমশঃ আমরা হঠে যাব।

সাধারণ বাঙ্গালী যুবকের মনোবৃত্তি আলোচনা করে একথা বলা যায় যে, ক্যান্‌-ভাসিং কার্য্যের প্রতি তাদের ততটা স্পৃহা নেই। এই নিস্পৃহ উদাসীনতাই জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার ললাটে পরাজয়ের কালিমা এঁকে দিয়ে তাকে লজ্জালাঞ্ছিত করে তুলেছে। এর কারণ নির্দ্দেশে এটা বলা যায় যে বাঙ্গালীর সাধারণ চরিত্রটা হচ্ছে শ্রমবিমুখ; সঙ্গে সঙ্গে এও বলা চলে যে, বাঙ্গালীর সাধারণ মনোবৃত্তি অপেক্ষাকৃত সৌখীন প্রকৃতির। তারই জন্য আমরা চাকরী ছাড়া অন্য ব্যাপারে নামতে রীতিমত ইতস্ততঃ বোধ করি। আমরা যে শ্রমবিমুখ এটা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যায় না, কারণ, কেরাণীর কাজে আমাদের যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটতে হয় সেটা কি অস্বীকার করা চলে? কেরাণীগিরি ছাড়া অন্য কাজে আমরা যে নামতে পারিনি তার কারণ, আমাদের ঐ অপেক্ষাকৃত সৌখীন মনোবৃত্তিই তাতে বাধা দিয়েছে। সেটা দোষণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা ঠিক শ্রমবিমুখতা নয়। প্রচলিত ধারা ও পারিপার্শ্বিক সৌখীনতার আবেষ্টনী আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলেই কেরাণীগিরি ছাড়া অপর কোন জীবিকাবৃত্তির পথ খুঁজে পাইনি। বহুর দশেক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ-ব্যাপারটা আমাদের সমাজে ততটা ক্ষতি করেনি, কেননা, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। আজ কিন্তু সেদিন নেই। ধনবাদের বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে অসম্ভব লোভের বশে লাভ-নিষ্কাষণের আখ-মাড়া কল একদিন আমরাই সৃষ্টি করেছিলাম, তখন জানিনি যে, বঞ্চনার করাত সামনে পেছনে দু'ধারেই কাটতে পারে। তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মধ্যবিত্তসম্প্রদায়রূপে আমরা আজ পিষ্ট, মথিত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে চলেছি; শ্রেণী হিসাবে আমাদের মত দুঃখী বোধ হয় আর কেউ নেই। তাই এখন—সৌখীনতার দোহাই আর খাটে না। বিত্তহীন, অন্নহীন, গৃহহীন মানবের পক্ষে জীবিকার্জ্জনের প্রচেষ্টাটাই বড়, সৌখীন মনোবৃত্তি বড় নয়। সেইজন্যই কেরাণীগিরি ছেড়ে দিয়ে জীবিকা-র্জ্জনের সকল ক্ষেত্রের সংগ্রামেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

তবুও সংস্কার বাধা মানে না। এই অন্যায় সংস্কারের বশেই উকিলগিরিতে সাধারণতঃ কোন লাভ নেই জেনেও আমাদের যুবকেরা হাজারে হাজারে আদালতে ভিড় করে এবং মাষ্টারী পাবার আশায় বি, এ, এম, এ, পাশ করে যায়। এর কারণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ওকালতী ও মাষ্টারী, কেরাণীগিরির রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র কেবল একটা রূপালী পাত মোড়া পচা পানের সামিল।—এ দুটো জীবিকাবৃত্তিরও একটা সৌখীন পরিবেষ্টনী আছে। সেধার দিয়ে দেখতে গেলে উক্ত সংস্কারের প্রভাবেই বাঙ্গালীর বহু সংখ্যায়ই ক্যান্‌ভা-

সিং-এর কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত ছিল, কেননা, কেরাণীগিরি, ওকালতী ও মাষ্টারীর তুলনায় ক্যান্‌ভাসিং-এর কাজে বেশী মাত্রায় সৌখীনত্ব বর্ত্তমান। অথচ বোঝবার ভ্রান্তিতে বাঙ্গালী এইখানটায় ভুল করেছে। ক্যানভাসার নাম শুনলেই তার চোখের সামনে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর সেই কাঞ্চননগরের ছুরি, আশ্চর্য্য মলম, দাঁতের মাজন ও বিদ্যুৎ বান বিক্রেতার চিত্রই ভেসে উঠে, কিন্তু আসলে ওরা ক্যান্‌ভাসার নয়, ওরা ফেরীওয়ালা। ক্যান্‌ভাসারের কাজ স্বয়ং মাল বিক্রয় করা নয়, মাল ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করা। কেমিষ্ট্রির ভাষায় ক্যান্‌ভাসার ঠিক 'ক্যাটালিটিক এজেণ্ট' (Catalytic agent), তার এক পয়সার মূলধনের প্রয়োজন নেই, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তার নিজের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, অথচ নিজে মধ্যস্থ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটাকে সে রীতিমত প্রভাবান্বিত করে।

এই রকম ঝুঁকিহীন, নির্ঝঞ্ঝাট কাজই ত বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির উপযোগী, তবুও আমরা এ ব্যাপারটাকে এতদিন উপেক্ষা করে এসেছি। বিলাসী ভদ্রয়ানার উপাসক হয়েও সৌখীনতার ক্ষেত্র হতে বিতাড়িত হবার শেষ পর্য্যন্ত আমরা চোখের সামনে আর একটি জীবিকার্জ্জনের

সৌখীন ক্ষেত্রকে আবিষ্কার করতে পারিনি, এতে আমাদের বুদ্ধির দীনতাই পরিস্ফুট হয়। আমরা যে ক্যান্‌ভাসিং কার্য্যটীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি এতে আমরাই ঠকেছি। অথচ ঠকা আমাদের উচিত ছিল না। আমরা যদি বুদ্ধির দৃষ্টি এতটুকু খুলে রাখতাম তাহ'লে এরকমটি ঘটত না। ক্যান্‌ভাসিং কার্য্যে বেশ দু'পয়সা আছে, কিন্তু একটা ভ্রান্ত প্রচারের ফলে লোকের মনে এমনি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, সবাই ভাবে বুঝি ও পেশাটা একেবারে অর্থকরী নয়। ক্যান্‌ভাসিং কার্য্যের মত মর্য্যাদা সম্পন্ন কাজ খুব অল্পই আছে, অথচ কর্ম্মীদের বোঝবার দোষে ও কাজটা যেন ভিক্ষুকের কাজে পরিণত হয়েছে। সেইজন্যই লোকে এদিকটায় বড় একটা ঘেঁষতে চায় না।

অথচ ক্যান্‌ভাসারের বিদ্যাটা উকিলের বিদ্যার সামিল। উকিল তার মক্কেলকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ লড়ে, ক্যান্‌ভাসারও তার মক্কেল—কোম্পানীর মাল কাটাবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে। উকিলের ক্ষেত্রে বিচারের ভার গ্রহণ করে দেশের আদালত, ক্যান্‌ভাসারের বেলায় বিচারকের আসনে বসে দেশের জনমত। উভয়ের ব্যাপারেই কিন্তু বিচারকের স্বাধীন মতামত বলে কিছু নেই, সামনে যে সমস্ত তথ্য দেখতে পাবে তার ওপরই নির্ভর করে তাকে রায় দিতে হবে। একজন আসামী সত্যই খুন করল, উকিল জানলে সে খুনী, বিচারকেরও দৃঢ় বিশ্বাস হল যে সে দোষী; কিন্তু উকিল আইনের দিক দিয়ে এমন ভাবে লড়লে যে দোষী জেনেও বিচারকের খালাস দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। ক্যান্‌ভাসিং-এর বেলায়ও সেই রকম। ক্যান্‌ভাসার জানে যে তার কোম্পানীর মাল অপর কোম্পানীর চেয়ে ভাল নয়, ক্রেতাও সেটা বোঝে—তবুও ক্যান্‌ভাসারের ব্যবসা বুদ্ধিপূর্ণ ওকালতির জোরে ক্রেতাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাল কিনতে বাধ্য হতে হয়। উক্ত ওকালতির কৌশলই হ'ল ক্যান্‌ভাসিং-এর আর্ট। এই আর্ট যার আয়ত্ত নেই, সে বৃথাই ক্যান্‌ভাসিং-এর কাজ করে।

একথা বলতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্যান্‌ভাসারই ঐ আর্ট সম্বন্ধে সজাগ নয়, তাই এদেশে ক্যান্‌ভাসিং-এর পেশাটা শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হয় না। এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে প্রত্যেক ব্যাপারেই ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আছে; ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন না হলে কোন ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা নেই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্যান্‌ভাসারেই ব্যক্তিত্ব ও কলাজ্ঞান উভয়েরই অভাব আছে। ক্যান্‌ভাসারের কাজই হ'ল কোন জিনিষের আবশ্যকতা সম্পর্কে অপরকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যাতে সে জিনিসটি তার পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। ভেবে দেখুন, বস্তুর গুণাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পর্কে কতখানি গভীর জ্ঞান থাকলে তার খদ্দেরকে এই রকম বোঝানো সম্ভব হ'তে পারে। এতখানি গভীর জ্ঞানত দূরে থাক সামান্য জ্ঞান অর্জ্জন করবার প্রচেষ্টাও আমাদের দেশের সাধারণ ক্যান্‌ভাসারদের নাই। তারা আবেদন নিবেদনের ওপর নির্ভর করে, স্বাদেশিকতার দোহাই দেয় কিন্তু ভুলেও যুক্তি তর্কের অবতারণা করে না। তাদের ক্যান্‌ভাসিং কার্য্যটা যেন কতকটা অনুগ্রহ ভিক্ষার মত।

কিন্তু ক্যান্‌ভাসিং কার্য্যের তা' ত আদর্শ নয়; ক্যান্‌ভাসারের সব সময় স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রতি ব্যাপারে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে Superiority সেটা বজায় না রাখলে লোকে সহজে ভিজবে কেন বা তার দিকে আকৃষ্ট হবে কেন? কিন্তু সব ক্যান্‌ভাসারই ত প্রতিভা সম্পন্ন নয়! বিশেষতঃ সংস্কৃতি-বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কি করে সে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে? এর জবাবে এই বলা যায় যে, প্রত্যেক ক্যান্‌ভাসারেরই ক্যান্‌ভাসিং-এর আর্ট সম্পর্কে একটা বৃত্তিমূলক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেটা তার শ্রেণীগত নিজস্ব সম্পত্তি, সাধারণ সংস্কৃতি সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি সেটার অধিকারী নয়। কাজেই এক্ষেত্রে তার পক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, বাজারে নূতন দেশী 'ঝর্ণা-কলম' বেরিয়েছে, কোম্পানী তা কাটাবার জন্য ক্যান্‌ভাসার নিযুক্ত করুন। বাজারে নানা রকম ভাল ভাল কলমের যে কি রকম প্রতিযোগীতা তা' সকলেই জানেন। ক্যান্‌ভাসার যদি এক্ষেত্রে কেবল 'দেশী জিনিস ক্রয় করুন' বলে আবেদন জানায় তাহলে স্বাদেশিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই তা' কিনতে পারেন, বাদবাকী লোক তা কিন্‌বে কেন? সেই জন্যই ক্যান্‌ভাসারকে বিভিন্ন রকম 'ঝর্ণা-কলম' সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে হ'বে, কার দোষ গুণ ও মূল্যের তারতম্য কোথায় সেটাও জানতে হ'বে—তারপর তার নিজের কলমের সুবিধা কোনখানে সেটা আবিষ্কার করতে হ'বে। বিদেশী ভাল জিনিষের তুলনায় দেশী জিনিষ প্রথমে দাঁড়াতে পারবে না এটা ঠিক, কিন্তু উকিল যেমন আসামীর সমর্থনের জন্য চাতুরী পূর্ণ যুক্তি টেনে বার করে,' সেই রকম ভাবে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে দেশী জিনিষকে বিদেশীর প্রায় সমকক্ষ হিসাবে দাঁড় করাতে হবে। তারপরে দেশীয় উৎপাদন কি রকম বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, কাঁচা মালের অসুবিধা কোথায়, উৎপাদনের খরচা কি রকম, বাণিজ্য শুল্কের নিয়ম বা হার ইত্যাদি বিষয়ে রীতিমত বুঝিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে বিলাতী কোম্পানীও এই অবস্থায় এর চেয়ে ভাল জিনিস তৈরী করতে পারত না। তারপর আরও বল্‌তে হ'বে যে, বিদেশীরা কত হাজার টাকা কলমের বিনিময়ে ভারত থেকে পিটে নিয়ে যায়—সে টাকাটা দেশে থাকলে দেশের লোকের কি সুবিধা হ'তে পারে। অন্য দেশের শিল্পোন্নতির সূত্রপাতের ইতিহাসের এই রকম অবস্থায় সেখানকার ক্রেতাগণ কি রকম সাহায্য করেছিল তার ইতিবৃত্তও ব্যক্ত করতে হ'বে। তারপরে উপসংহার স্বরূপ আবেদন জানাতে হ'বে যে, other things যখন প্রায় equal তখন কেন আপনি দেশী শিল্পকে সাহায্য করবেন না।

উপরোক্ত ব্যাপার থেকে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তেমন দক্ষ ক্যান্‌ভাসারের হাতে পড়লে উদ্দেশিত ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় ফেলা যায় যে তার জিনিষ ক্রয় করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না, তা' যতই কেন না তার অনিচ্ছা থাকুক। অন্ততঃ ভদ্রতা রক্ষার জন্যও তাকে কিন্‌তে হ'বে। এক্ষেত্রে একটা জিনিষ প্রণিধানযোগ্য যে, ক্যান্‌ভাসারের চেয়ে ক্রেতা প্রভৃত শিক্ষিত হলেও ক্যান্‌ভাসারের ঐ সমস্ত তথ্যের সঙ্গে ক্রেতা পরিচিত

নয়, সেইজন্যই ক্যান্‌ভাসারের পক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা মোটেই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না। ঐ সমস্ত তথ্য বিবৃত করা ক্যান্‌ভাসিং-এর একটা টেক্‌নিক্। এই টেক্‌নিকের সাহায্যেই ক্যান্‌ভাসার ক্রেতাকে চালিত করে। যে ক্যান্‌ভাসার ক্রেতাকে চালিত করতে পারে না, স্পষ্টই বুঝতে হবে যে, ক্যান্‌ভাসিং এর টেক্‌নিক্ তার আয়ত্ত নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্যান্‌ভাসারেরই সেই দশা, সেইজন্যই তাদের পেশাটা সম্মানজনক হয় না, আরও অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত টেক্‌নিক্ ছাড়া ক্যান্‌ভাসারের আরও কতকগুলি গুণ থাকা দরকার, যেগুলো তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক ক্যান্‌ভাসারেরই সুদর্শন, মিষ্টভাষী ও মধুর স্বভাব হওয়া প্রয়োজন। শেষোক্ত দু'টি গুণ বিধিদত্ত নয়! সুতরাং যে কেউ ও গুলির চেষ্টা করলে অধিকারী হতে পারে। প্রথমোক্ত গুণটি বিধিদত্ত, কাজেই সকলেই যে সুপুরুষ হবে এমন কোন কথা নেই। সুপুরুষ না হলেও সাধারণ সাজ-সজ্জা ও অঙ্গরাগের দ্বারা নিজেকে এমনভাবে তৈরী করে নেওয়া যায়, যাতে অপরের বিরক্তি উৎপাদন না করতে হয়। অ-সুদর্শন ক্যান্‌ভাসারের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। সুপুরুষ লোকের একটা ক্ষমতা এই যে, সে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—ক্যান্‌ভাসিং কাজের পক্ষে সেটা মস্ত সুবিধা। যারা সুপুরুষ নয় তারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, অথচ ক্যান্‌ভাসিং-এর গোড়ার কথাই হ'ল কোন রকমে লোকের মনে নিজের স্থান করে নেওয়া। রূপ ছাড়া ভাষণই মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে, সেইজন্যই অ-সুদর্শন ব্যক্তির পক্ষে ভাষণের বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। রূপ চোখ ভোলায়, কিন্তু কথা মন ভোলায়—সেইজন্য রূপের চেয়ে ভাষণ অধিকতর গুণ-বিশিষ্ট। এমন অনেক স্থলে দেখা গেছে যে, রূপ না থাকলেও ভাষণের জন্য লোকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। সুতরাং ভাষণের প্রতি সকলের অধিকতর মনোযোগী হওয়া দরকার, সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা প্রয়োজন যে, ভাষণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যখন সবেমাত্র কারও সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে তখন যেন সে ব্যক্তি আপনার ওপর বিরূপ হয়ে না উঠে।

এবার ভাষণ জিনিষটা কি সেটারই আলোচনা করা যাক। কথা সবাই বলে, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সেই একই বাক্য—'আমার মালটা নিয়ে দেখুন না, এটা ভাল।' কিন্তু ঐ একই কথা কারও কারও বলবার বৈশিষ্ট নিত্য নতুন হয়ে উঠে। এই বলবার বৈশিষ্ট্যের কোন ফরমুলা নেই, একে আয়ত্ত করবার কোন ধবা বাঁধা উপায় নেই—এটা সাধনা ও সংস্কৃতি সাপেক্ষ। গলার স্বর ভাষণের বৈশিষ্ট্য লাভে রীতিমত সাহায্য করে, কিন্তু শুধু মিষ্টি আওয়াজই সবটা নয়, তার সঙ্গে বলার ভঙ্গিমা থাকা দরকার। এই ভঙ্গিমাই হ'ল কথা বলার আর্ট।

কেউ যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয় তাহলে মনোহারী লোকেদের কথা বলার সময় লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে তাঁদের প্রত্যেক বাচনেই মুখের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী, চোখের একটা আকর্ষণীয় ইঙ্গিত, কণ্ঠস্বরের ওঠানামার একটা তীব্র মাধুর্য্য ফুটে ওঠে—সেইটাই হ'ল ভাষণের বৈশিষ্ট্য। ইংরাজীতে যাকে বলে

dialogue এর টেক্‌নিক্ modulation ও delivery, সেই তিনটিরই সংমিশ্রণ থাকা দরকার। ধরুণ কথাটা—'কি করে হয় বলুন ত ? কেমন করে পারি ?' এই যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, 'বলুন ত' ও 'পারি'র ওপর একটা কোমল টান এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার মুখচোখের একটা অপরূপ ইঙ্গিত ভাষণকে অতি মনোহর করে তোলে—শ্রোতার সাধ্য নেই, তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠে। ব্যাপারটা ঠিক কথায় বোঝানো যায় না, এটা অনুভূতির ব্যাপার। শরৎ চন্দ্রের 'শেষপ্রশ্নে'র 'কমল' চরিত্র যার জানা আছে সেই বুঝবে ভাষণের বৈশিষ্ট্য কি জিনিষ এবং মানুষকে তা' কতখানি আকর্ষণ করে।

কিন্তু অজ্ঞানতা নিয়ে ভাষণ চলে না, তার জন্য জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন। সে-জ্ঞানের মধ্যে যে বিরাট পাণ্ডিত্য থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। ইংরাজীতে একটা অবজ্ঞাসূচক প্রবাদ বাক্য আছে যে Jack of all trades but master of none ; কিন্তু ক্যান্‌ভাসারদের কোন কিছুর master না হয়ে Jack of all tradeই হওয়া দরকার। কোন ক্যান্‌ভাসারের ফিলজফার, অর্থনীতিজ্ঞ বা সমাজতত্ত্ববিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার ঠিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা হওয়ার প্রয়োজন আছে ; সে সবকিছুরই খানিকটা করে জানবে যাতে সকল ব্যাপারেই তার ফুট্ কাটবার মত ক্ষমতা ও অধিকার থাকে। কোন অর্থনীতিবিদকে যদি মাল গছাতে হয় ত সে যেন তার সঙ্গে দেশের মুদ্রামান, জনসংখ্যা, জিনিষের উদ্বৃত্ত মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা চালাতে পারে। এতে অর্থনীতিবিদের তার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, তিনি তখন তাকে আর সামান্য ক্যান্‌ভাসার হিসাবে মনে করেন না। কিন্তু ক্যান্‌ভাসারের ঐ প্রাথমিক আলোচনা পর্য্যন্ত জ্ঞানের দৌড় ; তখন তার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অর্থনীতি-বিদকে ক্রমশঃ বলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া—তাতে তিনি সন্তুষ্ট হ'ন। এই সন্তুষ্টিই ক্যান্‌ভাসারের কাজ হাসিল করে।

এই রকম প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও প্রতিটি ব্যাপারে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা ক্যান্‌ভাসিং কাজকে কখনো এরকম ভাবে গ্রহণ করেনি, তাই তারা এধারে সুবিধা করতে পারে না। অথচ রীতিমত অভিজ্ঞ হয়ে যদি একাজে নামা যায় তাহ'লে এ-পেষাটা যে অর্থকরী সেটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। খবরের কাগজে বাঁধা মাইনের চাকরী খালির বিজ্ঞাপন আর নেই, খালি ক্যান্‌ভাসিং-এর বিজ্ঞপ্তিই চোখে পড়ে। সুতরাং শিক্ষিত বেকারগণ এধারে সজাগ হোন।

ছোলার রপ্তানী বাণিজ্য

ভাত বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য হওয়ার দরুণ ছোলার বিষয়ে তারা ততো আগ্রহশীল নয়; কিন্তু ভারতের অপরাপর অংশের অধিবাসীরা ছোলা সম্পর্কে খুবই আগ্রহশীল। পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছোলা উৎপন্ন হয়, বিহারেও বড় কম হয় না, কেননা, ঐ সব স্থানে ছোলা এবং ছোলাজাত ছাতু, ছোলা ভাজা ইত্যাদি প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য হয়। সারা ভারতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমিতে ছোলার চাষ হয়ে থাকে। ১৯৩৪-৩৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ ৭১ হাজার টন, এটা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিছুটা কম। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৩-৩৪ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টন। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার ছোলা চাষের প্রধান ক্ষেত্র হ'লেও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, বোম্বাই, সিন্ধুপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি স্থানেও ছোলার চাষ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ নূতন ছোলা এপ্রিল মাসে বাজারে আসে এবং বর্ষার পূর্ব্বেই বাজার রীতিমত জেঁকে ওঠে।

অপরাপর ডাল জাতীয় শস্যের মতই ছোলার আভ্যন্তরিক চাহিদা এত বেশী যে, প্রাচুর্য্যের সময়ও এ বস্তু ততটা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হ'তে পারে না। নিম্নে ছোলার বিভিন্ন সময়ের একটা রপ্তানী তালিকা দেওয়া গেল :—

বছর	পরিমাণ	মূল্য
সাল	টন	পাউণ্ড
১৯১৩-১৪	৬৯,৫৯৭	৪১৫,১০৪
১৯১৮-১৯	২৮২,১৯৩	২,২৩৩,৪১৪
১৯৩১-৩২	১৫,৮৯০	১২৬,৯০২
১৯৩২-৩৩	৩০,৩৯৪	২১৭,৩২৩
১৯৩৩-৩৪	২৮,৮৬৭	১৯৩,১৪৫
১৯৩৪-৩৫	২৭,৭৪৩	১৬৮,৯৭৩
১৯৩৫-৩৬	৭,৫০১	৫৯,০২৩

উক্ত রপ্তানী বাণিজ্য প্রধানতঃ করাচী, বোম্বাই ও রেঙ্গুনের বন্দর দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যুক্তরাজ্য, সিংহল, ষ্ট্রেট্স্ সেটেল্মেণ্ট্, মরিসাস্, এডেন প্রভৃতি স্থানে রীতিমত ছোলা চালান যায়; ফরাসী দেশও মোটা অংশ ক্রয় করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানী ভারতীয় ছোলার একজন রীতিমত ক্রেতা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পরে সে মাল কেনা একেবারে বন্ধ করে দেয়। পরে ১৯৩৩-৩৪ সালে সে আবার ভারতীয় ছোলা কিন্‌তে আরম্ভ করে কিন্তু তার পরিমাণ বড় কম—মাত্র ৪,৭০০ টন। তালিকায় ১৯১৯ সালে রপ্তানী সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ ঐ বছর ইজিপ্ট্ ও

ইতালী থেকে বেশী মাত্রায় অর্ডার ছিল। ঐ বছরের পর রপ্তানী রীতিমত হ্রাস পায়, সেইজন্য ১৯২২ পর্য্যন্ত সরকার থেকে রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তার ফলে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ে বটে কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থায় আর ফিরে আসে না। বর্ত্তমানেও সেই অবস্থায় বজায় রয়েছে। বরং ১৯৩৫-৩৬ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ভয়ঙ্কর হ্রাস পেয়েছে।

কলিকাতার বাজারে ছোলার রপ্তানী বাণিজ্য মণ দরেই সাধিত হয়ে থাকে কিন্তু বোম্বাইয়ের বাজারে ছোলা ১৬৮ থেকে ১৯৬ পাউণ্ডের বস্তায় বিক্রয় হয়। করাচীতে ৮ মণী ঝুড়ি হিসাবে বা ১৬৪, ২০৫, ২০৬, ২২৪ পাউণ্ডের থলে হিসাবে বিক্রীত হয়ে থাকে। রেঙ্গুনে ১৬০ থেকে ২২৪ পাউণ্ডের থলে হিসাবে বা ৬৫পাউণ্ডী ঝুড়ির ১০০ ঝুড়ি লাটে বিক্রয় হয়।

জাওয়ার ও বজরার রপ্তানী বাণিজ্য

পূর্ব্বে ছোলার রপ্তানী বাণিজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, এবার জাওয়ার ও বজরার রপ্তানী বাণিজ্যের কথা বিবৃত হ'বে। ছোলার মতই জাওয়ার মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবীদের প্রধান খাদ্য, সেইজন্যই মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও যুক্তপ্রদেশে উপরোক্ত শস্যের রীতিমত চাষ হয়ে থাকে। পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশেও কিছুটা চাষ হয়। ১৯৩৩-৩৪ সালে সারা ভারতবর্ষে ৬১ লক্ষ ৯১ হাজার টন জাওয়ার উৎপন্ন হয়েছিল, ১৯৩৪-৩৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩ লক্ষ ৩০ হাজার টনে দাঁড়ায়। জাওয়ার শুধু শস্য হিসাবেই খাদ্য নয়, পরন্তু ওর গাছের শীষ গুলোও খড়ের মত পশুদিগের এক পুষ্টিকর খাদ্য।

বজরারও রীতিমত চাষ হয়ে থাকে। বোম্বাই, সিন্ধুদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই বস্তুটীর প্রচুর চাষ হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারেও চাষ হয়ে থাকে তবে তা' অপেক্ষাকৃত অল্প। ১৯৩৩-৩৪ সালে সারা ভারতের উৎপাদন পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ ২৮ হাজার টন, জাওয়ারের মতই পরবর্ত্তী বৎসরে তা' বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টনে দাঁড়ায়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানী বৃদ্ধি পায় না, কেননা, ছোলার মত জাওয়ার ও বজরাও আভ্যন্তরিক চাহিদার দরুণ দেশের মধ্যেই বেশীর ভাগ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নিম্নে আমরা জাওয়ার ও বজরার রপ্তানী বাণিজ্যের একটি তালিকা প্রদান করলাম :—

	পরিমাণ	মূল্য
বছর	টন	পাউণ্ড
১৯১৩-১৪	৮৪,২৯৪	৫৭৬,১৬৪
১৯১৮-১৯	৫,৩৯৬	৫৬,১৮২
১৯৩১-৩২	৫৮,৫০৩	৩১৮,৬৬৪
১৯৩২-৩৩	১৫,৫৩০	৯৯,১০৬
১৯৩৩-৩৪	৫,০৮২	৩৬,০32
১৯৩৪-৩৫	৪,৩৯০	৩১,০২০
১৯৩৫-৩৬	৮,৫৪৩	৬২,৭২৪

বোম্বাই ও করাচী বন্দর হইতেই বেশীর ভাগ মাল রপ্তানী হয়ে থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এডেন, ইঙ্গ, মিশরীয় সুদান ও বিদেশী রাজ্যের মধ্যে আরব, জার্ম্মানী, নেদারল্যাণ্ডস্, ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকাই প্রধান ক্রেতা।

করাচী বন্দরে উক্ত শস্যদ্বয় ৮ মণী ঝুড়ি বা ১৬৪ থেকে ২১০ পাউণ্ডী থলেতে করে বিক্রীত হয়ে থাকে। বোম্বাইতে জাওয়ার ও বজরার বিক্রয় পরিমাণের পৃথক ব্যবস্থা। রেঙ্গুন থেকে ইউরোপে সাধারণতঃ ২২৪ পাউণ্ডী থলেতে করেই মাল চালান যায়।

পত্রাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** ব্যবসায়ের সন্ধান দিবার এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য

৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,"—ফ্যাও,—ফ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে এবং পোষ্টেজ না পাঠাইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি,—**আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ১৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

আপনার ৭।২।৩৮ইং তারিখের একখানি আশ্বিন সংখ্যা পত্রিকা পাইলাম।

নাগপুর ও কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনের মধ্যে যে সকল মেল ট্রেন যাতায়াত করে তাহার যে রেলওয়ে টাইম টেবেল, বই ও ম্যাপ আছে তাহা অতি সত্বর জানাইবেন; প্রাপ্তি মাত্র আমি ডাক টিকেট পাঠাইয়া দিব। আপনার কাছে যদি নাও থাকে অন্যের কাছে খুঁজিয়া পাঠাইবেন।

নিবেদন ইতি----
শ্রীজয়রাম সরকার
মিরিপাড়া

১নং পত্রের উত্তর

আপনি যে রেলওয়ে টাইম টেবিল চাহিয়াছেন, তাহার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশন (কলিকাতা) Wheeler's Bookstall এই ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন। চিঠির সহিত ছয় আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

—*—

২নং পত্র

মহাশয়,

আমাদের এখানে প্রচুর তেঁতুল বীচি ও করঞ্জার বীচি সংগ্রহ করা আছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দুইটি জিনিসের খরিদ্দারের ঠিকানা জানাইবেন। ইতি—

শ্রীনবকুমার অধিকারী
গ্রাহক নং ৫৭৭৬
গ্রাম খানজাপুর
পোঃ গোপমহল
জেঃ মেদিনীপুর

২নং পত্রের উত্তর

(১) তেঁতুলের বীচির কোন ধরাবাঁধা খরিদদার নাই। ইহা প্রধানতঃ গো-মহিষাদির পাঁচ মিশেলী খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, তেঁতুল বীচির শাঁসের গুঁড়া, ভুষি, খড়কুচি, খৈল প্রভৃতি খাদ্যের সহিত গো-মহিষাদিকে খাইতে দিলে উহারা খুব হৃষ্টপুষ্ট হয়। শূকরকে খাওয়াইলে উহার দেহের চর্ব্বি বৃদ্ধি পায়। যখন গো-মহিষাদির অন্যান্য খাদ্যের অভাব হয়, তখনই অনেকে তেঁতুল বীচি ব্যবহার করিয়া থাকে। সেইজন্য ইহার কেনা-বেচার বিশেষ কোন কারবার নাই। গৃহস্থেরা নিজ নিজ গ্রাম হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া লয়।

তেঁতুলের বীচির শাঁস জলে ভিজাইয়া জ্বাল দিয়া এক রকম আঠার মত জিনিষ তৈয়ারী করা হয়। উহা প্রতিমার সাজ তৈরী করার জন্য সোলার ফুলাদি আঁটিতে কারীকরেরা পূর্ব্বে ব্যবহার করিত; তাহা ছাড়া চিত্রকরেরা রংয়ের সহিত মিশাইয়া রংকে পাকা করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সামান্য প্রয়োজনে তেতুল বীচির কেনা-বেচার কারবার চলে না।

(২) করঞ্জার বীচি হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। এক সময়ে কলিকাতার অসাধু ব্যবসায়ীরা সরিষার তৈলে উহা ভেজাল স্বরূপ ব্যবহার করিত। কলিকাতা করপোরেশন আইনের দ্বারা সেই অসাধুতা দমন করিয়াছেন। এখন আর করঞ্জার তৈল বাজারে চলেনা। উড়িষ্যার জঙ্গলে প্রচুর করঞ্জাগাছ আছে। সেখানকার লোকেরা করঞ্জার বীচির

তৈল জ্বালানী রূপে ব্যবহার করে। করঞ্জার তৈল কাপড়কাচা, সাবান তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এবিষয় এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ। আপনি যদি করঞ্জার বীচি হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া কিছু তৈল আমাদের নিকট পাঠাইতে পারেন তবে আমরা তাহা বিশেষজ্ঞ কেমিষ্টের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দেখিতে পারি। যদি কাপড় কাচা সাবান তৈরীর পক্ষে উহা উপযোগী বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে উহার অফুরন্ত কাট্‌তি হইতে পারে। কিন্তু সেজন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন এবং আনুষঙ্গিক কিছু ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা আমাদের স্বপ্ন-বিলাসী বচন বাগীশ বাবুদের আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কোনও মাড়োয়ারীর চোখে পড়িলে তাহারা উহা করিবে!

এই সকল জিনিষের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার দেখাইতে না পারিলে খরিদ্দার পাওয়া অসম্ভব। তথাপি আমরা আপনার পত্রের মর্ম্ম গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছি। তদৃষ্টে কোন ব্যবসায়ী আপনার সহিত সাক্ষাৎভাবে যদি পত্র ব্যবহার করেন এই আশায়।

৩নং পত্র।

মহাশয়,

নিবেদন এই যে, আমি বহুকাল যাবৎ রুহিত, কাতলা প্রভৃতি মাছের ডিম যাহা এক-প্রকার খুড়িতে করিয়া বিক্রয় করে—যাহা পুকুরের জলে রাখিলেই ঐ সব ডিম হইতে উক্ত মাছের পোনা হয়, সেই ডিম অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত তার কোনই সন্ধান করিতে পারি নাই। আশা করি আপনি দয়া করিয়া উক্ত রুহিত, কাতলা প্রভৃতি মাছের ডিমের খুড়ি কোথায়, কোন্ ঠিকানায়, কিরূপ অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

শ্রীহবিবর রহমান খাঁ।
পোঃ—বামনডাঙ্গা
গ্রাম—মণিরাম।
জেঃ—রংপুর।

৩নং পত্রের উত্তর

আপনি যে মাছের ডিম চাহিয়াছেন, তাহা বর্দ্ধমান জেলার মগরা নামক স্থানে পাওয়া যায়। মগরা, ই, আই, রেলের একটী ষ্টেশন। আপনি নিজে আসিয়া জেলেদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিয়া কিনিবার বন্দোবস্ত করিবেন। কলিকাতাস্থ বৈঠকখানার জেলেদের নিকটেও এই সময় পাওয়া যায়।

৪নং পত্র।

শ্রীযুক্ত 'ব্যবসা বাণিজ্য' পত্রিকার সম্পাদক
সমীপেষু—

মহাশয়,

'ইন্‌সুরেন্স' পত্রিকার শেষ ভাগে আপনাদের প্রদত্ত একটী বিজ্ঞাপনে দেখিলাম "সূতার গুলির কল বিষয়ক" আমি বহুদিন হইতে ঐ ধরণের কল অনুসন্ধানে ছিলাম। আমার মনে হয় পাটের সূতা কাটা হাত দ্বারা কিংবা পা দ্বারা চালান কল বাজারে পাওয়া যাইতে পারে। পাটের সূতা কাটা কল কত মূল্যের? কোথায়

পাওয়া যাইতে পারে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া জানাইলে বড়ই উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

বিনীত—
শ্রীরামপদ মৌলিক
পোঃ—রায়গঞ্জ
জেঃ—দিনাজপুর

৪নং পত্রের উত্তর।

আমরা যে গুলি সূতার কল বিক্রয় করিয়া থাকি তাহাতে বাজার হইতে সূতার ফেটী কিনিয়া গুলি পাকান যায়। পাটের সূতাকাটা কল বাজারে চলন নাই। বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ হইতে এক প্রকার কল তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাতে চরকার মত হাতে চালাইয়া পাটের সূতা তৈয়ারী করা হয়। সেই সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাদের নামোল্লেখ করিয়া নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন;—

Director of Industries, Bengal,
7 Council House Street, Calcutta.
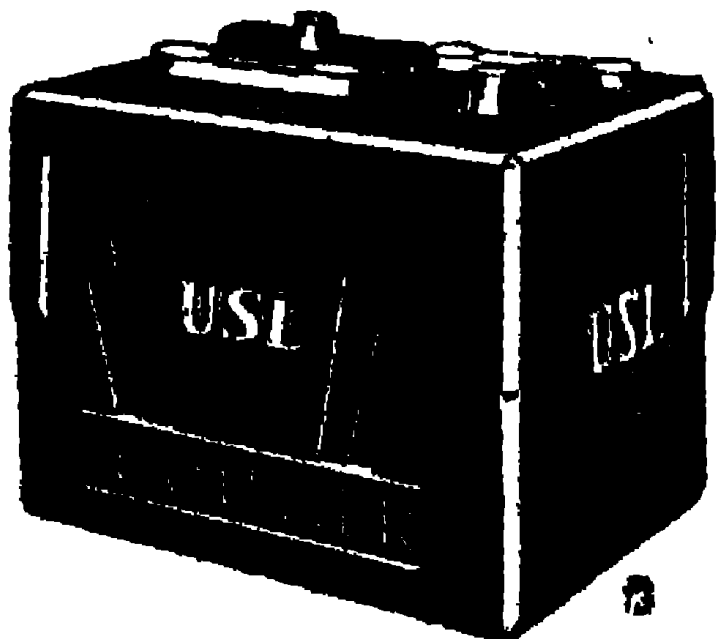
বার্লি প্রস্তুতের প্রক্রিয়া

এমন মানুষ এদেশে খুব কমই আছে যে জীবনে কখনো বার্লি খায়নি। বস্তুতঃ, বার্লি যেন আমাদের সংসারের এক অপরিহার্য দ্রব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার্লির টিন আজ প্রতি ঘরে ঘরেই বিরাজমান। বার্লি যে শুধু রোগীর পথ্য তা' নয়, উহা শিশুর খাদ্যও বটে। সেইজন্যই বার্লির কাটতি আজ অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। কেউ যদি শুধু ঘরমুখো "ডেলি প্যাসেঞ্জার"দের লক্ষ্য করেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে, তারা কি পরিমাণ বার্লির টিন হাতে নিয়ে চলেছে। ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছাড়া আরও কত সম্প্রদায়ত রয়েছে, তাদের ব্যবহারের পরিমাণ ধরলে বার্লি উৎপাদন যে একটি লাভজনক কারবার সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না।

বছর দশেক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছিল যে, বিদেশী বার্লিই বাজার ছেয়ে রাখত। তখন ভাল বার্লি বলতেই ক্রেতাদের মনে জেগে উঠ্‌ত 'রবিন্সনের' বার্লির কথা। সেইজন্য বিলাতী বার্লিই বাজারে কাটত বেশী। তারপরে আস্তে আস্তে দেশী বার্লিও বাজারে দেখা দিলে, বর্ত্তমানে তা রীতিমত চালু হয়েছে। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিলাতী বার্লি এখনো যথেষ্ট বিক্রীত হয়। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশী বার্লির উৎপাদন বৃদ্ধির এখনো যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে—তার জন্য আরও কারখানা খোলা যেতে পারে।

একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, টিনের বার্লি যে কি জিনিস সে-সম্পর্কে অনেকের কোন সঠিক ধারণা নেই। আসলে বার্লি যে কি বস্তু তা' ওর ঐ নাম থেকেই টের পাওয়া যায়, কিন্তু টিনে ভর্ত্তি শুভ্র পাউডার যে সামান্য যব থেকে তৈরী একথাটাই অনেকে সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ বার্লি আমাদের দেশে উৎপাদিত যব-এরই মিহি গুড়ো। সেই পরিষ্কৃত গুড়োই বাক্সে প্যাক্ হয়ে রীতিমত বিক্রী হচ্ছে।

এই বার্লি বা যবের চাষ গমের চাষের মত অতি প্রাচীনকাল থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বার্লির জাতের রকমফের আছে, তন্মধ্যে Hordeum distichum নামক জাতের বার্লি বন্য অবস্থায় মধ্য এসিয়ার কয়েকটী স্থানে জন্মাতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে যে জাতের বার্লি বা যত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে তার নাম হ'ল Hordeum hexastichum। ইউরোপে উৎপাদিত বার্লির প্রধান জাতকে Hordeum Vulgare নামে অভিহিত করা হয়। পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে

ইউরোপীয় বার্লি অপেক্ষা ভারতীয় বার্লিতে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার বর্ত্তমান।

ভারতবর্ষের বহু যায়গায় বিশেষতঃ যুক্ত-প্রদেশে যবের চাষ হয়ে থাকে। যবের চাষের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এবস্তব চাষ পৃথকভাবে সম্পন্ন হয় না, ছোলা, মটর বা গমের সঙ্গে একত্রে চাষ হয়ে থাকে। পূর্ব্বেই বলেছি যে টিন ভর্ত্তি পরিষ্কার গুড়ো বার্লি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যবই হ'ল একমাত্র কাঁচামাল, সুতরাং যব চাষের সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে যে যবের চাষ ছোলা, মটর বা গমের সঙ্গে একত্রে সাধিত হয় কিন্তু গম ও যবের একত্র চাষ অনেক লোক পছন্দ করে না। যবের সঙ্গে সরিষা ও তিষির চাষও হয়ে থাকে। যব চাষের পক্ষে হালকা বালু জমিই উপযোগী। যবের চাষের সুবিধা এই যে, এর জন্য বেশী মাত্রায় সার প্রদানের প্রয়োজন হয় না। খুব বেশী পরিমাণ ফসল পেতে গেলে বিঘা পিছু জমিতে ১০।১২ মণ গোবর, ৬।৭ সের হাড়ের গুড়ো ও ৫।৬ সের সালফেট অব অ্যামোনিয়াই যথেষ্ট। জমিতে যব চাষের জন্য খুব বেশী লাঙ্গল দেবারও প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু দেখা দরকার যেন মাটি ঢেলা পাকিয়ে না থাকে। জমিতে বীজ

বপনের পূর্ব্বে বার চারেক লাঙ্গল দিলেই কাজ চলে যায়। তবে অবস্থানুযায়ী অল্প বিস্তর রকমফের হতে পারে। সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে বীজ ছড়ানো হয়, তারপরে জমি সমতল করে জলশেচনের উপযোগী নালা প্রস্তুত করে দেওয়া হয়ে থাকে। বিঘা পিছু ১২।২০ সের বীজ আবশ্যক হয়, বীজ উৎকৃষ্ট হলে ১৪।১৫ সেরেই কাজ চলে। গমের চেয়ে যব গাছ অধিকতর অযত্নসহিষ্ণু অর্থাৎ গমের মত যব চাষে ততটা যত্ন না নিলেও চলে। সুতরাং যব চাষে যে খুব বেশী জলসিঞ্চনের প্রয়োজন তা নয়। চারাগুলি ৬ ইঞ্চি পরিমাণ বর্দ্ধিত হলে বিঘাপিছু ১০ সের সল্টপিটার মিশ্রিত ৫ মণ পরিমাণ জল যথেষ্ট। আসলে, বাংলাদেশে যব চাষের জন্য জলসিঞ্চনের কোন ব্যবস্থাই করা হয় না, কারণ আবহাওয়ার গুণে বাংলাদেশের মাটি ভিজেই থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল পাকে এবং সে সময়ে যবশীর্ষগুলিকে কাটা হয়, পরে সেগুলি ঝাড়াই-এর পর যব পাওয়া যায়।

এই গেল যব-চাষের প্রণালী। উক্ত যব থেকেই টিনে ভর্ত্তি পাউডার বার্লি প্রস্তুত হয়ে থাকে। যবকে ভেঙ্গে ঐ বার্লি তৈরী হয়। এই বার্লি প্রস্তুতের কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। প্রথমে যবগুলিকে কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়, তারপরে সেগুলো রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া হয়ে থাকে। এইবার তাদের খোলা ছাড়ানো হয়, খোলা ছাড়ানো হবার পর সেগুলিকে আবার মৃদু উত্তাপে শুষ্ক করা হয়ে থাকে। পরে সেগুলোকে হামানদিস্তাতে ফেলে গুঁড়ো করা হয় এবং সেই যবের গুঁড়ো শাসকে কাপড় কিংবা ছাকনীতে ছেঁকে নিলেই পরিষ্কার বাজারের বার্লি পাওয়া যায়। এই হ'ল বার্লি প্রস্তুত করণের সংক্ষিপ্ত প্রণালী।

বাজারে আর এক প্রকারের বার্লি পাওয়া যায় তার নাম পার্ল্ বার্লি (Pearl Barley)। এই বার্লি প্রস্তুতের প্রক্রিয়াও ঠিক পূর্ব্বেরই মত তবে যব ভাঙ্গা ও গুড়াকরণের ব্যাপার এটাতে আরও অধিক যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে। পূর্ব্বোক্ত বার্লির যবের শুধুমাত্র খোসাটাই ছাড়ানো হয় কিন্তু পার্ল বার্লির যবের শুধু খোসাটাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে চার ধারের খানিকটা শাসও বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে, পার্ল্ বার্লির যবের শুধুমাত্র ভেতরকার গোল শাঁসটুকুই বর্ত্তমান রয়।

সাধারণ বার্লি যবকে মৃদু উত্তাপে শুকিয়ে নিলেই চলে কিন্তু পার্ল্ বার্লির যবকে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত চুল্লীতে শুষ্ক করা হয়। এই চুল্লীটি আর কিছুই নয়, প্রকাণ্ড বড় উনুনের ওপর টালি বিছিয়ে সমতল ক্ষেত্র বানানো হয় এবং তার ওপর এক ফুট পুরু করে যব ঢেলে দেওয়া হয়ে থাকে। এধারে উনুনের উত্তাপ ১০৫° ডিগ্রি ফরানহাইটে রাখা হয় এবং উত্তপ্ত টালির উপরের যবগুলিকে অনবরত নাড়া হ'তে থাকে। যতক্ষণ না জলীয় ভাগ সম্পূর্ণ নিষ্কাষিত হয় ততক্ষণ এই রকমই চলে। যাঁরা মুড়ি ভাজার চাল তৈরীর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা জিনিসটা সবিশেষ বুঝতে পারবেন।

যবের খোসা ছাড়ানো ও যব ভাঙ্গার ব্যাপারটা পরিষ্কার জানা দরকার। এর জন্য পাথরের জাঁতা আছে, ঐ জাঁতা একটি গোলাকার লোহার পাতলা পাতের বাক্সে বসানো থাকে। বাক্সটির উপরকার ঢাকনীটা কাঠের এবং বাক্সটির গায়ের চারধারে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। জাতার মুখ দিয়ে যব ঢোকানো হয়,

জাতার পাথর মিনিটে ২০০ বার ঘোরে এবং তার ফলেই যবগুলি ভেঙে যায় ও তাদের খোসা আলাদা হয়ে যায় কিন্তু তা' একেবারে গুড়িয়ে যায় না। বাক্সটির ভেতরের দিকটা খসখসে, জাতার ভেতর থেকে ভাঙ্গা যবগুলো বাক্সের মধ্যে পড়ে। জাতা অত জোরে ঘোরার দরুণ হাওয়ার যে গতি হয় তদ্দ্বারা যবগুলো বাক্সের গায়ে ধাক্কা খায় এবং তার ফলেই যবের শাস থেকে খোলা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় ও শাস অন্য যায়গায় জমা হয়। তারপর সেই শাঁসগুলিকে পেষণ যন্ত্রে ফেলে মিহি করে গুড়ো করার পর তা' টিন ভর্ত্তি হয়ে বাজারে চালান যায়।

বার্লির আবশ্যকতা ও কাটতির কথা প্রথমেই বলা হয়েছে, এ বস্তুর যে চাহিদা আছে সে-সম্পর্কে দ্বিমত নেই। আরও দেখানো হয়েছে যে, বহুল পরিমাণ বিদেশী মাল বাজারে বিক্রীত হয়—এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হবে যে দেশের চাহিদা মেটাতে আমরা এখনো সক্ষম হইনি। সুতরাং যে ক'টি দেশী কারখানা আছে তা' ছাড়া আরও কারখানা খোলা যেতে পারে এবং সেটা আবশ্যক। দেশের মূলধনী সম্প্রদায়ের আমরা এধারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁরা টাকা খাটাবার ক্ষেত্র খুজে পান্ না কিন্তু এরকম বহু শিল্প প্রসারতার ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে লগ্নী করলে শুধুমাত্র তাঁরাই লাভবান হবেন না, দেশের লোকের বেকারত্ব ঘুচবে ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

শিল্পপ্রসঙ্গ

হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্প

(শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি)

হস্ত নির্ম্মিত কাগজ, কলের কাগজ অপেক্ষা কোন্ কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা গত ১৩৪৪ সালের চৈত্র মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' আলোচনা করিয়াছি। ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখনও হস্ত নির্ম্মিত কাগজের ছোট ছোট কারখানা আছে। কিন্তু ভারতীয় কাগজ শিল্পীরা সেই পুরাতন প্রণালীই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সকল নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, এদেশের লোক এখনও সে সব কিছু জানিতে পারে নাই,—অথবা জানিলেও অভ্যাসগত সংস্কারবশে তাহা গ্রহণ করিতেছে না।

বংলাদেশে ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত আউট্‌সাহী গ্রামে, হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের নিকট কতিপয় গ্রামে এবং হাওড়া জেলায় আমতা সহরে কুটীর শিল্পরূপে হস্ত-নির্ম্মিত কাগজের কারবার সামান্য রকম প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বোম্বাই, এবং নিজাম রাজ্য, ভারতবর্ষের এই সকল প্রদেশের নানা স্থানে অল্প বিস্তর হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই শিল্পীরা সেই মান্ধাতার আমলের প্রণালী আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। ফলে শিল্পের প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইতেছে না, বরঞ্চ দিন দিন উহা বিনষ্ট হইবার পথেই চলিয়াছে। এমন কি চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি দেশের শিল্পীরা যে প্রণালীতে হাতে কাগজ তৈয়ারী করে, তাহাও ভারতীয় শিল্পীদের কাগজ নির্ম্মাণ প্রণালী অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ঐ সকল দেশে এক্ষণে ক্রমশঃ আধুনিক প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষ এখনও পশ্চাতে বহুদূরে পড়িয়া আছে।

ভারতীয় শিল্পীরা হস্ত নির্ম্মিত কাগজে কেবল মাত্র রদ্দি কাগজের মণ্ড বা পাল্প্ ব্যবহার করে। তাহারা রদ্দি কাগজ জলে পচাইয়া উহাকে পায়ে দলিয়া মাড়ের মত করিয়া লয়। সেই পাতলা মাড় হইতে জালি নির্ম্মিত ছাঁচের সাহায্যে কাগজ তৈয়ারী করে। কিন্তু কেবল

মাত্র রদ্দি কাগজের মণ্ড ব্যবহার করিলে উহার দ্বারা ভাল কাগজ তৈয়ারী হয় না। এই মণ্ডের সঙ্গে কাপড়ের ন্যাকড়া এবং মাছ ধরিবার জালের ন্যাকড়া পচাইয়া মিশাইতে হয়। কিন্তু ন্যাকড়ার মণ্ড করিতে হইলে পায়ে দলিলে চলিবে না। কোন কোন স্থলে পচান ন্যাকড়া ও রদ্দি কাগজকে ঢেঁকিতে কুটিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ঢেঁকিতে কুটা, অথবা পায়ে দলা, কিছুতেই খুব ভাল মণ্ড তৈয়ারী হয় না। মণ্ডটী সর্ব্বত্র সমান হওয়া দরকার, কোথাও গাঢ়, কোথাও পাতলা হইলে চলিবে না।

ভারতের অনেক স্থানেই বিশেষতঃ বাংলা-দেশে এই হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্প নষ্ট হইয়া-গিয়াছে। ইহার পুনরুদ্ধারের জন্য বহুকাল যাবৎ কেহ চেষ্টা করেন নাই। খদ্দর আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন, এই কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা যে কিঞ্চিৎ মাত্র ও সফল হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। আমার বিবেচনায় নিম্ন লিখিত প্রণালীতে কার্য্য করিলে এই বিলুপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, কলের তৈয়ারীই হউক, কিম্বা হাতের তৈয়ারীই হউক, কাগজ ভাল মন্দ নির্ভর করে পাল্প্ বা মণ্ডের উপর। মণ্ড দুই প্রকার মিক্যানিক্যাল ও কেমিক্যাল। মিক্যানিক্যাল পাল্প্ প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ কাঠ, ঘাস প্রভৃতিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ডাইজেষ্টার যন্ত্রে কষ্টিক সোডার সহিত ষ্টীমের চাপে সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে ঐ সকল পদার্থ নরম হইয়া গেলে, উহাদিগকে ডিসইন্‌টিগ্রেটার যন্ত্রে ফেলিয়া ভাঙ্গা হয়। তারপর বীটার নামক যন্ত্রে চালাইয়া উহাদের ফাইবার বা আঁশকে পৃথক করিয়া খুব পাত্‌লা মণ্ডে পরিণত করা হয়। কেমিক্যাল পাল্প প্রস্তুত করিতে কাঠ, ঘাস প্রভৃতি কাঁচা মালকে রাসায়নিক মশলা সংযোগে একেবারে নরম কাদার মত করিয়া ফেলা হয়। ডিস্‌ইন্‌টিগ্রেটারের গুরুতর আঘাতে ইহাদিগকে চূর্ণ করা হয় না। সেইজন্য কেমিক্যাল পাল্পে আঁশ বা ফাইবার গুলি বেশ লম্বা লম্বা থাকে। সুতরাং তাহাতে তৈয়ারী কাগজ শক্ত ও ভাল রকমের হয়। কারণ লম্বা আঁশগুলি সহজেই কাপড়ের মত বুনন খাইয়া পরস্পর খুব আঁট লাগিয়া যায়। ইহাকে কাগজ শিল্পীরা বলে পাল্পের ফেল্টিং ক্ষমতা (Felting Power)। মিক্যানিক্যাল পাল্পের আঁশ গুলি খুব ছোট ছোট হয়। সেই জন্য উহার দ্বারা তৈয়ারী কাগজ কম জোরাল। সাধারণতঃ খবরের কাগজ ছাপিবার নিমিত্ত এবং অন্যান্য ছোট খাট কাজে সস্তাদরের যে কাগজ ব্যবহার করা হয়, তাহা ঐ মিক্যানিক্যাল পাল্পে তৈয়ারী হইয়া থাকে।
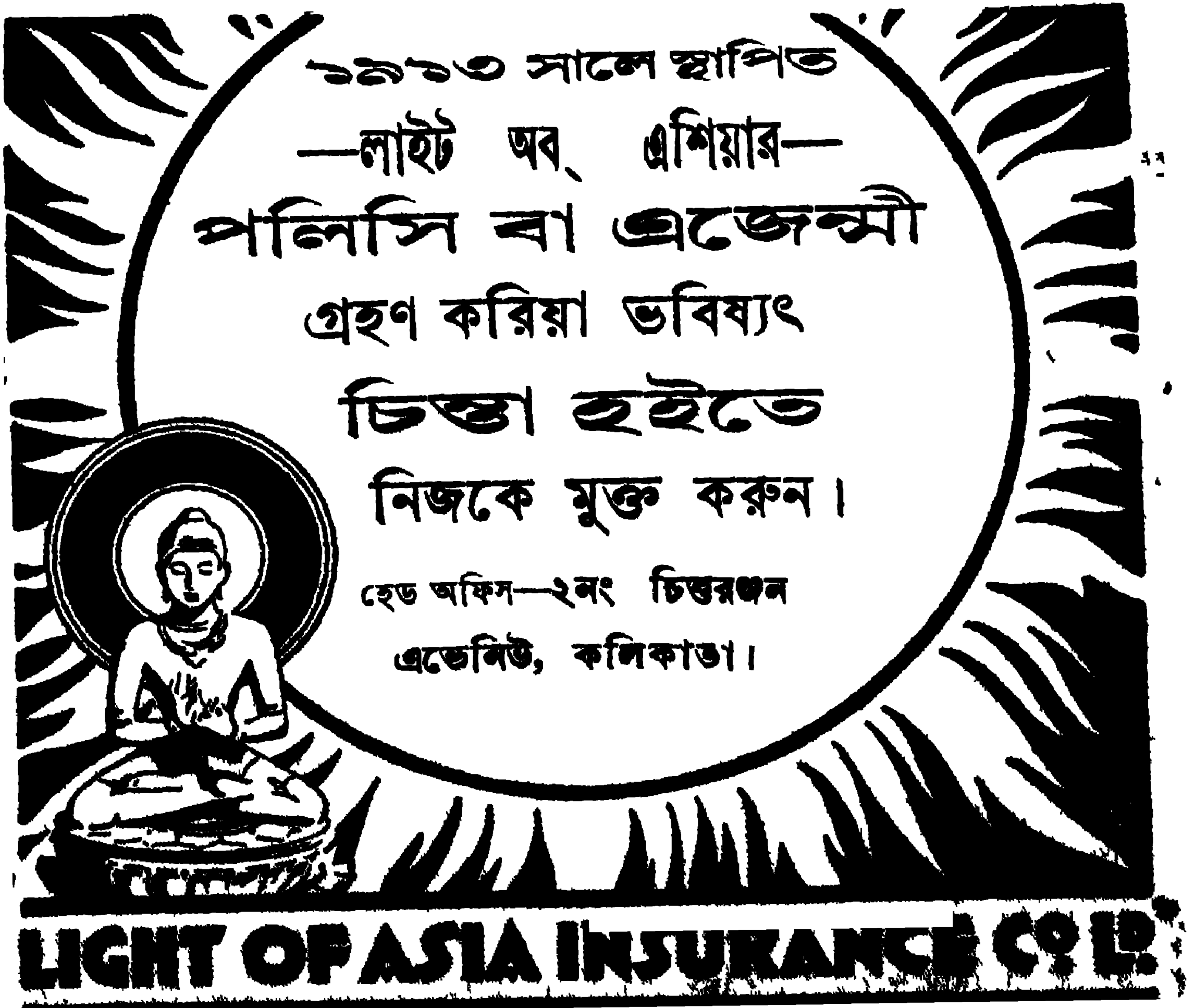
ভারতীয় কোন কাগজের কলে মিক্যানিক্যাল অথবা কেমিক্যাল কাষ্ঠ মণ্ড তৈয়ারী হয় না। উহা নরওয়ে, সুইডেন, ক্যানাডা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে আসে। এখানে উহার সহিত প্রয়োজন মত সাবয় ঘাস (এসপার্টো), ন্যাকড়া, রদ্দি পাট, শন, রদ্দি তুলা (কাপড়ের কলের স্কাচার নামক যন্ত্র হইতে যে রদ্দি তুলা বাহির হয়), প্রভৃতি মিশাইয়া নানা রকমের কাগজ তৈয়ারী হয়। এদেশে কাষ্ঠ মণ্ড প্রস্তুত না হইবার কারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, ভারতবর্ষে না কি উপযুক্ত কাষ্ঠের

স্বভাব। যাহা হউক সম্প্রতি বাঁশ হইতে পাল্প্ রা মণ্ড তৈয়ারী হইবার ব্যবস্থা এখানকার কাগজের কলে হইয়াছে এবং বাঁশের মণ্ড নির্ম্মিত কাগজও বাজারে চলিতেছে, সকলেই দেখিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতে কাষ্ঠ মণ্ড ও কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য পাঞ্জাবে (জগধারী নামক স্থানে) একটী বৃহৎ কারখানা স্থাপনের আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজদের মূলধনে ও পরিচালনায় ঐ কোম্পানী গঠিত হয়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই উহা উঠিয়া যায়। সম্প্রতি শুনিতেছি, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদ (নিজাম) রাজ্যে কাগজের কল এবং পাল্প্ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে।

যাহা হউক, কাগজ নির্ম্মাণ শিল্পে পাল্প্ বা মণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে এত কথা বলিলাম। যাঁহারা হস্ত নির্ম্মিত কাগজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই পাল্প্ তৈয়ারীতেই অসুবিধায় পড়িতে হয়। রদ্দি কাগজ ও রদ্দি ন্যাকড়া পচাইয়া, ঢেঁকিতে কুটিয়া, হামান দিস্তায় ছেঁচিয়া অথবা পায়ে দলিয়া মণ্ড তৈয়ারী করা নিতান্ত সোজা কাজ নহে এবং সেই মণ্ড ভালও হয় না। যাহাতে পরিশ্রম বেশী এবং জিনিষও খারাপ হয়, সেই শিল্প ব্যবসায় চলিতে পারে না। ভারতের হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্প নষ্ট হইবার প্রধান কারণ ইহাই। সুতরাং উহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শিল্পীরা যাহাতে অল্প পরিশ্রমে

এবং অল্পব্যয়ে ভাল মণ্ড পাইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেইজন্য আমার মনে হয় বাংলাদেশের যে যে স্থানে হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্পের কেন্দ্র আছে, সেই সকল স্থানে মণ্ড তৈয়ারী করিবার জন্য বীটার যন্ত্র বসান দরকার। ঐ সকল অঞ্চলে ইলেকট্রিক শক্তি না পাওয়া গেলে ক্রুড্-অয়েল ইঞ্জিনের দ্বারা বীটার চালান যাইতে পাবে। এই বীটাব যন্ত্র স্থানীয় মিস্ত্রীর দ্বারা অল্প খরচে অনায়াসেই তৈয়ার করা যায়। এই যন্ত্রের মধ্যে বিগ্‌ড়াইয়া যাইবার এমন কিছু নাই। দীর্ঘকাল পরে রোলার ও বেড্-প্লেটের লোহার ছুরিগুলি বদ্‌লাইতে হয়। এবিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

ঢেঁকিতে কুটিলে কিম্বা হামানদিস্তায় ছেঁচিলে পাল্পের আঁশগুলি কাটিয়া ভাঙ্গিয়া ছোট হইয়া যায়। সুতরাং তাহাব ফেল্টিং ক্ষমতা নষ্ট হয়। কিন্তু বীটাব যন্ত্রে তাহাব সম্ভাবনা নাই। ঘূর্ণমান রোলাব ও বেড্‌প্লেটেব ছুরিতে পচান কাগজ ও ন্যাকড়ায় আঁচড লাগে, সুতরাং তাহাতে আঁশগুলি কাটিয়া যায় না। এই কারণেই বীটাবে তৈয়াবী পাল্প্ ভাল হয়। যদি বীটার চালাইবার জন্য ষ্টীম্ ইঞ্জিন ব্যবহার করা যায়, তবে ঐ ষ্টীমের কিয়দংশের দ্বারা একটা ছোট ডাইজেষ্টার যন্ত্রের সাহায্যে ঘাস ও খড় হইতে পাল্প্ তৈয়াবীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গো-শালার অপচীত খড়,—যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়,—তাহা ডাইজেষ্টারে ষ্টীমের চাপে সিদ্ধ করিয়া পাল্প্ প্রস্তুত করা যায়। বীটার যন্ত্রের সঙ্গে ষ্টাফ্-চেষ্ট্ ('ষ্টাফ chest') চালাইলে আরও ভাল। এই যন্ত্রে পাল্পকে উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া অনবরত নাড়াচাড়া করিতে হয়। বেশী পরিমাণ পাল্প্ হইলে এই কার্য্য হাতে করা অসুবিধা। মাঝামাঝি সাইজের দুইটী বীটার ও একটী ষ্টাফ্-চেষ্ট্ হইলে ৮ ঘণ্টায় দুই টন কাগজেব উপযোগী পাল্প্ করা যায়। যে সকল গ্রামের নিকটে কাগজের কল আছে, সেই সকল গ্রামের কাগজ শিল্পীরা কাগজের কল হইতে পাল্প্ কিনিয়া লইতে পারে। যেমন তাঁতীরা কাপডেব কল হইতে সূতা কিনিয়া বাড়ীতে হাতের তাঁতে কাপড তৈয়ারী করে, কাগজ শিল্পীবাও সেই পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কবিতে হইলে ইহা ছাড়া আব অন্য উপায় নাই। কাগজ শিল্পীদেবে ভাল মণ্ড জোগান দিতে হইবে।

শুধু মণ্ড নহে,—আমাদের কাগজ শিল্পীরা যে মৌল্ড্ (Mould) ও ডেক্‌ল্ (Deckle) ব্যবহাব করে তাহারও উন্নতি করা দবকার। সাধাবণতঃ সরু ছোলা বাঁশের কাঠি অথবা এক প্রকাব শর জাতীয় কাঠির দ্বারা উহারা জালি বা মৌল্ড্ নির্ম্মাণ কবে এবং বাঁশের বাখারী দিয়াই ডেক্‌লেব কাজ চালায়। আমার মনে হয়, কাগজের কলে যে wire-cloth বা সূক্ষ্ম তার নির্ম্মিত জালি ব্যবহার হয়, তাহারই পুরাণো টুকরা দ্বারা মৌল্ড্ তৈয়ারী করা উচিত। কাগজের কলে রাবার নির্ম্মিত ডেক্‌ল ষ্ট্র্যাপ্ থাকে। হস্ত নির্ম্মিত কাগজে পাত্‌লা কাঠের ফ্রেম্ (ছবির ফ্রেমের মত) তৈয়ারী করিয়া ডেক্‌ল্ রূপে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। ডেক্‌লের দ্বারা কাগজের ধার এবং স্থূলত্বা ঠিক হইয়া থাকে। কাগজের কলে wire-cloth বা জালি [illegible]

(যাহাকে ইংরাজীতে Web বলা হয়) কুচ্-রোলারের (Couch roll) মধ্য দিয়া চাপিয়া নেওয়া হয়। হস্ত নির্ম্মিত কাগজে সেইরূপ একটু চাপ দিবার জন্য ফেন্টের টুক্‌রা ব্যবহার করা উচিত। একখানা ফেন্টের উপরে এক খানি কাগজ, তার উপরে আর একখানি ফেল্ট, তার উপরে 'আর একখানা কাগজ, এইরূপে ফেল্ট ও কাগজ একান্তর ভাবে সাজাইয়া আন্দাজমত সামান্য চাপ দেওয়া আবশ্যক।

কলের কাগজ ষ্টীমে উত্তপ্ত এবং ঘূর্ণ্যমান রোলারের উপর দিয়া চালাইয়া শুকান হয়। উহাতে চলন্ত বুনন (Web) কাগজ অর্দ্ধ গোলাকার হইয়া যাওয়াতে, আঁশগুলির জোর কমিয়া যায়। হস্ত নির্ম্মিত কাগজ বিছান অবস্থায় (ফ্ল্যাট্ ভাবে) অল্প রৌদ্রের আঁচে অথবা ছায়ায় শুকাইতে হয়। ঝুলাইয়া শুকাইলে বাঁকিয়া যায়। হস্ত নির্ম্মিত কাগজ গরম রোলারের জোর চাপে পালিশ করা উচিত নহে। কড়ি, শঙ্খ, প্রভৃতির দ্বারা ঈষৎ চাপে রগ্‌ড়াইয়া লইলেই ভাল হয়। এইরূপে নানা দিকে হস্ত নির্ম্মিত কাগজের উন্নতি করা আবশ্যক।

কিছুকাল পূর্ব্বে ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে, মিঃ ডার্ড্ হাণ্টার নামক একজন আমেরিকা দেশীয় কাগজ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দেশীয় অঞ্চলে হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্পের অবস্থা কিরূপ, তাহা অনুসন্ধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চীন, শ্যাম, কোরিয়া, জাপান, মালয় উপদ্বীপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষেই হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্পের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। তিনি বাংলাদেশের আউটসাহী (বিক্রমপুর) আমতা, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন। তিনি বলেন "ভারতবর্ষে যে ভাবে হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্প চলিতেছে, তাহাতে গৌরব করিবার কিছুই নাই,—এমন কি উহাকে একটা সামান্য রকমের ব্যবসায়ও বলা যায় না। বাস্তবিক একথা বলাই ঠিক যে, ভারতবর্ষে "হস্ত নির্ম্মিত কাগজ" নামক কোন শিল্পের অস্তিত্ব নাই।" যাঁহারা ভারতের কুটীর শিল্প সমূহের পুনরুদ্ধারের জন্য যত্নবান, তাহাদিগকে আমরা মিঃ হাণ্টারের এই কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যাঁহারা বাংলাদেশে হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি এই প্রবন্ধের উপসংহারে জানাইতেছি, যদি তাঁহারা এই শিল্পের কোন কেন্দ্রে (আউটসাহী, আমতা অথবা তারকেশ্বর) শিল্পীদিগকে উত্তম পাল্প্ বা মণ্ড সরবরাহ করিবার জন্য বীটার যন্ত্র, ষ্টাফ্ চেষ্ট্ এবং ছোট ডাইজেষ্টার বসাইতে চান, তবে আমি অল্প ব্যয়ে ঐ সকল যন্ত্র দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা তৈয়ারী করাইয়া দিতে পারি। ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার সম্পাদকের নিকট আমার ঠিকানা পাওয়া যাইবে।

আলপিন প্রস্তুত প্রণালী

সামান্য ছোট ছোট জিনিসের প্রতি লোকের অবহেলা ও অমনোযোগ থাকলেও ছোটখাটো বস্তুর ব্যবসা বড় মন্দ চলে না। দু' পয়সায় ২৫ টা সূচ রাস্তার ধারে বিক্রয় হয়, আমরা তার দিকে অবহেলা ভরে তাকাই, নয়ত অবাক বিস্ময়ে ভাবি যে এত সস্তায় এ জিনিস কি করে বিক্রীত হয়, কিন্তু ঐ সুঁচের ব্যবসায়েই জার্মানী আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার টাকা পিটে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম ফেরীওয়ালারা ২ হাত কার এক পয়সায় বিক্রী করত, আজ তা' পয়সায় ১০ হাত করে বিক্রীত হয়—কিন্তু সামান্য এই কার-ফিতের ব্যবসা যে কি রকম ভালভাবে চলে তা আমাদের ধারণা নেই। মেয়েদের চুল বাঁধবার জন্য মাথার কাঁটা সামান্য জিনিসই, কিন্তু তারও হাজার হাজার টাকার কাটতি এদেশে। ঝিনুকের বোতাম এক সময় পয়সায় দু'টো করে বিক্রী হত, আজ তা' পয়সায় দু'ডজন পাওয়া যায়—কিন্তু খোঁজ নিলে জানা যাবে যে, দেশে এই ঝিনুকের বোতামেরই বড় কারখানা আছে। এই রকম অগণিত ছোটখাটো জিনিসের নাম করা যায় যার ব্যবসা ভালভাবে চলে ও চলেছে কিন্তু সামান্য জিনিস বলেই আমরা সেধারে নজর দিই না।

আমরা যাকে বাংলায় আলপিণ বলি সেটাও ঐরকম একটা সামান্য জিনিস এবং সামান্য বলেই দেশী ব্যবসায়ীদের সেধারে নজর নেই। অথচ ব্যবসায়ী মহলে ও অফিস অঞ্চলে এই আলপিন যে দৈনন্দিন কি রকম কাজে লাগে তা' বোধ হয় কাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে না। অফিসের প্রত্যেক লোকটির টেবিলের ওপর একবার দৃষ্টিপাত করলেই আপনি দেখতে পাবেন যে, রঙচঙে ভেলভেটের প্যাডের ওপর সাজানো আলপিন ঝক্ঝক্ করছে। এধারে ওধারে যে সমস্ত ফাইল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে তার প্রায় প্রত্যেকখানি কাগজ পত্রের মধ্যে আলপিন বিদ্ধ হয়ে বর্ত্তমান। সাঙ্কেতিক লিপিকার যে সমস্ত চিঠি টাইপ করছে তার প্রত্যেকখানিই খামের সঙ্গে আলপিন দিয়ে আঁটা হয়ে সই হ'তে যাচ্ছে। এই রকম যে কত ব্যাপার তার কোন ইয়ত্তা নেই।

এই যে আলপিন—এ সমস্তই বিদেশ থেকে আমদানী হয়। একবার রাধাবাজারে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে, দেশী আলপিনও তৈরী হচ্ছে কিন্তু সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ কিছু অবগত নই। দেশী আলপিন যদি প্রকৃতই তৈরী হয়ে থাকে তাহ'লে আমাদের চেয়ে কেউ অধিকতর বেশী খুসী হ'বে না; কিন্তু আশঙ্কা এই যে, আজকের বাজারে দেশী মার্কার ছদ্মাবরণে অনেক বিদেশী জিনিষ চলে যাচ্ছে। চক্ষের সম্মুখে ত দেখা যায় 'মেড্ ইন্ জাপান' মার্কা গাঁট গাঁট কাপড় সম্পূর্ণ স্বদেশী বস্ত্রে

রূপান্তরিত হচ্ছে। তাতে ক্রেতার স্বদেশ প্রেম সম্পূর্ণ বজায় থাকে কিন্তু দেশীয় শিল্পের আর্থিক ক্রমোন্নতি বজায় থাকে না। সেই রকম ভাবেই বিদেশী পিন্ যদি স্বদেশী আল্‌পিনে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তাহ'লে আর বলবার কি আছে?

অথচ আল্‌পিনের ব্যবসা বেশ চালু ব্যবসা। দেশীয় মূলধনী সম্প্রদায়ের এই আল্‌পিন প্রস্তুতের দিকে পূর্ব্বেই নজর পড়া উচিত ছিল। এই আল্‌পিন সামান্য বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অপরাপর সামান্য জিনিষের মতই এই আল্‌পিনের দরুণই হাজার হাজার টাকা বিদেশে বেরিয়ে যায়। এছাড়াও সেফ্‌টিপিন আছে। মূলধনী সম্প্রদায়ের পূর্ব্বেই এধারে নজর পড়া উচিত ছিল আমরা এইজন্যই বললাম যে, আল্‌পিন তৈরী করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপারও নয়, প্রভুত ব্যয়সাধ্যও নয়। আল্‌পিন প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল হিসাবে শুধুমাত্র তারের প্রয়োজন। সেই তারটি মেসিনের সাহায্যে সর্ব্বত্র আল্‌পিনের মত সমান পরিধি বিশিষ্ট তৈরী হয়, তারপর সেগুলি আল্‌পিনের সাইজ প্রাপ্ত হবার পর তাতে মুণ্ডি লাগানো হয়ে থাকে। পরে মেসিনের দ্বারা এক প্রান্ত ছুঁচালো করা হয়। তারপর সব পিন্‌গুলিকে নিকেল করার পর সেগুলি কাগজে বিদ্ধ হয়ে বিক্রয়ার্থ চালান যায়। এই হ'ল আল্‌পিন প্রস্তুতের গূঢ় রহস্য।

উপরোক্ত ব্যাপার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে আল্‌পিন প্রস্তুতের ব্যাপারে তেমন কোন জটিলতা নেই। সুতরাং আমাদের ধারণা যে আল্‌পিন প্রস্তুতের কল ক্রয়ের জন্য বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। আমরা উপরে আল্‌পিন প্রস্তুতের যে ব্যবস্থার উল্লেখ করেছি সেটা হ'ল পুরাতন ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থানুযায়ী তারকে প্রথমে সমান সরু করবার জন্য লোহার প্লেটের নানারকম সরু গর্ত্তের ভিতর দিয়ে টানা হ'ত। এই রকম ভাবে প্রস্তুত তারটিকে তারপর মেসিনের সাহায্যে কেটে তার একপ্রান্ত ধারালো করা হ'ত এবং ভোঁতা প্রান্তটিতে মুণ্ডি লাগানো হ'ত। ঐ মুণ্ডিটা আর কিছুই নয়, উক্ত তার এক খণ্ড নিয়ে তার গায়ে আর এক খণ্ড সরু তার পাক দিয়ে জড়িয়ে দেওয়ার পর পূর্ব্ব তারটিকে খণ্ড খণ্ড করলেই পাকানো মুণ্ডি পাওয়া যায়, পরে ঐ মুণ্ডি নিয়ে আল্‌পিনের মাথায় বসিয়ে 'রিবেট্' করে দিলেই আল্‌পিন প্রস্তুত হ'ত।

এই যে পুরাতন ব্যবস্থা, এর প্রধান ত্রুটী হচ্ছে যে, এতে আল্‌পিনের মাথা ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশী এবং প্রকৃতপক্ষে ঘট্‌তও তাই। সেইজন্যই উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বহু চেষ্টার পর সে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। বর্ত্তমানে উন্নত ধরণের যা' যন্ত্র বেরিয়েছে তা' একেবারে 'অটোমেটিক্' অর্থাৎ আপনা থেকেই তাতে সব কিছু সম্পন্ন হয়। কাঁচামাল হিসাবে তারটিকে একধারে যুগিয়ে দিলেই তা' মেসিনের মধ্যে নানারকম প্রক্রিয়ার পর আল্‌পিন আকারে অপর প্রান্ত দিয়ে একটি পাত্রে পড়ে; সেই পাত্রের ধারে অগ্রভাগ ছুঁচালো করবার যন্ত্র লাগানো আছে,—আল্‌পিনগুলি এক এক করে তার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ছুঁচালো হয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর তাদের যন্ত্র সাহায্যেই কাগজে বিদ্ধ করে প্যাক্ করা হয়। পরে তারা বিক্রয়ার্থ চালান যায়।

এই হ'ল আলপিন প্রস্তুতের আসল ব্যাপার। আমাদের দেশে দিনের পর দিন আলপিনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য, কেননা, এদেশে ক্রমশঃ শিল্পের প্রসার ঘটছে। শিল্প প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য অফিস ইত্যাদিরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, সুতরাং চিঠিপত্র, ফাইল প্রভৃতির কাজ চালাতে গেলে আলপিনের ব্যবহার অপরিহার্য্য। দেশীয় মূলধনী সম্প্রদায় এই আলপিন, সেফটিপিন প্রভৃতির কারখানা খুলে লাভবান হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা এধারে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রোহিত মৎস্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুষ্করিণী, তাহার জল ও মৃত্তিকা

পুষ্করিণী শব্দে, মৎস্য পালন উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত জল আনয়ন ও জল বহিষ্করণেব বন্দোবস্তযুক্ত আবদ্ধ জলের আধাবকে বুঝিতে হইবে। কোন্ পুষ্করিণীতে কত মৎস্য পালন করা যাইতে পারে তাহা পুষ্করিণীব আয়তনের উপর যত নির্ভর না করে, তাহাতে মৎস্য পোষণোপযোগী খাদ্য কি পরিমাণ আছে তাহার উপর তত নির্ভর করে। তজ্জন্য পুষ্কবিণীব স্বাভাবিক মৎস্যখাদ্যের পরিমাণ বিবেচনায় তাহার অভাব পূরণার্থ অতিরিক্ত খাদ্য যোগ করা আবশ্যক। ঐ মৎস্য খাদ্য জলেব নিম্নে মৃত্তিকায় এবং জলেব মধ্যে থাকে। বৃহৎ মৎস্য অল্প গভীব জলে না থাকিলেও অল্প গভীর জলেব উপকাবীতা অস্বীকার করা যায় না, কারণ, তথায় ক্ষুদ্র জলজ জীব সকল বৃদ্ধি পায় ও অসংখ্য পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি করে। তথা হইতে তাহারা গভীর জলে রোহিতের আবাস ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পুষ্করিণীতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকা আবশ্যক।

জলের গভীরতা, জলপ্লাবন ও সূর্য্যকিরণ

পুষ্করিণীর জলেব নীচে মৃত্তিকায় মৎস্যখাদ্য রূপে যে সকল জলজ জীব থাকে তাহাদের সংখ্যা জলের গভীবতা বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস হয়। তজ্জন্য যদি ঐ মৃত্তিকার উপাদান—পুষ্করিণীর সকল স্থানেই এক প্রকৃতিব হয়, তাহা হইলে গভীর স্থান অপেক্ষা অল্প জলেব নীচেই অধিক পরিমাণ মৎস্যখাদ্য থাকে। দুইটী সমান আয়তনের পুষ্কবিণী মধ্যে তাহাদেব তলদেশের মৃত্তিকাব উষ্ণতার উপব মৎস্যখাদ্যের পরিমাণের তাবতম্য নির্ভব করে। তজ্জন্য পুষ্করিণী খনন সময়ে, তাহা অধিক গভীর কি তাহাব তীর জল হইতে খাড়া উঁচু করা উচিত নয়। অত্যন্ত অল্প গভীর হইলেও কোনও কোনও স্থানে জঙ্গলা উদ্ভিদ জন্মিয়া তাহা ক্ষুদ্র জলজ জীব গুলির খাদ্য হরণ করে।

যে পুষ্করিণীতে এক বৎসরের অধিক বয়সের মৎস্য থাকে অথচ যাহার গভীরতা অল্প তাহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র গভীর চৌকা রাখা আবশ্যক, কারণ গ্রীষ্মোত্তাপ দীর্ঘকাল-

স্থায়ী হইলে, মৎস্য তথায় আশ্রয় লইতে পারে এবং তাহাতে ক্ষুদ্র মৎস্যও শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়। রোহিত মৎস্য পালন জন্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীই সুবিধাজনক। বায়ু ও উত্তাপ সহজে জল মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে জৈব পদার্থ সকল (Organic substances) সহজে বিশ্লিষ্ট হয় এবং অল্প গভীর উদ্ভিদহীন জলের তাপাঙ্ক সহজে বৃদ্ধি পায়।

পুষ্করিণীর মৃত্তিকাও—বিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। পুষ্করিণীর জল হইতে রোহিত তাহার খাদ্য অন্বেষণ করে এবং সেই খাদ্য গ্রহণ কালে তৎসঙ্গে পাঁক মৃত্তিকা উদরস্থ না হয় তাহাও দেখা আবশ্যক, কারণ ঐ পাঁক জীর্ণ হয় না, উদর ভার করে। তজ্জন্য তলদেশে যাহাতে পাঁক না জন্মে তাহাও দেখা বিশেষ আবশ্যক। ঐরূপ কর্দ্দম না থাকিলে মৎস্যখাদ্য ক্ষুদ্র জলজ জীবও বৃদ্ধি পায়। পুষ্করিণীর জলে জঙ্গলা উদ্ভিদ না জন্মে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পুষ্করিণীর জল সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া দিয়া তলদেশের পঙ্ক দূর করতঃ কিছুকাল তাহাতে রৌদ্র ও বাতাস লাগাইলে পাঁক জন্মে না ও তাহা মৎস্য খাদ্য বৃদ্ধির উপযোগী হয়। মৎস্য ধরার পর ঐরূপ করিতে হয়, কখন কখন শীত ঋতুতে ঐরূপ জল নিষ্কাষণ করিয়া পুকুরের তলদেশে রৌদ্র ও বাতাস লাগাইবার জন্য তাহা পতিত রাখিতে হয়। জল পরিবর্ত্তন না করিলে রোহিত মৎস্য বৃদ্ধি পায় না।

কৃষিকার্য্যে যে সকল সার মূল্যবান, রোহিত মৎস্যের জন্য পুষ্করিণীতেও সেই সকল সার তদ্রূপ মূল্যবান। কৃষিকার্য্যে যেমন অনেক স্থলে উর্ব্বর ভূমিতে সার দেওয়া আবশ্যক করে না, রোহিত মৎস্য পালন জন্যও অনেক পুষ্করিণীতে সার দেওয়া আবশ্যক করে না।
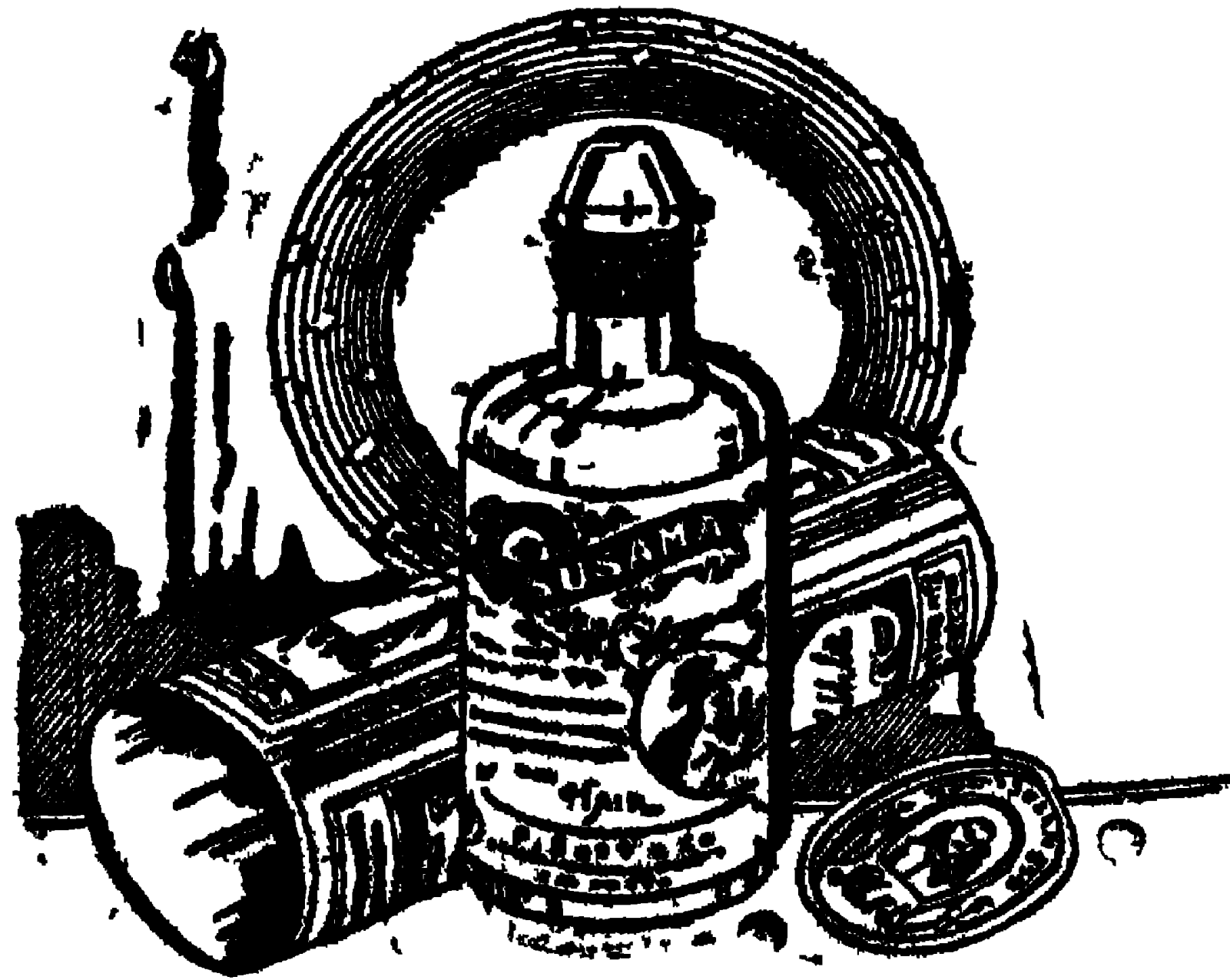
মৎস্য পালনে পুষ্করিণীর মৃত্তিকা ও জল এই দুইটিই মৎস্য খাদ্য জোগায়। বৃষ্টির জলে ধৌত অনেক সার পুষ্করিণীর মধ্যে পতিত হয়, তাহার যে গুলি জলে গলিয়া যায় তাহা জলস্থ জীবাণু সকলের শরীর পোষণে ব্যয় হয় এবং যেগুলি তলদেশে মৃত্তিকার উপর পতিত হয় তাহা ক্ষুদ্র জলজ জীববর্গের খাদ্যে পরিণত হয়। শেষোক্ত জলজ জীববর্গ জলস্থ জীবাণু (Infusuria) সকল ভক্ষণ করে। তৎপরে ঐ সকল ক্ষুদ্র জলজ জীব বড় হইলে মৎস্যেরাই তাহা ভক্ষণ করে। ইহাতে দেখা যায়, যে স্থলে জলের তলদেশের মৃত্তিকায় কি বৃষ্টির জলে ধৌত পদার্থ মধ্যে সার থাকে সে স্থলে সেই সার (Manure) প্রকারান্তরে রোহিত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সাহায্য করে।

যে স্থলে সাক্ষাৎ ভাবে রোহিতকে খাদ্য না দেওয়া হয়, সেস্থলে পুষ্করিণীর তলদেশের মৃত্তিকায় ঐ সার না থাকিলে, মাঠে যেমন অনুর্ব্বর ভূমিতে সার দেওয়া আবশ্যক করে, তদ্রূপ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

চূণ

পাথর চুণে জল দিয়া তাহা চূর্ণাকারে পরিণত করতঃ পুষ্করিণীর তলদেশের মৃত্তিকায় (অবশ্য জল নিষ্কাষণের পর তাহা শুষ্ক বা জলশূন্য হইলে) সর্ব্বত্র সমান ভাবে ছিটাইয়া দিতে হয়। একবারে অধিক পরিমাণে না দিয়া একাধিক বারে অল্প অল্প করিয়া চুণ দেওয়া ভাল। তাহাতে রোহিতের ওজন বৃদ্ধি ও বর্ণ পীত কি ঈষৎ পীত হয়।

ফস্ফরাস্

নিম্নশ্রেণীর ক্ষুদ্র জলজ জীবের পোষণ জন্য ফস্ফরাস্ আবশ্যক। যে মৃত্তিকায় ফস্ফরাস্ উপাদান না থাকে তাহাতে ফস্ফেট্সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। পুষ্করিণীর জল নিষ্কাষনের পর মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে এবং তাহাতে পুনর্ব্বার জল পূর্ণ করার অনেক সময় পূর্ব্বে ঐ সকল ফস্ফেট্সার প্রয়োগ করা উচিত, জল পূর্ণ করার অল্প পূর্ব্বে ঐ সার দিলে জঙ্গলা অনিষ্টকর উদ্ভিজ বৃদ্ধি পায়।

নাইট্রোজেন

ক্ষুদ্র জলজ জীবাণু হইতে বৃহৎ মৎস্য পর্য্যন্ত সকল জল জন্তুর শরীরের মাংস বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন্ উপাদান—অধিক আবশ্যক করে। তজ্জন্য নাইট্রোজেন্ প্রধান সার প্রয়োগ আবশ্যক।

মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীর মলমূত্রের মধ্যে নাইট্রোজেন্ উপাদান অধিক থাকে। যে পুষ্করিণীতে ঐ সকল মলমূত্র অধিক পরিমাণে পতিত হয় তাহার রোহিত মৎস্যও সেই পরিমাণ বৃহৎ হয় ও সংখ্যায় বাড়ে। পুষ্করিণীর জলের মধ্যে মধ্যে কিম্বা জল নিষ্কাষনের পর তাহার তলদেশ শুষ্ক হইলে তাহাতে গোবর সার, মনুষ্যের মলমূত্র ইত্যাদি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শীতকালে পুষ্করিণীর তলদেশের মৃত্তিকার মধ্যে স্থানে স্থানে গর্ত্ত করিয়া ঐ সকল পুতিয়া রাখিলে তাহা পচিয়া সারে পরিণত হয় এবং ক্ষুদ্র জলজ জীবদের বৃদ্ধি পাওয়ার এক একটি কেন্দ্র স্বরূপ হয়।

নাইট্রোজেন্ প্রধান ও ফস্ফরাস্যুক্ত খাদ্য রোহিতকে খাওয়ান আবশ্যক। রোহিতের চর্ব্বণ শক্তি দুর্ব্বল বিবেচনায় খাদ্য কঠিন আকারে প্রদত্ত না হয় ইহাও মনে রাখা আবশ্যক।

সকল বিষয়েই ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে স্থলে অন্য কোনও সুবিধা না থাকে

নাইট্রোজেন প্রধান ও ফস্‌ফরাস্‌যুক্ত খাদ্য রোহিতকে খাওয়ান আবশ্যক। রোহিতের খাদ্য চর্ব্বণ শক্তি দুর্ব্বল বিবেচনায় তাহা কঠিন আকারে প্রদত্ত না হয় ইহাও মনে রাখা আবশ্যক।

সকল বিষয়েই ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে স্থলে অন্য কোনও সুবিধা না থাকে কেবল সেই স্থলেই সাক্ষাৎ ভাবে মৎস্যকে খাদ্য প্রদান লাভজনক হয়।

যে পুষ্করিণীতে রোহিত মৎস্য ডিম্ব প্রসব করে ও ডিম্ব হইতে ছানা (পোনা) জন্মে তাহাতে মৎস্য খাদ্য না থাকিলে ছানাগুলি শীঘ্র বড় হইতে না পারায় অনেক শত্রু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং অনেকগুলি বড় না হইয়া ক্ষুদ্রাকার থাকে। সাক্ষাৎভাবে খাদ্য প্রয়োগে পোনাগুলি শীঘ্র শীঘ্র বড় হয় ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইলে সাক্ষাৎভাবে খাদ্য প্রদানই সুবিধাজনক। নচেৎ পোনাগুলি পুষ্করিণী হইতে উঠাইয়া তাহাদিগকে বড় করিবার জন্য অন্য একটী পুষ্করিণীতে সাক্ষাৎভাবে খাদ্য ছাড়িয়া দিতে হয়। তবে সাক্ষাৎভাবে খাদ্য প্রয়োগে একটী অসুবিধা এই যে ঐ খাদ্য খাইয়া মৎস্যভক্ষক অনিষ্টকর মৎস্যগুলি বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা রোহিতের খাদ্য অপহরণ করে।
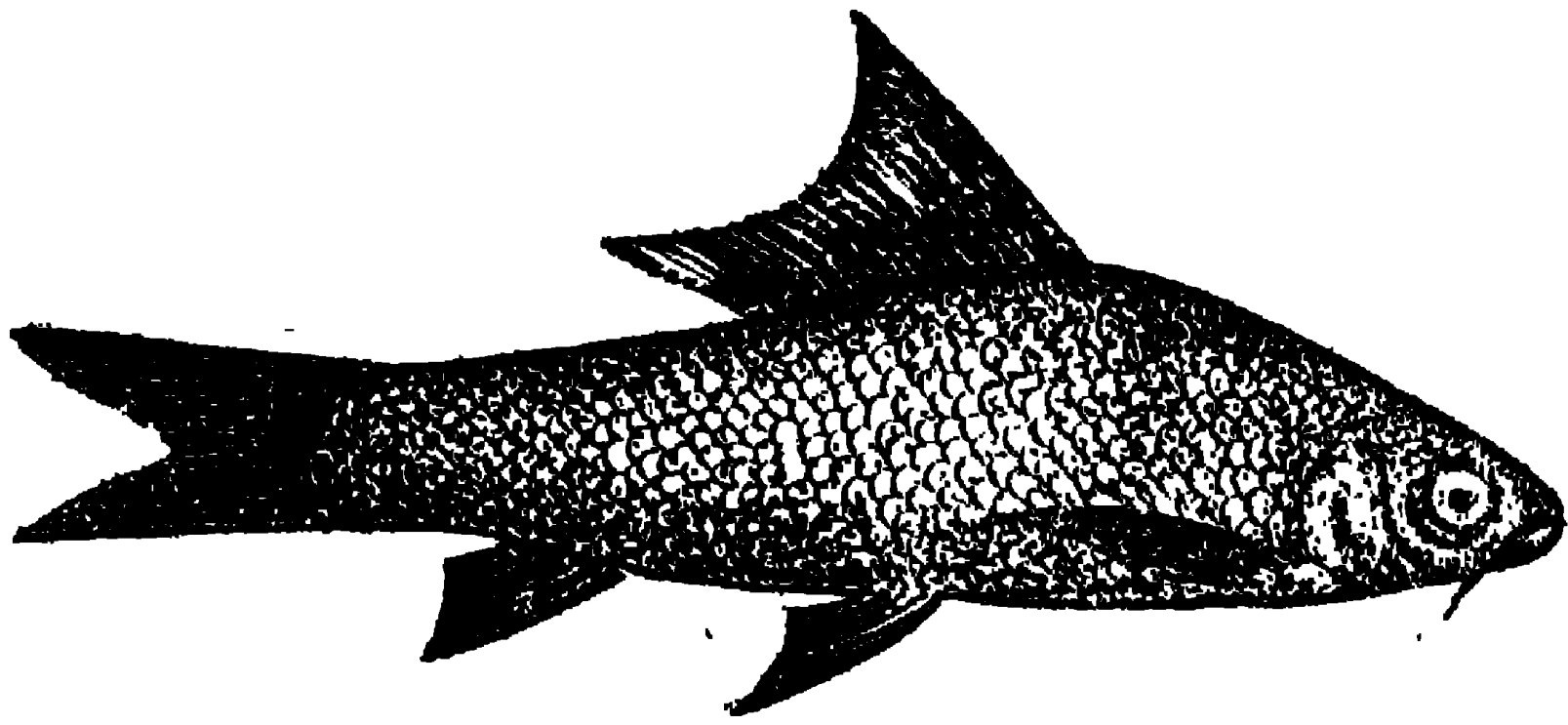
রোহিত মৎস্য

যে পুষ্করিণীতে ডিম জন্মে তাহা হইতে পোনা জন্মিলে সেই পোনা অন্য পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিয়া শেষোক্ত পুষ্করিণীতে সাক্ষাৎভাবে খাদ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়; কারণ, পোনা অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রথম বৎসর গ্রীষ্ম ঋতুতে তাহাকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়া বড় করিলে শেষে অধিক খাদ্য প্রদান আবশ্যক করে না। গ্রীষ্ম ঋতুতে পুষ্করিণীর জল বাহির করিয়া ফেলিয়া তাহার তলদেশ শুষ্ক করায় অনিষ্টকারী মৎস্য ও জলজন্তু সকলের উপদ্রবও কমিয়া যায়। পোনা মৎস্য বৎসরের যে সময়ে বড় হইতে আরম্ভ করে তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে তাহাকে খাদ্য দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং তখন মৎস্যের ক্ষুধাও বৃদ্ধি পায়। যে পুষ্করিণীতে পোনা বড় করা হয় (stretching pond) তাহাতে খাদ্য প্রয়োগে বড় পুষ্করিণীর অভাবের অসুবিধা থাকে না। যে সকল পুষ্করিণীতে বড় রোহিত থাকে এবং প্রত্যেক বৎসর জল নিষ্কাষন করা হয় না ক্রমাগত ২।৩ বৎসর জল পূর্ণ থাকে সেই সকল পুষ্করিণীতে রোহিতকে সাক্ষাৎভাবে খাদ্য প্রদান করিতে হয়।

যদিও যে সকল পুষ্করিণীর জল প্রত্যেক বৎসর বাহির করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার তাহাতে জল পূর্ণ করিতে হয় সেই সকল পুষ্করিণী বৃহৎ পুষ্করিণী অপেক্ষা সুবিধাজনক, তাহা হইলেও যাহার জল প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তন করা হয় না এরূপ বৃহৎ পুষ্করিণীও তৎসঙ্গে রাখা আবশ্যক, কারণ ঐরূপ একটী পুষ্করিণীর জল বাহির করিয়া তাহা পুনর্ব্বার জল পূর্ণ করিতে অন্ততঃ দুই বৎসর সময় লাগে।

সরিষা খইল চূর্ণ, গমের ভুষি (bran), সিক্ত যবাঙ্কুর (malt shoot =, যব জলে ভিজাইয়া রাখিলে যে অঙ্কুর হয় তাহা শুকাইয়া রাখিয়া পরে তাহা গুঁড়া করিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে malt shoot বলে।) প্রভৃতি জল মিশাইয়া পিণ্ডাকারে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা হইলে তাহা জলের নীচে মৃত্তিকায় পৌছে। মটর, বুট ইত্যাদি কলাই জাতীয় খাদ্য অগ্নি পক্ক না করিয়া কাঁচাই দেওয়া যায়। কোন কোনও খাদ্য ভাজিয়া কি পোড়াইয়া দেওয়া যায়। ভুট্টা ভাজিয়া এবং আলু সিদ্ধ করিয়া মাখিয়া দেওয়া যায়।

রোহিত মৎস্য আকারে ও ওজনে যে পরিমাণ হইতে পারে তাহা সেই পরিমাণ করিতে যত অল্প সময় লাগে ততই ভাল। তজ্জন্য যতটী মৎস্যকে যে পুষ্করিণীতে যে পরিমাণ খাদ্য দিয়া পালন করা যাইতে পারে সেই সংখ্যার কম কি অধিক রাখা ভাল নয়। খাদ্যের পরিমাণ প্রচুর হইলে পালন জন্য মৎস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। রোহিত মৎস্যের ওজনের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে রোহিত অল্প সময়ের মধ্যে বড় ও ওজনে অধিক হয় তাহা খাইতে সুস্বাদু হওয়ায় খরিদদারগণও তাহার সমাদর করে। কত পরিমাণ খাদ্য কত সংখ্যক মৎস্যের জন্য আবশ্যক তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যাইতে পারে। প্রত্যেক বৎসর মৎস্য ধরার সময়ে উহা স্থির করা যায়। পুষ্করিণীর আয়তনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রত্যেকটী পুষ্করিণীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। চতুর্থ বৎসরে গ্রীষ্ম ঋতুতে রোহিত পূর্ণাবয়ব হয় এবং পঞ্চম বৎসরে গ্রীষ্ম ঋতুতে তাহার ওজনের সর্ব্বোচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়।

যে পুষ্করিণীতে রোহিতকে তাহার খাদ্যের জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় সেই পুষ্করিণীর জল নিকাষণ করিয়া রোহিতের শত্রু বিনাশ ও আগাছা নষ্ট করতঃ তাহার সংস্কার করিতে হয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে পুষ্করিণীর ঐরূপ সংস্কার করায় রোহিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

রোহিতের খাদ্য ক্ষুদ্র জলজ জীব সকলও পুষ্করিণীতে যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। জলের ও মৃত্তিকার প্রকৃতি ও অবস্থানুসারে কোনও পুষ্করিণীতে ঐ সকল জীব অধিক এবং কোনওটীতে অল্প দেখা যায়। তজ্জন্য যে পুষ্করিণীতে তাহাদের সংখ্যা অল্প তাহাতে এরূপ পদার্থ যোগ কি অন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে, সেই সকল ক্ষুদ্র জলজ জীবের বীজ এইরূপ পুষ্করিণীতে দিলে তাহারা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

যে পুষ্করিণীর তলদেশে বালি থাকে তাহার উপর উত্তম দোয়াশ মাটি দিতে হয়, যেস্থানে পচা কর্দ্দম হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় তথায় সেই পাঁক উঠাইয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করা আবশ্যক।

বড় রোহিত মৎস্যের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি শতকরা নিম্নোক্ত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে :—

প্রোটিন্	১৯
ফস্ফরাস	১'২০
চুণ	১'২০
ম্যাগনেসিয়া	০'০৭

সভাপতির অভিভাষণ*

ঢাকা বিভাগের সমবায়-প্রতিষ্ঠান
সমূহের প্রতিনিধিবর্গ ও
ভদ্রমহোদয়গণ,—

আপনাদের এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য আপনারা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, এজন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এই সম্মেলনের মধ্যে আপনাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগাযোগ অনুভব করিতেছি, কারণ ঢাকা বিভাগের সহিত আমার আশৈশব যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে এখানকার কোন কাজের আহ্বানে আমার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক এবং এরূপ আহ্বানে আমি বিশেষ গৌরব অনুভব করি। ময়মনসিংহ আমার জন্মভূমি এবং প্রথম জীবনের নানা বাধাবিঘ্ন, দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়া জীবন-সংগ্রামের যে বহুমূল্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, ঢাকা ও ময়মনসিংহই তাহার কেন্দ্রস্থল। সুতরাং এই দুই জেলার প্রতি আমার মনে একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়াই আমি এই সম্মেলনে সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আনন্দ ও উৎসাহ লইয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

সমবায়-আন্দোলনের সহিত আমার সম্পর্ক

সমবায়-আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে আমার কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাই সত্য, কিন্তু দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে পল্লীগ্রামের বিভিন্ন সমস্যাগুলি লইয়া গত ১৫ বৎসর কাল আমি নানাভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই দীর্ঘকাল চিন্তা ও আলোচনায় আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সমবায়-নীতির সাফল্যের মধ্যেই আমাদের মৃতপ্রায় পল্লীর পুনর্জ্জীবন লাভের একমাত্র সম্ভাবনা রহিয়াছে। সমবায়-আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিবার সুযোগ হইবে বলিয়া আমি মনে করি। সুতরাং আমার নিকট হইতে আপনারা এ সম্পর্কে কোনো নূতন নির্দ্দেশ আশা করিলে হয়তো নিরাশ হইবেন। এদেশে সমবায়-আন্দোলনের এই সঙ্কটকালে আলাদীনের প্রদীপের মত এমন কোন অত্যাশ্চর্য্য উপায়ের সন্ধান আমি জানি না, যাহা দ্বারা রাতারাতি এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ অসাধ্যসাধন কাহারো দ্বারাই সম্ভব নয়। যাহা হউক আমি নেতৃত্ব বা অসাধ্যসাধনের আশা লইয়া এখানে উপস্থিত হই নাই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার দু'একটি ইঙ্গিতমাত্র আজিকার সভায় উপস্থিত করিতেছি। আজিকার সমবায় সমস্যার সমাধান পথে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যদি কর্ম্মী ও নেতৃগণের মনে নূতন কোন কার্য্যকরী

* গত ২রা জুলাই তারিখে ময়মনসিংহের জামালপুর সহরে ঢাকা বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্বসচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন তাহা আমরা আমূল প্রকাশ করিলাম—সম্পাদক।

পন্থার সন্ধান দেয়, তবেই আমার এই আলোচনা সার্থক হইবে।

আমার মতামত গবর্ণমেণ্টের মতামত নহে

কিন্তু আমার বক্তব্য বা মতামত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত বা ইঙ্গিত মনে করিয়া ভুল করিবেন না। আমি ময়মনসিংহের অধিবাসী, ঢাকা বিভাগ আমার জন্মভূমি, এখানে আমি আপনাদের সহকর্ম্মীরূপেই উপস্থিত হইয়াছি,—বাংলা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী হিসাবে নহে। আমার বক্তব্যের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত বা ইঙ্গিত খুঁজিতে গেলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে।

আধুনিককালে সমবায়-নীতির প্রয়োজনীয়তা

আধুনিককালে দেশের মধ্যে অর্থনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে ক্রমাগত নানাপ্রকার চিন্তা ও মতবাদের সংঘর্ষ চলিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ ও নীতি-বৈষম্যের মধ্যে আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানের উপযোগী কোন বিশেষ একটি কর্ম্মপদ্ধতি বাছিয়া লইতে গেলে সমবায়-প্রথার কথাই আমাদের প্রথম মনে পড়ে। ফ্যাসিজ্‌ম্ ও কম্যুনিজ্‌ম্ এই দুই ক্রমবর্দ্ধমান পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যবর্ত্তী পথ ও সামঞ্জস্যের উপায় সমবায়। ব্যক্তির অতি-সমৃদ্ধির মূলে যেমন লোভ, সমষ্টির নামে ব্যক্তির উচ্ছেদ কামনার মূলেও আছে তেমনি ঈর্ষা। একমাত্র সমবায়-নীতির মধ্য দিয়াই লোভ ও ঈর্ষার পরিবর্ত্তে ব্যক্তি ও সমষ্টির বৃহত্তর কল্যাণের যোগসূত্র স্থাপিত হইতে পারে। কারণ দেশের ও জাতির ধনসম্ভার একত্রীভূত করিয়া মূলধনরূপে নূতন ধনসৃষ্টিতে নিয়োজিত করিতে পারিলেই দেশের কল্যাণ। তথাকথিত সাম্যবাদের নামে যাঁহারা ধন একত্রীভূত হওয়ার বিরোধী, যাঁহারা সর্ব্বদা সমভাবে ধনবণ্টনের মত প্রচার করিয়া সুলভে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে চান, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে জাতির প্রয়োজন মিটাইতে, শিল্প, বাণিজ্য, ও কৃষি-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য একত্রীভূত ধনের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ব্যক্তি বিশেষের হাতেই হউক, বা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের হাতেই হউক, প্রচুর মূলধন ব্যতীত বৃহৎ কিছু সৃষ্টির কল্পনাকে সার্থক করা সম্ভব নহে। বহু ক্ষীণ জলধারা একত্রে মিলিত হইয়া যে বেগবতী স্রোতস্বতীর সৃষ্টি করে তাহা যেমন দেশ-দেশান্তরে উর্ব্বরতা সাধন করে,—ধনও তেমনি।

জাতীয় সম্পদ প্রতিষ্ঠা ও সমবায়-নীতি

বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে সকলের সম্মিলিত সঞ্চয়কে একত্র করার মধ্যেই জাতীয় সম্পদের প্রতিষ্ঠা। ধনীর অর্থ সর্ব্বহারার মধ্যে বিলাইয়া দিলেই সর্ব্বহারাদের সর্ব্বনাশের পরিমাণ লাঘব হয়না। সমষ্টির সম্মিলিত সঞ্চয়ের সাহায্যে যে প্রচুর ধনোৎপত্তির ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার মধ্য দিয়াই নিঃস্ব ও দুস্থের প্রকৃত দুঃখমোচন হইতে পারে। ধন আপন বৃহৎ দায়িত্ব পালন করিলে তাহার মধ্যে নিন্দার কারণ নাই। যে ধন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে না,—শুধু ভোগের পথ প্রশস্ত করে, তাহাই নিন্দার বস্তু। কিন্তু যে-ধন সমষ্টির, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণের পথ সুগম করে তাহা অবাঞ্ছনীয় নহে। কারণ বৃহৎ কল্যাণের জন্য বৃহৎ পুঁজির প্রয়োজন আছে। যে দেশে দরিদ্রকে নারায়ণরূপে গ্রহণ

করিবার আদেশ আছে, সে দেশে বিত্তহীনের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বিত্ত নাই বলিয়াই কেহ দোষগুণের ঊর্দ্ধে চলিয়া যায় না এবং বিত্ত থাকিলেই সকলের ঘৃণা ও আক্রোশের পাত্র হইতে হইবে এমন কোন কারণও নাই। নির্ধনের দুঃখময় জীবনযাত্রা ধনের দ্বারাই সুগম করিতে হইবে। ধনীকে পরিহার ও লাঞ্ছিত

করিয়া সে উদ্দেশ্য সকল ক্ষেত্রে সফল হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। অবশ্য ধনী যেখানে দরিদ্রকে শোষণ করিয়া নির্ম্মম ও কঠোরভাবে বিত্ত সঞ্চয়ে লিপ্ত, সেখানে সে ঘৃণার পাত্র সন্দেহ নাই এবং তখন নিশ্চয়ই তাহার সেই প্রবৃত্তির সংশোধন আবশ্যক।

সমবায়-নীতির মূলকথা

সমবায়-নীতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর সহযোগিতায় উহাদের সম্মিলিত ধনশক্তি দেশ ও জাতির সমৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামগুলির সহিত আমার পরিচয়—পুথি-পুস্তকের মধ্য দিয়া নহে, তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের কথা আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জানি। ঘুড়িটা আকাশের বহু উর্দ্ধে উড়িলেও মাটির সহিত উহার সূত্রের বন্ধন যেমন থাকেই, কার্য্য-ব্যপদেশে বর্ত্তমানে অধিকাংশ সময়ে সহরে অতিবাহিত করিলেও গ্রামের সহিত আমার তেমনি বন্ধন রহিয়া গিয়াছে।

এদেশের পল্লীসমস্যা এতই বিপুল যে, অনেক সময়ে উহার সমাধান এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; হতাশায় কর্ম্মীর মন আচ্ছন্ন এবং শক্তি দুর্ব্বল হইয়া আসে। কিন্তু সকলে একমন ও একচিন্তা লইয়া একটী বিশেষ আদর্শে মিলিত হইতে পারিলে বাংলার পল্লীশ্রীকে পুনরায় সঞ্জীবিত করা অসাধ্য নহে। সে আদর্শ—সহযোগিতার আদর্শ, সহকর্ম্মের আদর্শ। একের কাজ দশের মধ্যে গ্রহণ করা, একের দায়িত্ব দশজনে মিলিয়া ভাগ করিয়া লওয়া এবং দশের সমৃদ্ধিতে প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি করার যে আদর্শ পরস্পরের নির্ভর ও যোগা-যোগের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠে,—সমবায়-নীতি সেই আদর্শেরই নামান্তর। সমবায়ের মূলকথা,—এই পরস্পর সহযোগিতার ভাব, মানুষের চরিত্রের মধ্যে, মানুষের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পশুপক্ষীর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন; কিন্তু মানুষের জীবন পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা পরিবার হইতে সমাজে এবং সমাজ হইতে রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত। এই সহযোগিতার আদর্শ মানব সভ্যতার গোড়ার কথা এবং সে সভ্যতার উন্নতির সহিত জীবন-যাত্রা যেমন ক্রমশঃই জটিল ও সমস্যাবহুল হইয়া উঠিতেছে, পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে,—ব্যক্তিগত অপেক্ষা সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

পল্লীসমস্যা ও সমবায়-নীতি

এমন একদিন ছিল যখন কোন ব্যক্তি বিশেষের সমৃদ্ধিতে সমগ্র সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন সম্ভবপর ছিল; একক ধনীর সঞ্চিত অর্থদ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। এমন কি, দেশের জনহিতকর কাজগুলি জমিদার বা অন্য কোন অর্থশালী ব্যক্তি বিশেষেরই করণীয় কর্ম্মরূপে গণ্য হইত। বর্ত্তমানে সমাজে ধনী লোকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—মানুষের আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমাজের ও দেশের দাবীও কয়েকটীমাত্র ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ না রহিয়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্র করিয়া বৃহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। মানুষের

এই যৌথ প্রয়োজন ও যৌথ প্রচেষ্টাই সমবায় আন্দোলনের মূলতত্ত্ব। সমবায়-রীতিতে বহুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে আপন স্বাধীন সত্তাকে একেবারে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিতে হয় না, অথচ বহুকে অবলম্বন করিয়া একের ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ হয়; এই কারণে সমবায় আন্দোলনে প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি ও প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে,—মানুষ একটা বৃহৎ যন্ত্রের অংশ বিশেষে পরিণত না হইয়া আত্মোন্নতি করিবার ও স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। সুতরাং সমবায় প্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া দেশের সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করাই বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে প্রশস্ততম উপায় বলিয়া মনে হয়। এই সমবায় নীতি দ্বারা বহুর শুভবুদ্ধিকে একের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে আমাদের গ্রামগুলির সংস্কারসাধন সম্ভব হইবে। গ্রাম ও সহরের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, ইহা দ্বারাই তাহা দূর হইতে পারে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের গ্রামগুলিকে যদি সহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোজী না করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ দান করিতে হয়, তবে কেবলমাত্র সমবায় প্রণালী দ্বারাই দেশের পল্লীগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জমান দশা হইতে উদ্ধার করা সম্ভব।

সমবায়-আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন এ যাবত সম্পূর্ণ আকারে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের ব্যাপারে নিয়োজিত না হইয়া উহা একটা নিছক মহাজনী ব্যবসায়ের উন্নত সংস্করণে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। সমবায় নীতিকে জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ নীতি হিসাবে গ্রহণ না করিয়া একটা আংশিক উপায়-রূপে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু সমবায়ের গণ্ডী শুধু ঋণ-দানের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, জীবনের সমুদয় প্রয়োজনে—উন্নত উৎপাদন, উন্নত বিক্রয়-পদ্ধতি—এক কথায় উন্নত জীবন যাত্রার মধ্যে সমবায়কে গ্রহণ করিতে পারিলেই উহার পূর্ণ সার্থকতা। এই সার্থকতা লাভ করিতে হইলে ধনের সহিত সম্মিলিত শ্রমশক্তির যোগও অপরিহার্য্য; কারণ লোকের শ্রমশক্তিকে প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতাই ধনের ক্ষমতা। যাহারা দরিদ্র, তাহাদের শ্রমশক্তির মধ্যেই তাহাদের ধনশক্তিও লুক্কায়িত। দরিদ্রের বিচ্ছিন্ন শ্রমশক্তিকে সম্মিলিত করিয়া কার্য্যকরী করিবার মধ্যেই বৃহৎ মূলধন নিহিত। কিন্তু সমবায়ের এই বৃহত্তর আদর্শ আমাদের সমবায়-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, কর্ম্মী ও জনসাধারণ—কাহারও মনেই স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই। সমবায় সমিতিগুলি কৃষকের আশুপ্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দেওয়াকেই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ভুল করিয়াছেন, সেই টাকার যথোচিত ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে টাকা আগাইয়া দিলেই সমবায়-সমিতির কাজ শেষ হয় না, সে টাকা যথার্থ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হইবে কিনা এবং কৃষক সে টাকা পরিশোধের শক্তি অর্জ্জন করিতেছে কিনা, সে বিষয়ে কৃষককে সচেতন করিয়া তোলার উপরই সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে আর্থিক স্বচ্ছলতার সহিত কৃষকদের ঋণভারের যেন একটা অতি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। ঋণকরা

সহজ ও সুলভ হইলেই কৃষকের ঋণভার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কারণ মিতব্যয়িতা, কার্য্যকরী উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার অভ্যাস তাহাদের নাই। সমবায়-সমিতিগুলি সে কথা তাহাদিগকে শিখাইবার আবশ্যকতাও বোধ করে নাই। সমবায়-নীতির সমুদয় শক্তিকে কৃষকের শিক্ষা, জীবনযাত্রা, কৃষিকার্য্য, উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা অর্থাৎ গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে নিয়োজিত না

নলিনীরঞ্জন সরকার।

করিলে শুধু টাকা ধার দেওয়া তাহার পক্ষে যেমন নিরর্থক, সমিতিগুলির পক্ষেও তেমনি মারাত্মক।

সমবায় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকতর কর্ত্তব্য

কেবল টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা বড় কথা নহে; প্রকৃত প্রয়োজন হইতেছে গ্রামবাসীর মধ্যে কতকগুলি সাধারণ অথচ অত্যাবশ্যক সদ্‌গুণের উন্মেষ সাধন করা। সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সততা, মিতব্যয়িতা এবং সময় অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস শিখাইতে পারিলে গ্রামের প্রকৃত উন্নতির পথ সুগম হইবে,—কৃষকদিগের মধ্যে আত্মচেষ্টায় আত্মোন্নতির উপায় দেখা দিবে। সমিতিগুলি কৃষকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, সচ্ছলতার দিনে টাকা গচ্ছিত রাখিবার অভ্যাস এবং সমিতি পরিচালনা ও মূলধন সংগ্রহের দায়িত্ববোধ জাগরিত করিতে পারিলেই সমবায় আন্দোলন সফল হইবে। শুধু সমবায় প্রণালীতে ঋণদান করিয়া নহে, একত্রে কাজ করাইয়া পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করিয়া তুলিলেই আমরা পল্লীকে বাঁচাইতে পারিব।

সমবায়-আন্দোলনের ব্যর্থতার দায়িত্ব

কিন্তু সমবায়-নীতির অসাফল্যের জন্য একমাত্র আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকেই দায়ী করিলে হয়ত অন্যায় হইবে। দেশের জনসাধারণও সমবায় আন্দোলনকে গভর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্রের শুধু একটা অংশরূপেই গণ্য করিতে অভ্যস্ত। তাই আইন এবং নিয়মকানুনের শৈলশিখরে লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় উহা ভাসিয়া বেড়াইয়াছে, বৃষ্টির জলধারা স্রোতস্বতী বাহিয়া দেশের মর্ম্মস্থলে আসিয়া পৌঁছায় নাই। বস্তুতঃ এদেশের পক্ষে সমবায় প্রচেষ্টাকে 'আন্দোলন' আখ্যা দেওয়াই ভ্রমাত্মক। কারণ সমবায়কে কেন্দ্র করিয়া এদেশে আন্দোলন বলিতে একপ্রকার কিছুই হয় নাই; উহা জনসাধারণের প্রাণ-সম্পর্ক বিরহিত গভর্ণমেণ্টের একটা কার্য্যবিভাগে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। যাহাদের লইয়া সমবায় আন্দোলন, তাহাদের চরিত্রের ... মানসিক সংস্কৃতি ও সততার উপরে উহার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের জনসাধারণের সংস্কার, অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সততার অভাব সমবায় আন্দোলনের একান্তরূপে পবিপন্থী হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি যে-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকিলে মানুষের সহিত মানুষের মিলন সহজ হয়, যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা থাকিলে সমবেতভাবে কাজ করা সম্ভব হয়, আমাদের চরিত্রে তাহার অভাব রহিয়াছে। যাহারা দুর্ব্বল, অন্যের প্রতি বিশ্বাসও তাহাদের দুর্ব্বল, এবং নিজের শক্তি বা সততায় যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, অপরের প্রতি অশ্রদ্ধাও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই কারণে অপরের অনুশাসন পালন করা তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে, কিন্তু স্বশ্রেণীর মধ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করা অসম্ভব। এই কারণে আত্মদ্বন্দ্বে আমাদের সর্ব্বপ্রকার গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানই প্রায় পঙ্গু। টাকা ধার লইয়া সমবায়ের ফলটুকু ভোগ করিতে আমাদের আগ্রহ আছে, কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব পালন করিতে অনেকেই তেমন উৎসুক নহেন। সকল ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের উপরে সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া আমরা নিশ্চিত নির্ভরতায় কাল কাটাইতে চাই। অতীতে

সমিতির সংখ্যা ও তাহাদের সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দ্রুত প্রসার বৃদ্ধি করিবার রীতি যে সমবায় আন্দোলনের পক্ষে খুব উপযোগী হয় নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ না পাইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমবায়-আন্দোলনকে সফল করিয়া তোলা সম্ভবপর নহে। অনিচ্ছুক রোগীকে যেন তেন প্রকারে ঔষধের বড়ি গিলাইবার মত সমবায় আন্দোলন একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। জনসাধারণের সচেতন সহযোগীতা দ্বারাই উহার সফলতা সম্ভব,—অন্য উপায়ে নহে।

জনসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজন

অতিরিক্ত ঋণ লওয়া এবং ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা নিয়মিত শোধ না দেওয়া—এই দুই-ই সমবায়-প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে পদে পদে বাধা দিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে জনসাধারণ

এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তাহাদের সহযোগিতার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই। বর্ত্তমানে গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণকে এই বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে। বুঝাইতে হইবে যে, ঋণ গ্রহণ করিয়া সে-ঋণ পরিশোধের জন্য আন্তরিক চেষ্টা না করিলে সমবায়-প্রতিষ্ঠানের এবং তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। একদিকে ঋণ গ্রহণ ও ঋণকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার, অপরদিকে মিত-ব্যয়িতা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপাদনের ব্যয়-সংক্ষেপ, অপচয় নিবারণ, কৃষি-পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা—এসব বিষয়েই কৃষককে সচেতন করিতে হইবে। ঋণ করিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য এইরূপে সচেষ্ট না হইলে সমবায়-সমিতি-গুলির ক্রমে অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা লাগিয়াই থাকিবে।

সমবায়-সমিতিগুলির অবস্থার মোটামুটি আভাস

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকারের সমবায় প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় খান সাহেব তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমার সহকর্ম্মী সুহৃদ্বর মুকুন্দবিহারী মল্লিক মহাশয়ও তাঁহার অভিভাষণে সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং মৃতকল্প সমিতিগুলির মধ্যে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যে সামান্য স্পন্দন জাগান সম্ভব হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। আপনারাও নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এবিষয়ে অবশ্য এই সম্মেলনে আলোচনা করিবেন। সুতরাং সমবায় প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাই না। সমবায় আন্দোলনের সম্মুখে আজ যে সমস্যাগুলি অতি বিরাট আকারে দেখা দিয়াছে সেই সমস্যাগুলির সম্বন্ধেই কেবল আমি অল্প কথায় দুই একটি অভিমত প্রকাশ করিতে চাই।

প্রাথমিক সমিতি ও তাহাদের সমস্যা

প্রাথমিক সমিতিগুলির বর্ত্তমান সমস্যা দ্বিবিধ: প্রথমতঃ:—কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস এবং অন্যান্য কারণে কৃষক তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হওয়াতে প্রাথমিক সমিতিগুলি অতীতের ঋণভারে বিপন্ন। অপরদিকে, পূর্ব্বঋণ অনাদায়ী থাকার দরুণ সমিতির বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় কৃষককে তাহার বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য ঋণ দেওয়ার সঙ্গতিও সমিতিগুলির নাই। ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে ঋণ দান ব্যাপারে সমিতিগুলি প্রায় নিশ্চল হইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, নানাভাবে এই শোচনীয় পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে; কোনও ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের সুদ নিয়মিত ভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্বের অনাদায়ী সুদ পুরাপুরি মকুব করা হইতেছে, অপর ক্ষেত্রে হয়তো বা পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান উভয় সুদের দাবীই স্থগিত রাখিয়া যে টাকা পাওয়া যাইতেছে, তাহা আসল ঋণের শোধ হিসাবে গণ্য করা হইতেছে, ফলে ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিতেছে। এইরূপ আরও নানা উপায়ে সুদ কমাইয়া বা বন্ধ রাখিয়া কিম্বা মূল ঋণ হ্রাস করিয়া বর্ত্তমানের নিশ্চই অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা

চলিতেছে। প্রাথমিক সমিতির দুরবস্থার সঙ্গে স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিরও সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব ব্যাঙ্কের আমানতকারিগণ সুদ নিয়মিত পাইতেছে না বা আমানতের টাকা ফিরিয়া পাইতেছে না। সরকারী একটী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা বিভাগের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খারাপ ছিল।

সমিতিগুলির প্রধান সমস্যা

বর্ত্তমানে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের সম্মুখে প্রধান সমস্যাগুলি মোটামুটি এই বর্ত্তমানে প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাহাদিগের পুনর্গঠন, তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করা, এবং তাহাদের মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চার করা যেমন এক সমস্যা, অপর দিকে, এই সব প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে বর্ত্তমান দুরবস্থা পুনরায় না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রসার কি ভাবে হইতে পারে তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াও

কয়েকটী গুরু সমস্যা। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনের কোনও চেষ্টা করিতে হইলেই সমিতির সভ্যদের আর্থিক অবস্থা এবং তাহাদের ঋণপরিশোধ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। সুখের বিষয় এই যে, এই কাজটী ইতিমধ্যে বহু পরিশ্রমে সুসম্পন্ন হইয়াছে, সাড়ে চার লক্ষেরও অধিক সভ্যের প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রাথমিক সমিতির সভ্যগণের আর্থিক সঙ্গতির পরিমাণ জানিলে বুঝা যাইবে, সমিতির অনাদায়ী ঋণ কি পরিমাণ পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি দেখা যায় যে, অনাদায়ী ঋণ পুরাপুরি শোধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিরও সেই পরিমাণে প্রাথমিক সমিতির ঋণের অংশ মকুব করিয়া দেয় টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইবে এবং অবস্থা অনুসারে দেয় টাকা কিস্তিবন্দী হিসাবে পরিশোধ করিবার সুবিধা দিতে হইবে। যদি কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন হয় যে, প্রাথমিক সমিতিগুলির নিকট হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যে পরিমাণ অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহার সহিত নিজ রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা মিলাইয়াও আমানতকারিগণের দাবী পুরাপুরি মিটান ঐ সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে আমানতকারীকে তাহার মোট দাবী অপেক্ষা কম দেওয়া ভিন্ন উপায় কি? কেন্দ্রীয় সমিতির অনাদায়ী টাকার জন্য যে ঘাট্‌তি হইবে সর্ব্বশেষে উহা আমানতকারীদের উপরই গিয়া পড়িবে। ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ যখন এই সকল ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার বেশীর ভাগই স্বল্প-আয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং দুস্থ বিধবা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কষ্টসঞ্চিত অর্থ। সুতরাং এই ক্ষতির আঘাত যথার্থ কোথায় লাগিবে তাহা স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। এই শ্রেণীর লোকের এরূপ ক্ষতির ফলে ভবিষ্যতে সমবায় আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও সহানুভূতিও হয়তো কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা ছাড়া অপর কোনও উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমানতকারীরা ব্যবসায়ের দিক হইতেই ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সচ্ছলতার দিনে চড়া হারে সুদও ভোগ করিয়াছেন। আজ যদি ব্যাঙ্কের সঙ্কটকালে তাঁহাদের আসল টাকার কিয়দংশ ঘাট্‌তি দিতে হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতিকে অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষেও একটী অলিক সঙ্গতির ভরসা লইয়া বসিয়া থাকা অযৌক্তিক। সঙ্গতির যে চিত্র তাহাদের বর্ত্তমান ব্যালান্স-সীটে দেখান হয়, তাহা যখন তাহাদের প্রকৃত অবস্থার প্রতিচ্ছবি, তখন প্রাথমিক সমিতিগুলির নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্যের যে অংশ যথার্থতঃই পাওয়ার সম্ভাবনা, ব্যালান্স-সীটে তাহাই উল্লেখ করা উচিত। তাহাতে সঙ্গতির পরিমাণ কম দেখাইতে হইলেও ব্যাঙ্কের প্রতি লোকের আস্থা বর্দ্ধিত হইবারই সম্ভাবনা, সঙ্গতির হিসাবে কোনও লুকোচুরি নাই, প্রকৃত অবস্থা অপেক্ষা বাড়াইয়া কিছু বলা হয় নাই, একথা বুঝিলে লোকে নিশ্চিন্ত বোধ করিবে।

ঋণ পরিশোধের অনিচ্ছা

এস্থলে কৃষকদের বর্ত্তমান ঋণভার ও সমিতি-গুলির দুরবস্থা সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধিকাংশ কৃষকই নানাকারণে তাহাদের ঋণ পরিশোধে অক্ষম, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশে এমন এক শ্রেণীর খাতকও অনেক আছে, যাহারা সক্ষম হইয়াও ঋণ পরিশোধ করে না। টাকা ধার লইয়া উহা ফিরাইয়া না দেওয়ার দুর্ব্বলতা মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। সাময়িক প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার লোভে কোন কোন আন্দোলনকারী আজকাল জনসাধারণের সেই দুর্ব্বল মনোবৃত্তিকেই জাগাইয়া তুলিতেছেন। সুদের কঠোরতা, অন্যায় উৎপীড়ন ও শোষণ সর্ব্বপ্রকারে বাধা দেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু খাতকেরা মহাজনের প্রাপ্য পরিশোধ করিবে না, প্রয়োজনের দিনে টাকা ধার করিয়া সুদিনে সক্ষম হইয়াও তাহা ফিরাইয়া দিবে না,—এই সর্ব্বনাশা নীতিকে প্রশ্রয় দিলে সমাজে সমগ্র ঋণদান ব্যবস্থার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। ঋণের টাকা আদায় হওয়া আশা নাই, কিম্বা আদায়ের পক্ষে বাধা আছে, এই নিশ্চিত জানিলে কেহই টাকা ধার দিতে রাজি হইবে না। সুতরাং একদিকে মহাজনের শোষণ ও উৎপীড়ন নিবারণ করাও যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে জনসাধারণের মনে সততা এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের অভ্যাস গড়িয়া তোলাও তেমনি আবশ্যক।

আমানতকারিগণের সাহায্যার্থ ডিবেঞ্চার ইস্যু করা যুক্তিসঙ্গত কিনা?

খান সাহেব তাঁহার অভিভাষণে আমানত-কারীদের গচ্ছিত অর্থ পুরাপুরি পরিশোধের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়া গভর্ণমেণ্টকে উহার জামীন হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এরূপ জামিন থাকিতে পারিলে তাহাতে আমানতকারিগণের মনে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানে অনেক কথা ভাবিয়া দেখা

প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই ডিবেঞ্চারের দায়িত্ব যদি গভর্ণমেণ্টকে লইতে হয় তবে ডিবেঞ্চার-গুলির পশ্চাতে উপযুক্ত আয়ের সঙ্গতি আছে কিনা তাহা জানা আবশ্যক। ডিবেঞ্চারগুলি সবই গভর্ণমেণ্টকে পরিশোধ করিতে হইবে না—খান্ সাহেবের একথা সত্য, কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবে কেন্দ্রীয় সমিতিগুলির নিজ সঙ্গতি হইতে সাধ্যানুযায়ী দাবী-দাওয়া পরিশোধ করিবার পরেও যে অংশ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে পড়িবার আশঙ্কা আছে, তাহার পরিমাণও বড় কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ বৃহৎ দায়িত্ব বহন করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব এবং সমীচীন হইবে কি না তাহাও চিন্তা করা প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টকে যদি ডিবেঞ্চারে অর্থ পরিশোধ করিতে হয় তাহা হইলে তাহাতে সর্ব্বসাধারণের অর্থই ব্যয় করিতে হইবে। শুধু আমানত কারিগণের স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত করার জন্য,—অর্থাৎ একটী শ্রেণীবিশেষের জন্য, সর্ব্বসাধারণের অর্থ ব্যয় করা উচিত কিনা তাহা চিন্তার বিষয়। সেই অর্থের পরিমাণ যদি কম না হয়; তাহা হইলে এই অর্থব্যয়ের ফলে যদি কোনও নূতন কর ধার্য্য অথবা সমবায় করের হার বৃদ্ধি করিতে হয় তাহাও সমীচীন কিনা ভাবিবার বিষয়। অপর দিকে, ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য একবার এরূপ নীতি অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে যে বাঙ্গালার বহু বিপন্ন লোন কোম্পানী এমন কি, হয়তো সাধারণ ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির পক্ষ হইতেও গভর্ণমেণ্টের নিকট ঐরূপ দায়িত্বগ্রহণের দাবী আসিবে না, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমিতির আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে তদন্তের ফলাফল যথাযথভাবে না জানা পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা বা নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব নহে। তবে ইহা সুখের বিষয় যে সমবায়বিভাগের মন্ত্রী আমার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মল্লিক মহাশয় আশ্বাস দিয়াছেন যে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে উদ্ধার-কল্পে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য কোনও যুক্তি-সঙ্গত সংগঠন পরিকল্পনা উপস্থাপিত হইলে কি ভাবে ও কতদূরে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বা পরিকল্পনা সহায়তা করিতে পারেন তাহা গভর্ণমেণ্ট সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অল্পমেয়াদী ঋণ দানের ব্যবস্থা

কিন্তু আংশিক ঋণ-মকুবের পদ্ধতিতে প্রাথমিক সমিতিগুলির পুনরুদ্ধার করিলেই সমিতিগুলির সঙ্কট দূর হইবে না। যাহাতে অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দীর্ঘ মেয়াদী ও কিস্তীবন্দী ঋণগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখিয়া নূতন অল্প মেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণগুলি সম্ভব হইলে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন মহাজনের হাতেও ন্যস্ত করা যাইতে পারে। যদি তাহা একান্তই সম্ভব না হয়, তবে উহাকে একটি ভিন্ন বিভাগে পরিণত করিয়া সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক। নূতন ঋণের পরিমাণও এরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বিক্রীত ফসলের উদ্বৃত্ত দ্বারাই উহা শোধ দেওয়া সম্ভব হয়। যাহাতে কোন অনিবার্য্য কারণে ফসল নষ্ট হইলে বা অজন্মার বৎসরে চাষীদিগের কিছু পরিমাণ ঋণ মকুব করা বা পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি

করা সম্ভব হয়, সে-উদ্দেশ্যে সমিতির রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। টাকা ধার ও লগ্নীর সুদের হারের মধ্যে যথোচিত ব্যবধান রাখিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে যাহাতে রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেদিকে এখন হইতে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রিজার্ভ ফণ্ডকে চাষীদের অজন্মা বৎসর বা ঐরূপ দুঃসময়ের জন্য বীমা তহবিলের ন্যায় গণ্য করা প্রয়োজন।

সমবায়ের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এতদিন পর্য্যন্ত সমবায় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষককে তাহার অভাবের সময় অর্থ ধার দেওয়া। অধিকাংশ প্রাথমিক সমিতিগুলিই এইরূপ ঋণদান সমিতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই ঋণ-দান ব্যাপারে কৃষককে সমবায়নীতির মূল-তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। কৃষককে শুধু টাকা ধারই দেওয়া হইয়াছে, সে টাকা যে যথা সময়ে ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক সে কথা তাহাদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে, সুদ না দিলে অর্থের সচলতা নষ্ট হয়, সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অচল হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত সে ক্ষতি তাহাদের নিজের ঘাড়েই পড়ে—এ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য তাহাদিগকে সম্যক্ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এখন হইতে আমাদিগকে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, Better Living Societies—অর্থাৎ পল্লীজীবনের উন্নতিমূলক কয়েকটী প্রাথমিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পল্লীজীবনের উন্নতি সাধনের গোড়ার কাজগুলি—শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি যদি এই সকল প্রাথমিক সমিতি সমাধান করিতে পারে তবেই সমবায়ের বৃহত্তর আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত হইবে। মাননীয় মল্লিক মহাশয়ের বক্তৃতায় আপনারা শুনিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগ এইরূপ সমিতি স্থাপনের কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন, কাজও আরম্ভ করিয়াছেন; ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমার মনে হয়, ইহাই সমবায় আন্দোলনের যথোচিত উদ্যোগ পর্ব্ব। পাঞ্জাবেও বর্ত্তমানে এই ভাবেরই চেষ্টা চলিতেছে; যে সব অঞ্চলে নূতন সমবায় স্থাপন করার প্রয়োজন হইতেছে, সেখানে গোড়াতেই উহাকে শুধু ঋণদান সমিতি হিসাবে আরম্ভ না করিয়া পল্লীবাসীর জীবন যাত্রার সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধন-সমিতিরূপে স্থাপন করা হইতেছে এবং এইরূপে প্রথমে সমবায়ের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, ভবিষ্যতে আবশ্যক অনুযায়ী যাহাতে উহার অধীনে ঋণদান বিভাগও খোলা যাইতে পারে, সে ব্যবস্থাও রাখা হইতেছে। এই সমিতিগুলির মূল লক্ষ্য হইবে পল্লীর সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক জীবনের যত কিছু অভাব ও অন্তরায় দূর করিয়া পল্লীবাসীর জীবনের পূর্ণবিকাশের সহায়তা করা। প্রথমতঃ পল্লীবাসীর জীবন যাত্রায় অপব্যয় কিরূপে নিবারণ করা যায়, দ্বিতীয়তঃ কি কি উপায়েই বা তাহার আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়—এই উভয় বিষয়ে অনুসন্ধান করা সমিতিগুলির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য্য

পরিচালনা করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা, সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, কৃষককে আনুসঙ্গিক শিল্প শিক্ষা দেওয়া, মিত-ব্যয়িতার অভ্যাস গড়িয়া তোলা প্রভৃতি বহু বিষয়ে এই সমিতিকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না; আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, সমিতিগুলি যদি স্ব স্ব ক্ষেত্রে উক্ত প্রচেষ্টাগুলি সফল করিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পণ্যবিক্রয় প্রভৃতি কার্য্যের জন্য দেশে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গঠন করার পক্ষেও সেগুলি বিশেষ সহায়তা করিবে। সুতরাং সমিতির সংখ্যা বাড়াইবার দিকে ঝোঁক না দিয়া এখন আমাদের উচিত দুই-একটী উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইয়া সেখানে পূর্ব্ববর্ণিত পল্লী-উৎকর্ষসাধনী সমিতি স্থাপন করিয়া তাহাকে আদর্শ সমিতিরূপে গড়িয়া তোলা। সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমবায় আন্দোলন প্রসারের চেষ্টায় অর্থ ও পরিশ্রম যে অধিকাংশ স্থলে সম্পূর্ণ পণ্ড হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের সমবায় আন্দোলনের অতীত ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং আর ঐ ভাবে অগ্রসর না হইয়া অল্প-সংখ্যক আদর্শ সমিতি গঠন করিয়া তাহার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়া, সে সমিতিগুলিকে সফল ও কার্য্যকরী করিয়া পরে ধীরে ধীরে প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাদের উন্নতিকল্পে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা, তাহারা যদি ইহার কার্য্যকলাপে যোগ দেয় ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তবেই উহা প্রকৃত সাফল্যলাভ করিতে পারে। গভর্ণমেণ্টের কোনও শাসন-বিভাগের আদেশ বা ফতোয়া জারি দ্বারা কোন প্রাণবান সমিতি গড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। আমরা যদি বর্ত্তমানে প্রতি জেলায় এইরূপ একটী করিয়াও প্রাণবান সমিতি গড়িয়া তুলিতে পারি এবং তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি মনে করিব।

কৃষকের অর্থের সদ্ব্যয় শিক্ষার প্রয়োজন

কৃষকের সহায়তার জন্য ঋণ-দানের ব্যবস্থার কথা উঠিলেই অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন, যেন সুবিধাজনক কোনও ব্যবস্থা করিয়া কৃষকের বর্ত্তমান ঋণ-পরিশোধের বন্দোবস্ত করিলে এবং ভবিষ্যতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুলভ ঋণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেই চাষীর সব সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋণভার পীড়িত কৃষকের জন্য সহজ কৃষিঋণ ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাহার হাতের কাছে টাকা আগাইয়া দিলেই হইবে না। সচ্ছলতা অমিতব্যয়ীর ঋণ কমায় না, বরং তাহা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইয়াই চলে। সুতরাং সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থাই যথেষ্ট নহে; যে, অর্থের সদ্ব্যয় করিতে শিখে নাই তাহাকে সঞ্চয় ও সদ্ব্যয় করিতে শিখাইতে হইবে। ঋণলভ্য অর্থ সে যাহাতে অপব্যয় না করে, অধিকন্তু তাহা এমনভাবে ব্যবহার করিতে শিখে যাহাতে তাহার অধিক অর্থাগম হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে-শিক্ষাও তাহাকে দিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থার উপরেই সমবায়-আন্দোলনের সাফল্যের মূলতত্ত্ব নিহিত।

কৃষকের অবস্থার সংস্কার একদিনের কাজ নহে

পল্লীবাসী কৃষককে শিক্ষাদান, তাহার চরিত্রে সততা সদগুণ ফুটাইয়া তোলা এবং সমবায় নীতির অনুকূল মনোবৃত্তি জাগরিত করা সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও উন্নতি সাধনে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রধান কর্ত্তব্য। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিলে তবেই গ্রামের উন্নতি হইবে,—গ্রামবাসী কৃষকেরও উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে। এই কাজ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। রাতারাতি কোনও ফল লাভ করা সম্ভব নয়, আমাদের গরজ যতই হোক না কেন, তাহাতে কাজ কিছু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবে না। কৃষকের যুগ যুগ সঞ্চিত অজ্ঞান-অন্ধকার, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার শৃঙ্খল তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য ও নষ্ট উদ্যম,—এক কথায় বহুকালের পুঞ্জীভূত এত দোষ ত্রুটির অপসারণ কি একদিনেই সম্ভব? কৃষকের এতদিনের এই শাপ-মোচন কি এতই অনায়াস-সাধ্য? বস্তুতঃ কোনও স্থায়ী প্রতিকারই অল্লায়াসসাধ্য নহে। ইহার জন্য অপরিসীম ধৈর্য্যের আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ধৈর্য্যকে সদগুণের মধ্যে জ্ঞান করা আজকালকার ফ্যাসন নহে। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কথা আজকাল সকলের মুখেই শুনা যায়, কিন্তু পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী কোন পরিকল্পনা সমর্থন করিবার কয়জন লোক পাওয়া যাইবে? অথচ গ্রামে সহজ ও সুলভ ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃষকের চরিত্রে যে সকল বৃত্তি ফুটাইয়া তোলা আবশ্যক, ২৫ বৎসরের কম সময়ে তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভব নহে।

সেবাধর্ম্মের প্রয়োজন

আজ খুব বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, বা খুব বৃহৎ পরিকল্পনার আবশ্যক নাই,—আবশ্যক কেবল আত্ম-বিস্মৃত সেবার ;—যে-সেবা সরল ধারণা, জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এবং যে-কোন প্রকারের বাধাকেই আপ্রাণ চেষ্টা ও ধৈর্য্যসহকারে অতিক্রম করে। এই ধীর, স্থিরলক্ষ্য সেবার অভিজ্ঞতা দ্বারাই ক্রমে এরূপ প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অনুশাসন গড়িয়া উঠে, যাহা জাতীয় কল্যাণের সহায়ক, যাহার মধ্য দিয়া জনসাধারণের জীবন আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া আত্মোন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। আমাদের পল্লীর পুনরুজ্জীবনের জন্য আজ এইরূপ নীরব কর্ম্ম ও বৎসরের পর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘকালের অক্লান্ত সেবার প্রয়োজন। আমাদের সমস্যাগুলি জটিল ও কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ভাবে কাজ করিবার লোক যদি জুটে তবে কালে অবশ্যই পল্লীর ও পল্লীবাসীর ঈপ্সিত উন্নতি হইবে।

উপসংহার

পল্লীর হিতাকাঙ্খী ও হিত চেষ্টায় রত আজ যে আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন এবং সাগ্রহে এই সম্মেলনের আলোচনায় যোগ দিতেছেন ইহা আশা ও আনন্দের বিষয় ; পল্লীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি যে ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতেছে ইহা তাহারই নিদর্শন। বাঙ্গালাদেশে কিঞ্চিদধিক একশত মাত্র সহর, কিন্তু পল্লীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এই সহস্র সহস্র পল্লীর নামই বাঙ্গালা দেশ। এই পল্লীগুলির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র, কৃষি, গো-পালন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি না করিলে বাঙ্গালার সমস্যাগুলির সমাধান হয় না। নিজেরাই সচেষ্ট না হইলে পল্লীতে পল্লীতে এত লক্ষ লক্ষ দরিদ্রকে পালন করিবে, শিক্ষা দিবে, মানুষ করিবে কে ? তাই প্রয়োজন হইয়াছে, মিলনের, সহযোগিতার, সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার। সমবায়-নীতি এই সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টারই একটি সুষ্ঠু প্রণালী। সমবায়-নীতির মূলসূত্র হইতেছে ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগুলিকে, প্রয়োজনগুলিকে কুড়াইয়া এক লক্ষ্যে বাঁধিয়া তাহাদিগকে একটা সমগ্র রূপ দেওয়া,—পরার্থে নহে, তাহাদেরই আপন প্রয়োজন বা স্বার্থের খাতিরে। ধর্ম্মের, ত্যাগের, পরার্থপরতার যত বড়ই বক্তৃতা আমরা দিই না কেন, সাধারণ মানুষের কর্ম্মের ও প্রচেষ্টার সব চেয়ে বড় তাগিদ, সব চেয়ে বড় প্রেরণা থাকিবে স্বার্থে। সমবায়-নীতি ক্ষুদ্রের এই স্বার্থকে, ব্যষ্টির স্বভাব-দত্ত এই প্রচণ্ড প্রেরণাকে—একত্র করিয়া একমুখী ও একাগ্র করিবারই চেষ্টা করে। সমবায় আন্দোলনের ভিতরকার এই আন্দোলনের সাফল্য আপনিই আসিবে। আপনারা যাঁহারা এই শুভকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি ; আপনাদের সকলের শুভবুদ্ধির সংযোগে, আপনাদেরই সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় এই আন্দোলন সফল হউক, জয়যুক্ত হউক, পল্লীর শ্রী ফিরিয়া আসুক, বাঙ্গালার পল্লীবাসীর শাপমোচন হউক। ওঁ স নো শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু।

ছাত্রদের জীবিকা নির্ব্বাচন সমস্যা

কঃ পন্থা ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গিয়েছে। ম্যাট্রিকে এবারে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল, ২২ হাজারের ওপর পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। এটা সুনিশ্চিত যে, ঐ ২২ হাজার ছাত্রই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলেজে ভর্ত্তি হ'বে না—কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সংখ্যা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে তা ১০ হাজার; তাহ'লেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—১২ হাজার ছাত্র আর পড়বে না। এটা আশা করা মোটেই সঙ্গত নয় যে, ঐ ১২ হাজার ছেলেই চাকরী পেয়ে যাবে কিংবা কোন না কোন কাজ পাবে। হিসাব নিলে বোঝা যায় ঐ ১২ হাজারের মধ্যে এক হাজারের কাজ জোটে কিনা সন্দেহ—বাদবাকী ১১ হাজার বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। এইরকম ভাবেই আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন হু হু করে বেড়ে চলেছে।

উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে শুধু ম্যাট্রিক পাশ ছাত্রদেরই ধরা হয়েছে, কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ ছাত্র ছাড়া ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ, ও এম্-এ, পাশ ছেলেরাও রয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা ধরলে বছর বছর কত যে শিক্ষিত বেকার পয়দা হয় তার একটা সঠিক ধারণা জন্মে। এটা স্বীকার করতে কোন রকম কুণ্ঠা হওয়া উচিত নয় যে, সে ধারণাটা বড়ই মর্ম্মান্তিক। বাপ-মা বা আত্মীয়স্বজন নানা কষ্ট সহ্য করে যে ছেলেটার পেছনে বহু টাকা খরচ করে' তাকে শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত করে তুল্‌ল, সেই ছেলে যদি বেকার বসে থেকে কিছু উপার্জ্জন করতে না পারে তা'হলে সকলের মনেই দুঃখ জাগা স্বাভাবিক। একথা কোন মতেই অস্বীকার করবার জো নেই যে, আমাদের মধ্যে যারা লেখা পড়া শেখে তারা সকলেই অবস্থাপন্ন নয়; এমন দৃষ্টান্ত হামেসাই মেলে যে, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে বাপ-মাকে কায়ক্লেশে দিনপাত করতে হয়েছে, নয়ত বাস্তুভিটে বাঁধা পড়েছে। বাপ-মা বা আত্মীয়স্বজন এতখানি ক্লেশ স্বীকার বা স্বার্থত্যাগ করেন এই আশায় যে তাঁদের পূর্ব্ব জীবনের অসাধারণ কষ্ট স্বীকার উত্তর জীবনে সন্তানের রোজগারে পুষিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁদের সেই আশা নির্ম্মূল হয়ে যায়।

এইজন্যই দোষটা শেষকালে গিয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর। জনসাধারণ আশা করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটা সংস্কৃতি-মূলক (cultural) হওয়ার চেয়ে উহার অর্থোপার্জ্জনী শক্তি (monetary value) বেশী হোক—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাফ

জবাব দেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থকরী হওয়া উচিত নয়। এই বাদানুবাদের কচকচানি এতকাল চলে এসে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলে যে আমাদের আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করে তুলেছে সেধারে কারও নজর নেই—সবাই এখনো সেই পুরাতন কলহের জের টানতে ব্যস্ত। আমাদের মনে হয় যে, দোষটা উভয়তঃ—জনসাধারণেরও বটে, বিশ্ববিদ্যালয়েরও বটে। সেই দোষটাই আমরা এখানে প্রদর্শন করব।

বাঙ্গালী জাতির একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে তারা ভয়ঙ্কর ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতার গুণেই চেটাইয়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা তার এক রকম অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। সাধারণতঃ সব বাপ-মাই ছেলেকে লেখাপড়া শেখায় এই আশায় যে ছেলে একটি ভাল চাকরী পাবে, কিন্তু একথাটা ভুলেও ভাবে না যে ছেলের সংখ্যার অনুপাতে ভাল চাকরীর সংখ্যা দশ হাজারের মধ্যে ২৫টাও হয় কিনা সন্দেহ। এধারে, অধিকাংশ ছেলেরই উচ্চাভিলাষ বলে কোন জিনিস থাকে না—এক কথায় বলা চলে যে, কি জন্য লেখা পড়া শিখছে তা' তারা জানে না, বাপ-মাই তাদের লেখাপড়া শেখায়। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের জীবন যে অর্থকরী

হয়ে উঠবে এ ধারণা করা অন্যায়। যারা উচ্চাভিলাষী হয়, তাদের উচ্চাভিলাষ এতটাই গগনচুম্বী যে, সে উচ্চাভিলাষ পূরণ করবার তাদের আত্মীয় স্বজনের ক্ষমতা নেই। লেখা পড়া শিখতে গিয়ে অনেক ছেলেই ভাবে যে, বড় হয়ে সে হয় আই, সি, এস্ কি আই, এম্, এস্ কি আই, ই, এস্ হবে আর—ব্যারিষ্টার হবে, নয়ত ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের দল ভারী করবে। কিন্তু এতখানি আশা করবার পূর্ব্বে তার ভাবা উচিত ছিল যে, তার বাপ-মার অবস্থা কি রকম। এই রকম রোমান্সের মধ্য দিয়ে আই-এ, বি-এ, পাশ করে সে দেখে যে তার কল্পনার সৌধ বাস্তবের মুষ্ঠ্যাঘাতে একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে। আন্তরিক দুর্ব্বলতা ও স্বাভাবিক অপটুতার জন্য তখন সে ভয়ঙ্কর মুষড়ে পড়ে এবং ফলে তার দ্বারা অনুপ্রেরণার সঙ্গে কোন কর্ম্মজীবন গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

এই হ'ল বাস্তব চিত্র। হাজার দশেক ছাত্র যে কলেজে ভর্ত্তি হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সঠিক ধারণা নেই যে তারা কি কর্ম্মজীবন গ্রহণ করবে। যে দশ হাজার কলেজে পড়বে না অর্থাৎ বেকার হ'বে তারা কেবল খবরের কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে পয়সা খরচ করে দরখাস্ত পাঠাবে এবং বেশীদিন পাঠিয়ে পাঠিয়ে নিরাশ হয়ে অবশেষে 'যদ্ভবিষ্যতি' বলে আর পাঠাবে না। অথচ সকলেরই পিতামাতা লেখাপড়া শেখাচ্ছে ও শিখিয়ে এসেছে এই আশায় যে তার ছেলে বড় হয়ে রোজগার করবে। কিন্তু এমতাবস্থায় রোজগার কি করে সম্ভব?

এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের প্রতি কোন অভি-ভাবকের নজর যায় না বলেই আমাদের দুঃখের পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠেছে। টাকার দিক দিয়ে উচ্চশিক্ষা পাওয়া ও উচ্চশিক্ষা না পাওয়ার যদি সমান দর হয় তা'হলে গরীব অভিভাবকদের সাধারণ শিক্ষার জন্য টাকা খরচ না করাই উচিত ছিল। তাঁদের নিজেদের বোকামীর বৃষবৃক্ষের ফলের দরুণ আক্ষেপ করা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ দেওয়া তাঁদের সাজে না। বারংবার তাঁরা দেখেছেন যে, সাধারণ শিক্ষাটা আজকের বাজারে মোটেই অর্থকরী নয়, বরং অর্থগ্রহী, সুতরাং সে ধারে কেন তাঁরা নিজেদের সন্তানকে চালিত করেন? উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারী যুবকের চাকরীর পারিশ্রমিক ত ২৫৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে, কিন্তু উচ্চাভিলাষের মোহে সেটাকে ১০০৲ টাকা ভাবার পক্ষে কোন্ যুক্তি আছে? তার চেয়ে কিছু মূলধন দিয়ে (যে মূলধনটা তিনি শিক্ষায় ব্যয় করেন) ছেলেকে ব্যবসার কার্য্যে তিনি ব্রতী করান না কেন? নয়ত ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে নিযুক্ত করে দিন না কেন,—যেমন ছুতোর, মিস্ত্রী, কামার, কারিগরের কাজ প্রভৃতি?—

আমাদের মনে হয় শ্রমের মর্য্যাদা সম্পর্কে সব অভিভাবকদের ধারণা এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। ছেলে কারখানায় কাজ করবে বা সামান্য দোকানদার হ'বে একথা ভেবে অনেক অভিভাবকেরই মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সেইজন্যই তাঁরা সমস্ত জেনে শুনেই সাধারণ শিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা শ্রেয়স্কর বলে মনে করেন। কিন্তু এখনো অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা ঠিক ভেবে পান না কোন্ কর্ম্মপথে সন্তানকে চালিত করবেন; তাঁদের অবগতির জন্য আমরা আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করলাম।

২২ হাজার ছেলে আজ কর্ম্মজীবনের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে, বিচারের এতটুকু ভুলচুকে তাদের সারা জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। অপরাপর দেশে ছেলেরাই তাদেব কর্ম্মজীবনের প্রবেশ পথ খুঁজে নেয়, কিন্তু আমাদের দেশের ঐ ২২ হাজার ছেলের মধ্যে অধিকাংশই কর্ম্মজীবনের প্রবেশ পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়—সুতরাং দায়িত্বটা আছে অভিভাবকদের। এই সন্ধিক্ষণে আমরা অভিভাবকদেব চীৎকাব করে জানিয়ে দিতে চাই যে, সাধারণ শিক্ষাটা আর মোটেই অর্থকরী নয়। যে ১০ হাজার ছেলে কলেজে ঢুকতে চাচ্ছে তাদের মধ্যে যাদের কর্ম্মজীবন গ্রহণ সঠিক ধাবণা নেই অথচ যাদেব অর্থোপার্জ্জন কবাটা অপবিহায্য তারা যেন কলেজে ঢুকে টাকার শ্রাদ্ধ না করে। কর্ম্মজীবনের প্রবেশ পথেব সামনে দাঁড়িয়ে যাবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে রয়েছে তাদের জানাচ্ছি যে, যাদেব চাকরী করে দেবার লোকজন ও সুপারিশ আছে তারাই উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হোক্। কিংবা যারা উকিলী, ডাক্তারী বা মাষ্টারী করবার সুযোগ ও সামর্থ্য রাখে তারা কলেজে ভর্ত্তি হোক্। বাদ বাকী যাদের কোন পৈত্রিক পেশা বা কাজ আছে তাতেই শিক্ষানবিশী হিসাবে প্রবেশ করুক। এছাড়া অভিভাবকগণ নিম্নলিখিত কাজেব জন্য ছেলেদের উদ্যোগী হ'তে বলুন :—

বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ

কাবখানার কাজ, ইলেক্‌ট্রিকের কাজ, চামড়াব কাজ, বয়ন শিল্পের কাজ, কুটির শিল্পের কাজ প্রভৃতিতে ছেলেরা বিশেষ পারদর্শী হ'তে পারে। এসম্পর্কে বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের অফিস থেকে সমস্ত বিবরণ জানা যায়। তা'ছাড়া কাঁচড়াপাড়া, লিলুয়া, খড়্গপুব, সৈদপুব, জামালপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি বেলওয়ে ওয়ার্কসপে, বার্ণ,

জয়েনিং, জেসপ্ প্রভৃতি লৌহ কারখানায়, খিদিরপুরের জাহাজ ডকে, বিভিন্ন কাপড়ের কলের কারখানায় শিক্ষানবিশী হিসাবে ঢোকা যায়। এস্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঢুকতে পারলেই হাত খরচা অর্থাৎ এ্যালাউন্স্ মেলে। এইসমস্ত ছাড়াও অপরাপর ছোটখাটো কারখানায় যার সুবিধা হ'বে ঢুকতে পারে। কর্পোরেশনের কারখানায়ও বহু শিক্ষানবিশী গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক বড় বড় কারখানায়ই প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

ব্যবসাগত শিক্ষা গ্রহণ

যদি কারও কোন কিছুর ব্যবসা করার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে সে তার মনোমত ব্যবসাকেন্দ্রে শিক্ষানবিশী গ্রহণ করবে। ধরুন, কারও কাপড়ের ব্যবসা করবার অভিলাষ বর্ত্তমান, তাহ'লে তার প্রথমে কোন বড় কাপড়ের দোকানে শিক্ষানবিশী হিসাবে ঢোকা উচিত। এই রকম প্রত্যেকটি ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া দরকার।

দালালী ও ক্যান্‌ভাসিং কাজের শিক্ষা গ্রহণ

আজকের দিনে দালালী ও ক্যান্‌ভাসিং কাজটাই খুব জোর চলে। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বেশীর ভাগ ছেলেই অবশেষে এধারে ঝুঁকে পড়বে। কাজে কাজেই যারা এ-বৃত্তি গ্রহণ করতে চায় তাদের প্রথমে কোন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন দালালের সঙ্গে ঘোরা উচিত।

টেলিগ্রাফের কাজ, টাইপ রাইটিংয়ের কাজ, ব্লক্ প্রস্তুতের কাজ, দরজীর কাজ, ছাপাখানার কাজ প্রভৃতি আরও বহু ছোটখাটো কাজ আছে যার জন্যে ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। সেধারেও নজর দেওয়া চলতে পারে।

আমরা উপরে বহু বৃত্তিমূলক কাজের কথার উল্লেখ করলাম। ২২ হাজার ছাত্রের অভিভাবক এসমস্ত চিন্তা করে দেখুন, তারপর সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেষ্ট হোন্। নইলে গড্ডালিকা প্রবাহের মত ১০ হাজার ছেলে কলেজে ঢুকলেই অভিভাবকদের পকেটে টাকা আসে না, বরং টাকা বেরিয়ে যায়। এবং এইভাবেই অবশেষে ছেলে বেকার হওয়ার দরুণ পরিবারের দুঃখের সীমা থাকে না। কিন্তু সেই ছেলেকেই যদি প্রথম থেকে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায় তাহ'লে সে কিছু উপার্জ্জন করতে পারে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার প্রভূত খরচাও বেঁচে যায়। আর এই ভাবেই উচ্চ সংস্কৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার সুবিধা পায় ও বাজে আগাছারা বাদ প'ড়ে যায়। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করে অর্থকরী ব্যবস্থা সম্ভব করে তুলতে পারে।

২২ হাজার ছাত্র আজ জীবনের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে, বৃত্তি নির্ব্বাচনের এতটুকু ভুলচুকে বাংলার ঘরে ঘরে ভবিষ্যৎ হাহাকারের রোল উঠবে। অথচ অভিভাবকগণ এসম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে সচেতন হ'লে সে-হাহাকার নিবারণ করা যায়। আমরা কথাগুলি অভিভাবকদের একবার ভেবে দেখতে বলি।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুকায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব। —সম্পাদক

(শ্রীলক্ষ্মীকান্ত অধিকারী মালদহ)

অল্পা যুদ্ধে আঁটুনী সার

*

অতি মেঘে অনাবৃষ্টি

*

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি

*

অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার

*

অতি বাড় বেড়ো না কো ঝড়ে পড়ে যাবে
অতি ছোট হয়ো নাকো ছাগলে মুড়াবে

*

আকাশে থুথু ফেল্লে আপনার গায়ে পড়ে

*

আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ

*

আপন দোষ কেউ দেখে না

*

আপন মান আপন হাতে

*

আপনার ঘোল সবাই মিষ্টি বলে

*

আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে

*

আদা আর কাঁচকলা

*

আগে জলের ছিটা,
পরে চৈড়ের গুতা

*

আপন কোটে পাই
ত' চিড়ে কুটে খাই

*

আটে পিটে দড়,
(তবে) ঘোড়ার পিঠে চড়

*

ইটটি-মারলে পাটকেলটী খেতে হয়

*

উঁচু গাছেই বেশী ঝড়

*

উঁচু হবে তো নীচু হও

*

উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে

*

এঁচোড়ে পাকলেই গোল্লায় যায়

*

একহাতে তালি বাজে না

*

এক মাঘে শীত যায় না

*

একে মা মনসা, তায় ধুনার গন্ধ

*

এটা ছেড়ে ওটা ধরি
হাত ফস্কে পড়ে মরি

*

কনের মাসী, বরের পিসী

*

কথায় কথা বাড়ে

*

কপালের লিখন
না যায় খণ্ডন

*

কড়ি দিয়ে কিনব দই
কি করবে আমার গোয়ালা সই

*

কাজের মধ্যে দুই
খাই আর শুই

*

কিনতে পাগল, বেচতে ছাগল

*

কাজের সময় কাজি
কাজ ফুরালে পাজি

*

কৃপণের ছুনা আয়
চুরি না হয় তো ডাকাতী হয়

*

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে
খোলা কেটে রাক্ষস মরে

*

কুকুরের পেটে ঘি সয়না

*

কুঁড়ে ঘরে বাস
খাট পালঙ্কের আশ

*

কুকুরকে দিলে লাই
পাতায় বসে খায়

*

কানা গরুর ভিন্ন ডহর

*

গলার নীচে গেলে মনে থাকে না

*

গাইতে গাইতে গায়েন

*

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল

*

গোড়া কেটে আগায় জল

*

গোলেমালে হরিবোল

*

ঘরের শত্রু বিভীষণ

*

ঘরের ইঁদুর বাঁধ কাটলে ধরে
রাখে কে ?

*

চেনা বামুনের পৈতের দরকার নাই

*

চালুনী নিন্দে করে ছুঁচকে

*

ঝড়ে কাক্ মরে
ফকিরের কেরামত বাড়ে

*

ঝোপ বুঝে কোপ মারা

*

টাকায় টাকা আনে

*

টাকায় কি না হয়

*

তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না

*

তেলোমাথায় তেল দেওয়া

*

তিলকে তাল করা

*

দশে মিলি করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ

*

দশের লাঠি একের বোঝা

*

দুষ্ট বলদ অপেক্ষা শূন্য
গোয়াল ভাল

*

কাঠগুঁড়োর অপচয় নিবারণ ও একটি শিল্পের সম্ভাবনা

ইংরেজীতে একটি কথা আছে by product ব'লে ; উৎপাদনকারী ব্যক্তি (Manufacturers) ও বৈজ্ঞানিক ছাত্রেরা সেটির সঙ্গে পরিচিত। আজকের যুগে এই বাই-প্রোডাক্টের ভয়ঙ্কর কদর পাশ্চাত্য দেশে, এই বাই প্রোডাক্টের কল্যাণেই উৎপাদন-জগতে একটা রীতিমত ওলট্ পালট্ হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব্বে কিন্তু এই বাই প্রোডাক্টের ব্যবহার ছিল না বল্লেই হয়। এক্ষেত্রে বাই-প্রোডাক্ট্ দ্রব্যাদি কি সেটা জানা আবশ্যক। একটা কোন বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাম্য বস্তুটি প্রাপ্ত হবার পর অপর যেটা পড়ে থাকে সেটার যদি সদ্ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে তবে শেষোক্ত বস্তুকে প্রথমোক্তর বাই-প্রোডাক্ট্ বলে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বহু বাই-প্রোডাক্টের উদাহরণ দেওয়া চলে, কিন্তু একেবারে একটি গার্হস্থ্য বাই-প্রোডাক্টের উদাহরণ দিচ্ছি। বাড়ীতে ইলিশ মাছ এনেছেন, তেলে সেটা ভাজলেন। অন্য মাছ হ'লে ঐ ভাজা তেলটা তেমন কাজে আসত না, কিন্তু ইলিশ মাছের তেল খাদ্যবিশেষ—সুতরাং ওটা বাই-প্রোডাক্ট্। অর্থাৎ আপনি তেল খাবার জন্য মাছ কেনেননি, মাছ খাবার জন্যই ইলিশ কিনেছিলেন, কিন্তু তেলটা আপনার উপরি পাওনা হ'ল। কিংবা ধরুন, বাড়ীতে পান্তুয়া করবার জন্য আপনি 'ভেয়ান্' বসিয়েছেন, মণ ২৷৩ পান্তুয়া দরকার। তার জন্য প্রচুর পরিমাণ রসের প্রয়োজন। এ-রস আপনাকে তৈরী করতেই হবে অথচ পান্তুয়া খেয়ে ফেলবার পর এই বিরাট পরিমাণ রস আপনার কোন কাজে আস্‌বে না। কিন্তু সেই রস থেকে যদি মিছরি প্রস্তুত করা হয় তাহ'লে সেটা কাজে লাগে। এখানে মিছরিটা হ'ল বাই-প্রোডাক্ট। বাড়ীতে দুধ কাটিয়ে আপনি ছানা তৈরী করলেন, ছানার জলটা সচরাচর ফেলেই দেন। কিন্তু রুগীর পথ্য হিসাবে সেই ছানার জল যখন ব্যবহৃত হ'ল তখন সেটা দাঁড়ালো বাই-প্রোডাক্ট্।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, আমরা যে সমস্ত উদাহরণ উপরে উল্লেখ করলাম বৈজ্ঞানিক ও উৎপাদনকারিগণ (Manufacturers) সেগুলি শুনলে হাসবেন, কেননা, উপরোক্ত সাধারণ দ্রব্যগুলিকে নীতির দিক দিয়ে বাই-প্রোডাক্ট বললেও ব্যবহারিক দিক দিয়ে বাই-প্রোডাক্ট নামে অভিহিত করা চলে না। বিরাট উৎপাদন ব্যাপারে ভয়ঙ্কর লাভের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত 'ফেল্‌তা' দ্রব্য অতিরিক্ত লাভ এনে দেয় ব্যবহারিক ভাবে সেগুলিই হ'ল বাই-প্রোডাক্ট। কয়লার ব্যাপারে যে কোল্‌টার পাওয়া যায় তা' থেকে বেন্‌জিন্, ন্যাপ্‌থালিন

ও অন্যান্য বহু বস্তু উৎপাদিত হয় যার Commercial value বা ব্যবহারিক মূল্য আসল জিনিষটার চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বেশী। এক্ষেত্রে কোল্‌টার হ'ল একটী বাই-প্রোডাক্ট্‌। ইঞ্জিনে যে কোক্‌ কয়লা পোড়ে তাতে বাষ্প তৈরী হয়, অতঃপর যেটা ফেলা যায় তাকে cinders বা কয়লার ছাই বলে। এই কয়লার ছাই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ঠিক সুড়কীর ন্যায় ব্যবহৃত হয় এবং ইহার দ্বারা প্রস্তুত মসলা সীমেণ্টের ন্যায় মজবুদ ও শক্ত হ'য়ে জমাট বাঁধে। সুতরাং এটা হ'ল কয়লার বাই-প্রোডাক্ট। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

উপরে ঐ বাই-প্রোডাক্টের উল্লেখ করবার উদ্দেশ্যই হ'ল এই দেখানো যে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে আজকাল আর কোন জিনিসই 'ফেলতা' যায় না, সকল দ্রব্যকেই সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা চলে। আজকের বিজ্ঞানজগৎ আর কোন জিনিসকে নষ্ট হতে দিতে চায় না তা' সে যতো সামান্যই হোক্‌। শুধু বৃহৎ উৎপাদন ক্ষেত্রেই নয়, ছোটখাটো উৎপাদন ব্যাপারেও ঐ জিনিস পরিলক্ষিত হয়। আপনি পথ চলবার সময় যদি ইতস্ততঃ লক্ষ্য রাখেন তাহ'লে দেখতে পাবেন যে, রাস্তার জঞ্জাল থেকে একদল লোক ভাঙা কাঁচের টুক্‌রা, শিশি বোতলের খণ্ড ইত্যাদি কুড়িয়ে নিচ্ছে। এই সব ভাঙা কাঁচ কাঁচের কারখানায় ব্যবহৃত হয়। শুধু কি তাই, আপনি আরও দেখতে পাবেন যে, ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, কাগজ ইত্যাদিও পড়তে পায় না— এগুলোও নতুন কাগজ তৈরী করবার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় দরজীর দোকানে জামা ইত্যাদি তৈরী হবার পর যে ছাট্‌ কাপড় পড়ে থাকে সেটা তারা ফেলে দিলেও ছোট ছোট দরজীরা সেগুলি সংগ্রহ

করে নিয়ে যায় এবং তার থেকে নানাবিধ জামা-কাপড় তৈরী করে। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অপচয় বাঁচাতে সমাজের আজ কী ভীষণ আগ্রহ।

আমরা এবার করাত গুঁড়ো সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। করাত গুঁড়ো বা কাঠ গুঁড়োর সঙ্গে সকলেই পরিচিত আছেন কিন্তু এই সামান্য জিনিষ যে নানাবিধ কাজে আসে একথা শুন্‌লে অনেকেই বোধ হয় আশ্চর্য্য হবেন। ভারতবর্ষে কাঠের ব্যবহার বড় কম নয়, সুতবাং সঠিক না থাকলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রচুর কাঠ গুঁড়ো এদেশে উৎপাদিত হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমাণ কবেন যে, যে-পরিমাণ কাঠ চেরাই হয় তাব অন্ততঃ শতকবা দশ ভাগ কাঠ গুঁডোয় পরিণত হয়। এ হিসাব থেকে এটা বলা চলে যে, লক্ষ লক্ষ টন কাঠ গুঁড়ো প্রতি বৎসব উৎপাদিত হয়ে থাকে। সাধারণ লোকে কেবল দেখে যে কাঠ গুঁডো শুধু বরফ ঢাকাতেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ববফ ঢাক্‌তে ত আর হাজাব টন মাল কাজে লাগে না; খবব নিলেই জানা যাবে যে বেশীব ভাগ কাঠ গুঁডোই লোকে পুড়িয়ে নষ্ট করে। তা'তে ফল হয় এই যে আমরা ধোঁয়াব কালিমা ও ভুষোয় অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। কিন্তু যে পরিমাণ কাঠ গুঁড়ো বৃথা নষ্ট হয় তাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পাবি ত আমাদের বহু টাকাব সাশ্রয় হ'তে পারে।

কাঠ গুঁড়োকে নষ্ট না করলে তা' বহুবিধ দরকারে লাগতে পারে। মোটামুটি দেখতে গেলে কাঠ গুঁড়োর ব্যবহারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা:—

(১) ইহার নিজস্ব ব্যবহার;

(২) অপর কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ব্যবহার;

(৩) অপব বস্তু উৎপাদনে সাহায্য কারকরূপে ব্যবহার।

পৃথক পদার্থ হিসাবে কাঠ গুঁডো জ্বালানী, ফল প্যাক্ করণ, পালিশ, মেঝে তৈরী, গ্যাস্ বিশুদ্ধ করণ, সার্কাসের রিং প্রস্তুত, চামড়া পরিষ্কার, আস্তাবলে এবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে বিছাবার উপাদান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাডাও কাঠ গুঁডোব অন্যতম ব্যবহাব হচ্ছে অপব পদার্থেব সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে—কৃত্রিম কাষ্ঠ নির্ম্মাণ, মেঝে পরিষ্কাব, জমাট মেঝে প্রস্তুত, লাইনোলিয়াম, আলো জ্বালানী, সাবান প্রস্তুত, দেওয়াল পেপাব প্রস্তুত, পোড়া মাটী প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন। অক্সালিক্ এ্যাসিড্, এসেটিক্ এ্যাসিড্, ফর্মিক্ এ্যাসিড্, মিথিল্ এ্যাল্‌কোহল্, কাববাইড্, সেলুলোজ এ্যাসিটেট্ প্রভৃতি উৎপাদন এবং ডিস্‌টিলেসন্ ও ফিউসন ইত্যাদি কার্য্যেও কাঠ গুঁডো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপরে যে সমস্ত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলাম দুঃখেব বিষয় ভারতবর্ষে তাব সদ্ব্যবহাব অত্যন্ত কম। যা আছে তাতে সামান্য পরিমাণ কাঠ গুঁড়োই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং বাদবাকী কাঠ গুডো নষ্ট হয়। আমাদেব এখানকাব ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কিংবা বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদি উৎপাদক মণ্ডলী যদি সঙ্ঘ বা সমিতি স্থাপন দ্বারা উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি মনযোগ প্রদর্শন করেন তা'হলে দেশের একটি দ্রব্য অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়, এবং তা' বহুল ভাবে নূতন শিল্প বাণিজ্য প্রবর্ত্তনে সহায়তা করে। ব্যবহারোক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে গুটি কয়েক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা এদেশে আছে কিন্তু

সেখানে হয়ত কাঠ গুড়ো ব্যবহৃত হয় না। এর কারণ হচ্ছে যে, কাঠ গুঁড়ো বিক্রয় সমিতি বলে এখানে কোন প্রচারক সমিতিও নেই এবং তা'দের তরফ হ'তে কাঠ গুড়োর চাহিদা বৃদ্ধি করবার কোন প্রচেষ্টাও নেই। যে কারখানার কথা উল্লেখ করলাম সেখানে যদি কাঠ গুড়ো ব্যবহারের জন্ম প্রচার কার্য্যের চাপ দেওয়া যেত তা'হলে ঐ সব কারখানা নিশ্চয়ই কাঠ গুড়ো ব্যবহার করত। এক্ষেত্রে আমেরিকায় কাঠ গুড়ো বিক্রয়ের জন্ম কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'য়ে থাকে সেটার আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেখানে কাঠ গুড়ো বিক্রয় করবার জন্ম বড় বড় কোম্পানী আছে। বিভিন্ন কাঠগোলা ও কাঠেব কারখানা থেকে তারা উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করে এক যায়গায় জমা করে। তারপর ভাল-মন্দ, মিহি-মোটা গুণানুসারে তা' বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্ম মিহী, মোটা, সরেশ, নিরেশ ইত্যাদি প্রকারের কাঠ গুড়ো ব্যবহৃত হয়ে থাকে—কোম্পানী প্রয়োজনানুসারে সেই সেই যায়গায় আবশ্যকীয় বস্তু জোগান দেয়। এইভাবে তাবা কাঠ গুড়োর চাহিদা ঠিক রাখে এবং নিত্য নূতন চাহিদা সৃষ্টি করতে চেষ্টা পায়।

আমেরিকার ব্যাপার থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা করবার আছে। একথাটা সত্য যে, আমাদের দেশে বহুল পরিমাণ কাঠ গুড়ো উৎপন্ন হয় এবং তার বেশীর ভাগই অপচয়ে নষ্ট হয়। এটাও মিথ্যে নয় যে, কাঠ গুড়োর বহু প্রকার ব্যবহার আছে এবং আমাদের দেশে তার যদি যোগ্য সদ্ব্যবহার করা যায় তা'হলে আমাদের দেশের একটা সম্পদ্ অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং দেশে নূতন শিল্প বাণিজ্য গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, দেশীয় ব্যবসায়ী ও মূলধনী সম্প্রদায় একত্র মিলিত হ'য়ে একটি কাঠ গুড়ো বিক্রয় সমিতি করুন, উক্ত সমিতি বিভিন্ন জেলায় এজেন্ট নিযুক্ত পূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানের কাঠ গুড়ো সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ডিপোয় জমা করুন এবং তা' বিক্রয়ের জন্ম বাজার গড়ে তুলুন। এইভাবে এদেশেব কারখানা সমূহেই কিয়ৎ পরিমাণ কাঠ গুড়ো ব্যবহৃত হ'বে। শুধু তাই নয়, কাঠ গুড়োর যে সমস্ত ব্যবহারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, এদেশে সেই সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন শিল্প গড়ে উঠবে। যতদিন না তা' গড়ে ওঠে ততদিন উক্ত বিক্রয় সমিতি বিদেশের বাজারে কাঠ গুড়ো বিক্রয় করবার প্রচেষ্টা চালাবে। ভারতবর্ষ থেকে এই রকমের বহু কাঁচামাল বিদেশের বাজারে প্রেরিত হয়। সুতরাং কাঠ গুড়ো প্রেরিত না হ'বার কোন সঙ্গত কাবণ নেই। তা' ছাড়া কেন্দ্রীয় বিক্রয় সমিতি স্থাপনেব ফলে দেশের মধ্যে কাঠ গুড়ো বিক্রয়েব ব্যবসা রীতিমত জেকে উঠ্বে। আমাদেব এই দেশেই পুরাণো কাপড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ব্যবহৃত কাগজ প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করবার প্রতিষ্ঠান আছে এবং তা' থাকাব ফলেই বহুলোক ঐ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পায়। কাঠ গুড়ো বিক্রয় সমিতি গঠিত হ'লেও দেশের একদল বেকার উহা ক্রয় বিক্রয় করে জীবিকার্জ্জনের সুযোগ লাভ করবে এবং দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করণে সহায়তা করবে।

আমরা উপরে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করলাম, এক্ষণে দেশের ব্যবসায়ী ও মূলধনী সম্প্রদায় যদি এধারে নজর দেন তা'হলে একটি সম্পদ্ অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং বহু লোকের জীবিকার সংস্থান ঘটতে পারে।

ফরমুলা ও রিচিপি

পায়ে মাখিবার পাউডার ও সলিউসান

জুতা পায়ে দিয়া অথবা খালি পায়ে যেরূপই চলা ফেরা করা থাক্ না কেন, পায়ে নানাপ্রকার ময়লা ও রোগ বীজাণুর সংস্পর্শ হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী। জুতার সহিত ঘর্ষণে পায়ের চামড়া জখম হয়। অনেকের পায়ে বিশ্রী ও যন্ত্রণাদায়ক কড়া পড়ে। খালি পায়ে অথবা স্যাণ্ডেল কিম্বা চটিজুতা পরিয়া চলিলে ধুলো কাদা লাগিয়া একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে। পায়ের নখের কোণে ময়লা জমিয়া অস্বাস্থ্যের কারণ হয়। আমাদের দেশে পায়ে তেল মাখিবার রীতি প্রচলিত আছে। বাস্তবিক পায়ে তেল মাখা এত স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিজনক যে, কোন লোককে সন্তুষ্ট করার অর্থে তাহার "পায়ে তেল মাখা" কথাটী এদেশের ভাষায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে আমাদের দেশীয় এই স্বাস্থ্যকর প্রথাটী লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর কেহ পায়ে তেল মাখেন না। মুখে যেমন ক্রীম পাউডার, পায়ের জন্য ঐ রকম কিছু চাই। আমরা নিম্নে পায়ের জন্য কয়েক রকমের পাউডারের ফরমুলা দিলাম। যে সকল সুন্দর-সুন্দরীরা সরিষার তৈল মাখিতে না-রাজ, তাঁহারা ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। যাঁহাদের ক্রীম পাউডার প্রভৃতি তৈয়ারীর কারবার আছে, তাঁহারাও একটা নূতন প্রসাধন সামগ্রী বাজারে চলন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

(১) বোরিক য়্যাসিড (Boric Acid) — ২ আউন্স
জিঙ্ক অলীয়েট (Zinc oleate) — ১ ,,
ট্যালকাম্ (Talcum) — ৬ ,,

(২) বোরিক য়্যাসিড (Boric Acid) — ২ আউন্স
জিঙ্ক অলীয়েট চূর্ণ (Zinc Oleate powdered)
ফ্রেঞ্চ চক্ (French Chalk) — ১০ ,,
ষ্টার্চ (Starch) — ৩ ,,

(৩) শুষ্ক ফট্‌কিরী — ২ ড্রাম
স্যালিসিলিক য়্যাসিড্ (Salicylic Acid) — ১ ,,
গমের ষ্টার্চ (Wheat Starch) — ৮ ,,
ট্যাল্ক চূর্ণ (Powdered Talc) — ৩ ,,

(৪) ফরম্যালডিহাইড্ সলিউসান (Formaldehyde Solution) — ১০ ভাগ

থাইমল (Thymol) ১ ,,
জিঙ্ক্ অক্সাইড্ (Zinc Oxide) ৩৫০ ,,
ষ্টার্চ চূর্ণ (Powdered Starch) ৬৫০ ,,
(৫) ট্যাল্ক (Talc) ১২ আউন্স
বোরিক এ্যাসিড (Boric Acid) ১০ ,,
জিঙ্ক্ অলিয়েট্ (Zinc Oleate) ১ ,,
স্যালিসিলিক এ্যাসিড ১ ,,
((Salicylic Acid)
ইউকালিপ্টাস্ তৈল ২ ড্রাম
(Oil of Eucalyptus)

যাহাদের পা সর্ব্বদা ঘামে, তাঁহারা জুতা পায়ে দিয়া কখনও আরাম পান না। খালি পায়ে চলিলে ঘামেতে ধূলো বালি আটকিয়া অতি বিশ্রী ও অস্বাস্থ্যকর হয়। তাঁহারা নিম্নলিখিত সলিউসান ব্যবহার করিতে পারেন ;—

(১) বালসাম্ পেরু ১৫ মিনিম
(Balsam Peru)
ফর্‌মিক্ এ্যাসিড (Formic Acid) ১ ড্রাম
ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট্ ১ ,,
(Coloral Hydrate)

ইহাদের সহিত এ্যালকহল (Alcohal) মিশাইয়া মোট তিন আউন্স করিয়া লউন। এই সলিউসান এ্যাব্‌সরবেন্ট তুলায় (Absorbent Cotton) অর্থাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার জন্য ডাক্তার খানায় যে তুলা পাওয়া যায় সেই তুলায় ভিজাইয়া পায়ে মাখাইবেন।

(২) বোরিক এ্যাসিড্ ১৫ গ্রেণ
(Boric Acid)
সোডিয়াম বোরেট্ ৬ ড্রাম
(Sodium Borate)
স্যালিসিলিক এ্যাসিড্ ৬ ,,
(Salicylic Acid)
গ্লিসিরিণ (Glycerine) ১॥০ আউন্স্

ইহাদের সহিত এ্যালকহল (Alcohol) মিশাইয়া মোট তিন আউন্স করিয়া লউন।

নানা প্রকার কাগজ তৈরী করিবার প্রক্রিয়া

ফায়ার প্রুফ কাগজ, অর্থাৎ যে কাগজ আগুণে পুড়িয়া যায় না।

(১) এ্যামোনিয়াম সালফেট্ ৮ ভাগ
(Ammonium Sulphate)
বোরাসিক এ্যাসিড্ (Boracic Acid) ৩ ,,
সোহাগা (Borax) ২ ,,
জল ১০০ ভাগ

এই সকল মশলা উত্তাপে গরম করিয়া ভালরূপে মিশাইবেন। উত্তাপের পরিমাণ ১২২° ডিগ্রী হওয়া দরকার।

(২) য়্যামোনিয়াম সালফেট্ (ammonium sulphate) ৮০ ভাগ
বোরাসিক য়্যাসিড্ (Boracic acid) ৩০ „
সোডিয়াম বোরেট্ (Sodium borate) ১৭ „
জল ১০০০০০ „

এই মশলাগুলি ১২২° ডিগ্রী ফারেণ হীট্ উত্তাপে গরম করিয়া ভালরূপে মিশাইবেন। যে কাগজখানিকে ফায়ার প্রুফ্ করিতে হইবে তাহাকে তৈয়ারী মশলার জলে ডুবাইয়া (১২২° ডিগ্রী ফারেণহীট উত্তাপ) তারপর কাগজখানি ছড়াইয়া শুকাইয়া লইবেন। শুকাইলে রোলারের দ্বারা চাপিয়া পালিশ করিবেন।

হাইড্রোগ্রাফিক কাগজ

এই কাগজের উপর জল দিয়া লিখিলে ঠিক কালির লেখার মত লেখা হইবে।

(১) খুব শুক্না ভাজা আয়রণ সালফেট (iron sulhpate) এক ভাগ এবং নাটগল (nutgalls) ৪ ভাগ একত্র মিশাইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবেন। একখানি কাগজের উপর ঐ সূক্ষ্ম চূর্ণ মাখাইয়া একটী রোলারের দ্বারা খুব চাপ দিয়া লইবেন, যাহাতে কাগজের ছিদ্রের মধ্যে ঐ চূর্ণ প্রবেশ করে। তারপর আল্গা চূর্ণ যাহা কিছু কাগজে লাগিয়া থাকে তাহা বুরুশ দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবেন। এই কাগজের উপর জল দিয়া লিখিলে কাল লেখা হইবে। ব্লু-লেখা লিখিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত এক নম্বর ফরমুলার মত পারসালফেট অব আয়রণ (persulphate of iron) এবং পটাসিয়াম্ ফেরো সায়েনাইড্ (potassium ferro cyanide) ব্যবহার করিবেন।

রামধনুর মত বর্ণবিশিষ্ট কাগজ

স্যাল য়্যামোনিয়াক্ (Sal Ammoniac) ৮ ভাগ
ইণ্ডিগো সালফেট্ (Indigo Sulphate) ৮ „
আয়রণ সালফেট্ (Iron Sulphate) ৪০ „
নাটগল (Nutgalls) ৬৪ „
আরবী গঁদ (Gum Arabic) ১ „

এই সকল মশলা জলে ফুটাইয়া লইবেন। তারপর কাগজখানি ঐ মশলায় ধুইয়া য়্যামোনিয়ার বাষ্পের উপরে খানিকক্ষণ ধরুন।

লিথোগ্রাফিক কাগজ

যখন কোন চিঠি পত্র, আফিসের সার্কুলার, ছোটখাট বিজ্ঞাপন, রসিদ, চিত্র, প্রভৃতি বহু সংখ্যায় ছাপিতে হয়, তখন এই লিথোগ্রাফিক কাগজের দরকার। ইহার উপরে প্রথমতঃ লিথোগ্রাফিক কালি দিয়া লিখিতে হয়। তারপর এই লেখার পশ্চাৎ দিকের পৃষ্ঠা একটু জলে ভিজাইয়া লেখাটীকে পাথরের উপর রাখিয়া জোরে চাপ দিতে হয়। তখন দেখা যাইবে পাথরের উপর উল্টা লেখার ছাপ পড়িয়াছে। এই উল্টা লেখা হইতে পুনরায় ছাপিলেই ঠিক সোজা লেখা পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ লিথোগ্রাফিক ছাপিবার পদ্ধতিতে পাথরের উপর উল্টা করিয়া লিখিতে হয়। এই কার্য্যটী নিতান্ত সহজ নহে, সকলে ইহা পারেনা। কিন্তু লিথোগ্রাফিক কাগজে সোজা ভাবে লিখিয়া সেই লেখাকে পাথরের উপর উল্টাভাবে লইয়া যাওয়া খুব সহজ কাজ। এই কারণে আজকাল লিথোগ্রাফিক কাগজের খুব চলন হইয়াছে। ইহা তৈয়ারী করিবার দুইটী প্রক্রিয়া নিম্নে লিখিত হইল ;—

(১) প্রথমতঃ ষ্টার্চ্চ্ (starch) ৬ আউন্স, আরবী গঁদ ২ আউন্স, ফট্‌কিরি ১ আউন্স পৃথক পৃথক পাত্রে গরম জলে এই তিনটী দ্রব্যের ভোবাল সলিউসান করুন। তারপর তিনটি সলিউসান মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লউন। এই ছাঁকা তরল মশলাটী একটু গরম থাকিতে থাকিতে কাগজের এক পৃষ্ঠে একখানি পরিষ্কার বুরুশ অথবা স্পঞ্জ দিয়া একবার মাখাইবেন। এই কোট্ শুকাইয়া গেলে, দ্বিতীয় বার এবং দ্বিতীয় কোট্ শুকাইয়া গেলে তৃতীয় বার মাখাইবেন। শেষ কোট্ শুকাইলে কাগজ-খানিকে রোলারের সাহায্যে চাপিয়া পালিশ করিয়া লইবেন।

(২) প্রথমে খুব ভাল ষ্টার্চ্চ্ সলিউসান সাইজের তিন কোট অথবা চার কোট্ কাগজে লাগাইবেন। তারপর এক কোট্ গ্যাম্বোজ (gamboge) সলিউসান মাখাইবেন। এই সমস্ত সলিউসান যেন টাট্‌কা ও ঠাণ্ডা থাকে। এক কোট শুকাইবার পর আর এক কোট লাগাইবেন।

শ্লেট্ কাগজ

ছোট ছেলেমেয়েদের লেখার জন্য পাথরের শ্লেটের পরিবর্ত্তে আজকাল কাগজের শ্লেটের চলন হইয়াছে। ইহার সুবিধা এই যে হাত হইতে পড়িলে অথবা অসাবধানতায় কোন চাপ পাইলে উহা ভাঙ্গিয়া যায় না। এই শ্লেট কাগজ তৈয়ারীর মশলা নিম্নে লিখিত হইল ;—

প্রথমতঃ একখানি ভাল কাগজকে প্রয়োজন মত সাইজে কাটিয়া সিদ্ধ করা তিসির তৈলের ভার্ণিশে ডুবাইয়া লউন। তারপর তাহাতে নিম্নলিখিত মশলা মাখাইবেন ;—

কোপ্যাল ভার্ণিশ	১ ভাগ
তার্পিণ তৈল	২ ,,
সূক্ষ্ম বালুকা চূর্ণ	১ ,,
সূক্ষ্ম কাঁচ চূর্ণ	১ ,,
সূক্ষ্ম শ্লেটপাথর চূর্ণ	২ ,,

উপরোক্ত মশলা মাখান কাগজ শুকাইয়া শক্ত হইলে উহাকে শ্লেটরূপে ব্যবহার করা যায়।

ওয়াটার প্রুফ কাগজ

অর্থাৎ যে কাগজে জল লাগিলে নষ্ট হয় না।

(১) সোহাগা (Borax)	২ ভাগ
গালা (Shellac)	২ ,,
জল	২৪ ,,

সোহাগা ও গালাকে জলে গলাইয়া খুব মিহি কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লউন। তারপর একখানি বুরুশ অথবা স্পঞ্জের দ্বারা এই ছাঁকা তরল মশলাটী কাগজের উপর মাখাইয়া দিন। শুকাইয়া জলে নরম বুরুশে ঘষিয়া উহাকে পালিশ করিয়া লউন।

(২) প্রথমতঃ যে কোন একখানি কাগজে শিরীষ অথবা গঁদের আঠা মাখাইয়া লউন। এই আঠার সঙ্গে খুব মিহি রকমের জিঙ্ক হোয়াইট (Zinc white) অথবা খড়িমাটী মিশাইয়া লইবেন। যদি কাগজকে লাল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি অন্যরকমের রং করিতে চান, তবে সেই রং ও এইসঙ্গে মিশাইবেন। তারপর কাগজের উপরে এককোট সোডিয়াম সিলিকেট (Sodium Silicate) মাখাইবেন। এই সোডিয়াম সিলিকেটের সঙ্গে কিছুটা ম্যাগ্‌নেসিয়া (Magnesia) মিশাইয়া লইবেন। এক্ষণে ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত এই কাগজ খানিকে ৭৭ ফারেনহীট উত্তাপে শুকাইবেন।

এই কাগজের উপরে পেন্সিল, খড়ি, ক্রেয়ন কয়লা, ইণ্ডিয়া ইঙ্ক প্রভৃতির লেখাও চিত্র বার বার জলে ধুইয়া ফেলা যায়। তাহাতে কাগজ নষ্ট হয় না।

ফলের পচন নিবারণের ব্যবস্থা

যাঁরা ফলের ব্যবসা করেন তাঁরাই জানেন যে, এ-ব্যবসার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল পচনক্রিয়া। এই পচনক্রিয়ার আশঙ্কাতেই ফলের বাজারের ব্যাপারীরা রীতিমত শঙ্কিত থাকে। বস্তুতঃ, বাজারে ফলের দর-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পচনের ব্যাপারটা হ'ল একটি প্রধান উপাদান, অর্থাৎ ফলের দরটা শুধুমাত্র ব্যাপারীর ক্রয় খরচা ও মাল প্রেরণের ব্যয়ের ওপরই নির্ভর করে না, পরন্তু পচনের জন্য যে পরিমাণ মাল নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে সেটার হিসাবও ধরা হয়। সেইজন্যই ফলের দরটা আমাদের নিকট কিছু বেশী বলে মনে হয়। এটা ঠিক কথা যে, আমরা যদি কোন উপায়ে পচন নিবারণের ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহ'লে ফলের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা হ'ত।

বিষয়টি বোঝবার সুবিধার জন্য একটি ব্যবহারিক উদাহরণ ধরা যাক্। মেওয়াজাতীয় ফল পেশোয়ার থেকে কোলকাতায় চালান আসে, কিন্তু পেশোয়ারেই উক্ত ফলসমূহের জন্মস্থান নয়—আফ্‌গানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহ থেকে ফলগুলি সর্ব্বপ্রথম পেশোয়ারে আমদানী হয়। তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে যে, চাষের ক্ষেত্র থেকে ফলগুলির কোলকাতায় পৌঁছতে রীতিমত সময় লাগে; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতকটা পরিমাণ দ্রব্যের পচন স্বাভাবিক। যদি একমণ মাল প্রেরিত হয়ে থাকে তাহ'লে অন্ততঃ সের পাঁচেক পচে যায়; শুধু তাই নয়, কোল্‌কাতার বাজারেও ঐ ৩৫ সের ফল একেবারে কাটে না—কিছু সময় লাগে। সেক্ষেত্রেও আরও কিয়ৎ পরিমাণ ফল পচে এবং এইজন্যই অপরাপর খরচা বাদ দিলেও ৪০ সেরের দরটা ৩০ সেরের দরে গিয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ অপরাপর দ্রব্যের ব্যাপারে অপর স্থানে যদি ৪০ সের মাল ১০ টাকায় পাওয়া যায় তাহ'লে কোলকাতায় সেই ৪০ সের মালের দর ঠিক হবে ১০৲ টাকা+মালপ্রেরণের খরচ+ফড়ে'র দালালী+ব্যাপারীর লাভ। এখানে মালের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা কম্‌ল না। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে অন্য রকম। অপর স্থানে যদি ৪০ সের ফলের দর ১০৲ টাকা হয় তাহ'লে কোলকাতায় সেই ৪০ সেরের দাম ঠিক হবে ১০৲ টাকা+মাল প্রেরণের খরচ+ব্যাপারীর লাভ+ফড়ে'র দালালী+পচে যাওয়া ১০ সের (আনুমানিক) ফলের দাম। এক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যাপারটা বাড়তি। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা যদি না থাকতো ত ফলের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা হ'ত এবং ফল ব্যবসায়ীদেরও আতঙ্কগ্রস্থ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হ'ত না। এই কারণেই অর্থনীতি শাস্ত্রে perishable goods এর মূল্য নির্ণয়ের পৃথক নিয়ম আছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, পচনটা যদি কোনক্রমে নিবারণ করা সম্ভব হয় তাহ'লে ফলের দাম

কমে। ফলের দাম কমলেই তার কাটতি বাড়ে, কেননা, জনসাধারণের সেটা ক্রয় করা সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলের কাটতি বাড়া মানেই ফলের ব্যবসা ভাল ভাবে চালু হওয়া এবং সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকলেই লাভবান হতে পারে।

ব্যবহারিক ভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বিভাগ থেকে ফলের পচন নিবারণ করবার উপায় উদ্ভাবন করে ফলের ব্যবসার উন্নতি করবার জন্য প্রতি নিয়ত নানারূপ চেষ্টা করা হ'চ্ছে। উক্ত উপায় ত্রিবিধ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত :—

(১) এ্যান্টিসেপ্‌টিক্ পদার্থ দ্বারা ধৌত করণ, যাতে করে পচনকারী জীবসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,

(২) ফলের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন নিরোধক ব্যবস্থা,

(৩) পালিশের আশ্রয় গ্রহণ যাতে ফলের স্বাভাবিক রং অম্লান থাকে। আমেরিকা থেকে প্রচুর-পরিমাণ কমলা লেবু জাহাজযোগে বিদেশে চালান যায়, সুতরাং সেখানে উক্ত উপায় ও ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবসায়ীগণ যে উপকৃত হয় একথা বলাই বাহুল্য।

কমলালেবু চালান দেওয়ার ব্যাপারে একটা মজার ব্যাপার এই যে, চাষীদের প্রথমতঃ কাঁচা ফল চালান দেওয়ার একটা লোভ জন্মে। এর কারণ হচ্ছে যে, যে যত আগে বাজারে মাল চালান দিতে পারে সে তত বেশী দাম পায়। এই বেশী লাভের আশায়ই তারা ফল না পাকতে পাকতেই তাকে পেড়ে প্যাক্ করে। এতে ভবিষ্যতে ফল বড় খারাপ হয়। সেইজন্য সেখানকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা মিলে কোন অবস্থায় ফল চালান দেওয়া উপযোগী হয় তার একটা মান ঠিক করে নিয়েছে। সে-মান হচ্ছে লেবুর মধ্যে শর্করা ও অম্ল পদার্থের অবস্থানের নির্দ্দিষ্ট হার। পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, ফলের মধ্যে উপরোক্ত পদার্থের অবস্থানের ব্যাপারটা নির্দ্দিষ্ট হারে এসে দাঁড়িয়েছে তাহ'লেই সে ফল চালান যাবার উপযুক্ত হয়। এইভাবেই সেখানে বাজার ঠিক রাখবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

ফলের পচন কার্য্যে সাহায্যকারী পদার্থকে টেক্‌নিক্যালি দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে, একটির নাম Punicillium Italium এবং অপরটির নাম Punicillium digitatum. ফল যে সমস্ত জায়গায় থেঁতলে যায় সেই সমস্ত স্থানেই উক্ত শেষোক্ত পদার্থ আক্রমণ করে কিন্তু প্রথমোক্ত পদার্থ ফলের সর্ব্বস্থানেই পচনে সাহায্য করে এবং এটা অত্যন্ত সংক্রামক অর্থাৎ ফলের কোন অংশে যদি Punicillium Italium আক্রমণ করে তাহ'লে ফলের সর্ব্বাঙ্গে সেটা ছড়িয়ে পড়ে ও আক্রান্ত ফলের সংস্পর্শে অপর ফল থাকলেও তা'তে তা' বিস্তারিত হয়। প্যাকিং এর যেখানটায় ফল চেপে থাকে সেখানেও ও-বস্তু আক্রমণ করে। কাজে কাজেই প্যাকিং-এর ব্যাপারে আমরা যদি একটু যত্ন নিই এবং প্যাক্ করা বাক্স যদি নিরাপদে নাড়াচাড়া করি তাহ'লে ফলকে পচনের হাত থেকে অনেকটা বাঁচাতে পারি।

কিন্তু আসল প্রতিষেধক হ'ল এ্যান্টিসেপ্‌টিক্ সলিউসন। শতকরা ৮ ভাগ সোহাগার সলিউসন সদ্য-পাড়া ফলে মাখালে ফল ভাল থাকে। সোডিয়াম কারবোনেট্ সলিউসন মাখালেও ভাল ফল পাওয়া যায়। কারবোনেট

সলিউসন কাল দাগ নষ্ট করে কিন্তু সোহাগা পচন নিবারণ করে। সলিউসন মাখানো হবার পর ফলকে জলে ধুয়ে নিতে হয়।

সকলেই জানেন ফলের রং ভাল থাকলে তাকে তাজা দেখায় এবং সেই রকম ফলই খরিদ্দারে বেশী পছন্দ করে। আমাদের দেশের সাধারণ ব্যবসায়ীরা ফলকে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে সাজিয়ে রাখে, এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়। ফলের স্বাভাবিক রঙের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করবার জন্যে এবং কৃত্রিম সজীবতা প্রদান করবার জন্যে ঘোড়ার বালামচির তৈরী ব্রুশ এ ঘসলে এবং মধ্যে মধ্যে সামান্য রঞ্জন বা তৈল মিশ্রিত প্যারাফিন ওয়াক্স্ লাগালে ফলকে ঠিক একেবারে টাট্‌কা দেখায়।

বাংলাদেশে অনেকেই ফলের ব্যবসা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন যদিও এখানে ফল রপ্তানী কারকের সংখ্যা কম। তাঁরা যদি ফলের পচন নিবারণ কল্পে উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহ'লে তাঁরা লাভবান হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, পূর্ব্বেই বলেছি যে, ফলের দাম বেশী হওয়ার দরুণ সাধারণ লোকের দিক দিয়ে ফলের চাহিদা অল্প, অপরাপর কারণের সঙ্গে ফলের পচন জনিত লোকসানের হিসেবটা দামের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও একটা কারণ। সুতরাং ব্যবসায়ীরা অনাবশ্যক পচন নিবারণ করতে যদি সমর্থ হ'ন তাহ'লে ফলের দর সস্তা হওয়ার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকে—সাধারণ ক্রেতার পক্ষে সেটা একটা মস্ত সুবিধা।

এই গ্রীষ্ম-বর্ষা কালটা বাংলাদেশের পক্ষে ফল সম্পদের উপযুক্ত সময়। আম আর আনারস এখন বাজার রেখেছে, লিচুর আমদানী এখন শেষ হয়েছে। হাজার হাজার টুক্‌রী আম প্রত্যহ আমদানী হচ্ছে—নিমেষের মধ্যে তা' যাচ্ছে উড়ে। এতই চাহিদা এই জিনিষটার। ভারতের নানাস্থানে আম জন্মায়ও প্রচুর—ফল শস্যের দিক দিয়ে এ আমাদের একটা প্রধান জাতীয় সম্পদ্। কিন্তু এই ফল শস্যের সমারোহের অন্তরালে যে অপচয়ের ব্যাপারটা লুকিয়ে থাকে তার ইতিহাস যদি জনসাধারণের সামনে উদ্ঘাটিত করা হয় তাহ'লে নিশ্চয় করে বলা যায় যে সকলকার মন অপচয়ের গ্লানিতে ভরে উঠবে। পৃথিবীর সম্পদ্‌হীন দেশগুলি সামান্য সম্পদ্ বৃদ্ধি ও রক্ষা করবার জন্য কী রকম প্রাণপণ চেষ্টা করে তার খবর পাঠকবর্গের অল্প বিস্তর জানা আছে—আর আমরা সম্পদশালী হয়েও প্রতিদিন যে জিনিসটা অপচয়ে নষ্ট করি সে কথা শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয়। দুর্ভাগা ভারতবর্ষ বলেই হয়ত এ-ব্যাপার সম্ভবপর হয়, নইলে পৃথিবীর অপর কোন সভ্যদেশে এরকমটি ঘটলে অপচয়ের প্রশ্রয়দাতাদের প্রতি রাষ্ট্রের কঠোরতার সীমা থাকতো না। অথচ ভারতবর্ষের কি বৈদেশিক আর কি স্বদেশী রাষ্ট্রশক্তি এ-সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঐ আমের অপচয়ের ব্যাপারটাই ধরুন। পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রতিদিন হাজার হাজার টুক্‌রী আম আমাদের বাজারে আমদানী হচ্ছে। যদি হিসাব নেওয়া যায় ত দেখা যাবে যে ঐ আমদানীকৃত আমের অর্দ্ধেকেরও উপর কোন কাজে আসে না। কলিকাতার ব্যবসায়ীরা যখন টুক্‌রী খুলে আম বাছাই করে তখনই দেখা যায় যে, প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ ফল খারাপ হয়ে গেছে—কোনটা দাগী, কোনটা পচা, কোনটা বা কাঁচা থাকার দরুণ একেবারে দরকচা মারা। আপনি যদি

ঐ বাছাই করা আমই বাড়ীতে নিয়ে একদিন রেখে দেন ত পরের দিন দেখবেন যে অনেক গুলি নষ্ট হ'য়েছে। আপনি যদি টুক্‌রী কেনেন ত সে আপনার লটারীর টিকিট কেনার সামিল। হয় জিতলেন—নয় ত হারলেন। যদি জেতেন অর্থাৎ ভাল আম পান তাহ'লেও বাড়ীতে একদিন রাখলেই সে জিনিস খারাপ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীরাও নিশ্চিন্তমনে কারবার করতে পারে না—একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তা'দের সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকতে হয়। ক্রেতারাও ১৲ টাকা খরচ করে মাত্র তার ২ আনা উসুল করতে পারে কিনা সন্দেহ। শুধু আম নয়, আনারস, লিচু প্রভৃতি যে কোন ফলের ব্যাপারেই—ঐ এক অবস্থা। অথচ ঐ সমস্ত ফল আমাদের একটা জাতীয় সম্পদ—ওদের সুপরিচালিত ব্যবসায় বহুলোক জীবিকাৰ্জ্জন করতে পারে।

এই অপচয়ের কারণ যদি অনুসন্ধান করা যায় ত দেখা যাবে যে, শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল চালান দেওয়ার অভাবেই এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। আম কি ভাবে চালান আসে তা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। দু'টি টুকরীর মধ্যে আমগুলিকে কোন-রকমে পুরে ঝুড়ি সেলাই করে তা' রেলে তুলে দেওয়া হয়। রেলের কুলীরা ঐ ঝুড়িগুলোকে ফলের টুকরী বলে গ্রাহ্যই করে না—নিতান্ত অযত্ন সহকারে সেগুলিকে গাড়ীর ভেতর আছড়ে ফেলে দেয়। অপরাপর জিনিসের যেমন পর পর সাজিয়ে রাখবার নিয়ম আছে, ফলের টুক্‌রীর বেলায় সেরকম কিছু নেই—একটি টুকরীর পর আর একটি টুকরী পর্ব্বত প্রমাণ হিসাবে গাদি দেওয়া হয়। এতে করে তলাকার ফলগুলি উপরের চাপে তখনি থেঁত্‌লে নষ্ট হয়ে যায়। গাড়ীতে বাতাস চলাচলের বন্দোবস্ত নেই, কাজেই বদ্ধ গরমে ফলগুলি ভেপসে উঠে; এবং সর্ব্বোপরি অযত্ন সহকারে নাড়াচাড়ার ফলে সমস্ত ফলগুলিই আঘাত প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় অর্দ্ধেকের বেশী মাল যে পচে যাবে তা' আর বিচিত্র কি?

কয়েক বছর পূর্ব্বে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পৃষ্ঠায় এসম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় কি করে রোধ করা যায় তার বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু দেশের গভর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকলে কোন জিনিসেরই সদ্গতি হ'তে পারে না—সুতরাং আমাদের দেশেও ঐ বিরাট সম্পদকে রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়নি। প্রারম্ভে ফলের পচন নিবারণ কল্পে আমেরিকার যে প্রোচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি তা অনুধাবন যোগ্য। যেখানে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আইন দ্বারা সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তা' ছাড়া প্যাকার্স্‌ ইউনিয়ন, ট্রেডার্স্‌ সিণ্ডিকেট প্রভৃতি সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় এতটুকু জিনিষও সেখানে অপচয় হবার জো নেই। ওদেশের আদর্শ এখন সকল সভ্য দেশেই গৃহীত হ'য়েছে। সেই জন্যই দেখেন না সিঙ্গাপুরী কলা, আনারস ও অপরাপর দেশের ফল সমূহ এক মাস দেড় মাস জাহাজে থাকবার পরও এখানে ২০।২৫ দিন পর্য্যন্ত রীতিমত টাটকা থাকে—আর আমাদের দেশের ফল সমূহ ২।৩ দিনেই একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

এই বিভিন্নতার কারণই হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক

উপায়ে মাল চালান দেওয়ার অভাব। ওদেশে ফল তৈরী হ'লে তবে গাছ থেকে পাড়বার নিয়ম কিন্তু আমাদের দেশে কাঁচা অবস্থায়ই ফলকে পেড়ে বোঝাই দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় ফলের আস্বাদ কিছুই থাকে না এবং তাড়াতাড়ি পচনে তা' রীতিমত সাহায্য করে। ওখানে ফল পাড়া হ'লে প্যাকার্স ইউনিয়নের অভিজ্ঞ লোক এসে তা' রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্যাক্ করে দেয় তাতে করে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গাড়ীতে বা জাহাজে থাকলেও ফলের এতটুকু ক্ষতি হয় না। ফলের গাড়ীতেও সেখানে কোল্ড্ ষ্টোরেজ্, হাওয়া চলাচল প্রভৃতি ব্যবস্থার বন্দোবস্ত আছে। ফল প্যাক্ করবার সময়ই তা' গুণানুসারে বাছাই হ'য়ে যায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই তাতে মাল ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা হয়। আমাদের দেশে চালানী ব্যাপারের ত্রুটীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যার ফলেই আমাদের একটি জাতীয় সম্পদ অপচয়ে নষ্ট হচ্ছে এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই লোকসান গ্রস্ত হচ্ছি। আর আমাদেরই সামনে ওদেশের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণ উভয়েই লাভবান হচ্ছে। সামান্য আঙ্গুর ফল কি রকম যত্ন সহকারে তুলোর বাক্সয় বা কর্কের গুঁড়োর বাক্সয় প্যাক্ হয়ে আমাদের বাজারে বিক্রীত হয় তা' আমরা সকলেই দেখি, তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না। আমরা সেই লোকসান খেয়েই মরি।

আমাদের মনে হয় একটু চেষ্টা করলেই আমরা এই বিরাট জাতীয় অপচয় রোধ করতে পারি। এর জন্য ক্রেতা বিক্রেতা ও গভর্ণমেণ্ট সকলেরই সহযোগিতা আবশ্যক। যে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ে নষ্ট হচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে কাহারও এই সহযোগিতায় অস্বীকৃত হওয়া উচিত নয়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি এখনি অবলম্বিত হওয়া দরকার :—

১। গাছ থেকে ফল পাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় সম্পর্কে ও গুণানুসারে ফল বাছাই করা সম্পর্কে সরকারী আইন প্রনয়ণ।

২। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল প্যাক্ করণ সম্পর্কে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।

৩। চালানী অবস্থায় ফল রক্ষা করা সম্পর্কে রেল ও ষ্টীমারের উন্নততর ব্যবস্থার বন্দোবস্ত।

৪। সমবায় পদ্ধতিতে ফলের ক্রেতা ও বিক্রেতা সংঘ গঠনের ব্যবস্থা।

অপক্ক অবস্থায় ফল পাড়ার কি অসুবিধা তা' পূর্ব্বেই উল্লেখিত হয়েছে, সুতরাং এসম্পর্কে যদি কোন আইন থাকে তা'হলে সকলেই তৈরী অবস্থায় ফল পাড়তে বাধ্য থাকবে। প্যাকিং জিনিষটাই আসল, এসম্পর্কে যত্ন নেওয়া একান্ত দরকার। মাছ চালান দেওয়ার যেরকম বাক্স আছে সেইরকম বাক্সের মধ্যে যত্ন সহকারে এক থাক্ ফল ও এক থাক্ পাতা বা অপর বস্তু দিয়ে যদি ফল প্যাক্ করা যায় এবং সেই বাক্স যদি রেল ও ষ্টীমারের বিশেষভাবে নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ করে আনা যায় তা'হলে কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এসম্পর্কে রেল কোম্পানী ও জাহাজ কোম্পানীর যথেষ্ট অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ক্রেতা বিক্রেতা সঙ্ঘের যদি প্রবর্ত্তন করা যায় তা'হলে সমস্ত ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারটা একটা সুষ্ঠ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হওয়ার দরুণ সকলেই লাভবান হবেন সমান রূপে, অথচ এতটুকু জিনিষও অপচয়ে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

উপরে যে চারটি ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হ'ল তার প্রবর্ত্তন করা কিছুমাত্র শক্ত বা ব্যয়সাধ্য নয়, সুতরাং আমরা এধারে কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী সকল প্রকার গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—তাঁরা এধারে উদ্যোগী হয়ে একটা জাতীয় সম্পদকে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমরা বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংঘদেরও অনুরোধ করছি যে তাঁরাও গভর্ণমেণ্টের নিকট ডেপুটেশন প্রেরণ দ্বারা সরকারের উপর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য চাপ দিন। এই অপচয় যদি আমরা নিবারণ করতে পারি তাহ'লে শুধু যে একটি সম্পদ্ রক্ষিত হ'বে তা' নয়, দরের অনিশ্চয়তা দূরীভূত হওয়ায় ফলের ব্যবসা ভাল চলবে এবং বহু বেকার এই ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করবার সুযোগ লাভ করবে। সেটা দেশের পক্ষে কম লাভের কথা নয়।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আই-কম ও বি-কম্ পরীক্ষায় বীমা বিষয়কে পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মিঃ পি আর গুপ্ত এম্ এ, এফ্ সি আই আই (লণ্ডন) বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে বীমা বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ গুপ্ত বর্ত্তমানে ক্যালকাটা ইন্সুর‍্যান্সের য়্যাসিষ্টাণ্ট্ কণ্ট্রোলারের কার্য্য করিতেছেন।

—※—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে ৩ কোটী ৬ লক্ষ টাকার অধিক নূতন বীমার কারবার করিয়াছেন। আমরা এই সফলতার জন্য হিন্দুস্থানের সেক্রেটারী মিঃ এন্ দত্ত এবং উহার ব্রাঞ্চ্ ম্যানেজারগণকে অভিনন্দিত করিতেছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহারা হিন্দুস্থানকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং ক্রমাগত দিনের পর দিন হিন্দুস্থানের বীমাকারীদিগকে পলিসি সব সারেণ্ডার করিয়া দিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিল তাহাদিগের আশায় ছাই পড়িয়াছে। বৎসরের পর বৎসর হিন্দুস্থানের কাজ এত দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে যে তাহা দেখিয়া অতি বড় শত্রুর মনেও তাক্ লাগিয়া যাইতেছে। আজ সমগ্র ভারতের মধ্যে

হিন্দুস্থানের জেনারেল সেক্রেটারী—

মিঃ এন্, এন্, দত্ত

ওরিয়েণ্ট্যালের নীচে হিন্দুস্থানের কাজই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইতেছে। নলিনীবাবুর অবর্ত্তমানেও হিন্দুস্থানের এই যে ক্রমোন্নতি এবং অপ্রতিহত উর্দ্ধগতি অব্যাহত রহিয়াছে। ইহার জন্য আমরা হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এন দত্তকে এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে আমাদিগের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। হিন্দুস্থানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে নলিনীবাবুর সাফল্য এবং ওস্তাদিই এইখানে। ভাল জেনারেল তাকেই বলা যায় যিনি তাঁহার অধীনে ভাল ভাল লেপ্টেন্যাণ্ট বাছিয়া নিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে পারেন যাহারা তাঁহার অবর্ত্তমানে বা অনুপস্থিতে সৈন্যদিগকে এমন ভাবে পরিচালিত করিতে পারে যে armyর সুনাম ও যশ অব্যাহত থাকে। হিন্দুস্থানের প্রধান সারথিরূপে আজ তাহার এই সাফল্যের জয়মাল্য নরেন্দ্রবাবুরই প্রাপ্য এবং ইহাই নলিনীবাবুর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ও পুরস্কার।

বাটা-সু-কোম্পানী তাঁহাদের বিরাট কারখানার কর্ম্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য-বীমার পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন। গত ১৮ই জুন সেই সম্পর্কে বাটানগরে একটী হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য-বীমা সম্পর্কে আর কোন হাঁসপাতাল নাই,—বাটা কোম্পানীই ইহার পথপ্রদর্শক।

ভারত ইন্সুর‍্যান্সের চেয়ারম্যান মিঃ শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বিহার চেম্বার অব্ কমার্সের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, লক্ষ্মী-ইন্সুর‍্যান্সের ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌স্ মেসার্স কে সান্তানম্ এণ্ড কোং পদত্যাগ করিয়াছেন। ডিরেক্টার বোর্ড্ মিঃ কে সান্তানম্‌কে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন।

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইলের ডিরেক্টার মিঃ বংশীধর শ্রফ্ পরলোকে গমন করিয়াছেন। সেইজন্য গত ১৭ই জুন কোম্পানীর হেড্ আফিস এবং সমস্ত ব্রাঞ্চ্ আফিস বন্ধ ছিল। মিঃ শ্রফ্ কোম্পানীর সৃষ্টি হইতেই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কোম্পানীর গঠনে ও উন্নতি সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের য়্যাক্‌চুয়ারী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ জে এইচ্ টমাস্ ভারতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব ইনসুর‍্যান্সের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগ পাঁচ বৎসরের জন্য।

১৯৩৮ সালের ৪টা মে হইতে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজারগণ মেসার্স আলম বরুচা এণ্ড কোং পদত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন হইতে মিঃ ই, ই আলম্ ম্যানেজার, মিঃ এ, ই আলম্ য়্যাসিষ্টাণ্ট্ ম্যানেজার এবং মিঃ এম্ আর বরুচা সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সুর‍্যান্সের ম্যানেজিং এজেন্সি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডিরেক্টর বোর্ড্ স্বহস্তে কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস্ এম্ ভট্টাচার্য্য এক্ষণে কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং মিঃ ইউ এন্ পাল কোম্পানীর ম্যানেজার হইয়াছেন।

কয়লার খনি অঞ্চলে যে সকল বীমাকর্ম্মী কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা গত ১৭ই মে আসানসোলে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের অর্গ্যানিজেসান আফিসে মিলিত হইয়া একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার নাম

হইয়াছে "কোল্ ফিল্ডস্ ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্ষ্টিটিউট।" রীতিমত কমিটি গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগ্যলক্ষীর মিঃ টি, পি, বসু উহার অস্থায়ী অনারারী সেক্রেটারী ও ট্রেজারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—⁂—

"ফেডারেশান অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড্ ইন্ডাষ্ট্রী"র কমিটী ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট এক নিবেদন জানাইয়াছেন যে, ইন্দো বার্ম্মা বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের নিকট তথায় কার্য্যকরী ভারতীয় বীমা কোম্পানীর টাকা ডিপজিট্ রাখা বিষয়ে কোন মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম করা হউক, যে ব্রহ্মদেশে কার্য্যকরী ভারতীয় বীমা কোম্পানীকে যেমন ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন ডিপজিট্ দিতে হইবে না, ভারতে কার্য্যকরী ব্রহ্মদেশীয় বীমা কোম্পানীকে তেমনি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন ডিপজিট্ দিতে হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ৩২টী ভারতীয় কোম্পানী ব্রহ্মদেশে কার্য্য করিতেছেন। তন্মধ্যে ১৬টী কোম্পানী ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা ডিপজিট্ দিয়াছেন। যদি উভয়তঃ এইরূপ একটা বন্দোবস্ত না হয়, তবে অবশিষ্ট ১৬টী কোম্পানী তথায় কারবার গুটাইতে বাধ্য হইবেন।

—⁂—

ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল ইন্সুর্যান্স কোম্পানী এবং নয়া দিল্লীর ষ্টার্লিং ইন্সুর্যান্স কোম্পানী স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইয়াছেন। গত ২৯শে এপ্রিল আদালত হইতে উভয় কোম্পানীর এই সংযোগ মঞ্জুর হইয়াছে।

—⁂—

আমরা অবগত হইলাম ন্যাশনাল কল্যাণ ও ফেডারেল ইণ্ডিয়া মিলিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

—⁂—

গত ৬ই মে নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা) ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর একটী সাব-আফিস খোলা হইয়াছে। কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিসের অধীনে এই সাব-অফিস কার্য্য করিবে।

—⁂—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের বোম্বাই ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ এস্ সি মজুমদার গত ৩রা মে উইলিংডন স্পোর্টস্ ক্লাব গৃহে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুকে এক চা পার্টিতে অভ্যর্থনা করেন।

—⁂—

"এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার এবং "প্রুডেন-শ্যালের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ সুনীলদত্ত নিউ ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর এজেন্সী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

—⁂—

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার বেঙ্গল চীফ এজেন্সীর মিঃ রামকৃষ্ণ সরকার উক্ত কোম্পানীর কার্য্য ছাড়িয়া সম্প্রতি "নিউ এশিয়াটিকের" কলিকাতা ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—⁂—

ওরিয়েণ্ট্যালের জলপাইগুড়ী ব্রাঞ্চের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ পি সরকার এক্ষণে হিন্দুস্থানের উত্তর বাংলার প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন।

—⁂—

১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে মেট্রোপলিটানের নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে ৭৫২৩৬২৫ টাকা। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে যে কয়েকটী নূতন বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মেট্রোপলিট্যানের উন্নতি ও অগ্রগতি বহু পুরাতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীমা কোম্পানীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই কোম্পানীর কর্ণধাররূপে যে দুই জন ব্যবসায়ী ইহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন তাঁহাদের ক্রেডিট ও সুনাম বাজারে অপ্রতিহত। সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং সতীশ চৌধুরী যে প্রতিষ্ঠানেই কাঁধ দিয়াছেন তাহাকেই ঠেলিয়া শীর্ষস্থানে তুলিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে পপুলার ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর ৭৩২৬৮১ টাকার নূতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন।

চ্যাম্পিয়ান জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৭ সালে ২৭৩৫০০ টাকার নূতন বীমার কাজ হইয়াছে।
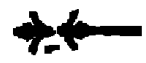
কার্য্যের প্রসার হওয়ায় গত ৩০শে মে হইতে হইতে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা চীফ্ এজেন্সী আফিস ২১নং ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটে (গ্রস্‌ভেনর হাউস্) স্থানান্তরিত হইয়াছে।

ঐ কারণে প্রিমিয়ার ইন্সুর্যান্স এণ্ড্ বিল্ডিং সোসাইটীর কলিকাতাস্থ ব্রাঞ্চ আফিস ৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের প্রশস্ত ও বৃহত্তর গৃহে উঠিয়া গিয়াছে।

মিঃ এইচ্ দত্ত ডমিনিয়ান ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ১লা জুন হইতে এই কোম্পানীর আফিস ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গত ৩০শে মে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল্ চেম্বার গৃহে ইণ্ডিয়ান ইন্সুর্যান্স ইন্‌ষ্টিটিউটের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ, সি, সেন বিশেষ কোন কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট মিঃ আই, বি, সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জেনারেল সেক্রেটারী রিপোর্ট এবং হিসাব উপস্থিত করেন এবং তাহা সভ্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

গত ৮ই জুন ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যকরী সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য যাঁহারা ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল। সভাপতি—মিঃ আই বি সেন। সহ সভাপতি—মিঃ কে এম নায়ক, মিঃ এস সি রায়, মিঃ এ টি পাল, মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার এবং মিঃ কে সি ব্যানার্জ্জী। জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এন প্রামাণিক। জয়েণ্ট সেক্রেটারী—মিঃ এইচ সি নাগ এবং মিঃ এন্ সি ঘোষ। কোষাধ্যক্ষ মিঃ এস বাগ্‌চি।

লক্ষ্মী ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ কাশ্মীরিলাল তঙ্কলী এম্-এ, উক্ত কোম্পানীর লাহোর হেড্ আফিসে বদলী হইয়াছেন। কোম্পানীর দিল্লী আফিস হইতে মিঃ লোকনাথ ধাবন কলিকাতা ব্রাঞ্চে আসিয়া মিঃ কাশ্মীরিলালের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ এম্, জি, চিৎনবীশ এম্ এল্-এ, পদত্যাগ করায়, তৎস্থলে মিঃ গোস্বামী এম্, আর, পুরী নাগপুর পাইওনীয়ারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ সুনীল চন্দ্র বসু বীকন্ ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের জন্য চীফ্ অর্গ্যানাইজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

"ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল্" পুনরায় নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছে। ঢাকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস এবং ভাগ্যকুলের রাজা জানকী নাথ রায়ের সুযোগ্য পুত্র কুমার রণেন্দ্র নাথ রায় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি পরিচালকরূপে এই কোম্পানীতে যোগ দিয়াছেন। ভাগ্যকুলের জমিদার শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় কোম্পানীর বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়াছেন। আমরা আশা করি বিপন্মুক্ত ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল্ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে

আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় ডিপজিটের টাকা দাখিল করিবার জন্য "ইউনাইটেড্ এ্যাস্যুর‍্যান্সের" ডিরেক্টার ও ম্যানেজারের উপর গভর্ণমেণ্ট নোটীশ জারী করিয়াছেন। এই কোম্পানীর উপর ১৯৩৬ সালে আর একবার নোটীশ জারী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উপেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ কোর্টে নালিশ উপস্থিত হইলে ইঁহারা কোম্পানীর পরিচালনা ভার ময়মনসিংহের বিখ্যাত উকীল রায় বাহাদুর শশধর ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত পবিত্র কুমার ঘোষ প্রমুখ কয়েক জনের হাতে transfer করিয়া দেন। সেই হইতে গত কয়েক বৎসর ইঁহারা কোম্পানীর কাজ পরিচালন করিয়া আসিতে-ছিলেন। সম্প্রতি আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে এই কোম্পানী বেঙ্গল মার্ক্যাণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইতেছে।

কলিকাতার কোন ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীকে একখানি ৫ হাজার টাকার পলিসি সম্পর্কে প্রতারিত করার অপরাধে লাহোরের তফিক হোসেন নামক একজন এজেণ্ট অভিযুক্ত হয়। লাহোর সেসন জজের বিচারে তাহার ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল অধ্যাপক জে, আর, ব্যানার্জ্জি এম, এ, বি-এল্, সম্প্রতি উক্ত কোম্পানী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানী দুই বৎসরেরও কম সময় পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বীমা ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কোম্পানীর দ্রুত উন্নতি দর্শনে আমি উহার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণাই পোষণ করিতেছি। বর্ত্তমানে যে হারে এই কোম্পানীর কার্য্য সম্প্রসারিত হইতেছে তাহা ঐ প্রকারে একটি শিশু প্রতিষ্ঠানের কাছে কমই আশা করা যাইতে পারে। 'প্যালেডিয়ামের কর্ম্মীরা যে উদ্যোগ উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা নিয়া কোম্পানীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়। একদল প্রতিভাবান কর্ম্মী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রথম হইতে কোম্পানীটিকে যথাসম্ভব সত্বর একটী শ্রেষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। প্যালেডিয়ামের সহিত যুক্ত এই সব ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী। কোম্পানীর সত্যিকার উন্নতি সাধনের আগ্রহ লইয়াই যে তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৪৫ | ৫ম সংখ্যা

কৃষির বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহা দূরীকরণের উপায়

ভারতবর্ষে কৃষকের সংখ্যা তার মোট অধীবাসীব শতকরা ৭১ জন। এই ৭১ জন হচ্ছে খাঁটি কৃষক, এব মধ্যে ভূমিহীন কৃষি মজুরকে ধবা হয়নি। সেটা ধরা হ'লে শতকবা ৮৫ ব কাছে সংখ্যাটা দাঁড়ায়। এই মোট সংখ্যা কৃষি অধিবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য-জীবনধারণেব উপরই দেশের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর কবে। এবং সেইজন্যই দেশের কি কংগ্রেস, কি গভর্ণমেণ্ট সকলেই বিভিন্ন সময়ে, তাদেব অবস্থার উন্নতির জন্য আগ্রহ দেখান। কিন্তু আমবা দেখতে পাচ্ছি যে, ফলে বিশেষ কিছুই এগোয়নি, বরং কালক্ষেপনের পক্ষতাড়নার জন্য কিষাণরা দৈনন্দিন দুঃখদাহে অধিকতর জর্জ্জরিত হয়েছে। আজ তারা এমন একটা যায়গায় এসে পড়েছে যেটাকে বলা চলে যে, এটা সহ্যের শেষ সীমা। এই শেষ সীমাও যদি অতিক্রমিত হ'তে দেওয়া যায় তাহলে দেশে হয় কৃষক-বিপ্লব সংঘটিত হ'বে নয়ত কৃষক শ্রেণী ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এধাবে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সচেতন হওয়া দবকাব।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস মধ্যে মধ্যে এই কৃষক-সমস্যা সমাধান করবার জন্য চেষ্টা কবেছিলেন কিন্তু সে-চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হয়নি। তার কারণ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা ছিল জোড়াতালির চেষ্টা এবং সাম্রাজ্য-বাদী গভর্ণমেণ্টের নিকট এর চেয়েও আর কি আশা করা যায়? কংগ্রেসের তরফ হ'তে যে চেষ্টা হয়েছিল সেটা রাজনৈতিক, সুতরাং তাতে কৃষকদের শ্রেণীগত অর্থনৈতিক দাবীর কোন কথা থাকত না। কিন্তু বর্ত্তমানে কয়েক বছর

কৃষকদের শ্রেণী প্রতিষ্ঠান কিষান সমিতির চাপে কংগ্রেস কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবী নিয়ে সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়েছে।

আমরা যদি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার কথা ছেড়েই দি' তা'হলেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্ত্তমানে দেশের আর্থিক দুরবস্থার প্রধান কারণ হ'ল ঐ কিষাণ সমস্যা। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতাহীনতার জন্যই দেশের শিল্পবাণিজ্যের অচল অবস্থা, পণ্য দ্রব্যের দর নিম্নগামী এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বেকারের পরিবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ঐ যে শতকরা ৭১ জনের কথা উল্লেখ করেছি, তাদের হাতে যদি উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা থাকত তাহ'লে বাজারে পণ্যদ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা বর্ত্তমান থাকার দরুণ শিল্পবাণিজ্যের অচল অবস্থাও ঘটত না এবং দেশের আর্থিক দুরবস্থাও সাধিত হ'ত না।

তাহ'লেই প্রশ্ন ওঠে যে, এই ক্রয়ক্ষমতা কিসে বৃদ্ধি পেতে পারে? কৃষকদের আয়ের পথ যদি সুগম করা যায় তাহ'লেই তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়। কৃষকদের আয় দু'রকমে বৃদ্ধি করা যায়:—(১) কৃষিজাত ফসলের মূল্য বর্ত্তমান অপেক্ষা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করণ, (২) বর্ত্তমান জমিতেই অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন। একটা নির্দ্দিষ্ট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হবে। ধরুন, কোন কৃষকের ১০ বিঘা জমি আছে। এই দশ বিঘা জমিতে হয়ত তার বিঘা পিছু ৮ মণ হিসাবে ৮০ মন ধান উৎপন্ন হয়। পাঁচসিকা মণ দর ধরলে ৮০ মণে সে পায় ১০০৲ টাকা। যদি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় যাতে করে ঐ ধানের দর পাঁচসিকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দু'টাকায় দাঁড়াবে তা'হলে উক্ত কৃষক ঐ ৮০ মণ ধান থেকেই পাবে ১৬০৲ টাকা। পূর্ব্বে সে পাচ্ছিল ১০০৲ টাকা, তাহ'লে তার আয় এবার ৬০৲ টাকা বাড়ল অর্থাৎ তার হাতে ৬০৲ টাকার অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা সঞ্চিত হ'ল।

কিংবা উপরোক্ত ২য় দফার কথাই ধরুন। কৃষকের ১০ বিঘা জমিতে ৮০ মণ ধান হচ্ছিল। যদি বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় অর্থাৎ ভাল সার, উৎকৃষ্ট বীজ, উন্নত সেচ-প্রণালী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে চাষের উন্নতি সাধন করা যায় তাহ'লে ঐ বিঘা পিছু জমিতে ৮ মণের স্থলে ১২ মণ ধান পাওয়া অসম্ভব নয়। ঐ কৃষক সেক্ষেত্রে মোট ১২০ মণ ধান পায় এবং মণ পিছু যদি পাঁচসিকা করেও দর ধরা যায় তাহ'লে ১৫০৲টাকা তার প্রাপ্য হয়। এক্ষেত্রেও তার ৫০৲ টাকা আয় বাড়ল অর্থাৎ তার হাতে ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা সঞ্চিত হ'ল। কিংবা যদি উপরোক্ত ১ম ও ২য় দফার দু'টি উপায়ই একসঙ্গে অবলম্বিত হয় অর্থাৎ কৃষির উন্নতিসাধনের দ্বারা ফসলবৃদ্ধি ও কৃষিপণ্যের দর বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে পূর্ব্বোক্ত কৃষকের ১২০ মণ ধানে ২৪০৲ টাকা লাভ হয় এবং তাহ'লে তার ১৪০৲ টাকার অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা হাতে আসে।

উপরোক্ত ব্যাপার থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হবে যে, কৃষকরা যদি উক্তরূপ বর্দ্ধিত ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহ'লে শুধু তারাই উপকৃত হবে না পরন্তু তার প্রতিক্রিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের ওপর ছড়িয়ে পড়ে সেটার অচল অবস্থা সচল করে তুলবে। কেমন ক'রে তাই দেখুন। এটা সর্ব্ববাদীসম্মত ব্যাপার যে, আমার হাতে যখন টাকা থাকে তখনি আমি

খরচ করি—খরচার কিছু না থাকলেও বিলাসিতার দ্রব্য কিনি। কৃষক সমাজের ঘরে ঘরে আজ হাহাকারের অন্ত নেই এবং তার কারণ শুধু তাদের দৈন্যদশা। কিন্তু যদি তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করানো যায় তাহ'লে তারা যে পেটে একটু ভাল খাবে তা' নয়; ভাল পরবেও। যেখানে আজ গামছা পরে কিংবা পাঁচ হাতি ধুতি পরে দিন কাটায় তার বদলে তারা অন্ততঃ আটপৌরে আট হাতি ধুতি ও পোষাকী দুখানি দশ হাতি ধুতি ব্যবহার করবে। ফুলতোলা গেঞ্জী, ফতুয়া কিংবা গঞ্জ থেকে ছিটকাপড়ের জামা কিনবে, পায়ে সস্তার পাম্পস্ নয়ত সিল্কের পক্ষে একজোড়া চটিও রাখবে। সখ করে খোসবাই-ওয়ালা তেল ও গন্ধ, সস্তার সাবান এবং আরও এটা-ওটা-সেটা নিজের জন্য ক্রয় করবে। পরিবারের জন্য আনবে একখানি রঙীন ডুরে সাড়ী, ছিটের সেমিজ, 'পতি পরম গুরু' মার্কা সিঁদুর কৌটা, টিস্যু পেপার মোড়া ঝকঝকে

তরল আলতা ; গিল্‌টির গয়না দু-একখানা এবং তার পয়সা কৌটার বাজে স্নো এক শিশি। ছেলেপুলের জন্ম সংগ্রহ করবে টিলাঢাল। পেনি-ক্রক, খেলনা ও লজেঞ্জুস্‌-বিস্কুট। এই রকম কত কি। এর ফলে হবে এই যে, তাদের ঐ সমস্ত মাল ক্রয় করার দরুণ দেশের ঐ সমস্ত ছোটবড় শিল্প ভাল ভাবে চলবে এবং তজ্জন্মই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও হস্তে পক্ষান্তরে ক্রয়-ক্ষমতা সঞ্চিত হবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীব হস্তে ক্রয় ক্ষমতা সঞ্চিত হবাব কাবণই হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত মাল কৃষকদের নিকট বিক্রীত হ'বে সেই সমস্ত শিল্প বাণিজ্য ভালভাবে চালু হওয়ার দরুণ নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী লাভবান হয়। নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীব সকলেই ঐ সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যজীবী, কেউ ব্যবসাদাব, কেউ কেরাণী, কেউ ক্যান্‌ভাসার, কেউ বা দালাল। উক্ত শিল্পবাণিজ্য ভাল চলার দরুণ তারা রীতিমত পারিশ্রমিক পাওয়ায় তাদের হাতে ক্রয়ক্ষমতা জমে ওঠে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে ক্রয়ক্ষমতা জমার ফল অন্য রকম ভাবে ফলে। তাদেব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা অপেক্ষাকৃত উঁচুদরের, সুতরাং এমন সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করে যেগুলি সভ্যতার একান্ত পরিপোষক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, সাবান, এসেন্স, ফাউণ্টেন পেন, আসবাব, রেডিও, গ্রামোফোন, মোটরগাড়ী, পুস্তক, ছবি প্রভৃতি। অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ার দরুণ তারা গৃহশিক্ষক, দাসী পরিজন ইত্যাদিও রাখে। যে দ্রব্যগুলির নাম করা গেল সেই সমস্ত দ্রব্যের বৃহৎ শিল্পগুলি রীতিমত চালু হয়—লক্ষ লক্ষ লোকে তাতে কাজ পায় এবং তারাই কৃষি-পণ্যর মূল্য ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

উপরোক্ত বিষয় থেকে এটা প্রমাণিত হবে যে, দেশবাসী সকলের স্বার্থই এক চক্রাকারে গ্রথিত। সুতবাং সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর যদি আমরা যোগ্য উপজীবিকার ব্যবস্থা করতে পারি তাহ'লে বাদবাকী শ্রেণীর জীবনযাত্রা আপনা থেকেই স্বচ্ছল হয়ে যায়। আমাদের দেশেব সংখ্যাগবিষ্ঠ শ্রেণী হ'ল কৃষক, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে মোট জনসংখ্যাব শতকবা ৭১ জন। আজ এই ৭১ জন এর দুর্দ্দশার কাহিনীব পুনরুল্লেখ কবা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, কেননা, প্রতিদিন সংবাদপত্রেব পৃষ্ঠায় তা' প্রকাশিত হয়। অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, কুসংস্কাব, ঋণভাব প্রভৃতি ব্যাপাব তাদেব দাবিদ্র্যকে অধিকতব দুঃসহ ও ভয়াবহ করে তুলেছে। এব প্রতিকাব বিধান না কবলে শুধু যে কৃষকসমাজের অমঙ্গল তা' নয় পবন্তু দেশের সকল শ্রেণীবই অমঙ্গল। সেইজন্যই এধাবে সমাজসেবী মাত্রেবই অবহিত হওয়া প্রযোজন।

আমাদের বর্ত্তমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার যদি কেউ খুঁটিনাটি বিষয়ের খবর নেন্‌ তাহ'লে বুঝতে পারবেন যে তার মত ত্রুটিপূর্ণ ব্যাপার বোধ হয় আর কিছু নেই। প্রতি বছর চাষীবা যে ফসল বোনে, ফসল বিক্রী করার পর দেখা যায় যে, তাতে তার লাভ হওয়া ত দূরের কথা খরচাই ওঠেনি। এই যে লোকসান—এ লোকসান সত্ত্বেও আবার চাষীরা পর বৎসর সেই ফসলেব চাষেই লেগে যায়। আবার বৎসরান্তে হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে তারা পুনরায় ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, এতেও কারও চৈতন্যোদয় হয় না। ফলে, আমবা দেখতে পাই যে প্রতি বৎসর প্রতি কৃষক পরিবারের গড়ে ২২ টাকা করে ঋণ বাড়ে।

হিসাবে প্রকাশ বাংলাদেশের গড়পড়তা কৃষক পরিবারের বাৎসরিক আয় ১১৪ টাকা, বাৎসরিক ব্যয় ১৩৬ টাকা, সুতরাং তাদের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। হিসাবে আরও প্রকাশ যে, প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের বর্ত্তমান ঋণের পরিমাণ হ'ল গড়ে ১৮৭ টাকা। এই ঋণভার ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ব্যাঙ্কিং এনকুয়ারী কমিটির রিপোর্ট মতে ভারতে কৃষিঋনের পরিমাণ ছিল ৯ শত কোটি টাকা, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, গত দশ বছরে তা' বৃদ্ধি পেয়ে আজ ১৫ শত কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ-পরিমাণ যে ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাবে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

এই যে ক্রমবর্দ্ধমান ঋণভার গ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তার কারণই হ'ল কৃষকদের কৃষি-কার্য্যে প্রতি বৎসর লোকসান ঘটন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই লোকসানের ব্যাপারটা কৃষকরা জ্ঞাত থাকলেও তার প্রতিবিধানকল্পে তারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। প্রতি বৎসরই গোড়ায় তারা মহা উৎসাহে চাষে লেগে যায়, তারপর ফসল কেটে বিক্রী করবার সময় দেখে যে পড়তা পোষাচ্ছে না। তাতে তারা অদৃষ্টকে রীতিমত ধিক্কার দেয় এবং সঙ্কল্প করে যে, পর বৎসর আর সে ফসলের চাষ তারা করবে না। কিন্তু পুনরায় যখন আবার চাষের সময় উপস্থিত হয় তখন পূর্ব্ব সঙ্কল্পের কথা তাদের আর মনে থাকেনা, সেই ফসলেরই চাষ আবার তারা করে থাকে এবং তা' করার দরুণ পুনরায় তাদের লোকসান যায়—এই রকম ভাবেই কৃষকের দুর্দ্দশা চলে আসছে।

এই দুর্দ্দশা দূরীকরণের জন্য আমরা উপরে দু'টি পন্থার কথা উল্লেখ করেছি—

(১) কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি,

(২) বিঘাপিছু জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করণ।

প্রথমটি ব্যাপকভাবে করতে গেলে সময়ের দরকার কিন্তু আংশিকভাবে সেটা করা যায়। উক্ত ব্যবস্থা করণের অধিকার আছে একমাত্র রাষ্ট্রের, সামাজিক ভাবে এটা করা সম্ভব নয়। অপরাপর স্বাধীন দেশে সেখানকার চাষীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য সরকার থেকে কৃষিদ্রব্যের একটা নিম্নতম দর বেঁধে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বিহার প্রদেশের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টও ইক্ষুর একটা নিম্নতম দর বেঁধে দিয়ে সেখানকার কৃষকদের দুর্দ্দশার ভার অনেকটা লাঘব করেছেন। বাংলাদেশে পাটের নিম্নতম দর বেঁধে দেবার জন্য বারংবার দাবী করা সত্ত্বেও এখানকার অ-কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে কোন চেষ্টাই করেননি। অথচ কৃষিদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করলে কিংবা একটা নিম্নতম দর বেঁধে না দিলে কৃষকদের বাঁচা শক্ত।

দ্বিতীয় পন্থাটি অনুসরণ করতে গেলে আন্তর্জ্জাতিক বা অর্থনৈতিক কোন জটিলতা তাতে দেখা না দিলেও এক্ষেত্রে দস্তরমত অর্থের আবশ্যক। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইচ্ছামত উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় না, বৃদ্ধিরও একটা সীমা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত কৃষি বিষয়ে পশ্চাৎপদ দেশে যে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে তাতেই আমাদের পরম কল্যাণ। সঠিক হিসাব নিলেই দেখা যাবে যে আমাদের এদেশে বিঘাপিছু যা' উৎপাদন তা' পাশ্চাত্য উন্নতিশীল দেশগুলির

উৎপাদনের তুলনায় একেবারে অকিঞ্চিৎকর। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন জেলায় ধানের উৎপাদন বিঘাপিছু ২।৩ মণও নয়, আবার গড় উৎপাদন ৫।৬ মণেরবেশী হয় না। ইতালীতে বিঘাপিছু সর্ব্বনিম্ন ধানের উৎপাদন ১২ মণ। সুতরাং বিঘাপিছু এই উৎপাদনে বাংলার চাষার পেট ভরতে পাবে না সেটা বলাই বাহুল্য। কাজে কাজেই কোন উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারাই যদি উক্ত উৎপাদন ১২।১৪ মণে দাঁড করানো যায় তা'হলেই অনেক উপকার সাধিত হয়। কৃষির যে কি অবনত অবস্থা তা' সঠিক হিসাব অনুধাবন করলেই টের পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের রায়তদের প্রধান উৎপাদনদ্রব্য হ'ল পাট, সেই পাটের বর্ত্তমান বাজার দরের জন্য চাষীদের হাহাকারের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের প্রধান উৎপাদন দ্রব্য হ'ল ধান, সেই ধানের উৎপাদনের পরিমাণ যে বিঘাপিছু গড়ে ৫।৬ মণ সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই ধানের বর্ত্তমান বাজার দরানুযায়ী দাম হয় বড় জোর ৭।০ টাকা থেকে ৯৲ টাকা। কিন্তু এই টাকায় চাষীর খরচাই পোষায় না। বিঘাপিছু

জমিদারের খাজনা সর্ব্বসমেত ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা। বীজ ধান, লাঙ্গল ভাড়া, জোগাড়ের খরচ, জমিতে মই টানা, ধান কাটা, ঝাড়াই প্রভৃতি ব্যাপারের জন্য প্রায় ৬৲ টাকা খরচ পড়ে। তারপর নিজেদের খাই খোরাকী এবং শ্রমের মূল্য আছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতই দেখা যাচ্ছে যে, চাষীর খরচা পোষায় না। তার ওপর যে সমস্ত কৃষক ভাগে জমি চষে (এবং এদের সংখ্যাই বেশী) তাদের অবস্থা ত আরও শোচনীয়। বিঘাপিছু ৬ মণের মধ্যে তার প্রাপ্য ৩ মণ—এই ৩ মণের দাম হ'ল বড় জোর ৪৷৷০—৫৲ টাকা। এটাকা ত তার খরচায় বেরিয়ে যায়। জমির মালিক যে জমি ভাগে দেয়, সেও পায় ঐ ৪৷৷০ টাকা, কিন্তু জমির খাজনা দিতে তার বেরিয়ে যায় ৩৲ টাকা। ১৲।১৷৷০ টাকা বিঘাপিছু যা লাভ থাকে তাতে সংসার চলে না, কেননা এক এক জনের ত আর দেড়শো বিঘা করে জমি নেই, আছে হয়ত গড়পড়তা ৩।৪ বিঘা ধানের জমি।

উপরোক্ত হিসাব দেখলে চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কোথায় তা ধরা যাবে কিন্তু পরিশ্রমভোগী সম্প্রদায় বলবেন যে ঐ হিসাব ঠিক নয়—ওতে ত্রুটি আছে। ত্রুটি একটু আছে স্বীকার করি কিন্তু সে ত্রুটিটুকু বাদ দিলেও চাষীদের জীবনধারণের উপযোগী দাম তারা পায় না। হিসাবে চাষের খরচ বাবদ যে ৬৲ টাকা ধরা হয়েছে তার থেকে মজুরী বাবদ কয়েক টাকা বাদ যাবে কেননা, চাষী নিজেই গতরে খাটে। ৬৲ টাকার মধ্যে মজুরী বাবদ ৩৲ টাকাও যদি বাদ দেওয়া যায় তা'হলেও খাজনা ও অপরাপর চাষের খরচা নিয়ে বিঘা-পিছু [illegible] টাকা খরচ পড়ে। তার লাভ থাকে মাত্র ২।৩ টাকা। খড়ের হিসাবটা ধরা হয়নি এইজন্য যে তার অধিকাংশই গরু-বলদের খাদ্যে ও ঘর ছাউনিতে ব্যয়িত হয়। প্রকৃত চাষীর গড়ে জমির পরিমাণ হ'ল ৩।৪ বিঘা। সুতরাং তার বাৎসরিক আয় হ'ল ১০।১২ টাকা। এতে কি করে সংসার চলে?

হিসাবটা টাকার দিক দিয়ে না করে ব্যবহারিক দিক দিয়ে করা যাক্। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, আমাদের চাষীরা ফসল বিক্রয়ের আর অবসর পায় না সেটা পেটে খেয়ে ফেলে। একজন চাষীর ধরুন ৫ বিঘা জমি—এই জমির উৎপন্ন ধানের পরিমাণ হ'ল (গড়ে ৬ মণ হিসাবে) ৩০ মণ। কৃষক পরিবারে যদি অন্ততঃ ৫টি লোকও ধরা যায় তাহ'লে দিনে খোরাকী বাবদ দু' বেলায় ⁄২৷৷০ সের চাল লাগে। বৎসরে তা'হলে কৃষক পরিবারে ২২ মণেরও ওপর চাল খরচ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ৩০ মণ ধান থেকে ২২ মণ চাল পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া শুধু ত লোকে ভাত খেয়েই জীবন ধারণ করে না—তেল নুন আছে, জামাকাপড়ের খরচ আছে, বিঘা পিছু চাষের খরচ ও জমিদারের সেই ৩৲ টাকা খাজনা আছে। এই ভাবেই দেখা যায় যে, খোরাকীর জন্য ও অপরাপর খরচের জন্য চাষীকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হ'তে হয়, নয়ত অনাহারে শুকিয়ে থাকতে হয়।

এই হ'ল আমাদের কৃষিকর্ম্মের আসল অবস্থা। উপরে যে হিসাবের উল্লেখ করেছি তার এতটুকুও মিথ্যা বা কাল্পনিক নয়। এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হ'বে যে, ভূমিহীন বা ভূমিশূন্য চাষী অথবা পল্লীগ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় [illegible] আমাদের কৃষিব্যবস্থার [illegible]

নয়, বরং সবাই বছর বছর অধিকতর ঋণগ্রস্ত হচ্ছে। ক্রয়ক্ষমতা থাকাত দূরের কথা, পেটের খোরাকী জুটবারই তাদের ব্যবস্থা নেই। তার মানেই হ'ল দেশের শতকরা ৮৫ জন খদ্দেরের শিল্প দ্রব্যের চাহিদা শূন্য। তারই দরুণ এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রায় অচল অবস্থা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশীর ভাগ লোক বেকার। সুতরাং দেশের এ অবস্থাকে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে কংগ্রেস ও কৃষক সমিতি বলেন যে, দেশের গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্ত্তন করলে তবে উক্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব। রাজনৈতিক দিক দিয়ে কোন জিনিসের বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়েই আমরা উক্ত অবস্থার বিচার করব। আমাদের পূর্ব্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা সকলেরই পরিষ্কার হ'বে যে, দেশের কৃষি-সমস্যার জন্যই আমরা সকল শ্রেণীর লোকই আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এবং উক্ত কৃষিসমস্যার যদি সন্তোষজনক সমাধান করা যায় তাহ'লে আর্থিক দিক দিয়েই আমরা সকল শ্রেণীই লাভবান হ'ব। আমরা দেখেছি যে, উক্ত কৃষি সমস্যার মূল কারণ হ'ল উৎপাদন স্বল্পতা ও ব্যয়বৃদ্ধি। একথাটা অস্বীকার করবার জো নেই যে কৃষকদের আয়ের তুলনায় খাজনার হারটা অত্যধিক চড়া

এবং কৃষি-ব্যয়ের মধ্যে খাজনার পরিমাণটা একটা মোটা অংশ—মোট খরচের প্রায় অর্দ্ধেক। সেইজন্য কিছুদিন হ'তে কিষাণদের দাবী হচ্ছে যে খাজনার হার কমাতে হবে। কিষাণ সমিতিগুলি চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে তাই ঘোষণা করেন যে, জমিদারী প্রথাটাই কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ হয়ে রয়েছে—সুতরাং ওটার বিলোপসাধন দরকার। বাংলার বর্ত্তমান জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন আসরে নামবার সময় প্রজাদিগের নিকট ঐ কথাটাই বলেছিলেন। চরম মতবাদকে দূরে রেখে পক্ষপাতশূন্য হয়ে আর্থিক দিক দিয়ে একথা বলা চলে যে, জমিদারের খাজনার দাবীটা কৃষকদের বর্ত্তমান অবস্থাটায় জুলুম হয়েই দাঁড়িয়েছে। বাংলার জমিদারগণ সরকারকে যে ভূমির জন্য বছরে ৩॥ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়ে থাকেন প্রজাদের নিকট হতে সেই ভূমির জন্যই আদায় করেন ১৭ কোটি টাকা। আর্থিক দিক দিয়ে কৃষকেরা এই যে ১৩॥ কোটি টাকা জমিদারদের দেয় তার বিনিময়ে তারা জমিদার-দের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পায় না। আমরাও এ বিষয়ে কোনও পক্ষাপক্ষ নিয়ে কথা বলব না। আমরা দেখ্‌ছি যে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের দরুণ এবং আরও নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনার ফলে কৃষকদের খাজনার হার অনুপাতে অত্যন্ত বেশী পড়ছে। অথচ জমিদারেরা যে ১৩½ কোটি টাকা পাচ্ছেন, তার এক পাইও নিচ্ছেন না। কৃষকদের জমির উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষী এবং সারের প্রচলনের জন্য জলহীন অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থার জন্য জমিদার-দিগের প্রাপ্য ১৩½ কোটী টাকা হ'তে অন্ততঃ সিকি পরিমাণ টাকাও প্রতি বৎসর প্রজাদিগের কল্যাণ কল্পে ব্যয়িত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। জগতে কোনও ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। যে অবস্থায় অজ্ঞ, নিরক্ষর কৃষককুল জমির খাজনা বিঘাপ্রতি ৩৲ টাকা ৪৲ টাকা বলে মেনে নিয়েছিল সে ব্যবস্থা যখন আর নেই এবং বাংলার কৃষক একেবারে মরতে বসেছে তখন ভূমির রাজস্ব এবং জমির খাজনার মধ্যে—গভর্ণমেণ্ট, জমিদার, মধ্যসত্বজীবি ও প্রকৃতি চাষীর দেনা পাওনার একটা ন্যায়মূলক সামঞ্জস্য বিধান (equitable re-adjustment) হওয়া আশু এবং একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ বাংলার নানাস্থানে যেরূপ অশান্তি ও হাহাকারের পুঞ্জীভূত ধুম বাংলার আকাশকে কালো করে তুলেছে উহাই একদিন দাবানলের সৃষ্টি করে বাংলার কৃষি ও সমাজকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলবে।

এই টাকাটা যদি তারা বাঁচাতে পারত অর্থাৎ তাদের উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব হ'তে এ পরিমাণ টাকাটা যদি বাদ পড়ত তাহ'লে কৃষিকর্ম্মের মুনাফাটা তাদের ঠিক ঐ পরিমাণ টাকাই বৃদ্ধি পেত—সেটা বড় কম লাভের কথা নয়।

এটা গেল উৎপাদনের ব্যয়-সঙ্কোচের দিক কিন্তু উৎপাদনের বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হবে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে অপরাপর উন্নতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের বিঘাপিছু উৎপাদন একান্ত অকিঞ্চিৎকর। তার কারণ সে-সমস্ত দেশ কৃষির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ

করেছে, আমাদের নিকট সেটা এখনো স্বপ্ন-বিলাস। নইলে আমাদের পক্ষেও উল্লেখযোগ্যভাবে বিঘা পিছু উৎপাদনবৃদ্ধি মোটেই অসম্ভব নয়। আমাদের মতই পশ্চাৎপদ রাশিয়া আজ কি অঘটন কাণ্ডই না সংঘটন করেছে! সুতরাং আমাদের দেশেও যে উন্নতি সম্ভব হবে না একথাটা কি করে বলা যায়। কিন্তু তার জন্য রাশিয়া যে কি প্রভূত পরিশ্রম করেছে তা' ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়। আমাদের দেশেও যদি সে-জিনিস সম্ভব করে তুলতে হয় তবে তার জন্যও পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। যদি কৃষকদের মধ্যে গিয়ে বলা যায় 'ওহে তোমরা সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ কর', তাহ'লে তারা তার কিছুই বুঝবেও না এবং সেরকম ভাবে চাষও করবে না; তার জন্য দরকার সরকারী সংগঠনের এবং সমবায় পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের। বৈজ্ঞানিক উপায় আপনা-থেকে অনুসৃত হয় না, তার জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। ভাল সার, ভাল বীজ, জল নিকাশ ও জল সেচনের উন্নততর ব্যবস্থা, লাঙ্গলটানা, মইটানা ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করাতে গেলে রীতিমত টাকার দরকার। সে টাকা ও সামর্থ্য যে কৃষকদের নেই একথা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু কৃষকদের রয়েছে প্রচণ্ড ঋণভার, তারই বছর বছর সুদ ও কিস্তি যোগাতে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় সরকার থেকে অর্থ সাহায্য করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? শুধু অর্থ সাহায্য নয়, রীতিমত সমবায় সংগঠন দ্বারা প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন। তাহ'লে যদি উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব নয়।

সরকার তরফ থেকে বলা হয় যে, তাঁদের তহবিলে এমন অর্থ নেই যার দ্বারা তাঁরা কৃষি-সমস্যার দিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে নজর দিতে পারেন। যে প্রজাসাধারণকে তাঁরা শাসন করেন তাদের মঙ্গলের জন্য তহবিলে টাকা না থাকা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। সত্যই যদি তহবিলে টাকা না থাকে ত তাঁরা দেশের ধনী সম্প্রদায়ের নিকট হতে লোন্ নিতে পারেন। যেমন তাঁরা অপরাপর বিষয়ে করে থাকেন। সেধার দিয়ে ত আর কিছু অসুবিধা ঘটবার কথা নয়, কেননা, কিছুদিন পূর্ব্বে মাত্র কয়েক মিনিটে কয়েক কোটি টাকা উঠে গিয়েছিল। সেই টাকাটা কৃষিঋণ প্রদান সমিতির ভেতর দিয়ে তাঁরা যদি কৃষকদের সাহায্য করেন, পরে উৎপাদন বৃদ্ধির সময় তাঁরা কিস্তি হিসাবে সে-টাকাটা আদায় করে নিতে পারেন। এতে কি প্রজা, কি সরকার কারুরই অসুবিধা হ'বার কথা নয়।

আমরা উপরে দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির মূল কারণ সম্পর্কে বিষদভাবে আলোচনা করেছি এবং এটাও দেখিয়েছি যে, কি উপায়ে এ দুর্গতির সমাধান করা যায়। সে-দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের; দেশের সকল শ্রেণীর স্বার্থ যখন ঐ কৃষি সমস্যার সঙ্গে জড়িত তখন রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়। আমরা এধারে সরকারী রাষ্ট্রপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভিনিগারের ব্যবসা ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যাঁরাই একটু সৌখীন তাঁরাই ভিনিগার নামক পদার্থের সঙ্গে পরিচিত। ভিনিগার হচ্ছে আমাদের দেশের 'অম্বল' জাতীয় জিনিস। এদেশের পল্লীগ্রামের লোকের আহারাদির রুচির সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে পাঁড়াগাঁয়ে লোকের ভোজনের শেষে 'টক' না হলে চলে না। হাজার ভাল ভাল খাবার অর্থাৎ পোলাও, মাংস, কোর্মা, কাবাব তাদের দেওয়া হোক্ না কেন সেই একটুখানি তেঁতুলগোলা জল কিংবা কচি আমের ঝোল না পেলে তাদের প্রাণটা যেন একেবারে হাঁপিয়ে ওঠে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, টক জিনিসটা রুচিকারক বলেই ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। ওটা শুধুমাত্র কেবল মুখবদ্লানোর ব্যাপার। বাংলাদেশে সাধারণ লোকের খাদ্যের ব্যাপারে টক যে কাজ করে থাকে, ইংরাজী খানাপিনার ব্যাপারে ভিনিগারও প্রায় সেই রকম কাজ দেয়। তা'ছাড়া বাংলা চল্‌তি কথায় আমরা যাকে 'জরানো' বলি অর্থাৎ ফল, আচার ইত্যাদি যেমন জারিয়ে রাখি ভিনিগারেও ঠিক সেই কাজ হয়ে থাকে। বিলাতী আচার, শিশি-ভর্ত্তি নানারকম ফল, শাকসব্জী ইত্যাদি ভিনিগারে জরানো অবস্থাই বাজারে বিক্রীত হয়। তা'ছাড়া ঔষধ ও কালি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ভিনিগার অত্যাবশ্যক।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে hunger is the best sauce. কথাটার তাৎপর্য্য সকলেই জানেন, ক্ষুধার সময় শুধু নুন দিয়ে যে ভাত গিলে ফেলা যায় একথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। কিন্তু ক্ষুধা যখন না থাকে? মানুষের এমনও ত হয় যে, ক্ষুধা থাকে অথচ কিছু খেতে ভাল লাগে না—এককথায় যাকে বলে অরুচি হওয়া। সে-সময় এমন একটা জিনিস বা Sauce দরকার যাতে তার রুচি বৃদ্ধি পায়। দেশীয় আচার, চাটনী, ঝাল-খাবার প্রভৃতি হচ্ছে সেই Sauce, বিদেশীদের নিকট ভিনিগারও সেই Sauce এর কাজ করে থাকে। তাই সর্ব্বত্র উহার এত আদর।

আমাদের এ-দেশেও ভিনিগারের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে। তার কারণ খুবই স্পষ্ট। পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে আমাদের সামাজিক বাঁধনটা খানিক আল্‌গা হয়েছে—আমরা তাদের রীতিনীতি খানিকটা আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের জীবন-যাত্রার অপরাপর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব যেমন পরিলক্ষিত হয়, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সে-প্রভাব কিছুমাত্র কমে না। দুগ্ধজাত খাবার আমাদের ভাল লাগলেও

মাংসজাত খাবার আমরা বেশী করেই গলঃধকরণ করি। এবং এই কারণেই ভিনিগার সিক্ত খাবারও আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠে।

ভিনিগার প্রস্তুতের প্রণালীটা একটু জটিল হলেও উহা প্রস্তুত করতে যে কাঁচামাল প্রয়োজন হয় তা জোগাড় করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। মদ্য, টকআপেল, ও শর্করা সলিউশন, ঝোলা-গুড়, মল্ট, এ্যাল্‌কোহল প্রভৃতির ক্বথ থেকেই ভিনিগার পাওয়া যায়। অম্ল পদার্থ বর্ত্তমান এমন কোন এ্যাল্‌কোহলের মণ্ড প্রথমে প্রস্তুত করতে হয়—তার থেকেই ভিনিগার, বেরোয়। স্পিরিট থেকে ভিনিগার উৎপাদন করতে গেলে আলু কিংবা জনার সম্ভুত তরলীকৃত স্পিরিটের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ফস্‌ফেট বা এ্যামোনিয়া সল্ট মিশাতে হয়। মদ্যজাত ভিনিগার জলীয় মদ থেকেই পাওয়া যায়—টক আপেলের রস থেকেও ভিনিগার মেলে। আজকাল মদ্য ইত্যাদি থেকে বেশী পরিমাণ ভিনিগার প্রস্তুত হয় না, মল্ট থেকেই অধিক পরিমাণ ভিনিগার প্রস্তুত হয়ে থাকে।

মল্ট থেকে যে ভিনিগার তৈরী হয় তার প্রস্তুতক্রিয়া নিম্নরূপ :—যে মল্ট ব্যবহার করা হ'বে তার সঙ্গে আবশ্যকীয় পরিমাণ জল মিশিয়ে পেষণ পাত্রে রাখা হয়—পরে ধীরে ধীরে তা ক্রমশ: ১৫২° ফরান হাইট পর্য্যন্ত উত্তাপে জাল দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে, পাত্রের মণ্ডকে ক্রমাগত নাড়া হয়ে থাকে। উক্ত মণ্ডর সঙ্গে যদি আওডিন মেশানো যায় ত তার রঙ্‌ নীল হয়ে উঠবে—যখন দেখা যায় যে আওডিন মিশিয়েও রঙ্‌ আর নীল হচ্ছে না তখন কাল দেওয়া বন্ধ করতে হয়। তারপর উপরের স্ফুটনভাগকে ফেলে দিয়ে ঈষৎ জল মিশ্রিত করে নতুন মণ্ড পেষণ পাত্রে ঢালা হয়—উক্ত জল ১৫৫° ফরাণ হাইট উত্তাপে গরম থাকে। দ্বিতীয়বারও এর স্ফুটনভাগকে পূর্ব্বের মত ফেলে দেওয়া হয়। তৎপরে সমস্ত পদার্থকে একবার ১৫৫° উত্তাপের গরম জলে ধুয়ে অবশিষ্ট পদার্থকে রেফ্রিজারেটর সাহায্যে ৭০° ফরান্‌হাইট উত্তাপে শীতল করা হয়। তৎপরে সেই শীতল বস্তুকে আলোরিত করলেই ভিনিগার পাওয়া যায়।

উপরোক্ত উপায় ছাড়া অন্যান্য উপাও আছে যদ্দ্বারা ভিনিগার প্রস্তুত হ'তে পারে। যে উপায়েই ভিনিগার প্রাপ্ত হওয়া যাক্‌ না কেন তা একটু অপরিষ্কার থাকে। সেই জন্যই তাকে মিল্‌টার মেসিনে ফেলে পরিষ্কার করে নিতে হয়। শুধু ফিল্‌টার করলেই কাজ ফুরোয় না, বিশুদ্ধ ভিনিগার পেতে হলে তাকে 'ষ্টেরিলাইজ' করে নেওয়া হয়ে থাকে। এই রকম বিভিন্ন মেসিন সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর, তবে ভাল ভিনিগার পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি আমাদের মধ্যেও ভিনিগারের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে,—সুতরাং ব্যবসায়ীরা যদি এদিকে মন দেন ত একটা ধনাগমের রাস্তা বে'র হ'তে পারে।

চুরুটের মর্য্যাদা

আমরা ইতিপুর্ব্বে সিগারেট-শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাতে এই দেখিয়েছি যে, সিগারেট শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কেননা ভারতবর্ষে সিগারেটের নেশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ধোঁয়াজাতীয় নেশার ক্ষেত্রে সিগারেটই সব নয়, বিড়ি আছে, চুরুট আছে, তামাক আছে, গাঁজা আছে, চরস আছে, এবং আরও কত কি আছে। গাঁজা চরস ইত্যাদির ব্যবসা লাভজনক কিনা জানিনে, কারণ সেটা একেবারে খাস্‌-গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন; সোস্যালিজমের আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া State-capitalisation ভারতে যদি কোথাও থাকে ত তা গাঁজা আফিং-এর চাষের ক্ষেত্রেই আছে। গাঁজা-আফিং-চরসকে বাদ দিলে পড়ে থাকে বিড়ি ও চুরুট। তন্মধ্যে বিড়ি শিল্প যে আমাদের কত বড় শিল্প তা' বোধ হয় কাকেও বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। ভারতবর্ষময় সাফল্য-মণ্ডিত কুটির-শিল্প যদি কিছু থাকেত সে এই বিড়ি-শিল্প, কত লোক যে এই শিল্পে নিযুক্ত আছে তার ইয়ত্তা নেই। যখন সেন্সাস্‌ নেওয়া হয় তখন যদি এই নিয়ম থাকে যে, যারা বিড়ি শিল্পে পার্ট-টাইম বা হোল-টাইম' নিযুক্ত আছে তাদেরও আলাদা করে সেন্সাস্‌ নেওয়া হবে, তাহ'লে দেখা যাবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক লোকই এই কুটির শিল্পে লিপ্ত আছে। একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারতবর্ষে নেশার দ্রব্য হিসাবে বিড়িই বেশী ব্যবহৃত হয়। এই বিড়িকে কেউ হঠাতে পাচ্ছে না, পারবে কি'না সেটাও বলা শক্ত। প্রতি স্থানেই দেখা যায় যে, কুটির শিল্প প্রথমে বেশ চলে কিন্তু তারপরে বৃহৎ আকারে মেসিন-শিল্প এসে সেই কুটির শিল্পকে ধ্বংশ করে ফেলে। কিন্তু বিড়িই একমাত্র কুটির শিল্প যেখানে দেখা যাচ্ছে যে মেসিন শিল্প এখনো মাথা গলাতে পারেনি। এমনও হতে পারে যে, মেসিন-শিল্প বিড়ি শিল্পের মত অমন নিকৃষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে মাথা গলানো প্রয়োজন বলে করেনি, কিন্তু ভারতে খুচরো খুচরো ভাবে যে বিড়ি বিক্রীত হয় তার সমষ্টিগত মূল্য মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। বিড়িশিল্পের ক্ষেত্রে একটা আশার কথা এই যে, এখানে কোন বিদেশী প্রতিযোগীতা নেই; সুতরাং এ-শিল্প সম্পূর্ণ আমাদের জাতীয় শিল্প।

বিড়িশিল্পকে ছেড়ে দিলে বাকী থাকে চুরুট শিল্প সেটাই হ'ল আমাদের আলোচনার বিষয়। তামাক পাতার ব্যবহারের আদিম ইতিহাস যদি অনুধাবন করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে মানুষ সর্ব্বপ্রথম তামাক পাতাকে চুরুটের মত পাকিয়ে টানতে শিখেছে, সেই সময় থেকেই হ'ল চুরুটের জন্ম। জন্মের সময় এই চুরুট সর্ব্বাঙ্গসুন্দরত্ব দূরে থাক্‌, এমন কি

সুন্দরত্বই প্রাপ্ত হয় নি। কিন্তু কালক্রমে বহু চেষ্টার পর আজ চুরুটের উন্নতি ঘটেছে। চুরুট সম্পর্কে আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, চুরুট ত আর কিছুই নয়—কেবলমাত্র কতকগুলি দোক্তাপাতাকে পাকিয়ে তার ওপর একখানি গোটা তামাক পাতা জড়িয়ে দেওয়া মাত্র। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সেটাই সত্য বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ সত্য নয়। দোক্তা পাতা ছাড়া চুরুট তৈরী হ'তে পারে না বটে, কিন্তু সে দোক্তাপাতার বিশেষরূপে যত্ন নেওয়া চাই। তার ওপর সে-দোক্তাপাতা জড়াবার কৌশলও আয়ত্ত করা দরকার। এই দু'টি জিনিস সম্ভব হ'লে তবেই চুরুট উৎপন্ন হতে পারে, নচেৎ নয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, চুরুট একেবারে আদিম-কালের বস্তু, অর্থাৎ বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতির জন্মের পূর্ব্বে চুরুট জন্মগ্রহণ করেছিল। সেইজন্য একশ্রেণীর লোকের নিকট এই চুরুট অত্যন্ত প্রিয়। চুরুটের একটা বিশেষত্ব এই যে, এ-বস্তু ধনী ও গরীবদের নিকট সমান সমাদৃত; এক তামাক ছাড়া ঐ গুণ আর কোন বস্তুর আছে বলে মনে হয় না। বিড়ির কথা যদি তোলেন তাহ'লে বলা যায় যে, বিড়ি কেবল গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা খেয়ে থাকে, বড় লোকেরা বিড়ি খেতে অভ্যস্ত নয়। সিগারেটের কথা যদি ধরেন তাহ'লেও এই বলা চলে যে তা' বড় লোক ও অবস্থাপন্ন মধ্য-বিত্তশ্রেণীর নিকটই বেশী প্রিয়; গরীবদের ইচ্ছা থাকলেও তারা সিগারেট খাবার খরচ যোগাতে পারে না। কিন্তু চুরুট গরীব বড়লোক সকলেই টেনে থাকে, তার কারণ চুরুট সিগা-রেটের তুলনায় সস্তাও বটে, দামীও বটে। এক পয়সায় দুটো চুরুটও পাওয়া যায়, আবার দু'আনার একটা চুরুটও পাওয়া যায়। এক পয়সার দু'টো চুরুট প্রায় ষোলটি বিড়ির সমান সুতরাং যাঁরা ধূমপায়ী তাঁদের চুরুট খেলে অতিরিক্ত খরচা বা অধিক ব্যয় পড়ে না। তবে একটা কথা এই যে, সিগারেট কিংবা বিড়ি প্রায় সকলেই পছন্দ করেন, চুরুট সকলে পছন্দ করেন না। সাধারণতঃ হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, ধূমপায়ীরা তাঁদের নেশা আরম্ভ করেন 'ন প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' থেকেই অর্থাৎ যখন গোঁফ বেরোয় নি তখন থেকেই তাঁরা নেশার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। কিন্তু সেই কচি বয়সে চুরুটের প্রতি তাঁদের হাজার আগ্রহ থাকলেও সেটা সহ্য করার সামর্থ্য থাকেনা একটা দিব্য রকমের মৌতাতী টানের স্বর্গসুখ অনুভবের পরিবর্ত্তে অসামান্য কৃপায় তাঁদের একেবারে মস্তিষ্ক বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়—ঘূর্ণায়মান জলদ রক্ত চক্ষু দুটিকে শিবনেত্র প্রাপ্তি থেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে পরিশেষে 'বাপ' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাঁরা শান্তি পান্;

সুতরাং ধূমপান শিক্ষার ইউনিভার্সিটির প্রবেশ দ্বারেই গুম্ফহীণ উচ্চনেশাভিলাসী বিলাসীদের একটা অকারণ চুরুট-ভীতি থেকে যায়। এমতাবস্থায় দোষটা চুরুটের কি বিধাতার তা' বলা শক্ত। তার চেয়ে সিগারেট সুন্দরীকে দুই ওষ্ঠদ্বয়ে ফাঁকে ফেলে ঈষৎ মৃদু সোহাগ জানানো যে ঢের ভাল। তাতে আত্মীয়-স্বজন মান্যবর দিগের তরফ হ'তে তাড়নার যত আশঙ্কাই থাক্ মস্তিষ্ক ঘূর্ণনের সম্ভাবনা নেই।

এইখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার যে, বিড়ি-চুরুট-সিগারেটের মধ্যে সিগারেটটাই

হচ্ছে অভিজাত গর্ব্বী কিন্তু তামাক ও চুরুট হ'ল অভিজাত ধর্ম্মী। আমরা, সাধারণ লোকেরা সিগারেটেই এ্যারিষ্টোক্রাসী অনুভব করি, কিন্তু প্রকৃত এ্যারিষ্টোক্রাটিক্‌রা তামাক ও চুরুটের ভক্ত। সেইজন্যই আজকাল দেখা যায় যে, ছোক্‌রা ও বিলাসী সম্প্রদায় চুরুটকে সমাদর করতে শিখেছে। বিজলী বাতির যত গর্ব্বই থাক্‌ কারুকার্য্যখচিত ঝাড়-লণ্ঠনের কাছে যেমন তাকে মানায় না, তামাক ও চুরুটের কাছে সিগারেটও ঠিক তেমনি। অথচ বিজলী বাতির প্রাপ্য গর্ব্ব থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করে না। সিগারেট স্মার্ট কিন্তু এ্যারিষ্টোক্রাটিক্‌ নয়—তার গর্ব্ব আছে কিন্তু মর্য্যাদা নেই। সুন্দরী বাইজীরও গর্ব্ব আছে, মাদকতা আছে; কিন্তু প্রতিষ্ঠা কেড়ে নেয় কুলবধূরা—তাকে নিয়ে বিলাস করা যায় কিন্তু সামাজিক সমারোহ করা যায় না। সিগারেটও ঠিক তাই, সে চটুল, সে স্ফুলিঙ্গ, সে একটা উন্মাদনা, কিন্তু নেশার ক্ষেত্রে সে বনেদী বংশ নয়; সেখানে কৌলিন্য লাভ করে চুরুট ও তামাক।

প্রশ্ন উঠ্‌বে যে, চুরুটের যদি এতই কৌলিন্য ও এ্যারিষ্টোক্রাটিক্ মর্য্যাদা, তবে সিগারেট অমন বিরাটভাবে বাজার অধিকার করলে কি করে? এর দু'রকম ভাবে জবাব দেওয়া যেতে পারে:—

প্রথমতঃ, চুরুট আবার তার লুপ্ত অধিকার ক্রমশঃ ফিরে পাচ্ছে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে বিলাসী বাবুরা আজকাল সিগারেট ছেড়ে দিয়ে চুরুটেরই বেশী করে ভক্ত হয়ে উঠছেন। চুরুট ব্যবহারের ইতিহাসে এটাকে একটা 'রেনেসাঁ' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সুতরাং চুরুটের জনপ্রিয়তা সিগারেট কেড়ে নিয়েছিল সত্য, কিন্তু তার কারণ সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বেই বলেছি যে, চুরুট হচ্ছে এ্যারিষ্টোক্রাটিক্ ব্যাপার; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এ্যারিষ্টোক্রাসির স্থান নেই। সামাজিক জীবনে এটা একটা ট্র্যাজেডী! আধুনিক জগৎ এ্যারিষ্টোক্রাটিক্ সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উন্মুখ হ'য়েছে, প্রত্যেক চিন্তাশীল মনীষিরই তাতে সম্মতি আছে। অথচ এক হিসাবে দেখতে গেলে এ্যারিষ্টোক্রাসী যদি ধ্বংস হয় তাহ'লে সভ্যতার গর্ব্ব করবার কিছুই থাকবে না। আসলে, এ্যারিষ্টোক্রাসী জিনিষটা খারাপ নয়, কিন্তু ওর প্রচলিত অর্থটাই সমাজের চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই অভিজাত সম্প্রদায়ের নাম শুন্‌লেই আমাদের স্বভাবতঃই মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, অথচ অভিজাত সম্প্রদায়েরই হ'ল আদর্শ জীবন ধারা। যাঁরা মার্জ্জিত, সুরুচিসম্পন্ন, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে যাঁরা অগ্রগণ্য—তারাই হ'লেন অভিজাত। প্রাচীন যুগে ও সামন্ত যুগে নৃপতি শ্রেণীরাই এই অভিজাত জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু তাঁদের একটা প্রধান অপরাধ হয়েছিল যে, পূর্ণিমার অধিবাসী হয়ে অমাবস্যার জীবনের দিকে ফিরে তাকানো তাঁরা কর্ত্তব্য বলে মনে করেন নি। সমাজ জীবনে আধিপত্যের এ-ধর্ম্ম নয় যে অপরকে দাবিয়ে রেখে কিংবা শোষণ করে নিজেরাই কেবল বড় হ'ব; সে দুর্নীতি যখন প্রাধান্য পায় তখনই সমাজে পাপ প্রবেশ করে। নইলে, অভিজাত কথাটার আদিম কিংবা অভিধানগত মানেটা কদর্থবাচক নয়, ওর প্রচলিত ধারণাটাই আমাদের বিচলিত করে তুলেছে। আধুনিক প্রগতিশীল জগৎ যখন তথাকথিত আভিজাত্যের বিরোধিতা করে, তখন তার এই মানে নয় যে, সারা দুনিয়াটা নিঃস্বদের লীলাক্ষেত্র ও সংস্কৃতির মরুভূমি হয়ে যাক্; বরং তারা এই চায় যে, আভিজাত্যের একচেটিয়া অধিকার একটি শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তা সাধারণের এক্তিয়ারে পরিণত হোক্। সেইজন্যই আপাততঃ সকলেই তথাকথিত আভিজাত্য-বিরোধী হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই এতদিন সবাই অভিজাত নিদর্শন চুরুটকে ত্যাগ করে সিগারেটকে আশ্রয় করেছিল।

কিন্তু একটা আশার কথা এই যে, সেদিন কেটে গেছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, চুরুটের ব্যবহারের ইতিহাসে এটা হচ্ছে 'রেনেসাঁর' যুগ, কাজে কাজেই চুরুটের মর্য্যাদা বাড়ছে। সুতরাং চুরুট ব্যবসায়ীরা এই শিল্পটি সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হোন্।

ডেন্‌মার্কের উন্নতির বিবরণ

(শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি-এস্‌-সি)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

ডেন্‌মার্কের রাজধানীর নাম কোপেনহেগেন। ডেনিস্‌ ভাষায় ইহার বর্ণ বিন্যাস এইরূপ,—Kiobenhavn. এই শব্দের অর্থ—"বণিকের স্বর্গ"—(Merchants' Heaven). যে দেশের রাজধানীর নাম "বণিকের স্বর্গ,—সে দেশের লোকেরা যে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিবে, তাহা আশ্চর্য্য কি? বণিকের স্বর্গেই ত লক্ষ্মী বাঁধা রহিয়াছেন। বাল্টিক সাগরের প্রবেশ পথে একটি দ্বীপের উপর,—সুইডেনের খুব কাছে এই নগর অবস্থিত। ইহার লোক সংখ্যা ৬ লক্ষের উপর। দেশের মধ্যে রাজধানীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা, বিবিধ শিল্পের কেন্দ্র,—সমস্তই একমাত্র এই কোপেনহেগেন সহরের মধ্যে রহিয়াছে,—আর কোথাও নাই। যদিও হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ড্যাম এবং বেলজিয়মের আণ্টোয়ার্প, এই দুইটি সহরের বাণিজ্য অধিকতর প্রসারিত ও উন্নত, তথাপি কোপেন-হেগেনকে বলা হয় "উত্তরের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌" (Constantinople of the North)। কৃষ্ণ-সাগরের প্রবেশ পথে যেমন কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌ এক সময়ে (এখন আর নহে) ইউরোপের চাবি-কাঠি (Key to Europe) বলিয়া অভিহিত হইত, সেইরূপ বাল্টিকের প্রবেশ পথে কোপেন-হেগেন। গ্রেট্‌ ব্রিটেন, জার্ম্মানী, সুইডেন, প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত মালপত্রের চলাচল কোপেনহেগেনের মধ্য দিয়াই হয়।

ডেন্‌মার্কের বণিকেরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে আসিয়া অন্যান্য সভ্য জাতিদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। পর্টুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসেন, সেই সময়ে ডেন্‌মার্কের বণিকেরাও অলস ছিলেন না। তাঁহারা ইংরাজ ও ফরাসীদের পূর্ব্বেই ভারতে আগমন করেন এবং নানা স্থানে বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে কোপেনহেগেন সহরে একটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর ছোট বড় আরও বহু সংখ্যক কোম্পানী গঠিত করিয়া ডেন্‌মার্কের বণিকগণ ভারতবর্ষে এবং পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। এই সকল কোম্পানীর মধ্যে এশিয়াটিক্‌ কোম্পানীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক্‌ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১১১ বৎসর পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানীর কারবার উঠিয়া যায়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহাতে কোপেন-হেগেনের বাণিজ্য এরূপ নষ্ট হয় যে, উহার পুনরুদ্ধার করিতে বহু বৎসর সময় লাগে।

১৮৩০ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোপেন-হেগেনের বিনষ্ট বাণিজ্য ক্রমশঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

হইতে থাকে। তারপর হইতে ডেনমার্কের বাণিজ্য দিন দিন উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতেছে।

কোপেনহেগেনের ইষ্ট এসিয়াটিক কোম্পানী পৃথিবী ব্যাপী একটি বিরাট কারবার। ১৮৯৭ সালে ইহা গঠিত হয়। এই কোম্পানীর বর্ত্তমান মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটী ক্রোনার। এক ক্রোনার একশিলিং দেড় পেন্স; আমাদের প্রায় বার আনার সমান। ১৮৯৪ সালে কোপেনহেগেন ফ্রি পোর্ট খোলা হয়। তখন হইতে কোপেনহেগেন বন্দর দিয়া চল্‌তি বাণিজ্য খুব বাড়িয়া যায়। ১৮৮৫ হইতে ৫০ বৎসরে ডেন্‌মার্কের বিদেশী বাণিজ্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় বুঝা যাইবে,—

সাল	মোট আমদানী মিলিয়ান ক্রোনার	মোট রপ্তানী মিলিয়ান ক্রোনার
১৮৮৫	২৪৯	১৬২
১৮৯৫	৩৬৪	২৬৯
১৯০৫	৬২৩	৫৩৪
১৯১৩	৮৩৩	৭২১
১৯৩৪	১৩৫৪	১২৩১

১৯৩৪ সালে মোট ১০৷৷০ মিলিয়ান টন মাল আমদানী হয় এবং ২ মিলিয়ান টন মাল রপ্তানী

হয়। বিদেশীয়দের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের সহিতই ডেন্‌মার্কের কারবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তার পরেই জার্ম্মানী ও সুইডেন। ভারতবর্ষের সহিত ডেন্‌মার্কের সাক্ষাৎভাবে কোন বাণিজ্য নাই। ভারতীয় কাঁচামাল ইংরাজ বণিকদের মারফৎ ডেন্‌মার্কে চালান যায়। সুতরাং তাহা গ্রেট্ ব্রিটেনের হিসাবেই ধরা হয়।

ডেন্‌মার্কের সমগ্র ভূমির শতকরা ৭৬ ভাগে চাষ আবাদ হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ডেন্‌মার্কের ক্ষেত্রফল ১৬ হাজার বর্গমাইল। সুতরাং সেই হিসাবে দেখা যায় ১২১৬০ বর্গ মাইল ভূমিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। ডেন্‌মার্কের ব্যবসা বাণিজ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের স্থানই প্রধান। ১৮৬৬ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত ৬৩ বৎসরে আবাদী জমির পরিমাণ সাড়ে চার লক্ষ হেক্টার বৃদ্ধি পায়। এক হেক্টার আমাদের দেশীয় সাড়ে সাত বিঘার সমান। ডেন্‌মার্কের কৃষকেরা পৃথিবীর বাজারের চাহিদা বুঝিয়া শস্য এবং খাদ্য সম্পর্কিত কাঁচা মাল উৎপাদন করে। ১৮৮০ সালের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ডেন্‌মার্কে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এবং গো-মহিষাদি পশুর সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। ১৮৮০ সালে শূকরের সংখ্যা যত ছিল, এক্ষণে তাহার ছয় গুণ হইয়াছে; এবং হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পক্ষীর সংখ্যা ছয় গুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চাষের জমির শতকরা ৯০ ভাগ ফসল গৃহপালিত পশু পক্ষীদের খাদ্য শস্য ঘাস ও শাক্ সব্জী। অবশিষ্ট ১০ ভাগ চিনি প্রস্তুতের বীট্, তৈলবীজ, বার্লি এবং রপ্তানীর অন্যান্য দ্রব্য।

কৃষিকার্য্যের জন্য বিদেশ হইতে যে সার এবং পশুর খাদ্য আমদানী হয় তাহার মূল্য প্রায় ২০০ মিলিয়ান ক্রোনার। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১২ মিলিয়ান ক্রোনার; বর্ত্তমান সময়ে তাহা ১ হাজার মিলিয়ান ক্রোনারে উঠিয়াছে। ৬৮ বৎসরের মধ্যে এই বিরাট উন্নতি কিরূপে হইল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মনে হয়, এ যেন সত্য সত্যই আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ! আরও বিস্ময়ের বিষয়,—এই ৬৮ বৎসরের মধ্যে ডেন্‌মার্কের লোক সংখ্যা বিশেষ কিছু বাড়ে নাই,—প্রায় এক রূপই রহিয়াছে। বাস্তবিক জ্ঞানের দ্বারাই যে এক লোক একশত লোকের সমান হইতে পারে, ডেন্‌মার্ক তাহার প্রমাণ।

ডেন্‌মার্কে কৃষিকার্য্য সম্পর্কিত ব্যবসাই প্রধান। ইহার মধ্যে গো-পালন ও দুগ্ধের কারবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর বাজারে মোট যে পরিমাণ মাখন সরবরাহ হয়, তাহার অধিকাংশ (শতকরা ২৫ ভাগ) ডেন্‌মার্ক হইতে আসে। এত মাখন আর কেহ জোগাইতে পারে না। ডেন্‌মার্কের গো-পালন, বর্ত্তমান সময়ে সকল সভ্য জাতির পক্ষে দেখিবার বিষয় এবং অনুকরণীয়। পৃথিবীর বাজারে কোন্ দেশ কি পরিমাণ মাখন সরবরাহ করে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল ;—

ডেন্‌মার্ক	শতকরা	২৫ ভাগ
নিউজিল্যাণ্ড	,,	২২ ,,
অষ্ট্রেলিয়া	,,	১৯ ,,
সোভিয়েট্ রাশিয়া	,,	৬ ,,
নেদার ল্যাণ্ডস্	,,	৪ ,,
আয়র্ল্যাণ্ড	,,	৬ ,,
সুইডেন	,,	৪ ,,
অন্যান্য দেশ	,,	১৪ ,,

পৃথিবীর বাজারের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যাকন (শূকরের মাংস) এবং শতকরা ২১ ভাগ ডিম ডেনমার্ক্ সরবরাহ করিয়া থাকে। ডেন্মার্কের কৃষিজাত দ্রব্য এবং দুগ্ধ, ডিম, মাংস, প্রভৃতি জিনিস অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া পৃথিবীর বাজারে উহাদের চাহিদা খুব বেশী। Made in Denmark (ডেন্মার্কে তৈয়ারী) ছাপমারা দেখিলে লোকে সর্ব্বাগ্রে সেই জিনিসটাই কিনিতে আগ্রহান্বিত হয়। বাজারে এইরূপ সুনাম প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই ডেন্মার্কের ব্যবসা-বাণিজ্যের এত উন্নতি হইয়াছে।

আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ডেনমার্ক্বাসীরা তাহাদের কৃষিকার্য্য, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় এবং নিয়ম প্রণালী মতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে করিয়া থাকে। এইজন্যই তাহাদের ধনবল ও জনবল বেশী না থাকিলেও, সফলতা লাভে কখনও বঞ্চিত হয় না। সেখানে ফসল উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য কো-অপারেটিভ্ বা সমবায় পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র দেশের লোকেরা সমবায় পদ্ধতিতে কার্য্য করিয়া কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য নানাদেশ হইতে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তথায় গমন করেন। তাঁহারা দেখিয়া লজ্জিত হন,—সুসভ্য ও শক্তিশালী গভর্ণমেন্টের অধীনস্থ অনেক দেশেই কো-অপারেটিভ্ বা সমবায় পদ্ধতি এখন পর্য্যন্ত এমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

কৃষিকার্য্যের জন্য ডেন্মার্কে ২০০০টী বৃহৎ জমিদারী, ৯০ হাজারটী ফার্ম্ম্ এবং ১১৫০০০টী ক্ষুদ্র জোত আছে। ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের হিসাব। এখন উহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি ফার্ম্মের সহিত রিসার্চ্চ বা গবেষণাগৃহ, লেবরেটরী বা পরীক্ষাগার, কৃষি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বীজ-নির্ব্বাচন সমিতি, প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান একযোগে কার্য্য করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেশে অনেক টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে—তাহাতে প্রধানতঃ কৃষি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব, তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে

পত্র লেখকগণের প্রতি
(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** ব্যবসায়ের সন্ধান দিবার এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য

৫।৶৹ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" **পত্রিকার গ্রাহক হইলেই**, আমরা আনন্দের **সহিত তাঁহার** জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,"—ন্যাও,—দ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে এবং পোষ্টেজ না পাঠাইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি,—**আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ১৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

আমি "ধান ভানা" ব্যবসা করিবার জন্য কেরোসীন তৈলে চালিত কল ক্রয় করিতে চাই, যে কলে ধান, তিসি, সরিষা ও ডাইল ভাঙ্গা যায়। আটা ভাঙ্গা কল চাই না, কারণ আমাদের দেশে উহা বেশী কাট্‌তি হয় না। তাই দয়া করিয়া ঐ সকল কলগুলির মূল্য তালিকা ও বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইবেন। আর ঐ সকল কল পাইবার জন্য কোম্পানী যদি অন্য কোন সুবিধা করিয়া দেয় তাহাও উল্লেখ করিবেন (i. e. Instalment), যাহাতে অল্প মূলধন সহ ঐ কাজ আরম্ভ করা যায়। আশা করি আপনারা এই কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি দানে ত্রুটি করিবেন না। আর অন্য কোন সহজ লাভজনক ব্যবসার কৌশল থাকিলেও তাহার বিজ্ঞাপন পাঠাইতে ভুল করিবেন না। আর তৎসঙ্গে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পুরাতন বাঁধান সেটের প্রবন্ধ সূচী বা Synopsis পাঠাইবেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীনেপাল চন্দ্র ব্যাপারী

পোঃ—বামরাইল

গ্রাম—সাচুহার

১নং পত্রের উত্তর

(১) যে কলে ধান ভানা হয়, তাহাতে সরিষা, তিল অথবা ডাইল ভাঙ্গা যায় না। ধানের কল পৃথক, সরিষা ও তিল ভাঙ্গা কলকে ঘানি বলে, তাহা অন্য প্রকার। ডাইল ভাঙ্গা কলও আলাহিদা রকমের। এই সকল কল কেরোসিন তৈলে চলে না, ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে, ঐ ইঞ্জিন চালাইতে হয় কেরোসীন অথবা

ক্রুড্ অয়েলের দ্বারা। দেখা যায়, গোড়াতেই আপনার এই সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের অভাব।

(২) এই সকল কলের মূল্য তালিকা ও বিবরণের জন্য আমাদের নাম করিয়া নিম্নলিখিত ফার্ম্মে চিঠি দিবেন ;—

(1) Bery Bros. 15 Clive Street, Calcutta.

(2) G. M. Mahamad Ali, 40 Strand Road, Calcutta.

(3) Marshall Sons & Co. (India) Ltd. 99, Clive Street, Calcutta.

(4) Industrial Machinery Co. 14 Clive Street, Calcutta.

(5) T. E. Thomson & Co. Ltd. 9, Esplanade, Calcutta.

(6) International Trading Co. 13, Clive Street, Calcutta.

(৩) আপনি যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহার মূল্য আপনি কি দিতেছেন? আপনি আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজখানির গ্রাহকও নহেন। বিনা পয়সায় ফাঁকি দিয়া আপনি ব্যবসার কৌশল শিখিতে চান ;—দুনিয়ায় অর্থোপার্জ্জন এত সোজা ব্যাপার নহে। আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজখানি কিনিয়া পড়ুন,—তাহাতে হাজার হাজার রকমের ব্যবসা কৌশলের সন্ধান পাইবেন।

(৪) ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুরাতন বাঁধাই সেটের প্রবন্ধ সূচী বা Synopsis আপনাকে পাঠান হইয়াছে।

মহাশয়,

আমার [illegible] যে, আমরা কয়েকজন কায়স্থ যুব[illegible]ত হইয়া এতদঞ্চলে, আমাদের নিক[illegible] হইতে পাট, গুড, তেঁতুল, চাউল, [illegible] প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আজ কয় [illegible] হিংগলগঞ্জ হাটে বিক্রয় করিতেছি, [illegible] মাড়য়ারী ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া নাম মাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, কখনও কখনও উহারা আসিয়া এমন দর দেয়, যাহাতে আমাদের যথেষ্ট লোকসান হইয়া যায়, অথচ আমরা নিরুপায়, কারণ আমরা জানিনা, কলিকাতায় কি দরে কোথায় মাল বিকাইতেছে, এবং মহাজন কাহারা? এসব আমরা কিছুই জানিনা। মাঝে মাঝে আমরা J. N. Das & Co. এর স্মরণ লইয়াছিলাম, তাঁহারা আমাদিগকে আশা দিয়েছিলেন, যে আমাদের মাল উচ্চহারে বিক্রয় করিয়া দিবেন, কিংবা একজন উপযুক্ত মহাজন ঠিক করিয়া দিবেন, কিন্তু বারবার কয়েক খানা পত্র লেখা সত্ত্বেও তাহাদের কোন জবাব পাই নাই। বর্ত্তমানে আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থী, আশা করি আপনার নিকট আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইব। এক্ষণে আমরা তেঁতুল ক্রয় করিতেছি, দর ১৸৹ ১৷৵৹ আনা (বীচিসহ) প্রতি মণ। মাড়য়ারীরা কখনও বা ১৷৹ টাকা দর দেয়, আবার কখনও ১৲ টাকা দর দেয়, আপনার নিকট প্রার্থনা হয় আপনি সুবিধা দরে বিক্রয় করিয়া দেন, কিংবা কোন উপযুক্ত মহাজন ঠিক করিয়া দেন, কিংবা কয়েকজন মহাজনের নাম আমাদের

জানাইবেন, এবং কলিকাতায় কি দর জানাইবেন। শীঘ্রই আমরা শিমুল তুলা ক্রয় করিব। তুলার দরও উল্লেখ করিবেন, বর্ত্তমানে আমরা প্রতি সপ্তাহে ১৫০/ মণ হইতে ২৫০/ মণ পর্য্যন্ত তেঁতুল সরবরাহ করিতে পারি। তুলা প্রতি সপ্তাহে ১০০/ মণ হইতে ১৫০/ মণ পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারি। যদি আপনার দ্বারা আমরা উৎসাহ পাই তাহা হইলে আরও প্রচুর মাল সংগ্রহ করিতে পারিব। কিছু তেঁতুল আমাদের আড়তে মজুত আছে। আপনার উত্তর

না পাইলে তাহা ছাড়িব না, পত্র পাঠে উত্তর দানে বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীকালী পদ দত্ত
পোঃ—হিঙ্গলগঞ্জ
গ্রাম—সেবাবাতি
জিঃ—২৪ পরগণা

২নং পত্রের উত্তর

আপনারা কারবারী লোক। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন। কিন্তু অব্যবসায়ীর মত কথা বলেন কেন? আপনি মাল বেচিয়া লাভ করিবেন,—আর অন্যে আপনাকে মুফ্‌তো সেই মাল বিক্রয়ের সুবিধা করে দিবে এরূপ আশা করেন কি হিসাবে? আপনি নিজে কাহাকেও এইরূপ সাহায্য করেন? জে, এন, দাস কোম্পানীর নিকট হইতে যে পত্রের উত্তর পান নাই, তাহার কারণ এই। তাহাতে আপনাদের দুঃখিত বা বিস্মিত হইবার হেতু নাই। যাঁহারা আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক, তাঁহাদের জন্ত আমরা খাটিতে পারি এবং সানন্দচিত্তে তাঁহাদিগকে নানাবিধ সুপরামর্শও দিয়া থাকি। কিন্তু আপনি আমাদের গ্রাহক নহেন। সুতরাং একখানি চিঠি লিখিলেই আমরা আপনার মাল বিক্রয়ের জন্য মহাজন ঠিক করিয়া দিলাম;—আর আপনিও বেশ দু'পয়সা লাভ করিয়া ফাঁপিয়া উঠিলেন এমন হইতে পারে না। আপনি যদি আমাদের পত্রিকার গ্রাহক হন, তবে আমাদের আফিসে আসিলে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া উপযুক্ত মহাজন একটী দুইটী নয়,—অনেক ঠিক করিয়া দিতে পারি। জিনিসপত্রের বাজার দরও আমাদের কাগজে বাহির হয়, তাহাতে দেখিতে পাইবেন। আমরা নিজে কোনপ্রকার বেচা কেনার কার্য্য করি না।

৩নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া হস্ত পরিচালিত ধান ভাঙ্গা, আটা ভাঙ্গা, ঝাড়াই কল, মোজা বোনা কল ইত্যাদির মূল্য তালিকা—দরকার, শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। আশা করি শীঘ্রই মূল্য তালিকা পাইব। অয়েল ইঞ্জিন এর মূল্য তালিকাও পাঠাইবেন। ইতি—

বিনীত।—
গোলামগিলাম
জমিদার
পোঃ—তালিবপুর
জেলা—মুর্শিদাবাদ

৩নং পত্রের উত্তর

১। হস্ত চালিত ধান-ভানা কলের মূল্য ৩০ টাকা এবং হস্ত-চালিত আটা ভাঙ্গা কলের মূল্য ২৫ টাকা। এই দুইটী কল আমাদের নিকট পাইবেন। প্যাকিং ও পাঠাইবার খরচা অতিরিক্ত লাগিবে। হস্ত চালিত ধানভানা ও আটাভাঙ্গা কলের দ্বারা কোন ব্যবসায় চলে না। কেবলমাত্র গৃহস্থের নিত্য-প্রয়োজনীয় চাউল ও আটা তৈয়ারী করিয়া লইবার জন্যই উহা ব্যবহৃত হয়। হস্তচালিত ধানভানা কলের সঙ্গে হস্তচালিত ঝাড়াই কল চলে না, কারণ ঐ সামান্য পরিমাণ চাউল কুলা দিয়া ঝাড়িয়া লওয়াই সুবিধাজনক। বলদ চালিত ধানভানা ও আটাভাঙ্গা কলের বিজ্ঞাপন একসময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা

গিয়াছে ঐ প্রকার কলের দ্বারাও ব্যবসা চলে না। সেইজন্য বর্ত্তমান সময়ে সেই সব কল অপ্রচলিত হইয়াছে।

২। মোজা বোনা কলের জন্য আমাদের নাম করিয়া নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন ;—

1. K. C. Mallik & Sons 20/A, Chittaranjan Avenue, Calcutta.

2. Don Watson & Co. 19, British Indian Street, Calcutta.

3. Indo-Swiss Trading Co. 2, Church Lane, Calcutta.

4. W. H. Brady & Co. Mercantile Buildings, Lalbazar St, Calcutta.

৩। অয়েল ইঞ্জিনের মূল্য তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি দিবেন,—

1. T. E. Thompson & Co. Ltd. 9. Esplanade, Calcutta.

2. Bery Bros 15, Clive Street, Calcutta.

3. Marshall Sons & Co. (India) Ltd. 99, Clive Street, Calcutta.

4. Balmer Lawrie & Co. Ltd. 103, Clive Street, Calcutta.

৪নং পত্র

শ্রীল শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন,

কুল্‌ফী বরফের (যাহা টিনের case এ রক্ষিত অবস্থায় বিক্রীত হয়) প্রস্তুত প্রণালী দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

বিনীত—
শ্রীকালীকিঙ্কর দে
গ্রাহক নং ৬০২১
পোঃ বাবুয়ান
গ্রাম সোনাজোল
জেঃ হুগলী

৪নং পত্রের উত্তর

কুল্‌পী বরফ সাধারণতঃ ফেরিওয়ালারা ছোট বড় মাঝারি দুই তিন রকম সাইজের মোচাকৃতি টিনের চোঙ্গায় করিয়া বিক্রয় করে। তাহা তৈয়ারী করিবার প্রণালী এই ;—প্রথমতঃ একটা বড় হাঁড়ীর মধ্যে কিছু ভাঙ্গা বরফ নুনের সঙ্গে মিশাইয়া রাখিতে হয়। তারপর যে জিনিসের কুল্‌পী তৈয়ারী হইবে, যথা মালাই, বা রাবড়ী, বা মিষ্টযুক্ত জ্বাল দেওয়া ঘন দুগ্ধ, প্রভৃতি টিনের চোঙ্গায় পুরিয়া ঐ বরফের মধ্যে গুজিয়া বসাইয়া রাখিতে হয়। এই টিনের চোঙ্গাগুলির উপরে গোল টিনের চাকৃতি দিয়া ঢাকা দেওয়া দরকার এবং জোড়ের মুখ একটু ময়দার আঠা মাখাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই মুখ বন্ধ করিতে কিঞ্চিৎ কৌশল খাটাইতে হয়। দুধ অথবা মালাই যখন জমিয়া শক্ত হইয়া আসে, তখন উহার আয়তন কিছু বাড়িয়া যায়, সুতরাং চোঙ্গার ঢাকনী ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারে। সেইজন্য চোঙ্গাগুলিতে দুধ মালাই প্রভৃতি একেবারে কানায় কানায় ভর্ত্তি করিতে নাই, একটু খালি রাখিতে হয়। এক্ষণে এক স্তর চোঙ্গা বসান হইয়া গেলে উহার উপরে আবার ঐ রকম নুন মিশান বরফখণ্ড ছড়াইয়া দিতে হয় এবং ঐ বরফের উপর আর এক স্তর চোঙ্গা বসাইতে হয়। এই রকম দুই তিন স্তর চোঙ্গা বসাইলে হাঁড়ী ভরিয়া যাইবে। তারপর সমস্ত হাঁড়িটাকে ভালরূপে ঢাকা দিয়া খুব পুরু কম্বল এবং চট্ দিয়া জড়াইতে হয় যেন বাহিরের গরমে হাঁড়ির ভিতরকার বরফ গলিয়া না যায়। তিন চার ঘণ্টার মধ্যে চোঙ্গার দুধ মালাই প্রভৃতি জমিয়া আসিবে। ফেরিওয়ালারা বৈকালে এইরূপ হাঁড়ি সাজাইয়া সন্ধ্যার

পরে বিক্রয় করিতে বাহির হয়।

বরফের সহিত নুন মিশাইলে, উহা আরও ঠাণ্ডা হয়। এই অত্যধিক শীতলতা বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে হাঁড়ীর বরফকে একটু নাড়া চাড়া করিতে হয়। দুধ ও মালাই প্রভৃতির সঙ্গে কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম এবং সুমিষ্ট আমের রস মিশাইয়া নানা রকমের বেশী দামের কুল্‌পী তৈয়ারী করা যায়। কলিকাতায় সিদ্ধি (ভাং), নেবু প্রভৃতির কুল্‌পীও বিক্রয় হয়।

আজকাল অনেক রেস্তোরাঁয় যে আইস্ ক্রীম্ পাওয়া যায়, তাহাও এই কুল্‌পী বরফের প্রক্রিয়াতেই তৈয়ারী হয়। তবে ইহার জন্য একপ্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়। সেই যন্ত্রে ঐ প্রকার নুন মিশ্রিত বরফের মধ্যে একটী পৃথক পাত্রে দুধ, মালাই প্রভৃতি রাখিবার ব্যবস্থা আছে। একটী হাতলের সাহায্যে এই পাত্রটীকে ঐ বরফের মধ্যে খুব দ্রুত ঘুরান হয়। তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যেই দুধ, মালাই প্রভৃতি জমিয়া যায়। সুতরাং হাঁড়ি অপেক্ষা এই যন্ত্রে একটু সুবিধা আছে। এই যন্ত্রের মূল্য সামান্য ৫।৭ টাকা হইতে উর্দ্ধে ৫০।৬০ টাকাও হইয়া থাকে।
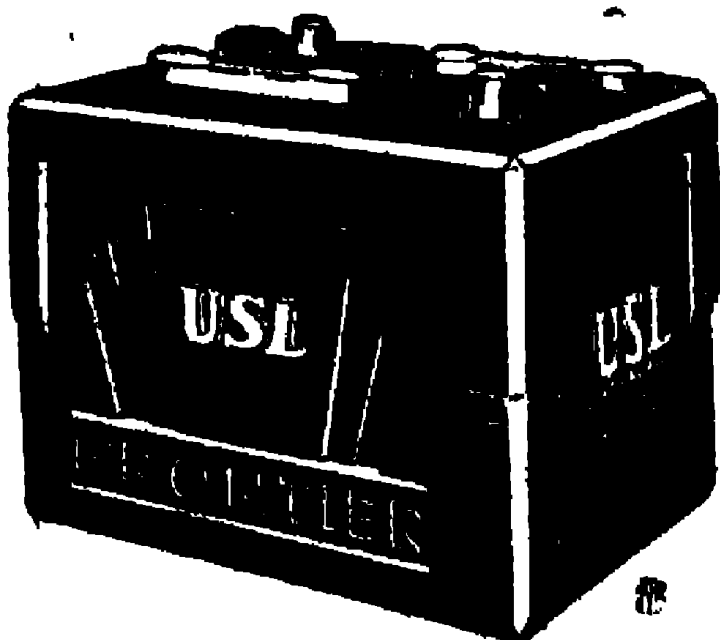
বাংলায় ফলের চাষ ও ফলের ব্যবসায়

বাংলাদেশের আর্থিক সম্পদ্ ও খাদ্য সম্পদ্ বৃদ্ধির একটি সহজ পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে ফলের চাষে;—আজ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট অথবা জনসাধারণ কেহই এদিকে কোন চেষ্টা করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতে ফলের চাষ সম্বন্ধে কোন কথা থাকে না। দেশের লোক, যাহারা গৃহস্থালীতে একটু মনোযোগী, তাহারা নিজেদের বাস্তুভিটার আশে পাশে দু' চারিটি ফল গাছ লাগায়;—তাহাতে শৃঙ্খলা, নিয়ম বা যত্ন চেষ্টা কিছুই নাই। বাস্তবিক ইহাকে ফলের চাষ বলা যায় না। ব্যবসা দূরে থাক্,—নিজেদের প্রয়োজনও তাহাতে সঙ্কুলান হয় না।

বাংলার মাটী এবং জলবায়ুর অবস্থা নানা প্রকার ফল চাষের অনুকূল। নারিকেল, কলা, আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল, আমারস, কাগজী নেবু, পাতি নেবু, বাতাবি নেবু, সরবতী নেবু, পেঁপে, বেল, লিচু, আতা, ডালিম, জামরুল, তাল, খেজুর, কুল, তেঁতুল, কামরাঙ্গা আঁশফল, শশা, তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড়, সুপারী, আমলকী, হরিতকী,—এই সব শত শত প্রকারের ফল বাংলাদেশে জন্মে। ইহাদের চাষের জন্য কোন প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র একটু গুছাইয়া সাজাইয়া গাছ লাগান এবং রীতিমত একটু যত্ন নেওয়া দেখা শুনা করা দরকার। গাছের এবং ফলের যে সকল ব্যাধির দরুণ ফসল ভাল হয় না; যে সকল কীট পতঙ্গের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হয়, সেই সব প্রতিকারের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত সার দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ অল্প চেষ্টাতেই বাংলাদেশে ফলের চাষ প্রচলন করা যায়।

জনসাধারণ উদ্যোগী হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলেও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের অভাবে তাহাদের চেষ্টা বিফল হইতে পারে। চা, পাট, কয়লা, চিনি, চাউল, গম প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর বাজারে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন, চাহিদা ও আমদানী রপ্তানীর একটা খবর পাইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্টের চেষ্টাতেই সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু ফলের উৎপাদন ও আমদানী রপ্তানীর কোন হিসাব বাংলা গভর্ণমেণ্টের হাতে নাই। বাংলাদেশের কি পরিমাণ জমিতে কোন্ ফলের চাষ হয়, বাংলার বাহিরে কি পরিমাণ ফলের চালান যায়; অথবা বিদেশ হইতে কোন্ ফল কি পরিমাণে বাংলাদেশে আমদানী হয়, গভর্ণমেণ্ট সেই সব বিবরণ সংগ্রহ করেন না। এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা কখনই ক্ষন্তব্য নহে। আমরা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে এমন সংবাদ সংগৃহীত হইতে দেখিয়াছি, যাহার কোন

প্রয়োজন নাই,—কোন মূল্য নাই। কিন্তু কৃষিজাত খাদ্য বস্তুর মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় যে ফল,—অন্যান্য দেশে যাহার ব্যবসায়ে কোটী কোটী টাকা খাটিতেছে,—সে বিষয়ে আমাদের গভর্ণমেণ্ট একেবারে নিশ্চেষ্ট,—নীরব!

ফলের ব্যবসা সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ করা এমন কঠিন কার্য্য কিছুই নহে। যিনি কৃষি বিভাগের মন্ত্রী হইয়া উচ্চাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর যদি একখানা ফতোয়া জারী করেন, তবেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। ইহাকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী জেলার নারিকেল সুপারী, দার্জ্জিলিং শ্রীহট্টের (শ্রীহট্টকে বাংলার মধ্যেই ধরিলাম) কমলা লেবু, মালদহ ও পশ্চিম বঙ্গের আম, পদ্মার চর ভূমিতে (গোয়ালন্দ) উৎপন্ন তরমুজ, ত্রিপুরার আনারস, আমলকী ও কাঁঠাল, ঢাকা ময়মনসিংহের কলা, (এখনও রামপালের দীঘির কলা বাংলাদেশে বিখ্যাত), ২৪ পরগণার লিচু, ফরিদপুরের পেয়ারা, এবং বাংলার সকল জেলায় অল্প বিস্তর উৎপন্ন লেবু, বেল, জাম প্রভৃতি নানাবিধ ফলের কেনা খরচা এখনও যেরূপ চলিতেছে, তাহা দেখিয়া বাংলাদেশের ফলের ব্যবসাকে কখনই ছোট বলা যায় না।

প্রাকৃতিক জল বায়ুর অবস্থার সহিত ফল শস্যাদির উৎপাদনের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যাঁহারা এবিষয়ের আলোচনা করেন, তাঁহারা বলেন, ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুই ফল উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক। শীতকালে বৃষ্টি (Moist Winter) এবং গ্রীষ্মকালে (Dry Summer) এই দুইটী অবস্থাই ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুর বিশেষত্ব। গ্রীস, ইতালীর দক্ষিণাংশ, ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল ভাগ, আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম, এই সকল ভূমধ্য সাগর তীরবর্ত্তী দেশে ঐ প্রকার জলবায়ু দেখা যায় বলিয়া উহার নাম ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু হইয়াছে। বাস্তবিক অন্যান্য দেশেও ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুর অবস্থা দৃষ্ট হয়,—যেমন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পশ্চিম উপকূল, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল, দক্ষিণ আমেরিকার এবং আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান। এইজন্যই ফ্রান্স, গ্রীস, কালিফোর্ণিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, মরক্কো ত্রিপোলী, কেপ্ কলোনী প্রভৃতি দেশের ফল পৃথিবীর বাজারে বিখ্যাত হইয়াছে। আমাদের বাংলাদেশে ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুর অবস্থা নাই;—মৌসুমী জলবায়ুই বাংলাদেশের বিশেষত্ব। সুতরাং সেই হিসাবে বাংলাদেশকে ফল উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র বলা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তে এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম দেখাইতেছে।

ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুর প্রদেশে পীচ আপেল, পিয়ার্স, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলই উৎপন্ন হয়, বাংলাদেশে এই সকল ফল নাই বটে, কিন্তু বাংলাদেশের আমের মত সুরসাল ফল পৃথিবীর আর কোন দেশে জন্মায় না। বাংলা দেশের কলা, নারিকেল, কমলা, জাম, লিচু পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের ফল অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে,—উৎপন্নও হয় প্রচুর। আমরা ফল বলিতেই কাশ্মীর কাবুলের আঙ্গুর বেদানার দিকে দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, বোম্বাই ও মাদ্রাজী আমের সঙ্গে টক্কর দিয়া আমাদের রসাল (কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত পল্লীগ্রাম) গোলাপ আম বাজারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার

করিয়াছে,—বারাসতের লিচুর কাছে মুজাফর-পুরের লিচু হার মানিয়াছে;—নাগপুরের কমলার উপর উঠিয়াছে দার্জ্জিলিং এর কমলা;—শ্রীহট্টের জল-ডুবা আনারসের কাছে সিঙ্গাপুরী পুরী আনারস দাঁড়াইতে পারে না;—গোয়ালন্দের তরমুজের মত এত বড় রস ভাণ্ডার লইয়া আর কোন ফল বাংলার বাজারে এখনো আসিতে পারে নাই;—নারিকেল ও বাংলার মর্ত্তমান কলা,—সেই বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মহীশূর, কূর্গ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টির দরুণ ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়। বাস্তবিক মাদ্রাজে প্রচুর পরিমাণেই ফল জন্মে। আমরা দেখিতেছি, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তথায় ফলের

চাষ ও ব্যবসার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। আমাদের বাংলা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এস্থলে কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোদুর নামক সহরে একটি প্রাদেশিক ফল প্রদর্শনী হয়। তাহার উদ্বোধন উৎসবে কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ মুনীস্বামী পীলাই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "এযাবৎ মাদ্রাজ প্রদেশে ফলের চাষ এবং ফলের ব্যবসার উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, জাতীয় আর্থিক সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে, এবং জাতীয় স্বাস্থ্য সম্পদ্ রক্ষা করিতে ফলের চাষ ও ব্যবসার উন্নতির জন্য আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলী আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী পরিষদের ইহা একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃষক চাষী ও গৃহস্থগণ ফল উৎপাদনে অধিকতর মনোযোগী হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। মাদ্রাজে মদ্যপান বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং যাহারা মদ্য প্রস্তুত করিত কিংবা মদ্য বিক্রয় করিত, তাহারা এক্ষণে ফলের চাষে মনোযোগী হইবার সুযোগ পাইবে এবং ফলের ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। এই প্রকারে একদিকে যেমন মদ্যপান বন্ধের চেষ্টা সফল হইবে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির একটী নূতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"জনসাধারণকে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যবান খাদ্য দেওয়া বর্ত্তমান সময়ে সকল গভর্ণমেণ্টেরই একটী প্রধান সমস্যা। খাদ্য-তত্ত্ব-বিশারদ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের গবেষণায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে নানাবিধ ফল মানুষের একটী বিশেষ পুষ্টিজনক খাদ্য। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ফল খাইলে অনেক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং শস্য উৎপাদন অপেক্ষা ফলের চাষ কম প্রয়োজনীয় নহে। মাদ্রাজে ফলের চাষের উপযোগী বহু বিস্তৃত জমি ও বাগান পড়িয়া রহিয়াছে। বাজারে ফলের চাহিদাও আছে। পুনশ্চ মাদ্রাজের উপকূলে কয়েকটী বন্দর থাকাতে জলপথে ফল রপ্তানী করিবার সুবিধারও অভাব নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে জাতীয় উন্নতির জন্য জনসাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি উত্থিত হউক,—"আরও ফল উৎপাদন কর এবং আরও ফল খাও"।

১৯৩৬—৩৭ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে ৭৩৪৮৩৫ বিঘা জমিতে আমের চাষ, ৩৯৮৩৩১ বিঘা জমিতে কলার চাষ, ৩৯০০০ বিঘা জমিতে কমলার চাষ, ২৫৫০০ বিঘা জমিতে নেবুর চাষ, ১৫০০ বিঘা জমিতে পিয়ার্স্ ফলের চাষ, ৯৯০ বিঘা জমিতে আনারস, ৭৫০ বিঘা জমিতে আঙ্গুর এবং এতদ্ব্যতীত আরও বহু বিস্তৃত জমিতে কাঁঠাল, পেয়ারা, তরমুজ, ডালিম প্রভৃতি ফলের চাষ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় মাদ্রাজে ১২ লক্ষ বিঘার কিঞ্চিৎ অধিক জমিতে ফলের চাষ হয়।

ফলের ব্যবসার হিসাবে দেখা যায়, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে ৪ লক্ষ মণ আম, ২ লক্ষ ৬ হাজার মণ কলা, ২০ হাজার মণ কমলা, ৯০০০ মণ পিয়ার্স্, রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী

হইয়াছে মধ্যপ্রদেশ ও কুর্গ হইতে এক লক্ষ ৩০ হাজার মণ কমলা, চমন এবং কোয়েটা হইতে ৭০০০ হাজার মণ আঙ্গুর, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান এবং উত্তর ভারত হইতে ১৩০০০ মণ আপেল।

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের এই হিসাব দেখিয়া আমাদের মনে হয় বাংলা গভর্ণমেণ্ট কি এইরূপ হিসাব তৈয়ারী করিতে পারেন না? এইখানেই আমরা কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাইতেছি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি কংগ্রেস-মন্ত্রি শাসিত প্রদেশে জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টায় নিত্য নূতন মতলব তৈয়ারী হইতেছে,—কিন্তু বাংলাদেশের মন্ত্রী সংসদ নীরব নিশ্চেষ্ট, জড় ভরতের মত রহিয়াছেন। আমরা মৎস্যের চাষ ও মৎস্যের ব্যবসা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই করেন নাই।

ফলের চাষের বিপুল ক্ষেত্র বাংলাদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। সামান্য মাত্র চেষ্টার অভাবে বাঙ্গালীর এত বড় জাতীয় সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মায়ের বন্দনা গান হইতে সকলে ভাবোচ্ছসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,—"সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" কিন্তু মায়ের সেই 'সুফলা' মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে কাহারও চেষ্টা নাই। বাংলাদেশে কত অসংখ্য প্রকারের সুরসাল ফল জন্মে, তাহার একটা তালিকা প্রথমেই দিয়াছি। উহার মধ্যে যে কোন একটা ধরিয়া ছোট বড় কারবার চলিতে পারে। বাংলার বেকার যুবকদের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ জনও যদি এই বিষয়ে উদ্যোগী হন, তবে বাংলায় ফলের ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারে। কৃষি বিভাগের মন্ত্রীও বাংলায় ফলের চাষের উন্নতি করিয়া বাস্তবিক "একটা কাজের মত কাজ" করিবেন।

ঋণ-সালিশী বোর্ড

সকলেই জানেন যে Bengal Agricultural Debtors' Act. (যাহা সাধারণতঃ B. A. D. Act বলিয়া সাধারণে পরিচিত) আমলে আসিবার পর হইতে বাংলাদেশে খাতক ও মহাজনের মধ্যে বহুকাল হইতে যে সম্বন্ধ ও ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ওই বোর্ডের ক্ষমতা কি এবং ইহারা কি কি কার্য্য করিবেন তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই মনে ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিয়াছে। এজন্য নিম্নে আমরা উহার চুম্বক বিবরণ প্রকাশ করিলাম :—

ঋণ-সালিশী আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিয়ম (Rules) প্রণয়ণ করিয়াছেন। সেই সকল নিয়মের মধ্যে "স্পেশ্যাল বোর্ডের" অর্থ কি তাহা বলা হইয়াছে। ঋণ-সালিশী আইনের ১৯ ধারার ১ উপধারার (বি) বা (খ) প্রকরণ, ২১ ধারা কিংবা ২২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ক্ষমতা পরিচালনা করিবার জন্য যে বোর্ড গঠিত হয়, তাহাই "স্পেশ্যাল বোর্ড" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ঐ সকল ধারার কি আছে তাহা আলোচনা করা যা'ক্।

১৯ ধারা

১৯ ধারার ১ উপধারার (বি) বা (খ) প্রকরণে **ঋণ মিটমাট** সম্বন্ধে বিধান আছে। যদি এমন হয় যে, মোট যে দেনা আছে, তাহার মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৪০৲ টাকা পরিমাণ পাওনাদার দেনাদারের সহিত মিটমাট করিতে রাজী আছে, বাকী পাওনাদার রাজি নহে এবং এইরূপ বাকী পাওনাদারের টাকার মধ্যে কোন দেনা মিটমাটের জন্য দেনাদার কোন প্রস্তাব করিতেছে, তাহা হইলে এই স্পেশ্যাল বোর্ড ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং যদি দেখেন যে, ঐ প্রস্তাব ন্যায্য এবং উহা পাওনাদারগণের গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে ঐ বোর্ড আদেশ দিবেন যে, ঐরূপ প্রস্তাব অনুসারে মিটমাট করিতে হইবে।

কিন্তু কোন্ প্রস্তাব ন্যায্য নহে তাহাও এই ধারায় বলা আছে। যেমন, যদি দেখা যায় যে, উপরোক্ত শতকরা ৪০৲ টাকা দেনা মিটমাটের যে সম্মতিজনক প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার তুলনায় দেনাদারের বাকী ঐ একই রকমের দেনা মিটমাটের প্রস্তাব সুবিধাজনক নহে, তাহা হইলে এই প্রস্তাব ন্যায্য বলিয়া বোর্ড বিবেচনা করিবেন না।

আর যদি দেখা যায় যে, চাষী-খাতক ঋণের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণ অনুসারে দেনার মূল্য আসল টাকা যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষাও টাকা কমাইবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে এবং সেই প্রস্তাবে শতকরা অন্ততঃ ৬০৲ টাকা পরিমাণ পাওনাদারগণ রাজী হইতেছেন না, তাহা হইলে ঐ প্রস্তাব বোর্ড ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন না।

এই মিটমাটের ধারা অনুসারে আরও কতকগুলি নিয়ম প্রণীত (rules) হইয়াছে। তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে।

৬৯ ধারা মতে প্রণীত নিয়ম

দেনাদারের জমিদারের যদি কোন খাজনা বাকি থাকে তাহার সম্বন্ধে যদি কোন মিটমাটের প্রস্তাব হয়, এবং তাহার দ্বারা উক্ত বাকি খাজনা সম্বন্ধে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, উক্ত মিটমাট সম্বন্ধে বোর্ড কিছুই লিখিবেন না এবং কোন পাওনাদার বা দেনাদারের অন্যায়রূপে অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উক্ত মিটমাট সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন না।

কোন মিটমাট বা দেনাদার কর্ত্তৃক মিটমাটের প্রস্তাব ন্যায্য কি না তাহা বিচার করিবার সময় বোর্ডে এইগুলি বিবেচনা করিবেন যথা—

বণ্ডে যে টাকা লওয়া লেখা আছে প্রকৃত পক্ষে তাহা অপেক্ষা কম লওয়া হইয়াছে কি না এবং ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় মহাজন আইনের বিধানগুলিও বিবেচনা করিবেন।

যদি ১৯ ধারা অনুসারে কোন দেনাদারের কতকগুলি দেনা মিটমাট হয় কিন্তু সমস্ত দেনা যদি মিটমাট না হয়, তাহা হইলে উক্ত মিটমাট-দেনা সম্বন্ধে রোয়দাদ স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য দেনা অর্থাৎ যে সকল দেনা মিটমাট হইল না সে গুলি সম্বন্ধে ১৭ ধারার ১ উপধারা মতে ডিসমিসের আদেশ দেওয়া চলিবে না।

অর্ডিনারী বোর্ড যদি দেখেন যে, কোন দেনা মিটমাট করিবার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সকল হইতেছে না কিংবা দেনাদারকে দেউলিয়া সাব্যস্ত করান আবশ্যক তাহা হইলে ৩৮ নিয়ম অনুসারে দেনাদারের দরখাস্ত স্পেশাল বোর্ডে পাঠাবার জন্য অর্ডিনারী বোর্ড কালেক্টারের নিকট রিপোর্ট পাঠাইতে পারেন। কালেক্টার যতক্ষণ না এই দরখাস্ত স্পেশাল বোর্ডে পাঠাইতে অগ্রাহ্য করেন, ততক্ষণ ১৭ ধারার ১ উপধারা অনুসারে অর্ডিনারী বোর্ড কোন রোয়দাদ বা ডিসমিসের আদেশ দিবেন না।

২৭ ধারা

এই ধারা মতে দেনাদারকে তাহার দেনা সম্বন্ধে **সার্টিফিকেট** দিবার ব্যবস্থা আছে। এই সার্টিফিকেট পাইলে দেনাদারের অনেক সুবিধা হয়, যথা—সার্টিফিকেটে লিখিত কোন দেনা সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে ডিক্রীদার খরচা পাইবে না বা ১৮ (২) ধারা মতে নির্দ্ধারিত আসলের উপর বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকার বেশী সুদ পাইবে না এবং মিটমাট দেনা বা রোয়দাদের লিখিত দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রী জারি হইতে পারিবে না, কিংবা যতদিন না ২৯ ধারার ৫ উপধারা মতে রোয়দাদ নষ্ট না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী হইতে পারিবে না। আর যেখানে কোন রোয়দাদ নাই, সেস্থলে সার্টিফিকেটের লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ডিক্রীজারি হইতে পারিবে না। এই সময় ১০ বৎসরের বেশী হইবে না।

কি অবস্থা হইলে এইরূপ সার্টিফিকেট পাওয়া যাইতে পারে তাহাই এখন বলা হইতেছে—

দেনাদার তাহার দেনা মিটমাট সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতেছে, কিন্তু পাওনাদার

তাহাতে সম্মত হইতেছে না আর বোর্ড যদি বিবেচনা করেন যে, উহা ন্যায্য প্রস্তাব এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে পাওনাদারের গ্রহণ করা উচিত তাহা হইলে স্পেশাল বোর্ড যে ঋণ সম্বন্ধে ঐ প্রস্তাব করা হইতেছে তজ্জন্য উপরোক্ত সার্টিফিকেট দিবেন।

২২ ধারা

দেউলিয়া দেনাদারের দেনা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এই ধারায় বিধান আছে।

স্পেশাল বোর্ড যখন **সন্তোষজনকরূপে** বুঝিবেন যে, কোন দেনাদারের দেনা ১৯ ধারা মতে কমাইলেও সে ২০ বৎসরের **মধ্যেও তাহা** পরিশোধ করিতে পারিবে না এবং সে এই ধারার সুযোগ পাইবার যোগ্য ব্যক্তি, সেস্থলে স্পেশাল বোর্ড দেনাদারের সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাকে লিখিত আদেশের দ্বারা **দেউলিয়া সাব্যস্ত** করিবেন। এবং নিম্নলিখিত দুই রকম ব্যবস্থার মধ্যে যে কোন রকম ব্যবস্থা করিতে পারিবেন—

(ক) তাহার দেনা এত কমাইতে পারিবেন যে, ২০ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবে। ইহা ঐ আদেশের মধ্যে লিখিত থাকিবে। কিংবা

(খ) স্পেশ্যাল বোর্ড যদি বিবেচনা করেন যে, উপরোক্ত (ক) দফা অনুসারে তাহার দেনার পরিমাণ কমান বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে যেভাবে তাহার দেনার জন্য দেওয়া হইবে তাহাও ঐ আদেশে নির্দ্দেশিত থাকিবে। এই দফায় আরও বলা আছে যে, এইরূপ আদেশ দিবার সময় এই ধারার (৪) প্রকরণ এবং ২৪ ধারার বিধান বজায় রাখিতে হইবে।

সুতরাং ৪ প্রকরণ এবং ২৪ ধারায় কি আছে তাহাও দেখিতে হইবে।

৪ প্রকরণে দেনাদারের ভরণ-পোষণের জন্য কি কি সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে না হইবে তাহা লিখিত আছে। বসত-বাটীর জমি বাদ দেওয়া হইবে, আর দেনাদারের নিজ দখলে অন্য যে সব জমি থাকিবে তাহার একতৃতীয়াংশের অনধিক জমি বাদ দেওয়া হইবে। তবে একটা কথা আছে যে, তাহার নিজ দখলে যদি ৩ একর (প্রায় ৯ বিঘা) জমির কম থাকে, তাহা হইলে ১ একরের অনধিক জমি বাদ রাখা হইবে।

কিন্তু জমিদারের বাকী খাজনার জন্য দেউলিয়া দেনাদারের কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বাদ যাইবে না।

এখন ২৪ **ধারার বিধানে** কি আছে দেখা যা'ক্—

এই ধারায় **দেউলিয়া দেনাদারের** কোন্ কোন্ সম্পত্তি বিক্রয় হইতে বাদ দেওয়া হইবে তাহারই উল্লেখ আছে।

২২ ধারার (১) প্রকরণ মতে কোন খাতক দেউলিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তাহার স্থাবর সম্পত্তির কতখানি বসত-বাটী বলিয়া ধরা হইবে তাহা বোর্ড স্থির করিয়া দিবেন।

২২ ধারার (২) প্রকরণ মতে এইরূপ বসত-বাটী বিক্রয় হইবে না এবং ২৮ ধারা অনুসারে বন্ধকের দেনা ব্যতীত অন্যান্য দেনার জন্যও উহা বিক্রয় হইবে না, এবং ৪২ ধারার ৫ প্রকরণ মতে যতক্ষণ না ডিসচার্য্যের (অব্যাহতির) সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, ততক্ষণ খাতক উহা বন্ধক, দায়বদ্ধ জমা বিলি বা কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

খাতক ২২ ধারার (১) প্রকরণ মতে দেউলিয়া সাব্যস্ত হইলে কি কি সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারিবে না তাহা বলা হইতেছে—

কতকগুলি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবে না বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার ভরণ-পোষণের জন্য নির্দ্ধারিত স্থাবর সম্পত্তি এবং উপরোক্ত বিধান অনুসারে তাহার বসতবাটী।

২৪ (১) ধারা মতে খাতকের বসত-বাটী নির্দ্ধারণ

খাতকের বসত-বাটী নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত করিবার ব্যবস্থা আছে, যথা—

(ক) বোর্ডকে স্থির করিতে হইবে, খাতকের সহিত তাহার পরিবারবর্গের কে কে বাস করে এবং ঐ স্থানে তাহাদের বাসের

ধারা সাধারণতঃ কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া তাহাদের কিরূপ জায়গার আবশ্যক তাহা দেখিতে হইবে। ১ একর (তিন বিঘা) জমি আছে এমন ধারা চাষীর অবস্থা অনুসারে ঐ সব বিবেচনা করা হইবে।

(খ) বোর্ডের একজন মেম্বার ঐ বসত-বাটী দেখিয়া আসিয়া রিপোর্ট করিবেন, তারপর বোর্ড স্থির করিবেন যে, দেউলিয়ার বসত-বাটীতে আবশ্যকীয় স্থান অপেক্ষা বেশী স্থান আছে কি না কিংবা আবশ্যকীয় জমি অপেক্ষা বেশী জমি উহাতে আছে কি না এবং যদি দেখা যায় যে বেশী স্থান বা বেশী জমি আছে তাহা হইলে বসত বাটী এবং গৃহাদির এমন একটা একলপ্তে সম্পত্তি পৃথক রাখিবেন যাহাতে উপযুক্ত বাস-স্থানের কুলান হয়।

(গ) এই একলপ্তে সম্পত্তির মধ্যে কি কি থাকিবে তাহাই এখন বলা হইতেছে। ইহার মধ্যে বিল্ডিংএর জায়গা ও পোঁতা এবং অন্যান্য জমি বা যাতায়াতের রাস্তা, যেগুলি ঐ বিল্ডিং ব্যবহারের জন্য আবশ্যক বলিয়া বোর্ড বিবেচনা করিবেন এবং পুষ্করিণী, ডোবা বা উহাদের কোন অংশ যাহা বোর্ড অবস্থানুসারে আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কিন্তু যতদূর সম্ভব বাগান জমি উহার অন্তর্গত হইবে না।

(ঘ) বোর্ড কোন সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে দেউলিয়া বা পাওনাদারের কোন আবশ্যকীয় নিবেদন বিবেচনা করিবেন।

(ঙ) বোর্ডের সিদ্ধান্ত লিখিত অর্ডারের মধ্যে থাকিবে। ইহাতে যে সম্পত্তি একলপ্তে রাখা হইল এবং উহার উপরিস্থিত বিল্ডিংএর বর্ণনা থাকিবে এবং উহা এই আইন অনুসারে দেউলিয়ার বসত বাটী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।

২৪ (৩) ধারা মতে দেউলিয়ার নিলামের অযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি

দেউলিয়ার নিম্নলিখিত অস্থাবর সম্পত্তি নিলামের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে—

(ক) আবশ্যকীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি, রাঁধিবার তৈজস-পত্রাদি, দেউলিয়া ও তাহার স্ত্রী ও পুত্রগণের তক্তাপোষ, খাট ও বিছানা-পত্রাদি এবং এমন সব অলঙ্কারাদি যাহা কোন স্ত্রীলোক ধর্ম্মপ্রথা অনুসারে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

(খ) এক জোড়া বলদ এবং এমন সব কৃষি-যন্ত্রাদি এবং এমন সব বীজ যাহা সার্টিফিকেট অফিসারের মতে দেউলিয়ার চাষীরূপে জীবিকার্জ্জনের জন্য আবশ্যক।

(গ) আগামী ফসল কাটিবার সময় পর্য্যন্ত দেউলিয়া ও তাহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য সার্টিফিকেট-অফিসার যে সকল কৃষি-ফসল আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাও নিলাম হইবে না।

পশু পালন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার বি এল

মহিষ

১। বঙ্গদেশের গরু খর্ব্বকায় ও দুর্ব্বল এবং গরু অপেক্ষা মহিষ অধিকতর সবল ও পরিশ্রমী। জল বায়ুও মহিষের পক্ষে অনেকটা অনুকূল; তজ্জন্য বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্যে মহিষের ব্যবহার অধিক প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে স্থানে জঙ্গল অধিক কিম্বা বিস্তীর্ণ বিলেজমি, তথায় মহিষ পোষার সুবিধা। দুগ্ধের জন্য গো ও মহিষ পালন করিলে তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। গরু অপেক্ষা মহিষ লাঙ্গল ও গাড়ী টানিতে অধিক কার্য্যক্ষম। মহিষ শীত বৃষ্টি সহ্য করে; লতা, পাতা, খড়, মোটাঘাস যাহা পায় তাহাই খায় এমন কি গোশালায় পাতিয়া দেওয়া খড় ইত্যাদি এবং ঘোড়ার নাদিও (পুরীষ দলা) খায়। মহিষের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণও অধিক। মহিষ রৌদ্রে ক্লান্ত হয় এবং জল ও শীত ভালবাসে; এবং জলের মধ্যে ডুব দিয়া দীর্ঘকাল থাকিতে পারে; কুম্ভীরও ইহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। জঙ্গলে ব্যাঘ্রও মহিষকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না, কারণ দুইটি মহিষ একত্র হইলে একটী ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া দিতে পারে। দিল্লীর মহিষ উৎকৃষ্ট। দুই একটী পুং মহিষ অত্যন্ত কোপণ স্বভাব; শুভ্র কি লাল কাপড় কিংবা ছাতা দেখিলে সক্রোধে ধাবমান হয়; তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করাই শ্রেয়। এখন বঙ্গদেশে জঙ্গলা মহিষ নাই।

২। তিন বৎসর বয়সে মেদী মহিষ প্রথম শাবক প্রসব করে। তৎপর দুই কি তিন বৎসর অন্তর এক এক বার শাবক প্রসব করতঃ মোটের উপর ৬টী শাবক দেয়। কখন কখন প্রতি বৎসরও শাবক প্রসব করে। ইহার গর্ভধারণ কাল ৩১৫ হইতে ৩৫০ দিন। প্রথম দুই বৎসর দৈনিক ৬ হইতে ১২ সের দুধ দেয়। তৃতীয় বৎসর যখন প্রসব করে তখন দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হয় এবং প্রসবের দুই মাস পূর্ব্বে এককালীন দুগ্ধ বন্ধ হয়।

দুগ্ধবতী মহিষীকে কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ভূষি, খড় ইত্যাদি ১০ সের সঙ্গে ২।৩ সের খইল খাইতে দিবে এবং তদ্ব্যতীত মাঠে কি জঙ্গলে চরাইবে এবং বর্ষাকালে গমের কুঁড়া ও খইল কিংবা গম, যব, বুট ৪ সের করিয়া প্রাতে ও বৈকালে খাইতে দিবে। গোদুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ ও মাখনের ভাগ অধিক।

৩। **অধিক দুগ্ধপ্রদা মহিষীর লক্ষণ**—শরীরের অগ্রভাগ অপেক্ষা পশ্চাৎ ভাগ অধিকতর গুরু ; চর্ম্ম পাতলা, মসৃণ ও চক্‌চকে ; লোম সরু ; তলপেট ও ওলান বড় ; পায়ের হাড় সরু।

৪। **পরিশ্রমী মহিষের লক্ষণ**—সুঠাম, মাংসল ও পিপার আকার বিশিষ্ট ; শরীরের পশ্চাৎ ভাগ অপেক্ষা সম্মুখের ভাগ গুরু ; চারিটী পা সোজা ও সুদৃঢ় হাড় বিশিষ্ট।

৫। **মেদী মহিষের ও পুং মহিষের বয়স নির্ণয়**—শৃঙ্গে চক্রাকার যতগুলি চিহ্ন জন্মে তাহার সংখ্যা দ্বারা মেদী মহিষের বয়স জানা যায়। ৩ বৎসর বয়স পর শৃঙ্গের ঐ চক্রাকার প্রত্যেকটী চিহ্নে এক এক বৎসর গণনা করিতে হয়। সুতরাং চক্রাকার চিহ্ন সংখ্যায় ৩ যোগ করিলেই মেদী মহিষের বয়স জানা যায়। পুং মহিষের বয়স দন্ত পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়। দুই বৎসর বয়সে, তাহাদের অস্থায়ী দন্তের প্রথম যোড়া পড়িয়া যায় এবং

পাঁচ বৎসর বয়সে তাহাদের সমস্তগুলি স্থায়ী দন্ত উঠে। দ্বিতীয় বৎসর বয়সের পর, প্রতি বৎসর এক এক যোড়া অস্থায়ী দন্ত পড়িয়া যায় ও তাহাদের স্থানে এক যোড়া করিয়া স্থায়ী দন্ত উঠে।

৬। **পীড়া**—গরু অপেক্ষা মহিষেব কৃমি রোগ অধিক দেখা যায়; অন্যান্য রোগ গরুরও যেরূপ মহিষেরও প্রায় তদ্রূপ।

মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, অনবরত তরলমল ত্যাগ, অসুস্থতা, কখন কখন মলের সঙ্গে কৃমি নির্গমন, প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা ঐ বোগ নির্ণয় করিতে হয়। নিম্নোক্ত কৃমিনাশক ও বিরেচক ঔষধটী উপকাবক:—

খাদ্য লবণ একপোয়া, টাটকা হলুদ দেড় পোয়া, রসুন আধ পোয়া, পুরাতন মাতগুড় আধ সের, একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই মাত্রা করতঃ একমাত্রা প্রাতে ও একমাত্রা বৈকালে খাওয়াইবে। ৩।৪ দিন ঐরূপ ঐ ঔষধ খাইতে দিবে; ঐ ঔষধ যে কয়দিন সেবন করান যায় সেই কয়েক দিন অল্প মাত্রায় জল পান করিতে দিয়া কেবল শুষ্ক ভূষি খাইতে দিবে।

ছাগ

১। ছাগ প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের পাতাই খায়। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সকল সময়েই ছাগ খোলাস্থানে থাকিতে পারে। পাঁঠা, খাসী, ও ছাগীর মূল্য অধিক, অথচ প্রতিপালন ব্যয় সামান্য; তজ্জন্য ছাগ পালনও লাভজনক কার্য্য।

২। গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগ-দুগ্ধ উৎকৃষ্ট; ইহাতে মাখন, ছানা ও শর্করার ভাগ অধিক। রোগী ও শিশুগণ, ছাগ-দুগ্ধ সহজে জীর্ণ করিতে পারে। যক্ষা কাশি রোগীর পক্ষে ছাগ-দুগ্ধ ব্যবস্থা। গো-দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে না ফুটাইয়া খাওয়া নিরাপদ নয়, কারণ তাহাতে গাভীর কাশ, বসন্ত ইত্যাদি রোগ মনুষ্যে সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা; কিন্তু ছাগীর ঐ সকল রোগ হয় না বলিয়া তাহার বানোষ্ণ দুগ্ধ অধিকতর হিতকব। বোধ হয় ছাগী যে সকল লতাপাতা তৃণ ভক্ষণ করে সেই সকলে ছাগ দুগ্ধকে পাঁচনের গুণ যুক্ত কবে। যে ছাগীর দুধ হয় তাহাকে প্রত্যহ লতাপাতা খাদ্য ব্যতীত আধ সের ছোলা কি কলাই খাইতে দিবে।

৩। এ্যাঙ্গোরা জাতীয় ছাগ, দুগ্ধের পক্ষে উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। ইহার লোমও রেশমের ন্যায় কোমল এবং প্রত্যেকটায় বার্ষিক যে লোম প্রদান করে তদ্বারা তাহার প্রতিপালন
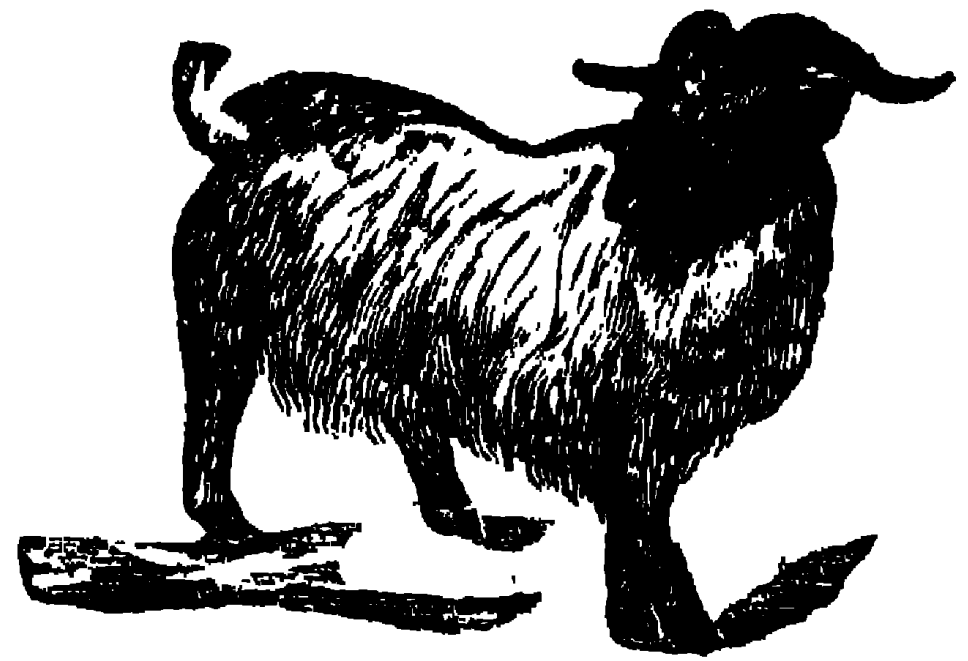
এ্যাঙ্গোরা জাতীয় ছাগল

ব্যয় অনেক পরিমাণ সংগ্রহ হয়। কিন্তু এই জাতীয় ছাগ এদেশের জলবায়ুর উপযোগী নয়, তজ্জন্য বিহার প্রদেশের "যমুনাপাড়ি" ছাগই বঙ্গদেশের পক্ষে ভাল। 'টার্কিশগোট' বা "রাম ছাগল" এই শ্রেণীর, অধিক দুধ দেয় ও আকারে বড়।

ছাগী ১৪৮ হইতে ১৫৬ দিন গর্ভধারণ করিয়া একবারে এক হইতে দুইটী কখনও বা তিনটী শাবক প্রসব করে। কামধেনুর ন্যায়, কোনও

কোনও ছাগীর শাবক হয় না, অথচ দোহন করিলে অল্প অল্প পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়।

গর্দ্দভ

এদেশে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহণের প্রথা নাই, রজকগণ নির্দ্দয় ভাবে তাহার পৃষ্ঠে কাপড়ের গুরুভার চাপাইয়া বহন করায়। গর্দ্দভের বসন্ত রোগ হয়না বলিয়া এদেশে প্রবাদ আছে, কিম্বা গর্দ্দভ, শীতলার বাহন এই কারণেই হউক গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বলিয়া লোকের ধারণা। গর্দ্দভীর দুগ্ধ, প্রায় মাতৃস্তনের সমগুণ বিশিষ্ট বিধায় সদ্য প্রসূতি মাতৃহীন শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ, যক্ষ্মারোগীর জন্য ছাগ-দুগ্ধ যেরূপ সাধারণতঃ বিশেষভাবে পথ্য ব্যবস্থা করেন, বিলাতেও চিকিৎসকগণ, ঐ রোগে তদ্রূপ গর্দ্দভীর দুগ্ধ বিশেষরূপ ব্যবস্থা করেন। গর্দ্দভী দোহনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক কারণ ইহা দোহনকারীকে কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে পারে।
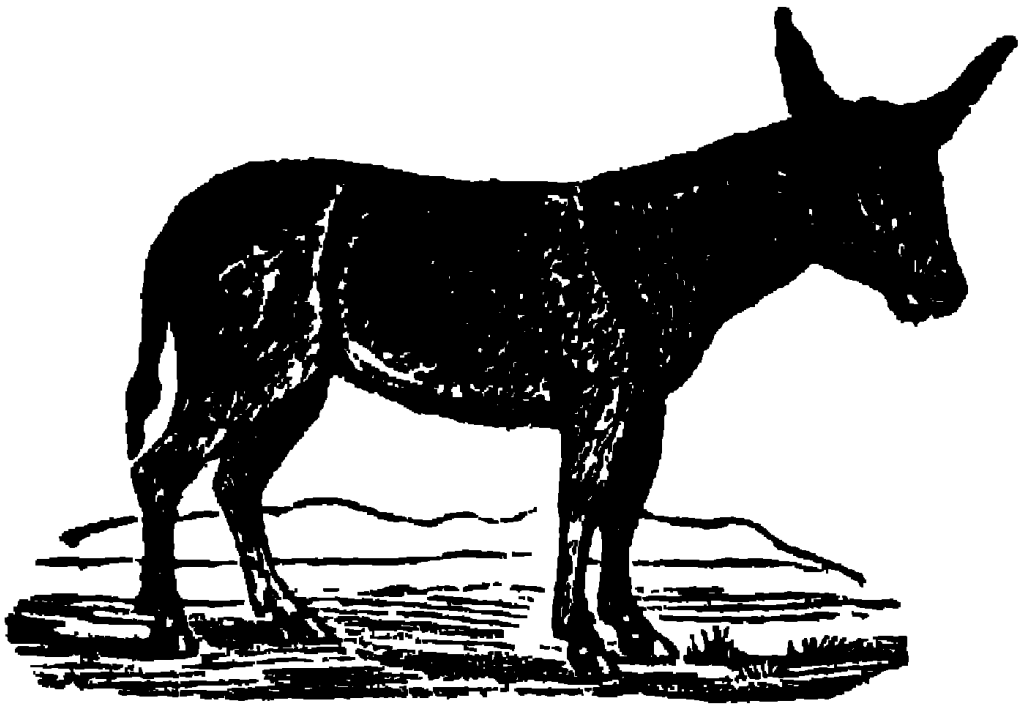
মেষ

১। এদেশেও লোমের জন্য ও খাদ্য মাংসের জন্য অল্প পরিমাণে মেষ পালন করিতে দেখা যায়। মেষের লোমে কম্বল হয়।

২। জাপানে একজন ডাক্তার এরূপ একটী তরল পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন যে তাহা মেষের

শরীরে প্রত্যেক দুই দিবস ইঞ্জেক্‌ট (inject সূক্ষ্ম সূচবৎ পিচকারীর দ্বারা রক্ত মধ্যে প্রবিষ্ট করা) করিলে, মেষের লোম শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়; দুইমাস কাল এইরূপ "ইঞ্জেকশান" (injection) দেওয়ায়, ১২ মাসে সাধারণতঃ মেষ লোম যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত তাহাতে এক বৎসরে ২।৩ বার (wool) ছাঁটা যায়।
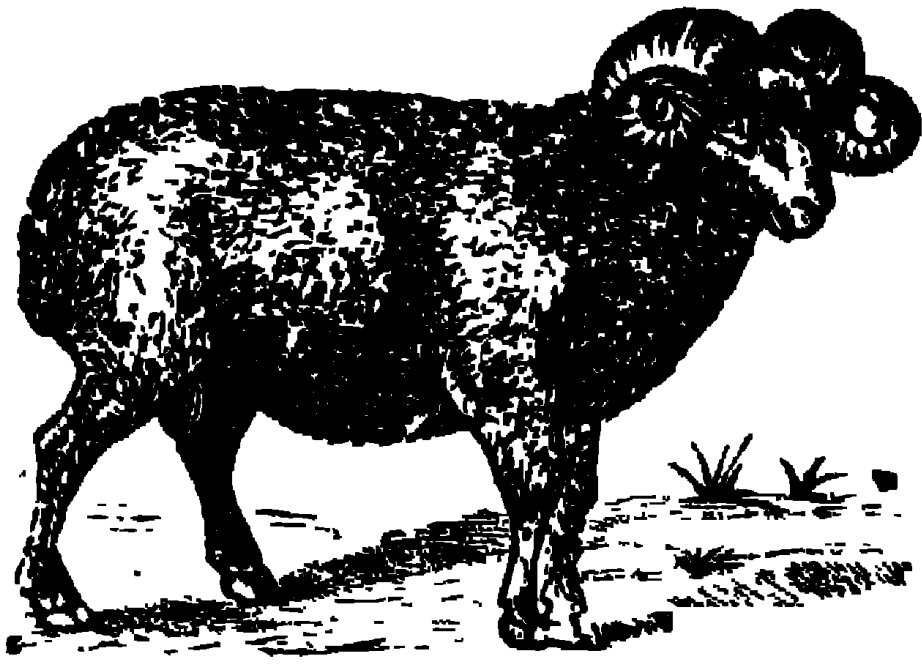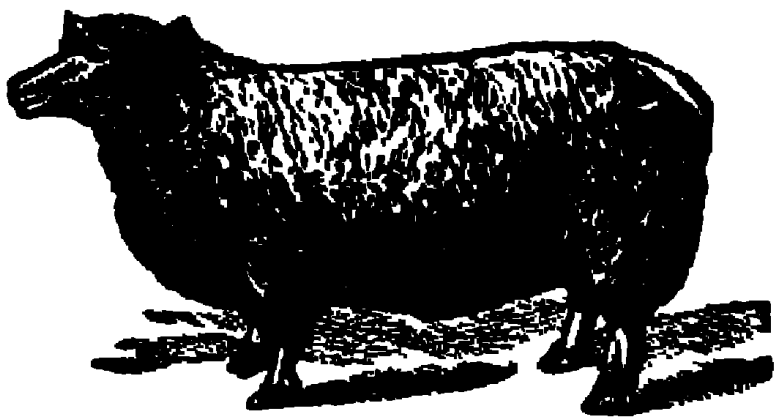
৩। একটী মেষের মাংসগ্রন্থি (gland গ্ল্যাণ্ড) অন্য একটী মেষের শরীরে আরোপিত করায় শেষোক্ত মেষের লোম ১০ ইঞ্চ দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে।

গাভী

গরু, পূর্ব্বকালে ধনশ্রেণী ভুক্ত থাকায় গো-ধন বলিয়া অভিহিত হইত। গাভী গো-ধন প্রসবা এবং তাহার দুগ্ধ শিশু ও বৃদ্ধের খাদ্য, রোগীর পথ্য, বিধায় প্রাচীন হিন্দুগণ গাভীকে মাতা ভগবতী আখ্যা প্রদান করেন। বস্তুত দুগ্ধ একটী আদর্শ খাদ্য জ্ঞানে পাশ্চাত্য সভ্য জাতিগণ, "ডেয়ারীকে (Dairy বা গব্যগৃহ) যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন এবং গাভীকে যেরূপ যত্ন করেন, তাহাতে হিন্দুদের শালগ্রাম শিলার গৃহের পবিত্রতার ও দেবী ভগবতীর প্রতি ভক্তির কথা মনে উদয় হয়। পূর্ব্বে এদেশে রাজাদেরও গো-ধন ছিল; মহাভারতের উত্তর গোগৃহ হইতে গো-ধন হরণ, মিথিলাধিপতি জনকের গো-ধন, ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের গাভীবংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। বশিষ্ট মুনির শবলা নাম্নী এক কামধেনু ছিল; তিনি যাহা পাইতে ইচ্ছা করিতেন, শবলা তাঁহাকে তাহাই দিত। সকল মুনিই দুগ্ধার্থ গাভী পালন ও গো-সেবা করিতেন। বস্তুত উৎকৃষ্ট জাতীয়া গাভীমাত্রই কামধেনু স্বরূপ। গব্য দ্রব্য সকল উপাদেয় খাদ্যের প্রধান উপকরণ। খরিদা দুগ্ধ নানা পীড়ার আশঙ্কা জনক থাকা জানিয়াও লোকে গাভী পালনে মনযোগ না দেওয়া বড় দুঃখের বিষয়। গো-রাখাল বলিলে লোকে, এখন নির্ব্বোধ অকর্ম্মণ্য লোক বুঝে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে ব্রজরাখালগণসহ বৃন্দাবনের বনে বনে ধেনু চরাইতেন; বাঁশীর সুমধুর রবে, সকলকে মুগ্ধ করিতেন, কংসরাজকে বধ করেন, এবং পরে মথুরার রাজা হন। তজ্জন্য তাঁহাকে যেরূপ "রাখাল রাজা" আখ্যা প্রদান করা যায়, প্রাচীন কালের ইহুদী নরপতি ডেভিডকে "রাখাল রাজা" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে; তিনিও বাল্যকালে পাহাড় জঙ্গলে মেষ চড়াইতেন, বীনা বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন; তাঁহার ভাবী শ্বশুর, ইহুদীদের প্রথম রাজা, সলের মস্তিষ্ক বিকৃতি তাঁহার বীণা বাদন শ্রবণে দূর হয়, তিনিও বাল্যে অতিকায় ফিলিষ্টিন বীর গোলিয়াথকে বধ করেন এবং তৎপরে সলের সিংহাসনে বসেন। দীলিপ রাজা, বশিষ্টের শবলা কামধেনুর রাখালি করিয়া পুত্র অজকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই সকল মনে করিলে গো-রাখাল হইয়া গো-সেবা করিতে নিন্দনীয় কিছুই নাই। প্রকৃত সভ্যতা পবিত্র নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী। এখন শীত প্রধান দেশের বৈজ্ঞানিকগণও, হিন্দু নিরামিষ-ভোজীদের ন্যায় শাক সব্জী ফল মূল ও দুগ্ধের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য দুগ্ধ, নিরামিষভোজীদের একটী প্রধান খাদ্য।

ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—১২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা

ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান—
ঃ স্বর্গীয় দেশপ্রিয় ঃ
যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত

চেয়ারম্যান
বোর্ড অব্ ডিরেক্টারস্
বঙ্গীয় আইন সভার ভূতপূর্ব্ব
—সভাপতি—
সন্তোষের মাননীয় মহারাজা
স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী
কে, টী, এম্, এল্, সি

●●●●.●●●●.●●●●

কৃতী কর্ম্মদক্ষ ও বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের
—জন্য—
হাউসিং স্কীমের
সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে

ম্যানেজিং এজেন্টস্—
মেসার্স আর, আর, দাস এণ্ড কোং লিঃ
(নিম্নলিখিত ব্যবসাক্ষেত্রে কৃতী ও ধনকুবেরগণ দ্বারা সংগঠিত)

১। ভাগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও ধনকুবের, প্রেমচাঁদ জুট-মিলস লিঃ এর ম্যানেজিং এজেন্টস্ রাজা জানকীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদার্সের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী, এবং ট্রাইটন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টার,—

কুমার রমেন্দ্র নাথ রায়

২। ঢাকার প্রথিতযশা জমিদার ও ধনকুবের, বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ, ইষ্টবেঙ্গল সুগার মিল্স্ লিঃ, ও কলিকাতা পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এর ম্যানেজিং এজেণ্ট ও ডিরেক্টার

শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস

৩। ভাগ্যকুলের প্রথিতযশা জমিদার, ব্যাঙ্কার ও ব্যবসা-বিশেষজ্ঞ, কলিকাতা পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এর ডিরেক্টার

শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায়

৪। পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত মার্চেন্ট প্রিন্স মেসার্স যতীন্দ্র কুমার দাস ফার্ম্মের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী, জমিদার ও ব্যাঙ্কার

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দাস

৫। বীমা বিশেষজ্ঞ, নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা, লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ ইনসিওরেন্স কোং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ কে, বি, রায়, বি, এস, সি; আর, এ; এ, সি, আই, আই (লণ্ডন), এ, এস, এ,এ, (লণ্ডন), ইন্‌কর্পোরেটেড্ একাউণ্ট্যাণ্ট এণ্ড অডিটর

মেসার্স
আর আর দাস এণ্ড কোং লিঃএর
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ এন্, কে, রায়

ভাগ্যকুলের খ্যাতনামা জমিদার ও ব্যাঙ্কার, ডিরেক্টার ইষ্টবেঙ্গল সুগার মিল্স্ লিঃ

সর্ব্বত্র বিশিষ্ট প্রতিনিধি ও অর্গানাইজার আবশ্যক

বীমাকারীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার
ব্যাঙ্কিং এবং জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী-সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

প্রেরক—শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"Culture"—ওয়ারি, ঢাকা

সাচ্চা গুড় আঁধারে মিঠা।

*

ছাল নাই, কুত্তার নাম বাঘা

*

পোঁদে নাই চাম,
রাধা কৃষ্ণের নাম।

*

পোঁদে না আটে,
খাব্‌লা খাব্‌লা বাটে।

*

দিনের বেলা হরি হরি,
রাতের বেলা চুরি করি।

*

পরের লেগে কুয়া খোড়ে
সেই কুয়ায় আপনি পড়ে।

*

সাজে গোজে দত্তের ঝি!

*

আপন হাত জগন্নাথ

*

পরের ধনে পোদ্দারী

*

দিন যায় কথা থাকে

*

নিম তিতা নিসিন্দা তিতা
তিতা মাকাল ফল,
তাহার চেয়ে অধিক তিতা
বোন সতীনের ঘর।

*

আপনা শ্বাশুড়ী সেলাম পায় না
খুড়াই শ্বাশুড়ী পা বাড়ায়।

*

পাপে বাপেরেও ছাড়েনা।

*

বাপের নাম নাই দাদার নাম নাই
ট্যাস্ গোপালের নাতি।

*

পেটের আপদ মুড়ি
ঘরের আপদ শুঁড়ি।

*

পয়সা দিয়ে কিনলাম দই
গোয়ালনি আমার কিসের সই

*

কানা খোঁড়া ভেঙ্গুড়
হারাম জাদার লেঙ্গুর।

*

আপনার চেয়ে পর ভাল
পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল।

*

তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে

*

আহাম্মকের গু তিনখানে।

*

কপাইলার কপাল থেকে বাইজা গু আসে

*

জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা।

*

তাস পাশা সর্ব্বনাশা

*

লুঠের আগ, মারের পাছ

*

ঝি নষ্ট ঘাটে পুত নষ্ট হাটে।

*

অতি তাতে ঘি নষ্ট
বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।

*

আগে গেলে বাঘে খায়
পাছে গেলে সোনা পায়

*

মাছের মা শাকের ছা

*

কচি পাঠা বৃদ্ধ মেষ
দধির অগ্র ঘোলের শেষ

*

বৌ রাড়ি ঝি রাড়ি,
তিন রাড়ি-এ করলাম এক হাড়ি

*

গোলে মালে হরিবল

*

কুল হারালে কাশ্যপ
জাত হারালে বৈষ্ণব

*

গাছে উঠিয়ে মই সরানো

*

একে নিদ্রা দু'য়ে পাঠ,
তিনে বাজার চারে হাট

*

টাকার নাম বাবু
যেদিকে যায় সেদিকে করে কাবু

*

পৃথিবী টা———কার বশ

*

শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাবে তাই সয়

*

টাকা দিবে শরতে
মজা করবে ভরতে

*

নেচে মরে নরসিংহ
চৈতা চিড়া খায়

*

অসৎ মাগীর ঘোমটা বড়

*

অসৎ মাগীর ন-শত বুদ্ধি

*

আমার বাপের গাই ছুটলো
খাইলো রামার ক্ষেতের কলই
ছ্যাড়াইতে ছ্যাড়াইতে মরলো
রাম গোবিন্দ'র বাপের তালই।

*

অসৎ লোকের বিপরীত বুদ্ধি।

*

চোরের দশদিন সাধুর একদিন।

*

ঘরে বসে রাবা গোনা।

*

চালে হাগলে পাতিলে পড়ে

*

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি
ঘরে বসে পুছে বাত
তার কপালে নাই ভাত।

*

কামারে জানে লোহার মর্ম্ম।

*

চাড়ালে জানে কি কর্পূরের মর্ম্ম?

*

কার্য্য কালে ফারসি,
রাত্রি বেলা তেড়ছি,
ভোজন কালে রাত কর্ম্ম,—
—আহাম্মকের তিন কর্ম্ম।

*

শিখেছো কোথায়?
—ঠেকেছি যেথায়।

*

খায় লয় 'ভুস্কি'
নাম পড়ে 'চিমটি'র

*

টাকা থাকলে তালইর বাপের শ্রাদ্ধ
হয়, টাকা না থাকলে আপনার বাপের
শ্রাদ্ধ হয় না।

*

মুখে মধু বুকে বিষ।

*

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা

*

মাঘে তেল—ফাল্গুনে বেল
এ কর্ম্ম যে না করে, তার জন্মই বৃথা গেল।

*

দিদিমার কথাখানি
মধুরসের বাণী
নীচ দিয়া গাছ কাটে
উপরে ঢালে পানি।

*

বুড়া হলেও সান্নিকের জোর যায় না।

*

আবাখি কাটালের মুড়িটা বড়

*

নাঠা কাঠালের আঠা বেশী।

*

নাকের উদ্দেশ নাই
পোঁটার পটাপটি

*

এখান থেকে মারলাম ঢিল
লাগলো কলা গাছে
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে
চোখ গেলরে বাবা।

*

জানলে বৈরাগী হত কোন শালা
মালা জপতে হয় তিন বেলা
হায় জালা।

*

কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।

*

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

গত ১০ই জুলাই খুলনাতে ন্যাশন্যাল মার্কেন্টাইল ইন্‌স্যুর্যান্স কোম্পানীর একটী ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। খুলনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনজজ্‌ মিঃ এস্‌ সেন আই সি এস্‌ মহোদয় ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

কলিকাতায় সম্প্রতি একটী "ইন্‌স্যুর্যান্স য়্যাকাডেমী" স্থাপন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। বীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে গত ১৭ই জুন বেঙ্গল ইন্‌স্যুর্যান্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানীর আফিস গৃহে এক সভা করেন। পুনরায় ১৮ই জুলাই তারিখে ন্যাশন্যাল ইন্‌স্যুর্যান্স কোম্পানীর আফিসে তাঁহাদের আর এক সভা হয়। তাহাতে প্রস্তাবিত ইন্‌স্যুর্যান্স একাডেমীর উদ্দেশ্য এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়;—(১) সাহিত্য, শিক্ষা, সম্মেলন, ক্রীড়া প্রভৃতিব মধ্য দিয়া সর্ব্বপ্রকাব বীমা কর্ম্মীদের পরস্পব সংযোগ স্থাপন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা (২) বীমা সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তিকার প্রচাব (৩) বীমা বিজ্ঞান বিষয়ে সভা, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন। মেম্বার গণের বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা বার্ষিক ১॥০ টাকা চাঁদা দিয়া য়্যাসোসিয়েট মেম্বার হইতে পারেন।

সাধারণতঃ আমরা এবিষয়ে কিছু বলিতাম না, কিন্তু দেখিতেছি বাংলাদেশে Schism বা সাম্প্রদায়িকতা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতায় Indian Insurance Institute নামক একটী প্রতিষ্ঠান আজ আট বৎসর যাবত স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশস্থ বীমা কোম্পানী এবং কর্ম্মীদিগের ইহাই প্রতিনিধি স্থানীয়

একমাত্র প্রতিষ্ঠান; ইহার নিয়মকানুন এবং কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে আমাদিগের মতে নানারূপ অসামঞ্জস্য ও গলদ আছে, তাহা আমরা জানি এবং অনেকবার কর্ত্তৃপক্ষীয়দের গোচরেও তাহা আনিয়াছি। দুঃখের বিষয় তাহার কোন প্রতিকার আজিও হয় নাই; যদি আমাদিগের ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্য হইবার অধিকার থাকিত তবে আমরা অন্যান্য সভ্যদিগের নিকট এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করিতাম এবং ঐ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিবারও প্রয়াস পাইতাম। যাহাদিগের মধ্যে দলাদলির ভাব নাই তাহারা এইভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলির সকল দোষ-দূরকরতঃ তাহাদিগকে ক্রমে শক্তিশালী করিয়া তোলে। কিন্তু যে হেতু আমার মতমতো কাজ হইতেছে না, সুতরাং আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সভা স্থাপন কর, এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যাহারা কাজ করে তাহারা গড়া জিনিষ ভাঙ্গিবার উৎসাহে এবং উত্তেজনায় মাতিতে পারে বটে কিন্তু নিজেরা কিছুই গড়িতে পারে না। কারণ তাহাদের এই মনোবৃত্তির মধ্যেই autocracy বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানের সভ্যদিগের মত পরিবর্ত্তন করানোর আয়াস স্বীকার করিব না, অথচ তাহারা আমার মত গ্রহণীয় বলিয়া মনে করে না; সুতরাং বাংলাদেশে সব চেয়ে সহজ মনোবৃত্তিই হইতেছে একটা rival institution বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা—তা সে বুদ্বুদ যতক্ষণই ভাসিয়া বেড়াক না কেন।

এ সেই দেশ, যেখানে সাহিত্য পরিষদের মত একটা প্রতিষ্ঠানে মোড়লী করিতে না পারায় ধনমদগর্বে শোভাবাজারের পরলোকগত রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব হিতবাদীর কাব্য বিশারদ মহাশয়ের সহায়তায় "সাহিত্য সভা" নামক একটী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ধাষ্টামো করিয়াছিলেন। এ সেই দেশ, যেখানে প্রবহমানা কালীগঙ্গার মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়া লোকে ঘাটে ঘাটে গঙ্গা বাঁধিয়াছিল এবং বোসের বাড়ীর গঙ্গা, ঘোষের বাড়ীর গঙ্গা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল, তথাপি সকলে মিলিয়া একত্রে কালীগঙ্গার জলে অবগাহন করার আনন্দ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়াছিল। যে দেশে সকলে মিলিয়া একত্রে গঙ্গায় অবগাহন করার আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া ঘাটে ঘাটে গঙ্গা বাঁধিয়াছিল, সে দেশে কথায় কথায় সকল বিষয়েই rival institution স্থাপন করার বিপুল উৎসাহ এবং উত্তেজনা দেখিলে আমাদের কিছুই বিস্ময় লাগে না। কিন্তু ইহাতে যে জাতির কতটা শক্তির অপচয় হয় এবং পরস্পরের মধ্যে অকারণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় তাহা আমরা খতাইয়া দেখার অবসর পাই না। এই ভাঙ্গাগড়া এবং দলাদলির ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে খুব প্রীতি এবং বন্ধুত্বের ভাব গজাইবার সম্ভাবনা আছে কি? অথচ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থাকিয়া যুক্তি এবং ন্যায়ের পথ ধরিয়া অধিকাংশ সভ্যকে নিজ মতানুবর্ত্তী করিয়া নিলে প্রতিষ্ঠানটী ক্রমে গলদ শূন্য হইয়া শক্তিশালী হইতে পারে। এইজন্য আমাদের মনে হয় Indian Insurance Institute এর ন্যায় আট বৎসরের একটী প্রভাব প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকিতে আবার নূতন করিয়া একটী Insurance Academy গঠন করিবার পরিকল্পনা শুধু অনাবশ্যক নহে পরন্তু সমূহ অনিষ্টকর আয়োজন। তারপর

Insurance Institute ছাড়া এজেণ্টদের নিজস্ব Field Workers Association নামক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আছে। ইহার আবশ্যকতা আছে এইজন্য, যে বীমা কোম্পানীর এজেণ্টদিগের কোম্পানীর বিরুদ্ধে অনেক সময় নানারূপ অভাব অভিযোগাদি থাকে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন আলোচনাদি চালাইতে পারিলে এই সকল অভাব অভিযোগাদির প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও নানারূপ গঠন মূলক কার্য্যের প্রয়োজন আছে। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে এজেণ্টদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে বোঝা যায়।

তাহা ছাড়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আর একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আছে কারণ তাঁহাদের স্বার্থাদি সাধারণ বীমা কোম্পানী হইতে পৃথক।

এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে সত্য, কিন্তু যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া Indian Insurance Institute স্থাপিত হইয়াছে এবং আজ আট বৎসর কাল পরিচালিত হইতেছে সেই সকল উদ্দেশ্য লইয়াই আবার একটা Insurance Academy স্থাপন করিবার হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

উদ্যোক্তারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যাদির যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাব মধ্যে একটী প্রধান করণীয় কাজ স্থির হইয়াছে বীমা সম্বন্ধীয় একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার। বাংলাদেশে যতই হাজার হাজার বেকার বাহিনীর সৃষ্টি হইতেছে এবং অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে শিক্ষিত যুবকেরা আত্মহত্যা করিতেছে ততই বাঙ্গালীরা অবাঙ্গালীদিগের প্রতিযোগীতায় আর কোনও ব্যবসা বাণিজ্যে

উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া কেবল গণ্ডায় গণ্ডায় কাগজ প্রসব করিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ভাবে এই যে কোনও রকম করিয়া একখানা কাগজ,—তা' সে দৈনিক, মাসিক বা সাময়িক যাহাই হউক না কেন, বাহির করিতে পারিলেই বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রাহক হইবে এবং তাহাদের সকল অভাব অনটন মিটিয়া যাইবে। কিন্তু প্রায় সব কাগজ ওয়ালাদের ভাগ্যেই "পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে"।

পরিকল্পিত ইন্‌সিওরেন্স একাডেমীর প্রস্তাবিত কাগজ অবশ্যই বাংলা ভাষায় বাহির হইবে না কারণ উহা আমাদের মাতৃভাষা এবং ঐ ভাষায় কাগজ বাহির করিলে অনেকের জাত্ মান যায়। ইংরাজীতে আবার একখানি বীমার কাগজ এই কলিকাতা সহর হইতে বাহির করিবার বাস্তবিকই কি একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে? আমরা দেখিতেছি এই কলিকাতা সহর হইতেই ইংরাজী ভাষায় শত্রুর মুখে ছাই দিয়া প্রায় দুই গণ্ডা বীমা সংক্রান্ত কাগজ বাহির হইতেছে। যথা,—

Indian Insurance Journal.
Insurance World.
Insurance Herald.
Insurance and Finance.
Financial Times.
Joint Stock Companies Journal.

তাহা ছাড়া বাংলাতেও আছে।

এতগুলি বীমা সংক্রান্ত কাগজের মধ্য দিয়াও কি Insurance Academyর গঠনকারীদের মত প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা হইল না? তাহা যখন হয় নাই তখন মনে হয় ঘাটে ঘাটে গঙ্গা বাঁধাই ইহাদের মতলব।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রতি নাগপুর পাইয়োনীয়ার ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীতে উত্তর বঙ্গের এজেন্সী ইনস্পেক্টার রূপে যোগদান করিয়াছেন।

হুকুমচাঁদ ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ রূপনারায়ণ গাগ্‌গর এম এ (কম্) ভারত ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চে যোগদান করিয়াছেন।

কোন কোন ইনসুর‍্যান্স কোম্পানী স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফিস কমাইয়া দেওয়াতে বরিশাল মেডিক্যাল ইউনিয়নের সভ্যগণ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন, যদি পূর্ব্বের মত ফিস্ দেওয়া না হয়, তবে তাঁহারা ইহার প্রতিকারের জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

আমরা অবগত হইলাম, নিউ ইণ্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আর জে ডাফ্ শীঘ্রই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমতঃ ছুটী লইয়া দেশে যাইতেছেন। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ নিউ ইণ্ডিয়ার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মিঃ ডাফ্ উহার পরিচালনায় অতি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

বম্বে মিউচুয়্যালের চেয়ারম্যান ডাঃ ডি এ মন্টি গত ১লা জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে বোম্বে মিউচুয়ালের কলিকাতা

ব্রাঞ্চের চীফ এজেন্টস্ মেসার্স দস্তিদার এণ্ড সন্স একটী শোকসভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে জুন হিন্দুস্থানের স্পেশ্যাল এজেন্ট মিঃ রমেশচন্দ্র সরকারের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব হোম মেম্বার এবং বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব অফিসিয়েটিং গভর্ণর স্যার রবার্ট বেল্‌কে বম্বে ফায়ার এণ্ড্ জেনারেল ইন্‌সিওরেন্স এসোসিয়েশানের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই পদের বেতন মাসিক ৩০০০ টাকা। বীমা ব্যবসায়ে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের এক প্রতিনিধিসংঘ সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানান যে গভর্ণমেণ্টের অবসর প্রাপ্ত উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে বীমা কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত করা যুক্তি সঙ্গত নহে; সুতরাং স্যার রবার্ট বেলের উক্ত প্রকার নিয়োগ আপত্তি জনক; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী হইতে ইহার প্রতিবাদ করা হউক। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, স্যার রবার্ট বেল্ চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে প্রতিবাদে ফল হইয়াছে।

জামসেদপুরের টাটা কোম্পানী এক সার্কুলার জারী করিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী দিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা কেহ আর ইন্‌সিওরেন্স এজেন্সীর কাজ করিতে পারিবেন না। নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মারফতেও ইন্‌সিওরেন্স করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আদেশ যাহারা অমান্য করিবে তাহারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইবে বলিয়া কোম্পানী শাসাইয়াছেন।
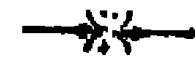
আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, অষ্ট্রেলেশিয়ার ন্যাশন্যাল মিউচুয়্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী তাঁহাদের ভারতীয় কারবার শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দিতেছেন। আমাদের মধ্যে যত স্বদেশী প্রিয়তা এবং স্বদেশী ভাব জাগিয়া উঠিবে ততই বিদেশী কোম্পানীগুলিকে দরজা বন্ধ করিতে হইবে। ইহার জন্য দেশব্যাপী স্বদেশীভাব আরও প্রবল করিয়া তোলা প্রয়োজন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের দিল্লী ব্রাঞ্চ আফিস কুইন্‌স্‌ওয়ে, নয়া দিল্লী,—এই ঠিকানায় বৃহত্তর বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রিমিয়ার ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড বিল্ডিং সোসাইটীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস্ ১২নং ডালহাউসী স্কোয়ারে উঠিয়া গিয়াছে।

আলীগড়ের প্রভিডেন্স্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী এবং লাহোরের গ্লোরী অব্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লাহোরের গ্রেট ওরিয়েণ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

লাহোরের ভিক্টরী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী এবং পেশোয়ারের ফ্রণ্টিয়ার ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লাহোরের সান্ সাইন্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

কলিকাতার জাতীয় কল্যাণ, লাহোরের ইউনিটি এবং আরও কয়েকটি কোম্পানী ফেডারেল ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই মিলিত আফিস ১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় কল্যাণের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি, ইহার কলিকাতা বিভাগের ম্যানেজার (Calcutta territorial manager) রূপে কার্য্য করিতেছেন।

—⁂—

যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ছত্তরীর নবাব ক্যাপ্‌টেন স্যার মহম্মদ আহম্মদ সৈয়দ খাঁ, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, এম্ বি ই, নিউ এশিয়াটিক্ লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ডি দত্ত রায় বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগে নিউ এশিয়াটিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—⁂—

গত ৮ই জুন গৌহাটীতে ইণ্টার ন্যাশন্যাল প্রভিডেণ্ট এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। আর্ল ল-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মিঃ জে বড়ুয়া বার-এট্-ল, সেই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। সিধ্‌লী রাজ এষ্টেটের জমিদার কুমার অজিত নারায়ণ দেব এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্-এ, মহাশয় কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

—⁂—
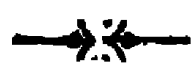
এরিয়ান লাইফ ইন্‌সুর্য়ান্স্ কোম্পানীকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য ইহার পরিচালকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, বোম্বাই হাইকোর্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৩০ সালে এই বীমা প্রতিষ্ঠান একটী মিউচুয়াল কোম্পানীরূপে স্থাপিত হয়। এক্ষণে ডিরেক্টরগণ উহাকে এক লক্ষ টাকা মূলধনে একটী লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন।

—⁂—

ভারতের প্রথম ইন্‌সুর্য়ান্স্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ জে এইচ টমাস গত ২৩শে জুন এদেশে আসিয়াছেন এবং তিনি ইতিমধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

—⁂—

পাঞ্জাবের জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্টার নোটীশ দিয়াছেন যে, অতঃপর সকল কোম্পানীকেই তিন কাপি করিয়া হিসাবপত্র ও রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। পূর্ব্বে এক কাপি দেওয়ার নিয়ম ছিল। বিদেশী কোম্পানীও এই নূতন নিয়মাধীন হইবে। আমাদের জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার মিঃ এন, কে, মজুমদারকেও আমরা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেই।

—⁂—

গত ৫ই জুন ভারত ইন্‌সিওর্য়ান্সের অফিস গৃহে রাওলপিণ্ডি ইন্‌সুর্য়ান্স য্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—⁂—
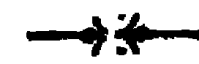
লাহোরের গ্রেট ওরিয়েণ্ট ইন্‌সুর্য়ান্স্ কোম্পানীর আফিস চ্যারিং ক্রশ, দি মল; লাহোর এই ঠিকানায় বৃহত্তর বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

—⁂—

অমৃতসরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিঃ কপিল দেও ফেডারেল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর (দিল্লী) জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মিঃ এস্‌ এস্‌ গোবিন্দ উহার হেড্‌ আফিসে ম্যানেজার হইয়াছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বাড়ী ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা করিতে হইবে এবং ঐ সকল বাড়ী পুনর্ব্বীমা করিবার সময়েও ভারতীয় কোম্পানীতেই বীমা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই সকল বাড়ী-বীমা সম্পর্কে বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া হয়। বাংলা দেশের মন্ত্রীমণ্ডল কি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা, এবং কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন না?—কংগ্রেস শাসিত গবর্ণমেণ্ট সমূহ ছোটখাটো অনেক কিছুই করিতেছেন যাহা দেখিয়া লোকে কংগ্রেস দলের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। বাংলা গবর্ণমেণ্ট দেশের ও দশের জন্য এযাবত কি করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা জনসাধারণ কিছুই জানেনা। তাঁহারা তাঁহাদের ক্যাবিনেটের স্থায়ীত্ব-সম্বন্ধে এত সুনিশ্চিত যে তাঁহারা যদি কিছু ভাল কাজ করিয়া থাকেন তবে তাহার প্রচার করাও প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। Shakespeare বলিয়া গেছেন "Security is mortals' chief enemy"—সুনিশ্চিত ভাবিয়া যাহারা ঘুমায় তাহাদের পতন অনিবার্য্য।

মামলা মোকদ্দমা

গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ ইন্সিওরেন্স

গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে প্রতারিত করিয়া ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক পলিসির টাকা লইবার অপরাধে ত্রিপুরা জেলার দিশাবাস গ্রাম নিবাসী আবদুল হামিদ, হাফিজুল্লা, আবদুল মজিদ, রামচন্দ্র ভৌমিক এবং সতীশচন্দ্র বল এই পাঁচজন কুমিল্লার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম্ কে আচার্য্যের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে আবদুল মজিদ, রামচন্দ্র ভৌমিক এবং সতীশ চন্দ্র বল খালাস পায়,— কিন্তু আবদুল হামিদ ও হাফিজুল্লার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঘটনাটি এই ;—

বিগত ১৯৩৪ সালে ৬ই আগষ্ট দিশাবাস গ্রাম নিবাসী হাফিজুল্লা নামক এক ব্যক্তি তাহার পুত্র বলিয়া বর্ণিত সিরাজুল্লার নামে সিঙ্গাপুরের গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে দুইটী পলিসিতে ৪৫০০ টাকার জীবন-বীমা করে। এবং নিজের নামে ঐ পলিসি দুইটী এসাইন করাইয়া লয়। ১৯৩৫ সালে কোম্পানীর কলিকাতা আফিসে জানান হয় যে, বীমাকারী সিরাজুল্লার কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তারের এবং ইউনিয়ান বোর্ডের সার্টিফিকেট দাখিল করা হয়। তদনুসারে কোম্পানী ১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে পলিসির টাকা যথারীতি সম্পূর্ণ রূপে দিয়া দাবী মিটাইয়া ফেলে। ইহার পরে একখানি বেনামী চিঠি পাইয়া কোম্পানী জানিতে পারে, হাফিজুল্লার সিরাজুল্লা নামে কোন পুত্রই ছিল না এবং বাস্তবিক তাহার কোন পুত্র সন্তানই নাই। সে মিথ্যা নামে কোম্পানীকে প্রতারণা করিয়া টাকা নিয়াছে। অতঃপর কোম্পানীর পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইলে তদনুসারে পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করিয়া হাফিজুল্লাকে গ্রেপ্তার করে। তারপর অন্যান্য আসামীরাও ধরা পড়ে। আবদুল হামিদ বীমার প্রস্তাব পত্রে সাক্ষী হইয়াছিল। সে হাফিজুল্লার প্রতিবেশী। উত্তরাধিকারের সার্টিফিকেট লইবার সময় হাফিজুল্লার স্বাক্ষরিত ওকালত নামা আবদুল হামিদই আনিয়া উকীলকে দিয়াছিল। সতীশচন্দ্র বল কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্টরূপে ঐ বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করে। রামচন্দ্র ভৌমিক একজন কবিরাজ। সিরাজুল্লার মৃত্যু সম্বন্ধে যে সার্টি-

ফিকেট কোম্পানীর নিকট দাখিল করা হয়, তাহাতে ঐ কবিরাজ রামচন্দ্র ভৌমিকের স্বাক্ষরাঙ্কিত উক্তি লিপিবদ্ধ আছে যে সিরাজুল্লা কলেরায় মারা যায় এবং পীড়ার সময় সে রামচন্দ্র কবিরাজের চিকিৎসাধীন ছিল।

কুমিল্লার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম্ কে আচার্য্যের বিচারে আবদুল মজিদ, রামচন্দ্র এবং সতীশ খালাস পায়। আবদুল হামিদের এবং হাফিজুল্লার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আবদুল হামিদ কুমিল্লার সেসন জজের আদালতে আপীল করে, কিন্তু তাহার আপীল ডিস্‌মিস্ হয়। অবশেষে সে হাইকোর্টে আপীল করে। বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস্ বার্ট্‌লী এবং মিঃ জাষ্টিস্ খোন্দকারের এজলাসে মামলার শুনানী হয়। বিচারপতিদ্বয় প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণ না পাইয়া আবদুল হামিদ ও হাফিজুল্লা দুইজনকেই খালাস দিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আরুল হকের এজলাসে গত ৯ই জুন তারিখে আসাদগঞ্জ বীমা প্রতারণা মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ফুরুল আমীন প্রমুখ ১১জন ব্যক্তি শেষ রাত্রিতে আসাদগঞ্জে কয়েকটি কাঠের গুদামে ও দোকান ঘরে অগ্নি সংযোগ করে। এই গুদাম ও দোকান ঘরগুলি অগ্নি-বীমা করা ছিল। আসামীগণের মধ্যে ৩ জন এখনও পলাতক আছে। সরকারী কৌসুলী শ্রীযুক্ত জে কে ঘোষাল এই মামলা সম্পর্কীয় সমস্ত কাহিনী আদালতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আসামী ফুরুল আমীন, গুন্নু মিঞা, কবীর আমেদ ও হৃদয় লালা আসাদগঞ্জের ঐ গুদাম দোকান ঘরগুলির মালিক ছিল। ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার প্রধান আসামী ফুরুল আমীন এইভাবে অগ্নি-বীমার টাকা আদায় করে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইভান্ আদালতে তাহার তদন্তের কাহিনী বর্ণনা করেন। অগ্নি-বীমা কোম্পানীর দুইজন এসেসারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ১১ জন আসামীর মধ্যে ৮ জন সেসনে সোপর্দ্দ হইয়াছে।

চন্দ্রকুমার কর নামক এক ব্যক্তি অনিল কুমার মিত্র নামক একজন ইন্‌সিওরেন্স্ এজেণ্টের মারফতে কলিকাতার কোন ইন্‌সিওর‍্যান্স্ কোম্পানীতে ৯৭৫০০ টাকার জীবন-বীমা করিয়া ৯ খানি পলিসি গ্রহণ করে। উভয়ের মধ্যে এই চুক্তি হয়, চন্দ্রকুমার এক বৎসর যাবৎ ৬টী দ্বৈমাসিক প্রিমিয়াম দিয়া পলিসি চল্‌তি রাখিবে এবং তজ্জন্য অনিল কুমার এজেন্সীর নিয়মানুসারে কোম্পানীর নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য কমিশন হইতে চন্দ্রকুমারকে ৭৮১ টাকা ৫ আনা রিবেট দিবে। চন্দ্রকুমারের অনুরোধে অনিল কুমার তাহাকে ঐ ৭৮১ টাকা ৫ আনার ভিতর ১৩০ টাকা সাড়ে তিন আনা অগ্রিম দেয়। কিন্তু চন্দ্রকুমার দ্বিতীয় প্রিমিয়াম এবং তাহার পরবর্ত্তী আর কোন প্রিমিয়ামই না দিয়া চুক্তি ভঙ্গ করে। অগত্যা অনিল কুমার প্রদত্ত ১৩০ টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করে। চন্দ্রকুমার বলে যে, অনিল কুমারের সহিত কোন চুক্তি-নামা লিখা-পড়া হয় নাই, কেবলমাত্র মৌখিক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং সে একবৎসর পলিসি চল্‌তি রাখিতে স্বীকৃত হয় নাই। ১৩০ টাকা সাড়ে তিন আনা তাহার প্রথম প্রিমিয়ামের রিবেট বাবতে পাওনা হইয়াছে; সুতরাং অনিল কুমার তাহা ফেরৎ পাইতে পারে না। কলিকাতা (প্রেসিডেন্সী) ছোট আদালতের জজ্, মিঃ এ

পি বসুর এজলাসে মামলার বিচার হয়। বিচারপতি চুক্তিনামা বিশ্বাস করিয়া খরচা সহ মামলা ডিক্রী দিয়াছেন।

ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল

দীর্ঘকাল শুনানীর পর সম্প্রতি কলিকাতার পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে আহ্‌মদ্ ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর মামলার বিচার শেষ করিয়া রায় দিয়াছেন। এই মামলায় কোম্পানীর পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্ট্‌স্ এবং ২৭ জন ডিরেক্টর অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কোম্পানীর বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্ট্‌স্ এবং ১৩ জন ডিরেক্টর ১৯৩৩ সালের সংশোধিত হিসাব পত্র দাখিল করেন নাই বলিয়া অভিযুক্ত হন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সকল আসামীকে খালাস দেন। কারণ, তিনি বলেন, আসামীদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে হিসাবপত্র দাখিল করিতে বলা হয় নাই। ১৯৩৬ সালের ১২ই নবেম্বর সংশোধিত হিসাব পত্র দাখিল করা হইয়াছে, সুতরাং মামলা চলিতে পারে না।

১৯৩১ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত চারি বৎসরে কোম্পানীর যে আয় হইয়াছে, তাহার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ টাকা আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্টের নিকট সিকিউরিটী ডিপজিট রাখিতে হয়; কিন্তু কোম্পানী ঐ সিকিউরিটী ডিপজিটের সমস্ত টাকা দিতে পারেন নাই,—১৮৯০ টাকা বাকী ছিল। এই অপরাধে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আর একটী মামলা দায়ের হয়। বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট কোম্পানীকে ৩০০ টাকা এবং পূর্ব্বতন ম্যানেজিং এজেন্ট্‌স্ মেসার্স্ চ্যাটার্জি এণ্ড্ কোম্পানীকে ১৫০ টাকা জরিমানা করেন। ডিরেক্টরদের মধ্যে ডাঃ এ কে চ্যাটার্জ্জি এবং এ টি মুখার্জ্জি প্রত্যেকের ১৫০ টাকা জরিমানা হয়। অন্য পাঁচ জন ডিরেক্টর মিঃ ভবেন্দ্র চন্দ্র রায়, মিঃ জে পি চ্যাটার্জ্জি, ডাঃ পি কে ব্যানার্জ্জি, মিঃ এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি, এবং ডাঃ পি বি ব্যানার্জ্জি, ইঁহাদের প্রত্যেকের ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। অবশিষ্ট ২০ জন ডিরেক্টর খালাস পাইয়াছেন।

১৯৩৬ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে এই সকল মামলা দায়ের হইয়াছিল। তারপর বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্ট্‌স্ সিকিউরিটী ডিপজিটের টাকা দেওয়াতে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে মামলা স্থগিত হয়। পুনরায় ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাসে মামলা উত্থাপিত হয়।

পত্রান্তরে প্রকাশ যে ১৯৩৭ সালের ২৪শে নবেম্বর অধুনা লুপ্ত Insurance Times এর সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী টি কে সরকার ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স্ য়্যাণ্ড ট্রেডার্স্ নামক কারবারের এজেণ্ট বি কে ঘোষালের নিকট আসিয়া নিজেকে "ইন্‌সুর‍্যান্স্ টাইম্‌স্" কাগজের সত্ত্বাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং দুই শত টাকার এক-খানি চেক্ ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা দিতে অনুরোধ করে। চেক্‌খানি "কণ্টিনেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক অব্ এসিয়া"র নামীয়। বি কে ঘোষাল তাহাকে ২ টাকা কমিশন কাটিয়া চেকের টাকা দেয়। কিন্তু ঐ চেক্ পরে কণ্টিনেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক অব এসিয়ায় উপস্থিত করিলে উহা dishonoured ফেরৎ আসে। তারপর টি কে সরকারের নিকট বার বার টাকা চাহিয়া না পাওয়াতে বি কে ঘোষাল অগত্যা য়্যাডিসানেল চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্ সিংহের এজলাসে নালিশ করে। কিন্তু বিচারপতি উহা দেওয়ানী মামলা বলিয়া ডিস্‌মিস্ করেন। অতঃপর বি কে ঘোষাল হাইকোর্টে রুল জারীর প্রার্থনা করেন। মিঃ জাষ্টিস্ বার্ট্‌লী এবং মিঃ জাষ্টিস্ গোন্দকারের এজলাসে আবেদন শুনানী হয়। বিচারপতিদ্বয় আবেদন মঞ্জুর করিয়া রুল জারীর আদেশ দিয়াছেন।

পালিশ্ বা বার্ণিশ্ প্রস্তুত প্রণালী

পালিশ জিনিসটার সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক নরনারী সকলেই পরিচিত। এই কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্যের স্তাবকবৃন্দ সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান। তার কারণ আছে। প্রকৃতির যে নগ্নরূপ তাতে অকৃত্রিমতা থাকতে পারে কিন্তু পারিপাট্য নেই। স্থূল-সৌন্দর্য্য আজ আর কেউ পছন্দ করে না, সূক্ষ্ম মনোহারিত্বই লোকের মন ভোলায়। সেইজন্যই লোকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ওপর একটা কৃত্রিমতা প্রদান করতে সাহস করে। দেখেন না, প্রকৃতির ঘন ঝোপঝাপকে পরিষ্কার করে মানুষ, তার রুচিমত রূপ দক্ষতা সহকারে সেখানে লতা বিতান সৃষ্টি করে—নইলে বন জঙ্গলের মধ্যে যতই স্বাভাবিকতা থাক্ না কেন তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় না। লোকেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যাপারেও ঠিক ঐ জিনিসই দেখা যায়—মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরও একটা সভ্যতার পালিশ চড়ে যেটার নাম হ'ল 'সামাজিক ভদ্রতা'। সেইজন্য কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্যের আদর এতখানি।

আপনার গৃহের আসবাবপত্রের কথাই ধরুন। কাষ্ঠের বুক চিরে সেগুলি তৈরী হ'ল, ঠিক সেই অবস্থায়ই যদি আপনি সেগুলি ঘরে সাজিয়ে রাখেন তা'হলে সেগুলির ওপর কারুরই নজর পড়বে না কিংবা তদ্দ্বারা ঘরের কিছুমাত্র শোভা বৃদ্ধি ঘটবে না। এর একমাত্র কারণ হ'ল যে কাষ্ঠের স্বাভাবিক রূপের কোন ঔজ্জ্বল্য নেই তা' সে সেগুন কাঠই হোক্ আর মেহেগ্নি কাঠই হোক্। কিন্তু সেই কাঠের ওপরই যখন কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের পালিশ চড়ে তখন তার আলাদা রূপ খুলে যায়। সকল লোকের তখন সেই বিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্রব্যের প্রতি নজর যায়—দর্শকমাত্রই তার তারিফ ও প্রশংসা করে। শুধু আসবাবপত্র নয়, ঘরের দরজা-জানালা-শার্শী-খড়খড়িতেও আধুনিক রুচি অনুযায়ী রঙের বদলে পালিশ চড়চে। এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে, দরজা জানালায় রঙের বদলে পালিশ লাগালেই ভাল দেখতে হয় এবং সেই-জন্যই অবস্থাপন্ন লোকের ঘরবাড়ীর দরজা জানালায় আজকাল শুধু পালিসই চড়ে।

এই যে আসবাবপত্রের পালিশ, এ তৈরী করার ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়, বরং সহজ। তারপিন-তৈল, এ্যালকোহল, মেথিলেটেড্ স্পিরিট প্রভৃতি উদ্বায়ী দ্রব্যে রঞ্জন পদার্থ মিশ্রিত করলেই পালিশ প্রস্তুত হয়। এই পালিশ বা বার্ণিশ লাগাবামাত্র শুকিয়ে যায় এবং কাষ্ঠের গাত্রে এক মনোহারী উজ্জ্বল বর্ণ ফুটিয়ে তোলে।

আমাদের পালিশকারেরা আসবাবদ্রব্য পালিশ করবার জন্য গালা ব্যবহার করে। এই গালা মেথিলেটেড্ স্পিরিটে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং এইরূপভাবে প্রস্তুত পালিশকে ফ্রেঞ্চপালিশ বলে। ৫ পাউণ্ড ভেনিস্ তারপেনতাইন ও ৬০ পাউণ্ড অরেঞ্জ সেলাক্ (shellac) ৪০ গ্যালন মেথিলেটেড্ স্পিরিটে ডুবিয়ে ৬ ঘণ্টা ধরে ঘাঁটা হয়। এই পালিশের রঙ্ হয় ফিকে কমলালেবু বর্ণ এবং এ পালিশ লাগাবার পর ১০ মিনিটের মধ্যে তা' শুকিয়ে যায়। এই পালিশ রবার কিংবা নেক্ড়ার পুঁটুলীর সাহায্যে দ্রব্যের ওপর লাগানো হয়। এক পোঁচ অর্থাৎ একটা কোটিং লাগানোর পর সেটা শুকাতে দেওয়া হয় তারপর আর এক পোঁচ লাগানো হয়ে থাকে। এই রকম ভাবে বার কয়েক লাগালেই রীতিমত ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়।

পালিস বা বার্ণিশ নানা রঙের হয়ে থাকে। সাদা হার্ড বার্ণিশ তৈরী করতে গেলে দ্রবণীয় ম্যানিলা গাম স্পিরিট্ বা এ্যালকোহলে মিশ্রিত করতে হয়। ১ গ্যালন এ্যালকোহলে ৩ পাউণ্ড হারে ম্যানিলা গাম্ মিশ্রিত করাই নিয়ম। এই বার্ণিশ খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। বাদামী হার্ড বার্ণিশ প্রস্তুতের প্রক্রিয়াও ঐ একই রকমের, শুধু রঙের জন্য যৎসামান্য বিস্মার্ক্ ব্রাউন মিশ্রিত করা দরকার।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, এ্যালকোহলে রজন মিশ্রিত করলে স্পিরিট্ বার্ণিশ তৈরী হয়। ১ গ্যালন্ এ্যালকোহলে ৪ পাউণ্ড হারে রজন মিশ্রিত করাই নিয়ম। রজন ছাড়া অপর দ্রব্যাদিও ব্যবহৃত হ'তে পারে—যথা :—গাম্ ম্যাষ্টিক, স্যাণ্ডারক, এলিমি প্রভৃতি। পালিশ বা বার্ণিশ যাতে রীতিমত কামড়ে ধরতে পারে এবং তা' যাতে সহজে চটে না যায় তজ্জন্য ক্যাষ্টর অয়েল, ভেনিস্ তারপেন্‌তাইন, গাম্, কোপাইবা বাল্‌সাম (copaiba balsam), বার্গাণ্ডি পিচ্ প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যও মিশ্রিত করা হয়।

নিম্নে কতকগুলি পালিশ বা বার্ণিশ প্রস্তুতের ফরমূলা প্রদত্ত হইল :—

সেলাক্ স্পিরিট বার্ণিশ

অরেঞ্জ সেলাক্	১০ পাউণ্ড
ভেনিস্ তারপেন্‌তাইন	৩ ,,
এ্যাল্‌কোহল্	৩৬ গ্যালন্

সাদা পালিশ

ব্লিচ্‌ড সেলাক্	৪০ পাউণ্ড
মেথিলেটেড স্পিরিট	২৭ গ্যালন

গাঢ় বাদামী পালিশ

গার্ণেট সেলাক্	৪০ পাউণ্ড
মেথিলেটেড স্পিরিট	২৫ ,,

পেপার বার্ণিশ

(১) স্যাণ্ডারক	৫০ পাউণ্ড
গাঢ় তারপিণ তৈল	৩০ ,,
এ্যালকোহল	১৫ গ্যালন
(২) ম্যানিলা কোপাল্	১৬ ভাগ
ভেনিস্ তারপেনতাইন	৫ ,,
এ্যাল্‌কোহল	৩০ ,,

রজন বার্ণিশ

পেল্ রোসিন্	২৩ পাউণ্ড
ভেনিস্ তারপেন্‌তাইন	৪ ,,
এ্যালকোহল্	১৫ ,,

বুক বাইণ্ডার্স বার্ণিশ

সেলাক্	৮½ ভাগ
স্পিরিট অব্ তার্পেনতাইন	৩ গ্যালন
মেথিলেটেড স্পিরিট	৮০ গ্যালন

বুক বাইণ্ডার্স হোয়াইট্ বার্ণিশ

স্যাণ্ডারাক্	৬ ভাগ
ম্যাষ্টিক্	৩ ,,
এলেমি (Elemi)	৩ ,,
এ্যাল্‌কোহল্	১৭= ,,

ফটোগ্রাফীর নেগেটিভের বার্ণিশ

গাম্ স্যাণ্ডারাক্	৫ আউন্স
গাম্ বেঞ্জইন্ (Benzoin)	২ ,,
মেথিলেটেড স্পিরিট	½ গ্যালন

পূর্ব্বেই বলেছি যে, কাষ্ঠ দ্রব্য পালিশ ছাড়াও অপরাপর দ্রব্যও বার্ণিশ হয়ে থাকে এবং সে বার্ণিশ নানান্ রংয়ের হয়। পূর্ব্বে স্বাভাবিক বস্তুর দ্বারাই ঐ সমস্ত বার্ণিশ রং করা হ'ত কিন্তু কৃত্রিম বস্তুর আবিষ্কারের সঙ্গে তাদের আবশ্যকতা লুপ্ত হয়েছে। তাই বর্ত্তমানে ড্রাগনস্ ব্লাড, হলুদ, লগ্‌উড্ এক্সট্রাক্ট প্রভৃতি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে Spirit aniline colour সমূহ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এসম্পর্কে কতকগুলি ফরমূলা দেওয়া গেল :—

গাঢ় সোনালী রং

ব্লিচ্‌ড্ সেলাক্	৩ পাউণ্ড
মেথিলেটেড স্পিরিট	২ গ্যালন
কন্‌সেন্ট্রেটেড সলিউশন্ অব্ Diamond Fuachsine	¼ পাইট

ফিকে সোনালী রং

ব্লিচড্ সেলাক্	১০ আউন্স
মেথিলেটেড স্পিরিট	১ গ্যালন
Aniline yellow concentrated solution	½ পাইট

নীল রং

সেলাক্	৫ আউন্স
স্যাণ্ডারাক্	৫ ,,
এলিমি	২ ,,
Alkali blue concentrated solution	½ পাইট

বেগুনী রং

সেলাক্	২ আউন্স
স্যাণ্ডারাক্	৮ ,,
এলিমি	৩ ,,
মেথিলেটেড স্পিরিট	১ গ্যালন

বাঁধাকপির চাষ

বাংলাদেশের শাক সব্জীর মধ্যে কপি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সাধারণতঃ সহর অঞ্চলে ইহার চাহিদা খুব বেশী। সেই জন্য ব্যবসা হিসাবে বড় বড় সহরের নিকটেই কপির চাষ করা লাভজনক। সুদূর পল্লী-গ্রামের গৃহস্থদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণে সৌখীন ভাবে কপির চাষ করিয়া থাকেন। কোন কোন সমৃদ্ধ গ্রামের বড় বড় বাজারে কপির চলন দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, উৎপাদন বেশী হইলে পল্লী গ্রামেও কালক্রমে কপির ব্যবসা চলিবে। সহরের অতি নিকটে কপিচাষের উপযুক্ত জমি দুর্মূল্য। চাষের মজুরীও বেশী। পল্লীগ্রামে এই দুইটী অসুবিধা নাই। বিশেষতঃ তথায় জল-সেচনের ব্যবস্থা ব্যয়সাধ্য নহে। ফসলবিক্রয়ের সুবিধার জন্যই লোকে সহরের নিকট কপির চাষ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ষোল সতর মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও মোটর লরীর সাহায্যে কলিকাতার বাজারে প্রতিদিন সকালে স্তুপাকার শাক্-সব্জী তরীতর-কারী আসিয়া উপস্থিত হয়। পল্লীগ্রামে এমন সুবিধা ঘটেনা। কিন্তু কপি শীতকালের ফসল। সেই সময়ে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট জলকাদা শূন্য এবং শুষ্ক হইয়া উঠে। সুতরাং চলাফেরার কোন কষ্ট হয় না। মোটর লরী না চলিলেও, গরুর গাড়ী কিম্বা মহিষের গাড়ী অথবা মাথায় বোঝা করিয়া বাজারে ক্ষেতের ফসল লইয়া আসা যায়। সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশের পল্লী-গ্রামে কপির ব্যবসা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া এই দেশের জলবায়ু কপিচাষের অনুকূল। কিন্তু ভাল ফসল পাইতে হইলে ইহার চাষে খুব পরিশ্রম ও যত্ন লইতে হয়। অনেকে তাহা পারেন না বলিয়াই কপির চাষের তেমন প্রসার-নাই। বাস্তবিক যাঁহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের পক্ষে এই পরিশ্রম ও যত্ন নিতে আলস্য করা উচিত নহে।

দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় এবং নর্ম্মদা ও গঙ্গানদীর উপত্যকার পলল মৃত্তিকায় কপির ফসল খুব ভাল হয়। কারণ ইহাতে বালুকার সহিত গলিত জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এবং এই মাটী সহজে গুড়া হইয়া যায়। কপিচাষের জন্য জমি খুব ভালরূপে তৈয়ারী করা দরকার। কপি যেরূপ উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়, তাহাতে জমি তৈয়ারীর জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহা পোষাইয়া যায় এবং লাভও খুব বেশী হয়।

বর্ষার অব্যবহিত পরেই জমি তৈয়ারীর কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কারণ তখন মাটী

নরম থাকে বলিয়া লাঙ্গল দিবার অথবা কোদালী দ্বারা খুড়িবার সুবিধা। প্রথমতঃ জমি একফুট বা ১৫ ইঞ্চি আন্দাজ চষিতে হয়, কিম্বা খুড়িতে হয়। একমাস পরে বড় বড় মাটীর চাকা গুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া আর একবার লাঙ্গল দেওয়া দরকার। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া জমিতে হাওয়া রৌদ্র খাইলে মে মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার আঁচড়া লাগাইতে হয়। সেই জমিতে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া খুব ভাল গোবর সার ছড়াইয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ফসল সবুজ সার বপন করিবে। আমাদের দেশে ধঞ্চে, এড়াঞ্চি প্রভৃতি সবুজ সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় গাছ খুব বড় হয়না, কিন্তু ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া জন্মে। খাদ্যস্বরূপে ইহাদের কোন মূল্য নাই কিন্তু কিছু বড় হইলে ইহাদিগকে উপড়াইয়া ফেলিয়া জমিতে মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া চষিয়া দিলে ইহাদের পাতা ডাটা শিকড় বাকড় পচিয়া মাটীকে খুব উর্ব্বর করে। আগষ্ট মাসে এইরূপে সবুজ সার জমির সঙ্গে মিশাইয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ভাল কপির ফসল পাইতে হইলে জমিতে কৃত্রিম সার দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সার নানা প্রকার আছে। আমরা নিম্নে দুইটী সাদা সিধে রকমের সারের বিষয় উল্লেখ করিলাম ;—

(১) গোবরের সহিত,

একসের বা দেড়সের নাইট্রেট্ অব্ সোডা এবং একসের বা দেড়সের সুপারফস্ফেট অব্ লাইম এবং ছয় ছটাক আন্দাজ সাল্‌ফেট্ অব্ পটাশ।

(২) গোবর ছাড়া,—

২ সের কিম্বা ২৷৷০ সের নাইট্রেট্ অব সোডা এবং ২ সের কিম্বা আড়াই সের সুপার ফস্ফেট্ অব্ লাইম্, এবং ছয় ছটাক সালফেট্ অব্ পটাশ।

নার্সারী জমিতে অথবা একটী আন্দাজ মত বড় বাক্সে খুব ভাল মাটীতে প্রথমতঃ বীজ বপন করিতে হয়। এই নার্সারী কিম্বা বাক্সের মাটী বিশেষ যত্নের সহিত তৈয়ারী করা আবশ্যক। যেখানে রৌদ্র ও খোলা বাতাস লাগে, সেইখানে নার্সারী করিতে হয়। বীজ একটু পাতলা করিয়া না পুতিলে চারাগাছগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উঠিবে যে উহারা জোরাল হইতে পারে না, সরু এবং লম্বা ধরণের হয়। সেইজন্য প্রথম নার্সারীতে ছাড়ান বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইলে উহাদিগকে উঠাইয়া দ্বিতীয় নার্সারীতে অথবা বাক্সে পাতলা পাত্‌লা করিয়া রোপন করিতে হয়। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বের রাত্রিতে নার্সারীর জমিতে জলসেচ করা আবশ্যক। সকাল বেলা বীজ বপন করিয়া তাহার উপরে খুব হাল্কা রকমের এক পরত্ খুব ভাল এবং চালুনীর দ্বারা চালা মিহি মাটীর চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। তাহার উপরে প্রতিদিন হাল্কা ভাবে জলের ছিটা দিতে হয়। এইরূপ করিলে খুব শীঘ্র,—দুই দিনের মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। চারা গাছগুলি দুই তিন ইঞ্চি লম্বা হইলে উহাদিগকে তুলিয়া দ্বিতীয় নার্সারীতে লাগাইতে হয়। এই দ্বিতীয় নার্সারীতে চারাগুলিকে দুইদিকেই তিন ইঞ্চি অন্তর অন্তর লাগাইবে। নার্সারীতে চারাগুলি যেন সারাদিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা একটু রৌদ্র পায়। অবশিষ্ট সময়ে চারাগুলির উপরে ছায়া

দিবে। বেশী রৌদ্র লাগিলে চারার জোর কমিয়া যায়; আবার সর্ব্বদা ছায়াতে রাখিলেও বিপদ, কারণ তাহাতে পোকায় ধরিয়া চারাগুলিকে নষ্ট করে। চারাগুলি ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইলে, উহাদিগকে পুনরায় তুলিয়া তৃতীয় নার্সারীতে লাগাইবে। এই নার্সারীর মাটিতে যেন খুব ভালরূপে সার দেওয়া থাকে। তৃতীয় নার্সারীতে চারা গাছগুলি যেন এক দিকে ২ ফুট এবং অন্যদিকে আড়াই ফুট অন্তর করিয়া রোপন করা হয়। দেখা গিয়াছে, এই রকম দুই তিন বার নাড়া চাড়া করিয়া রোপন করিলে গাছ খুব জোরাল হয়।

জমিতে বিকালবেলা জলসেচ করিবে। শেষবারে চারাগাছগুলিকে লাগাইবার পূর্ব্বে জমিতে সার খুব ভালরূপ মিশাইয়া দিবে। এ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার যেন জমিতে কখনও সারের অভাব না হয়। কারণ সারের অভাব হইলেই কপির মাথায় বাঁধন ধরিবে না এবং পাতা খুলিয়া খুলিয়া যাইবে। জমি মাঝে মাঝে খুঁড়িয়া দেওয়া দরকার এবং জমি যেন কোন প্রকারে অপরিস্কার না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। কারণ অপরিষ্কৃত জমিতেই পোকার উপদ্রব হয়।

কপির মাথাগুলি তৈয়ারী হইতে আরম্ভ করিলেই পাতাগুলিকে মুড়িয়া বাঁধিয়া দিবে যেন সূর্য্যের কিরণ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। তাহা হইলে কপি খুব সাদা হইবে। এক আউন্স পরিমিত বীজে দুই হাজার হইতে তিন হাজার পর্য্যন্ত চারা জন্মে। প্রতি বিঘা জমির জন্য দেড় আউন্স কিংবা দুই আউন্স বীজ দরকার।

কপিতে সহজেই পোকা ধরিবার আশঙ্কা খুব বেশী। সেইজন্য জমি পরিষ্কৃত রাখা দরকার এবং যে গোবর সার ব্যবহার করা হয়, তাহা যেন খুব পচান হয়। চারাগাছের প্রথম অবস্থায় তাহাদের উপরে এক ভাগ প্যারিস গ্রীনের (Paris green) সহিত ৩২ ভাগ ছাই মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলে পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। পোকা ধরা গাছগুলি তখনই উঠাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কপি ফসলের আর একটী ব্যাধি এই যে ইহার শিকড়গুলিতে গাঁট বাঁধিয়া যায় এবং পাতাগুলি হলদে বর্ণ বিশিষ্ট হয়। সাধারণতঃ যে মাটীতে অম্ল ভাগ বেশী, তাহাতেই এই ব্যাধি দেখা যায়। সুতরাং প্রতি ১০০ বর্গফুট জমিতে দশ সের আন্দাজ চূণ মিশাইয়া যদি ঐ অম্লভাব নষ্ট করা হয়, তবে আর এই ব্যাধির আশঙ্কা থাকে না। কয়েক বৎসর জমিতে কপি জাতীয় ফসল ব্যতীত অন্য ফসলের চাষ করিলেও জমির ঐ অম্লভাব দূর হইয়া যায়; সুতরাং পরে তাহাতে কপির চাষ করা চলে। *

---

* ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাঁধা কপির চাষ সম্বন্ধে আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। এই দুই প্রবন্ধ এক সঙ্গে পাঠ করিলে পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" —সম্পাদক

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশন্যাল্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্

১৯৩৭ সালের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা নিম্নে ন্যাশন্যালের একত্রিংশৎ বার্ষিক (১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) হিসাব ও কার্য্যবিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন কারবার ঃ— আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ২১৯১৯২৩১ টাকা মূল্যের ১১৮৪৩টী বীমার প্রস্তাব প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে ১৬০২৩৯০৯ টাকা মূল্যের ৯৩৭৭টী প্রস্তাব গৃহীত এবং তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। পুনর্ব্বীমা ও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই নূতন কারবার হইতে বার্ষিক নিট্ প্রিমিয়াম আয় (পুনর্ব্বীমা বাদে) ৮৫৫৯২৩ টাকা।

আয় ব্যয় ঃ— আলোচ্য বৎসরে আয় হইয়াছে ৬৬৭৮২৮৪ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে আসিয়াছে (ইনকাম ট্যাক্স বাদে) ১২৬০০৩৭ টাকা। এন্‌ডোর্স্‌মেণ্ট ফিস্ পাওয়া গিয়াছে ২৩৬ টাকা।

ব্যয় হইয়াছে মোট ৪৪৫২০৬৮ টাকা; ইহার বিভিন্ন দফা এই,—

দাবী শোধ ———— ২৩৪৬৮২২ টাকা

নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে মেয়াদী বীমার দাবী শোধ (ডিস্কাউণ্ট্ বাদে) ——— ১১১৮০১ টাকা

সারেণ্ডার (বোনাস্ সহ) —— ৪৬৫০৯৪ টাকা

পলিসি হোল্ডারদের নগদ বোনাস ———— ৯৭৫২ ,,

পরিচালনা খরচ ———— ১৪৯৭৬৫৪ ,,

ইনকাম্ ট্যাক্স্ ও সুপার ট্যাক্স্ ———— ৫৫৫৫ ,,

আসবাব পত্রের মূল্য হ্রাস ——— ১৫৩৮৭ ,,

জীবন-বীমা তহবিল ঃ— এইসব খরচা বাদে জীবন-বীমা তহবিলে বৎসরের শেষে ২৯৪৯৩৪৪৮ টাকা জমিয়াছে। বৎসরের আরম্ভে জীবন-বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৭২৬৭২৩১ টাকা।

অন্যান্য ফাণ্ড ঃ— জীবন-বীমা তহবিল ব্যতীত নিম্নলিখিত বিবিধ ফাণ্ডেও কোম্পানীর টাকা জমা আছে,—

কন্টিঞ্জেন্সী রিজার্ভ্ ——— ১৭৩৭৫১ টাকা

পেন্‌সান ফাণ্ড্ ————	৩০,০০০	টাকা
গ্যারাণ্টি ফাণ্ড্ ————	১৫৬০৮	,,
জেনারেল ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট্ রিজার্ভ্ —	১২০৫৩	,,
জেনারেল পেন্‌সান ফাণ্ড ———	৫০,০০০	,,
জেনারেল রিজার্ভ ———	২০০০০০	,,

সম্পত্তি ও দায়ঃ—কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩২২৭৫৩৬৬ টাকা।
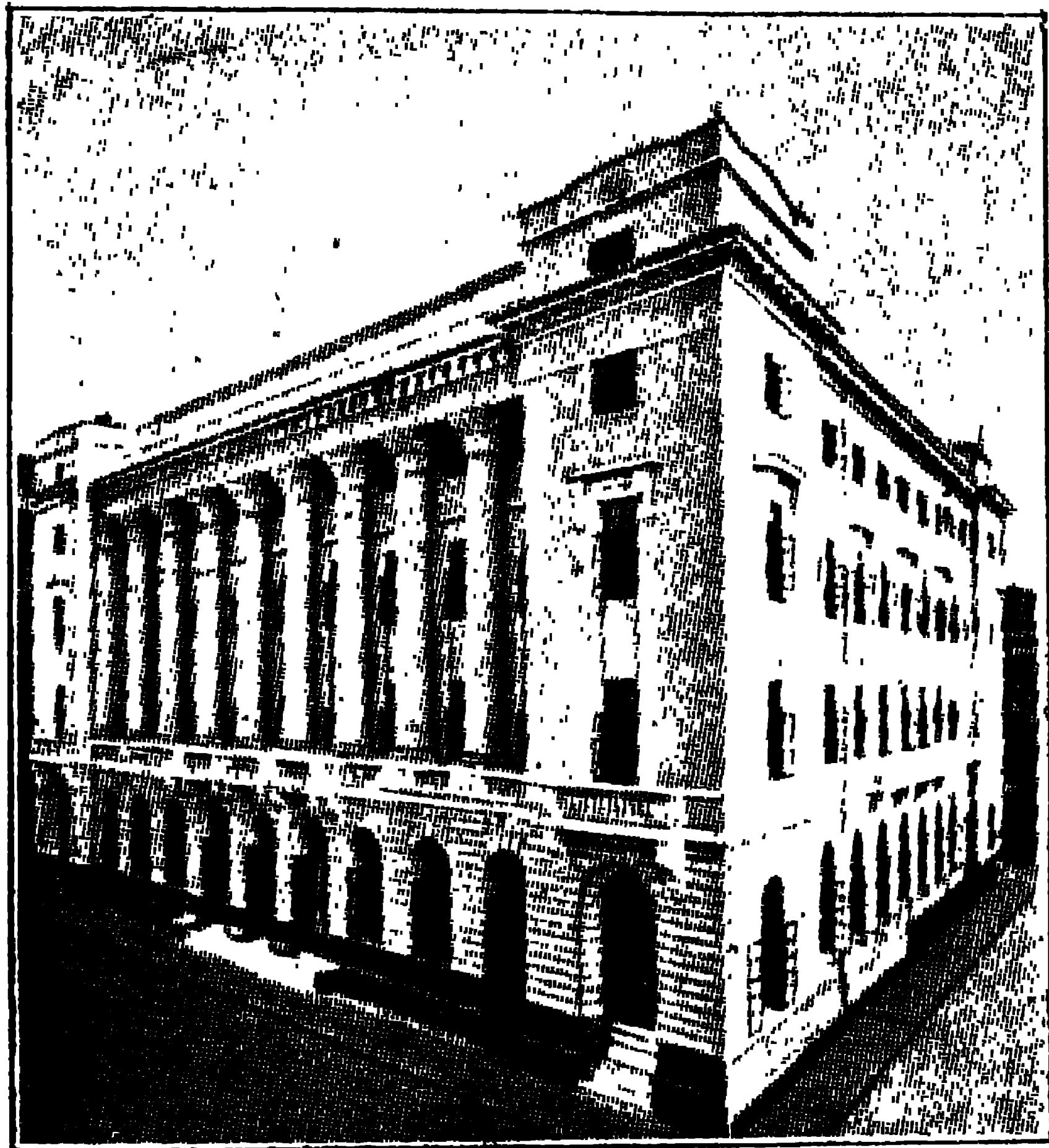
ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ বাটী।

তন্মধ্যে জীবন-বীমা তহবিলের লগ্নী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৩১৬০৬৫৭৩ টাকা। অন্যান্য লগ্নীর পরিমাণ ৫৮৩৯৯৮ টাকা। আদায়ী মূলধন দুই লক্ষ টাকা এবং উপরোক্ত বিভিন্ন তহবিল ব্যতীত দায়ের ঘরে নিম্নলিখিত কয়েকটী দফা দেখা যায়,—

হিসাবের বহির্ভূত জমা	৭০৩	টাকা
খরচ বাকী	৩৫৮৭	,,
ডিভিডেণ্ড	৮১১৮	,,
লাভক্ষতির হিসাবে	১৭৮৭২২	,,

গ্যারাণ্টি বিভাগঃ—এই বিভাগে বৎসরের আরম্ভে গ্যারাণ্টি ফাণ্ডের পরিমাণ ছিল ১৩২০৩ টাকা। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ৩৯০২০ টাকা। খরচের

মধ্যে গ্যারান্টি দাবী দেওয়া হইয়াছে ৭৭৮৬ টাকা। পরিচালনা বাবতে গিয়াছে ২১৬৩২ টাকা। লাভক্ষতির হিসাবে নেওয়া হয় ৭১৯৬ টাকা। খরচা বাদে বৎসরের শেষে গ্যারান্টি ফাণ্ডে ১৫৬০৮ টাকা থাকে।

বিবিধঃ—ব্যালান্স্ সিটে সিকিউরিটী সমূহের যে মূল্য ধরা হইয়াছে, ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঐ সকল সিকিউরিটীর বাজার দর তদপেক্ষা ৭৫৭৭৭০ টাকা অধিক। খরচের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২৭·৯ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে (১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর) দেখা যায় কোম্পানীর মোট চল্‌তি পলিসির সংখ্যা ৬০৬৪০। তন্মধ্যে ভারতে ৫৫৩৭৩ খানি সাধারণ পলিসি এবং ভারতের বাহিরে অবশিষ্ট ৫১৬৭ খানি। এই সকল পলিসিতে (বোনাস সহ) মোট ১১৪৭৪৭০০৮ টাকা বীমা করা আছে। তন্মধ্যে ভারতে ১০৩৫০৬৯৪৯ টাকা এবং ভারতের বাহিরে ১১২৪০৩৫৯ টাকা।

ন্যাশন্যাল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানী লিমিটেড্

ন্যাশন্যাল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী, ন্যাশন্যাল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর ৪৯৩৯ শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। শেয়ার পিছু ৬০ টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ন্যাশন্যাল ইন্সুর‍্যান্সের পরিচালকগণ তাঁহাদের ব্যালান্স্ সিটে এই কোম্পানীর এক বৎসরের (১৯৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) হিসাব দেখাইয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দেওয়া হইল ;—

আয় :—১৯৩৬ সালের ১লা অক্টোবর

ফায়ার এণ্ড য়্যাক্সিডেন্ট্ ফাণ্ড	১০৩৬৩৫	টাকা
অগ্নি বীমা ও য়্যাক্সিডেন্ট্ বীমার প্রিমিয়াম (পুনর্ব্বীমা বাদ)	৪৫৫৬৬৩	,,
সুদ আদায়	৪১৪৫	,,
লাভক্ষতির হিসাব হইতে আনীত	৭০০০	,,

ব্যয়ঃ-

ফায়ার ও য়্যাক্সিডেন্ট দাবী শোধ	২১২৪৪৯	টাকা
কমিশন	১৬০০০৫	,,
পরিচালনা খরচ	৮২৯৯০	,,

এই সকল খরচা বাদে (১৯৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর) ফায়ার এণ্ড য়্যাক্সিডেন্ট্ ফাণ্ডে ১১৫০০০ টাকা জমিয়াছে।

এই কোম্পানীর রেজেষ্টারীকৃত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ইসু ও বিক্রয় হইয়াছে। এই ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৬৩৬২০১ টাকা। তন্মধ্যে লগ্নীতে আছে ৩২৭৫২৫ টাকা। অনাদায়ী প্রিমিয়াম ১৭২৯৭৪ টাকা। আসবাবপত্র ও মোটর গাড়ী (মূল্য হ্রাস বাদে) ৮৮০১ টাকা। এজেন্টদের হাতে ৪২৪০৯ টাকা এবং নগদ (আফিসে ও ব্যাঙ্কে) ৪১৪৯০ টাকা। রিজার্ভ ফাণ্ডে ৯০০০ টাকা আছে। মূলধন ও বিভিন্ন ফাণ্ড ব্যতীত কোম্পানীর দায়ের-ঘরে নিম্নলিখিত কয়েকটী দফা প্রধান দেখা যায় ;—

অবন্ধকী ঋণ	২২৩৮০	টাকা
কোম্পানীসমূহের ব্যালান্স্	৬৭৯৭৯	,,
জ্ঞাত ও স্বীকৃত দাবী, যাহা শোধ করা হয় নাই	৩৯৮৯৮	,,
পুনর্ব্বীমার দরুণ দেনা	২৯৫৪৪	,,
অগ্রিম প্রিমিয়াম	১৮৮	,,
খরচের বাকী	৪৯৬৭৬	,,
লাভক্ষতির হিসাবে	২৫৩৪	,,

ন্যাশন্যালের উত্তরোত্তর এইরূপ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমরা ইহার পরিচালকগণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বম্বে লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
১৯৩৭ সালের হিসাব ও রিপোর্ট

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

গত ১৭ই জুন (১৯৩৮) বম্বে লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর হেড্ আফিসে উহার ত্রিংশৎ বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৩৭ সালের হিসাব ও রিপোর্ট আলোচিত এবং গৃহীত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

নূতন কারবার

আলোচ্য বৎসরে ১৭২৫৭৯৭৫ টাকা মূল্যের ৯০৫৮টী বীমার প্রস্তাব কোম্পানী পাইয়াছেন। গত বৎসরেরও অল্প কয়েকটী বীমার প্রস্তাব গৃহীত হইবার বাকী ছিল। এই সমস্ত হইতে ১৪০০৬৬৬৫ টাকা মূল্যের ৭৭২৭টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহার প্রিমিয়াম আয় ৭৬৬৭২৬ টাকা।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বৎসরে আয় হইয়াছে মোট ৩৪৬৬৫৩৪ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে পাওয়া গিয়াছে ৩০৭৭০১৬ টাকা। সুদের আয় হইয়াছে ৩৮১৫৪৯ টাকা। ট্রান্স্ফার ও অন্যান্য ফিস্ ৩৩০৮ টাকা। লগ্নী বিক্রয়ে লাভ হইয়াছে ৪৬৫৯ টাকা। ব্যয় হইয়াছে মোট ১৮৪৭৩৭০ টাকা। তন্মধ্যে পলিসির দাবী শোধ বাবতে গিয়াছে ৬০০৯১৭ টাকা। সারেণ্ডার ভ্যালু দিতে হইয়াছে ৩৪২৪৭ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ১০৮৩০৯৭ টাকা। কোম্পানীর লাভের উপরে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স্ (সুপার ট্যাক্স সহ) দিতে হইয়াছে ৪৫২৬৩ টাকা। কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ডে কোম্পানী দিয়াছেন ১২২১৮ টাকা। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ও জমির খাজনায় গিয়াছে ৮৫৩৭ টাকা। ১৯৩৬ সালের ডিভিডেণ্ড স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে ১৬২১২ টাকা।

জীবন-বীমা তহবিল

সমস্ত খরচা বাদে বৎসরের শেষে জীবন বীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৯৮৬৮২৩২ টাকা। বৎসরের আরম্ভে ইহার পরিমাণ ছিল ৮২৪৯০৬৭ টাকা।

সম্পত্তি ও দায়

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১১১৯২২৫৮ টাকা। তন্মধ্যে বিভিন্ন নানা প্রকার সিকিউরিটীতে লগ্নী আছে ৭৮৪০৯৮৫ টাকা। ভারতীয় সম্পত্তিতে প্রথম মর্টগেজ ২৮২০২৫ টাকা। পলিসি বন্ধকী ঋণ আছে ৯৪৭২৫৩ টাকা। ভারতবর্ষে কোম্পানীর যে বাড়ী সম্পত্তি আছে, তাহার মূল্য ১১০৬২০৯ টাকা। প্রিমিয়াম বাকী ২৭০৮৪৪ টাকা;—সুদ বাকী ৩:৩৭২ টাকা। ব্যাঙ্কারের নিকট

নগদ আছে ৪০১১৬০ টাকা। বিভিন্ন ফাণ্ড এবং অংশীদারদের মূলধন ব্যতীত কোম্পনৌর দায়ের ঘরে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। কমিশন, অডিটারের ফিস্, বিজ্ঞাপনের খরচা, ডাক্তারের ফিস্ প্রভৃতি বাবতে দেনার পরিমাণ ২৫২২৩৬ টাকা। প্রিমিয়াম স্বরূপ ডিপজিট আছে ৯৬০৮৬ টাকা। স্বীকৃত অথবা জ্ঞাত কিন্তু অপরিশোধিত দাবীর পরিমাণ ৪০৮৩৫৬ টাকা হিসাবের দায়ের ঘরে দেখান হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ১১৮৮০০ টাকা ইতিমধ্যে শোধ হইয় গিয়াছে। অদাবীকৃত ডিভিডেণ্ড রহিয়াছে ২৬৬৩ টাকা এবং সিকিউরিটী ডিপজিট্ আছে ৫০০ টাকা।

বিভিন্ন তহবিল ও মূলধন

কোম্পানীর মূলধন ও বিভিন্ন ফাণ্ডের পরিমাণ এই ;—

জীবন বীমা তহবিল	৯৮৬৮২৩২ টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	২০৩৮২ ,,
আদায়ী মূলধন	১৩৫১০০ ,,
খারাপ ও সন্দেহজনক	
ঋণের জন্য রিজার্ভ	১৫৩০৯ ,,
ডিপ্রিসিয়েশান ফাণ্ড	১৪৩৬৫৮ ,,
প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড	১৫৮৯৮৪ ,,

পলিসির দাবী

আলোচ্য বৎসরে ২৩২ জন পলিসি হোল্ডারের মৃত্যুজনিত দাবী (বোনাস সহ) ৪২৬৩৯৬

টাকা দেওয়া হয়। ১২৩টী মেয়াদী বীমার সময় উত্তীর্ণ হয় এবং তদ্দরুণ বোনাস্ সহ ১৯৪৪৯৮ টাকা দাবী দেওয়া হয়। এই সকল দাবীর মধ্যে ১৫২০৬ টাকা অন্য কোম্পানীতে পুনর্ব্বীমা করা আছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মৃত্যুজনিত

বাংলা দেশস্থ চীফ্ এজেন্ট—

মিঃ আই, বি, সেন।

দাবীর পরিমাণ প্রায় ৬৭ হাজার টাকা বাড়িয়াছে।

খরচের অনুপাত

১৯৩৬ সালে প্রিমিয়াম আয়ের সহিত খরচের অনুপাত যত ছিল, আলোচ্য বৎসরে তদপেক্ষা শতকরা প্রায় ১॥০ টাকা কমিয়াছে।

ডিভিডেণ্ড ও বোনাস্

আলোচ্য বৎসরে আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড এবং শতকরা ১০ টাকা হিসাবে বোনাস্ (উভয়ই ইন্‌কাম্ ট্যাক্স মুক্ত) দেওয়া হইয়াছে।

মোট মজুত বীমা

১৯৩৭ সালের শেষ দিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর মোট মজুত বীমার পরিমাণ ৩২৫১০ সংখ্যক পলিসিতে (বোনাস্ ও য়্যান্যুইটী সহ) ৬০৪৭০৫৯৩ টাকা।

বিবিধ

কোম্পানী ইন্‌সুর্যান্স লেজিস্‌লেশান্ কমিটীতে ৩৭৫০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। নূতন বীমা আইন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইবার সময় এই কমিটী ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিবিধ প্রকারে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। নূতন বীমা সংগ্রহ করিবার ব্যয় কমাইবার জন্য কোম্পানী চীফ এজেন্সী ক্রমশঃ তুলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্রাঞ্চ আফিস খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। নূতন আইনে চীফ এজেণ্টদের বেতনের কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, কিন্তু সাধারণ এজেণ্টদের কমিশন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; সেইজন্যই কোম্পানী চীফ এজেন্সী তুলিয়া দিবার মতলব করিয়াছেন। মৃত্যুজনিত দাবী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে যে হারে বাড়িয়াছে, নূতন কারবারের পরিমাণও সেই হারে বাড়িয়াছে। সুতরাং মৃত্যু জনিত দাবী বৃদ্ধি আশঙ্কার বিষয় নহে। নিম্নে বম্বে লাইফের গত ৫ বৎসরের ক্রমোন্নতির পরিচয় দেওয়া হইল;—

সাল	নূতন বীমা টাকা	প্রিমিয়াম আয় টাকা	জীবন বীমা তহবিল টাকা	দাবী শোধ টাকা
১৯৩৩	৯৪১৬৫০০	১৫১২৬৯১	৫০০৪৮৭১	৩৫৪০০৩
১৯৩৪	১০৪৩৩৭৫০	১৮৮৫৯৭০	৫৮০২৯৮৩	৩৮৮৯৬৫
১৯৩৫	১২৩২৮০০০	২২৫৪৮৬৫	৬৮০১৫০০	৫৭৫১৯৮
১৯৩৬	১৩৬০০১৮০	২৬৭৬২৭৪	৮২৬৯৪৫০	৫৯২২৮৮
১৯৩৭	১৪০০৬৬৬৫	৩০৭৭০১৬	৯৮৬৮২৩২	৬০০৯১৭

মিঃ আই বি সেনের পুত্র—

মিঃ এন, আর, সেন।

উপরি উক্ত তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বম্বে লাইফ কিরূপে বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্থির পদক্ষেপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ কে এম্‌ মুন্সী বি এ, এল এল বি, য়্যাডভোকেট্‌ বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়াতে ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে মিসেস্‌ লীলাবতী কে মুন্সী ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ পি জে বিলমোরিয়া (কোম্পানীর প্রধান ডিরেক্টার) সম্প্রতি ভারতে না থাকায়, মিঃ মানিক লাল প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ার-ম্যান হইয়াছেন।

জেনারেল এ্যাসুর‍্যান্স সোসাইটীর বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার ডিক্রী

আবদুল রেজাক নামক এক ব্যক্তি আজমীরের (রাজপুতানা) জেনারেল য়্যাসুর‍্যান্স সোসাইটী হইতে ১৯৩৩ সালের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে নিজ নামে ও তাঁহার স্ত্রীর নামে একটী ১০ হাজার টাকার যুক্ত-পলিসি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পলিসির এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে বীমাকারীদ্বয়ের যে কোন একজনের মৃত্যু হইলেই পলিসির দাবীর টাকা পাওনা হইবে। ১৯৩৩ সালের ২৬শে অক্টোবর সন্তান প্রসব করিবার সময় আবদুল রেজাকের স্ত্রী জামিলা খাতুনের মৃত্যু হয়। পলিসির সর্ত্ত অনুসারে আবদুল রেজাক কোম্পানীর নিকট দশ হাজার টাকা দাবী করে। কিন্তু কোম্পানী এই বলিয়া টাকা দিতে অস্বীকার করে যে আবদুল রেজাক পলিসি লইবার সময় প্রস্তাব পত্রে তাহার স্ত্রীর বয়স ঠিক লেখায় নাই এবং উহার গর্ভাবস্থা গোপন করিয়াছিল। সুতরাং প্রতারণা-হেতু সে পলিসির টাকা পাইতে পারে না।

অতঃপর হাইকোর্টে মিঃ জাষ্টিস্ লর্ট উইলিয়াম্‌সের এজলাসে মামলা দায়ের হয়। তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া ও কাগজ পত্রাদি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন, বাস্তবিক ফরিয়াদী পক্ষে কোন প্রকার প্রতারণা করা হয় নাই। আসামী কোম্পানীর পক্ষ হইতে প্রতারণার যে সকল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি দুর্ব্বল ও অগ্রাহ্য। ১৯৩৩ সালের ২৬শে অক্টোবর জামিলা খাতুন সন্তান প্রসব করে। ইহাতেই আসামী কোম্পানী ধরিয়া লইয়াছেন যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ২৫শে মার্চ্চ তারিখে পলিসি লইবার পূর্ব্বে জানুয়ারী মাসে জামিলা খাতুনের গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ধরিয়া লওয়া আন্দাজের প্রমাণ মামলার বিচারে গ্রাহ্য নহে। সকলেই জানে গর্ভ সঞ্চার হওয়া মাত্রই তাহা জানিবার উপায় নাই। এমন কি দুই তিন মাসের মধ্যেও তাহা জানিতে হইলে বিশেষ ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং বীমাকারী যে জ্ঞাতসারে সত্য গোপন করিয়া পলিসি লইয়াছেন, একথা টিকেনা। বিশেষতঃ এমন অনেক ঘটনাও দেখা যায় যে স্থলে স্বাভাবিক দশ মাসের পূর্ব্বেই ভূমিষ্ঠ হয়।

আসামী কোম্পানী আর একটী আপত্তি দেখাইয়াছে যে, বীমার প্রস্তাব গৃহীত হইবার সময় জামিলা খাতুনের বয়স ২৫ বৎসরের কম ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধেও আসামী কোম্পানী যে প্রমাণ আনিয়াছে, তাহা অপ্রচুর ও অসন্তোষজনক। বিবাহ সার্টিফিকিটে জামিলা খাতুনের যে বয়স লেখা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। কারণ পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই বিবাহের সময় কন্যার বয়স কম করিয়াই বলেন। জামিলা খাতুনের দুইবার বিবাহ হইয়াছিল এবং আবদুল রেজাক তাহার দ্বিতীয় বারের স্বামী। সুতরাং তাহার বয়স যে ২৫ এর কম ছিল এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বিচারপতি মামলা খরচা ও সুদ সহ (শতকরা ৬ টাকা হিসাবে) ডিক্রী দিয়াছেন।

ফরমুলা ও রিসিপি

মরিচা দূর করিবার উপায়

স্ক্রু, মেসিনের ছোট খাটো কলকব্জা, অনুরূপ ইস্পাতের দ্রব্য সমূহে সহজে মরিচা ধরে এবং তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। সেইজন্য ব্যবহারকারিগণ উহাদিগকে মরিচা ও ক্ষয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হ'ন। অথচ সঠিক উপায়টির সম্বন্ধে তাঁহারা সম্যক অবগত নন্। নিম্নলিখিত উপায়ে মরিচা ও ক্ষয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করা চলে :—

অর্দ্ধ গ্যালন জলে ১ আউন্স এলুমিনিয়াম সালফেট, ১ আউন্স ক্রীম্ অব্ Tartar ও ½ আউন্স টিন গুলিয়া ফেলুন ; পরে একটী দস্তার পাত্রে উক্ত সলিউশন্ ঢালিয়া তাহাতে আপনার ইপ্সিত দ্রব্যটি ৪৫ মিনিট কাল ফুটান। তাহার পর উহাকে তুলিয়া লইয়া করাত গুঁড়োর সাহায্যে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্ম কাঠ গুঁড়োর দ্বারা পালিশ করিলেই উহা একেবারে ঝক্‌ঝকে হইয়া উঠিবে।

আর্শী ও জানালার কাঁচ পরিষ্কার প্রণালী

সকলেই জানেন যে আয়না ও জানালার আর্শীতে এক রকম দাগ পড়ে, সাধারণ ভাবে হাজার পরিষ্কার করিলেও সেই দাগ দূরীভূত হয় না। অথচ সেই দাগ তুলিয়া ফেলিবার উপায় আছে। কড়া সাবান সলিউসনে ৭ আউন্স প্রিসিপিটেটেড্ চক্ ও ২ আউন্স ত্রিপলি গুলিয়া ন্যাকড়া সাহায্যে উক্ত আয়না বা কাঁচে লাগাইয়া শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে তাহা মুছিয়া ফেলিলেই পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হইয়া উঠে।

চীনা মাটির ভাঙ্গা বাসন জুড়িবার প্রণালী

লোকের ঘরে চীনা মাটীর জিনিষ পত্র থাকে এবং তাহা ক্ষণ ভঙ্গুর হওয়ার দরুণ প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়। অথচ যদি এমন উপায় থাকে যাহাতে ভাঙ্গা টুক্‌রো জোড়া দেওয়া চলে তাহা হইলে গৃহস্থের অনেক উপকার হয়। আমরা নিম্নে চীনা মাটীর ভাঙ্গা বাসন জুড়িবার একটি উপায় উদ্ধৃত করিলাম :—

সোহাগার স্যাটুরেটেড্ সলিউশনের সঙ্গে দুগ্ধজাত পনীর মিশাইলে উহা আঠা আঠা মত হইবে। ভাঙ্গা পাত্রের গায়ে ঐ আঠা লাগাইয়া পরস্পর ঠিক করিয়া জুড়িয়া দিয়া একদিন রাখিলেই ভাঙ্গা জুড়িয়া যাইবে।

ডিম পরীক্ষার উপায়

ডিম বেশী দিনের হইলে তাহা খারাপ হইয়া

যায় বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ত কথাই নাই। কোন লোক পুরা দাম দিয়া হয় ত এক কুড়ি ডিম কিনিল। কিন্তু বাড়ী লইয়া গিয়া ব্যবহারের সময় দেখিল যে তাহার অনেকগুলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহাকে যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা ভুক্তভুগী মাত্রই অবগত আছেন। ডিম পুরানো হইলেই নষ্ট হইয়া যায়, টাট্কা থাকিলে সহজে নষ্ট হয় না—অথচ উপর হইতে টাট্কা বা বাসী বলিয়া চিনিবার সহজ কোন উপায় নাই। আমরা নিম্নে ডিম পরীক্ষার একটি উপায় লিপিবদ্ধ করিলাম :—

এক কাপ জলে ২ চামচ লবণ ফেলিয়া দিন। তৎপরে সেই ডিমটি ডুবান। যদি ডিমটি জলের তলায় গিয়া পড়ে তবে তাহা টাট্কা। যদি ভাসে তবে তাহা পুরাণো।

কেশ কুঞ্চিত করিবার প্রণালী

আজকাল দেখা যায় যে অনেকেই কেশ কুঞ্চিত করণের জন্য ব্যস্ত হ'ন। কিন্তু সেই সম্পর্কে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিরুণী বা অপরাপর প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয় তাহার খরচ অনেক। সুতরাং সস্তার কিছু উপায় থাকিলে সাধারণ কেশ বিলাসীরা উপকৃত হন সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে একটি তৈল প্রস্তুতের ফরমূলা প্রদান করিলাম, উহা ব্যবহারে চুল কোঁকড়াইয়া যায়।

সোহাগা	৪ ভাগ
পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড	৫ ,,
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	২ ,,
সাল্ফোনেটেড্ অলিভ্ তৈল	১০ ,,
কড়া এ্যামোনিয়া	১৫ ,,
জল	৬৮·৫ ,,

গাছে ফুল ফুটাইবার উপায়

অনেকের ফুল গাছের সখ আছে দেখা যায় এবং তাঁহাদের ইচ্ছা যে গাছে অধিক সংখ্যক ফুল ধরুক। নিম্ন উপায়ে তাহা সম্ভব হয়।

এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	৪০ ভাগ
,, ফস্ফেট্	২০ ,,
পটাসিয়াম নাইট্রেট্	২৫ ,,
এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্	৫ ,,
ক্যাল্সিয়াম সালফেট্	৬ ,,
ফেরাস্ সাল্ফেট্	৪ ,,

হাজার ভাগ জলে উক্ত ভাবে সংমিশ্রিত পদার্থ এক ভাগ মিশাইয়া গাছে ও ফুলে ছিটাইলে ফুল তাজা থাকে ও বড় হয়।

সর্দ্দির প্রতিকার

অনেকে মনে করেন কেবল বুঝি ঠাণ্ডা লাগিয়াই সর্দ্দি হয় কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

সর্দ্দি অনেকটা সংক্রামক—বিশেষতঃ শিশুদের মধ্যে। সাধারণতঃ দেখা গিয়া থাকে একটি শিশুর সর্দ্দি হইলে একে একে সকলেরই হইয়া থাকে। অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সর্দ্দি আক্রান্ত ব্যক্তি হইতে পৃথক থাকা আবশ্যক, কাশিতেছে বা হাঁচিতেছে এরূপ ব্যক্তির নিকটে সর্ব্বদা থাকিলে বা তাহার বস্ত্রাদি নাড়াচাড়া করিলেও সর্দ্দি হইয়া থাকে। উন্মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে প্রধানতঃ সর্দ্দি হইয়া থাকে। উন্মুক্ত বায়ুতে সর্দ্দির জীবাণু বায়ুপ্রবাহে দূরান্তরিত হইয়া থাকে—আর এক কথা, গরম বদ্ধ বায়ুতে নাসিকার উক্ত জীবাণু প্রতিরোধ শক্তি থাকেনা। এই জন্যই বদ্ধ ঘরে জানালা দরজা বন্ধ করিয়া থাকার জন্য বা জনাকীর্ণ স্থানে বহুক্ষণ থাকাতেও সর্দ্দি হইয়া থাকে।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগিয়াও সর্দ্দি হইয়া থাকে। শৈশব হইতে গাত্রচর্ম্ম ঠাণ্ডা বাতাস সহনোপযোগী করিয়া তোলা উচিত। সর্ব্বদা শিশুদের সর্ব্বাঙ্গ কাপড় জামা মুড়িয়া রাখার অভ্যাস মোটেই ভাল নহে; ইহাতে গাত্রচর্ম্ম কখনই বাহিরের হাওয়া সহ্য করিতে পারে না, অল্পেই সর্দ্দি লাগে। ধীরে, ধীরে বাহিরের হাওয়া সহ্য করাইয়া লইলে শিশুদের গাত্রচর্ম্ম ক্রমে ঠাণ্ডাসহ হইয়া উঠে।

খাটি সরিষার তৈল গায়ে নিয়মিত রূপ মাখিলে গাত্রচর্ম্মের ঠাণ্ডা প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়া থাকে। যাঁহারা ভাল করিয়া সরিষার তৈল গায়ে মাখেন তাঁহাদের সহজে সর্দ্দি হইতে দেখা যায় না। চরক খাটি সরিষার তৈলের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। সরিষার তৈলের গণ্ডূষ করিলে দাঁত শক্ত হয়।

সমালোচনা

আর্থিক জগৎ

ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও অর্থ-নীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক,—শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট, (কলিকাতা) হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ডাক মাশুল সহ বার্ষিক ৬৲ টাকা প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই আনা।

আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা ছিলাম একাকী, নিঃসহায় এবং সহযোগী শূন্য। ইংরাজী কয়েকখানি কাগজ তখন বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত। ক্রমে ক্রমে দুই চারিটী সহযোগীর দেখা পাইলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনশ্চ অদৃশ্য ও বিলুপ্ত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল পরে বাংলার ব্যবসা ক্ষেত্রে নব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। ধনকুবের কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহার সহায়তায় এবং শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত "আর্থিক উন্নতি" তাহার প্রধান পরিচয়। এতদ্ব্যতীত বণিক, কৃষিলক্ষী, প্রভৃতি কয়েকখানি ছোট মাসিক কাগজও চলিতেছে। কিন্তু বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য "আর্থিক জগৎ" প্রকাশ করিয়া সেই অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন। যতীন বাবুর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য;—আনন্দ বাজার পত্রিকায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ধারা যতীন বাবুর সম্পাদনাতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নব প্রতিষ্ঠিত দৈনিক সংবাদ পত্র যুগান্তরের প্রথম সম্পাদকরূপে কিছুকাল কার্য্য করিয়া তিনি এক্ষণে "আর্থিক-জগৎ" প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, যতীন বাবু এইবারে তাঁহার প্রকৃত কার্য্য ক্ষেত্রে আসিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, "আর্থিক-জগতের" রাজনৈতিক চর্চ্চা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে এবং সেই স্থলে খাঁটী ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ আলোচিত হইতেছে।

আর্থিক জগতে বিবিধ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ সম্ভার, দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ, শিল্পের বিবরণ, বাজার দর, বীমা,

ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি যেরূপ সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। উপযুক্ত সহযোগী পাইয়া আমাদের বহু কালের আশা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এখনও বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থিক সম্বন্ধীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে কেবল মাত্র মাটী কাটার কাজ (spade work) আরম্ভ হইয়াছে। প্রাসাদ তৈয়ারী হইবার এখনও অনেক বাকী। আশাকরি আর্থিক জগতের সম্পাদক মহাশয় এবং পরিচালকগণ এ কথা স্মরণ রাখিবেন। বাংলাদেশের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক বন্দর ও গঞ্জ আছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা মাল ও শিল্প-দ্রব্যের কারবার চলিতেছে। ইহাদের সহিত যোগাযোগ না রাখিলে সংবাদ পত্রের প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধিত হয় না এবং যাঁহারা প্রকৃত কারবারী এবং ব্যবসায়ী তাহাদের সাহায্য করা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, আর্থিক জগৎ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের পথ প্রসারিত করিবেন।

আর্থিক জগতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজ কারবারের যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সংবাদ বাহির হইতেছে তাহার সম্যক পরিচয় অথবা বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার স্থান বা ক্ষেত্র মাসিক পত্রে নাই। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এই কাগজখানি রাখিলে ব্যবসায়ীরা প্রকৃতই উপকৃত হইবেন। ব্যবসা সম্পর্কীয় কাগজের পথ বহু ব্যয়সাপেক্ষ এবং বিঘ্ন সঙ্কুল; তাহা ছাড়া ইহাকে ব্যবসায়ীদিগের প্রকৃত উপযোগী এবং কল্যাণকামী করিতে হইলে সারা বাংলা ভাষাভাষী সহস্র সহস্র বন্দর, গঞ্জ এবং মোকামের ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ইহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আয়োজন চাই। ইহা সময়, সাধনা ও অর্থ সাপেক্ষ। বন্ধু যতীন্দ্র নাথকে আমরা এদিকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি।

পুষ্পরাজ তৈল

আমরা কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন হইতে এক শিশি পুষ্পরাজ কেশ তৈল উপহার পাইয়াছি। ইহার গন্ধ মনোহর এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী। তেলের উপকারিতা সম্বন্ধে শিশিতে লেখা আছে ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল রাখে, মন প্রফুল্ল হয় এবং ঘনকৃষ্ণ কেশরাজি জন্মে। এক শিশি তেল ব্যবহার করিয়া ইহার ফলাফল বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। তবে কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন হইতে এই তেলের পরিচয় যখন এইরূপ দেওয়া হইয়াছে তখন আমরা এই উক্তির উপর নির্ভর করিতে পারি।

কান্তি সোপ

আমরা বালীগঞ্জের Calso Park স্থিত ক্যালকাটা সোপ্ ওয়ার্কসের প্রস্তুত "কান্তি সোপ" এক বাক্স ব্যবহার করিয়া দেখিবার জন্য উপহার পাইয়াছিলাম। কান্তি সোপ Toilet সোপ; সুতরাং খাদ্যাদি সম্বন্ধে আমরা যেমন Pure food ব্যবহার করবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রোপ্যাগাণ্ডা করি এবং সকল প্রকার ভেজাল ও impurities পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেই, Toilet বা গায়ে মাখিবার সাবান সম্বন্ধেও সকলকে ঠিক সেই রকমই উপদেশ দেই। ভারতবর্ষের জ্ঞাত, অজ্ঞাত এবং খ্যাত, অখ্যাত নানা কারখানা হইতে Toilet সাবান বাহির হয় সত্য, কিন্তু বোম্বাই এবং বাঙ্গলার মুষ্টিমেয় কয়েকটী কারখানা ব্যতীত আর কোনও কারখানা হইতে chemically pure এবং ব্যবহার যোগ্য সাবান অতি

অল্পই দেখিয়াছি। বিশুদ্ধ সাবানের কয়েকটী লক্ষণ এইখানে বর্ণনা করিতেছি,—

১। ইহা কোনও প্রকার রংহীন অর্থাৎ সাদা হইলেই ভাল হয়।

২। Free alkali বা ক্ষার জাতীয় দ্রব্য যাহাতে এক বিন্দুও না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

৩। পরিমাণ মত তৈলযুক্ত এবং soft হওয়া চাই।

সাধারণ লোকের পক্ষে এই সব বুঝিবার উপায়ও সহজ, যথা :—

(ক) Free alkaliর জন্য এবং কষ্টিক সোডার সহিত তৈলের সংমিশ্রণ সুন্দররূপে না হইলে সাবানের গায়ে ক্ষারের দাগ এবং ডিপ-জিট ফুটিয়া উঠে। খরিদ্দার ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারেন।

(খ) সাবান কাটিয়া ফেলিলে অথবা ২।৪ দিন ব্যবহার করিলে সাবানের ভিতরে জায়গায় জায়গায় নানারূপ দাগ দেখা যায়। উহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সোডা ও তৈলের মিশ্রণ সুন্দররূপে না হওয়ায় কিছুকাল পরে তৈল rancid হইয়া সাবানের ভিতরে দাগ সৃষ্টি করিয়াছে। Skin food হিসাবে ইহা মারাত্মক না হইলেও ইহাকে Perfect Soap বলা যায় না।

(গ) Soapএ যদি Free alkali বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ থাকে তবে তাহা ব্যবহার করিলে সমস্ত গায়ের চামড়া খড়ির মত খস্‌খসে হয় এবং স্নানের পরে চামড়া একেবারে শুকাইয়া চড়্ চড়্ করিতে থাকে; তাহাছাড়া সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইতে থাকে। এরূপ সাবান বিষের মত বর্জ্জন করা উচিত।

(ঘ) যেসকল সাবান টিপিলে আঙ্গুল বসিয়া যায় তাহা দুই দিনেই ক্ষয় হইয়া যায়। যে সকল সাবান ঘামে তাহার মধ্যে ক্ষারের সহিত তৈলের সংমিশ্রণ হয় নাই এইজন্য ইহাও ভাল সাবান নহে।

এই সকল পরীক্ষার দ্বারা আমরা কান্তিসোপ ব্যবহার করিয়া দেখিলাম ইহা সর্ব্বাংশেই উচ্চ শ্রেণীর Toilet সাবান হইয়াছে। ইহা গায়ে ২।৩ বার মাখিলেও চামড়া একটুও খস্‌খসে হয়না। প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি চামড়া স্নিগ্ধ এবং মসৃণ থাকে। গন্ধও খুব মধুর। সাবানের গন্ধটা Skin food হিসাবে একেবারে অবান্তর; অর্থাৎ কোনওরূপ গন্ধ না থাকিলেও চলে। Baby Soap বা শিশুদিগের জন্য যে একেবারে Pure সাবান তৈরী হয় তাহা যেমন colourless তেমনি একেবারে গন্ধশূন্য। কারণ গন্ধ বা Essential Oil এর মধ্যে যে alcohol বা rectified spirit থাকে তাহা চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর Baby Soap এ কোনওরূপ scent বা সুগন্ধ দেওয়া হয়না।

কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদিগের জন্য সাবানের পক্ষে Scent বা Essential Oil, Skin food হিসাবে অনাবশ্যক এবং অবান্তর হইলেও শরীরের ক্লেদ ও ঘর্ম্মজাত দুর্গন্ধ দূর করিয়া চিত্তে স্নানের একটা বিমল আনন্দ দিতে জগতের সকল সোপব্যবসায়ীই সাবানে অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্যাদি মিশ্রণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই সাবানের দামের এত ইতর বিশেষ হয়। skin food এর basis এ অনেক কারখানার সাবান সম্পূর্ণ সমকক্ষ হইলেও যে কারখানার সাবানে যেরূপ গন্ধ দ্রব্য মিশানো হয় তাহার দামের উপরে পড়্‌তা করিয়া সাবানের দাম ফেলা হয়। এইরূপে গোলাপ সার, অগুরু, চন্দন, হেনা, ল্যাভেণ্ডার, অটোডি রোজ ইত্যাদি এসেন্সের দাম এবং সুগন্ধের উপর সাবানের পড়তা ধরা হয়।

সুগন্ধের দিক দিয়া কান্তি সাবানের গন্ধও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মালিকেরা ইহার দাম কত ফেলিয়াছেন জানিনা। শুনিলাম কলেজ ষ্ট্রীটের বড় বড় মনোহারী দোকানে পাওয়া যায়। পূজার বাজারে প্রিয়জনদিগকে উপহার দিবার পক্ষে কান্তি সাবান যে খুব উৎকৃষ্ট এবং পছন্দসই উপহার হইবে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৪৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সেলুলয়েড শিল্পের কথা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন নানাবিধ শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেল, তখন যে সকল কাঁচামাল স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহাদের অকুলান হইয়া উঠিল। কৃত্রিম কাঁচামাল তৈয়ারীর ইহাই মূল কারণ। বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এ যাবৎ বহুবিধ কাঁচামাল কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অসংখ্য প্রকারের রঞ্জনদ্রব্য নীল, রেশম, রেয়ন-তন্তু, বিবিধ গন্ধ ও স্বাদকর দ্রব্য,-প্রভৃতি বর্ত্তমান সময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের জন্য স্বাভাবিক উদ্ভিজ কাঁচামাল ব্যবহার হয়না। এতদ্ব্যতীত তৈল, মাখন, চিনি প্রভৃতিও আজকাল রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈয়ারী হইতেছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হাড়, শিং, হাতীর দাঁত প্রভৃতি জিনিষের নির্ম্মিত নানাবিধ জিনিষ মানব সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু কালক্রমে এই সকল জিনিষ অন্যপ্রকার অধিকতর প্রয়োজনীয়কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়াতে শিল্পের জন্য উহাদের অকুলান হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বলা যায়; হাড়ের কথা। বর্ত্তমান সময়ে হাড়ের গুঁড়া কৃষিকার্য্যে সাররূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে হাড় ব্যবহার হইত, সেই সকল শিল্পের জন্য আর হাড় পাওয়া যায়না। শিরীষ আটা তৈয়ারীর জন্যও শিং, হাড় প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সৌখীন শিল্পদ্রব্য অপেক্ষা শিরীষ আটা অধিকতর প্রয়োজনীয়। এইসকল কারণে শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য হাড়, শিং প্রভৃতি জিনিস আর পাওয়া যায়না। হাতীর দাঁতও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে জমিদার ও রাজা মহারাজা

সকলেই হাতী পুষিতেন। সেইজন্য বুনো হাতী ধরা পড়িত অনেক। আজকাল মোটর গাড়ীর চলন হওয়াতে হাতী পোষা উঠিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ হাতীর খোরাক জোগান, একটা অসম্ভব ব্যাপার। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে গজদন্তের শিল্প নষ্ট হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ।

এইরূপে হাড়, শিং ও গজদন্তের অভাব হওয়াতে শিল্পব্যবসায়ীরা ঐসকল জিনিসের সমগুণ বিশিষ্ট কৃত্রিম দ্রব্য পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাজারের এই চাহিদার ফলে এবং বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় অবশেষে সেলুলয়েডের সৃষ্টি হয়। ইহা তৈয়ারী করিতে খরচা খুব অল্প। ইহাকে ইচ্ছামত নরম করিয়া এবং প্রয়োজনানুসারে ছাঁচে ঢালিয়া বিভিন্ন আকৃতির নানাবিধ শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করা যায়। পুনশ্চ ইহাকে খুব কঠিন অবস্থায় কাঠের মত কাটিয়া কুটিয়া এবং কুঁদিয়া বাক্স পেট্‌রা, ঝাঁপি, কৌটা, ফ্রেম, খেলনা, পুতুল, ছোটখাট আসবাব পত্র প্রভৃতি তৈয়ারী করা যায়। ইহা কাঠের চেয়ে হাল্কা, এবং অসাবধানতার দরুণ হাত হইতে পড়িলে সেলুলয়েডের জিনিস সহজে ভাঙ্গিয়া যায়না। ইহাতে নানারকমের চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক রং ফলান যাইতে পাবে,—তাহার খরচাও বেশী নহে। এইসকল সুবিধা থাকার দরুণ সেলুলয়েডের ব্যবহার খুব বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল শিল্পে হাড়, শিং, গজদন্ত, কচ্ছপের খোল, ঝিনুক প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতনা, তাহাতেও এক্ষণে সেলুলয়েড ব্যবহার হইতেছে।

৭৫° ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড) পরিমাণ উত্তাপেই সেলুলয়েডকে নরম এবং ছাঁচে ফেলিবার যোগ্য করা যায়। সাধারণতঃ গরম জলে ডুবাইয়া অথবা ষ্টীম টেবিলের উপর রাখিয়া সেলুলয়েডকে নরম করা হয়। এত কম তাপে নরম করা যায় বলিয়া সেলুলয়েডকে শিল্প কার্য্যে ব্যবহার করা খুব সুবিধাজনক। জলে অথবা ডাইলিউট য়্যাসিডে (অর্থাৎ জলমিশ্রিত হাল্কা য়্যাসিড্) সেলুলয়েড্ নষ্ট হয়না। ইহাও আর একটী সুবিধার বিষয়। সেলুলয়েড্‌কে প্রয়োজন মতে খুব পাত্‌লা ও স্বচ্ছ করা যায়; অথচ কাচের মত ইহা ভঙ্গুর নহে। সেইজন্য বর্ত্তমান সময়ে ফটো-গ্রাফির প্লেট্ ও সিনেমার ফিল্মের জন্য সেলুলয়েড ব্যবহার করা হয়। বাস্তবিক সেলুলয়েড্ উদ্ভাবিত না হইলে সিনেমার ফিল্মই তৈয়ারী হইতনা। চিরুণী, ছুরির বাঁট, পিয়ানো ও হারমোনিয়মের চাবি, সার্টের কলার, সোপ্‌কেস্ ফাউন্টেন পেন্ প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মাণে বর্ত্তমান সময়ে সেলুলয়েডের ব্যবহার একেবারে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

শিল্প জগতে এই সেলুলয়েড একটী key industry বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সকল শিল্প জাত দ্রব্য অন্য বহুবিধ প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; সেই সকল শিল্পকে কী ইন্‌ডাষ্ট্রী (Key Industry) অর্থাৎ "শিল্পের চাবি কাটি স্বরূপ" বলা হয়। যার কাছে ভাণ্ডারের চাবি কাটি থাকে, সেই যেমন প্রধান ও শক্তিমান হয়, সেইরূপ ঐ সকল শিল্প দ্রব্য যারা তৈয়ারী করে, ব্যবসা ক্ষেত্রে তারাই ক্ষমতাশালী এবং অর্থবল সম্পন্ন হইয়া থাকে। য়্যালুমিনিয়াম, পিতল, কাঁসা, তামা, লোহা, প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য, গ্লিসিরিণ, সোডা য়্যাশ, কোলটার (Coal-tar) বা আল্‌কাতরা, প্রভৃতি

কেমিক্যাল, কাচ, রাবার, সেলুলয়েড—এই সকল শিল্প দ্রব্য ঐ কী ইন্‌ডাষ্ট্রীর (Key industry) অন্তর্গত।

এই সকল চাবি কাটি শিল্পের অনেকগুলিই আমাদের দেশে নাই। জামসেদপুরের টাটা কোম্পানীর দিকে চাহিয়া বলা যায়, কী-ইন্‌ডাষ্ট্রীর মধ্যে বাস্তবিক একমাত্র লৌহ শিল্পই আমাদের দেশে আছে। দক্ষিণ ভারতে রাবারের চাষ হয়,—কাঁচা রাবার কিছু তৈয়ারীও হয়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের তুলনায় তাহা সামান্য। পরন্তু ঐ রাবার শিল্প বিদেশীয় ব্যবসায়ীদেরই হস্তগত।

দেশীয় শিল্পের যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে এই কী-ইন্‌ডাষ্ট্রীগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে বালুকা ভিত্তির উপরই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা হইবে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখুন। আমাদের দেশে সাবানের কারখানা অনেক হইয়াছে এবং আমরা স্বদেশী সাবান ব্যবহার করিয়া ভাবিতেছি, দেশের খুবই উপকার হইল। কিন্তু আসল ব্যাপারটী কি?

আমাদের দেশীয় সাবানের কারখানার মালিক-গণকে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় প্রধান উপকরণ গ্লিসিরিণের জন্য বিদেশীয়দের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। আজ যদি বিদেশের গ্লিসিরিণ আসা বন্ধ হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাবান কারখানাও উঠিয়া যাইবে। এই আমদানী গ্লিসিরিণের দামের উঠ্‌তি পড়্‌তির সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া এবং প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া সাবান-শিল্পের কারখানা চালান অতি কঠিন ব্যাপার।

আমাদের দেশে য়্যালুমিনিয়ামের জিনিস খুব চল্‌তি হইয়াছে। ভারতবর্ষে য়্যালুমিনি-য়ামের জিনিস তৈয়ারী করিবার কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর এই কারবার খুব জোর চলে,—লাভও' হয় বেশ। কিন্তু আর সে দিন নাই। বিদেশী য়্যালুমিনিয়াম সিটের দর যেই চড়িয়া গেল;—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় কারখানা-গুলির দরজাতেও ঝাঁপ পড়িল। তারপর ধরুন কাচশিল্প। ইহার জন্য যে সোডা য়্যাশ্‌ দরকার, তাহা এদেশে তৈয়ারী হয় না। সুতরাং যে সকল ভারতীয় কারখানায় কাচের জিনিস প্রস্তুত হয়, তাহার মালিকেরা বিদেশ হইতে বড় বড় কাচের ব্লক্ আমদানী করেন এবং সেগুলিকে উনুনে গলাইয়া ল্যাম্পের চিম্‌নী, গেলাস, প্লেট্‌ বাটী, নল, কৌটা, দোয়াত, শিশি, বোতল প্রভৃতি তৈয়ারী করেন। দেশীয় কাচ শিল্পের এই পরনির্ভরতা ও দুরবস্থার কথা অনেকবার ট্যারিফ্‌ বোর্ডে এবং ব্যবস্থাপক সভায় আলো-চিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের কাচ শিল্পের অবস্থা কাচেরই মত ভঙ্গুর এবং টলটলায়মান।

এক্ষণে সেলুলয়েডের কথা। হিসাবে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষে ডজন খানেক সেলুলয়েড্‌ ফ্যাক্টরী আছে। ইহাদের মধ্যে ১০টী বাংলা-দেশে,—(ঢাকা, যশোহর ও কলিকাতা) এবং আর দুইটী কাণপুরে ও অমৃতসরে। কিন্তু এই সকল কারখানায় আসল সেলুলয়েড্‌ তৈয়ারী হয় না। বিদেশ হইতে তৈয়ারী সেলুলয়েডের পাত অথবা রড্‌ আনাইয়া তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া, মৌল্ড্‌ করিয়া নানা রকম জিনিস তৈয়ারী হয়,—এইমাত্র। সুতরাং বিদেশী সেলুলয়েডের দাম চড়িয়া গেলে, এই সকল কারখানার কাজ চলে না, কারণ তখন বিদেশের সঙ্গে, বিশেষতঃ জাপানের সঙ্গে দামের প্রতি-যোগিতা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং এই এক ডজন কারখানা দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না যে ভারতবর্ষে সেলুলয়েড্‌ শিল্প অন্ততঃ কিছুমাত্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ সেলু-লয়েড্‌ তৈয়ারী খুব কঠিন কার্য্য নহে এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জাও খুব জটিল ও ব্যয় সাধ্য নহে। ইহা প্রধানতঃ একটী রাসায়নিক শিল্প। মেকানিক্যাল বা যন্ত্রের দিক দিয়া এই শিল্পে কোন প্রকার নট্‌-খটি বা জটিলতা নাই। কিন্তু সকল প্রকার রাসায়নিক শিল্পেতেই যেমন মন্ত্রগুপ্তি (Trade secret) থাকে, সেলুলয়েড্‌ তৈয়ারীতেও সেইরূপ আছে। সেইজন্য ইহা আয়ত্ত করিতে হইলে রসায়ণ শাস্ত্রের বিদ্যার সহিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ আবশ্যক।

রসায়ন শাস্ত্রে সেলুলয়েড্‌কে কলয়েড্‌ (Colloid) শ্রেণীর পদার্থ বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্রবনীয় নাইট্রোসেলিউলোজ (nitrocellulose) এবং কর্পূর ইহার প্রধান দুইটী উপাদান

নাইট্রো সেলিউলোজের আর এক নাম পাই-রক্সিলীন (pyroxylin)। প্রথমে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার পার্কস্ (Alexander parkes) এবং তৎপর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হায়েট ভ্রাতৃদ্বয় (Hyat Brothers) সেলুলয়েড প্রস্তুত করেন। নাইট্রো সেলুলোজ এবং কর্পূর মিশাইয়া চাপ এবং তাপ প্রদান করিলে স্বচ্ছ সেলুলয়েড তৈয়ারী হয়। এই মিশ্রণের রাসায়নিক প্রকৃতি এখনও জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, সেলুলয়েড একটী কঠিন-দ্রব বা সলিড সলিউসান (Solid solution) বিশেষ। বাস্তবিক ইহা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় গঠিত কোন যৌগিক পদার্থ নহে। এই মিশ্রণ ঘটাইবার দুইটী প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

সিক্ত প্রক্রিয়া (Wet process)

প্রথমতঃ ৫ ভাগ সালফ্যুরিক য়্যাসিড, ২ ভাগ নাইট্রিক য়্যাসিড এবং ৬ ভাগ জল মিশাইয়া এই মিশ্রিত তরল দ্রব্যের উত্তাপ ৩০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড অথবা তাহার কিঞ্চিৎ উপরে তুলুন। এই তরল দ্রব্যের মধ্যে টিস্যু কাগজ (Tissue paper) ২০ মিনিট অথবা তাহার অধিক কাল ডুবাইয়া নাইট্রো সেলুলোজ তৈয়ারী করুন। ইহাকে জল দিয়া খুব ভালরূপে ধুইবেন,—যেন সমস্ত য়্যাসিড দূরীভূত হইয়া যায়। তারপর এই নাইট্রো-সেলুলোজকে ব্লীচ বা বর্ণহীন করিয়া লইবেন। অবশেষে হাইড্রো-একৃষ্ট্রাক্টার যন্ত্রে চাপাইয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে জল শূন্য করিয়া লউন। তারপর এই নাইট্রো-সেলুলোজ ৫০ ভাগ (ওজনে), য়্যালকহল ৫ ভাগ (আয়তনে), ঈথার ১০০ ভাগ (আয়তনে) এবং কর্পূর ২৮ ভাগ (ওজনে) এই সকল দ্রব্য খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া চটকাইবার মেসিনে (Kneading Machine) ঘুঁটিয়া লউন। ইহার সহিত প্রয়োজন ও পছন্দমত রং এবং ঘন করিবার জন্য খড়িমাটী অথবা কেওলীন মিশাইতে পারেন। কোন তরল দ্রব্যকে খুব গাঢ় ও কাদার মত ঘন করিবার জন্য যে সকল মশলা ব্যবহার হয়, তাহাকে শিল্পীরা ফিলার (Filler) বলিয়া থাকে। খড়িমাটী, কেওলীন, চীনামাটী, ময়দা (Starch) প্রভৃতি জিনিস ফিলাররূপে ব্যবহৃত হয়। রং (pigment) ও ফিলার মিশাইয়া মসলাটীকে খুব ঘুঁটিয়া উহার সহিত কিছু ইউরিয়া (urea) যোগ করিতে হয়। ইহাতে মশলাটী পাকা (stable) হইয়া উঠে। এক্ষণে এই কাদার মত ঘন পদার্থটীকে গরম বোলারের চাপে পাতলা কাগজের আকারে পরিণত করা হয়। তারপর পাতলা সিটগুলিকে হাইড্রলিক প্রেসের চাপে জুড়িয়া প্রয়োগ মত বিভিন্ন রকমের মোটা করিয়া লওয়া হয়। চাপ দিবার সময় হাইড্রলিক প্রেস্‌টী ৭৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পরিমিত উত্তপ্ত থাকা চাই। কাগজ ও বোর্ডের মত সিট তৈয়ারী না করিয়া সেলুলয়েডের চৌকা অথবা গোল রড কিংবা পাটিও তৈয়ারী করা যায়। এই সকল সিট, রড এবং পাটীগুলোকে একটা ঘরের মধ্যে কিছুকাল রাখিয়া পাকাইয়া (Seasoning) লইতে হয়। এই ঘরটী ৩০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পরিমিত উত্তপ্ত করা দরকার।

শুষ্ক-প্রক্রিয়া (Dry process)

প্রথমে নাইট্রো সেলুলোজ বা পাইরক্সি-লীনকে ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লউন। তারপর ইহাকে হল্যাণ্ডার (Hollander) যন্ত্রে জলের নীচে রাখিয়া খুব মিহি করিয়া গুঁড়া করুন। এই হল্যাণ্ডার যন্ত্র কাগজের কলে

ব্যবহার হয়। ইহাকে বীটারও Beater বলা হইয়া থাকে। এক্ষণে জল মিশান এই পদার্থটীকে হল্যাণ্ডার বা বীটার হইতে তুলিয়া একটা ছিদ্রযুক্ত পাত্রে পুরিয়া খুব চাপ দিন। তাহাতে অনেক জল ঝরিয়া যাইবে। তারপর ইহাকে ঐ ছিদ্রযুক্ত পাত্র হইতে বাহির করিয়া শতকরা ৪০—৫০ ভাগ কর্পূর ইহার সহিত মিশান এবং চটকাইবার যন্ত্রে Kneading machine খুব ঘুঁটিয়া লউন। এই সময়েই রং এবং ফিলার filler যোগ করিয়া লইবেন। এইবার ঘন জিনিসটীকে হাইড্রলিক প্রেসে ফেলিয়া খুব চাপে পাতলা সিটে পরিণত করুন। চাপ দিবার সময় হাইড্রলিক প্রেস্‌কে ষ্টীমের উত্তাপে ৬৩০ ডিগ্রী সেন্টীগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা চাই। এই প্রকার চাপ দিয়া কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিতে হয়। গলিত কর্পূরের মধ্যে নাইট্রো সেলুলোজ শীঘ্রই সলিউসান হইয়া যায়। প্রেসের চাপ হইতে বাহির করিয়া সেলুলয়েড সিটগুলোকে বায়ুতে রাখিয়া শুকাইতে হয়।

গজদন্ত, কচ্ছপের খোল, চামড়া, প্রবাল, মুক্তা, প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান দ্রব্যের অনুকরণের জন্য সেলুলয়েড নানাপ্রকার খণিজদ্রব্যজাত রং, লেক্ (Lakes) এবং য়্যানিলীন্‌জাত রং ব্যবহার করা হয়। ভঙ্গুর বলিয়া যে সকল স্থলে কাচ ব্যবহার করা যায় না, সেইস্থলে আজকাল সেলু-লয়েডের খুব চলন হইয়াছে। সিনেমার ফিল্মের জন্য যে সেলুলয়েড ব্যবহার হয় তাহাতে নাইট্রো সেলুলোজের পরিমাণ বেশী থাকে এবং ঐ নাইট্রোসেলুলোজকে খুব বেশী পরিমাণে নাইট্রিকয়্যাসিড যুক্ত করা হয়।

লাক্ষা প্রস্তুত প্রণালী

ইউরোপ এবং আমেরিকায় নানা শিল্পকার্য্যে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। এই লাক্ষা জিনিসটী কাঁচামালরূপে ভারতবর্ষেই উৎপত্তি হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ; এমনকি বলা যায়, লাক্ষা উৎপাদনের একচেটিয়া কারবার ভারতবর্ষের হাতেই রহিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লাক্ষার উৎপাদন ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থাদিতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লাক্ষার রং এবং লাক্ষার বার্ণিশ (কাষ্ঠনির্ম্মিত জিনিসের জন্য) ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে আরও বহুবিধ শিল্পে লাক্ষার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। নিম্নে যে কয়েকটীর কথা লিখিত হইল তাহাতে দেখা যাইবে, এই লাক্ষা জিনিসটী আজকাল শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে কত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামোফোনরেকর্ড, শীলমোহর করিবার গালা, বোতাম, লিথোগ্রাফিক কালী, শানপালিস যন্ত্রের জন্য কোরাণ্ডাম ও এমেরী চাকা, নকল গজদন্ত, অয়েলক্লথ, ইলেকট্রীক্-ইন্সুলেটর, এবং সকল প্রকারের বার্ণীশ তৈয়ারীকরিতে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে লাক্ষাদ্বারা চুড়ী, ব্রেস্‌লেট প্রভৃতি নানারকম অলঙ্কার তৈয়ারী হয়। ধাতুনির্ম্মিত ও গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এবং গহনার উপর কারুকার্য্য করিবার জন্য, বাক্স, পেঁটরা, কৌটা, ঝাঁপি প্রভৃতি নানাবিধ পারিবারিক প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী করিতে লাক্ষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একপ্রকার কীট (ইংরাজীতে ইহাদিগকে Coccus Lacca বলে) কুসুম, পলাশ ও তজ্জাতীয় বৃক্ষাদিতে বাস করিয়া যে রস খায়, তাহা হজম করিয়া উহারা নিজ দেহ হইতে একপ্রকার আঠার মত পদার্থ নিঃসারিত করে। সেই আঠার মত পদার্থটীই লাক্ষা। লাক্ষা ব্যবসায়ীরা এই কীটের চাষ করে। বীজ লাক্ষা হইতে কীটগুলি পিঁপড়ের মত ঝাঁকে ঝাঁকে উৎপন্ন হয়। উহাদিগকে গাছের ডালে ছাড়িয়া দিলে, উহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ডালে ছাইয়া যায় এবং ডালের রস শুষিয়া খাইতে থাকে। প্রথমতঃ ডালের উপরে একটা সাদা আঠার আবরণ দেখা যায় ; ক্রমশঃ উহা পুরু এবং লাল আভাযুক্ত কটা রং বিশিষ্ট হইতে থাকে। তার পর তিন চার মাসের মধ্যেই লাক্ষার ফসল তুলিবার উপযুক্ত হয়।

কুসুম বৃক্ষের লাক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের বনে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। বাবুল, খদ্দ, বার্‌বালাস প্রভৃতি গাছেও লাক্ষা কীটের চাষ হইয়া থাকে। গাছের ডালগুলো সমস্ত লাক্ষায় ঢাকিয়া গেলে উহাদিগকে সাবধানে ভাঙ্গিয়া সংগ্রহ করা হয়। বৎসরে দুইবার এইরূপ ফসল পাওয়া যায়। ইহাকে

ষ্টীক্-ল্যাক্ (Stick lac) বলা হয়। এই ষ্টীক্-ল্যাক্ বা কাঁচা লাক্ষাকে কারখানায় আনিয়া পাথরের চাক্কি অথবা রোলার মিলে গুড়া করা হয়। এই সময় সাবধান হইতে হইবে, যেন অতিরিক্ত মাত্রায় গুড়া না হয় এবং একেবারে ধূলার মত হইয়া না যায়। তার পর গুঁড়া পদার্থটীকে চালুনীর দ্বারা চালিয়া গাছের ডালের আঁশযুক্ত অংশ গুলোকে পৃথক করা হয়। এই-রূপে পরিস্কৃত লাক্ষার গুঁড়াকে কাচা-চৌরী বলে। ইহাকে অতঃপর একটী বৃহৎ প্রস্তর পাত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। লাক্ষা-প্রস্তুতকারী একজন মিস্ত্রী বা কারিকর তখন ঐ প্রস্তর পাত্রের মধ্যে নামে এবং পা ঘুরাইয়া ঘুরা-ইয়া সুকৌশলে লাক্ষার গুঁড়া গুলোকে প্রস্তর পাত্রের গায় ঘষিয়া পরিস্কার করিয়া লয়। জলের সহিত একটু সামান্য পরিমাণ সোডা, চূন বা অপর কোন ক্ষারজাতীয় পদার্থ মিশাইয়া দিতে হয়। মাঝে মাঝে লাক্ষার দানা গুলিকে তলায় পড়িতে দিয়া উপরের পরিস্কার জলটা ফেলিয়া পুনরায় জল মিশান আবশ্যক। এইরূপে সমস্ত ময়লা জলের সহিত বাহির হইয়া গেলে, শেষে নীচেকার সঞ্চিত ঘন কাদার মত পদার্থটী লইয়া উহাকে চাপিয়া চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা পিঠার মত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়।

রৌদ্রে শুকাইবার সময়, সাবধান হওয়া দরকার যেন, অধিক উত্তাপের দরুণ লাক্ষার দানাগুলো গলিয়া না যায়। ভালরূপে শুকান হইলে লাক্ষার পিঠাগুলোকে পুনরায় গুড়া করিয়া কুলো দিয়া ঝাড়িতে হয়। তাহাতে কাঠির টুকরা বালি কাকর প্রভৃতি ময়লা সমস্ত দূর হইয়া যায়। তারপর যে পরিষ্কার জিনিসটী পাওয়া যায় তাহার সহিত শতকরা ৯৪—৯৬ ভাগ গরম য়্যালকহল মিশাইলে দ্রবণীয় লাক্ষা পাওয়া যায়।

কিন্তু লাক্ষা তৈয়ারীর প্রক্রিয়া এই-খানেই শেষ হয়না। খুব ভাল নমনীয় মিহি ও উজ্জ্বল লাক্ষা তৈয়ারী করিতে হইলে, এই কুলোয়-ঝাড়া পরিস্কার লাক্ষার গুড়াকে একটী ৫০ ফুট লম্বা কাপড়ের থলির মধ্যে ভর্তি করা হয়। এই লম্বা থলিটী একটী কাঠ কয়লার চুলার সম্মুখে ঝুলান থাকে। লাক্ষ্যা গলিয়া গেলে থলিটীর একপ্রান্ত ধরিয়া ঘুরান হয়। আর একপ্রান্ত চুলার সম্মুখে উপবিষ্ট কারিগরের হাতে থাকে। থলিয়াটী মোচড় খাইতে থাকিলে উহার ছিদ্রের মধ্যদিয়া লাক্ষা বাহির হয়। এই লাক্ষাকে একখানি ছুরি দিয়া চাঁছিয়া লইয়া জলের সহিত ফেটাইয়া মিশাইয়া পুনরায় থলির মধ্যে দেওয়া হয়। খুব উচ্চদরের লাক্ষা তৈয়ারী করিতে হইলে সাধারণতঃ ইহার সহিত কিছু পাইন রোসিন (Pine Rosin) এবং অরপিমেণ্ট (Orpiment) চূর্ণ মিশ্রিত করা হয়।

এইরূপ পরিস্কৃত করিবার সময় লাক্ষার উত্তাপ ১০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের উপরে যাহাতে না উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। লাক্ষাকে গলান অবস্থায় রাখিবার জন্য ১০০° ডিগ্রীর কাছা-কাছি,—৯৯ কি ৯৮ ডিগ্রী উত্তাপ হইলেই যথেষ্ট। এক্ষণে এই গলান লাক্ষাকে কারিকর একখানি তালপাতার ছুরি দিয়া নিকটবর্ত্তী একটী গরম শিলিণ্ডারের উপর পাতলা করিয়া ৩০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ও ১৫ ইঞ্চি প্রস্থে ছড়াইয়া দেয়। আর একজন কারিকর ঐ ছড়ান লাক্ষার পাত-খানিকে একটু কৌশলে ঠোকা মারিয়া সিলিণ্ডার হইতে খুলিয়া নেয়। তারপর সে নিজের দু' পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ঐ পাতখানির নীচেকার দিক চাপিয়া ধরিয়া দুই হাতে ও মুখে আর এক দিক ধরিয়া টানিয়া উহাকে ৫ ফিট

লম্বা ও ৩ ফিট চওড়া করিয়া ফেলে। এইরূপ করিবার সময় পাতখানিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চুলার সম্মুখে গরমে ধরিতে হয়। এরূপ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তাহা না হইলে, লাক্ষা নমনীয় হয় না। উঁচু দরের লাক্ষার ইহাই একটী প্রধান গুণ। সুতরাং এই কার্য্যের জন্য ভাল সুদক্ষ কারিকর আবশ্যক।

এই বড় বড় লাক্ষার পাতগুলি স্তুপাকৃতি করিয়া গালাইয়া রাখা হয়। তারপর ঠাণ্ডা ও শক্ত হইলে উহাদিগকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া বাছাই করা হয়। ইহাই বাজার চল্‌তি লাক্ষা। যাহাতে পাইন রোসিন Pine rosin মিশান হয় না, তাহা খাঁটী লাক্ষা pure shellac বলিয়া বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। লাক্ষা গলাইয়া কোন পালিশ করা সমতল পৃষ্ঠের উপর ফোঁটা ফোঁটা (যেমন বাতাসা তৈয়ারী করে) ফেলিলে যে লাক্ষা তৈয়ারী হয়, তাহা বাজারে বোতাম-লাক্ষা button lac নামে বিক্রয় হয়। লাক্ষা গলাইয়া কলা পাতার উপর ঐরূপ ফোঁটা ফোঁটা ফেলিলে যে লাক্ষা তৈয়ারী হয় বাজারে উহার চল্‌তি নাম জিভ্‌ লাক্ষা tongue lac।

পূর্ব্বে যে কাপড়ের থলির মধ্যে লাক্ষা গলাইয়া পরিষ্কৃত করিবার কথা লিখিত হইয়াছে, সেই কাপড়ের থলির মধ্যে যে ময়লা সঞ্চিত হয়, উহাকে বাহির করিয়া বড় বড় চাপ্‌ড়ার আকারে তৈয়ারী করা হয়। বাজারে ইহা "কিরি" নামে প্রচলিত। ইহাতে শতকরা ৬৫ ভাগ গরম য়্যালকহলে দ্রবণীয় লাক্ষা থাকে। উপরের বর্ণিত প্রণালী ব্যতীত আরও সহজ উপায়েও লাক্ষা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিম্নে তাহার দুই একটী প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল,—

১। প্রথমতঃ একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া (যেমন মহুয়া গাছের ডাল) কাঁচা লাক্ষা সংগ্রহ করুন এবং উহার ময়লা পরিষ্কার করিয়া উহাকে গুঁড়া করুন। তারপর একটী লোহার কড়াইতে এই গুড়া লাক্ষাকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লউন। এই গলিত লাক্ষা এক্ষণে একখানি ছড়ান কলা পাতার মসৃণ দিকে ঢালিয়া দিন এবং আর একখানি কলাপাতা দিয়া উহাকে এইরূপে ঢাকুন যেন, মসৃণ দিকটা লাক্ষার সংস্পর্শে থাকে। তারপর এই কলাপাতাকে একখানি কাঠ দিয়া চাপা দিন। উভয় কলা-পাতার মধ্যে চাপ খাইয়া লাক্ষা চ্যাপ্টা ও পাত্‌লা হইয়া যাইবে। শুক্‌না ও ঠাণ্ডা হইলে ইহাকে কলাপাতা হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয়। ইহারই বাজার চল্‌তি-নাম "পাড়গালা"।

২। প্রথমে ৪ পাউণ্ড কুসুম-লাক্ষা এবং ২ পাউণ্ড হল্‌দে রজন (yellow rosin) গুঁড়া করিয়া একটী পাত্রে রাখুন। তারপর উহাতে দুই আউন্স্‌ ভিনিস্‌ তারপিন তেল (Venice Turpentine) মিশাইয়া অল্প আগুনের আঁচে গলাইতে থাকুন। এক্ষণে ঐ গলিত লাক্ষা পূর্ব্বের মত কলাপাতায় ঢালিয়া পাত গালার মত তৈয়ারী করুন। ইহা দ্বারা শীলমোহর করিবার গালা প্রস্তুত করা যায়।

৩। প্রথমতঃ অশ্বত্থ গাছের কাঁচা লাক্ষা লইয়া উহাকে প্রচুর জলে সিদ্ধ করুন। যখন দেখিবেন সমস্ত জল লাল হইয়া গিয়াছে, তখন জল ফেলিয়া দিন এবং লাক্ষাকে শুকাইয়া গুড়া করিয়া লউন। এক্ষণে এই অশ্বত্থ-লাক্ষার এক সেরের সহিত ২ সের হল্‌দে রজন, এক সের কুসুম-লাক্ষা এবং এক সের মহুয়া-লাক্ষা মিশ্রিত করুন। ভাল করিয়া গুড়াইয়া এই মিশ্রিত

লাক্ষাকে একটা লোহার কড়াইতে গলাইয়া, পূর্ব্বের মত কলার পাতায় ঢালিয়া পাতগালার মত তৈয়ারী করুন। কিন্তু এই লাক্ষার পাত-গুলি যেন অন্ততঃ ⅛ ইঞ্চি পুরু হয়।

লাক্ষা প্রস্তুতের ব্যবসায় লাভজনক করিতে হইলে, প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কাঁচা লাক্ষাকে ভালরূপে বাছাই করিয়া দুই তিন রকম শ্রেণীতে পৃথক পৃথক ভাগ করিয়া লওয়া উচিত। প্রথমে ধুইবার সময় খুব সাবধানে ধুইবে,—যেন লাক্ষার সমস্ত রং জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই রংটা লাক্ষার দানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে পরে গলাইবার সময় সমস্ত লাক্ষায় মিশিয়া প্রস্তুত মালটিকে খারাপ করিয়া ফেলে। সেইজন্য ধুইবার পূর্ব্বে লাক্ষাকে ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। এই সময়ের মধ্যে প্রায় সমস্ত রং বাহির হইয়া আসে।

ব্যবসায়ীরা নানা রকম জিনিস লাক্ষাতে ভেজাল দেয়। রোসিন, অরপিমেণ্ট্ প্রভৃতি ছাড়াও আরও নানা রকম জিনিস লাক্ষার সহিত মিশান হইয়া থাকে। কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী বালি ও ছাই মিশ্রিত করে। সুতরাং কিনিবার সময় লাক্ষা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সাইট্রিক্ এ্যাসিড্ প্রস্তুতকরণ

'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' পৃষ্ঠায় ইতিপূর্ব্বে বাই-প্রোডাক্টের (by-product) সদ্ব্যবহার সম্পর্কে রীতিমত আলোচনা হ'য়েছে। তার থেকে এটা পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম হবে যে, আজকের দিনে কোন জিনিসকেই অপচয় হ'তে দেওয়া উচিত নহে। ভারতবর্ষের উৎপাদকমণ্ডলী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এ-বিষয়টা ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার। আমাদের দেশে এমন বহু দ্রব্য অপচয়ে নষ্ট হয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাদের সদ্ব্যবহার করা চলে। শিল্পগত ভাবে একথা বলা চলে যে, আমরা যত বাই-প্রোডাক্ট উৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশ করব ততই আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে উঠব! ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প প্রধান দেশগুলি বাই-প্রোডাক্ট উৎপাদনে রত হয়ে প্রচুর জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। ভারতবর্ষের কি তা' দেখে চোখ ফুটবে না?

নানা রকম লেবুর চাষ আমাদের দেশে যথেষ্টই হয়ে থাকে। বোম্বাই প্রদেশে সাইট্রাস্ ফ্রুট্ প্রচুর পরিমাণেই জন্মায়। আমাদের পল্লীর প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই কাগ্‌জী লেবুর গাছ থাকে। রসপিপাসু ও ভোক্তা হিসাবে আমরা লেবু জিনিসটাকে ফল হিসাবেই গ্রহণ করেছি, তার অতিরিক্ত ভাবে আমাদের দৃষ্টি আর এগোয় নি। অথচ লেবু ফল হিসাবে এক অখণ্ড প্রোডাক্ট হ'লেও ওরও বাই-প্রোডাক্ট আছে। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই সাইট্রিক্ এ্যাসিডের নাম শুনেছেন; মদ্য জাতীয় দ্রব্য ও নানা রকম সল্ট প্রস্তুতের পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজন। এই সাইট্রিক্ এ্যাসিড লেবু থেকেই তৈরী হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ফল হিসাবে লেবুর ব্যবহার ছাড়াও তার একটা অতিরিক্ত চাহিদা রয়েছে—লেবু উৎপাদকের এ-তথ্যটা জেনে রাখা দরকার। অনেক লেবু হয়ত দাগী হওয়ার দরুণ বা পচন ধরার দরুণ ফেলা যায়, কিন্তু সাইট্রিক্ এ্যাসিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেইগুলিরই সদ্ব্যবহার ঘটতে পারে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে যেটা লোক্‌সানের, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটাই লাভের। এই লাভের প্রতি আমাদের সজাগ হ'তে হ'বে।

সাইট্রিক্ এ্যাসিড এক প্রকার দ্রাবক বিশেষ। দাগী, পোকায় খাওয়া, কিংবা spotted লেবু থেকেই সাইট্রিক্ এ্যাসিড্ প্রস্তুত হয়, সুতরাং সাইট্রিক্ এ্যাসিড্‌কে লেবুর বাই-প্রোডাক্ট্ বলা হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, নানারকম সল্ট্ ও মদ্য জাতীয় দ্রব্য উৎপন্নের জন্য উক্ত এ্যাসিড্ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতির সাইট্রেট প্রস্তুত করতে এই এ্যাসিড অপরিহার্য্য। কাপড় ছাপার ব্যাপারে ও কয়েকটা রং প্রস্তুতের জন্য সোডিয়াম সাইট্রেট ও সাইট্রিক্ এ্যাসিড কাজে লাগে। ছবি তোলার কাযে ফিল্ম্ বা প্লেট্ 'ডেভেলপ' করবার সলিউশন প্রস্তুত ব্যাপারে সোডিয়াম সাইট্রেট ও সাইট্রিক্ এ্যাসিড আবশ্যক হয়। নীল জিনিস ছাপিবার জন্য কোনও special কাগজ প্রস্তুতের জন্য ফেরিক্ এ্যামোনিয়াম্ সাইট্রেট ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, ল্যাবরেটরীর কার্য্যে সাইট্রিক এ্যাসিড ও এ্যামোনিয়াম্ সাইট্রেট্ হ'ল এক প্রধান 'রি-এজেণ্ট্'। কেমিক্যাল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফার্টিলাইজার পদার্থে ফস্ফেটের অবস্থিতি নির্দ্ধারণ কল্পে উক্ত বস্তুদ্বয় কাজে লাগে। সাইট্রিক্ এ্যাসিডের এ ছাড়াও আরও বহু ব্যবহার আছে।

উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, সাইট্রিক্ এ্যাসিডের রীতিমত চাহিদা আছে এবং ইহা উৎপাদনের প্রতি আমরা যদি মনোনিবেশ করি তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে লেবুরও চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ এই সাইট্রিক্ এ্যাসিড উৎপাদনের সঙ্গে কৃষি ও শিল্পের একসঙ্গে প্রসারতা ঘটবে। বর্ত্তমানে তাহারই বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশ প্রধানতঃ কৃষি প্রধান হ'লেও কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে দেশকে কেবল শিল্প প্রধান করে তুললে কাঁচা মালের জন্য তাকে পর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় এবং সেটা সুবিধার কথা নয়। সুতরাং সম্ভবপর হ'লে কৃষি ও শিল্পের সমতা রক্ষা করাই সকলের কর্ত্তব্য। সাইট্রিক্ এ্যাসিড উৎপাদনের ব্যাপারে সেই সমতা রক্ষার সুযোগই উপস্থিত হয়। সাইট্রিক্ এ্যাসিড প্রস্তুতে মনোনিবেশ করার মানেই হ'ল একটি শিল্প প্রবর্ত্তনে সহায়তা করা, এবং সাইট্রিক্ এ্যাসিড উৎপাদনে কাঁচা মাল হিসাবে লেবুর আবশ্যক হওয়ার দরুণ তাতে করে পরোক্ষভাবে লেবুর চাষের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতেও সাহায্য করা হয়। কাজে কাজেই যে কৃষক আজ জমিতে অন্য ফসল বোনার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেই কৃষকই অপর একটা ফসল বোনার কাজে লাভবান হ'তে পারে।

৮ হাজার লেবুকে মেশিনে ফেলে রস নিঙড়ে বার করলে ৭০০ লিটার রস পাওয়া যায় এবং তাতে শতকরা ৫।৬ ভাগ সাইট্রিক্ এ্যাসিড বর্ত্তমান থাকে। টাট্কা ফলের রসে শতকরা ৭ থেকে ৯ ভাগ গ্লুকোজ অবস্থান করে; ফল যদি পাকা হয় তাহলে শতকরা ৯ ভাগ পর্য্যন্ত স্যাকারোজ saccharose থাকতেও দেখা যায়।

সাইট্রিক্ এ্যাসিড প্রস্তুত প্রণালী একটু জটিল ব্যাপার। প্রথমে লেবুর খোসা ছাড়িয়ে তাকে টুক্রা করা হয়। খোলাগুলি ফেলা যায় না, এসেন্স বা নির্য্যাস্ তৈরীর জন্য সেগুলিকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়। তৎপরে লেবুর কোয়া বার করে নিয়ে সেগুলি থলিতে পুরে মেসিনে ফেলে রস নিষ্কাষণ করা হয়ে থাকে। তৎপরে ১০০ হেক্টোলিটার মাপের একটি বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত পাত্রে ২০ হেক্টোলিটার ঘন রস ও ৮০ হেক্টোলিটার জল রাখা হয়, পরে সেটাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরে ভালভাবে মিশ্রিত করলে উভয় পদার্থের আলোড়ন হেতু গ্লুকোস্ এ্যাল্কোহলে পরিণত

এ্যামোনিয়াম, লিথিয়াম, আয়রণ, বিস্মাথ, হয়ে থাকে। পাত্রের গায়ে জড়ানো পাইপের সাহায্যে অতিরিক্ত শীতল জল চালনা করার দরুণ মিশ্রিত তরল পদার্থের তাপ ৫০ ডিগ্রিতে নেমে আসে এবং অমিশ্রিত ভাসমান পদার্থ সকল এতে করে পৃথক হয়ে যায়। তৎপরে উক্ত পদার্থকে ফিলটার-প্রেস্ যন্ত্রে চালনা করা হয় এবং তারপর ২০ হেক্টোলিটার মাপের একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে ফেলে উক্ত সলিউশনকে ষ্টীম সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। ঐ উত্তপ্ত তরল পদার্থের সঙ্গে মিল্ক অব লাইম বা গুড়ো ক্যাল্‌সিয়াম্ কারবোনেট মিশ্রিত করলেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তলায় ক্যাল্‌সিয়াম্ সাইট্রেট্ জমা পড়ে।

ঐ ক্যাল্‌সিয়াম্ সাইট্রেট থেকেই সাইট্রিক এ্যাসিড প্রস্তুত হয়। ক্যাল্‌সিয়াম্ সাইট্রেটের সঙ্গে সালফিউরিক্ এ্যাসিড মিশ্রিত করে নিউট্রালাইজ করলেই ক্যাল্‌সিয়াম্ সাল্‌ফেট ও সাইট্রিক্ এ্যাসিডের সলিউশন প্রস্তুত হয় এবং তার থেকে ক্যাল্‌সিয়াম্ সালফেট্‌কে আলাদা করে নিলে সাইট্রিক্ এ্যাসিড সলিউশন পড়ে থাকে। এই সলিউশন্ একেবারে বিশুদ্ধ নয়, এর মধ্যে খুব ন্যূন পরিমাণ সালফিউরিক্ এ্যাসিড ও কিঞ্চিৎ কাল পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং এই সলিউশন্‌কে বিশুদ্ধিকরণের প্রয়োজন হয়। একটী পাত্রে রেখে ষ্টীম সাহায্যে জ্বাল দিলেই অতিরিক্ত পদার্থ সকল বাষ্পরূপে উঠিয়া যায় এবং এইরূপে সলিউশন্ ঘনীভূত হয়ে সাইট্রিক এ্যাসিডে পরিণত হয়।

আমরা উপরে ঐ এ্যাসিডের ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করলাম। যাঁহারা নানারূপ Heavy Chemicals প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের নিকট আমরা এই প্রস্তাবটীর বিষয় উল্লেখ করিলাম।

স্যাণ্টোনাইন প্রস্তুত প্রণালী

কৃমিনাশক স্যাণ্টোনাইন্ ঔষধের নাম সকলেরই নিকট সুপরিচিত। এক প্রকার বৃক্ষের পাতা ও ফুল হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী করা হয়। ভারতবর্ষে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহার নাম রাখিয়াছেন— আর্টিমিসিয়া ব্রেভিফলিয়া-(Artemisia Brevifolia) এই বৃক্ষের পাতা ও ফুল হইতে কিরূপে স্যাণ্টোনিন্ প্রস্তুত করা যায়—নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। যাঁহারা ছোটখাট রকমের ঔষধ তৈয়ারীর কারবার করেন, তাঁহারা অনায়াসে এই প্রক্রিয়ায় স্যাণ্টোনিন্ তৈয়ারী করিতে পারেন। ইহাকে ফ্রোম প্রক্রিয়া, (Fromme's Process) বলা হয়।

প্রথমতঃ ফুলগুলির বোঁটা ও নীচের অংশ কাটিয়া কেবল মাত্র মাথার দিকটা লউন। পাতা গুলিরও বোঁটা ফেলিয়া লইতে হইবে। তৎপরে এই ফুল ও পাতা গুলিকে খুব চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণের ২৬গ্রাম্ ২৬০কিউবিক সেণ্টি-মিটার ক্লোরোফর্ম্মের সহিত মিশাইয়া একঘণ্টা পর্য্যন্ত খুব নাড়া চাড়া করুণ। এক্ষণে ইহার ২০৫কিউবিক সেণ্টিমিটার লইয়া ফিল্টার করুন। তলানির পরিমাণ ওজনে ২০গ্রাম্ হইবে। এই তলানিকে এরূপ শুকাইয়া লউন যেন উহার ওজন কমিয়া ১৬ গ্রাম দাঁড়ায় তারপর ২০০কিউবিক সেণ্টিমিটার টাটকা তৈয়ারী বেরিয়াম হাইড্রেটের (Barium hydrate) সম্পৃরিত Saturated সলিউসানে ঐ ১৬গ্রাম তলানি মিশাইয়া উহাকে ফুটন্ত জলের ভাপে Water bath বসাইয়া গরম করুণ,—যেন ঐ তলানির গায়ে-লাগা অবশিষ্ট ক্লোরোফর্ম্ম্ সমস্ত বিতাড়িত হইয়া যায়। তার পর এই সলিউসানটীকে ফিল্টার করুন। ফ্লাস্ক্ ও ফিল্টার গরমজলে ধুইয়া লইবেন। ফিল্টার করিয়া যে পরিস্কৃত তরলদ্রব্য পাওয়া গেল, তাহার সহিত ১০ গ্রাম ওজনে ২৫%হাইড্রো ক্লোরিক য়্যাসিড্ মিশাইয়া উহাকে অম্লযুক্ত করুন। সামান্য গরম অবস্থায় এই অম্লযুক্ত সলিউসানকে একটী বৃহৎ ঝাড়াই যন্ত্রে Separator রাখুন এবং ফ্ল্যাস্কটিকে ৪০কিউবিক্ সেণ্টিমিটার ক্লোরোফর্ম্মে ধুইয়া সেই ধোয়ানি ক্লোরোফর্ম্মও ঐ ঝাড়াই যন্ত্রে রাখুন। দুইমিনিট ধরিয়া ঝাড়াই যন্ত্রটী খুব জোরে নাড়িলে দেখা যাইবে, ক্লোরোফর্ম্ম্ পৃথক হইয়া ভাসি-তেছে। এই ক্লোরোফর্ম্মকে টানিয়া লউন। আর একবার ফ্ল্যাস্কটীকে ৪০ কিউবিক সেণ্টি-মিটার ক্লোরোফর্ম্মে ধুইয়া ঝাড়াই যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া ঐরূপে ক্লোরোফর্ম্মকে পৃথক করিয়া টানিয়া লউন। এই ক্লোরোফর্ম্ম্ সলিউসানকে শুকাইয়া ফেলিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,

তাহাকে ১৫ গ্রাম য়্যাব্‌সলিউট য়্যালকহলের সহিত গরম করিয়া ৮৫ গ্রাম গরম জলে ঢালুন। ইহাকে তখনি ফিল্টার করিয়া লইবেন। ৩৪ গ্রাম জলের সহিত ৬ গ্রাম য়্যাবসলিউট য়্যালকহল মিশ্রিত ও উত্তপ্ত করিয়া তাহার ২০ কিউবিক সেণ্টিমিটারের দ্বারা দুইবার ফ্ল্যাস্ক্‌ ও ফিল্টার ধুইয়া লউন। ফিল্টার করিয়া যে সলিউসান পাওয়া গেল, তাহাকে ঠাণ্ডা হইবার জন্য ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিন। তাহার পরে দেখিবেন দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে উহাকে ফিল্টার করুন। দুইবার ২০ কিউবিক সেণ্টিমিটার ১৫% য়্যালকহলের দ্বারা ফিল্টার ফ্ল্যাস্ক ধুইয়া লইবেন। তারপর ১১০ ডিগ্রী সেণ্টীগ্রেড উত্তাপে ফিল্টার করা দানাগুলি শুকাইয়া লইবেন, যতক্ষণ না তাহাদের ওজন অপরিবর্ত্তিত হয়। অবশেষে দানাগুলিকে পাকাপাকি ওজন করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবেন।

মিনারেল ওয়াটারের ব্যবসা

রেলষ্টেশনের রিফ্রেস্‌মেণ্ট্‌ রুমগুলির প্রতি যিনিই দৃষ্টিপাত করেছেন তিনিই দেখেছেন যে সেখানকার, আল্‌মারীতে নানা বর্ণের লেবেল্‌ মারা মিনারেল্‌ ওয়াটারের বোতলগুলি কী, সুন্দর ভাবেই না সজ্জিত থাকে। শুধু তাই নয়, আশে পাশে এধারে ওধারে ঐ সমস্ত বোতলের চটকদার বিজ্ঞাপন ঝুলছে দেখা যায়। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এদেশে মিনারেল ওয়াটারের কি ভীষণ কাটতি। ঐ সমস্ত মিনারেল ওয়াটারের বোতল গুলির অধিকাংশই ইউরোপ ও জাপান থেকে আমদানী হয়। তাতে দেশের অনেক টাকা বিদেশে চলে যায় এবং একথা সত্য যে আমরা যদি ঐ সমস্ত মিনারেল ওয়াটার অর্থাৎ বোতল পানি দেশে উৎপন্ন করতে পারতাম তাহলে এই বাবদ যে টাকাটা বিদেশে বেরিয়ে যাচ্ছে তা দেশে রাখা সম্ভব হত।

মিনারেল ওয়াটার অর্থাৎ বোতল পানি এদেশে এতটা কাটবার কারণই হল আমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। খাওয়া দাওয়ার পর সেটা হজমের জন্য একটু মৌজ করা আমাদের পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস। এটা হল কতকটা আভিজাতিক। কিন্তু বর্ত্তমানে অভিজাত সম্প্রদায়টা আমাদের সমাজে মুষ্টিমেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; নিম্নমধ্যবিত্তের সংখ্যা গেছে বেড়ে। তাদের স্বাভাবিক দারিদ্র্য হেতু অপুষ্টির জন্য অম্ল অজীর্ণতা তাদের নিত্য সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই হেতু মিনারেল্‌ ওয়াটারের পক্ষে হয়েছে সেটা একেবারে মাহেন্দ্র যোগ। সাধারণ লোকের একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে যে খনিজ পদার্থ সকল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর উপকারী, সেই জন্য যে সমস্ত জলে খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে তা' তারা আগ্রহ সহকারে পান করে। সেইটাই মিনারেল ওয়াটারের কাটতির পক্ষে' যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে সাধারণ বাঙ্গালী (অপরাপর প্রদেশবাসীও বটে) রীতিমত অজীর্ণগ্রস্ত—অম্বল তাদের লেগেই আছে। যাদের অম্বল এখনো আক্রমণ করতে পারেনি, তারাও অম্বলের আক্রমণের অপেক্ষায় তাল ঠুকছে অর্থাৎ নীরোগ ব্যক্তিরাও অজীর্ণ হবার আশঙ্কায় অনবরত বোতলপানি গলাধঃকরণ করছে। কাজে কাজেই বোতল পানি যে বেশী বিক্রী হবে এ আর বিচিত্র কি! আমাদের শরীর ধাতবীয় খনিজ পদার্থ সংযোগে গঠিত (অপরাপর পদার্থও আছে,) তন্মধ্যে কোন পদার্থ আনুপাতিক পরিমাণ অপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হ'লে শরীরে রোগের প্রবেশাধিকার ঘটে। সেইজন্য ডাক্তারেরা ঔষধ দ্বারা উক্ত পদার্থ সমূহের

আনুপাতিক সংযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। তজ্জন্য ঔষধ পত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিনা আয়াসে প্রাকৃতিক দ্রব্য দ্বারা যদি লোকে ঔষধের স্থান পূরণ করে নিতে পারে তবে সে সুযোগ কেন তারা ছাড়বে। সেইজন্যই অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিরা কলের জলের চেয়ে নলকূপের জল বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের একটা ধারণা আছে যে নলকূপের জল অত্যন্ত হজমী—এ ধারণা তাঁদের অমূলক নয়। নলকূপের জল কতকটা মিনারেল ওয়াটার জাতীয় জল, খনিজ পদার্থ তাতে কিছু কিছু বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সে জল ব্যবহারে লোকের অম্ল অজীর্ণতা সারলেও সারতে পারে।

কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বিল্ডিংএ যখন বড় নলকূপ খোলা হয় তখন হাজার হাজার লোককে বালতী ঘটী গেলাস হাতে তদভিমুখে ধাবিত হতে দেখা যেত। ও অঞ্চলের সমস্ত কেরাণী কুল যদি দৈনিক একবারও অন্ততঃ সেন্‌ট্রাল্ ব্যাঙ্কের টিউবওয়েলের শান্তি বারির পরশ না পেত তা'হলে তার পরদিনই তাদের পেটফেঁপে বুকজ্বালা করে অস্থির হ'তে হ'ত। এমনিই সেই জলের মহিমা! আমাদের মনে হয়, যদি কোন চালাক ব্যবসায়ী উক্ত টিউবওয়েলের জল বোতলে পুরে যথাযুক্ত লেবেল মেরে মিনারেল-ওয়াটার বলে বিক্রী করতঃ তাহ'লে বোতলপানি লোভী খদ্দেরের দিক দিয়ে এতটুকু আপত্তি উত্থিত হ'ত না।

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা হ'ল সেই সম্পর্কে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের টিউব-ওয়েলের কথাটা আমরা রহস্য করেই উল্লেখ করেছি কিন্তু এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ভারতবর্ষের এমন বহু ঝর্ণা বা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে যার থেকে মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। অথচ আমাদের সেই প্রাকৃতিক সম্পদ অবহেলায় অপচয়ে নষ্ট হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, ঐ সমস্ত ঝর্ণার জল কতলোক অতি আগ্রহ সহকারে পান করে থাকেন। দূর দূরান্তরের লোকেরা সেই সমস্ত জল পাত্র ভরে নিয়ে যান।

সার জগদীশচন্দ্র বসু রাজগীরের উষ্ণপ্রস্রবনের জলে রেডিয়াম পেয়েছেন; সেইজন্যই বোধ হয় রাজগীরের উষ্ণপ্রস্রবনের জলে স্নান করলে সকল রকম চর্ম্মরোগের উপশম ও আরোগ্য হয়। মুঙ্গেরের নিকট সীতাকুণ্ডের জল সমগ্র বাংলা বিহারে অত্যন্ত হজমী বলে সুপরিচিত। রাজগীরের কোনও কোনও কুণ্ডের জল এরূপ হজমী যে অনেকে সেখান হ'তে টীন টীন জল এনে পান করে থাকেন। ভুবনেশ্বরের একটা কুণ্ডের জল প্রায় দুধের মত সাদা বলে লোকে কুণ্ডটীকে দুগ্ধকুণ্ড বলে। এই জলও অত্যন্ত হজমী বলে সুপ্রসিদ্ধ। এই সকল জল বোতলে পুরে কলিকাতার মত বড় সহরে এনে বিক্রয় করলে যথেষ্ট বিক্রয় হবার সম্ভাবনা। বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত ব্যক্তি পশ্চিমে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বেড়াতে যান তাঁরা ও পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ঐ সমস্ত জল অত্যন্ত হজমী। এর থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ঐ সব জলের এমন একটা বিশেষগুণ আছে যার জন্য তারা মানুষের অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত

করে ও অজীর্ণতা নিরাময় করে। কাজে কাজেই সেই সমস্ত প্রস্রবনের জল থেকে মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন করা যে সহজসাধ্য ব্যাপার একথা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের স্থানে স্থানে এখনও দেখা যায় শীতল প্রস্রবনের ঠিক পাশেই উষ্ণ জলকুণ্ড বর্ত্তমান। বোম্বাই প্রদেশের কায়রা জেলার লাসমুদ্র নামক স্থানে ও থানা জেলার ভজরাতি নামক স্থানে যে প্রস্রবণ বর্ত্তমান আছে তার জল ১১৫° উত্তপ্ত। সে জলে গন্ধক বর্ত্তমান আছে। সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের স্থানে স্থানে ঐপ্রকার উষ্ণ প্রস্রবন দৃষ্ট হয়। কাঙ্গরা জেলার জ্বালামুখী নামক যায়গায় যে ঝরণা আছে তার জলে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ব্রোমাইড্ ও আইডাইড্ মেশানো আছে। শোনা যায় যে সে জল ব্যবহারে গলগণ্ড রোগ নিরাময় হয়। কাম্বে থেকে গোধ্রার পথে তালয়া নামক স্থানে যে ঝর্ণা আছে তার জলে প্রচুর পরিমাণ রেডিও এ্যাক্টিভ্ গুণ বর্ত্তমান। এই সমস্ত ঝর্ণার জলকে বিভিন্ন প্রকারে কাজে লাগানো যায় তারজন্য রীতিমত বিশ্লেষণের প্রয়োজন ও গবেষণা করা দরকার।

আসল মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন সম্পর্কে আমরা জানি আমাদের এদেশে মিনারেল ওয়াটার উৎপাদনের কারখানা আছে কিন্তু সে ওয়াটার প্রস্তুত হয় কেমিক্যাল দ্রব্য সংযোগে। প্রাকৃতিক ঝর্ণার জলে যেখানে স্বভাব গুণেই মিনারেল পদার্থ বর্ত্তমান থাকে সেখানে তদ্দ্বারা মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন করতে কোন অতিরিক্ত পদার্থের আবশ্যক হয় না। সুতরাং নামমাত্র উৎপাদন ব্যয়ে সেক্ষেত্রে মিনারেল ওয়াটার প্রস্তুত হতে পারে। আমাদের ব্যবসায়ীদের এধারে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যে প্রাকৃতিক সম্পদ স্বতস্ফুর্ত্তভাবে বর্ত্তমান রয়েছে তাকে আমরা কেন কাজে লাগাব না? অধিকন্তু এই প্রকার মিনারেল ওয়াটারের ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের আবশ্যক হয় না, অল্প মূলধনেই সে ব্যবসা কার্য্যকরী হতে পারে; জল বিশুদ্ধ করণের একটী যন্ত্র ও ছিপি টাইট্ করবার মেসিনই যথেষ্ট। বোতলে করে উক্ত জল ভরে রীতিমত লেবেল মেরে বাজারে চালান দিলেই তা' বিক্রয়ের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের অভাব নেই। কাজের জোগাড় করবার জন্য তাঁরা এধার ওধার ঘুরে বেড়ান—নতুন কোন ব্যবসার পথও তাঁরা খুঁজে পান না। তাঁদের দৃষ্টি আমরা এই মিনারেল্ ওয়াটারের ব্যবসার প্রতি আকর্ষণ করছি। তাঁরা সংগঠিত ভাবে এই ব্যাপারটাকে যদি চালু ক'রতে পারেন তাহ'লে একটী নতুন দেশীয় শিল্প গড়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এসম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে। দেশে নতুন নতুন ব্যবসা প্রবর্ত্তনের পথ সুগম করার দায়িত্ব তাঁদেরই—তাঁরাই গবেষণা ও অনুসন্ধানকার্য্য দ্বারা জনসাধারণের সামনে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করবেন। এরই জন্য তাঁরা সরকারীভাবে ভারপ্রাপ্ত। কিন্তু এপর্য্যন্ত ক'টা শিল্পসম্ভাবনার তাঁরা ইঙ্গিত দিয়েছেন তা' আমাদের জানা নেই, অথচ জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট সেইটাই আশা করে।

নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক * মহাসম্মেলন

[নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন মহাশয়ের অভিভাষণ]

সকল কল্যাণের আকর-স্বরূপ পরমপিতাকে প্রণামপূর্ব্বক, পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের চরণবন্দনা করতঃ, কলিকাতাবাসী আয়ুর্ব্বেদ-সেবিগণের পক্ষে আমি আপনাদের যথাযোগ্যজনে যথোচিত প্রণাম ও প্রীতি নিবেদন করিতেছি। আমাদের অনুরাগের স্রক্‌-চন্দন গ্রহণ করিয়া, আপনারা আমাদের ধন্য ও কৃতার্থ করুন।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজ আর নূতন কিছু বলিবার নাই। নিখিল বঙ্গের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের এই বার্ষিক সম্মেলনের আবশ্যকতা বিষয়ে, আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এ শুধু ক্ষণিকের প্রীতি-মিলন নহে। যে মহত্তম বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলনে আপনারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই জনহিতকর শাস্ত্রের আলোচনা ও গবেষণায় আপনাদের ন্যায় সুধীবৃন্দের যত্ন-প্রয়াস কতটা অগ্রসর হইয়াছে —তাহারই একটা বার্ষিক হিসাব নিকাশের এই সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করিয়া, আমাদের সমগ্র চিকিৎসক সমাজ উপকৃত হইবেন। বৈজ্ঞানিকগণের এরূপ মিলনে, দেশের একটা বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত থাকে। দেশের আধি-ব্যাধি লইয়াই যাঁহাদের কারবার, তাঁহাদের চিন্তার আদান প্রদানে এবং পরস্পর ভাব-বিনিময়ে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। সুযোগ্য সুধীগণের অভিভাষণে দেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য ও ব্যাধি-সমস্যা সম্বন্ধে সুচিন্তিত উপদেশ লাভ করিয়া, আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইব। কালজয়ী আয়ুর্ব্বেদের জয়পতকা বহিবার ভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত, তাঁহারা প্রশস্ত কর্মীগণের নিকট নূতন প্রেরণা লাভ করিবেন।

---

*আমরা আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় এল্‌বাট হলে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ায় উহা আমূল প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ কিম্বা সভার বিবিরণাদি তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইয়াও পাইলাম না। এজন্য সভার বিবরণ কিম্বা সভাপতির অভিভাষণ আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। সম্পাদক।

অবসাদ-গ্রস্ত পঙ্গুর বর্তমান বলিয়া কোন কিছু নাই। বর্তমান তাহার নিকট প্রীতির সংবাদ, আশার আলোক বহন করিয়া আনে না। অতীতের সুখৈশ্বর্য্যের কীর্তনে, সে নিত্য দেখে ভবিষ্যতের কাল্পনিক স্বপ্ন। বর্তমানের সমস্যা-চিন্তাকে সে সাধ্যমত পরিহার করিয়া চলে, কারণ বর্তমান তাহার নিকট স্বস্তিক নহে। সত্যের আলোকে বর্তমান সমস্যাকে সে নিত্য যাচাই করিতে চাহে না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্ন জাতি আমরা, বর্তমান সম্বন্ধে সচেতন নহি। অতীত-প্রীতি মানুষমাত্রেই স্বাভাবিক, মহিমাময় অতীত ভুলিবার বস্তু নয়, ইহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু, জগতের গতিশীল জাতিসমূহ যাহাদিগকে আমরা বর্তমান-সর্ব্বস্ব বলিয়া গালি দেই, তাহারা শুধু অতীতের চিন্তায় অলস হইয়া বসিয়া থাকে না, তাহারা শুধু সুদূর ভবিষ্যতের রঙ্গীন কুহকে বিভোর হইয়া থাকেনা—বর্তমানকে সাগ্রহে বরণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে বিজয়লাভের প্রয়াস পায়। এই জন্য তাহাদের দৃষ্টি বর্তমান ও আসন্ন ভবিষ্যতেই নিবদ্ধ। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, কি আর্থিক বা শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কি বিজ্ঞান বা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে তাহারা প্রণালীবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছে। হয়ত, আগামী পাঁচ বা দশবৎসরের জন্য একটা পরিকল্পনা খাড়া করিয়া তাহাকে বাস্তব রূপ দিতে তাহাদের কর্মী ও ধনিক, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক সকলেই বদ্ধ-পরিকর।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে যাঁহারা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আয়ুর্বেদকে পুনরায় তাহার গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের অনেকেরই মধ্যে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। এ আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন হইয়াছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ হইতে। তদনুসারে কিছু কিছু কাজও হইয়াছে। আমাদের এ বার্ষিক সম্মেলন ঐরূপ আকাঙ্ক্ষারই একটা অভিব্যক্তি। কিন্তু, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন সু-চিন্তিত উন্নতির পরিকল্পনা বা প্রোগ্রামকে কার্য্যে পরিণত করিবার কোন ঐক্য বদ্ধ চেষ্টা এখনও দেখা দেয় নাই।

অন্যান্য দেশে রাজ-শক্তির তরফ হইতে দেশীয় প্রচলিত চিকিৎসা বিষয়ক পরিকল্পনা গুলিকে বাস্তবে পরিণত করিতে সাহায্য করা হয়। এখানে সেরূপ অকুণ্ঠ সাহায্যের একান্তা-ভাব। দেশীয় চিকিৎসার উপরে দেশকে সম-ধিক নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু, দেশের চিকিৎসা-পদ্ধতির আবর্জ্জনা দূর করিয়া তাহাকে সুপ্রতি-ষ্ঠিত করিতে, রাজশক্তি অবহেলা করিয়াছেন এবং এখনও কার্পণ্য করিতেছেন। কিন্তু, রাজশক্তির অবহেলা ও কার্পণ্য ব্যতিরেকে আরও অনেক-গুলি বিরোধী কারণ আয়ুর্বেদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। উন্নতি-বিরোধী কারণ-পরম্পরা সম্বন্ধে বারংবার আলোচনা ও উহার নিবারণ, আয়ুর্বেদের উন্নতিকামীর প্রধান ও প্রথম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

বর্তমান অবস্থাকে বুঝিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইলে, বিগত শতাব্দীর একটু পরিচয় আবশ্যক।

রাজশক্তির ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, জনসমাজের স্বাভাবিক নেতৃ-স্থানীয় তৎকালীন জমিদার ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠোপোষকতা হইতে আয়ুর্বেদ উনবিংশ শতাব্দীর বহুলাংশ পর্য্যন্ত একেবারে

বঞ্চিত হয় নাই। কিঞ্চিদধিক একশতাব্দী হইল দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। মুসলমান যুগে রাজদরবারে হাকিমীর মর্য্যাদা ছিল বটে, কিন্তু, দেশে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষ প্রচলন হয় নাই এবং আয়ুর্বেদের সহিত হাকিমীর কোন সাক্ষাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার কারণ দেশের লোকের মধ্যে এমন একটা মানসিক পরিবর্ত্তন দেখা দিল, যাহার ফলে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়, দেশের প্রাচীন কৃষ্টির বিষয়ে পুঙ্খানু-

অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি—
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন।

পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান না করিয়াই, প্রাচীন পন্থা বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। নূতন সামাজিক সংস্থানের ফলে, এই নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ক্রমশঃ দেশের নেতৃত্বের আসন পাইলেন কোথাও সাক্ষাৎ বলা বাহুল্য, আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কোথাও পরোক্ষভাবে বিদ্বেষবিষ বর্ষিত হইতে লাগিল। এদিকে ভারতের বাজারে বিদেশী ঔষধের কাটতি বাড়ানোর যে বিশেষ একটা প্রয়োজন ছিল, তাহা না বলিলেও চলে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে রস-চিকিৎসার প্রচলন অধিকতম। তান্ত্রিক ও রসচিকিৎসক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অশেষ কল্যাণকর রসৌষধসমূহ আয়ুর্বেদের চিকিৎসার অঙ্গীভূত করিয়া, প্রাচীন চিকিৎসকগণ নিজেদের উদার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। রস চিকিৎসা কিন্তু, ব্যয় সাপেক্ষ। পূর্বতর কালের ব্যয়ে বিত্তবান্ ব্যক্তিদের চিকিৎসার্থে, কবিরাজ মহাশয়গণ রসবৈদ্যগণের সহায়তায় ধনীদের সকল রকম ঔষধ শাস্ত্রসম্মত প্রথায় প্রস্তুত করাইতেন। ধনীদের চিকিৎসার পর যাহা কিছু উদ্বৃত হইত, তাহা স্বল্পমূল্যে বা ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে সাধারণের চিকিৎসার্থে প্রদত্ত হইত। আশু প্রয়োজন না থাকিলেও,কখনও কখনও ভবিষ্যতের জন্য ঐ ঔষধ প্রস্তুত করান হইত। কবিরাজ মহাশয়গণ ঐ সকল ঔষধের এক একটা অংশ পাইতেন। তদ্দ্বারা অল্পবিত্ত ব্যক্তিগণ উপকৃত হইত। দেশের সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে অব্যর্থ ফলপ্রদ মূল্যবান্ ঔষধগুলি সহজপ্রাপ্য না হইলেও, নিতান্ত দুর্মূল্য ছিল না। দেশের সাধারণ লোকও ঐ সকল ঔষধের গুণরাজি অবগত ছিল। কিন্তু, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে প্রাচীন-আদর্শচ্যুত ধনী-সম্প্রদায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে শিথিলপ্রযত্ন হইতে লাগিলেন। সে শিথিলতার ফল সমাজের সাধারণ স্তরের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এই ত গেল রস চিকিৎসার কথা। ভেষজ চিকিৎসার অবস্থাও অনুরূপ দাঁড়াইয়াছিল। যে যুগ হইতেই হউক বা যে কারণেই হউক, ঔষধ প্রস্তুত করণের ভার আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ স্বহস্তে লইয়াছিলেন, কিন্তু, ঔষধি সংগ্রহ করিতেন বণিকেরা। বিভিন্ন কেন্দ্রে, ভারতের জলবায়ু অনুসারে, বিভিন্ন ঔষধি উৎপাদনের কোন কেন্দ্রীভূত ব্যাপক চেষ্টা বা ব্যবসায় কোনদিন দেখা যায় নাই। দেশীয় গাছগাছড়া সংগ্রহের ব্যবসা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয় নাই। কাজেই অনেকে প্রয়োজনীয় গাছগাছড়ার স্বরূপ বা পরিচয় ভারত ভুলিয়াছে; নিরক্ষর বেদিয়া শ্রেণীর লোক এবং লাভপরায়ণ বণিকদের দল, ভারতের ঔষধি সম্পদ যতটুকু বাঁচাইয়াছে, ততটুকুই আমরা পাইয়াছি। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে শাস্ত্রোক্ত গাছগাছড়া চিনিবার বা চিনাইয়া দিবার এবং সম্ভবপর স্থলে উৎপাদন চেষ্টার শোচনীয় অভাব হেতু, চিকিৎসক সমাজকে উত্তরোত্তর বণিক বা বেদীয়াগণের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

পূর্বে ছিল পায়ে হাঁটার যুগ, দেশের মাটির সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল নিবিড়। সশিষ্য প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ চিকিৎসা ব্যপদেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে যখন পরিভ্রমণ করিতেন, তখন মাটির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয়ের সুযোগ ঘটিত বেশী, গুরু শিষ্যগণকে নানাস্থানে প্রকৃতির ক্রোড়জাত নানা ভেষজের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাইয়া দিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে এ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটায়, ভেষজ পরিচয়ের অবনতি ঘটিতে থাকে। পূর্বে বণিকগণ সুদূর দেশজাত নানা ঔষধির ব্যবসাতে কোনদিন অসাধুভাবের প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু, দেশের নৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনে এ সময় হইতেই ঔষধিবিষয়ে ভেজাল চলিতে থাকে। উহার প্রতীকার কল্পে চিকিৎসক সমাজ কোন উপায় সে সময় অবলম্বন করেন নাই।

অতঃপর, সে সময়ের পঠন-পাঠন পদ্ধতির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সময় হইতে দেশে সংস্কৃত-শিক্ষার আদর কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বংশের সন্তানগণ সংস্কৃত চর্চা ছাড়িয়া ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। বৈদ্য সমাজের সন্তানগণেরমধ্যেও সংস্কৃত-চর্চার আদর কমিতে লাগিল। অথচ, জটিল আয়ুর্বেদশাস্ত্র দেবভাষায় সূত্রাকারে রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে দেখা গেল যে, বুদ্ধিমান্ মেধাবী ছাত্রের দল ইংরাজী শিক্ষায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে লাগিলেন। ইহার ফলে আয়ুর্বেদ বিভাগে সংস্কৃত ভাষায় যথার্থ অভিজ্ঞ ছাত্র কচিৎ পাওয়া যায়।

সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা গিয়াছে ইত্যাদি দেখিয়াও, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাজ্ঞ চিকিৎসকগণ অবস্থানুসারে শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারে মনঃসংযোগ করেন নাই। আয়ুর্বেদ-শিক্ষা একেবারে বিশৃঙ্খল ও নিঃস্বামিক অবস্থায় উপনীত হইল। এই যুগে বহু বাংলা ভাষায় অনুদিত চিকিৎসা-গ্রন্থ বাজারে প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ সকল অনুবাদ অধিকাংশ স্থলে অত্যন্ত বিকৃত ও বিকলাঙ্গ এবং একই বৈদ্যক-গ্রন্থের বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্ন অনুবাদ বিভিন্নমুখী হওয়ায়, আয়ুর্ব্বেদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। বটতলা বহুদিন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারীর কাজ করিয়াছে, পৌরাণিক সাহিত্য প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু বটতলা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে বাঁচাইয়াছে, এ কথা বলিতে কেহ প্রস্তুত হইবেন কি ?

এই যে বাংলা ভাষায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দুর্বল প্রচার প্রয়াস ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছিল যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ সমাজ এই প্রচার প্রয়াসে অনাসক্ত ছিলেন বলা যায়। নচেৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই আমরা সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুবাদ দেখিতে পাইতাম। তাহার দ্বারা দেশের কল্যাণই হইত। যে যুগে কালী সিংহের মহাভারতের ন্যায় বিরাট অনুবাদ গ্রন্থের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, সে যুগে অনুবাদে সক্ষম অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব ছিল না। অভাব ছিল তাঁহাদের উদ্যমের এবং মাতৃভাষায় যে যথার্থ প্রামাণ্য শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে সেই বিষয়ে দূরদর্শিতার।

প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইলে, যখন গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কেহই জাতিনাশ ভয়ে শব-ব্যবচ্ছেদে স্বীকৃত হন নাই, তখন যিনি

সর্ব্বপ্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি ছিলেন সংস্কৃতকলেজের আয়ুর্বেদের অধ্যাপক ৺মধুসূদন গুপ্ত মহাশয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আয়ুর্বেদাচার্য্যের এই সদৃষ্টান্তে, দেশের রক্ষণশীল আয়ুর্বেদীয় সম্প্রদায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় যে অনুরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভকরা যে শাস্ত্রের অভিপ্রেত তাহা অনুভব করিলেন না। কাজেই তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের প্রতি আস্থা হারাইতে লাগিলেন।

মোটামুটি, ঐ যুগের গলদগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় ঃ—

(১) শব-ব্যবচ্ছেদ দীর্ঘকাল দেশে রহিত হওয়ায়, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা একমাত্র কায়-চিকিৎসায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। শব-ব্যবচ্ছেদের পুনঃ প্রবর্ত্তনে যখন নূতন যুগের সম্ভাবনা হইয়াছিল, রক্ষণশীল আয়ুর্বেদীয় সমাজ তখন উচ্চ কণ্ঠে উহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপ অস্বীকৃতির ফলে আয়ুর্বেদীয় কায়-চিকিৎসক যে একদিন দেশের শ্রদ্ধা হারাইবেন, এ বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল না।

(২) চিকিৎসা-পদ্ধতি সবদেশেই এখনও অধিকাংশ স্থলে কায় চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ, এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু, যে পদ্ধতিতে শল্যতন্ত্র ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতির প্রয়োগ লোপ পাইয়াছিল, আধুনিক যুগে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রচলন এবং আদর-কদর যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইতে থাকিবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

(৩) রোগ নির্ণয় ব্যাপারে আধুনিক প্রত্যক্ষ-মূলক বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে কবিরাজ মহাশয়গণ পরাঙ্মুখ হইলেন। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রগুলিতে চিকিৎসার চরম কথা বলা হইয়া গিয়াছে, আর নূতন কিছু বলিবার নাই। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে, ঋষিপ্রণীত আয়ুর্বেদ গ্রন্থনিচয় বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে; শাস্ত্রপ্রণেতাগণের অন্যতম মহর্ষি আত্রেয় স্পষ্ট কণ্ঠেই বলিয়াছেন, চিকিৎসাবিষয়ে আমি যাহা বলিলাম উহাই পর্য্যাপ্ত নহে, উহা ভিন্ন যেখানে যাহা নূতন উপদেশ পাইবে, তাহা গ্রহণ করিও। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কলেবর বারংবার যুগে যুগে সংস্কৃত, প্রতি-সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিমার্জিত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে ঋষিত্ব জাতি-নিষ্ঠ নহে, ঋষিত্ব লাভ করা কোন একটা দেশ-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। ঋষিত্ব বিশুদ্ধ জ্ঞান-নিষ্ঠ এবং জ্ঞান-প্রবাহ কালপ্রবাহের ন্যায় অনন্ত।

বিশুদ্ধ নাড়ীবিজ্ঞান ও ত্রিদোষ তত্ত্বের জ্ঞানের সহিত, যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া হয়, তাহাতে ঋষি-শাস্ত্রের অমর্য্যাদাও হয় না এবং উহাতে আয়ুর্বেদ আলোচনার ক্ষেত্রও যে প্রশস্তর হয়, অত্যধিক রক্ষণশীলতার বশে, এ চিন্তাকে তাঁহারা হৃদয়ে স্থান দেন নাই। দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ ও স্পর্শের দ্বারা রোগনির্ণয়ের কথা শাস্ত্রে আছে; যে দেশেরই লোক হউক, যদি মানুষ এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া থাকে, যদ্দ্বারা ঐ দৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানে চিকিৎসকের সহায়তা হয়, যদি তাঁহাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সন্ধান দেয়, যদি একই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে একই বস্তু বা ক্রিয়াকে রাম, শ্যাম, যদু ও হরি একইভাব দেখে বা অনুভব করে, তাহা হইলে তেমন যন্ত্রের উপ-

যোগিতা অস্বীকার করিয়া লাভ কি ! যন্ত্র বিকল হইলে, অনুভূতি ভ্রান্ত হয়। কিন্তু মানুষের চক্ষু কর্ণেরও ত ভুল হয় এবং সে প্রকার ভুলের অবসর কত বেশী।

(৪) কেহ কেহ বলেন এবং সে যুগেও বলিতেন যে, আধুনিক যন্ত্রপাতি বা উপায় সমূহের সাহায্য না লইয়া, একমাত্র কায়চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া, আয়ুর্বেদ চর্চা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যখন দেশে বিদ্যমান আছে, তখন ভবিষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু, এই এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, সে আশা দুরাশা। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সকল চিকিৎসা-প্রণালীর গোড়ার কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, চিকিৎসা-পদ্ধতি দৈবব্যপাশ্রয় হইতে যুক্তি ব্যপাশ্রয়ের দিকে গিয়াছে এবং যে পদ্ধতি যতটা যুক্তি-ব্যপাশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই পদ্ধতির প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জরামরণশীল মানব চিকিৎসা-ব্যাপারে দৈবব্যপাশ্রয় একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজও সর্বসমাজে উহার অল্পবিস্তর প্রচলন আছে। ভারতেও অথর্ববেদের দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসার যুগ হইতে আয়ুর্বিজ্ঞান উত্তরোত্তর যুক্তি-ব্যপাশ্রয়ের দিকে গিয়াছে। এই যুক্তি-ব্যপাশ্রয় চিকিৎসাপ্রণালীতেই আয়ু-

র্বেদের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিহিত। সূত্রাকারে রচিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কার্য্য-কারণ-পরম্প-বিস্তারিত বিবরণ সর্বত্র নাই, অনেক স্থলে কেবল সিদ্ধান্ত মাত্র দেওয়া আছে। যথা ধরুন, আয়ুর্বেদের যুক্তিবহুল চিকিৎসার যুগেও দেখা যায় এমন নির্দ্দেশ দেওয়া আছে যে, রোগবিশেষে তিথি, নক্ষত্র ও কাল বিশেষে একটা বিশেষ ঔষধি সংগ্রহ করিতে হইবে। রস ও বিপাক ব্যতীত, দ্রব্যের প্রভাব সম্বন্ধে তিথি-বিশেষের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ক্ষেত্র-বিশেষে তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; সে তথ্যের কোন ইতিহাস তাঁহারা রাখেন নাই। কাজেই আধুনিক যুক্তিবাদী যদি ঐ সিদ্ধান্তে সন্দিহান হয়েন, তাহা হইলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রোগ-বিশেষে ঐরূপ বিশেষভাবে সংগৃহীত ঔষধের প্রভাব প্রমাণিত করিতে হইলে, শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না, শুধু আধুনিক Scepticism এর জন্য অশ্রুপাত করিলে চলিবে না, শুধু দুই একটা চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না, উহার প্রভাব প্রমাণ করিতে হইলে যেরূপ ব্যাপকভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাহাতে সাধারণ চিকিৎসাশালা এক বা বহু গবেষক, প্রভৃতি অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। জগতের দরবারে আয়ুর্বেদীয় গবেষকগণ যখন সেই ভাবে নিজেদের আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিতে পারিবেন তখন যথার্থই আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের যুগ ফিরিয়া আসিবে।
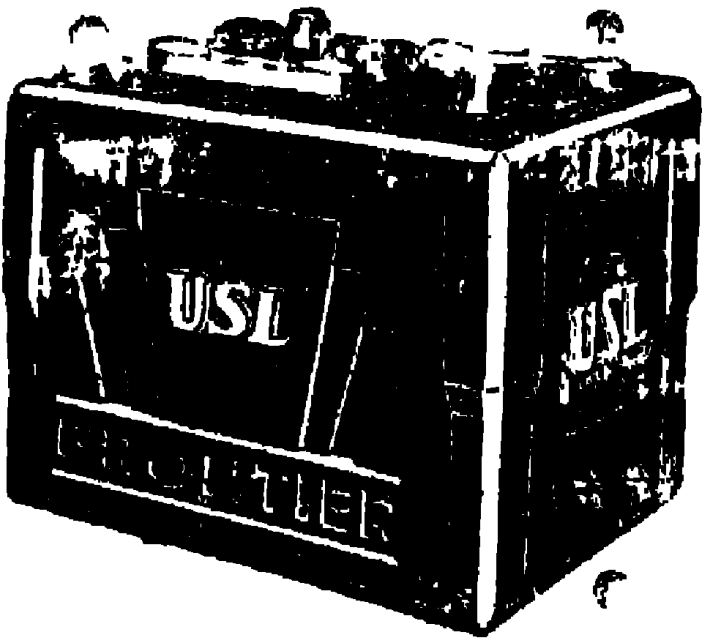
অনেকে বলেন এবং সে যুগেও বলিতেন যে, সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্তগুলি আর নূতন করিয়া পরীক্ষা করার কি আছে? আয়ুর্বেদ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ন্যায় নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ যাহা বলিতেছে, কাল তাহার পরিবর্তন করিতেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। উত্তরে বলিব, কালের আবর্তনে নৈসর্গিক ও সামাজিক পরিবর্তনে, মানবের ধাতু ও প্রকৃতির পরিবর্তন ও বৈষম্য যে ঘটিতেছে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা। মানবের ব্যাধি ও ভোগের যে রূপান্তর ঘটিতেছে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নিজের ত্রুটি হইলে, তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সত্যের পথে অগ্রসর হওয়াই বিজ্ঞান সাধনা। সত্যপ্রীতিতে ইহার মূল, সাফল্য ও সততা ইহার আশ্রয়, তাই ত্রুটি স্বীকারে কোন লজ্জা নাই। আধুনিক মানুষের মন যদি সে দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দোষ দিব কাহাকে? অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী হইয়া, যাহারা শুধু নিশ্চেষ্টতার ফলে নিজেদের প্রাচীন কৃতিত্ব হারাইয়াছেন এবং নিজেদের ঋদ্ধিময় ভাণ্ডার বাড়াইতে বিমুখ হইয়াছেন, তাহাদের নহে কি? ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নিশ্চেষ্টতা যতটা প্রকট হইয়াছিল এমন আর কোন কালে নহে। তিন চারিশত বৎসর পূর্ব পর্য্যন্তও এ দেশের চিকিৎসক, যখন যে বিদেশজাত ঔষধির গুণাগুণ বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহাকেই সাদরে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে এ উদারতার পরিবর্ত্তে, তাঁহারা বিদেশীকে দিয়াছেন শুধু উপহাস। উহার ফল ভাল হয় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কথায় আপনাদের মূল্যবান্ সময়ের অনেকটা ব্যয় করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর সম্বন্ধে সকল কথাই আপনাদের সুবিদিত। একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আয়ুর্বেদ চর্চা কারিগণের

মধ্যে এই শতাব্দীতে একটি বিশিষ্ট দলের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানবাদী। তাঁহারা গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক এবং এবং উদার পথের পথিক। এদিকে যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, তাঁহারা নবীনকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। এ উভয় দলের সামঞ্জস্য বিধানই বর্তমানের প্রধানতম সমস্যা। এ উভয় দলের মধ্যে জয় পরাজয় পরস্পর কলহ বা বাদানুবাদের উপর নির্ভর করিতেছে না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, হৃতগৌরব আয়ুর্বেদকে যাঁহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিবেন পরিণামে দেশ তাঁহাদেরই অনুসরণ করিবে। তবে উভয় পক্ষের কেহ যদি মনে করেন যে, তাঁহারা বিরুদ্ধ দলকে বর্জ্জন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবেন, তাহা হইলে বলিব তিনি ভ্রান্তির রাজ্যে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার দ্বারা আয়ুর্বেদ সেবার পূর্ণ মর্য্যাদা কোন দিন ফিরিয়া আসিবে না।

আধুনিক বিজ্ঞানবাদীকে বলি, যদি সংস্কারের আগ্রহাতিশয্যে আয়ুর্বেদ তাহার স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য হারায়, তাহা হইলে আয়ুর্বেদ চর্চা দেশে অবান্তর বলিয়া গণ্য হইবে। নবীনকে বলি, তোমার কৃষ্টির বৈশিষ্ট নিহিত আছে যে শাস্ত্রে, সে শাস্ত্রকে যাঁহারা নানা বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সেই প্রাচীনের সম্মানের দাবী তুমি সর্বোতোভাবে স্বীকার করিও।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমি পুনরায় কলিকাতার সহকর্ম্মীগণের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সসম্মানে আহ্বান করিতেছি, আমাদের আয়োজন অতি সামান্য, ভয় আপনাদের মর্য্যাদা রক্ষায় হয়ত আমরা সক্ষম হইব না। তবে, বিশ্বাস আছে, আপনারা নিজগুণে আমাদের দোষক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।

"গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।"

ওঁ শান্তি !
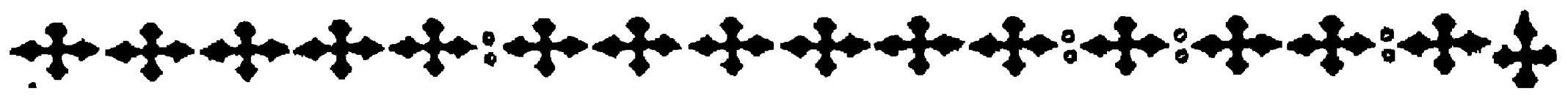
ক্রিকেট-বল প্রস্তুত প্রণালী

ভারত গরীবের দেশ হ'লেও ক্রীড়া জগতে তার প্রাধান্য বড় কম নয়। বিশ্বের দরবারে খেলোয়াড় হিসাবে তার খুব নাম আছে। বিলাত ও চীন থেকে যে ক্রীকেট ও ফুটবলের টীম এদেশে খেলতে এসেছিল তারা ভারতীয়-দের ক্রীড়া নৈপুণ্যের খুব প্রশংসা করে গেছে। এটা শুনলে আমাদের বুকখানা নিশ্চয়ই গর্ব্বে ভরে উঠবে যে, বিদেশীদের সঙ্গে খেলায় আমরা সম্মানজনক অংশ লাভ করেছি। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বে আমাদের হকীটীম একেবারে অপরাজেয়—তাদের সামনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে এমন খেলোয়াড় পৃথিবীতে নেই। পরাধীন ভারতবাসীর কাছে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

আমাদের এখানে ফুটবল খেলার মরশুম শেষ হয়েছে, কয়েক মাসের মধ্যেই ক্রিকেট খেলা অরম্ভ হবে। এ খেলা শুধু বাংলা দেশের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সারা ভারতবর্ষেই তা' ছড়িয়ে আছে। বরঞ্চ একথা বলা যায় যে, বাংলা দেশের চেয়ে অন্যান্য প্রদেশেই এ-খেলার বেশী চলন এবং বাঙ্গালীর চেয়ে অপরাপর প্রদেশবাসীই এধারে বেশী পটু'। কিন্তু বংলাদেশেও ক্রিকেট খেলার প্রসারতা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। সহরে বাঙ্গালী ছেলের ফুটবল ও ক্রিকেট ছাড়া আর কোন খেলা নেই বললেই হয়। এমন দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মাঠের অভাবে রাস্তার গলিতে এবং উইকেট-ষ্ট্যাণ্ডের অভাবে খান তিনেক খান-ইট সাজিয়ে ছেলেরা খেলা করছে; যাদের ব্যাট্‌বল আছে ভালই, যাদের নেই তারা কেরোসিন বাক্সের কাঠকে ব্যাটের আকারে তৈরী করে নিয়েছে, এবং ক্রিকেট বলের বদলে টেনিসের ক্যাম্বিস্ বলেই কাজ চালাচ্ছে।

এর থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, আমাদের ছোট ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার কী ভয়ঙ্কর আগ্রহ প্রাকাশ পাচ্ছে। এই আগ্রহ ক্রমশঃ আরও বেশী ভাবে প্রকাশ পাবে এর কারণ আছে। আমরা যত বেশী পশ্চিমের সংস্পর্শে আসছি, ওদের খেলাধুলা, চাল চলন ততই আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, আমাদের জাতীয় ক্রীড়া কর্ম্ম লুপ্ত হতে চলেছে। এটা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কালের অপ্রতিহত দাবীর জেরে যা কিছু পুরাতণ তা যাচ্ছে বিলীন হয়ে ঠিক বুদ্বুদের মত। জাতীয়তাবাদের উন্মত্ততায় ও আন্তরিক-তায় আমরা এর বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি ও প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ঘোষনা করছি, তবুও কিছুতেই এটা রোধ করতে পাচ্ছি না। হয়ত কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও

প্রয়োজন ছিল। আমাদের জাতীয় ক্রীড়া কর্ম্মাদি যদি আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া কর্ম্মাদির নিকট হটে যেতে সুরু করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, হয় আমাদের জাতীয় ক্রীড়া কৌশলাদির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তারা হারিয়েছে নয়ত আমাদের মন জাতীয়তা বিমুখ হয়ে পড়েছে।

নিছক তর্কাতর্কি ছেড়ে দিয়া ব্যবসা ও শিল্পের দিক দিয়ে এদেশে ক্রীড়া কৌশলাদির প্রবর্ত্তনে আমরা একটি শিল্পের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। ফুট বলের মরশুমের সময় এদেশে যে পরিমাণ ফুটবল বিক্রীত হয় তা' নিতান্ত সামান্য নয়; লক্ষ লক্ষ ফুটবল এক এক মরশুমে বাজারে কাটে বলে মনে হয়। তার মধ্যে বেশীর ভাগ দেশী মাল আছে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এর দ্বারা দেশীয় মুচি ও ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছে। ক্রিকেট সম্পর্কেও ঐ একই বিষয় প্রযোজ্য। উক্ত খেলার মরশুমের সময় বহু সংখ্যক ব্যাট ও বল বিক্রীত হয়। ঐ ব্যাট্ ও বল এদেশে প্রস্তুত হতে পারে এবং হয়েও থাকে, এবং উক্ত বস্তু এদেশে প্রস্তুত হওয়ার দরুণ এদেশীয় ব্যবসায়ীগণের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আমরা বর্ত্তমানে ক্রিকেট বল প্রস্তুত করার বিষয়ই আলোচনা করব।

ক্রিকেটবল যাঁরাই লক্ষ্যই করেছেন তাঁরাই দেখেছেন যে উহা খুব শক্ত হয়ে থাকে, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন শক্ত ধাতু বস্তু বা কাষ্ঠদ্রব্য দিয়ে উহা তৈরী হয় না। বরং হালকা নরম বস্তু দিয়েই তৈরী হয়ে থাকে। ঐ হালকা বস্তুর নাম হচ্ছে কর্ক্। কর্ক্ ছাড়াও চামড়ার টুক্‌রো, সুতার প্‌টলী স্পঞ্জ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রিকেট-বল প্রস্তুত করণের প্রক্রিয়া ত্রিবিধ:—প্রথমে কর্ক বা অনুরূপ দ্রব্য সমন্বয়ে বলের কাঠামো তৈরী করে নিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ সেই কাঠামোকে বলের আকারে গোল করে ছেটে তার উপর পুরু করে টোয়াইন্ সুতো জড়িয়ে এবং শিরিষের আটা লাগিয়ে সেটাকে শক্ত বলাকৃত পদার্থে পরিণত করা হয়; তৃতীয়তঃ চামড়া দিয়ে সেটাকে মুড়ে সেলাই করে ফিনিস লাগানো হয়। এই হল ক্রিকেট বল প্রস্তুতের আসল রহস্য।

উপরোক্ত ব্যাপার থেকে বোঝা যাবে যে ব্যাপারটা কত সহজ। কর্ককে ছোট ছোট কিউব আকারে কেটে নিয়ে তারপর আটা দিয়ে পরস্পরকে জুড়ে সেগুলোর কোণ ছেঁটে দিয়ে সেটাকে গোলাকৃতি বলেতে পরিণত করা কিছু-মাত্র শক্ত ব্যাপার নয়। তাবপরে তারওপর টোয়াইন্ সুতা জড়িয়ে সেটাকে প্রার্থিত সাইজে পরিণত করতেও বেগ পেতে হয় না। উক্ত বস্তুকে তখন শিরীষের আঠা মাখিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়ে থাকে। শুকোবার পর উহা খুব শক্ত আকার ধারণ করে। তারপরে চামড়া জড়াবার পালা—এই চামড়া যে পুরু হবে তার কোন মানে নেই, তা' মজবুত হলেই হল! উক্ত চামড়ার এক এক খানিকে বলের মোট পরিধির (circumference) কিঞ্চিদধিক এক চতুর্থাংশ আকারে কেটে নেওয়া হয় এবং সেগু-লোকে জলে ভেজানো হয়ে থাকে। তৎপরে উক্ত দুখানি চামড়াকে একসঙ্গে সেলাই করলেই তা বলের অর্দ্ধাকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে বলের বহিরাবরণের খোল প্রস্তুত সম্পন্ন হয়ে

থাকে। উক্ত খোলের একটিতে গোলাকৃতি তালটি পুরে তার ওপর আর একটি খোল মুড়ে উভয়কে সেলাই করে দেওয়া হয়। এই সেলাই ব্যাপার সমাধা করবার জন্য বিশেষ রকমের ছোটখাটো যন্ত্রপাতি আছে। চামড়াকে জলে ভিজিয়ে সেলাই করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তখন তা নরম থাকার দরুণ ভেতরের পদার্থকে ঠিক-ভাবে ঢেকে দিয়ে তা সেলাই করা যায় এবং তা যত শুকোয় ততই টাইট হওয়ার দরুণ বল অত্যন্ত শক্ত আকার ধারণ করে।

উপরোক্ত ব্যাপার থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, ক্রিকেট বল প্রস্তুত ব্যাপার-টা কিছুমাত্র শক্ত বিষয় নয়, বরং এটা ছোট-খাটো কুটিরশিল্পের একটা উত্তম উপাদান। আরও একটা সুবিধা এই যে, এই ব্যাপারে বিশেষ মূলধনের প্রয়োজন হয় না। সামান্য মূলধনেই চলে যায়। ব্যবসার পক্ষে এটা কম সুবিধার কথা নয়। আমাদের এদেশে পূজার পর থেকেই ক্রিকেটের মরশুম, সুতরাং তা' এসে পড়ল বললেই হয়। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের মধ্যে ক্রিকেট খেলাটা ক্রমশঃ ফুটবলের মতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ক্রিকেট বলের ব্যবসার পক্ষে সেটা একটা সুলক্ষণ সন্দেহ নেই।

এতদিন দেখা গেছে যে, ক্রিকেটের বল বিক্রীর ব্যবসাটা কোল্‌কাতার গোটাকয়েক স্পোর্টস্-ডিলার্সের দোকানের মধ্যেই একচেটে হয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে কেউ যদি পৃথক ভাবে ক্লাবে ক্লাবে যোগান দ্বারা তাদের সেই একচেটিয়া ব্যবসা ভাঙ্গতে পারে তাহলে সে যে লাভবান হবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আজকাল এমন দেখা যাচ্ছে যে ব্যব-সায়ীদের মধ্যেও একটা হতাশার ভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হচ্ছে ; নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুণ লাভ কম হওয়ায় তাদের ব্যবসার ওপর একটা বিতৃষ্ণা এসেছে। কিন্তু তারা যদি নূতনত্বের দিকে একটু ঝোঁকে তাহ'লে হতাশার কোন কারণ থাকে না। তা' ছাড়া, আমাদের মধ্যে এমন বহু বেকার যুবক আছে যারা কোনরূপ জীবিকা সংস্থানের উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। তারা যদি ক্রিকেটবল উৎপাদন ও বিক্রয়ের দিকে মনোনিবেশ করে তবে লাভবান হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শিল্পপ্রতিষ্ঠায় ধনীদের কার্য্যকরী অংশ

একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বাংলাদেশ শিল্পপ্রসারতার প্রারম্ভিক প্রান্ত-পথ ত্যাগ করে উন্নতির ক্রম-প্রসারমান পথে অগ্রসর হয়েছে, তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে ব্যাপারটা বড়ো দেরীতে অনুষ্ঠিত হ'ল। একেইত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে ভারতবর্ষের আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদও আধুনিকতন্ত্রের মধ্যপথে স্থগিত হয়ে রয়েছে—বিশ্বের কোথায়ও এরকম অসামঞ্জস্যমূলক ব্যবস্থা দেখা যায় না। তার ফলেই ইউরোপীয় দেশসমূহে বহুপূর্ব্বে যন্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হ'লেও ভারতবর্ষে তার হাওয়া কয়েক বৎসর আগে মাত্র এসে লেগেছিল; তার ওপর অপরাপর প্রদেশ, বিশেষতঃ বোম্বাই যখন সেই বিলম্বাগত যন্ত্রবিপ্লবের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল, বাংলাদেশ তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাল কাটিয়ে দিয়েছে। অথচ হিসাবে প্রকাশ নাকি বোম্বাইএর চেয়ে বাংলাদেশেই টাকাকড়ির লেনদেন হয় সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের সেই শিল্পবিমুখ ঘোরতন্দ্রা অন্ধকার এই বিশ্বব্যাপী অর্থস্রোত ও যন্ত্রস্রোতের কলমন্ত্রমুখরতায় যে জেগে উঠেছে সেটা সুখের কথা কিন্তু আশঙ্কার কথা হচ্ছে যে বাংলার সাধারণ অর্থলগ্নীকারী ধনিকশ্রেণীর ঘুম আজও ভাঙ্গেনি। আজও বাংলাদেশে দুটি চিনির কলের পাঁচ বছর ধরেও সেয়ার বিক্রী সম্ভব হইল না, অথচ কয়েক মাসের মধ্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কয়েকটি চিনির কল জন্ম নিয়ে তাদের উৎপন্ন মাল বাজারে চালু হয়ে গেল। আজও বাংলায় বাঙ্গালী অপেক্ষা ভিন্নপ্রদেশবাসীরই অর্থগত ও শিল্পগত আধিপত্য বেশী।

এর কারণ যদি অনুধাবন করা যায় তা'হলে দেখা যাবে যে, আমাদের ধনীদের দৃষ্টি এখনো গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির ওপর নিবদ্ধ। এক হিসাবে দেখতে গেলে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বড় নিরাপদ ব্যবস্থা, নিশ্চিন্ত আরামের রত্নসিংহাসনের ওটা যেন কোন্ মধ্যমণি; সেইজন্যই শিল্পবিমুখ ধনীদের আলস্যময় তন্দ্রাজড়িত আঁখি একে দেখেই লুব্ধ হয়েছিল; তাঁদের সেই স্তিমিত দৃষ্টির কাছে আহত মণির দ্যুতিমান ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র নিষ্প্রভ হয়নি, যদিচ বহুবরষ কেটে গেল। সাংসারিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির কল্যাণে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়ত ঠিকই আছে, কিন্তু বর্ত্তমান গতিশীলতা ও পরিবৃদ্ধির যুগে শুধুমাত্র 'ঠিক থাকাটাই লাভের পরিচয় নয়। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত 'মূলধনে'র সঙ্গে ওরই ইংরাজী প্রতিশব্দ 'কাপি-

ট্যাল'এর একটু পার্থক্য আছে; প্রথমোক্তের আয় আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তা' একেবারে নির্দ্দিষ্ট, আর শেষোক্তের প্রতিদানটা একেবারে অনির্দ্দিষ্ট।

ক্যাপিটালের অর্থশাস্ত্রগত ব্যাখ্যা যাই হোক্ না কেন ওর ব্যবহারিক আদর্শ হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি হারে লাভ আদায় করা (অবশ্য একথা ঠিক যে উচ্চলাভের একটা সীমা আছে, এবং ক্ষেত্রান্তরে লোকসানও ঘটতে পারে) কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করলে সে-জিনিষটা ঘটে না। অথচ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিটা যে ক্যাপিটাল নয় এমন কথা বলবার সাহস কোন অর্থনীতিবিদ্ই রাখে না। সেই-জন্যই বলছিলাম যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির কল্যাণে ধনীদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ঠিক থাকতে পারে কিন্তু তা বাড়েনি, অথচ ক্যাপিটাল হিসাবে সেটা বাড়া উচিত ছিল। ক্যাপিটাল হয়েও ক্যাপিটালের ব্যর্থতা এইখানে।

আমাদের বোম্বাই ও মাড়োয়ার প্রদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে মূলধনের এই ত্রুটি সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ে; সেইজন্যই আমরা দেখতে পেয়েছি যে ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই এ সর্ব্বপ্রথম যন্ত্র-বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির নিরাপদ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নিঃশঙ্ক স্বর্গসুখকে তারাই প্রথম অগ্রাহ্য করেছিল, ওর প্রলুব্ধ আলেয়া তাদের কখনো টানতে পারেনি। সেইজন্যই বোম্বাই প্রদেশে এত কলকারখানার প্রসারতা সম্ভব হয়েছে। আজ কিন্তু আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের অচলা লক্ষ্মী আজ যখন ষোড়শোপচার পূজার অভাবে সচলা হ'তে চলেছে তখন আমাদের খেদের সীমা নেই। আমাদের সেই নিশ্চিন্ত আরামের আলস্যবিক্ষিপ্ত ঘোরতন্দ্রা থেকে আমরা জেগে উঠেছি বটে কিন্তু অন্য প্রদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এত পশ্চাতে পড়ে রয়েছি যে, আমাদের আর্থিকশক্তি ক্রমাগত ব্যাহত হচ্ছে। এর ওপর এখনো যদি ধনীদের নিদ্রালস আঁখি গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির আলেয়ার দিকে নিবদ্ধ থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে জাতীয় উন্নতির আর একটা সুবর্ণ সুযোগ অন্তর্হিত হবে।

নবীনপন্থীরা যন্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে কিন্তু যে-সমস্ত প্রাচীনপন্থীর দৃষ্টি এখনো যন্ত্রবিমুখ তাঁদের একথাটা ভোলা উচিত নয় যে, বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে রাজসেবার চেয়ে বাণিজ্য ব্যাপারটাকেই ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে এ-অভিমতও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ততেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বেশী পূর্ণ হয়। পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত সংস্কারের মোহের বশে আমরা অন্ধ ভক্তি সহকারে লক্ষ্মীর পূজা করি সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে আজ পর্য্যন্ত শিখিনি। অর্থাৎ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিটীর প্রতি আমাদের যুক্তিহীন ভক্তি ঢেলে দিই বটে কিন্তু আসল দেবীর আরাধনা আমরা কোন দিনই করিনে। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা লগ্নী করা যে, এক রকমের রাজসেবা একথাটা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না, অথচ বাণিজ্যে যে তার চেয়ে বেশী লক্ষ্মী লাভ হয় সেটা শাস্ত্রেই বলছে। সুতরাং প্রাচীনপন্থীরা কি করে শিল্প বিমুখ মন নিয়ে বসে থাকেন তার কি কোন যুক্তি পাওয়া যায়?

পৃথিবীর সর্ব্বক্ষেত্রেই আজ শিল্পের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বর্ব্বর জগতের বাইরে ভারতবর্ষ ও চীন দেশ শিল্প ব্যাপারে পশ্চাদপদ। অথচ দেশটীকে শিল্পমুখী না করলে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা যে দূরীভূত হবে না সেটা নিশ্চিত। শিল্প প্রসারতার অনাধ্যাত্মিক কুফল দেখে অনেকে যন্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের একথাটা বোঝা উচিত যে উক্ত কুফলের জন্য যন্ত্রবিপ্লব দায়ী নয়, দায়ী উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য। পূর্ব্বেই বলেছি যে, দেড় শতাব্দীরও পূর্ব্বে যে শিল্প বিপ্লব ইউরোপকে আলোড়িত করেছিল তার ঢেউ আমাদের দেশে এসে পৌছল বহু বিলম্বে—এই বিলম্বের জন্য আমাদের দুর্ভাগ্য বেড়েছে বই কমেনি। সেই বিলম্বাগত সুবিধার সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজও আমরা যদি পূর্ব্বের মত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দিন কাটাই তা হলে দুঃখের পাল্লা আরও ভারী করা হবে। অথচ আমাদের ধনীরা ক্রমাগত গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর প্রতি লুব্ধ হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সেই জিনিসটি সম্ভব করছেন। শিল্প প্রসারতার প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে মূলধন যোগানোর কার্য্যে দেশের ধনীরাই একমাত্র ভরসাস্থল; গরীব অর্দ্ধভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে সে সামর্থ্য এখনো দেখা দেয় নি যাতে তারা কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সাহায্য করতে পারে। কাজে কাজেই দেশের ধনীদের প্রতি নিবেদন যে, তাঁরা এবিষয়ে অবহিত হোন্। তাঁদের মূলধনকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে দিন, তাতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের হাহাকারও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হ'বে।
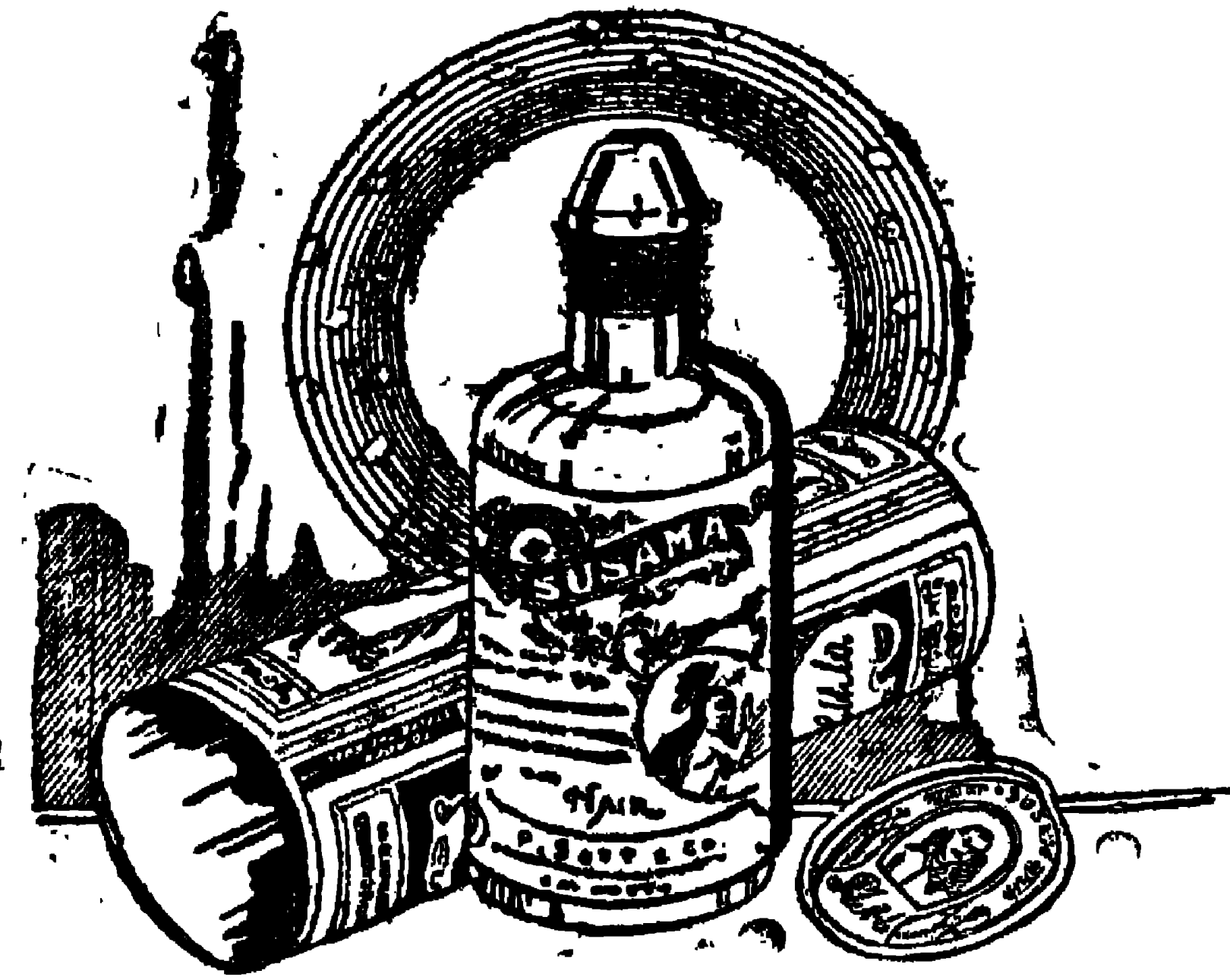
পূজার বাজার

আশ্বিন-কার্ত্তিক দুইমাস বাংলাদেশে শারদোৎসব ও পূজার বাজার। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, —এই পাঁচটী পূজার অনুষ্ঠান এই দুই মাসের প্রধান উৎসব। ধর্ম্মের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ আমরা সে বিষয়ের আলোচনা এখানে করিব না। ব্যবসায়ের সহিত ইহাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, আমরা সেই সূত্রেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলার শিল্প ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিব।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে যখন এই সকল পূজা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এমন একটা সংযোগ ছিল যে ঐ দুইটীকে পৃথক বলিয়া ধরা যাইত না। দেখা যায়, এই সকল পূজা এবং উৎসব যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমাজের সকল স্তরের লোকই নানাবিধ শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া এই সকলপূজা পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। এইরূপে দেশের শিল্প এবং ব্যবসায়ের উন্নতি এবং পরিপুষ্টির ব্যবস্থা এই সব অনুষ্ঠানে ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আইন কানুন করিয়া শিল্পব্যবসায়কে রক্ষা করিতে হয়,—কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানেব মধ্যদিয়া সেই কার্য্য আপনা-আপনি সাধিত হইত। এখন পূজা-পার্ব্বণ কেবল আধ্যাত্মিকতার প্রেরণাতেই অনুষ্ঠিত হয়,—পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্তই লোকে দেব-দেবীর অর্চ্চনা করে। কিন্তু তথাপি এই পূজার দুইমাস ধরিয়া বাংলাদেশের ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। চারিদিকে "পূজার উপহার"—"পূজার উপহার"—বলিয়া একটা সাড়া পড়িয়া যায়। বাজারে বেচা কেনার ব্যাপার খুব জমিয়া উঠে।

পূজার উপকরণে শিল্পদ্রব্যের প্রচুর ব্যবহার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রীতি ও সদ্ভাব পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে বিবিধ উপহার প্রদান, আমোদ-প্রমোদ এবং পান ভোজনের বিপুল আয়োজন,—উৎসব উপলক্ষে জনসাধারণের ইতস্ততঃ গমনাগমন-চাঞ্চল্য, এই সকল ব্যাপারে ব্যবসাবাণিজ্যকে তুমুল আন্দোলনে তোল-পাড় করিয়া তোলে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন শিল্পব্যবসায়ের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও সংযোগ স্থাপিত হওয়াতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই

এই পূজার মরশুমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, যদিও প্রকৃতপক্ষে উৎসবটী কেবলমাত্র হিন্দুদেরই অনুষ্ঠেয়। বাংলাদেশে আর কোন উৎসবে এরূপ দেখা যায় না।

প্রাচীনকালে ভারতীয় রাজগণ শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। বাস্তবিক প্রাকৃতিক অবস্থাও তখন বিজয় অভিযানেরই অনুকুল হইয়া থাকে। সেইজন্যই দেখা যায়, পূজার দেব-দেবীগণ সকলেই যুদ্ধ এবং ধনসম্পদ্ সম্পর্কিত। পূজার মন্ত্রও সেইরূপ,—

রূপং দেহি, জয়ং দেহি
যশো দেহি, দ্বিযো জহি।

"আমাদিগকে রূপ দাও, জয় দাও, যশঃ দাও,—আমাদের শত্রু সংহার কর।" কিন্তু বর্ত্তমান কালে, ভারতবর্ষে সেই প্রাচীন দিগ্বিজয়-যাত্রার কল্পনাও কেহ করিতে পারেনা। বাঙ্গালীর সিংহল-বিজয়, খুব বেশী দিনের কথা নয়। সেনবংশীয় এবং পালবংশীয় রাজগণও বাংলার সীমা বহুদূর প্রসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ বাংলার সেই গৌরবের দিন আর নাই ;—সেই বীরত্বের কাহিনী আজ বিস্মৃত স্বপ্নের মত কুহেলি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। অথচ বাংলার শারদোৎসবে পূর্ব্বের মত রণ-চণ্ডী দেবীগণের পূজা চলিতেছে,—ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর উপাসনা এবং বীরত্বের প্রতীক দেবসেনাপতির সম্বর্দ্ধনা হইতেছে। তবে এ সকল পূজা ও উৎসবের সার্থকতা কি? বৃথা ঐ মঙ্গল কলস গৃহের দ্বারে দ্বারে পুষ্পপল্লবে সজ্জিত হইয়াছে?—নিষ্ফল ঐ ধূপদীপ নৈবেদ্যের সম্ভার? —মিছে ঐ তন্ত্র-মন্ত্র তপ-জপ ভজন-পূজন? না, তাহা নহে। বাঙ্গালী তাহা হইতে দিবেনা। বাঙ্গালী আজ দিগ্বিজয়ের দ্বারাই তাহার শারদোৎসবের পূজাকে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিবে। সে দিগ্বিজয় যুদ্ধবিগ্রহে নয়,-ব্যবসা-বাণিজ্যে। তাহাতে বিদেশীয় বণিক-দের সহিত প্রতিযোগিতাই যুদ্ধ,—এবং তাহাদের মালপত্র বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কারই শত্রু সংহার।

শারদীয় শুক্লা সপ্তমী হইতে যখন বাংলার ঘরে ঘরে পূজার বাদ্য,—শঙ্খ ঘণ্টা ও ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠে,—ধূপধূমে, হোম গন্ধে দীপালোকে, নৈবেদ্যের থালায় পূজার মণ্ডপ ভরিয়া যায়,—আনন্দ কলরবে বাংলার নগর পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে,—তখন যদি দেখা যায়, বাংলার লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে,—বাংলার লক্ষ্মী হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছেন,—বাংলার হাট বাজার বিদেশীর পণ্যে ভরিয়া গিয়াছে, তবে কি পূজার আমোদ একটা বিষাদ মলিনতায় ঢাকিয়া যায়না?—তবে কি পূজার অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয়না? আমরা তাই আজ পূজার উদ্বোধনে বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি বাণিজ্যসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া যথার্থরূপে দেবীর পূজা কর;—বাংলার ধনসম্পদ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর তুষ্টি বিধান কর। দেশের টাকার বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া বিদেশের টাকা কুড়াইয়া আনিবার উপায় কর।

এই পূজার বাজারে প্রধান পণ্যদ্রব্য হইল, —বস্ত্র। আজকাল সাধারণ আটপৌরে সুতি কাপড় হইতে বহুমূল্য তসর গরদ রেশমী পশমী কাপড় পর্য্যন্ত সবই দেশী পাওয়া যায়। কাপড়ের জন্য বাঙ্গালীকে আর পরনির্ভরশীল হইতে হইবে না। এমনকি আমরা আশা করিতে পারি বাংলাদেশের কাপড়ের কলেই বাংলার পূজার বাজারের চাহিদা মিটাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশে ২৭টী কাপড়ের কল আছে। এই ২৭টী কাপড়ের কলে মোট ৩৫২৩৬৮ টাকু এবং ৮৮১৫ তাঁত চলিতেছে। শীঘ্রই ২নং মোহিনীমিল (বেলঘরিয়ার নিকট) এবং ২নং ঢাকেশ্বরী মিল (নারায়ণগঞ্জে) চলিতে আরম্ভ করিবে। বাঙ্গালী একমাত্র বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল লইয়া ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যবসা ক্ষেত্রে নামিয়াছিল,—আজ বাঙ্গালী বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ২৭টী কাপড়ের কল চালাইতেছে। শীঘ্রই বাঙ্গালীর কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩০ হইবে। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। আজ পূজার বাজারে বিদেশের,—অ-বাঙ্গালীর কাপড় কিনিয়া বাঙ্গালী যেন সেই গৌরব ক্ষুণ্ণ না করে। আমরা জানি, জাপানী প্রতিযোগিতা খুব তীব্র। সস্তা দামের জাপানী কাপড়, সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু সস্তার যে তিন অবস্থা,—সস্তামাল কিনিয়া আখেরে যে পস্তাইতে হয়,—জাপানী পণ্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ;—সে প্রমাণও বাঙ্গালী পাইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী স্বদেশী মিলের ট্যাঁকসই, সুন্দর কাপড় ফেলিয়া জাপানী কাপড় কোনমুখে কিনিবে? বিশেষতঃ এই পূজার বাজারে,—যখন দেবীপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাঙ্গালী বলিতেছে,—

"রূপং দেহি,-জয়ং দেহি
যশো দেহি, দ্বিষো জহি।"

তখন যদি বিদেশী বস্ত্রে বাঙ্গালীর দেহ সজ্জিত হয়, তবে সেই মন্ত্রের মাহাত্ম্য থাকে কোথায়?—পূজার পবিত্রতা রক্ষা হয় কিরূপে? সেইজন্য আজ শারদলক্ষ্মীর অনুপম সৌন্দর্য্যে যখন বাংলার নগরপল্লী ভরিয়া উঠিবে, তখন যেন সেইসঙ্গে বাংলার মিলের রকমারী সুন্দর সুন্দর কাপড়ে

বাজার ভরুতি হইয়া যায়,—আর তাহাই কিনিবার জন্য যেন বাঙ্গালীদের মধ্যে কাড়াকাড়ির কোলাহল পড়িয়া যায়। তবেইত পূজা সার্থক ও সফল।

কাপড়ের পরে, সাবান-গন্ধদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতি বিবিধ উপহার। এই সকল জিনিসও বাংলাদেশে প্রচুর তৈয়ারী হইতেছে। ইহার জন্যও বাঙ্গালীকে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। জুতা এখন আর বিদেশী নাই;—বাঙ্গালীর জুতার কারখানাও অনেক হইয়াছে। জামার কাপড় ও নানারকম ছিট্ বাংলার মিলে প্রচুর তৈয়ারী হয়না বটে,—কিন্তু ইহার জন্যও ভারতের বাহিরে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার নাই।

কয়েক বৎসর যাবৎ পূজার বাজারে পুস্তকের ব্যবসা খুব জমিয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানার কাজও বাড়িয়াছে। পূজা উপলক্ষে প্রীতিভাজন আত্মীয় স্বজনকে অথবা স্নেহাস্পদ বালক বালিকাদিগকে পুস্তক উপহার দেওয়ার প্রথা এত চল্‌তি হইয়াছে যে, পূজার জিনিস পত্রের ফর্দ্দে অন্ততঃ দুই তিন খানি পুস্তক থাকিবেই। সংবাদপত্রের মালিকদের অনেকেই পূজার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করেন; সেইজন্যও ছাপাখানার কাজ বাড়িয়া যায়।

লোক চলাচল ব্যাপারে পূজার মরশুমে রেল-কোম্পানী এবং ষ্টীমার কোম্পানীই বেশী টাকা পায়। এই বাবতে বাঙ্গালীর বহু টাকা বিদেশে যাইবে,—কিন্তু তাহার উপায় নাই। খালে বিলে নৌকা চলিলেও পদ্মা, মেঘনার মত নদীতে বিপদ;—অথচ বাঙ্গালী এযাবৎ স্বকীয় ষ্টীমার কোম্পানী গঠিত করিতে পারে নাই। তবে বাঙ্গালীর পরিচালিত মোটর বাস্ কোম্পানী অনেক আছে,—এবং এই পূজার বাজারে বাঙ্গালী সেই সকল কোম্পানীকে যদি টাকা দেয়, তবে দেশের টাকা দেশেই থাকিবে।

পূজার সময় মূর্ত্তিগঠন উপলক্ষে মৃৎশিল্পীদের কাজের খুব চাহিদা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের ক্রমোন্নতি আমরা দেখিতেছিনা। দেবমূর্ত্তিগঠনে ইহারা নূতন নূতন ফ্যাশন আমদানী করিতেছে বটে, কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে,—যেখানে বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে, সেখানে বাঙ্গালী মৃৎশিল্পীদের কার্য্য পরিচয় আমরা কিছুই পাইনা। বাঙ্গালীর পরিচালিত পটারী ওয়ার্কস্ (Pottery Works) নাই,—চিকিৎসা বিদ্যাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মডেল—বাংলার মৃৎশিল্পীরা তৈয়ারী করিতে পারেনা,—সে সমস্ত বহুমূল্য মডেল বিদেশ হইতে আসে। পূজায় দেবমূর্ত্তিগঠন প্রথা বাংলার মৃৎশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে,—কিন্তু যদি অন্যক্ষেত্রে সেই শিল্পের প্রসার না হয়,—তবে এমনতর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

পূজার উৎসবে আলোক মালার উজ্জ্বল সজ্জা একটী প্রধান আনন্দের বিষয়। বড় বড় সহরে যেখানে ইলেক্‌ট্রিক বা বিজলী সরবরাহের কারখানা আছে, সেখানে ঐ বিজলী বাতিতেই রোস্‌নাইয়ের খুব জৌলুস হয়। কলিকাতা ব্যতীত বাংলার অন্যান্য সহরে আমাদের দেশীয় কোম্পানীরই ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কারখানা আছে। সুতরাং পূজা উপলক্ষে তাহাদের যে আয় বৃদ্ধি হইবে, তাহা বাঙ্গালীর সম্পদ ভাণ্ডারেই সঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু এই সম্পর্কে যে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের বাল্‌ব্ ব্যবহার হয়, তাহা বিদেশ হইতেই বেশী পরিমাণ আসে। সম্প্রতি বাংলা দেশে এই বাল্‌ব্ তৈয়ারীর

কারখানা প্রতিষ্টিত হইয়াছে। বিদেশী বাল্বের তুলনায় আমাদের দেশীয় বাল্ব কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী এই পূজার উৎসবে আলোক সজ্জার জন্য যেন স্বদেশী বিজলী বাতির বাল্ব ক্রয় করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী স্বদেশী নূতন শিল্পের উন্নতির সাহায্য করেন,—ইহাই আমাদেব ইচ্ছা।

কালীপূজা উপলক্ষে বাজী পোড়ান এ দেশে ধর্ম্মোৎসবের অঙ্গ স্বরূপ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেই সকল বাজী এবং অগ্নি উৎসবের নানা উপকরণ সমস্তই বিদেশ হইতে আসে এবং ইহাব মূল্য বাবতে বহু লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। পুনশ্চ দীপালী রাত্রিতে দৈব দুর্ঘটনায় বহুলোকের মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে,—বাঙ্গালীর আনন্দ কোলাহলে দুঃখের হাহাকার উঠে। আমরা বাঙ্গালীকে অনুবোধ কবি কালীপূজা দীপালী উৎসব এমন ভাবে সম্পন্ন করুন, যেন দেশেব লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাইয়া বিদেশী বাজী আমদানী কবিয়া পোড়ান না হয়। প্রবল বন্যায় সমগ্র বাংলা দেশ ডুবিয়া গিয়াছে, গৃহস্থদের সারা বৎসরেব আহাব সামগ্রী, কৃষকদের গৃহপালিত গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জন্তু বন্যায় ভাসিয়া মবিয়া গিয়াছে, আজ সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন, নিরাশ্রয়, তাহাদেব মাথা রাখিবার স্থান নাই। এমন অবস্থায় কি বিদেশী বাজী পোড়ান শোভা পায়? এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালীকে বিশেষ অবহিত এবং একটু সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে অনুরোধ করি।

পূজার উৎসবে পান ভোজনাদির আমোদেও বিদেশী বণিকের সহিত প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। বিস্কুট লজেঞ্জ, প্রভৃতি নানারকম খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে বহু আমদানী হয়। কিন্তু ইহাদের কারখানা দেশেও অনেক রহিয়াছে। বাঙ্গালী যেন পূজার বাজারে বিদেশী বিস্কুট লজেঞ্জ কিনিয়া ছেলে মেয়েদের হাতে না দেন, আমরা তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করি। পূজার মণ্ডপে নৈবেদ্যের থালার দিকে চাহিয়া আমাদেব দুঃখ হয়;— বাংলার ফল শস্যেব কি দারিদ্র্য—বাংলার দুগ্ধজাত দ্রব্যেব কি নিদারুণ অভাব! বাংলার ফলের চাষ, গো-পালন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসায় কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠাও হয় নাই। আমরা এই সম্পর্কে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় মাসের পর মাস অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং এখনও লিখিতেছি। বাঙ্গালীর দৃষ্টি এই দিকে পতিত হউক, বাংলার "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" নাম সার্থক হউক।

শরৎ কালের পূজাব উৎসব বাঙ্গালী এই রূপে বিজয় গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী দেশের টাকা দেশে রাখুন, নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাংলার উৎসাহ উদ্যম অর্থ সামর্থ্য নিয়োজিত হউক। তবেই শারদোৎসবে বাঙ্গালীব এই পূজার অনুষ্ঠান—সর্ব্ব-শক্তির প্রতীক স্বরূপ দেব দেবীর উদ্বোধন এবং উপাসনা সার্থক ও সফল হইবে।

শিল্প-প্রসঙ্গ

Eau-de-cologne

প্রস্তুত প্রণালী

বিলাসী বাবু ও সুগন্ধ-ব্যবসায়ী মাত্রই ওডি-কোলনের (Eau-de-cologne) সঙ্গে পরিচিত। যত রকমের সুগন্ধী দ্রব্য আছে তার মধ্যে ওডি-কোলন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর কারণ হচ্ছে যে, ইহা বহু ব্যাপারে প্রয়োজন হয়! শুধু বিলাস-দ্রব্য হিসাবে নয়, মানুষের ব্যামোপীড়ার সময় শারীরিক যন্ত্রণা দূরীভূত করতেও ইহা বিশেষ সাহায্য করে। সেই জন্যই এর এত আদর। পল্লীগ্রামে যেখানে বরফ পাওয়া যায় না, সেখানে কোন ব্যক্তির চড়া জ্বর হলে তার মাথার যন্ত্রণার অন্ত থাকেনা, কিন্তু তখন যদি তার কপালে ওডি-কোলন ভিজিয়ে জলপটি দেওয়া যায় তা'হলে সে রীতিমত আরাম বোধ করে। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন এই ওডি-কোলন আবিষ্কৃত হয় তখন থেকেই এ-বস্তু নানান কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পূর্ব্বে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ওডি-কোলন প্রস্তুত হ'ত তা' অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। বর্ত্তমানে কিন্তু উক্ত প্রক্রিয়া ব্যয়সাধ্য বলেই অবলম্বিত হয় না। তা ছাড়া বর্ত্তমানে কৃত্রিম দ্রব্য সমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার দরুণ অনেক সুবিধা হ'য়ে গেছে। তবে এখনো বাজারে এমন ওডি-কোলন পাওয়া যায় যা পুরাতন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়ে থাকে। কাজে কাজেই সেক্ষেত্রে দরের ভয়ঙ্কর তারতম্য দেখা যায়।

ওডি-কোলন কোন মৌলিক পদার্থ নয়, ওটি একটি যৌগিক পদার্থ। Bergamot oil, Petitgrain oil, লেবুর তেল ও অপরাপর সুগন্ধ নির্য্যাস সমূহ মিশ্রিত করেই ওডি-কোলন উৎপন্ন হয়। উক্ত নির্য্যাস সমূহের মধ্যে রোজমেরি, নিরোলি, চন্দন, জেসমিন প্রভৃতি প্রধান। এই বিভিন্ন নির্য্যাস মিশ্রিত করেই ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ বিশিষ্ট ওডি-কোলন প্রস্তুত হয়। Bergamot তৈল মিশ্রিত করলে উহার মধ্যকার সাইট্রাস পদার্থ বর্ত্তমান থাকার দরুণ তা' যৌগিক পদার্থকে প্রভূত সুগন্ধযুক্ত ক'রে তোলে। নিরোলি তৈল লেবুর পুষ্প

হ'তে প্রস্তুত হয়, সুতরাং এ-বস্তুর সংমিশ্রন আসল বস্তুকে পুষ্পগন্ধাভিষিক্ত ক'রে তোলে এবং এ-বস্তু ওডি-কোলন প্রস্তুতের এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। রোজমেরি তৈল যদিও খুব অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তবুও এ একটি আবশ্যকীয় পদার্থ। ওডি-কোলন প্রস্তুত ব্যাপারে যে ল্যাভেণ্ডার তৈল ব্যবহৃত হয় তার পুষ্প নির্য্যাস ও অপরাপর সুগন্ধীদ্রব্যের মধ্যে সমতা রক্ষার্থ কাজে লাগে।

উপরে যে-সমস্ত সুগন্ধদ্রব্য ও নির্য্যাসের কথা উল্লিখিত হল তাদের এক সঙ্গে মিশ্রিত করে এ্যাল্‌কোহলে ডুবিযে দিতে হয়। উক্ত এ্যালকোহল খুব পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ হওয়া চাই, কেননা, ওর মধ্যে অবস্থিত ময়লা পদার্থ ওডি-কোলনের গুণাগুণ ব্যাহত করে। সেই জন্যই রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উক্ত রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটকেও কাঠ কয়লা সাহায্যে ডিস্‌টিল করা হয়—কাঠ কয়লা ছাড়া পটাসিয়াম পার্‌ম্যাঙ্গনেট সাহায্যেও ডিস্‌টিল্‌ করা যেতে পারে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, সাইট্রেস পদার্থ ওডি-কোলনের এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, আঙ্গুর ফল হ'তে প্রস্তুত স্পিরিটে তা' ডোবালে ভাল ফল দেয়। সুতরাং আঙ্গুর ফল হ'তে প্রস্তুত স্পিরিট অর্থাৎ গ্রেপ স্পিরিট ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। উক্ত গ্রেপ স্পিরিটে ocnanthic ether নামক এক প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, যা ওডি-কোলনের মধ্যে অবস্থিত নির্য্যাস-পদার্থের সঙ্গে ভালভাবে মিশ খায়। যদি গ্রেপ-স্পিরিট না পাওয়া যায় তা'হলে 'ট্রিপল্‌ ডিস্‌টিল্‌ড' স্পিরিট ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওডি-কোলন প্রস্তুত ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্পিরিট ডিস্‌টিল্‌ করবার পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান মিশ্রন-পদার্থগুলি মিশিয়ে দেওয়া হয়, শুধু নিরোলি তৈল, রোজমেরি অয়েল প্রভৃতি এ্যাল্‌কোহল ডিস্‌টিলড্‌ হবার পরে মিশ্রিত হয়ে থাকে। এই সব দ্রব্য শেষে মিশ্রিত হবার কারণ হচ্ছে যে এই প্রকার সূক্ষ্ম গন্ধ পদার্থ যদি ডিস্‌টিল্‌সনের পূর্ব্বে মিশ্রিত করা যায় তাহ'লে ওর সুগন্ধ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি ডিস্‌টিল্‌শনের পরে মিশ্রিত হয় তা'হলে সুগন্ধ উবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ভাল ওডি-কোলন উৎপন্ন করতে গেলে মিশ্রিত পদার্থকে দীর্ঘকাল থিতিয়ে রাখতে হয়। এই দীর্ঘকাল, সময় সময় বৎসরাধিক কাল থিতিয়ে রাখার সুফল দ্বিবিধ:—প্রথমতঃ এই রকম দীর্ঘকাল রেখে দেওয়ার দরুণ মিশ্রিত এ্যালকোহলে একপ্রকার 'এ্যারোমেটিক ইথর' উৎপন্ন হয় যা, ওডি-কোলনের সুগন্ধ বৃদ্ধি করে, দ্বিতীয়তঃ, এভাবে এ্যাল্‌কোহলের নিজস্ব গন্ধ ক্রমশঃ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে ওডি-কোলনের স্নিগ্ধতা বেড়ে ওঠে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, ছোটখাটো উৎপাদন-কারিগণ এরূপভাবে মাল ফেলে রাখতে সমর্থ হন না। এই অসুবিধা হচ্ছে আর্থিক অসুবিধা। সকলেই জানেন যে, ছোটখাটো উৎপাদান-কারিদের মূলধন বেশী থাকে না, এবং সেই জন্যই কোথাও টাকা আটকে রাখতে পারে না। কোন ব্যবসায়ী যদি কোন মাল বিক্রয় করে টাকাটা দেরীতে পান এবং তাঁর মূলধন অল্প হয় তা'হলে তাঁর কারবারের অবস্থা কাহিল হ'য়ে পড়ে। কারণ, যে-মাল তিনি বেচলেন সেই মাল বিক্রয়ের টাকা থেকেই তাঁকে আবার অপর মাল খরিদ ক'রতে হয়। ওডি-কোলন-

উৎপাদনকারিদেরও ঠিক সেই অবস্থা। কিছু টাকা খরচ করে তাঁরা খানিক মাল উৎপাদন করলেন এবং সে মাল বৎসরাধিক কাল থিতিয়ে রইল। ফলে এই হল যে, সেই টাকাটা আটকে রইল। তাঁরা যদি অল্প মূলধন বিশিষ্ট হন তাহলে এরকম অবস্থায় তাঁদের ক্ষতির সম্ভাবনা।

সেইজন্যই অল্প মূলধনবিশিষ্ট ব্যক্তিরা কেমি-ক্যাল দ্রব্যের সাহায্যে বেশী দিন থিতিয়ে রাখার ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। এ্যাল্‌কোহলের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ গাম্ বেঞ্জিন্ মিশিয়ে দিলেই কাজ হয় এবং তাতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ থিতিয়ে রাখলেই সমস্ত সুফল পাওয়া যায়। তা'ছাড়া এই গাম্ বেঞ্জিন ব্যবহারের আরও সুফল আছে—এতে করে সুগন্ধটী একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কোন কোন প্রস্তুতকারী সুগন্ধদ্রব্য মিশানর পূর্ব্বেই এ্যাল-কোহলকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য উক্ত কেমিক্যাল দ্রব্য মিশানর পক্ষপাতী। সেক্ষেত্রে প্রতি লিটার এ্যালকোহল পিছু ১ গ্রাম বেঞ্জিন্ ১ গ্রাম টোলু ও অর্দ্ধ গ্রাম oil banum মিশ্রিত করতে হয়। এইভাবে মিশ্রিত পদার্থকে সপ্তাহ ৪।৫ রাখিবার পর সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করে বোতলে প্যাক করতঃ বাজারে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যদি সুগন্ধ দ্রব্য খুব কড়া এ্যালকোহলে মিশ্রিত করা হয় তাহলে উক্ত এ্যালকোহলকে অধিকতর তরল করার প্রয়োজন হ'তে পারে—সেক্ষেত্রে ক্ষেপে ক্ষেপে একটু একটু করে গোলাপ জল বা কমলা লেবু ফুলের জল মিশ্রিত করে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

এটা সত্য যে এ্যালকোহলিক সলিউসনকে ডিস্‌টিলেশন দ্বারা ভাল ওডি-কোলন প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাতে খরচাও আছে। সেই জন্য খরচের পড়তা কম করবার হেতু অনেকে ডিস্‌টিলেশন ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। সেক্ষেত্রে এ্যালকোহলের সঙ্গে গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত ক'রে মিশ্রিত সলিউশনকে এক সপ্তাহ রেখে দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে তাকে ঘাঁটা হয়। এ্যালকোহল কড়া থাকলে উপরোক্ত উপায়ে জলীয় পদার্থ মিশ্রিত করে তাকে অধিকতর তরল করা হয় বটে কিন্তু সুগন্ধ দ্রব্য বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত জলীয় পদার্থ মিশ্রিত করা অসুবিধাজনক, কারণ তাতে সলিউশনগত সমস্ত পদার্থের দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্যই প্রথমে সকল সুগন্ধিদ্রব্যের একটা সলিউশন ইথার সাহায্যে করে নিয়ে পরে সেইটা তরল এ্যালকোহল সলিউশনে করলেই ভাল হয়। খুব ভাল ওডি-কোলন উৎপন্ন করার একটি ফরমূলা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :—

বার্গামট অয়েল	—	১৪২ গ্রাম
লেমন্ "	—	৮৪ "
পোর্ট গ্যাল "	—	৫৭ "
রোজ মেরি "	—	১৪ "
ল্যাভেণ্ডার "	—	১১ "
অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার		৪০০ "
এ্যালকোহল (শঃ ৯০ ভাগ)		
		৯০০০ "

উক্ত মিশ্রিত পদার্থকে ডিস্‌টিল্‌ড্ ক'রে তার সঙ্গে নিম্ন লিখিত পদার্থগুলি নির্দ্দিষ্ট পরি-মাণানুযায়ী মিশাতে হয় :—

নিরোলি অয়েল	—	২০ গ্রাম।
পেটিট গ্রেন	—	
[Petit grain oil]	—	২০ "।
ক্লোভ অয়েল	—	৩ "।
টিন্‌চার অব বেঞ্জিন্	—	৯০ "।

সংমিশ্রিত পদার্থকে এক মাস থিতিয়ে রেখে তারপর শিশিতে প্যাক্ করে রেখে বাজারে বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়া হয়।

ভাল ওডি-কোলন ছাড়াও বাজারে এক রকম সস্তার ওডি-কোলন বিক্রীত হয়। এই সস্তার ওডি-কোলন প্রস্তুতের মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, আসল উপাদানের পরিবর্ত্তে তাতে নকল উপাদান ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এই প্রকার কতকগুলি উপাদানের তালিকা প্রদত্ত হল।

আসল উপাদান	নকল উপাদান
Bergamot oil	Linalyl acetate
Neroli oil	Petitgrain oil or Methyl naphthyl ketone
Lemon oil	citronellol oil
Clove oil	Eugenol
Lavender oil	Terpinyl acetate

নিম্নে উক্ত প্রকার সস্তার ওডিকোলন প্রস্তুতের ফরমূলা দেওয়া গেল :—

Citronellol	—	৪ গ্রাম।
Rhodinol	—	৫ ,, ।
Linalyl acetate		২ ,, ।
Isopropyl alcohol		৫০০ ,, ।
Distilled water		৫০০ ,, ।

কিম্বা অপর ১টী ফরমূলা :—

Linalyl acetate	—	১১·৫ গ্রাম।
Citronellol	—	৬·৫ , ।
Beta-naphtholl ethyl ether		২০ ,,
Petitgrain oil	—	২০ ,, ।
Eugenol	—	৫ ,, ।
Isorpropyl alcohol		৮৫০ ,, ।
Distilled water	—	১৪০ ,, ।

অথবা আর ১টী ফরমূলা :—

Bergamot oil [terpeneless]		৯ গ্রাম।
Citronellol	—	১ ,, ।
Terpinyl acetate	—	২ ,, ।
Methyl anthranilate	—	১ ,, ।
Geraniol	—	৫ ,, ।
Menthol	—	০·৫ ,, ।
Musk ketone	—	০·৫ ,, ।
Iro-engenol	—	১ ,, ।
Neroli	—	১০ ,, ।
Isorpropyl alcohol	—	৫০০ ,, ।
Distilled water	—	৫০০ ,, ।

তরল ওডি-কোলন ছাড়াও একপ্রকার কঠিন ওডি-কোলন পাওয়া যায়। এই ওডি-কোলন, ওডিকোলন গন্ধযুক্ত একপ্রকার স্বচ্ছ সাবান ছাড়া আর কিছুই নয়। উক্ত স্বচ্ছ সাবান এ্যাল্কোহল প্রসেস দ্বারা প্রস্তুত হয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাবান পদার্থ ও ওডিকোলন এসেন্স্ এ্যাল্কোহলে মিশ্রিত করলেই উক্ত সাবান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এ্যাল্কোহলের ভাগ হবে সাবান পদার্থের ওজনের ১০ গুণ। উক্ত মিশ্রিত পদার্থকে ডিস্টিলেশনের পর তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করলে তা' জমাট বাঁধে এবং তাকে তখন আবশ্যকীয় ছাঁচে ঢালা হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, ডিস্টিলেশনের খরচ বেশী এবং সেজন্য উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় খরচের পড়তা বেশী। তজ্জন্য একপ্রকার সহজ প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হ'য়েছে যাতে করে সস্তাদামে কঠিন ওডিকোলন উৎপাদন করা যায়। নিম্নে তা' বর্ণিত হ'ল :—

উৎকৃষ্ট সাবান পদার্থ	১০০ ভাগ
কেন্ সুগার	২৫ ,,
জল	২৫ ,,

উক্ত তিনটি পদার্থ মিশ্রিত করলে পর যখন তা' গলে যায় তখন তাতে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি যোগ করিতে হয় :—

Linalyl acetate	—	৫'৫ ভাগ
Citronellol	—	৬ "
Petitgrain oil	—	৭ "
Rhodinol	—	২ "
Terpinyl acetate	—	১ "

উক্ত মিশ্রিত পদার্থকে ছাঁচে ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দিলেই তা, কঠিন ওডিকোলন আকার ধারণ করে।

আমরা ওডিকোলন সম্বন্ধে সবিস্তারে সমস্ত লিপিবদ্ধ করলাম, শিক্ষিত বেকারের দল এ ধারে মনোনিবেশ করুন এই প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রদ্দি পাটের ব্যবহার :—

সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, পাটের গোড়ার দিকে প্রায় ১২ ইঞ্চি একটু শক্ত ও কড়া থাকে। চটকলে হেঁসিয়ান বুনিবার সময় যখন পাট ব্যবহার করা হয়, তখন পাট হইতে ঐ ১২ ইঞ্চি ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হয়। কারণ তাহাতে আঠার মত একরকম পদার্থ থাকে। উহা আঁশগুলিকে পরস্পর এমন আটকাইয়া রাখে যে, কিছুতেই ছাড়ান যায় না। চটকলে পাটের এই অংশটুকু বাদ দেওয়া বিশেষ ক্ষতি-জনক। কোন কোন কাজে এই পরিত্যক্ত অংশের দ্বারা খারাপ রকমের হেঁসিয়ান তৈয়ারী হয় বটে কিন্তু তাহার যে দাম পাওয়া যায়, সেই দামে ক্ষতি পূরণ হয় না।

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক মিঃ বি সি রায় এবং মিঃ পি বি সেন ঐ রদ্দিপাটকে কাজে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা একপ্রকার রাসায়নিক মসলা প্রয়োগ করিয়া রদ্দি পাটের আঠার মত পদার্থটীকে নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া কলকারখানায় ব্যবসা হিসাবে কতদূর প্রযোজ্য তাহার পরীক্ষা চলিতেছে।

দোকান ও আফিসের কর্ম্মচারীদের স্বস্তিলাভ :—

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট নূতন আইন করিতেছেন, তাহাতে দোকানের কর্ম্মচারী, বেয়ারা-খানসামা, রসুইকারক (গৃহস্থের ও রেস্তোরার) সিনেমা ও থিয়েটারের কর্ম্মচারী, টাইপিষ্ট্‌ ও কেরাণী, ইহাদের একটু স্বস্তি ও আরাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মচারিগণকে তাহাদের মনিবেরা প্রায়ই অতিরিক্ত সময় খাটান, এমন কি দোকানের কর্ম্মচারীদিগকে সকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত একটানা পরিশ্রম করিতে হয়। প্রস্তাবিত এই আইনে যে সকল ধারা থাকিবে, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) দোকানে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আফিসে কোন কর্ম্মচারীকে প্রতিদিন ৯ ঘণ্টার বেশী কোন মনিব খাটাইতে পারিবে না।

(২) প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে এই ৯ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টা খাওয়ার জন্য অথবা বিশ্রামের জন্য ছুটী দিতে হইবে এবং কোন কর্ম্মচারীকে অন্ততঃ আধঘণ্টা বিশ্রাম না দিয়া একটানা ৬ ঘণ্টার বেশী খাটান যাইবে না।

(৩) প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে বৎসরে পুরা ৫২ দিন এবং মাসে অন্ততঃ পুরা ৪ দিন ছুটী দিতে হইবে।

(৪) যাহার বয়স ১৫ বৎসরের কম, এরূপ কোন বালক বালিকাকে যদি কোন ডাক্তার কাজের যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট না দেন, তবে তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।

(৫) বালক-বালিকাদিগকে দৈনিক ৬ ঘণ্টার বেশী খাটান নিষেধ এবং তাহাদিগকে সকাল ৬ টার পূর্ব্বে ও সন্ধ্যা ৭ টার পরে খাটান যাইবে না। দেওয়ালী ও বড়দিনের পূর্ব্বের সপ্তাহে দোকান সম্বন্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হইবে না। যদিও এই আইন সমস্ত বোম্বাই প্রদেশের জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে, তথাপি প্রথমতঃ উহা বোম্বাই, আহমদাবাদ, পুণা ও সোলাপুর এই চারিটী সহরে প্রয়োগ করা হইবে।

দোকানের কর্ম্মচারিগণকে কিঞ্চিৎ আরাম ও স্বস্তি দিবার জন্য বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় যে চেষ্টা হইতেছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমাদের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও মিঃ হুমায়ুন কবীর এই উদ্দেশ্যে এক বিল উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাইর প্রস্তাবিত আইনের সহিত তাহার কতক প্রভেদ আছে। আমরা মিঃ হুমায়ুন কবীরের বিলের সমালোচনায় উহার দোষ দেখাইয়াছিলাম। দোকানের কর্ম্মচারীদিগকে আরাম দিতে যাইয়া তিনি দোকানের মালিকদের সর্ব্বনাশের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা আশা করি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ মিঃ হুমায়ুন কবীরের বিলের আলোচনায় বোম্বাইর দৃষ্টান্তটী স্মরণ রাখিবেন।

ভারতীয় গৃহপালিত পশুর রোগের ফল :—

এক সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক গৃহপালিত পশু বিদেশে রপ্তানী হইত। কারণ উহারা স্বাস্থ্যবান ও সবল বলিয়া একটা সুনাম ছিল। ভারতীয় গৃহপালিত পশুর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে উহারা বিদেশে ভিন্ন রকমের জলবায়ুতে যাইয়াও সহজে জীবন ধারণ ও বংশ বিস্তার করিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে আর পূর্ব্বের মত ভারতীয় গৃহপালিত পশু বিদেশে রপ্তানী হয় না। উহার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৩২ কোটীরও অধিক টাকা মূল্যের গৃহপালিত পশু বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরেই (১৯৩৪-৩৫) উহা কমিয়া ১২ কোটী টাকাতে নামিয়াছে। এক বৎসরে এই ব্যবসায়ে ভারতের প্রায় ২০ কোটী টাকা ক্ষতি হইল। রপ্তানী পশুর সংখ্যা ও মূল্য কমিবার কারণ এই যে, ভারতীয় গৃহপালিত পশু স্বাস্থ্যবান্ বলিয়া যে সুনাম ছিল তাহা আর নাই। নানা প্রকার রোগ ব্যাধি প্রবেশ করিয়া এই সকল পশুদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বিদেশীয় লোকেরা আর এই ব্যাধিগ্রস্ত এবং রোগশীর্ণ পশুদিগকে ক্রয় করিতে চাহে না। তাহারা বলে "আমরা অনেক পরিশ্রম, চেষ্টা এবং অর্থব্যয় করিয়া আমাদের পশুদের মধ্য হইতে

যে সকল ব্যারাম দূর করিয়াছি, আবার আমরা কি সেই সকল রোগের বীজ আমদানী করিব ?” এই কারণে তাহারা আর ভারতীয় পশু ক্রয় করিতেছে না।

মুক্তেশ্বরে ভারত গভর্ণমেণ্টের পশু চিকিৎসা বিষয়ক যে গবেষণাগার আছে, তাহার: রিসার্চ্চ অফিসার মিঃ এস্ সি দত্ত এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যদি ভারতীয় গৃহপালিত পশুর রোগ দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ না হয়, তবে, কিছুতেই এই বিনষ্ট ব্যবসায়ের উদ্ধার হইবে না এবং ভারতের বিপুল আথিক ক্ষতির পরিপূরণও হইবে না।

ডিক্টোগ্রাফ ঃ—

আমেরিকার “টারনার” নামক একব্যক্তি "ডিক্টোগ্রাফ্” নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্র ওজনে একপোয়া, ইহার মূল্য ৪৫০৲ টাকা। যন্ত্র যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে যদি কেহ অতি চুপি চুপি কথাও বলে, তাহা ৫০ গুণ উচ্চৈঃস্বরে ১০ মাইল দূর হইতে শুনা যাইতে পারে। আমেরিকার পুলিশ যাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া মনে করে, তাহাদের ঘরে এই যন্ত্র লুকাইয়া রাখে। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরা নিজের ঘরে বসিয়া গোপনে যে আলাপ আলোচনাদি করে, পুলিশ দূরে বসিয়া তাহা শ্রবণ করে। এই যন্ত্রের সহিত টেলিফোনের তার সংলগ্ন থাকে। যন্ত্র যে স্থানে অবস্থিত, তাহার ১৫ ফুটের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়, তৎসমস্তই এই যন্ত্রসহযোগে ১০ মাইল পর্য্যন্ত নীত হইতে পারে। ইংলণ্ডের পুলিশও এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

—০—

দন্তরোগের ঔষধ:—

ডরনেষ্টারের প্রত্নতত্ত্ব সভার সভাপতি মিঃ এইচ্ লরেন্স ঐ সভার এক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, দন্তরোগক্লিষ্ট ব্যক্তি যদি বাহুদ্বারা একটী দেবদারু বৃক্ষ বেষ্টন করে এবং যেস্থানে তাহার উভয় হস্তের অঙ্গুলি একত্রিত হয়, সেই স্থান হইতে এক টুকরা ছাল তুলিয়া বাম হস্তের দ্বারা তাহার দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠ হইতে ২।১ গাছি চুল তুলিয়া লইয়া বৃক্ষ ত্বকের কর্ত্তিত অংশে রাখিয়া দেয়, তবে নিশ্চয়ই দন্তরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

—০—

নূতন কাপড়ের কল:—

মালবের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ ইন্দোর সহরে একটী কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

—০—

কমলালেবুর খোসা:—

স্পেনের মালাগা বন্দর হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক কমলা লেবুর খোসা ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। এ বৎসর অনুমান ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার মণ শুষ্ক কমলা লেবুর খোসা ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হইয়াছে।

—০—

হাঁস ও মুরগীর ডিম ফুটানো:—

চীনদেশে এক নূতন উপায়ে হাঁস ও মুরগীর ডিম ফুটান হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কতকগুলি ধান অল্প গরম করা হয়। একটা কাঠের বাক্সের তলায় ৩ ইঞ্চি পুরু গরম ধান বিস্তৃত করিয়া তদুপরি ১০০ ডিম সাজাইয়া রাখা হয়। এই ডিম ৩ ইঞ্চ গরম ধান দ্বারা ঢাকিয়া তদুপরি আবার ১০০ ডিম সাজাইয়া রাখা হয়। এইরূপ ৬ স্তর গরম ধান ও ৫ স্তর ডিম সাজান হয়। প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর ধান গরম করিয়া ঐরূপে ধান ও ডিম পুনরায় সাজান হইয়া থাকে; কিন্তু দ্বিতীয়বার সাজাইবার সময় সর্ব্বনিম্ন স্তরের ডিম সর্ব্বোপরি স্তরে রাখিতে হয়। ২০ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া থাকে।

—৴—

ফুল তাজা রাখার উপায়:—

টাট্‌কা ফুলের বোঁটাটী কিছুকালের জন্য গরম জলে ভিজাইয়া লইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে; পুষ্পাধারে উহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট হয় না। এই অবস্থায় ডাকযোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা চলে। যাঁহারা ফুলের ব্যবসায় করেন, তাঁহারা এই উপায়টী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

—৴—

শূকর ছানার চামড়ার ব্যবহার:—

শূকর ও শূকর ছানাকে কে না ঘৃণা করে? কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের অস্ত্র চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন, শূকর ছানাকে ঘৃণা করিলে চলিবে না। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইয়াছেন, দুই হইতে ছয় মাস বয়স্ক শূকর ছানার গাত্র হইতে চর্ম্ম তুলিয়া মানবদেহে সংযুক্ত করিয়া দিলে উহা বেশ মানাইয়া জোড়া লাগিয়া যায়। দুরারোগ্য ক্ষত প্রভৃতি চিকিৎসার কালে পূর্ব্বে ডাক্তারগণ যেখানে মানুষের দেহ হইতে চর্ম্ম

তুলিয়া ক্ষতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেন, এখন সেখানে শূকর ছানার চর্ম্ম ব্যবহার করা হইতেছে। এই উপায়ে পূর্ব্বে যেখানে শতকরা ৩২ হইতে ৫০টী রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভবপর হইত, এখন সেখানে ৭৫ হইতে ১০০ রোগীকে আরোগ্য করা হইতেছে।

ফরমুলা ও রিচিপি

রাবার সলিউসান তৈয়ারী করার প্রক্রিয়া :—

বাইসাইকেল ও মোটর গাড়ীর চাকার টিউব, ফুটবলের ব্লাডার, রাবারের থলি প্রভৃতি ফুটা হইয়া গেলে জুড়িবার জন্য রাবার সলিউসান দরকার। তাহা তৈয়ারী করিবার একটী ফরমুলা নিম্নে বর্ণিত হইল।

য়্যাব্‌সলিউট্‌ য়্যালকহল—৬ ভাগ
কারবন্‌ ডাই-সালফাইড্‌
(Carbon disulphide)—১০০ ভাগ
ক্যাট্‌-স্থ— (Cautchoue) —আন্দাজ মত প্রচুর

প্রথম য়্যালকহল ও কারবণ ডাই সালফাইড্‌ মিশ্রিত করুণ। তার পর উহার সহিত আন্দাজ মত প্রচুর ক্যাচুক্‌ (অর্থাৎ যে রকম পাতলা সলিউসান চাহেন, সেই রকম) মিশাইয়া অল্প উত্তাপে গরম করুণ; এবং নাড়িয়া চাড়িয়া লউন যদি সলিউসান খুব ভাল আঠাযুক্ত করিতে চান, তবে গরম না করিয়া কারবন ডাই-সাল্‌ফাইড্‌ ও য়্যালকহল একটু বেশী পরিমাণে দিবেন। তারপর মশলার পাত্রটী কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া উপরের পাত্‌লা তরল পদার্থটী ফেলিয়া দিলে দেখিবেন যে নীচেকার ঘনপদার্থটী খুব আটা যুক্ত রাবার সলিউসান হইয়াছে।

চর্ব্বিজাত তৈলের দুর্গন্ধ দূর করিবার উপায় :—

নারিকেল, রেড়ি, তিসি, তিল, তুলার বীজ, সরিষা, পাম, প্রভৃতি হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা উদ্ভিজ্জ চর্ব্বিজাত এবং সাধারণ মাছের তৈল, কড্‌ লিভার অয়েল, তিমি মাছের তৈল প্রভৃতি জান্তব চর্ব্বিজাত। এই সকল তৈলে একটা বিশেষ বর্ণ ও গন্ধ থাকে। এই বর্ণ ও গন্ধ অনেক স্থলেই অপ্রীতিকর সেই জন্য এই সকল তৈলকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে উহাদের বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট করা আবশ্যক। এই বর্ণ ও গন্ধ দূর করিতে যাইয়া তৈলের গুণ যেন ঠিক থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সাধারণতঃ উত্তপ্ত বায়ু অথবা ষ্টীম তৈলের মধ্যে প্রবাহিত করিলে উহার গন্ধ নষ্ট হইয়া যায় এবং কোন কোন স্থানে বর্ণ ও থাকে না। নিম্নে ইহার একটী প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল :—

একটী ধাতু নির্ম্মিত বোতলাকৃতি পাত্রের মুখের ছিপির মধ্য দিয়া একটী ধাতু নির্ম্মিত নল বোতলের তলা পর্য্যন্ত আসিয়া নানা

শাখায় বিভক্ত হউক; এই সকল শাখাতে ছোট ছোট ছিদ্র থাকিবে। এই বোতলাকৃতি ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে তৈল রাখিতে হয়। ষ্টীম্ বয়লার হইতে খুব আস্তে আস্তে ষ্টীম্ ছাড়িবেন। কয়েক ঘণ্টা যাবৎ ষ্টীম্ তেলের মধ্যে চলাচল করুক। তার পর দেখিবেন, তেলে জলে মিশিয়া গিয়াছে। এক্ষণে জল হইতে তৈল কে পৃথক করিয়া কাট কয়লার মধ্য দিয়া ফিল্টার করিয়া লউন।

এই প্রক্রিয়াতে অনেক প্রকার তৈলের দুর্গন্ধ দূর করা যায়। মাছের তৈলকে এই প্রক্রিয়াতে দুর্গন্ধ যুক্ত করিতে হইলে পূর্ব্বে উহাকে ১৭৫ ডিগ্রী হইতে ২০০ ডিগ্রী (ফারেনহীট) উত্তাপে গরম করিয়া লইতে হইবে।

কালী তুলিবার তরল মসলা :—

পরিস্রুত জল— ৪ গ্যালন
ক্লোরাইড অব্ লাইম
(Chloride of lime)—১১ পাউণ্ড
য়্যাসেটিক্ য়্যাসিড্
(Acetic acid)— ১৪ পাউণ্ড্

প্রথমতঃ জলের সহিত ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ মিশাইয়া ভালরূপে ছাকিয়া লউন। তারপরে য়্যাসিড্ মিশাইয়া বোতলে পুরিয়া রাখুন।

ঘর্ম্ম-জনিত দুর্গন্ধ দূর করিবার মসলা :

ঘাড়ে, বগলে, কুচ্কিতে ঘাম জমিয়া দুর্গন্ধ হয়। ভদ্র সমাজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে মেলা মেশা করিতে হইলে, এই দুর্গন্ধ দূর করা আবশ্যক। নিম্নলিখিত মশলাটী তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করিলে সৌখীন নারী পুরুষগণ উপকার পাইবেন ;—

য়্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড—৫০ গ্রাম্
(aluiminium chloride)
গ্লিসিরিন (Ghycrine) – ৫০ কিউবিক সেণ্টিমিটার
টিংচার বেনজইন
(Tnic. Benjoin) —২০ কিউবিক-সেণ্টিমিটার
গোলাপ জল যাহাতে
সমস্তটার পরিমান হয়—১০০০ „

প্রথমতঃ ৮০০ কিউবিক সেণ্টিমিটার জলে য়্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড্ গলাইয়া লউন। তার পর আস্তে আস্তে গ্লিসিরিণ ও টিংচার বেনজইন মিশান। ইহা মিশাইবার সময় হরদম খুব নাড়া চাড়া করিবেন। এক্ষণে গোলাপ জল মিশাইয়া সমস্ত মসলাটীর পরিমাণ ১০০০ কিউবিক সেণ্টিমিটর করিয়া লউন।

এসেন্স অব পিপারমিণ্ট

পিপারমিণ্ট নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেইজন্য অনেকে এসেন্স্ অব্ পিপারমিণ্ট্ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে জানতে চান। তাঁদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, এসেন্স্ অব্ পিপারমেণ্ট্ প্রস্তুত করতে হলে ১০০ মিলিলিটার (Millilitres) অয়েল্ অব্ পিপারমিণ্ট এর সঙ্গে শতকরা ৯০ ভাগ কড়া এ্যালকোহল মিশিয়ে সমস্ত পরিমাণকে ১০০০ মিলিলিটারএ পরিণত করতে হয়। তৎপরে উক্ত পদার্থের সঙ্গে ঈষৎ (powdered talc) মিশ্রিত করে বেশ ক'রে নেড়ে নিয়ে ফিল্টার করলেই এসেন্স্ অব পিপারমেণ্ট পাওয়া যায়।

পিপারমেণ্ট ক্রষ্ট্যাল

পিপারমেণ্টের দানা ক'রতে গেলে পিপার মিণ্টের তৈলকে একটি কাঁচের পাত্রের মধ্যে রেখে পাত্রটিকে বরফ ও লবনের মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। এই রূপে তৈল খুব শীতল হলে পিপারমেণ্টের দানা আপনি তলায় জমিতে থাকে।

মার্কা প্রদানের কালি :—

বস্ত্রাদির উপর মার্কা করিবার কালির রীতি-মত চাহিদা আছে। নিম্নে লালকালী প্রস্তুতের একটি ফরমুলা দেওয়া গেল :—

সিল্‌ভার নাইট্রেট	—	৪৮	ভাগ
টার্টারিক এ্যাসিড	—	৬০	,,
গাম্	—	৪০	,,
Carmine	—	২	,,
জল	—	৮০	,,
য়্যামোনিয়া	—		

সিলভার নাইট্রেট ও টার্টারিক এ্যাসিডকে একসঙ্গে মিশাইয়া তার সঙ্গে ততটুকু এ্যামোনিয়া মিশ্রিত করা হয় যতটুকুতে সমস্তটা সম্পূর্ণ সলিউসনে পরিণত হয়। তৎপরে গাম ও Carmine সংযোগে বেশ করে নেড়ে নিয়ে আবশ্যকীয় পরিমাণ জল দ্বারা পাতলা বা ঘন করে নেওয়া হইয়া থাকে।

মার্কা দিবার নীল কালি

Resorcin blue	—	১	ড্রাম্
অক্সালিক এ্যাসিড	—	১০	গ্রেন্
চিনি	—	½	আউন্স্
ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার	—		

৬ ড্রাম্ ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটারে উক্ত Resorcin blue মিশ্রিত করে ২ ঘণ্টা পরে মাঝে মাঝে করে নাড়িতে হয়। তৎপরে আরও ২৪ আউন্স গরম ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার ও উপরোক্ত পরিমাণ অক্সালিক এ্যাসিড ও চিনি মিশ্রিত করলেই নীল কালী প্রস্তুত হয়।

শ্যাম্পু

সহুরে লোকদের মধ্যে শ্যাম্পুর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে। উহা মাথার চুল পরিষ্কার রাখার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। অনেকে মাথায় সাবান মাথার চেয়ে শ্যাম্প মাথাই পছন্দ করেন, সেই জন্য শ্যাম্পুর সমাদর দিন দিন বেড়ে চলছে। শ্যাম্প নানা রকম উপায়ে প্রস্তুত হতে পারে; তন্মধ্যে নিম্নে একটী ফরমুলা দেওয়া হইল :—

নারিকেল তৈল	—	৪	ড্রাম্
এ্যামোনিয়া ওয়াটার (১০%)	—	৬	,,
স্পিরিট অব রোজমেরি	—	১½	আউন্স
ওডিকোলন	—	১½	,,
Tinc. of Saffron	—	২	ড্রাম্

প্রথমে নারিকেল তৈল ও এ্যামোনিয়ার জলকে বেশ করিয়া মিশ্রিত করে তৎপরে তার সঙ্গে অপর পদার্থগুলি মেশাতে হয়। ব্যবহারের পূর্ব্বে সলিউসনকে উত্তম রূপে ঝাঁকাইয়া নিতে হয়।

পত্রাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব, তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, "**একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব**"। ব্যবসায়ের সন্ধান দিবার এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য

৫।৴০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,"—ফ্যাও,—ফ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে এবং পোষ্টেজ না পাঠাইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি,—**আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

প্রিয় মহাশয়,

আমার স্বর্গগত পিতৃদেব আপনার পত্রিকাব একজন গ্রাহক ছিলেন ; কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদেব আর্থিক দুরবস্থার জন্য বাধ্য হইয়াই আমরা আপনার পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিতেছি না, আশা করি অনুগ্রহ করিয়া এই চিঠিখানার উত্তর বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া জানাইবেন।

আমি একজন গ্র্যাজুয়েট্, এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি। কিন্তু চাকুরির যে দুরবস্থা, বিশেষতঃ আমার কোন মুরুব্বি নাই, এমতাবস্থায় চাকুরির জন্য আমি কোনরূপে সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমার মতামতের জন্য বড ভাই ও মাতৃদেবী আমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট ; কারণ আমি ৩০৲ বেতনে কেরাণীগিরি করিতে চাহি না।

আমি কতকগুলি মুরগী, হাঁস ও ছাগল নিয়া ছোট একটী Poultry Firm এর মতো করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু বিশেষ কিছু জানা না থাকায় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইতেছে না। ১০০ মুরগী, ১০০ হাঁস ও ৪০।৫০টী ছাগল লইয়া প্রথমে Poultry আরম্ভ করা যায় কিনা? এবং তাহাতে কত Capital (minimum) লাগিবে? মাসে কত টাকা খরচ লাগিতে পারে (approximately)? এখানে Digboi, Tinsukia, Dibrugarah প্রভৃতি স্থানে Dacca, Calcutta, Chittagang প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ডিম, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি চালান আসিয়া থাকে, ডিম সাধারণতঃ একটী তিন পয়সা দরে বিক্রয় হয় কখনও কখনও /০ /৫ পয়সা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় এখানে Poultry Firm করিলে লাভবান হওয়া যাইবে কিনা? উপরোক্ত সংখ্যক হাঁস, মুরগীর জন্য জায়গার কতটুকু দরকার হইবে? কোন্ জাতীয় স্বল্প মূল্যের মুরগীতে বেশী ডিম দেয় এবং বেশী লাভ হয়? গিনি ফাউল, Turkey এবং চীনা মুরগীর বাচ্চা আপনারা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন কিনা? এবং উহাদের জোড়ার দাম কিরূপ পড়িবে? কতো দিনে একটা ছোট Poultry আপনার লাভে আপনি চলিতে পারে? ১০০ মুরগীর মধ্যে কতটা পুরুষ ও কতটা স্ত্রীর দরকার? ধান এবং কলছাটা চাউলে মুরগীর কোনরূপ ব্যাধি হয় কি না? আপনাদের নিকট এমন কোন পুস্তক আছে কি না যাহাতে মুরগীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে, থাকিলে তাহার দাম কত? মুরগীকে সাধারণতঃ কি কি খাদ্য দেওয়া দরকার? উপরোক্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া বাধিত ও উপকৃত করিবেন।

তিনসুকিয়া, ডিগবয় প্রভৃতি স্থানে যে সব ডিম চালান আসে তাহা রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। প্রতি শুক্রবার একটা বা দুইটা Wagon ভর্ত্তী আসে। Town এর (তিনসুকিয়া প্রভৃতি) সিকি লোকেও ডিম পায় না। এমতাবস্থায় এখানে একটী Poultry চলিতে পারে কি না জানাইবেন। এখানে বৃষ্টি একটু বেশী হয় এবং ভাদ্র মাসের শেষ ভাগ হইতেই শীত পড়িতে আরম্ভ করে। ২০০।২৫০৲ টাকা মূলধন লইয়া প্রথমে আরম্ভ করা যায় কিনা জানাইবেন। আপনি যখন আমাদের জন্যই কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন, তখন আপনাকে আমাদের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। ইতি—।

শ্রীসুধীর রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ—নামরূপ
গ্রাম—বলিমারা
ডিব্রুগড়, আসাম।

১নং পত্রের উত্তর

আপনার পিতা আমাদের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মর্য্যাদা বুঝিতেন, তাই তিনি উহার গ্রাহক ছিলেন। আপনার পত্রখানি পড়িয়া বোধ হয়, আপনিও আমাদের কাগজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্যে আপনার মতি হইয়াছে,—আপনি পিতার উপযুক্ত পুত্র;—আশা করি এই উপযুক্ততা সকল দিকেই প্রকাশিত হইবে।

চাকুরীর প্রতি আপনার ঘৃণা প্রশংসারই বিষয় ;—যদি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহের যথার্থ মূল্য দিতে পারেন। কেবল জল্পনা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলে ব্যবসা হয় না। জ্ঞান আহরণ করা আবশ্যক ;—তার মূল্য দানে কৃপণতা ব্যবসায়ীর পক্ষে দোষাবহ ; এই কথাটি মনে রাখিবেন।

আপনাদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য দুঃখিত, কিন্তু প্রয়োজনীয়,—বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস বাদ দিলে ত চলে না। তাহা যেরূপেই হউক সংগ্রহ করিতেই হয়। আপনার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম, আমাদের কাগজখানি ছাড়িয়া আপনি কত ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন।

আপনি যে পোলট্রি ফার্ম্মিং এর ব্যবসায় করিবার মতলব করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম প্রস্তাব। এই কারবার খুব লাভজনক। নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সস্তায় প্রচুর ডিম, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি আমদানী করিতে পারেন। কলিকাতাতেও ঐ সকল স্থান হইতে ডিম আসে। হাঁস, মুরগী, টার্কী, ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশুপক্ষী পালন বিষয়ে আপনি যে পরামর্শ চাহিয়াছেন, তাহা সমস্ত বলিতে গেলে এক মহাভারত হয়। চার পয়সার চিঠির জবাবে তাহার লক্ষ ভাগের এক ভাগও বলা যায় না। আমরা আমাদের এই ব্যবসা বাণিজ্য পত্রিকায় পোলট্রি ফার্ম্মিং সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস প্রকাশ ও আলোচনা করিয়াছি। সেই সকল পুরাতন ব্যবসা ও বাণিজ্যের বাঁধাই সেট্ পাঠ করিয়া দেখুন,—এই ব্যবসায়ের সমস্ত সন্ধান জানিতে পারিবেন। চীনদেশে আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বিদেশে ডিম চালান দিবার জন্য ব্যবসায়ীরা কি কি উপায়ে ৬।৭ মাস কাল ডিম তাজা রাখিয়া থাকে তাহার ১৬ রকমের প্রক্রিয়া সবিস্তারে প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পোল্ট্রি ব্যবসায়ের এমন কোনও গূঢ় তত্ত্ব নাই যাহা এই সকল প্রবন্ধে সবিস্তারে বর্ণিত হয় নাই। আমরা পুরাতন ব্যবসা ও বাণিজ্যের বার্ষিক বাঁধান সেট্ ২॥০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি। আপনি তাহা কিনিয়া দেখিতে পারেন, তাহাতেই আপনার আগ্রহ কতদূর বুঝা যাইবে।

আমরা আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের কারবারের সুবিধার জন্য সকল রকম সন্ধান ও ঠিকানা মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা, সাময়িক পরামর্শদান, প্রভৃতি নানাবিধ সাহায্য করিয়া থাকি,— আর কাহারো জন্যে নয়।

২নং পত্র

মহাশয়,

এই স্থানে বহু পতিত জমি নিয়া আমরা ৪।৫ জন ভদ্রযুবক agricultural firm খুলিয়াছি। মুরগী, হাঁস এবং Pigs এর চাষ করিব ও ছাগল পুষিব মনন করিয়াছি। বর্ত্তমানে ১০০ হাঁস ও ৩০টী মুরগী ও ৪৫টী ছাগল রাখিয়াছি, শীঘ্রই ২।১ মাসের মধ্যে আরও খরচা বর্দ্ধিত করিব। Champion Belly City, নামে একটি incubator যোগাড় করিয়াছি। উহার মালিক একদিনও ব্যবহার করেন নাই। Wooden part অনেক উই পোকা খাইয়া ফেলিয়াছে। যদি একটী Catalogue পাই তবে এখানে ভাল মিস্ত্রী দ্বারা মেরামত করাইতে পারিব বলিয়া বোধ হয়।

Dacca agricultural firm Live Stock (Dept) এই প্রকার নির্দ্দেশই দিয়াছে। Belly City incubator Coy of U.S.Aর Indian Distributing firm এর যদি অনুগ্রহ করিয়া Address পাঠান তবে বিশেষ বাধিত হইব। ভবিষ্যতে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদের ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং একখানি পত্রিকা শীঘ্রই রাখিবার আশা করি। অন্য Incubator এরCatalogue,এবং tractorএর Catalogue পাবার সুযোগ করে বাধিত করিবেন।

ইতি ভবদীয়—
শ্রীসরোজকান্তি ব্যানার্জ্জি,
শান্তি কুঠীর
কক্সবাজার।

২নং পত্রের উত্তর

Belly City Incubator Company সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিনা। আপনি American Cousulate এর নিকট চিঠি লিখিতে পরেন। তাঁহার ঠিকানা,—Bombay Mutual Building, Hornby Road, Fort Bombay. আমেরিকার Cypher Incubator Companyই আমরা সব চেয়ে বড় বলিয়া জানি। ঐ নামে নিউইয়র্কে চিঠি লিখিলেই জানিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয়, আপনারা যখন ছোট রকমের প্রথম কারবার আরম্ভ করিয়াছেন, তখন অল্পদামের Incubator ব্যবহার করাই আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক বোম্বাইর ইগাতপুরী নামক স্থানে Ross Celtic Incubator Company নামে একটী স্কচ্ ম্যানের ফার্ম্ম আছে। তাঁহারা অল্পদামের ভাল Iucubator সরবরাহ করেন। তাঁহাদের নিকট বেশী দামের Incubator ও আছে। কমদামের গুলো ২৫৷৩০ টাকার মধ্যে পাইবেন তাঁহাদের ঠিকানা,—Ross Celitic Incubator Company. Igatpuri (G.I.P.Ry.) Bombay.

ট্র্যাক্টরের জন্য নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন (1) T. G Thomson & Co. Ltd. 9, Esplanade Calcutta. (2) W. Leslie & Co. 19, Chowringhee Road, Calcutta. (3) Berry Bros, 15, Clive Street, Calcutta. (4) Industrial Machinery Co. 14 Clive Street, Calcutta.

৩নং পত্র

(ইংরাজীর অনুবাদ)

নিবেদন এই,

মহাশয়,

আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা পাঠ করিয়া আমি দুগ্ধজাত দ্রব্যের কারবার খুলিবার মনস্থ করিয়াছি। আমি ক্রীম্‌সেপারেটার যন্ত্র কিনিতে চাই। উহা কোথায় পাওয়া যাইবে এবং উহার মূল্য কত ইত্যাদি বিষয় জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ইতি
বি, সি, চৌধুরী
পোঃ নহরকাটিয়া, আসাম।

৩নং পত্রের উত্তর

ক্রীম্ সেপারেটরের মূল্য কমপক্ষে ১৫০৲ টাকা। ইহার আকৃতি এবং কলকব্জা অনুসারে দাম কমবেশী হয়। Edw. Keventer Ltd. 11-3 Lindsay Street, Calcutta. এই ঠিকানায় ছোট বড় নানা রকম সাইজের ক্রীম সেপারেটর পাইবেন।

৪নং পত্র

(ইংরাজীর অনুবাদ)

শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক,

সমীপেষু,

মহাশয়,

আমাকে আপনার পত্রিকার বিশেষ বীমাসংখ্যা একখানি পাঠাইবেন। আর আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন, কোথায় চুনের কারখানা আছে এবং কোথায় চুণ তৈয়ারী করিবার পাথর কাটা হয়। আমি আপনার পত্রিকার একজন (৬০২০নং) গ্রাহক।

যে বিষয়টী জানিতে চাহিলাম, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত শীঘ্র জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ইতি

নিবেদক

আমতাবন্দর জেঃ হাওড়া।

৪নং পত্রের উত্তর

আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার কোন বিশেষ বীমা সংখ্যা প্রকাশিত হয়না। আমরা পৃথক একখানি বীমাবার্ষিকী নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকি। বর্ত্তমান বর্ষের (১৩৪৫) বীমা বার্ষিকী ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই প্রাকাশিত হইবে,—উহার মূল্য দুই টাকা। আপনার প্রয়োজন হইলে পাঠাইয়া দিব।

চুণের কারখানা—এবং চুণা পাথর কাটিবার পাহাড় ভারতবর্ষের নানা স্থানে আছে; তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম দেওয়া হইল।

(1) Bisra stone and lime Co. Ltd. Managing Agents Bird & Co. Chartcred Bank Buildnigs, Calcutta.

(2) Behar Lime & Cement Co. Ltd. 30, Clive Street Calcutta.

(3) Sutna Stone of Lime Co. Ltd. 4 Fairlie Place Calcutta.

(4) 4 Fairlie Place, Calcutta.

(5) Kalyanpur Lime Works Ltd. 17, Mangoe Lane, Calcutta.

(6) G. H. cook and sons. Katni. C. P.

(7) Jadunath Mitra & Bros. Katni. C.P.

(8) Imperial Stone Lime Manufacturing Co. 12 Keeling Road, New-Delhi.

(9) Jaipur Lime Stone Co. Ajmeer gate Delhi.

(10) Kotah Lime Factory, Rampura, Kotah.

(11) Ram Narayan & Brothers, Alwar Rajputana.

(12) Wah Stone & Lime Quarry Ltd. Wah, N. W. Ry. (Punjab).

কাটনী, সাটনা, কানপুর, ফয়জাবাদ, কাঞ্চীপুরম্, দক্ষিণ আর্ক প্রভৃতি স্থানে আরও অনেক চুনের কারখানা ও কারবার রহিয়াছে। সে সমস্ত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নহে। যত গুলির নাম ও ঠিকানা দিলাম তাহাই যথেষ্ট।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনিক য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৭ সালের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা নিম্নে ইউনিকের এক বৎসরের (১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) হিসাব ও কার্য্য বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিলাম। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন কারবার—

আলোচ্য বৎসরে কেম্পানী ১৮১৮০৬৮ টাকা মূল্যের ১৫৫১টী বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরেরও কতকগুলি বীমার প্রস্তাব গৃহীত হইবার বাকী ছিল। এই সব হইতে ১২২২৭০০ টাকা মূল্যের ১১০০টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে।

আয় ব্যয়—

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর আয় হইয়াছে মোট ৩০৯৪৪০ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে আসিয়াছে ২৯১৬৭৪ টাকা। সুদ বাবতে পাওয়া গিয়াছে ১৭৩৩৩ টাকা। অন্যান্য আয় ৪৩২ টাকা। ব্যয় হইয়াছে মোট ২৬১১৩৭ টাকা। তন্মধ্যে দাবী শোধ বাবতে গিয়াছে (বোনাস্ সহ) ৮০১১২ টাকা। সারেণ্ডার ভ্যালু দিতে হইয়াছে ২২২১ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ১৬৬৬৯৯ টাকা আসবাব পত্রাদির মূল্য হ্রাস ধরা হইয়াছে ১৮৩২ টাকা।

জীবন-বীমা তহবিল

খরচা বাদে বৎসরের শেষে জীবন-বীমা তহবিলে ৮২৯০০৮ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। বৎসরের আরম্ভে জীবন-বীমা তহবিলের পরিমান ছিল ৭৮০৭০৫ টাকা।

সম্পত্তি ও দায়—

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১১৪৭-১৪০ টাকা। তন্মধ্যে লগ্নী আছে (জমিতে ও সিকিউরিটীতে) ৪৫৪৬৯৮ টাকা। শ্রীহট্টের সম্পত্তির মূল্য ৮৯১১ টাকা। পলিসি বন্ধকী ও অন্যান্য ঋণ ৪৫৩৬৩০ টাকা। প্রিমিয়াম ও সুদ বাকী ৩০১৪৩ টাকা। এজেন্টদের হাতে আছে ৫৮৮৭২ টাকা। আসবাব পত্রাদির দরুন (মূল্য হ্রাস বাদে) ১২৪২৪ টাকা। ক্যাস্ ব্যালান্স (ব্যাঙ্কে ও আফিসে) ২২৪৬০ টাকা। দায়ের ঘরে দেখা যায় পলিসির দাবী শোধ বাকী ১০৮৯২৭ টাকা। প্রিমিয়াম হিসাব ভুক্ত হইবার

বাকী আছে ২৬৪৩ টাকা। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ৮৯৮০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত শেয়ার বাবতে ডিপজিট, কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড এবং অন্য বিবিধ দেনাতে মিলাইয়া মোট ৬৩৬০ টাকা হইয়াছে। কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১১০৩৯৯ টাকা দায়ের ঘরে রহিয়াছে।

খরচের অনুপাত—

পূর্ব্ব বৎসরে খরচের অনুপাত শতকরা ১৭ টাকা হিসাবে কমিয়া ছিল। এ বৎসরেও দেখা যায় উহা শতকরা ১ টাকা হিসাবে কমিয়াছে।

ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বণ্ড বিভাগ-

এই বিভাগের হিসাবে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরের আরম্ভে বণ্ড-তহবিলে ১৮৯৮৪ টাকা ছিল; রিনিউয়্যাল প্রিমিয়াম ২৭৪৯ টাকা এবং সুদ ২৩৫ টাকা আদায় হয়। ব্যয়ের ঘরে দেখা যায়, দাবী শোধ বাবতে গিয়াছে ৯৭৫১ টাকা। সারেণ্ডার ভ্যালু দিতে হইয়াছে ৪৫১২ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ১৮৮৪ টাকা। ঋণ ও বাকী সুদ ছাড় দিতে হইয়াছে ৭০২ টাকা। এই সকল খরচ বাদে বৎসরের শেষে বণ্ড-ফাণ্ডে ৫১১৮ টাকা জমিয়াছে। এই বিভাগের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৯১৪৪ টাকা।

কোম্পানীর ১০০ বিঘা জমির উপরে বেহালা কলোনীর নির্ম্মাণ ও প্রসার কার্য্য দ্রুত গতিতে চলিতেছে এবং এক্ষণে উহা একটী লাভজনক কারবারে দাঁড়াইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধেক জমি ইতি মধ্যে বিলি হইয়া গিয়াছে।

বেহালার উপনিবেশ গঠন কার্য্য শেষ হইলে এবং উহার প্লটগুলি কোম্পানীর নির্দ্ধারিত দরে বিক্রয় হইয়া গেলে ইউনিকের যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে যাহার ফলে ইহার বর্ত্তমান অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে।

লাইট অব এসিয়া ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৭ সালের হিসাব ও রিপোর্ট

আমরা লাইট্ অব এসিয়ার ১৯৩৭ সালের হিসাব ও কার্য্য বিবরণ পাইয়াছি। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে আয় হইয়াছে মোট ২৯৪৯৯ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদে আয় হইয়াছে ২৪৭৬২ টাকা। সুদ বাবদে পাওয়া গিয়াছে ৪০১৬ টাকা এবং অন্যান্য আয় ৭১৯ টাকা। ব্যয় হইয়াছে মোট ৩৪৮৭৮ টাকা। তন্মধ্যে দাবী শোধ বাবদে গিয়াছে ২০৩৩০ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ১৩৮২৫ টাকা। আসবাবপত্রাদির মূল্য হ্রাস ধরা হইয়াছে ৩৩১ টাকা এবং ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট্ রিজার্ভ তহবিলে রাখা হইয়াছে ৩৯২ টাকা। খরচ বাদে বৎসরের শেষে জীবন-বীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৮৬৭৫৭ টাকা।

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৪০৩৪৮ টাকা। তন্মধ্যে পলিসি বন্ধকী ঋণ ৭৫৭১ টাকা; লগ্নী ও ডিপজিট্ আছে ১২১৭৭০ টাকা। সুদ বাকী রহিয়াছে ২১৪৯ টাকা। আসবাবপত্র ও লাইব্রেরীর মূল্য ২৭০৩ টাকা এবং এজেন্ট্‌দের নিকট অগ্রিম দেওয়া নগদ হাতে ও ব্যাঙ্কে মিলাইয়া মোট ৩৬৭৯ টাকা আছে। খরচের অনুপাত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কমিয়াছে। এযাবৎ কোম্পানী ১৭০০০০ টাকার অধিক দাবী মিটাইয়াছেন।

লাইট্ অব এসিয়ার পরিচালনা নূতন ভাবে আরম্ভ হইবার পর আমরা ইহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া আসিতেছি। একদিকে যেমন কোম্পানীর জীবন-বীমা তহবিল ও সিকিউরিটীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি খরচের অনুপাত কমিয়া আসিয়াছে। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় হইবার, ইহাই প্রধান উপায়।

লাইট্ অব এসিয়া পলিসি হোল্ডারদের দাবীর টাকা অতি শীঘ্র এবং বিনা ঝঞ্ঝাটে প্রদান করিয়া থাকেন। কোম্পানী পুরাতন বলিয়া ইহাকে খুব মোটা রকমের দাবী মিটাইতে হয়। কিন্তু মৃত্যু জনিত দাবী বেশী নহে। কারণ বীমার প্রস্তাব নির্ব্বাচনে কোম্পানী বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। কোম্পানীর বয়স ২৫ বৎসর হইয়া গিয়াছে, সুতরাং মেয়াদী বীমার দাবী ক্রমাগতই মিটাইতে হয়।

লাইট্ অব এসিয়া কিরূপ তৎপরতার সহিত এবং শীঘ্র দাবীর টাকা মিটাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা পলিসি হোল্ডারদের দ্বারা কোম্পানীর নিকট লিখিত অনেকগুলি চিঠি দেখিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল না। যে কেহ এই সকল কাগজ পত্রের কথা কোম্পানীর নিকট লিখিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সমুদয় কাগজ পত্রাদি পাঠাইয়া দেন।

আর্য্যস্থান ইনসুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একবৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

নূতন কারবার :—

আলোচ্যবৎসরে কোম্পানী ১৩৫৮৫০০ টাকা মূল্যের ১১০১টী বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ১১৭২৫০০ টাকা মূল্যের ৯২৮টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপরে পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে।

আয় ব্যয় : -

আলোচ্যবৎসরে আয় হইয়াছে মোট ৭৪৫০৮ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম (পুনর্ব্বীমা বাদে) ৭৩৮০৯ টাকা। গতবৎসর প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৬০,১২৯ টাকা ইনকম্ ট্যাক্স বাদে সুদ ও ডিভিডেণ্ড পাওয়া গিয়াছে ১৪৯৫ টাকা। ব্যয় হইয়াছে মোট ৫৯২৮৭ টাকা; তন্মধ্যে দাবীশোধ বাবতে গিয়াছে ২৬৮৭ টাকা। সারে-ণ্ডারভ্যালু দিতে হইবে ৫৬ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ৪৭৭৮০ টাকা। ভ্যালুয়েশন খরচ ৭৩০ টাকা। কোম্পানী সংগঠনকার্য্যের জন্য যে ব্যয় হইয়াছে তাহার ৭৮০০ টাকা ছাড় দেওয়া হইয়াছে। আসবাবপত্রের মুল্যহ্রাস ধরা হইয়াছে ২৩৩ টাকা।

জীবনবীমা তহবিল :—

সমস্ত খরচা বাদে বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৪১৬৬১ টাকা। বৎসরের আরম্ভে ইহার পরিমাণ ছিল ২৬৪৩৯ টাকা। সুতরাং এবৎসর লাইফ ফাণ্ড বাড়িয়াছে ১৫,২২১ টাকা।

সম্পত্তি ও দায় :—

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমান ১৪০৭৮০ টাকা। তন্মধ্যে সিকিউরিটী ডিপজিট্ ৬৫৯৩৫ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ৫৮৫ টাকা। পলিসি বন্ধকীঋণ ১৮৩২ টাকা। আসবাবপত্র ৩৪৯৫ টাকা। এজেণ্টগণকে অগ্রিম দেওয়া আছে ৯২২৭ টাকা। প্রিমিয়াম বাকী ১৬২৯৩ টাকা। সংগঠনকার্য্যে যে ৩৬২৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার ৭৮০০ টাকা ছাড় দিয়া অবশিষ্ট ২৮৪৮০ টাকা সম্পত্তির ঘরে দেখান হইয়াছে। ব্যাঙ্কে ও হাতে নগদ আছে ১০০৪৭ টাকা।

দায়ের ঘরে দেখা যায় কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ৭৩০১০ টাকা। জীবনবীমা তহবিল

৪১৬৬১ টাকা, ইনভেষ্ট্‌মেণ্ট্‌ রিজার্ভ্‌ তহবিল ২৪৮৭ টাকা। দাবীশোধ বাকী রহিয়াছে ১০০০ টাকা। প্রিমিয়াম বাবতে ও অন্যান্য

আর্য্যস্থানের ম্যানেজর—
মিঃ এস, সি, রায় এম এ, বি এল।

ডিপজিট্‌ ১৬৩৭৮ টাকা এবং খরচেব দরুণ দেনা ৫৮২৮ টাকা।

সিকিউরিটী ডিপজিট :—

কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে আলোচ্যবৎসরে আরও ২৩০০০ টাকা ডিপজিট্‌ রাখিয়াছেন। এক্ষণে মোট ডিপজিট্‌ ৭০০০০ টাকা হইল। ইহার বাজারদর ৬৫৯৩৫ টাকা সম্পত্তির ঘরে দেখান হইয়াছে।

দায়ের ঘরে ১০০০ টাকা দাবীশোধ বাকী দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ দাবীর টাকা ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

আমাদের মন্তব্য :—

আর্য্যস্থান অতি অল্পদিনের কোম্পানী হইলেও আমরা ইহার কার্য্যের প্রসার এবং সকলদিকে উন্নতি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৬৫ টাকা পরিচালনা খরচ হইয়াছে। এই খরচের অনুপাত ৪ বৎসর বয়স্ক কোম্পানীর পক্ষে কম প্রসংসার বিষয় নহে। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, আর্য্যস্থান ধীর স্থিরপদবিক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার কর্ণধার মিঃ এস্ সি রায় এম. এ. বি. এল বীমাজগতে সুপরিচিত। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, অসাধারণ অধ্যবসায়ী এবং পরিশ্রমী বলিয়া সকলের নিকট তিনি খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ন্যায় কর্ম্মপটু শক্তিশালী লোকের হাতে আর্য্যস্থানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

ওরিয়েণ্ট্যাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ য়্যাস্যুর্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্

১৯৩৭ সালের হিসাবও ও রিপোর্ট

১৯৩৭ সলের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ওরিয়েণ্ট্যালের এক বৎসরের হিসাব ও কার্য্য বিবরণ নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইল। হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন কারবার

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৩৬৬২৯০৩৬ টাকা মূল্যের ৭৭২৪১টী নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ৯৯৭৯৩৫৫৮ টাকা মূল্যের ৫৫২২৮ টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে, একটী প্রস্তাবে সর্ব্বোচ্চ এক লক্ষ টাকার পলিসি পর্য্যন্ত কোম্পানী ইস্যু করিয়াছেন। ইস্যুকরা পলিসির দরুণ বার্ষিক প্রিমিয়াম আয় ৫৩১৯৭৭৪ টাকা। পুনর্ব্বীমার পরিমাণ ২৭৭০০০ টাকা এবং তাহার বার্ষিক প্রিমিয়াম আয় ১৪৩৩৭ টাকা। আলোচ্য বৎসরে নূতন য়্যান্যুইটী করা হইয়াছে ১৫খানি। ইহাদের খরিদ মূল্য ১৪৬০৬১ টাকা এবং বৃত্তির পরিমাণ ১২৯৩৭ টাকা।

মোট মজুত বীমা

আলোচ্য বৎসরের শেষে দেখা যায় কোম্পানীর হাতে মোট চল্‌তি পলিসির সংখ্যা ৩৬০০৩৪। তন্মধ্যে ভারতের মধ্যে ৩৩১০৬২ এবং ভারতের বাহিরে ২৮৯৭২। এই সকল পলিসিতে মোট ৭২৯৪৬১১৭২ টাকা (বার্ষিক বোনাস্ সহ) বীমা করা আছে। তন্মধ্যে ভারতের মধ্যে ৬৫১৭৩৭১৮৫ টাকা এবং ভারতের বাহিরে ৭৭৭২৩৯৮৭ টাকা। ত্রিগুণ সুবিধা যুক্ত পলিসিতে যে টাকা বাড়তি হইয়াছে, তাহা যোগ করিলে মোট মজুত বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩২৬৮০২৫৮ টাকা। ইহার মধ্যে পুনর্ব্বীমা ৩২১৯০৮৬ টাকা। বৎসরের শেষে কোম্পানীর চল্‌তি য়্যান্যুইটীর সংখ্যা (ডেফার্ড য়্যান্যুইটী তিনখানি বাদে) ১০২। ইহাদের সম্পর্কিত বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ ৭৩৩৮৮ টাকা। তন্মধ্যে ১৮৫৪ টাকা পুনর্ব্বীমা। আলোচ্য বৎসরে ২২০৩ টাকার ৮খানি য়্যান্যুইটীর মেয়াদ শেষ হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বৎসরে আয় হইয়াছে মোট ৪১৯৪৮১৮৫ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম পাওয়া গিয়াছে (পুনর্ব্বীমা বাদে) ৩২৭৪৪৭৩৮ টাকা। ইহার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৮৩৪৮৫১ টাকা। সুদ বাবতে আয় হইয়াছে ৯০৪০৬৬০ টাকা। য়্যান্যুইটীর মূল্য (ডেফার্ড য়্যান্যুইটী সহ) পাওয়া গিয়াছে ১৪৬২৬২ টাকা।

ব্যয় হইয়াছে মোট ২৩১৭০৩৬১ টাকা। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী দফা প্রধান ও লক্ষ্য করিবার যোগ্য ;—

অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড ও বোনাস্

ডিভিডেণ্ড	৬০০০০০	টাকা
দাবীশোধ	১২৭৪০৮১৪	,,
সারেণ্ডার	১২৫৪৭২৫	,,
পরিচালনা খরচ	৭১০৬৪১২	,,
ইন্‌কাম্ ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স	৬১২১৫১	,,
খরচ বাদে অবশিষ্ট থাকে	১৮৭৭৭৮২৩	,,

তন্মধ্যে জীবন-বীমা তহবিল ছিল ১৯২০৮৭৬৯৩ টাকা। বৎসরের শেষে কোম্পানীর বিভিন্ন তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১২৩২২০৭১ টাকা। তাহার দফাওয়ারী হিসাব এই ;—

জীবন বীমা তহবীল	২১০৮৩৯২৮১	টাকা
কন্টিঞ্জেন্সী রিজার্ভ ফাণ্ড	৬০৭৪৩১	,,
বিল্ডিং ফাণ্ড	২৭৫৩৫৭	,,
আদায়ী মূলধন	৬০০০০০	,,

ওরিয়েণ্টালের ম্যানেজার—

মিঃ এইচ, ই, জোন্‌স্

বিভিন্ন তহবিল

বৎসরের আরম্ভে কোম্পানীর বিভিন্ন তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৯৩৫৪৪২৪৭ টাকা।

পলিসির দাবী উৎপত্তি

আলোচ্য বৎসরে মোট ১২৭৪০৮১৪ টাকা দাবীর মধ্যে মৃত্যু জনিত দাবী হইয়াছে

৫৭৭৮৮৫৮ টাকা এবং মেয়াদশেষ জনিত দাবী হইয়াছে ৬৯৬১৯৫৬টাকা। গত ভ্যালুয়েশনে মৃত্যুর হার যাহা ধরা হইয়াছিল, সেই অনুসারে সম্ভাবিত মৃত্যুর শতকরা ৪৮·৭টী মাত্র ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৬ সালে) ইহার পরিমাণ ছিল শতকরা ৫০·৬ এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে ছিল শতকরা ৫৪·২।

খরচের অনুপাত

প্রিমিয়াম আয়ের সহিত পরিচালনা ব্যয়ের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২০·৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৬) এই অনুপাত শতকরা ২২·৯ টাকাই ছিল এবং ১৯৩৫ সালে ছিল শতকরা ২২·৪ টাকা।

সম্পত্তি ও দায়

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২২০০০৪৭৫৩ টাকা। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী দফা প্রধান ও লক্ষ্য করিবার যোগ্য ;—

বিবিধ সিকিউরিটীতে লগ্নী	১৮১৪৩২২০৫	টাকা
গৃহ সম্পত্তির মূল্য	৬২০২৯২২	,,
পলিসি বন্ধকী ঋণ	২১৭০২৬৮৪	,,
প্রিমিয়াম বাকী	৪৬৯৫৫৭৯	,,
সুদ বাকী	২৮৫৫৮৯৮	,,
প্রিমিয়াম বাবদে অগ্রিম দাদন	১২৩৫২৮	,,
নগদ হাতে ও ব্যাঙ্কে	১৯২২৫৮০	,,

কোম্পানীর বিভিন্ন তহবিল ২১২৩২২০৭১ টাকা ব্যতীত অন্য যে সকল দফা দায়ের ঘরে দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রধান,—

ডিভিডেণ্ড ও বোনাস্ ডিভিডেণ্ড দেওয়ার বাকী	১০৯২৫	টাকা
প্রিমিয়াম প্রভৃতি বাবদে ডিপজিট্	৭৩১৭১২	,,
জানিত অথবা স্বীকৃত দাবী, যাহা দেওয়া হয় নাই	৪৬৭৭৮৬০	,,
বিবিধ দেনা	১৩৮৮৩৩২	,,
সিকিউরিটী ডিপজিট	১৬৮০০৭	,,

কোম্পানীর ষ্টক্ একচেঞ্জ সিকিউরিটী সমূহের যে মূল্য হিসাবের খাতায় ধরা হইয়াছে বাজার দর তাহা অপেক্ষা ৩১০ লক্ষ টাকা বেশী। এই বাড়তির পরিমাণ শতকরা ১৭ টাকা। সুতরাং কখনও যদি সিকিউরিটী সমূহের দর পড়িতে আরম্ভ করে, তখন কোম্পানীর আর্থিক অসচ্ছলতা ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই।

সুদের হার

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী গড়ে শতকরা ৪৫৯ টাকা হারে সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৬) এই সুদের হার ছিল শতকরা ৪·৭০ টাকা। গত বৎসর বাজারে চল্‌তি সুদের হার খুব কম ছিল। সেই কম সুদে কোম্পানীর নূতন কারবারের টাকা লগ্নী করাতে সুদের হার আলোচ্য বৎসরে কম দাঁড়াইয়াছে।

ডিভিডেণ্ড

১৯৩৭ সালের জন্য অংশীদারগণকে প্রতি-শেয়ারে ১২৫ টাকা হিসাবে (ইনকাম্‌ট্যাক্স মুক্ত) ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

কর্ম্মচারীদের বোনাস্

১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যাহারা অন্যূন এক বৎসর চাকুরী করিয়াছে, এরূপ কর্ম্মচারীদিগকে একমাসের বেতন বোনাস্ দেওয়া হয়।

ওরিয়েণ্ট্যালের ত্রিষষ্ঠিতম (৬৩তম) বার্ষিক সভায় চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

গত ১লা জুন (১৯৩৮) বোম্বাই "ওরিয়েণ্ট্যাল বিল্ডিংস্" ভবনে অরিয়েণ্ট্যাল গবর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটী লাইফ্ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর অংশীদার ও পলিসি হোল্ডারদের ৬৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস সি. আই, ই তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের সার মর্ম্ম দেওয়া হইল ;—

এবারে আমাদের বার্ষিক সভার অধিবেশন এত বিলম্বে কেন হইল প্রথমেই তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনেকরি। কোম্পানীর অনেক ডিরেক্টার মে মাসে স্বাস্থ্য-ভঙ্গজনিত কারনে অথবা জনসাধারণের কার্য্যে বোম্বাইর বাহিরে যাইতে বাধ্য হন ; সেইজন্য বার্ষিক সভার বিলম্ব হইয়াছে। ভবিষ্যতের

জন্য আমরা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি, যাহাতে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই বার্ষিক সভা হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে হিসাবের খাতায় যে তারিখে নূতন কারবার বন্ধ করা হয়, ভবিষ্যতে সেই তারিখের দুইসপ্তাহ পূর্ব্বে হিসাবের খাতায় নূতন নূতন কারবারের পরিমাণ খুব কম হইবার ভয় ছিল। কিন্তু নূতন কারবারের হিসাবে ৫৫২২৮টী পলিসিতে ৯৯৮ লক্ষ টাকার বীমা দেখা যাইতেছে। ইহা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা তেমন কিছু কম নহে। ইহা সন্তোষজনক বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ওরিয়েন্ট্যালের চেয়ারম্যান্

স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস।

কারবার বন্ধ করা হইবে; তাহা হইলে বার্ষিক সভার অধিবেশনে বিলম্ব হইবে না।

কোম্পানীর গত ভ্যালুয়েশনে যে বোনাস্ ঘোষনা করা হইয়াছে, তাহার ফলে এবারে

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ৩২৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২৯৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, প্রিমিয়াম আয় ২৮ লক্ষ টাকার উপর

বাড়িয়াছে। সুদবাবতে আয় হইয়াছে প্রায় ৯০।। লক্ষ টাকা। ইহাও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৮ লক্ষ টাকার উপর বেশী হইয়াছে। জীবন-বীমা তহবিলের লগ্নী হইতে সুদ আদায় হইয়াছে শতকরা ৪·৫৯ টাকা পূর্ব্ব বৎসরে ইহা ছিল ৪·৭০ টাকা। এই সামান্য কমতির কারণ এই যে খুব ভাল সিকিউরিটীর সুদের হার এখনও অতি কম। অথচ সেইসব উৎকৃষ্ট সিকিউরিটী-তেই কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিল লগ্নী করা আছে।

দাবীশোধ বিষয়ে কোম্পানীর রিপোর্ট অতি সন্তোষজনক। মৃত্যুজনিত দাবী দিতে হইয়াছে প্রায় পৌনে ৫৮ লক্ষ টাকা (পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মাত্র সওয়া লক্ষ টাকা বেশী) এবং মেয়াদ শেষ জনিত দাবী বাবতে গিয়াছে ৬৯ লক্ষ টাকা (পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৬।। লক্ষ টাকা বেশী)। বিশেষ সুখের বিষয় এই যে কোম্পানী যে পরিমাণ মৃত্যু জনিত দাবীর আশঙ্কা এবং শোধের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, তাহার শতকরা ৪৮·৭টী মৃত্যু বাস্তবিক ঘটিয়াছে। মৃত্যুঘটনার এত কম অনুপাত কোম্পানীর জীবন ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনের সময় উদ্বৃত্ত হিসাব করিয়া যে বোনাস ও ডিভিডেণ্ড্ করা হয়, তাহা এই অনুপাতের উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে।

প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২২·৯ টাকা পরিচালনা খরচ হইয়াছে। এই অনুপাত পূর্ব্ব বৎসরের সমানই আছে। খরচের অনুপাত এত কম, আমি মনে করি, (একটী মাত্র কোম্পানী ছাড়া) আর কোন ভারতীয় কোম্পানীর নাই।

লগ্নী বিষয়ে ডিরেক্টরগণ এইনীতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, যে সকল সিকিউরিটী অল্পসময়ের মধ্যে খালাস করা যায়, তাহাতেই কোম্পানীর তহবিল লগ্নী করা হইবে; কারণ ঐরূপ সিকিউ-রিটীর বাজার দর পড়িয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কোম্পানীর পলিসিবন্ধকী ঋণের পরিমাণ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৪।। লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ইহা কোম্পানীর পক্ষে লাভ জনক হইলেও পলিসি হোল্ডারদের পক্ষে ক্ষতির কারণ। ইহাতে শেষকালে পলিসিহোল্ডারগণ বীমার সুফলহইতে বঞ্চিত হন।

আলোচ্যবৎসরে গৃহ সম্পত্তিতে কোম্পানীর লগ্নীর পরিমাণ হইয়াছে ৬২ লক্ষ টাকা,—পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১১ লক্ষ টাকা বেশী। ষ্টক্ একচেঞ্জ্ সিকিউরিটীতে কোম্পানীর যে লগ্নী আছে তাহার বাজার দর হিসাবের খাতায় ধরা মূল্য অপেক্ষা ৩১০ লক্ষ টাকা বেশী;—অর্থাৎ শতকরা ১৭ টাকা। ইহাতে দেখা যায়, দর পড়্তি আরম্ভ হইলে কোম্পানী সেই ধাক্কা সামলাইয়া চলিতে পারিবে। তারজন্য যথেষ্ট রিজার্ভ রহিয়াছে।

অভিভাষনের শেষাংসে সভাপতি নূতন বীমা আইনের কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সমালোচনা

১। **ব্যবসায়ে বাঙালী** ঃ—শ্রীবিজয় কৃষ্ণ বসু প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ৯৯।১ বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানির লেখক স্বয়ং একজন ব্যবসায়ী নিজের পরিশ্রম অধ্যবসায় ও বুদ্ধি-বলে তিনি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছেন। পুস্তকে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে কাল্পনিক কথা কিম্বা অসম্ভব স্কীমের বৃথা আন্দোলন বা আলোচনা নাই। আজকাল বাঙ্গালী ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়াছে। কিন্তু কেবল টাকা হইলেই ব্যবসা চলে না। অভিজ্ঞ লোকদিগের পরামর্শ লইয়া মূলধন যথার্থরূপে নিয়োজিত ও পরিচালিত করা আবশ্যক। যাহারা চাকুরীর পরিবর্ত্তে ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই পুস্তক পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহা তাঁহাদের মূলধনের সাহায্য করিবে ; এই পুস্তকের কয়েকটী প্রবন্ধ আমাদের নিকট খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়। যথা—আড়তদারী পরিচালন, ব্যাঙ্কের সাহায্যে ব্যবসা পরিচালন, ব্যাঙ্ক ও আড়ৎদারীর মধ্যে পার্থক্য, যৌথ কারবারে বাঙালী ইত্যাদি ; গ্রন্থকার প্রকৃত বন্ধুর মত বাঙালীর চরিত্রের অনেক দোষ ত্রুটী দেখাইয়াছেন। আশাকরি, বাঙালী পাঠক নাটক নভেল এবং অসার গল্পের পুস্তক ফেলিয়া এই প্রয়োজনীয় পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বর্ত্তমান বেকার সমস্যার সমাধানের একটা উপায় করিবেন। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ইহার এক টাকা মূল্য বেশী নয় ;—যখন এই এক টাকা খরচ করিয়া হাজার হাজার টাকা লাভ করিবার পরামর্শ ও সুযোগ পাওয়া যায়।

২। **বার্ষিক শিশু-সাথী** ঃ—শ্রীভোমাপদ ঘোষ এম্-এ, সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা। ৫ নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

আশুতোষ লাইব্রেরী প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া উৎসবের সময় শিশু-সাথী প্রকাশ করেন। সুন্দর কাগজে, সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া বার্ষিক শিশু-সাথী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ২৭২ পৃষ্ঠায় গল্প, কবিতা ও বিবিধ প্রবন্ধ মিলিয়া ৬৭টি চিত্তাকর্ষক পাঠ্য বিষয় রহিয়াছে। গল্প ও কবিতা ছাড়া ইহাতে ইতিহাস, বিজ্ঞান,

দেশ-বিদেশের সংবাদ, মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত এবং সাধারণ সাহিত্য, সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা শিশুর পিতামাতাদের মনোরঞ্জন করিবে। এই পূজার বাজারে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের পূজার উপহার ফর্দ্দে একখানি শিশু-সাথী থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শারদীয়া পূজার কথা লিখিয়া পুস্তকখানিকে কেবল মাত্র সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় করা হয় নাই, ইহা—চিরন্তন শিশু সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার বালক বালিকা এবং ছাত্রদিগের মধ্যে আমরা এই "শিশু-সাথীর" বিশেষ প্রচার কামনা করি।

৩। **চর্ম্মলীন**ঃ— প্রাপ্তিস্থান—১৭ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল চর্ম্মলীন ওয়ার্কস্, কলিকাতা। সকল রকম চর্ম্মরোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। Little's Oriental-Balm যেরূপ ছোট শিশিতে করিয়া বিক্রয় হয়, চর্ম্মলীন তদনুরূপ alluminium এর screw stoppered ঢাকনীসহ ছোট শিশিতে করিয়া বিক্রয় হয়। ইহাতে কাউর, পচাঘা, চুলকনা গরল্, খোস্, দাদ, ছুলি প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয় বলিয়া বিবৃত আছে। আমাদের পরিচিত কয়েক জন লোক বলিত ঘা এবং শোথযুক্ত ঘায়ে এই মলম লাগাইয়া আশ্চর্য্য উপকার পাইয়াছেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল ব্যাপী নানারূপ পুরাতন ক্ষত এবং ঘাএর জন্য কষ্ট পাইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা এই মলম ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলি। ঘা, কাটা এবং ক্ষতে এদেশের শিক্ষিত লোকেরা জাম্বাক্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এক কৌটা জাম্বাকের দাম ৸৵৹ হইতে ১৲ টাকা এবং ইহার কাটতি সমগ্র ভারতে লক্ষাধিক টাকার উপর। অথচ ইহার মধ্যে এমন কোনও অসাধারণত্ব নাই যাহা আমাদের দেশীয় ঔষধে নাই; বরং আমরা বহুস্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, চাঁদনীর মলম, সিদ্ধ মলম এবং আরও নানারকমের অখ্যাত এবং স্বল্পপ্রচারিত মলম দামে এবং গুণে বিদেশীয় এই জাতীয় ঔষধাপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। আমাদের দুর্দ্দশার কারণ এই যে এই সকল মলম প্রথমতঃ যেরূপভাবে পাত্রাদিতে প্যাক্ করিয়া রাখিলে লোকের চিত্তাকর্ষণ করে এবং handle করিবার সুবিধা হয়, সে বিষয় আমাদের আদৌ নজর নাই এবং দ্বিতীয়তঃ প্রচার ও প্রপ্যাগাণ্ডার দারুণ অভাব। "চর্ম্মলীন" handle করিবার পক্ষে ঠিক্ বিদেশীর সমকক্ষ হইয়াছে, এখন মালিকেরা যদি প্রচার ও প্রপ্যাগাণ্ডার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে এই উৎকৃষ্ট ঘায়ের মলম যে ঘরে ঘরে আদৃত হইবে সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ভৈষজ্য লতা, গাছ ও গুল্মাদি
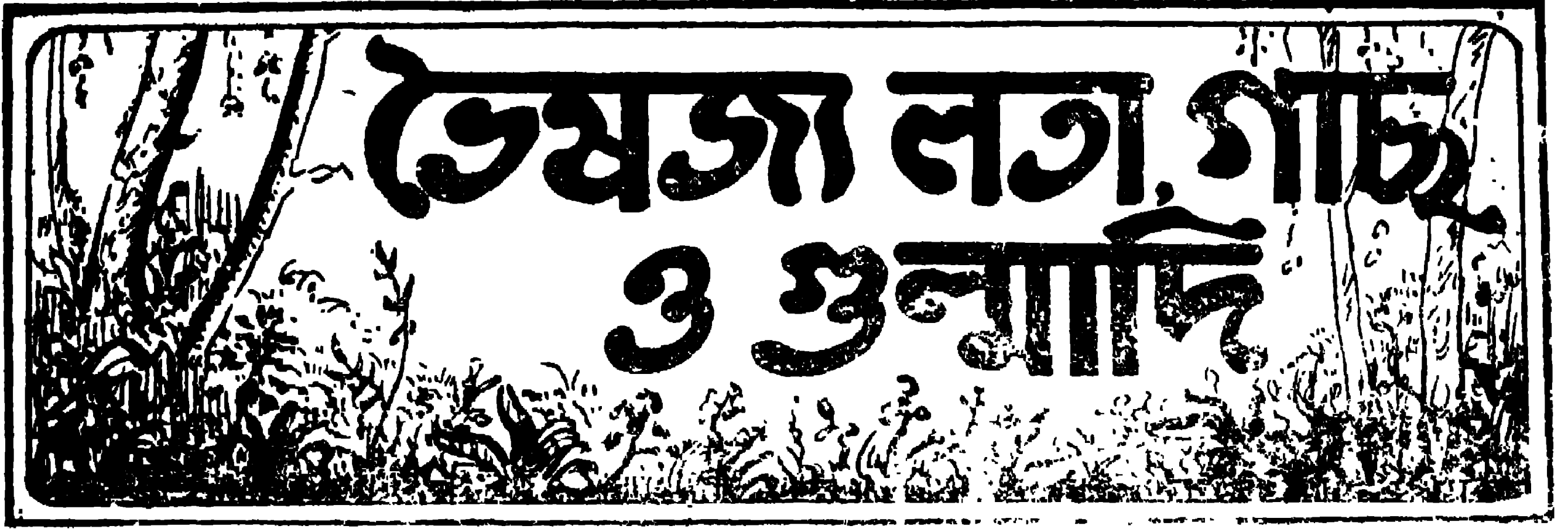
নিম্ব-নিম

ডাঃ---শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আজকাল নানা কারণে দেশী ঔষধের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। যাহার যে দেশে জন্ম, সেই দেশীয় প্রকৃতি জাত উপাদানই যে তাহার প্রতিকূল স্বাস্থ্য রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়, তাহা আজকাল অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। সেই জন্য বড় বড় ঔষধে যে কাজ না হয়, সময় সময় সাধারণ ঔষধে তদপেক্ষা বহুগুণ ফল প্রকাশ করে। অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেরই এই সব স্বভাবজাত সুলভপ্রাপ্য ঔষধসমূহের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা 'নিম' সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দুই চারিটী কথা বলিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া ফেলিতে বাসনা করি।

'নিম' অতলস্পর্শ, আয়ুর্ব্বেদ জলধির অমূল্য রত্ন; বুঝি বা কৌস্তভমণি। একাধারে এত গুণ অল্প ঔষধেই দেখা যায়। নিমের ঔষধীয় গুণ প্রায় সকলেই অবগত আছেন, সেজন্য বাহুল্য বোধে এইগুলির সবিস্তার আলোচনা না করিয়া কয়েকটী কষ্টপ্রদ রোগে নিম দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্যরূপে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বিবৃত করাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রায় ৪৷৷ মাস হইল, আমার হাপিস্ হইয়াছিল। যাহাকে হাপিস্ জোষ্টার বলে, আমার তাহাই হইয়াছিল। দক্ষিণ হস্তের প্রায় সর্ব্বাঙ্গে দলবদ্ধ ব্রণপুঞ্জ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং মেরুদণ্ডের উপরেও দুইভাগে কয়েকটী ব্রণপুঞ্জ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব ব্রণপুঞ্জ রস ও পূঁজে পরিণত হইয়া প্রদাহ বেদনা ও টন্‌টনানি প্রভৃতি দ্বারা ভীষণ কষ্ট প্রদান করিতে থাকে। Inflamation ও যন্ত্রনা বেশ ছিল এবং হাতখানা শূন্যে রাখার শক্তি একবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আভ্যন্তরিক Alterative ও Tonic-mixture (আর্সেনিক দেওয়া হইত) এবং বাহ্যিক জিঙ্ক

অক্সসাইড্, আইডোফর্ম্ম, কার্ব্বি প্রভৃতি দেওয়া হইতেছিল—কিন্তু কিছুতেই রোগের বা যন্ত্রণার উপশম হয় নাই। অবশেষে জনৈক বহুদর্শী চিকিৎসকের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রকার চিকিৎসায় দুইদিনের যন্ত্রণার মধ্যে অবসান এবং প্রায় ১ সপ্তাহের মধ্যেই রোগোপশম হয়।

১। প্রথমতঃ কতকগুলি নিমপাতা এক হাড়ী জলে একটু বেশী সিদ্ধ করিয়া সহ্য হওয়া মত গরম অবস্থায় সেই জল দ্বারা ব্রণপুঞ্জ সমূহ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কি তিন পোয়া ঘণ্টা পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। সর্ব্বাঙ্গ নিমপাতা সিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জলে ধৌত করিবে। যাহাতে ব্রণপুঞ্জ হইতে বিনির্গত রস শরীরের অন্যত্র লাগিতে না পারে, তজ্জন্য সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। আবশ্যক বোধে দিনে দুইবার কি তিনবার ধৌত

করিলেই যথেষ্ট, তৎপরে তুলি দ্বারা নিম্নলিখিত ঔষধটী লাগাইবে।

(১) নিম তৈল, পাক তৈল ও চালমুগরা তৈল সমপরিমাণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করণান্তর একটি শিশি বা কাচপাত্রে রাখিবে।

এই ঔষধে প্রথমতঃ প্রদাহ বেদনা নিবারণ হয়। আবশ্যক অনুযায়ী দিনে ৭।৮বার লাগাইবে।

অল্প সময়ে ঔষধের প্রদাহ ও বেদনা নিবারক প্রভৃতি শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হইবে। ইহা ক্ষত পরিষ্কার ও শুষ্ক করণ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

আভ্যন্তরিক এসেন্স্ অব নিম।

ইচ্ছা করিলে এতদ্সহ এটকিনসনের সিরাপ বা স্বেচ্ছানুরূপ টনিক মিক্শ্চার খাইতে পারেন। আর্সেনিক বেশী মাত্রায় সময় সময় বিশেষ উপকার দর্শে।

২। এক প্রকার খাজুলি আছে তাহাকে কাট খাজুলি বা শুকনা খাজুলি বলে। ইহা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক পীড়া, চুলকাইতে চুলকাইতে বিরক্তবোধ হয়। এই পীড়ায় নিমপাতা ও কাঁচা হরিদ্রা একত্রে উত্তমরূপে বাটীয়া রোগ স্থানে স্নানের পূর্ব্বে একটু ঘন করিয়া প্রলেপ দিতে হয়। ১৫।২০ মিনিট এইরূপ রাখার পর উষ্ণ জলে সেই স্থান ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে প্রায় ৬।৭ দিনেই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

আভ্যন্তরিক—নিমপাতা ভাজিয়া খাওয়া বা Essence of Neem.

৩। সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ এমন কি কুষ্ঠ-রোগেও নিম মহৌষধি।

৪। সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা সংশোধনার্থ নিমের ক্বাথ মহৌষধি।

৫। সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ ভিন্ন অন্যান্য কঠিন রোগেও পরিবর্ত্তনার্থ নিম মহৌষধি।

৬। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে ও বিবিধপ্রকার জ্বরে নিম সবিশেষ উপকারী।

৭। নিমের সংক্রমাপহ ও পরাঙ্গপুষ্ট নিকৃষ্ট জীবাণু নাশক শক্তি যে কোন উৎকৃষ্ট Antiseptic ঔষধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আশা করি, এই শ্রেণীর ঔষধ সম্বন্ধে আমাদের সহযোগীবৃন্দ সময় সময় আলোচনা করিবেন। 'নিম' সম্বন্ধে আমার কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে যে কেহ তাহা দর্শাইলে বাধিত হইব।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

গত ১লা আগষ্ট হইতে ভাগ্যলক্ষ্মীর সেক্রেটারী মিঃ কে, ডি, ব্যানার্জ্জি উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছেন মিঃ ডি, ডি, ব্যানার্জ্জি সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, হিন্দু মিউচুয়্যালের সেক্রেটারী এবং ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসের য়্যাসোসিয়েসানের ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট মিঃ পি, সি, রায় মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শীঘ্র আরোগ্য কামনা করি।
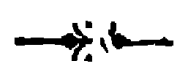
মিঃ নিখিলেন্দ্র সেন বি কম্‌, নাগপুর পাইয়োনীয়ারের এজেন্সী ইন্‌স্পেক্টার (দক্ষিণ কলিকাতার জন্য) নিযুক্ত হইয়াছেন।
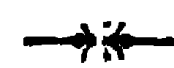
ন্যাশন্যাল ইন্‌সুর‍্যান্স এবং মেট্রোপলিটান ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টর স্যার হরিশঙ্কর পাল এম্‌, এল্‌, এ, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্‌ কমার্সের প্রতিনিধি স্বরূপ কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য হইয়াছেন। তিনি এই দ্বাদশবার ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের মেম্বার হইলেন।

মিঃ প্রশান্ত রায় দশবৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সুর‍্যান্স সোসাইটীর ষ্ট্যাটিষ্টিক্স বিভাগে কার্য্য করিয়া ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাইর নিউ ইণ্ডিয়া য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর (বর্দ্ধমান বিভাগের জন্য) এজেণ্টদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আসানসোলে তাঁহার প্রধান আবাস বা হেডকোয়ার্টার্স থাকিবে।

আমরা অবগত হইলাম, এসিয়া মিউচুয়াল ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল বীমা বিভাগের কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন এবং উচ্চ রকমের জীবন বীমার কাজ সংগ্রহে অধিকতর মনোযোগ দিবার নিমিত্ত ফিল্ড ওয়ার্কারদের উপর হেড আফিস হইতে আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন।

প্রভাত ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী এবং সেণ্ট্রাল মিউচুয়্যাল লাইফ য়্যাস্থর‍্যান্স সোসাইটী পরস্পর মিলিত হইবার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের সম্মতি লাভ করিয়াছেন। শুনা যায়, মিলিত কোম্পানীর সহিত আরও দুই একটী কোম্পানী (সম্ভবতঃ অল্-ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী এবং জেনারেল য়্যাস্থর‍্যান্স কোম্পানী) সংযুক্ত হইবার প্রস্তাব চলিতেছে।
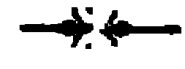
সেণ্টিন্যাল য়্যাস্থর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা আফিস গত ২২শে জুলাই . ১৯৩৮) হইতে ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় অ[illegible]তর প্রশস্তগৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রী লাইফ ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা চীফএজেন্সী অফিস, ৫ ও ৬ নং হেয়ার ষ্ট্রিট, এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, কলিকাতার ডাঃ এস্, কে, রায় এম্, বি, তাঁহার মেডিক্যাল ফিস্ বাবতে ২০০০৲ টাকার দাবী করিয়া ভারত ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলা উঠিবে।

গত ২৭শে আগষ্ট মিঃ সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৌরহিত্যে ভারত-ভবন গৃহে ইন্সুর‍্যান্স য়্যাকাডেমীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে; ভারত ইন্সুর‍্যান্সের ভাইস্-চেয়ারম্যান মিঃ দুর্গাপ্রসাদ খৈতান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় হায়দরাবাদ পাইয়োনীয়ার য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর একটী ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইয়াছে। এই কোম্পানী হায়দরাবাদ নিজাম রাজ্যের আইন অনুসারে এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

নাগপুরের আইডিয়্যাল ডিমক্রেটিক য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ পদত্যাগ করায়, গত ১৪ই আগষ্ট হইতে মিঃ জি, আর, দেও বি এ, বি এল, য়্যাডভোকেট কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যা সমাধানের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তদনুসারে বেকার যুবকদিগকে বীমা সংগ্রহের কার্য্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এলাহাবাদে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের বাংলা গভর্ণমেণ্ট এবিষয় নিশ্চেষ্ট।

১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ক্যালকাটা ইন্স্যুর‍্যান্সের তৃতীয় ভ্যালুয়েশন হইয়াছে। তাহার ফল আজীবন বীমায় ১৭ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় ১৪ টাকা হিসাবে বোনাস্ ঘোষণা করা হইয়াছে।

পণ্ডিত চন্দ্রমোহন নাথ কুঞ্জরু এম্-এ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের আগ্রা ব্রাঞ্চ অফিসে অর্গেনাইজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বি এন্ সাক্সেনা এই পদে ছিলেন, তিনি সম্প্রতি হিন্দুস্থানের আলীগড় স্থিত অর্গানাইজিং অফিসে নিযুক্ত হইয়াছেন।

লাহোরে ফোরসাইট্ ইন্সুরেন্স্ কোম্পানী নামে একটী নূতন বীমার কারবার খোলা হইয়াছে। লাহোরের ভিক্টোরী ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানী এবং পেশোয়ারের ফ্রণ্টিয়ার ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইবার মনস্থ করিয়াছেন।

আলীগড়ের প্রভিডেন্স্যাল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী এবং লাহোরের গ্লোরী অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী উভয়ে লাহোরের গ্রেট ওরিয়েণ্ট্ ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্ষ্টিটিউটের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এন্ প্রামাণিক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মধুপুরে যাইতেছেন; তাঁহার স্থলে ইন্ষ্টিটিউটের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এন্, সি, ঘোষ কার্য্য করিবেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, য়্যাসোসিয়েটেড ইন্ডিয়া ইন্‌সুরেন্স কোম্পানী ১টী চতুর্ব্বার্ষিক ভ্যালুয়েশন করাইয়াছেন। তাহার ফলে কোম্পানী প্রতি ৫০০ টাকার আজীবন বীমায় ১৫ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় ২০ টাকা হিসাবে বোনাস্ ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় কোং সমূহের মধ্যে য়্যাসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়াই সর্ব্ব প্রথম বোনাস্ ঘোষণা করিবার গৌরব অর্জ্জন করিলেন।

—•—

বম্বে মিউচুয়ালের সেক্রেটারী মিঃ জে; এম্ কার্ডিরো, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহার কোম্পানী কংগ্রেস হইতে চীনদেশে প্রেরিত মেডিকেল মিশনের ডাক্তারদের প্রত্যেককে বিনা প্রিমিয়ামে একখানি হাজার টাকার জীবনবীমা পলিসি দিতে প্রস্তুত আছেন,—ঐ ডাক্তারদের বয়স ২০ হইতে ৫০এর মধ্যে হওয়া চাই। আমরা অবগত হইলাম, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বম্বে মিউচুয়ালের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

—০—

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের ২১শ অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, নাবিক শ্রমিকদের অসুস্থতা বীমা বাধ্যতামূলক করা হউক। তদনুসারে ভারতগভর্ণমেণ্টের "লেবার কমিশন" তদন্ত করিয়া যে মন্তব্য করেন, তাহাতে ভারতগভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সকল রকম নাবিক শ্রমিকদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে অসুস্থতা বীমা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব নহে। তবে কোন বিশেষ শ্রেণীর নাবিক শ্রমিকদের মধ্যে অসুস্থতা বীমা প্রচলন করিবার একটা পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্ট করিতেছেন।

—০—

বীমা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় ডাক্তারের ফিস্ কমাইয়া দেওয়াতে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ উঠিতেছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল য়্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ডাঃ কে, এস, রায় এই সম্বন্ধে বিভিন্ন শাখা সমিতির মত জানিতে চাহিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

—০—

নিউ ইণ্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আর জে, ডাফ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ৬ মাসের ছুটী লইয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়সে নর্থ ব্রিটিশ এণ্ড মার্কেণ্টাইল ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর লণ্ডন হেড অফিসে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৬ বৎসর সেই কোম্পানীতে কাজ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে "নিউ ইণ্ডিয়া"তে নিযুক্ত হন। নিউ ইণ্ডিয়াতে তাঁহার কার্য্য হইল প্রায় ২০ বৎসর।

—০—

কমন্স ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস ১৬০।১।১ হ্যারিসন রোড হইতে ২নং চার্চ্চ লেনে উঠিয়া গিয়াছে।

রঙ্গরস

টিপ্পনী

(শ্রীলাল বিহারী মজুমদার)

ইটালীতে আইন হইল

—বিবাহ না করিলে সরকারী চাকুরীয়াদের বেতন বৃদ্ধি হইবে না!

এ দেশের মুসলমানগণ যুগপৎ ৪টা পর্য্যন্ত পারেন; হিন্দুরা আজকাল একটার বেশী করেন না, সুতরাং,—

—মুসলমানগণ শতকরা ৬০টি চাকুরী পাইবেন ঠিক হইয়া গেল।

—উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি!

* * *

রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং পণপ্রথা রোধ জন্য একটা আইনদাবী করিয়াছেন।

অগত্যা শিক্ষিত উপার্জ্জনক্ষম পাত্রকে আমরা গোপনে গছাইব!

ভটা—হয় না!

* * *

ফরিদপুরের ঘটনা,—সৈয়দালী সেখ ক্ষুদী সেখের যুবতী স্ত্রীকে হরণ করে। দায়রা জজ উহার প্রতি ১৮ মাস জেলের হুকুম দেন।

হাইকোর্টে দণ্ড কমাইয়া ১ বৎসর করিয়াছেন যুক্তি,—

মেয়েটির বয়স যখন ষোল বৎসরেরও কম ছিল এবং সৈয়দালী যখন তাহাকে এক রাত্রির বেশী রাখে নাই।

—রেট বাঁধা হইয়া গেল!

* * *

লোকে জমীদার অপেক্ষাও মহাজনকে বেশী ভয় করে। মহাজন জব্দ করিয়া সরকার নিজেই মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অতঃপর আমরা সরকারকে আরো বেশী ভয় করিব।

সবুর যখন সয় না, তখন মহাজনকে এ দেশ হইতে 'ইহুদী' করিয়া দেওয়া মন্দ কি?

আইন হইতে চলিল,—অতঃপর সরকারী মঞ্জুরী (License) না লইয়া কেহ কোন এলাকায় টাকা লাগাইতে পারিবে না।

—পূর্ব্বে যাহারা দিয়াছেন তাহাদের দেনা আর পরিশোধ করিতে হইবেনা, এরূপ একটা আইন হইতে পারে না কি ?

হক—রায়কত-নন্দী কোম্পানী কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

সম্ভব হইলে, দু'নিয়া-টা'—হ'তো কত 'মজাদার'!

মহাত্মা গান্ধীর সিদ্ধান্ত,—চীনারা যদি অহিংস এবং অসহযোগী থাকিত তবে এত-দিনে জাপানকে পথ দেখিতে হইত !

চীনারা মনে করিতে পারে,—

—ভাগ্যিস প্রভু চীন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই!

* * *

মিঃ প্যাটেল এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদই "মহাত্মা-জীর" অহিংস তরণীখানিকে বানচাল করিয়া দিবেন।

—সাম্প্রদায়িকতা মন্দ, প্রাদেশিকতা ভাল!

* * *

হাইলাকান্দীতে নাকি শীঘ্রই সহশিক্ষার কুফল প্রসূত হইবার 'সম্ভাবনা' দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কিন্তু শর্ম্মার নিষেধ আছে,—

তপ্ত অঙ্গার এবং ঘৃতকুম্ভ অত গা' ঘেঁষিয়া রাখিতে নাই!

* * *

গণের মতবাদ যখন গণেশের পকেটস্থ হইয়া পড়ে, তখনই নামকরণ হয়—

"গান্ধীক্রাসী" অর্থ,—"গান্ধী কহিয়াছেন"!

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক এইচ, জি, ওয়েল্‌স এক কেতাবে নাকি হজরত মহম্মদকে কি সমস্ত বলিয়াছেন। ভারতীয় একদল মুসলমান উক্ত বই পাইবামাত্রই ছিঁড়িয়া দিতেছেন।

—এই যন্ত্রপ্রাধান্যের যুগে ছিঁড়িয়া কত কমাইবেন।

সঙ্গত হয়, ওদিকে গুপ্ত কবির সেই দুই ছত্র আর একদফা শুনাইয়া দেওয়া,—

—"মেরীর তনয় যদি ঈশের তনয়, মোষের তনয় তবে দোষের ত' নয়"!

* * *

রবীন্দ্রনাথের বড় দুঃখ,—অতবড় বিশ্ব-প্রেমিক জাপানি কবি নগুচি, তিনিও কেন জাপানের এ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা সমর্থন করেন —

যেহেতু ওরা জানে—খৃষ্টান হইলেই লোকের ধর্ম্মলোপ ঘটেনা।

* * *

হিন্দুরা পঞ্চ ম'কারের তত্ত্ব পাঠ করে ইউ-রোপীয়েরা উহার অনুশীলন করে ?

হিন্দুরা মনুস্মৃতিতে আওড়ায় "শূরানাঞ্চৈব ভীরসঃ" অর্থাৎ যাহারা বীর তাহারা ভীরু-দিগকে খাইয়া ফেলিবে ইহাই প্রকৃতির ধর্ম্ম ;—পক্ষান্তরে স্বাধীন জাতিগুলি সেই সূত্রমূলে দুর্ব্বল শক্তিগুলিকে গ্রাস করিতেছে।

—রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, নগুচি স্বাধীন জাতির লোক !

—'আসমান-জমিন' ফারাক!

রতিরাম দত্তের প্রেতাত্মা

শ্রীলালবিহারী মজুমদার।

যদিও পাড়াগাঁ, তবু রতিরামপুর গ্রামখানি একটা মিউনিসিপ্যাল টাউনেরই তুল্য! —মেথর-ঝাড়ুদার আছে; সরকারী রাস্তা আছে; স্কুল, লাইব্রেরী, ফুটবল-ক্লাব সমস্তই আছে!—

গ্রামের জমিদার রামধনবাবুর বাড়ীতে সহুরে বরযাত্রের দল আসিয়া পড়িয়াছে,—

১৬।১৭টী বরযাত্র সামাল দিতে গ্রামশুদ্ধ লোক হিম সিম খাইয়া গিয়াছে,—

—কারো ঘণ্টায় তিন পেয়ালা করিয়া 'চা' চাই! —কেহ রসগোল্লার খোসা ছাড়াইয়া জলযোগ করেন!—কাহারো পায়খানায় যাইবার পূর্ব্বে ২টা করিয়া 'হাভেনা চুরুট গ্রহণ অভ্যেস' ওদিকে কারণান্তরে হাতের জল শুকাইতে পারিতেছে না!

ইত্যাকার অবস্থা,—

শীতকাল, কৃষ্ণপক্ষের রজনী;—একজন হুকুম করিলেন,—"এই সময় একটু—পাইলে মন্দ হইত না!—"

—হরিশ সা'র দোকানে লোক পাঠান হইল!

সেবার প্রজা বিদ্রোহ হইয়াছিল, রামধনবাবু ঠেঙাইয়া সাত দিনে এলাকা দোরস্ত করিয়া দিয়াছিলেন,—

এবার উপায় নাই, সমস্তই বরযাত্র! কাহারো সোনার বোতামের উপর মিনার কার্য্য; কাহারো মাথার টেরিটি দেখিলে মনে হয়, ইহারা সাত পুরুষ যাবত এই কর্ম্মই করেন; আবার কোন বাবুর নাসা কুঞ্চনের ভাবে এবং দস্তুরে মালুম হয়,—"অক্রুরদত্তের বাড়ী ইহাদের কানাচে।"

—যে রামধনবাবুর প্রতাপে ও তল্লাটে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়, তিনি আজ কন্যাদায়গ্রস্ত এবং বদ্ধাঞ্জলী।

পরের দিন বিবাহ! রাত্রি একটার সময় একজন ওজর তুলিলেন,—"রামধনবাবুর অতি-বৃদ্ধ পিতামহ রতিরাম দত্ত কলিকাতায় বালাম চাউল ফেরি করিত, সুতরাং আমরা এ বাড়ীতে অন্ন আহার করিবনা,—উৎকৃষ্ট গব্য-ঘৃতে ময়ান দেওয়া লুচি খাইব!"

* * *

সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে! ক্রমে, উভয় পক্ষে মন কশা-কশি আরম্ভ হইয়া গেল! —সব সওয়া যায়, কিন্তু ভিনগাঁয়ের লোকের মুখে গ্রামের নিন্দা, স্বর্গীয় পূর্ব্বপিতামহগণের নামে কুৎসা-কেলেঙ্কারী শুনিলে প্রাণে বড়ই লাগে,—

এই অবস্থায় গ্রামের 'ফুটবল টিমের যুবকগণ রামধনবাবুর নিকট একখানি লিখিত দরখাস্ত পেশ করিল,—

—"হুজুর,

আমাদিগকে বরযাত্র অভ্যর্থনার অধিকার দান করিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়!"

রামধনবাবু দরখাস্তের পার্শ্বে একটু "Seen" লিখিয়া দিলেন ; ইঙ্গিত,—"তা বেশ ;"

*   *   *   *

বেলা ৮টা,—তখনও বরযাত্রের দল গাত্রোত্থান করেন নাই ; ঘুম অনেকেরই ভাঙ্গিয়াছে, শুইয়া শুইয়া হাঁই তুলিতেছেন, আর 'চা-চা' করিতেছেন!—সহুরে লোক, 'বেড-টি' (Bed-Tea) তাঁহাদের 'অভ্যেস!'

*   *   *   *

গ্রাম্য যুবকদল এই অবস্থায় ঘরের ভিতরে সমাগত!—কেহ বসিতে বলেনা, যাইতেও বলে না! যুবকগণ বরযাত্রদিগের পায়ের দিকে গিয়া একটু স্থান করিয়া বসিল! তা'তেও আপত্তি নাই ;—তাঁহাদের হাসি-টিট্‌কারী চলিতেছে, চুরুট-সিগারেট চলিতেছে, আবার কেহবা কুঞ্চিত পা' দুইখানি টান করিয়া যুবকগণের গা'য়ে ঠেকাইয়া দিতেছেন! অস্থার্থ,—"তোমাদের মত অমন ঢের ঢের ছেলে দেখা আছে!"

"ওঠায়া'ক্, নিতাই" বলিয়া একটি বাবু গা'-ঝাড়াদিয়া উঠিতেই বাকী কয়েকজনও উঠিয়া বসিলেন,—

(প্রকাশ থাকে যে, রামধনবাবুর বাড়ীর পরে একটি আমের বাগান, তারপর একটা মস্ত-বড় বাঁশ-বন, তারপর মাঠের অদূরে, বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বের স্কুলঘরে বরযাত্রদিগকে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছে!)

'চা' আসিল, ৩/৪ রকম সন্দেশ আসিল,—পঙ্গপালের মত দলটি উঠিয়া,—কেহ চোখে-মুখে একটু জল দিলেন, না দিলেন,—ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চক্ষের নিমেষে সেগুলি সমস্তই সাবাড় করিয়া দিলেন!

এ পর্য্যন্ত বেশ!—

১ম বরযাত্র,—"কী বিশ্রী এ গ্রাম।"

১ম গ্রাম্যযুবক,—"আপনাদের বোধ হয়, পাড়াগাঁয়ে কোন ভদ্রাসন নাই,—আপনারা বোধ হয়, সহরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস্তব্য করেন!"

২য় বরযাত্র,—"কেন, আমার পিসিমার নাত্ জামাই সহরে বেশ একখানি বাড়ী করেছে।"

২য়, গ্রাঃযুঃ—সে পিসি কি আপনার বাবার সহোদরা?"

২য়, গ্রাঃযুঃ—"মহাশয়ের কি করা হয়?"

৩য়, ব-যাঃ,—"ইনি আমাদের খাজাঞ্চি বাবুর বড় জামাতা!"

৪র্থ, গ্রা-যুঃ—"করেন কি?"

৪র্থ, ব-যাঃ—"ষ্টেশনারী দোকান!"

(বুঝা গেল, ও দলের মধ্যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে এবং পদে প্রতিষ্ঠায় ঐ খাজাঞ্চিবাবুর বড় জামাতা বাবাজীই সর্ব্বোত্তম!)

দিনটা একভাবে কাটিয়া গেল ;—একটু মন্দীভূত হইলেও, সে কিষ্কিন্ধ্যা বাহিনীর উপদ্রব থামিল না।

*   *   *

রাত্রি ৯টায় বিবাহ,—বহু সাধ্য সাধনা, জনপ্রতি ৮৲ হিসাবে না দিলে, বরযাত্রেরা কেহই রতিরাম দত্তের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের কন্যার বিবাহে যোগদান করিবেন না;—"রতিরাম দত্ত কলিকাতার বাজারে বালাম চাউল ফেরি করিত।"

মহাগণ্ডগোল,—লগ্ন উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম। ঐ এক কথা,—"রতিরাম দত্ত বালাম চাউল ফেরি করিত!"

—অগত্যা শুধু পাত্রটি লইয়া গিয়াই বিবাহ আরম্ভ হইয়া গেল!

* * *

অন্ধকার রাত্রি,—একদিকে ২০।২৫ বিঘা বাঁশবন,—আর একদিকে ধূ-ধূ করে মাঠ! কর্ত্তারা ঘরের মধ্যে বসিয়া ঘোট পাকাইতেছেন,—"এখন কি করিয়া দত্তের পো'কে জব্দ করা যায়!"

* * *

কথা নাই, বার্ত্তা নাই,—সেই বাঁশবন ভেদ করিয়া, —পাঁচ হাত লম্বা একটা প্রাণী আপাদ-মস্তক একটা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় আবৃত, হাতে একখানি সাত হাত লাঠি,—ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল;—লম্বা হাতখানি বাড়াইয়া আলোটা নিভাইয়া দিল!—

ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল,—যাইবার পূর্ব্বে নাকী সুরে বলিয়া গেল,—

"—এঁকটু থাঁকোঁ, আঁবার আঁসচি!"

* * *

—এ কি!—সকলেই অবাক —ভূত নয় ত! রতিরাম দত্তের প্রেতাত্মা নয় ত!—রতিরাম দত্ত,—সেত কয় পুরুষ হয় মারা গিয়াছে!"—

"—ভূত নয় ত!"

—শীতে বিড়ালের ছা'র মত সকলে গা' ঘেষিয়া বসিয়া 'ঠক্ ঠক্' করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন,—"ভূত নয় ত!"

—"বিদেশ বিভুঁই,—এ আবার কোন্ উপদ্রব!—মরামানুষের নিন্দা, কাজটা ভাল হয় নাই!—রতিরাম দত্তের প্রেতাত্মা নয় ত! প্রাণ বাঁচাইতে হইলে, এখন বিবাহ বাড়ীতে লোক জনের মধ্যে গিয়া বসাই ভাল! ঐ বাঁশবনটা কি প্রকারে অতিক্রম করা যায়!"

* * *

হঠাং—মন্থর পদবিক্ষেপে আবার ঐ রকম চারিটা প্রাণী বাঁশ-বন ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, দেখা গেল!—কর্ত্তাদের তখন ঘর্ম্ম ছুটিতেছে,—এত শীতেও গা'দিয়া নদী বহিতে আরম্ভ হইয়াছে,—"৪ হাত স্কোয়ার" যায়গার মধ্যে ১৫।১৬ জনে একটা 'মনুষ্যপিণ্ড' সৃষ্টি করিয়াছেন!

কথা নাই-বার্ত্তা নাই লম্বা মূর্ত্তি আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল,—কম্বল দিয়া আস্তে তাঁহা-দিগকে ঢাকিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল!—

—এবারেও ঐ এক কথা, তবে এবারে চারিটি নাকী সুরে বলিয়া গেল,—

"—এঁকটু থাঁকোঁ আঁবার আঁসচি!"

'কারণ' অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই,—ষোল জনের ঘর্ম্মেই হউক আর যে কারণেই হউক,—কর্ত্তাদিগের লেপ তোষক তখন ভিজিয়া চপ্ চপ্ করিতেছে!

"—বাপরে, স্থান ভাল না" বলিয়া সকলেই দৌড়!—দৌড়, দৌড় এবং দৌড়!

সে কী দৌড়!—গোহালে আগুণ লাগিলে, দড়ি ছিঁড়িয়া গরুগুলি যেমন দৌড়ায়;—ছেলে নদীর ঘাটে ডুবিয়াছে শুনিয়া বিধবা মা' যেমন দৌড়ায়,—দৌড়, দৌড় এবং দৌড়!

বাঁশ-বন প্রায় অতিক্রম করিয়াছে—এমনি সময়,—সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্য হইতে বাহির হইয়া, একদল লোক,—সংখ্যায় ৫।৭ জনের বেশী হইবে না,—আসিয়া পড়িয়াই—দমাদম্ 'ঝাটা সংগ্রাম'!

—ঝাটার চোটে এক একজনের পীঠ দুই আঙ্গুল করিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে!—ততোধিক সে ঝাঁটা যেন কি একটা পদার্থ বিশেষে নিষিক্ত থাকায়, এক একজনের গায়ের গন্ধে ভূত পালায়!

গ্রামের বালক, বৃদ্ধ ও যুবকগণ যে যার মত লণ্ঠণ লইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া দেখে,—এই ব্যাপার!

(সকলে সমস্বরে)

"আহা, আপনারা ভদ্রসন্তান,—আহা, আপনারা পদস্থ লোক,—আহা,—আপনারা সহরের বাবু,—আগে মনে পড়িলে, আপনাদের জন্য অন্যস্থানের ব্যবস্থা করিতাম!—চাউল বেচা রতিরাম দত্তের মৃত্যুর পর হইতেই গ্রামখানি বড় খারাপ হইয়াছে;—তারপর আবার স্থান দেওয়া হইয়াছে ঐ ঘরটায়। যাক্ প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন, সেই মঙ্গল!"

—গ্রামের যুবকগণ ছিল আগাগোড়াই সহানুভূতিসম্পন্ন!—তিন জনে দৌড়াইয়া গিয়া তিন বাল্তি গোবর-জল আনিল এবং প্রত্যেক-কে তাহাদ্বারা অভিষিক্ত করিল!—ছয়টা লণ্ঠণ-যোগে সারাপথে রোস্নাই করিয়া উহাদিগকে নদীর ঘাটে লইয়া গেল এবং স্নান করাইয়া আনিল,—

১ম গ্রাঃ যুঃ—"এই শীতের রাত্রিতে একটু কষ্টই পাইলেন।"

বরযাত্রগণ (সমস্বরে) —"আজ্ঞে, আপনা-দিগকে ধন্যবাদ; আপনারা না থাকিলে আজ আমরা প্রাণে মারা যাইতাম।"

* * *

পরদিন মধ্যাহ্নে সুশীল ও সুবোধ বালকের ন্যায় বাসীবিবাহের ভোজ খাইয়া এবং বর-কন্যা লইয়া বরযাত্রের দল গ্রাম ত্যাগ করিলেন!—

—যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা গ্রাম্য যুবকগণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন,—"গ্রামটা যদিও খারাপ, কিন্তু গ্রামের লোকগুলি বেশ ভদ্র।"

* * *

বৈকালে রামধনবাবু গ্রামের যুবকগণকে একটা ফুটবলের দাম এবং মেথরদিগকে এক একখানি নূতন বস্ত্র দান করিলেন!

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ | কার্ত্তিক---১৩৪৫ | ৭মসংখ্যা

জুট্ অর্ডিনান্স ও তাহার প্রতিক্রিয়া

বাংলা দেশে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক খবর হচ্ছে 'জুট্ অর্ডিনান্স্'। কয়েকদিন পূর্ব্বে হঠাৎ এক সময় ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জ্ ও সেয়ারবাজারে হুড়াহুড়ি পড়ে গ্যাল—চট্‌কলের শেয়ারের দর একেবারে আগুন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, আসন্ন জুট্ অর্ডিনান্স্ প্রবর্ত্তনের গুপ্ত খবর আগাম পেয়েই speculatorরা শেয়ারের দর মুহুর্ত্তে একেবারে দ্বিগুণ চড়িয়ে দিয়েছে। ওধারে রাজনৈতিক গগনে এই জুট্ অর্ডিনান্স্‌কে উপলক্ষ্য করে রীতিমত তাল ঠোকাঠুকি লেগেগেল। অনাস্থা প্রস্তাবের রণক্ষেত্রে সদ্যবিজয়ী মন্ত্রিমণ্ডলী প্রচার করিতেছেন যে, প্রজাদের কল্যাণের জন্যই এই আইন জারী করা হইয়াছে। অন্যদিকে বিপক্ষদল বলিতেছেন —সব ঝুট, সব ঝুট্, শ্বেতাঙ্গদের ওপর নির্ভর-শীল বলেই তাদের তোয়াজের জন্যই এ আইন জারী করা হ'য়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, যাদের হিতের জন্য এত চেঁচামেচি সেই প্রজাসাধারণ উক্ত আইনের বিষয় কিছু না বুঝতে পেরে একবারে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে রইল। এই হল বর্ত্তমান অবস্থা।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে বাঙ্গলার গভর্ণর এই অর্ডি-নান্স জারী করিয়াছেন। জারীর সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিনান্স বলবৎ হইয়াছে। অর্ডিনান্সের মর্ম্ম এই যে, চটকলগুলির কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া

গভর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে আদেশ জারী করিবেন। বিভিন্ন চটকলগুলির বিভিন্ন কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। অর্ডিন্যান্স জারীর সময় কলে কতগুলি তাঁত ছিল, অর্ডিন্যান্স জারীর সাত দিনের মধ্যে চীফ ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টারের নিকট তাহা জানাইতে হইবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে তাহা না জানান হয় তবে ঐ সময় উত্তীর্ণ হইবার পর যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত সংবাদ না জানান হইবে ততদিন পর্য্যন্ত কল চালান যাইবে না।

অর্ডিন্যান্স বলবৎ হইবার পর চীফ ইন্‌স্‌পেক্টারের অনুমতি ব্যতীত কলের তাঁত বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং পুরাতন তাঁতের স্থলে নূতন তাঁত বসান যাইবে না।

যদি কোনও কলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাহিরে কাজ করা হয়, তবে যতদিন বে আইনী ভাবে কাজ করা হইবে তাহার প্রত্যেক দিনের জন্য তাঁত পিছু মালিক ও ম্যানেজারের ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে। যদি মালিক এই অর্ডিন্যান্সের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক তাঁত সংখ্যা না জানান তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে যতদিন পর্য্যন্ত জানান না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত মালিকের প্রত্যেক দিনের জন্য একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত সময়ের জন্য প্রত্যেক দিনের বে-আইনী কাজের জন্য তাঁত পিছু কলের মালিকের দশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে। ম্যানেজারের ও অনুরূপ দণ্ড হইবে। যদি এই অর্ডিন্যান্সের বিধান ভঙ্গ করিয়া তাঁতসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় বা পুরাতন তাঁতের স্থানে নূতন তাঁত বসান হয় তবে যতখানা তাঁত পরিবর্ত্তন বা বৃদ্ধি করা হইবে তাহার প্রত্যেকখানার জন্য মালিকের দশ টাকা হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে, অধিকন্তু নূতন তাঁত গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

অর্ডিন্যান্স জারীর কারণ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশে এত চটকল আছে যে ঐ সকল কলে ফ্যাক্টরী আইনে নির্দ্দিষ্ট পুরা সময় কাজ চলিলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চট উৎপন্ন হয়। এজন্য কলগুলি নিজেদের মধ্যে সুবন্দোবস্ত করিয়া কার্য্যকাল হ্রাস করিয়াছিল। ১৯৩৬ সালে উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া যায়। তাহার পর কলের মালিকেরা যদৃচ্ছভাবে কাজ চালাইতে থাকেন; ফলে, অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু চটের দাম কমিয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটের দামও কমিয়া যায়। আপোষে কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হই ।

জুট অর্ডিনান্স জারী উপলক্ষ্যে গভর্ণমেণ্ট যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে এ যে, বিভিন্ন কলগুলিতে সামঞ্জস্যহীন বেপরোয়া কাজ চালাবার জন্য উৎপাদনবৃদ্ধির দরুণ চটকলগুলির ক্ষতি হ'চ্ছে, সুতরাং কাজের ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট করে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন। এতে করে চটকলগুলিও লাভবান হবে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটএর দাম বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ চাষীদের উপকার ঘট্‌বে। কাজেই গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য থেকে আসলে বোঝা যাচ্ছে যে, গভর্ণমেণ্ট দু' সম্প্রদায়ের হিত চান—এর মধ্যে একজন হচ্ছে মিল মালিক ও অপরজন হ'চ্ছে পাট-চাষী।

আমরা লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্লিতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষীয় নই, কিন্তু তা সত্ত্বেও

আমরা বল্‌তে বাধ্য যে তাঁদের এ অর্ডিনান্সের মধ্যে রীতিমত ফাঁক রয়েছে এবং সেই ফাঁক থাকার দরুণ বিরুদ্ধপক্ষীয় যদি বলে যে শ্বেতাঙ্গদের সুবিধার জন্যই উক্ত আইনজারী করা হ'য়েছে তাহালে সেটা নেহাৎ মিথ্যাভাষণ হবে না। মন্ত্রিমণ্ডলীর উদ্দেশ্য সাধু হ'তে পারে কিন্তু তাঁদের একথা ভুললে চলবে না যে, সামান্য ত্রুটীর জন্য শিব গড়্‌তে গিয়ে বাঁদরও তৈরী হয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর এই 'ডালভাতের' নবতম অবদান জুট্ অর্ডিনান্স্‌কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে উক্ত আইনের দ্বারা এক শ্বেতাঙ্গ মালিক এবং পাটের যাহারা intermediary ব্যবসাদার অর্থাৎ দালাল, ফ'ড়ে, আড়ৎদার এবং মহাজনাদি ছাড়া আর কেউই বড় একটা লাভবান হবে না। কেন হবে না! সেইটাই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্।

পাট যে আমাদের একেবারে একচেটিয়া সম্পদ একথা বলে গলা একেবারে ফাটিয়ে ফেলা হয়েছে। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এবং সহকারীতায় সকলে মিলিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট প্লান অনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে এই একচেটীয়া সম্পদের দ্বারা বাংলার সকল দুঃখ দূর করা যাইত। কিন্তু কেবল ব্যবস্থার দোষ ও অভাবে বাংলার লক্ষ লক্ষ চাষীর দুঃখ কিছুতেই দূর হইতেছে না।

অথচ আমাদের এই একচেটিয়া দেশীয় সম্পদ থেকে বিদেশীরা কি রকম মোটা লাভ মারছে তা' চটকলগুলির ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ষান্মাসিক আয়ের হিসাব থেকে বোঝা যাবে। নিম্নে অঙ্কগুলি দেওয়া গেল :—

পাটকলের নাম	লাভের পরিমাণ	শতকরা ডিঃ
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া	৮,৫৭,২২৫৲	১৫
বালী	২,৭২,৪৩৭৲	৬
চাঁপদানী	৪,৭৯,৯১৬৲	৫
ফোর্ট গ্লষ্টার্	৫,৭৫,০৮৮৲	১৫
ফোর্ট উইলিয়াম	২,৯০,৭৫০৲	১০
গৌরীপুর	৬,০৮,৫০২৲	২৫
হাওড়া	১০,৮৯,১৮৫৲	১৭½
নদীয়া	৫,৬৩,৩৮২৲	২০
রিলায়েন্স্	৭,৩৬,৫৯৭৲	২৫ $\frac{২}{১০}$

এত গেল হাল্‌ফিলের ৩৩ সালের কথা। বিগত জার্ম্মান্ যুদ্ধের সময় পাটকলগুলি যে বিরাট লাভ ক'রেছে তার ফলে পাটকলগুলিতে যে পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হয়েছিল তার অন্যূন দশগুণ টাকা মিলমালিকেরা তুলে নিয়েছে। আর পাট উৎপাদক বাংলার চাষী ?—তার চালে কুটা নাই—ঘরে খাবার নাই—পরিধানে কাপড় নাই। লাভবান শুধু মিল-মালিকরাই হয় নি।—পাটের ফড়ে, দালাল, মহাজন, আড়ৎদার, যাচনদার, বেলদার প্রভৃতি লড়াইয়ের সময় পাট যারা ছুঁয়েছে তারাই লাল হ'য়ে গিয়েছে—কেবল যারা বুকের রক্ত জল করে পাট তৈয়ারী ক'রেছে তাদের হাহাকার যায় নি ! সাধে কি কিষাণরা আজ খেপে উঠেছে ?

এই যে বিরাট লাভের অঙ্ক এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পাটের কারবার কি রকম লাভজনক কারবার, অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে চাষীরা এই অংশ থেকে একেবারে বঞ্চিত। সেই জন্যই পাটচাষীদের হাহাকার বাংলার আকাশ বাতাস প্রতিনিয়ত ভারাক্রান্ত করে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পাটের কারবার ক'রে কলওয়ালারা 'লাল' হয়ে যাচ্ছে, মহাজন ফেঁপে উঠ্‌ছে, ফড়েরা বাড়ীর ওপর বাড়ী ক'রছে, কিন্তু পাটচাষী সেই যে তিমিরে সেই তিমিরে। এর একমাত্র কারণ হ'চ্ছে যে পাটের প্রাথমিক দর কিছুতেই চড়ছে না। সেই জন্যই পাটের দর বেঁধে দিবার জন্য দেশের মধ্যে রীতিমত আন্দোলন চলেছিল; বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীও নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; চাষীরাও আশা ক'রেছিল যে, এমন একটা আইন হবে যাতে ক'রে পাটের দর বাধ্যতামূলক ভাবে চড়ে যাবে —কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে এমন এক আইন জারী হ'ল যার ফল চাষাদের পক্ষে এক কাণা-কড়িও কল্যাণের নয়।

গভর্ণমেণ্ট এই আইন প্রচলনের কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছেন যে, চটকলগুলির উৎপাদন সীমাবদ্ধ করলে তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হবে এবং তজ্জন্য পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ চাষীদেরও উপকার হবে। আমাদের মনে হয় এ উক্তির পেছনে কোনই যুক্তি নেই এবং যদিও বা আংশিক যুক্তি থেকে থাকে তা'হ'লেও কাজের বেলায় সেটা ফলপ্রদ হবেনা। আমরা জানি যে, কোন জিনিসের দর তখনি বৃদ্ধি পায় যখন সে বস্তুর চাহিদা বাড়ে। চটকলগুলির উৎপাদন যদি সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যায় তবে এটা নিশ্চিত যে কাঁচা পাটের চাহিদাও বর্ত্তমানাপেক্ষা কমে যাবে। সুতরাং

মন্ত্রিমণ্ডলী যদি বলেন যে, বর্ত্তমান অর্ডিনান্স দ্বারা চাষীদের কল্যাণ সম্ভব তাহলে সেটা যে নিছক ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যদি তর্কের খাতিরে এ যুক্তিও ধরে নেওয়া যায় যে, চটকলগুলির অবস্থা ভাল হওয়ার দরুণ মালিক বেশীদরে পাট কিনতে আপত্তি করবে না তাহলেও একথা জোর করে বলা চলে যে, কার্য্যতঃ ও-যুক্তির কোনই মূল্য নাই; কেননা, আমরা দেখেছি যে ১৯৩৩ সালে মোটা লাভ মারার দরুণ চটকলগুলির অবস্থা যখন খুব ভাল ছিল তখন তারা বরং আজকের চেয়ে আরও কম দরে পাট কিনেছে। কাজে কাজেই গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য অনুযায়ী স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, জুট্ অর্ডিনান্স্ দ্বারা পাট চাষীর কিছুমাত্র লাভের সম্ভাবনা নেই।

তবে এ-অর্ডিনান্স দ্বারা কারা লাভবান্ হবে? পাটচাষীরা যে লাভবান হবে না সেটা আমরা দেখতে পেলাম, তাহ'লে নিঃসন্দেহে অপর পক্ষ অর্থাৎ মিল মালিকই লাভবান হবে। এই মিল মালিকের মধ্যে দেশী বিদেশী দু'সম্প্রদায়েরই লোক আছে এবং বিদেশীর সংখ্যাই অত্যধিক। আমাদের বক্তব্য হ'চ্ছে যে বর্ত্তমান জুট্ অর্ডিনান্স্ দ্বারা মিল মালিকরা লাভবান্ হলেও বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গ মালিকগণই লাভবান্ হ'বেন অত্যধিক এবং দেশীয় মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

কেন সেইটাই দেখুন! সকলেই জানেন যে, বিগত মহাসমরের সময় পাটের ব্যবসায়ে যখন একেবারে সোণা ফলতে লাগলো তখন সেই লাভের ভাগীদার হবার জন্য একটিও দেশী কোম্পানী ছিল না। দেশী কোম্পানীগুলির পত্তন হয়েছে কয়েক বৎসর মাত্র। বিগত মহাসমরের সময় বিদেশী কোম্পানীগুলি যে লাভ নিয়েছে তাতে তাদের মূলধন সুদে ও আসলে করে উঠে গেছে এবং যে টাকাটা তারা জমা করেছে তাতে কিছুকাল তাদের লাভ না হলেও চলে। কিন্তু দেশী কোম্পানীগুলির কি অবস্থা দেখুন। বিদেশী কলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগীতায় তারা এখনো ভাল করে দাঁড়াতে পারে নি এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তারা মোটেই তাদের আসল উশুল করতে পারে নি। সেই জন্যই পাণপণে তারা ডবল shiftএ বা দুইদল নিয়ে কাজ চালাচ্ছিল যাতে দু'পয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন যদি কাজের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ হয় তবে তাদের উৎপাদন রীতিমত কমে যাবে এবং তাতে তাদের রীতিমত লোকসান্ হবে। এই কারণেই তারা জুট য়্যাসোসিয়েশনের এগ্রিমেণ্টের মধ্যে থাকতে রাজী হয় নি।

কাজেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, গভর্ণমেণ্ট যাই বলুন না কেন, জুট অর্ডিনান্স দ্বারা ভারতীয় চাষী কিংবা মালিকের কোন লাভেরই সম্ভাবনা নেই; এতে উপকার ঘটবে শ্বেতাঙ্গ মালিকগণের। শুধু তাই নয়, এই জুট অর্ডিনান্স দ্বারা মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাবে। সকলেই জানেন যে বছর কয়েক পূর্ব্বে জুট্ মিলগুলির মধ্যে চুক্তির ফলে যখন কাজের সময় সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা ছিল তখন শ্রমিকদের টাকা পিছু ৬ পয়সা হতে নানারকম তারতম্য মূলক হারে বেতন ছাটাই হয়। তৎপরে যখন চুক্তি খতম করে সকলে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ চালালে তখন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী অনুযায়ী সেই ছাঁটাই রহিত হল না। ১৯৩৭ সালে বাংলার চটকলগুলিতে

বিরাট সাধারণ ধর্ম্মঘট দেখা দেয়। সেই থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ অশান্তি পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে। আজ অর্ডিনান্স্ জারীর দরুণ ৫৪ ঘণ্টা থেকে কাজের সময় ৪৫ ঘণ্টা হলে মালিকরা নিশ্চয়ই তাদের বেতন প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছাঁটাই করবে। শুধু তাই নয়, বহু তাঁত সিল করে দেওয়ার দরুণ হাজার হাজার শ্রমিকের জবাব হ'বে। এর ফল কি মারাত্মক হ'বে ভাবুন দেখি। চটকলগুলির স্পিনিং ঘরের লোকেরা মাত্র ২২½ টাকা পায় —তা' থেকে হপ্তা আবার এক পঞ্চমাংশ কাটা যাবে। এতে তারা নিজেরাই খেতে পায় না, তা' পরিবার পালন করবে কি করে? এমত অবস্থায় বাংলা দেশের চটকলগুলিতে নিশ্চয়ই এক সাধারণ ধর্ম্মঘট হবে। তাতে তিন লক্ষ লোকের জীবন মরণ স্বার্থ জড়িত থাকবে এবং সাধারণ ব্যবসার ভয়ঙ্কর ব্যাঘাত ঘটবে।

আমরা জানি না মন্ত্রিমণ্ডলী এইরকম অবাঞ্ছিত অর্ডিনান্স্ জারী করবার পূর্ব্বে উপরোক্ত বিষময় ফলসমূহের কথা ভেবে দেখে ছিলেন কিনা; যদি ভেবে দেখতেন তাহ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এরকম মারাত্মক অর্ডিনান্স জারী ক'রতেন না। এসমস্ত ছাড়াও একটী বিষয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ করবার আছে। অর্ডিনান্স বর্ণিত বিভিন্ন মালিকগণের সমন্বয়ে যে কমিটি গঠিত হয়েছে তার কথা মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন এবং তাঁদের মতানুসারেই তা' ঘটেছে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, সেই কমিটির লোক মনোনয়নে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হ'য়েছে; মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষিত হ'য়েছে মাড়োয়ারীর স্বার্থ সংরক্ষিত হ'য়েছে কিন্তু এই বাংলাদেশে বসে বাঙালীর স্বার্থ মোটেই সংরক্ষিত হয় নি। বাংলাদেশে কি বাঙালীর চটকল নেই? প্রেমচাঁদ জুট মিলের নাম কে না শুনেছে? যখন মাড়োয়ারীর চটকলের জন্ম হয় নি তখন থেকেই এই বাঙালীর চটকলটির কাজ চলেছে, এর পরিচালন ভার বিদেশে বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত এমন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর ওপর ন্যস্ত রয়েছে যাঁহার প্রতি রক্তকণার মধ্যে পুরুষানুক্রমে ব্যবসাবুদ্ধির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমরা ভাগ্যকুলের প্রসিদ্ধ ধনী, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার রাজা জানকী নাথ রায়ের পুত্র কুমার রণেন্দ্র নাথ রায়ের কথা বলিতেছি। এমন একজন ধীর স্থির উচ্চশিক্ষিত এবং ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন লোক থাকিতে কমিটিতে কি যোগ্য বাঙালী নিযুক্ত করবার মত লোক খুঁজে পাওয়া গেল না? বাংলাদেশে বাস ক'রে বাঙালী গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী যদি বাংলার স্বার্থের প্রতি এতটা উদাসীন হন তবে তার চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন আর কি আছে? মন্ত্রিমণ্ডলীর এই কার্য্যের দ্বারা বাঙলার চাষীর কিছুমাত্র উপকার নেই, এবং ভারতীয় মালিকেরও কোন লাভ নেই; শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ বণিকরাই যাতে লাভবান্ হবে—সেই কার্য্যকে বিরুদ্ধপক্ষীয়রা যদি অভিসন্ধিমূলক আইন বলিয়া প্রচার করে তবে তাহার কি উত্তর আছে?

আমরা উপরে যে সমস্ত যুক্তি ও বিশ্লেষণের অবতারণা করেছি তা' একেবারে জলন্ত সত্য। ওর মধ্যে ফাঁকিবাজির এতটুকু ছোঁয়াচও পাওয়া যাবে না। আমাদের অভিমত হ'চ্ছে যে পাটচাষীর স্বার্থ অগৌণে রক্ষা করা দরকার এবং সে কার্য্য সাধন ক'রতে গেলে পাটের

এই একচেটিয়া ব্যবসাকে গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে প্রভৃতির মত ন্যাশনালাইজ ক'রে ফেলা উচিত। তাতে গভর্ণমেণ্টেরও লাভ হয়, পাটচাষীরও স্বার্থ বজায় থাকে। গভর্ণমেণ্ট যদি বিভিন্ন মহকুমায় ডিপো স্থাপন পূর্ব্বক উৎপন্ন সমস্ত পাটের ক্রেতা হন তাহ'লে তার পক্ষে সেটা ইচ্ছামত ন্যায্য দরে বিক্রয় করা কিছুমাত্র শক্ত ব্যাপার হবেনা। এতে ক'রে তার রাজস্বের আয় বাড়বে বই কমবে না। প্রশ্ন উঠবে যে, এর জন্য গভর্ণমেণ্টের টাকা কোথায়? সে টাকা যদি নাই থাকে ত' গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের কাছ থেকে তা' শতকরা ৩৲ তিন টাকা সুদে লোন্ নিতে পারেন; এছাড়া এই কার্য্যে হাত দিলে বাংলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ডিপো স্থাপনের জন্য বহু শিক্ষিত বেকারের জন্য অন্নসংস্থান হ'তে পারে। পাটচাসীর স্বার্থ সংরক্ষেণের বর্ত্তমানে আর কোন উপায় নেই।

এর কারণ আরও স্পষ্ট ক'রে বল্‌ছি। অর্ডিন্যান্স্ দ্বারা জুটের নিম্নতম দর বেঁধে দিলেও চাষী তার সুযোগ নিতে পারবে না এইজন্য যে সে নেহাৎ গরীব—অনশনে অর্দ্ধাশনে তার দিন কাটে—তার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই কেবল চোখের জল ও হাহাকার আছে। অর্ডিন্যান্সের দ্বারা পাটের নিম্নতম দাম যদি ৬৲ টাকা মন বাঁধিয়া দেওয়া হয় তবে ফড়িয়া মহাজন, আড়ৎদার সবাই তার সুখ সুবিধা ভোগ ক'রতে পারবে; কারণ ৬৲ টাকার উপর তারা বাজার বুঝে আরও ২।৪ টাকা মণ চড়িয়ে বিক্রী ক'রবে; যেহেতু তার মাল ধ'রে রাখ্‌বার এবং চড়া বাজারে বেচে লাভ ক'রবার শক্তি ও সামর্থ্য আছে। কিন্তু চাষীর যে ধ'রে রাখবার ক্ষমতা নাই। তার যে ঘরে খাবার নেই,—উনুনে হাড়ী চ'ড়ে না। ক্ষেতের উৎপন্ন পাট বেচে টাকা আন্‌লে তবে বাচ্চা কাচ্চাদের মুখে ভাত দেবে, মহাজনের দেনা শোধ দেবে; অর্ডিন্যান্সের নিম্নতম দাম ৬৲ টাকা পাবার জন্য অপেক্ষা করার তার যে তাকৎ নেই; সে যে তা'হলে সপরিবারে না খেয়ে মরবে। ফ'ড়ে এবং দালালরা গাঁয়ে গাঁয়ে এইরূপ দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত পাট চাষীদের সংবাদ রাখে এবং অর্ডিন্যান্স ৬৲ টাকা দর বেঁধে দিলেও তারা ৪৲ টাকা ৫৲ টাকার এইরূপ দুঃস্থ পাট চাষীদের কাছ থেকে অনায়াসে মাল কিন্‌বে। এর থেকে চাষীকে রক্ষা ক'রবার একমাত্র উপায় পাট ব্যবসায়ীকে গভর্ণমেণ্ট Nationalise করুন। দেশের সমগ্র পাট গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত ইউনিয়নের হাত দিয়া বিক্রয় হউক। ইউনিয়নের গুদামে পাট জমা দিলেই চাষী অর্দ্ধেক দাম পাইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক দাম বিক্রয়ান্তে পাইবে। যেমন আড়ৎদারেরা করে। পাট চাষীকে বাঁচাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। এতে হাজার হাজার বেকার যুবকেরও অন্নসংস্থান হইবে। মন্ত্রী-মণ্ডলীকে বলি একটা বড় কল্পনা বা স্কীম নিয়ে তাঁরা কাজে নামুন। দেখিবেন দেশের লোক তাঁদের ভক্ত এবং অনুরক্ত হ'য়ে উঠবে।

তারপরেই আসে মালিকের স্বার্থ রক্ষার কথা। মালিকের স্বার্থ যে কোথায় বিপন্ন হ'য়েছে তা আমাদের চোখে পড়ে না। হিসাব নিলেই দেখতে পাবেন যে বিদেশী চটকলগুলি এখানে ৮ পারসেণ্ট, ১০ পারসেণ্ট, ১৫ পার্সেণ্ট করে ডিভিডেণ্ট দিচ্ছে। শুধুমাত্র ভারতীয় চটকলগুলি এখনো ঠিক্ দাঁড়াতে সমর্থ হয় নি। উৎপাদন যদি সীমাবদ্ধ করা হয় ত ক্ষতি হবে তাদের বেশী, সুতরাং এমন ব্যবস্থা অবলম্বন

করা উচিত যাতে ভারতীয় মালিকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে। অর্ডিনান্সের মধ্যে এব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে শ্রমিকদের বেতন ছাঁটাই ও জবাব না ঘটতে পারে। আমাদের মতে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করবার ব্যবস্থা টিকবে না। বর্ত্তমানে সমগ্র ইউরোপ একেবারে একটা বারুদখানা হ'য়ে রয়েছে, শুধুমাত্র দিয়াশালাই কাঠি জ্বালাবার অভাব। এমত অবস্থায় যুদ্ধ যদি লাগে ত চটকলগুলিতে দিনরাত কাজ চালাতে হবে—বর্ত্তমান অর্ডিনান্সের প্রয়োজন তখন থাকবে কোথায়?

আমরা উপরে জুট অর্ডিনান্স সম্পর্কে যে সকল কথা লিখলাম ইহা কোন রাজনৈতিক প্রপাগাণ্ডা নয়, কিম্বা বিদ্বেষ প্রসূত প্ররোচনাও নয়,—অমরা এই দেখিয়েছি যে, বর্ত্তমান অর্ডিনান্স দ্বারা কি পাটচাষী কি ভারতের মালিক কেউই লাভবান্ হবে না—শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ বণিকেরই পেট ভরবে। তাছাড়া আরও দেখিয়েছি যে এই অর্ডিনান্স দ্বারা শ্রমিক্ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার দরুণ শ্রমিক অসন্তোষ রীতিমত বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং উক্ত অর্ডিনান্স দেশের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। আমাদের মতে চাষীদের কল্যাণকল্পে পাটের নিম্নতম দর বেঁধে দিয়ে অর্ডিনান্সজারী করা একান্ত প্রয়োজন এবং সমগ্র পাট ব্যবসায়ীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা দরকার। তাহলেই কৃষিস্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং দেশের মধ্যে আর্থিক সমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'বে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিল্কাহ্রদের মাছ
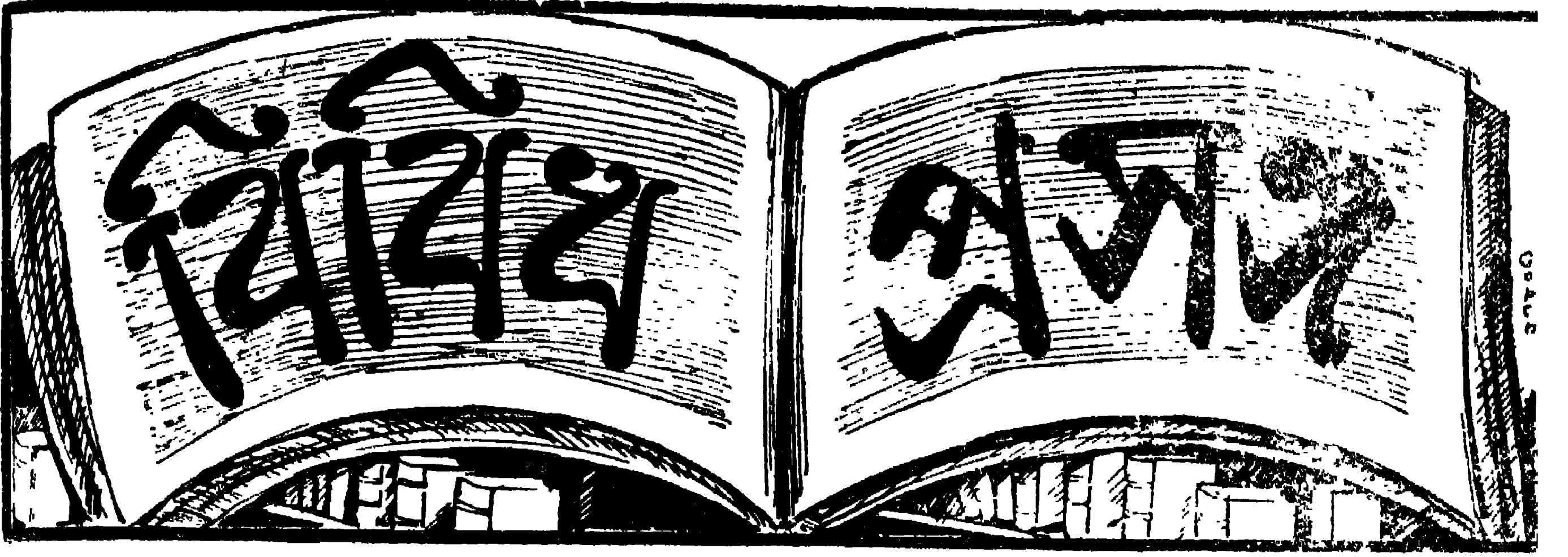
উড়িষ্যা প্রদেশে চিল্কাহ্রদ একটী বিশেষ আর্থিক সম্পদ। প্রতিবৎসর এই হ্রদ হইতে প্রায় ৩০ হাজার মণ মাছ কলিকাতায় আসে। এতদ্ব্যতীত বহুল পরিমাণে চিংড়ী মাছ রেঙ্গুনে চালান যায়। চিল্কাহ্রদের তীরে প্রায় এক হাজার ঘর জেলে বাসকরে। এই চিল্কাহ্রদের মাছ ধরাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। তারপর বহুসংখ্যক মৎস্য ব্যবসায়ী,—যাহারা মাছের চালানী কারবার ও ফড়িয়াগিরি করে,—তাহাদেরও চিল্কা হ্রদের মাছের কারবারে প্রচুর অর্থলাভ হয়। সম্প্রতি দেখা যায়, চিল্কা হ্রদের মাছের পরিমাণ কমিয়া আসিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের মত প্রচুর মাছ পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে ধীবর পরিবার হইতে গবর্ণমেণ্ট্ পর্য্যন্ত সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে ধীবরদের কয়েকটী সভা হইয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, চিল্কা হ্রদের প্রবেশমুখ,—যাহা সমুদ্রের সহিত যুক্ত,—উহা অতি অল্প পরিসর। বর্ত্তমান সময়ে সেই মুখ ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাওয়াতে আর সমুদ্রের মাছ আসিতে পারিতেছেনা। এই কারণে মাছের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। যাহাহউক শুনিলাম এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে তদন্ত করিতেছেন। আমাদের মতে শুধু চিল্কাহ্রদের প্রবেশমুখ ভরাট হওয়াই মাছের পরিমাণ কমিবার একমাত্র কারণ নহে। অন্য কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান আবশ্যক। হ্রদের জলে কোন দোষ অথবা তাহাতে মাছের খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে। এতকাল পর্য্যন্ত মাছ ধরিবার জন্য ধীবরেরা যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও কৌশলপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, হয়ত এখন তাহার পরিবর্ত্তন দরকার। কারণ মৎস্য ইতরপ্রাণী হইলেও, তাহাদের সহজবুদ্ধির নিকট অনেক সময় মানুষের কৌশলও ব্যর্থ হইয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চুক্তিঃ—

১৯৩৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট্ ট্যারিফ আইন প্রচলিত করেন। তাহার পর হইতে উক্ত গবর্ণমেণ্টের সহিত

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিষয়ে একটা অস্থায়ী চুক্তি হইবার কথাবার্ত্তা চলে। সম্প্রতি সেই চুক্তি লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে এবং গত ১৯শে মার্চ্চ হইতে উহার প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয়ে কাউন্সিল অব্ ষ্টেটে মিঃ যুবরাজ দত্ত সিংহ প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে মিঃ ডো বলেন যে এই অস্থায়ী চুক্তির কথাবার্ত্তা হইবার সময় ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়কে জানান হয় নাই, কারণ ১৯৩৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সম্পর্কে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, বর্ত্তমান অস্থায়ী চুক্তিতে কেবল তাহারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, এই চুক্তি পাকাপাকি করিবার জন্য উহাকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে না। কারণ এই চুক্তিতে পূর্ব্বেকার চুক্তির সর্ত্তাদির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সন্তোষজনক বা যুক্তি সঙ্গত নহে। ১৯৩৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য বিষয়ে ভারতের সম্বন্ধই অন্যায় ও আপত্তিকর ছিল এবং বর্ত্তমান চুক্তিতে তাহারই পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় ছিল। তাড়াতাড়ি ধামা-চাপা দিয়া, ভারতীয় বণিকদের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ একটা অস্থায়ী চুক্তির কোন আবশ্যকতা ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা বোম্বাই বন্দরে খুব সস্তায় কয়লা পাঠায়। তাহার ফলে বোম্বাই আহমদাবাদের মিলে বাংলা দেশের কয়লা ব্যবহার হয় না। সিন্ধু-প্রদেশে যে বিরাট সুক্কুর বাঁধ (লয়েড ব্যারেজ) তৈয়ারী হইল,—সেই কোটী কোটী টাকার কাজে,—এক পয়সার কয়লাও বাংলাদেশের খনি হইতে যায় নাই। সমস্তই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়াছে। সুতরাং ভারতের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য চুক্তিতে ইহাই একটী প্রধান সর্ত্ত থাকা আবশ্যক যে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কয়লার অতিরিক্ত পাঠাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান অস্থায়ী চুক্তিতে তাহা যদি না থাকে, তবে বাংলাদেশ হইতে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় লোকের বিপদ ঃ—

গত বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তথাকার অধিবাসীদের হাতে অনেক ভারতবাসী নিহত হয়। তখন আত্মরক্ষার জন্য নিরুপায় হইয়া ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করে যে, তাহা-দিগকে বন্দুক রাখিবার অনুমতি দেওয়া হউক। কিন্তু তাহাদের সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট্ জেনারেল সম্প্রতি ইহার প্রতিকারে মনোযোগী হইয়াছেন। গত তিন বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট্ কতজন ভারতীয়ের বন্দুক লাইসেন্সের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিতে তিনি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস্কে অনুরোধ করিয়াছেন।
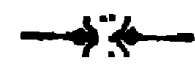
রোটাস্ ইন্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড্ ঃ—

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার নাম আজ ভারতের ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপরিচিত। পরলোকগত লালা হরকিষণ লালের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে

যখন ভারত ইন্‌সুর্যান্স্‌ কোম্পানীর অধঃপতন আসন্ন হয়, তখন রামকৃষ্ণ ডালমিয়াই তাহাকে রক্ষা করেন। ভারতে নবনব শিল্প প্রতিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার চেষ্টা অসাধারণ ও অদমনীয়। কোন প্রকার বাধায় তিনি পশ্চাৎপদ হন না। সকল রকম শিল্পব্যবসায়ে বুদ্ধিপরিচালনা করিতে পারেন, এরূপ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ভারতে আমরা রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। সম্প্রতি তিনি "রোটাস্‌ ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড্‌" নামে যে বিরাট কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ব্যবসা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিহার প্রদেশে রোটাস্‌ জেলায় শোন নদীর তীরে বহুদূর ব্যাপী স্থানে ইহা অবস্থিত।

শেঠ রামকিষণ ডালমিয়া

তাঁহার নিজ নামানুসারে ঐ স্থানের নাম হইয়াছে "ডালমিয়া নগর"। চিনি, সিমেণ্ট, কাগজ, পটারি, টাইলস্‌, প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পকারখানা রোটাস্‌ ইন্‌ডাষ্ট্রীজের অন্তর্গত। গত ২০শে মার্চ্চ বিহার প্রদেশের গবর্ণর স্যার মরিস্‌ গ্যালিয়ার হ্যালেট্‌ ডালমিয়া নগরে সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীর উদ্বোধন করেন। তদুপলক্ষে শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া গবর্ণরের অভিনন্দনকালে যে অভিভাষণ করেন তাহাতে বলেন "আমরা ভারতবাসী দীর্ঘকাল যাবৎ দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় নিমগ্ন থাকিয়া শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বাস্তবিক শিল্পবাণিজ্যই জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেরই শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অধিক। নিদারুণ দারিদ্র্য, ব্যাপক বেকার অবস্থা, অজ্ঞতা ও দুঃখভোগ, এই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। আমার এই প্রতিষ্ঠান যতই বিরাট হউক না কেন, আমি উহাকে অতি সামান্য,—সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ মনে করি। আমাদের আরও অনেকদূর অগ্রসর হইতে হইবে,—বহুসংখ্যক কলকারখানা স্থাপন করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, এই ভাবে চলিতে থাকিলে অনতি-বিলম্বে ভারতবর্ষ শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে অন্যদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।" পাঁচ বৎসর হইল ডালমিয়ানগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে উহার কুঁড়েঘর গুলির স্থলে বাংলো এবং পাকা বাড়ী উঠিয়াছে। শীঘ্রই তথায় কর্ম্মচারী ও মজুরদের জন্য হাসপাতাল, ঔষধালয়, স্কুল, খেলারমাঠ, বাজার দোকান প্রভৃতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতীয় কাগজ শিল্প

কলিকাতা কাগজ ব্যবসায়ী সমিতির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ বি আর ভি রাও, সেক্রেটারী মিঃ আর এন্ দত্ত, য়্যাসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারী মিঃ সি সি মুখার্জ্জি এবং সদস্য মিঃ কে ঘোষ, ইহারা কাগজ শিল্প সম্বন্ধীয় তদন্তে ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেন, ভারতীয় কাগজ শিল্পের জন্য প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হিসাবে যে রক্ষণ-শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, তাহা বজায় থাকা উচিত। ট্যারিফ বোর্ডের প্রথম তদন্ত হওয়ার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় কাগজের কলের উৎপাদন দ্বিগুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতেও বাজারের চাহিদা মিটে না। তথাপি কলিকাতা কাগজ ব্যবসায়ী সমিতির মত এইযে, তিন পাই হিসাবে যে সার চার্জ্জ ধরা আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং যাহাতে ভারতীয় কাগজের কলের উৎপাদন অতিরিক্ত না হয়, সে বিষয়ে ট্যারিফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং তৎসহিত ভারতীয় কাগজের ব্যবসায়েরও প্রসার হইবে। কিন্তু ভারতীয় কাগজের দাম আশানুরূপ সস্তা নহে। এখানে কাঁচামালও মজুরীর

মূল্য কম, সুতরাং কাগজের দাম বাড়িবার কোন কারণ নাই। ভারতের সকল বন্দরেই বিদেশী কাগজের মূল্য প্রায় সমান;—কেবল মাত্র দূরত্ব হিসাবে রেল জাহাজ ভাড়ার দরুণ যাহা কিছু তফাৎ হয়। কিন্তু ভারতীয় কাগজের মূল্য সকল বন্দরে সমান নহে। কলিকাতা হইতে দূরের বন্দরে উহা সস্তায় বিক্রীত হয়।

কলিকাতায় খাদ্য ও ঔষধ নিয়ন্ত্রণ

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কলিকাতা করপোরেশন পচা ও ভেজাল খাদ্য এবং ভেজাল ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু তদুদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে আমরা আশার কথা কিছু শুনিতে পাইনা। করপোরেশনের কর্ত্তাদের প্রধান চেষ্টা দেখিতেছি, তাঁহাদের সেণ্ট্র্যাল লেবরেটরীর পুনর্গঠন, উন্নতি ও প্রসার। তাঁহাদের য়্যানালিষ্ট কর্ম্মচারিগণ ঐ লেবরেটরী বৃহৎ ভাবে পুনর্গঠন করিবার স্কীম বা পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, সুসজ্জিত লেবরেটরী অথবা মোটা মাহিনার য়্যানালিষ্ট কেহই ভেজাল পচা খাদ্যদ্রব্য অথবা ভেজাল ঔষধ বিক্রয় বন্ধকরিতে পারিবেন না। লেবরেটরী ও য়্যানালিষ্ট ভেজাল ও পচা জিনিস ধরিয়া দিলেন;—কিন্তু তাহার বিক্রয় বন্ধ করিবে কে? সকল খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিতেই কি লেবরেটরী ও য়্যানালিষ্টের দরকার? কলিকাতা করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে যে কয়টী বাজার চলিতেছে, তাহাতে যে লেবরেটরী ছাড়াও নিত্য চোখের সাম্নে দেখা যাইতেছে পচা মাছ, তরকারী, ভেজাল দুধ ঘি মাখন, তৈল, দশ দিনের বাসি মিঠাই-খাবার, মাটী-মিশান গুড়,—এই সব বিক্রয় হয়, কে তাহা বন্ধ করে? করপোরেশনের শক্তি কোথায়? মোল্লার দৌড় ত মস্জিদ পর্য্যন্ত! মিউনিসিপ্যাল গেজেটে দণ্ডপ্রাপ্ত দোকানদারদের তালিকা বাহির হইতেছে,—কিন্তু তাহাতে ফল কি? যে দোকানদার জোচ্চুরী প্রতারণা করিয়া দুই চারিহাজার টাকা লাভ করে, সে দশ বিশ টাকা জরিমানাতে ভয় পায় না। লেবরেটরীর উন্নতি ও প্রসার আমরা আপত্তিজনক মনেকরি না। কিন্তু লেবরেটরী ছাড়াও যে সকল প্রতারণা জোচ্চুরী এবং অসাধু ব্যবহার ধরা যাইতে পারে, করপোরেশন সেই-সব দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? —এই আমাদের জিজ্ঞাস্য। লেবরেটরীর সাজ সজ্জায় যে উৎসাহ ও অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা এমন কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে বাস্তবিক সুফল পাওয়া যাইবে। আমাদের বিবেচনায় ভেজাল, পচা ও বাসি খাদ্যদ্রব্য এবং ভেজাল ঔষধাদি বিক্রয় সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে এমন একটা আইন পাশ হওয়া দরকার যাহাতে অপরাধীর কঠোর শাস্তির বিধান থাকিবে। বাস্তবিক যাহারা পচা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, তাহাদিগকে ত একহিসাবে নরহত্যার চেষ্টা (Attempt to murder) অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে। আমরা আরও মনে করি, এই সকল অপরাধের বিচার করপোরেশনের নিজ হাতে রাখিবার দরকার নাই। অন্যান্য অপরাধের মত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উহাদের বিচার হওয়া

উচিত। শুধু জরিমানা দিয়াই যদি অপরাধীরা ছাড়ান পায়, তাহাহইলে কোন ফল হইবে না। আমাদের মতে অপরাধীদের জরিমানা (২০ টাকার কম নহে) ও দীর্ঘকালের নিমিত্ত (৩ মাসের কম নহে) সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত। কারণ জেল হইলে কারবার নষ্ট হওয়ার ভয় থাকিবে।

কুতব মিনার

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, দিল্লীর কুতব-মিনার কাহার কীর্ত্তি—হিন্দুর না মুসলমানের? কানওয়ার সেইন পঞ্জাব ঐতিহাসিক সমিতিতে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কুতব মিনার মুসলমানের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান প্রচারার্থ দান

আমেরিকার ধনিগণ এক বৎসরে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বিজ্ঞান প্রচারার্থ, ৯৮,৮০,০০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রশংসার কথা।

মোমের গাছ

এতদিন মধুচক্র হইতে মোম সংগৃহীত হইত; কিন্তু সম্প্রতি ক্যাণ্ডিলিয়া নামক এক প্রকার মোমের বৃক্ষ আবিস্কৃত হইয়াছে। রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস নামক মাসিক পত্রে এই বৃক্ষের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃক্ষ আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা দেখিতে বেত গাছের মত, কোন পত্র নাই, কেবল ডালগুলি একস্থানে ঝাড় বাঁধিয়া থাকে। চাকের মোম অপেক্ষা এই বৃক্ষজাত মোম, অধিক তাপ সহ্য করিতে পারে ও কঠিন। ইহা দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্যাদি, খেলনা ও গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈয়ারী হইয়া থাকে। ঐ বৃক্ষ হইতে অতি অল্প পরিমাণে রবারও পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর প্রশংসা

বিগত প্লাবনের সময় বঙ্গীয় ছাত্রগণের সহিষ্ণুতা, আন্তরিকতা, সেবা বুদ্ধি ও সদ্‌গুণ লক্ষ্য করিয়া কলিকাতা চার্চ্চ মিশনারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রেভারেণ্ড মিঃ হল্যাণ্ড একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী এক নূতন জাতি হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গীয় ছাত্রগণের কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত প্রশংসার্হ।" বাঙ্গালী বালকদের এতাদৃশ আত্মোৎসর্গ দর্শনে বাস্তবিকই আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। কিন্তু এবারকার এই দারুণ প্লাবনে ছাত্রদিগের মধ্যে সেরূপ সেবা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে বন্যাপ্রপীড়িত স্থান সমূহে সাহায্যকরার জন্য ছুটিয়া যাওয়া কিম্বা কোনরূপ ত্যাগোন্মত্ততার ভাব কিছুই দেখা যাইতেছে না। কেবল কলিকাতার অলিতে গলিতে নাচগান করিয়া টাকা তোলার খুব তোড়জোড় দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই সব নাচগানের আয় বন্যাপীড়িত স্থান সমূহের কোথায় কত পাঠান হইল তাহার বিবরণ কয়েকটা অনুষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশেরই কোনও সংবাদপত্রে আমরা দেখি নাই।

নারিকেল তৈল বিক্রয়ের অভিনব পন্থা

পল্লীগ্রাম এবং সকল সহরেই নারিকেল তৈলের বিলক্ষণ কাটতি আছে। কিন্তু একটী উপায় করিলে আরও অধিক কাটতি হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে নারিকেল তৈলই উৎকৃষ্ট কেশ তৈল, ইহার স্নিগ্ধকর গুণ কেশরক্ষণে এবং মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয়। প্রমাণ---প্রাচীনা মহিলাগণের কেশ---অশিতিবর্ষ বয়স্কা মহিলাগণও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, তিনি আজীবন কেবল নারিকেল তৈলই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এত বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ রহিয়াছে। আধুনিক সৌখীনগণের প্রায় সমস্ত তৈলই—যাহা white oil নামে বিখ্যাত, তাহা পরিস্কৃত কেরোসিন তৈল মাত্র, তাহাতে ২৪ ফোঁটা সুগন্ধ তৈল যথা অটো বা নিরোলী প্রভৃতি দিয়া সুগন্ধীকৃত হইয়া সৌখীন নাম ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহারা ভাবী ফলাফলের দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখেন না। খনিজ তৈল সংকোচক গুণবিশিষ্ট, সুতরাং ব্যবহার করিলে কেশ কূপের মুখ সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া কেশের পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে, সুতরাং ভাবি ফল, কেশের অকাল পক্কতা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি। সে অনেক কথা---তাহা লইয়া এস্থলে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে, তাহা করিতেও চাহি না; কিন্তু উদ্ভিজ্জ তৈলই স্নিগ্ধকর, রৌদ্রতাপে অনায়াসে গলিয়া লোমকূপ দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম, সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে ইহা প্রকৃত কেশ পরিপোষক এবং মস্তিষ্ক শীতল কারক।

ব্যবসায়ীর লক্ষ্য স্থল।

ইহা চির প্রচলিত মহিলাগণের আদরের সামগ্রী, অথচ ইহাকে একটু রকমফের করিয়া আধুনিক সম্প্রদায়ের উপযুক্ত করিতে পারিলে ইহার কাটতি অধিক করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যেও বিক্রয় করা যায়।

তৈল রং ঢংএ সুশোভিত হইয়া শিশির মধ্যে ঢুকিলেই মাত্র আধ পোয়া তৈলের মূল্যই ৷৵০ আনা, এক টাকা হইয়া যায় ইহা সকলেই দেখিতেছেন। কিন্তু বাজার চলিত তৈলে প্রতি সেরে পচা পাতা আধ পয়সার, একাঙ্গী চূর্ণ ২॥ পয়সার, আর গোলাপ ফুল চূর্ণ, লাল পাতা ৫ পয়সার যদি কোন তৈলে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সুগন্ধ তৈলরূপেই দাঁড়ায়, সেইরূপ তৈল যদি বাজারে সাদা তৈল ॥০ আট আনা মূল্যে বিক্রয় হয়, আর এই রঙ্গিন সুগন্ধ তৈল যদি সেই স্থলে ॥৴০ বা ॥৵০ আনায় বিক্রয় করা যায়, তাহাহইলে অবশ্যই কাটতি অধিক হইবে, অথচ এই কার্য্যের জন্য অধিক পুঁজীর আবশ্যক নাই। ধরুন, নারিকেল তৈল

প্রতি মণ ১০।।০ টাকায় কেনা গেল, ইহাতে মসলা প্রভৃতির জন্য আরও ২৲ টাকা ধরিয়া ১২।।০ টাকার পড়তা পড়িল, আমরা যদি ।।৵০ আনা সের বিক্রয় করি, তাহাহইলে ২২।।৵০ প্রতি মণের দাম পড়ে। খরচ খরচার জন্য যদি আরও ২৲ টাকা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি মণে ৬৲ টাকা অধিক লাভ পাওয়া যাইতে পারে, ইহা সহজ লাভ নহে। যাঁহাদের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য আছে, তাঁহারা অধিক মূল্যে বেশ তৈল ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক সমাজের বড় লোকের অনুকরণ করিতে চাহে, যদি তাহারা সেইরূপ অনুকরণ এবং আকাঙ্ক্ষার দাস না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অভাব হইবে কেন? কথাটা বুঝুন। সেই জন্য এরূপ সুলভ এবং ঈষৎ সৌরভময় তৈল ইহারা সের দরে পাইলে কেন না ক্রয় করিবে? এই ব্যাপারটা আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাল, ইহা বেশ আদরের সহিত বিক্রীত হইয়াছিল, আমাদের বিশ্বাস, কোন উদ্যোগী ব্যবসায়ী এই উপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ব্যবসায়ে অভিনবত্ব দেখাইতে পারিলেই কিছু পাওয়া যায়, কেবল পরপদচিহ্ন অনুসরণ না করিয়া কিছু মৌলিকত্ব দেখাইলে ক্ষতি কি?

"Man is his own star" মানুষের সৌভাগ্য তাহার নিজের কাছে, উদ্যোগী হও, পরিশ্রমী হও, সমস্ত জন্ম নক্ষত্রই তোমার অনুকূলে দাঁড়াইবে। কথা এই আর কি? নিজের সৌভাগ্য নিজেই ফিরাইতে হয়।

কারিগরী শিক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। কেবল সাহিত্য-চর্চ্চায় ও সাহিত্যিক শিক্ষায় সকলের উদরান্নের সংস্থান হয় না,—ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যে বিষম জীবন সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে জয়যুক্ত হইতে হইলে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শ্রম করিতে এবং শ্রমজীবিকে সম্মান করিতে হইবে। চীন দেশের মান্দারীণ-দিগের মত জড় ভরতকে সম্মান করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। সসম্মানে আত্মরক্ষা করিতে হইলেই সকল জাতিকে শ্রম করিতে হইবে। কিন্তু কেবল শ্রম করিলেই সে শ্রম সার্থক হইবে না। যে কৌশলে শ্রম করিলে শ্রম সফল হয়, তাহাও শিক্ষা করা আবশ্যক। জগতে দিন দিন যত শ্রম লাঘবজনক যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে,—ততই শ্রম করিবার পদ্ধতি জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। সুতরাং সে পদ্ধতি শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে। মানব জাতির সভ্যতা বিস্তারের ও জ্ঞান বিকাশের সহিত নানা দেশে গতায়াতের যত সুবিধা হইতেছে,—বৈদেশিক পণ্যের সহিত স্বদেশী পণ্যের প্রতিদ্বন্দিতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রম করিবার পদ্ধতি শিক্ষার আবশ্যকতা ততই অনুভূত হইতেছে। ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্নরূপ শ্রমকৌশল ও শ্রম প্রয়োগের প্রণালী শিক্ষার নাম কারিগরী শিক্ষা বা টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে অনেকে এই শিক্ষাকে সফল করিবার পথে নানা বাধার উল্লেখ করিয়াছেন। নূতন পথে চলিতে হইলেই প্রথমে নানা বাধার বিভীষিকা মনে উদিত হয়, ইহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু তাহার জন্য কাহারও অবশ্য গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে। বরং কি উপায়ে সেই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। সকল দেশেই নূতন পথে চলিতে জনসাধারণ নূতন বাধা দেখিতে পাইয়া থাকে। কিন্তু মানবের অধ্যবসায়ের, কৌশলের ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে কোনও বাধাই অনতিক্রান্ত থাকে না। জর্ম্মনীতে যখন শিল্প বিদ্যার প্রথম শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়,—তখন সেই বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ কার্য্যক্ষেত্রে নানা বাধা দেখিয়াছিল। কিন্তু তথাকার সরকার ছাত্রগণকে এই নূতন পথে চলিতে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছিলেন সেইজন্য তাহাদের সে বাধা তাদৃশ বিভীষিকাপ্রদ হয় নাই। আমাদের দেশের লোকও সরকারের সহায়তা পাইবে এরূপ আশা আছে।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত এম্, জি, কামিং বাংলার কারিগরী শিক্ষা-সম্পর্কিত মন্তব্যে বলিয়াছেন,—'ভারতীয় ব্যবসাদার জাতীরা শিল্পকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসুক নহে। যে সকল জাতির শিল্প-বুদ্ধি সম্যক বিকশিত হয় নাই, **যাহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে জীবিকার্জ্জনের প্রবর্দ্ধমান তীব্রতা অনুভব করিতেছে, তাহারাই কেবল শিল্প কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।** সুতরাং কুম্ভকারের বৃত্তি ধরিলে কর্ম্মকারের সাফল্য লাভ যেমন সুদূরপরাহত হয়,—এ দেশে উক্ত কারণে কারিগরী শিক্ষা সেইরূপ বিফল হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসাদার জাতিরা যদি কারীগরী শিক্ষা করে, তাহা হইলে ঐ শিক্ষা ফলবতী হইতে পারে। আমরা শ্রীযুক্ত কামিংএর এই উক্তি অংশত সত্য বলিয়া স্বীকার করি। যত দিন ব্যবসায়ী জাতিরা শিল্পকে ব্যবসায় বলিয়া গ্রহণ না করিতেছে—ততদিন কারিগরী শিক্ষা ফল প্রসবিনী হইতেছে না।
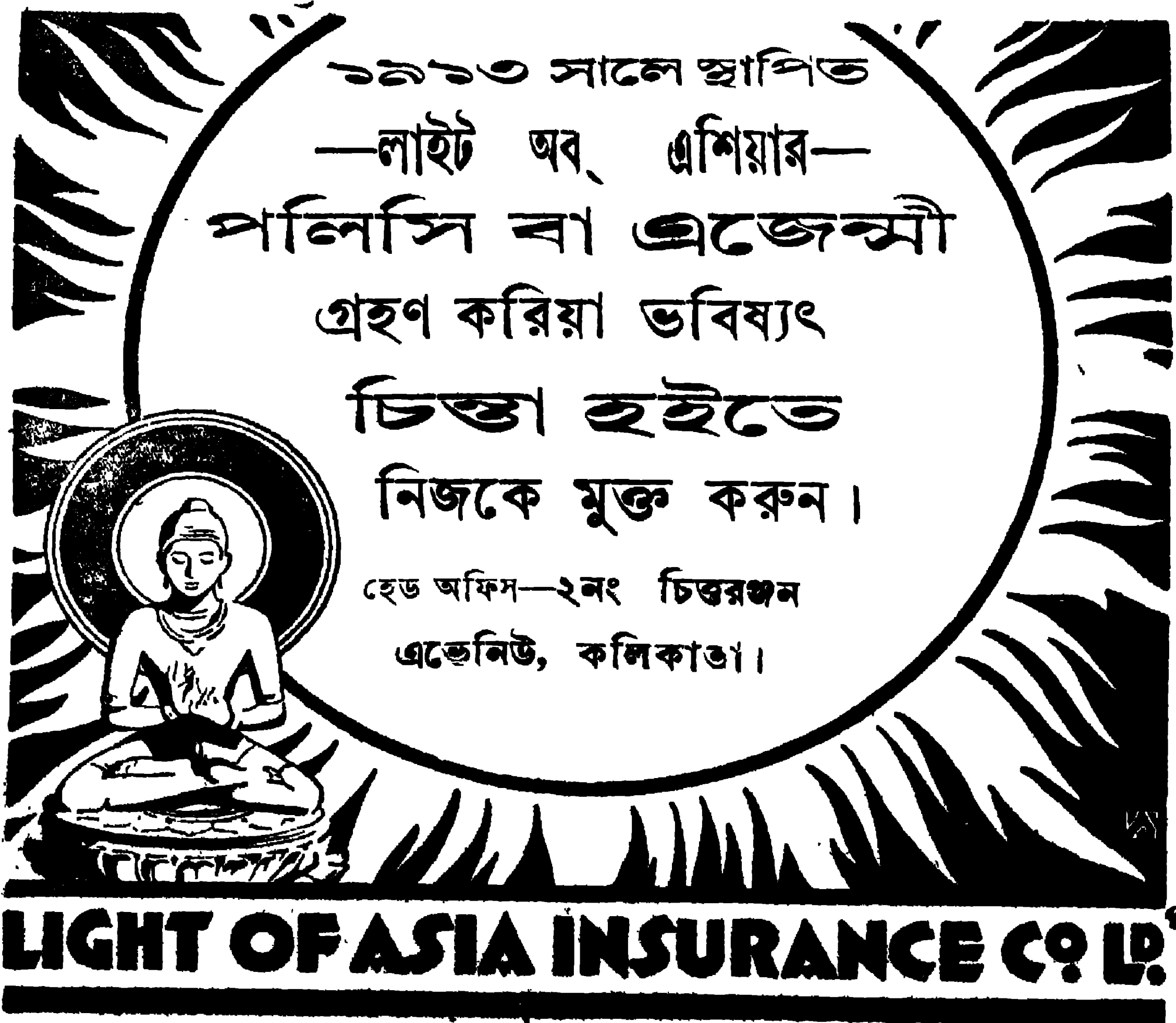
মাদ্রাজের শিল্পবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ চ্যাটার্টন বলিয়াছেন,—

"ভারতের সর্ব্বত্রই কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য লোক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কারি-

গরী শিক্ষা করিলে কলকারখানায় চাকুরী মিলিবে, এইরূপ আশা হইতেই ঐ আগ্রহ উদ্ভূত হইয়াছে। শিক্ষিত লোক কর্ম্ম পাইতেছে না, এই উৎপাত ভারতেই কেবল উপলব্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; কারিগরী শিক্ষাদিলে ঐ উৎপাতের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইবে—ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে। **যতদিন দেশীয় লোকের মূলধনে দেশীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে,—যতদিন য়ুরোপীয়দিগের মূলধনে** এ দেশে কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,—ততদিন যোগ্যতালাভ করিলেও ভারতবাসীরা অধিক সংখ্যায় মোটা বেতনের বা মোটা লাভের কাজ পাইবে না।" চ্যাটার্টন আরও বলিয়াছেন, দেশীয়গণ যোগ্যতালাভ করিলেও এ দেশের য়ুরোপীয় কারখানায় চাকুরী পাইবে না। স্বদেশপ্রেমিক য়ুরোপীয় জাতিরা যোগ্য স্বদেশী পাইলে এ দেশীকে মোটা বেতনের চাকুরী দিতে প্রায়ই সম্মত হইবে না। সুতরাং যাহাতে কারিগরী শিক্ষা করিয়া যুবকগণ চাকুরী পায় সর্ব্বাগে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। দেশীয়দিগের মূলধনে কারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে অনায়াসেই সে ব্যবস্থা হইতে পারে। সুতরাং ধনী সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। আর এক কথা, সরকারেরও এ বিষয়ে দেশীয়গণকে আনুকূল্য করা কর্ত্তব্য। যাহাতে দেশীয়গণ যোগ্যতালাভ করিলেই সরকারে চাকুরী পায়, তাহার ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যাইতে পারে। আর এক কথা, অনেক হাতের কাজেও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার প্রভৃতি শিল্পিগণ যদি উন্নততর যন্ত্রের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের কার্য্যে অধিকতর লাভবান হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কুম্ভকার যদি তাহার সেই প্রাচীনকালের কুলাল চক্র পরিত্যাগ করিয়া পায়ে চাপা চক্র (treadleworked wheel) চালাইতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজকাল অনেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষা পাইলে তাহাদের কার্য্য কুশলতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

অনেকেই বলেন যে, এদেশী যুবকগণ কারিগরী বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই উচ্চ বেতনের চাকুরী পাইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকে,—তাহারা মজুরদিগের মত হাতে কলমে কাজ করিতে সম্মত হয় না। বিলাতে এরূপ ব্যবস্থা নাই। সেখানকার ছাত্রগণ কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুকাল ঘরের পয়সা দিয়া কোনও কল-কারখানার ফোরম্যানের, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অথবা এঞ্জিনিয়ারের অধীনে শিক্ষা-নবিশী করিয়া থাকে। তাহার পর তাহারা সামান্য মজুররূপে উক্ত কারখানায় গৃহীত হয়। সাধারণ মজুর অপেক্ষা এই সকল শিক্ষিত মজুরদিগের পার্থক্য কিছুই থাকে না। এইরূপে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পরে তাহারা উচ্চপদে উন্নীত হইয়া থাকে। এ দেশের লোক উহাদের মত শ্রমের সম্মান বুঝিতে অসমর্থ। যাহারা কারিগরী শিখিতে যাইতেছে, তাহাদের পক্ষে আত্মাভিমানই যে উন্নতির পরিপন্থী, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

আমরা বহুবারই এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এদেশের লোকে সে কথা শুনে কৈ ?

জাপানের শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়

জাপানকে বালার্ক কিরণোদ্ভাসিত দেশ ("The Land of the Rising Sun") বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ জাপানবাসীগণ সূর্য্যের ন্যায় তৎসন্নিকটস্থ দেশ সমূহে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছে এবং সভ্যজাতি মধ্যে একটি প্রতাপশালী জাতিতে পরিণত হইতেছে বলিয়া উহার ঐ প্রকার নাম প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা পাঠক পাঠিকাগণের সকাশে কথঞ্চিত বর্ণনা করিব। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানের সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান জাপানবাসীর উন্নতির সূত্রপাত হয়। তিন বা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কনফিউকাস (Confucus) সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মিলিত হইয়া কার্য্য করিত। অতঃপর দিনমারেরা জাপানবাসীগণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তথায় দিনেমার ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দিনেমার শিক্ষার নাম তখন 'রঙ্গকা' (Rangaka) বলা হইত। অবশেষে যখন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাবাসীগণ জাপানে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিল এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলগিন পরিষদবর্গ সহিত জাপানে আগমন করিলেন, তখন তথায় খাস ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইল ও ব্রিটিশ-জাপ সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন হইতেই জাপানবাসীগণের মধ্যে নব ভাবের উন্মেষ আরম্ভ হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানে অস্থায়ী শিক্ষাসমিতি গঠিত হয়। তিন বৎসর পরে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত হইল। তাহাকে জাপানী ভাষায় "মুম্বুসো" (Mombusho) কহে। রাজ মন্ত্রী ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্ব প্রথম শিক্ষা-আইন (Educational code) প্রচারিত হয়। জাপানের রাজা তাহাতে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

তিনি বলেন, "কর্ম্মচারী, কৃষাণ, শিল্পী, ভাস্কর, কবিরাজ অথবা চিকিৎসা ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেরই স্ব স্ব বৃত্তির প্রসার বৃদ্ধি করণ মানসে জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্যক। আমি আশা করি এই শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের জ্ঞান লিপ্সা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। তখন গ্রামে গ্রামে সুদূর পল্লীতে পল্লীতে তাহা ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে। তখন আমার মনে হয়, কি ধনী কি নির্দ্ধন কোনে পরিবারেই নিরক্ষর লোক থাকিবে না। শিক্ষায় দেশ মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে।" জাপানরাজের বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ষড়বিংশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ৭৯ লক্ষ, ২৫ সহস্র ৯ শত ৬৬ জন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী অধ্যয়ন করিত।

লক্ষ, ৬২ সহস্র, ৪ শত, ১৮ জন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন! ইউরোপের পণ্ডিতগণ বলেন, সেই বর্ষে জাপানে কেবল বিদ্যালয়ে বালকগণের উক্ত শিক্ষা শতকরা ৮২-৪৯ জন প্রাপ্ত হইতেছিল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর দৌত্যকার্য্য পরিচালনা মানসে ৪৯ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি বৃন্দের দ্বারা একটি সমিতি স্থাপিত হইল। ইহারাই সমগ্র জাপানের মুখপত্র বা প্রতিনিধি-স্বরূপ। তন্মধ্যে রাজপুত্র ইয়াকুরা (Prince Iwakura) ও মারকুইস ইতো (Ito) প্রধান ছিলেন। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যদ্দারা জাপানের উচ্চ শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পায়, তদুপায় বিধানে মনোযোগী হইলেন। শত শত জাপান ছাত্রকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বিভিন্ন দেশে জাপ ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা
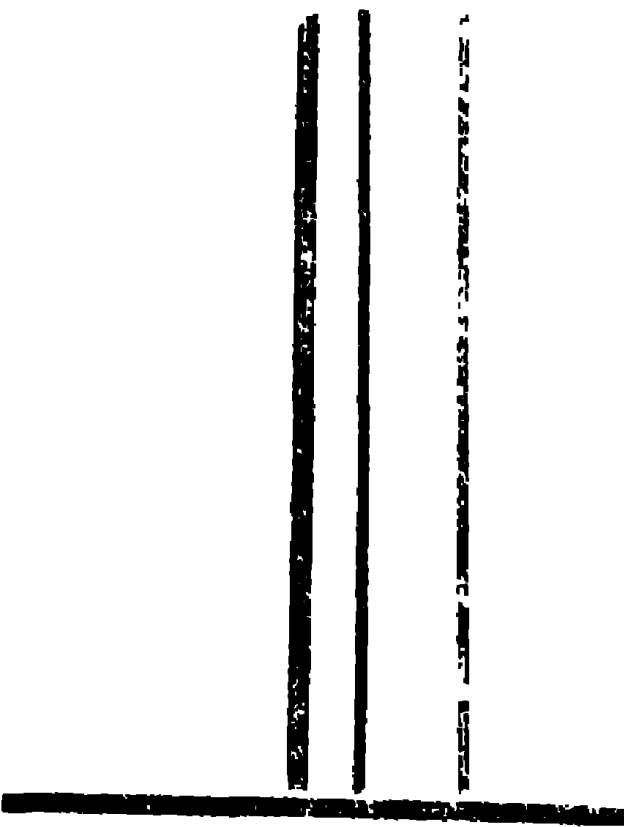
পদ্ধতি শিক্ষা করিবার জন্যই জাপানের ছাত্রগণকে ইউরোপ, আমেরিকায় প্রেরণ করা হইত। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে বিদ্বান লোকের সংখ্যাও কম নহে এবং তাঁহারাই জাপান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তত্ত্বাবধান করিয়া সুন্দররূপে পরিচালিত করিতে পারেন। সুতরাং অধুনা আর প্রায়ই জাপান হইতে শিক্ষার্থী ছাত্র আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে প্রেরিত হয় না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আড়াইশত ছাত্র রাজ-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দেশে গমন করিয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসাকুল্যে ১১৭টী ছাত্র উচ্চ বৃত্তি পাইয়া বিদেশে গমন করে। সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক লইয়া আসিয়া জাপানী ছাত্রকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছিল, পরে সে ব্যবস্থাও রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ বৈদেশিক শিক্ষক ৩০ জন ছিল, তন্মধ্যে ১০ জন গ্রেট ব্রিটান হইতে, ১১ জন আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে, ইহাই হইল সরকারী কলেজের কথা। বেসরকারী কলেজাদিতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১৬৭ জন পুরুষ ও ১০১ জন স্ত্রীলোক, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে শিক্ষকতার জন্য লইয়া আসা হয়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা যদ্দ্বারা সুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইতে পারে জাপান গভর্ণমেণ্ট তদুপায়বিধান করিতে বিশেষ যত্নবান। প্রেসিডেণ্ট ইবুকা (Ebuka) আমেরিকায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, জাপানবাসীগণ পাশ্চাত্যবিদ্যায় পারদর্শী হইলে গ্রেট ব্রিটানের নিকট হইতে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিবে ও আমেরিকার নিকট হইতে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করিবে। তখন তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে।

জাপানের প্রাথমিক (Elementary) বিদ্যালয় সমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সাধারণ ও (২) উচ্চ। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সমষ্টি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ সহস্র ৩ শত ২২টী ছিল। ইহার ব্যয় ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৩ শত ৭০ পাউণ্ড হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত ৪৬ পাউণ্ড কর দাতৃগণের নিকট হইতে চাঁদা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই শ্রেণীর অনুমাণ পঞ্চ সহস্র বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। তাহাতে বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকর্ম্ম, কৃষি অর্থ নীতি এবং অপরাপর পরিশ্রম সাধ্য শিল্পাদি অধিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। জাপানে বালিকাগণকে সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক গৃহস্থালী ও সূচী কার্য্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাপান গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়াদিতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে বিনা বেতনে সকলেই শিক্ষালাভ করিতে পারিবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

জাপানবাসিগণের মধ্যে একটি বিষয়ের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। তথায় জাপান বালিকাগণ বিনাকারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। এই দোষটি জাপানে অত্যন্ত অধিক, সত্বরই ইহার প্রতিবিধান কল্পে অনেকেই বদ্ধ পরিকর হইতেছেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জাপানের মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, "জাপানের স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সমগ্র জাপানে তাহা ব্যাপৃত হইতে পারিবে না। বালক ও বালিকা সকলকেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। যদ্যপি কেহ শিক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহাহইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া

বিদ্যালয়ের আইনের আমলে আনিতে হইবেক।" এই প্রকার আদেশ প্রচার হওয়ায় সকলেই (বালক বালিকাগণ) বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করিল। তথায় পুরাকালে ললনাগণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যাহা হউক, বর্ত্তমান শিক্ষার উন্নতি দর্শনে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে তদ্দেশবাসিগণ জ্ঞানার্জ্জনে কি প্রকার পক্ষপাতী ছিল।

আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে আরও পরিস্ফুট হইবে। তথাকার লোকেরা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উপযাচক হইয়া ১ লক্ষ ৫৪ হাজার পাউণ্ড বা স্বর্ণ মুদ্রা বিদ্যালয়াদির জন্য প্রদান করিয়াছিল। অত্রস্থলে আরও বক্তব্য এই, এক বৎসরের মধ্যে জাপানবাসীগণ ৩৬ লক্ষ ৭৭ হাজার 'একর' জমি; ১৪ হাজার পুস্তক এবং ১৬ হাজার শিক্ষা কার্য্যের যন্ত্রাদি দান করিয়াছিল। লিউইজ সাহেব বলেন, "জাপানের শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য এককালীন দানের সংখ্যাই অধিক। তাহার এক পঞ্চমাংশ বেতনাদি বাবদ কলেজ প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক শতকরা ১৫ জন হইতে ১০ জনে পরিণত হইয়াছে। বৈদেশিক শিক্ষকগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়াদির কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) মধ্যবৃত্তি স্কুল ও (২) উচ্চ বিদ্যালয় সমূহ। এই সময় হইতে তাহাদিগকে সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য সমর বিভাগ করিয়া লইতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে কেহই ২৮ বৎসরের পূর্ব্বে স্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে না। জাপানের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহ হইতে উচ্চ বিদ্যালয়াদির সংযোগ এবং একতা সংরক্ষিত না হইলে দেশের উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে, সেকথা তাঁহারা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিম্নস্কুল হইতে শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই তাহারা প্রবেশাধিকার লাভে সমর্থ হয় এবং কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকিলে তাহাকে অপর বিদ্যালয়াদির সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে সুতরাং সম্পদে বিপদে সকলেই পরস্পর মিত্রতাসূত্রে সম্বদ্ধ আছে বলিয়া তথাকার অবস্থা এতাদৃশ ক্রমোন্নত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি আরও সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। কোন ছাত্র নিম্ন স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া অপর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিনা পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার লাভে সমর্থ হইতে পারে। যদ্যপি কেহ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠাদি নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিয়াছে বলিয়া কোন প্রশংসাপত্র (Certificate) প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান না করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে এবং তাহার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সহজেই হইতে পারে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে সেও তদপেক্ষা নিম্নপদ প্রাপ্ত হইবে না। নিম্ন বিদ্যালয়ের সঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়াদির এমন সহানুভূতি সকল দেশেই অনুকরণীয় অপর কোন দেশে ঈদৃশ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বসাকুল্যে ১৩৯টি সাধারণ মধ্য বিদ্যালয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৬টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। এই স্থলে দুই হাজার

৬১ জন শিক্ষক, তন্মধ্যে দ্বাদশ জন বিদেশ হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। ৪ হাজার ২ শত ৮১ জন ছাত্র ছিল। ⅘ ভাগ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠার্থে গমন করিত। ১/১ ভাগ সৈন্যদলভুক্ত হয় এবং ২/৮ ভাগ অংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছিল। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ৫৬ জন আইন অধ্যয়ন করিত। ১২৭ জন স্থপতি বিদ্যা (Engineering) ১ হাজার ৪ শত ৬৯ জন ডাক্তারী এবং ২ হাজার ৫শত ৮৯ জন সাধারণ বিভাগে সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিত। ইহাই হইল পূর্ব্বাকার অবস্থা।

মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়াদিতে ইংরাজী ভাষার প্রচলন আছে। জাপ ভাষা ও চৈনীক ভাষার পরস্পর নিকট সম্পর্ক বলিয়া উভয়েরই সমভাবে প্রচলন আছে। জাপানে জিমনাষ্টিক বা ব্যায়ামাদিতে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। কিন্তু গণিত বা ইতিহাস পঠনে ততোধিক যত্ন লওয়া হয় না। দর্শন ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে জাপানবাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা উদাসীন। এই সকল ধর্ম্মমূলক শিক্ষার জন্য তথাকার লোকে তত আগ্রহ প্রকাশ করে না। ব্যবসা বাণিজ্যাদি শিক্ষা ব্যপদেশে যে সমুদয় বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যক, তত্তুল্য জ্ঞান লাভ হইলেই যথেষ্ট হইল, এইরূপ জাপানের সাধারণ শ্রেণীয় মত।

তাহাদের বিশ্বাস, শারীরিক বলাধান হইলেই বহিঃশত্রু এবং বিভ্রমাদি বিদূরিত হইতে পারে। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়াদিতে সকল বিষয়ই তুল্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচটি বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী সাধারণ শিক্ষা বিষয়ের অধ্যয়নার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন লওয়া হয়। একটিতে সর্ব্বোচ্চ আইন ও স্থপতি বিদ্যা শিক্ষা প্রযত্নে জাপানবাসীগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহার ফলেই কাইটো বিশ্ববিদ্যালয়ের (Kyoto University) সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে টেকনিকাল পদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করতঃ তথাকার পথ প্রসার করিয়া দিয়াছে। অধুনা আমরা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বিশ্ববিদ্যালয়

জাপানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটী টোকীয়োতে (Tokyo) ও অপরটি কাইটোতে (Kyoto)। তন্মধ্যে প্রথমটি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইহার কার্য্যকারীতা, শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। রাজকীয় টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আদর্শানুযায়ীরূপে গঠিত হয় এবং ইহার সঙ্গে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কৃষিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চ কলেজের সংযোগ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমেরিকান পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। তাহার পরবর্ত্তী সময় হইতে জর্ম্মণ দেশ প্রচলিত প্রথায় উদ্বোধিত হইয়া নবোৎসাহে অদ্যাবধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে টোকিয়ো বিশ্ব বিদ্যালয় বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার বিবরণ যথাকালে জ্ঞাপন করিব। এই স্থানে একটী "হল" আছে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণ এই স্থানে নিয়মিতরূপে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে।

তথায় কি কি বিষয় অধীত হইয়া থাকে, তাহাই অধুনা দেখা যাউক। আইন, বিজ্ঞান, স্থপতিবিদ্যা, চিকিৎসা, কৃষি, সাহিত্য, পুস্তক রক্ষণ প্রণালী, উদ্ভিদ বিদ্যা, মান মন্দির সংশ্লিষ্ট জ্যোতিষ, সামুদ্রিক রসায়ন, হাসপাতালে রোগী-চর্য্যা প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যক বিষয় পঠিত হইয়া থাকে।

জাপানে ১৮৯৮ খৃঃ ২শত ৫০ জন অধ্যাপক ২ হাজার ৪শত ৬৫ জন ছাত্র ছিল। ১৮৯৭ খৃঃ পূর্ব্বোক্ত ১শত ৬১ জন অধ্যাপক, নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন,—আইনে ২২ জন, চিকিৎসায় ৩০ জন স্থপতি বিদ্যায় ৩৫ জন, সাহিত্যে ২৫, বিজ্ঞানে ১৮, কৃষি বিদ্যায় ৩১ জন। দৈনিক ছাত্র সংখ্যা হুহু করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া পড়িতেছে। প্রতি বর্ষে এইরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া নিম্নলিখিতরূপে ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।

জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কি প্রকারে বাড়িতেছে, তাহার তালিকা প্রদান করিলেই পাঠকগণ সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন :-

	কলেজের নাম ও বিষয়		১৮৮৫	[illegible]	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৭
১।	ইউনিভারসিটি হল (কলেজ)		০	৮৭	১০০	১৬৬	১৭৪
২।	আইন	,,	২১৭	৩০১	৬৭৮	৫৬১	৭৩৭
৩।	বিজ্ঞান	,,	৪৩	৭৭	১০৯	১০৫	১০৫
৪।	স্থপতি বিদ্যা	(কলেজ)	৩০	১০৮	২৯৫	৩৯৫	৩৮৫
৫।	ডাক্তারী	,,	১২৬	১০৩	১৭৮	২৩৩	৩৯৭
৬।	সাহিত্য	,,	১২৯	৮৮	২১৯	২১৮	২৭৮
৭।	কৃষি	,,	০	৬৫	১৯৯	২১৫	২৩২
	একুনে	,,	১,১৪৫	১,২৯২	১,৬২০	১,৮৩৭	২,২০৮

১৮৯৮ খৃঃ সমগ্র ছাত্রসংখ্যা হইতে শতকরা ৩০ জন ছাত্র আইন, ৯ জন ডাক্তারী, ৩১ জন স্থপতি বিদ্যা, ৭ জন বিজ্ঞান এবং ৪ জন কৃষি শিল্প অধ্যয়ন করিত। লিউস সাহেব বলেন ১৮৯৬ খৃঃ যে সকল ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৩০৮ জন। তন্মধ্যে ১০৭ জনকে জাপান গভর্ণমেণ্ট শাসন বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছেন। ৪৮ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-হল নামক কলেজে বিবিধ গ্রন্থের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ৪৫ জন ব্যাঙ্কে ও বাণিজ্যাদি সংক্রান্ত কার্য্যে বিনিযুক্ত। ৭৪ জন কোন কার্য্যই করিতেছে না। ৪২ জন স্কুল ও কলেজের অধ্যাপক হইয়াছেন। ১৫ জন কলেজ সমূহে পোষ্ট গ্রাজুয়েটের কার্য্যে এবং ২ জন অপর ব্যবসায়াদি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তথায় পূর্ব্বে এই প্রকার কার্য্য চলিত। বর্ত্তমান সময়ে জাপান ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেশের বহুবিধ মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। কেহ তথায় যাবজ্জীবন কুমার অবস্থায় কলেজ লাইব্রেরীতে বিবিধ গবেষণায় কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ বা বিজ্ঞানচর্চ্চায় গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়

টোকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। ১৮৯৫ খৃঃ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের খরচ কি প্রকার হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম :—

কলেজের নাম			বার্ষিক ব্যয়
বিশ্ববিদ্যালয়হল		...	১১,০০০ পাউণ্ড
আইন কলেজ		..	৯৫০০ ঐ
বিজ্ঞান	ঐ	...	১৪,০০০ ঐ
ইঞ্জিনিয়ারীং	ঐ	...	১৫,০০০ ঐ
মেডিক্যাল	ঐ	..	৫২,০০০ ঐ
সাহিত্য	ঐ	...	১১,০০০ ঐ
কৃষিশিল্প	ঐ	..	১৪,৫০০ ঐ

একুনে ৭টী কলেজ···১,২৮,০০০ পাউণ্ড ব্যয়।

জাপানগভর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার পরিপোষণে বদ্ধপরিকর।

বিগত ১৮৯৫খ্রীঃ কাইটো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পরিত্যাগ করিলেও কেবল টোকীয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রকল্পে ১ লক্ষ ২৮ হাজার পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ সমূহের সর্ব্বসাকুল্যে ব্যয় পড়ে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ শত পাউণ্ডের অধিক নহে। জর্ম্মান গভর্ণমেণ্টের বার্লীন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিগত ১৮৯১-২ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭ শত ৮০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন ৩৫ বৎসরের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যয়াদিতে জাপান সভ্য এবং প্রতাপশালী ইউরোপীয় জাতিগণের শ্রেষ্ঠ নৃপতিবৃন্দের সমকক্ষ হইয়াছে কিনা। জনৈক বহুদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিত জাপানের শিক্ষাসম্বন্ধে বলেন "জাপানবাসীগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অহঙ্কার করিবার কারণ আছে। জাপানে কেহ আইন ও অন্যান্য বিষয়ের পাঠে যত দিন ইচ্ছা ব্যয় করিতে পারে। আমাদের বাঙ্গালাদেশের ন্যায় তথায় অল্পদিনে তাহারা সমগ্র অধ্যয়ন শেষ করে না।

গভর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন জাপানে আরও কতিপয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে (১) উদার শিল্পের বিশ্ববিদ্যালয় (University of Liberal Arts,) (২) স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) ডশীষা (Doshisha) বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। আমাদের দেশের জনগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপকারীতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

কার্পাস তুলারবীজ হইতে তৈলের ব্যবসা

সকলে অবগত আছেন যে, আমেরিকায় এখন প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হইয়া সমগ্র জগতের বস্ত্রের কলে সরবরাহ হইয়া থাকে। ভারতের কার্পাস চাস বিশেষ বাঙ্গালার চাষ বিলুপ্ত প্রায়। আমরাই দেখিয়াছি, বাঙ্গালা দেশেও কার্পাস প্রস্তুত হইত এবং প্রতি ঘরে ঘরে সেই তুলা হইতে চরকা সাহায্যে সূতা প্রস্তুত হইয়া দেশের জোলা ও তাঁতিদের দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া বহু ভদ্র পরিবার ব্যবহার করিতেন, তার পর বিলাতি সূতার আমদানী বৃদ্ধি হওয়াতেই বোধ হয় এদেশের তুলার চাষ উঠিয়া গেল।

যাহা হউক, সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। এখন এত তুলা যে দেশে জন্মে, সে দেশের তুলার বীজও প্রচুর পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়া নষ্ট হইত, কতক গবাদির খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হইত। আমেরিকার ন্যায় বিজ্ঞানে অগ্রনী দেশে, ইহা কখনও হইতে পারে না, তুলার বীজ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল বাহির করিয়া তাহার খোলগুলি কৃষি কার্য্যে লাগান হইল এবং গবাদি জন্তুর উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য রূপে পরিণত হইল। এক্ষণে এই তুলার বীজের তৈল উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে মানুষেও ব্যবহার করিতেছে, এবং এই পরিত্যক্ত তুলার বীজের তৈল একটা উৎকৃষ্ট অর্থকরী সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার কৃষি বিভাগ এবং ডোমেষ্টিক সায়েন্স ডিপার্টমেণ্টে এই তৈলের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। আমেরিকার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট বা কৃষি বিভাগ নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি প্রদর্শন করিতেছেন; গাহস্থ্য বিজ্ঞান সমিতির কথা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

১। তুলার বীজের তৈল পুষ্টিকর খাদ্য কিনা, সে কথা রসায়ন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আমেরিকার কৃষি বিভাগ বলিতেছেন :— আমরা অনেক খাদ্য-রসায়নতত্ত্ববিদকে ইহা পরীক্ষার জন্য দিয়াছিলাম. তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, তুলার বীজের তৈল পুষ্টিকর খাদ্য। বহু রসায়ন পুস্তকের দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহাতে কোন বিষাক্ত উপকরণ নাই। যাহারা ইহাকে অপুষ্টিকর বলেন, ইহা তাহাদের পক্ষে বিষ হইতে পারে। সাধারণে ইহা প্রতি দিনই ব্যবহার করিতেছেন, কোন বিষাক্ত পদার্থ থাকিলে নিশ্চয়ই বহু লোকের অনিষ্ট বার্ত্তা এতদিন প্রকাশ পাইত।

২। তুলার তৈলের কলে যাহারা কাজ করে, তাহারা কাঁচা তুলার বীজের তৈল ব্যবহার করে, তাহাদেরও কোন অনিষ্টের কথা শুনা যায় নাই।

৩। প্রায় ১০।১৫ লক্ষ লোক লার্ড বা চর্ব্বির পরিবর্ত্তে পরিস্কৃত Purified তুলার তৈল চাটনী এবং আচারের সহিত ব্যবহার করিতে-

ছেন; কোন অনিষ্ট হয় নাই। অন্যান্য তেলের তুলনায় প্রায় শতকরা ৯০ পার্সেণ্ট ইহার কাটতি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং মনুষ্যের সমস্ত খাদ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

৪। চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল এবং ক্ষীণাঙ্গীর চিকিৎসায় এই তৈলকে Tissue Builder বলিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতেছেন।

৫। সমস্ত শরীরতত্ত্ববিদ ও রসায়ন তত্ত্ব-বিদগণ বলেন, চর্ব্বি অপেক্ষা ইহা অতি সহজে পরিপাক হয়।

৬। ইহা লার্ড বা চর্ব্বি অপেক্ষা সুলভ, গরীবেও অনায়াসে ব্যবহার করিতে সক্ষম। পরিপাকের হিসাবে ইহা খাঁটি ঘৃতের সমতুল্য অথচ খাঁটি ঘৃত সমস্ত সাধারণ লোকের পক্ষে সুলভ নহে—মহার্ঘ।

৭। উপসংহারে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত সংবাদপত্র এবং বৈজ্ঞানিক পত্রে ইহা দ্বারা অনিষ্টের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই সকল কারণে কার্পাস বীজের তৈল যে পুষ্টিকর তৈল; তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক ছাড়িয়া দিলেও পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে ইহারা কিরূপে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করিয়া থাকে ইহা দেখিবার ও শিখিবার বিষয়। ভারতের লোকেও কার্পাসের বীজ ভাজিয়া চাল ভাজার সঙ্গে খাইত, আমরা দেখিয়াছি। এখন কার্পাসের চাষ লুপ্ত প্রায়, লোকে সূক্ষ্ম বস্ত্রের পক্ষপাতী, পল্লীগ্রামের তন্তুবায় এবং চরকা অন্তর্হিত হইয়াছে। এ দেশের মৃত্তিকায় কার্পাস জন্মিলেও ইহাতে কৃষকগণ আর লাভ করিতে পারে না, ইহাই এদেশের কৃষকগণের ধারণায় দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু কার্পাসের চাষ করিলে শয্যাদির উপযুক্ত দৃঢ় মোটা বস্ত্র গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য ও প্রস্তুত হইয়া বহু অর্থ অর্জ্জিত করা যাইতে পারে, তাহা কেহ এখন বুঝিতে চাহেন না। এ দেশে পুনরায় খুব ব্যাপকভাবে কার্পাসের চাষ হওয়া উচিত

শিল্প-প্রসঙ্গ
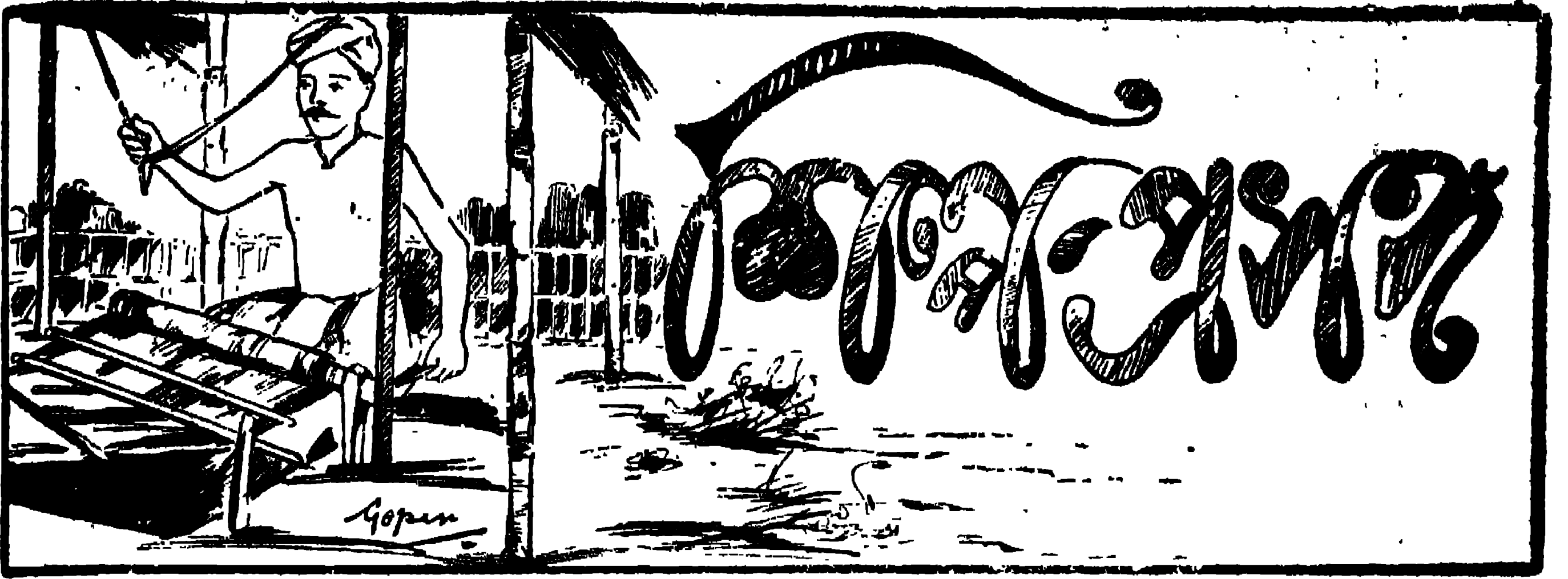
আধুনিক দর্পণ প্রস্তুত প্রণালী

আধুনিক যে প্রণালীতে দর্পণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণিত হইল :—

দর্পণ প্রস্তুতের জন্য যে কাচগুলি ব্যবহার হয়, উহা অতি স্বচ্ছ ও বেদাগ হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ [illegible], জলেটের গ্লাসই ভাল। ঐ কাচগুলি কলাই করিবার জন্য দুই প্রকার solutions বা জল প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। ঐ দুই প্রকার জল প্রস্তুতের জন্য distilled water বা পরিশ্রুত জল, নাইট্রেট সিলভার, কষ্টিক্ (ক্রিষ্ট্যাল্) সোডাটার্ট ও লাইকার্ এমোনিয়া আবশ্যক। ১ম সলিউসন প্রস্তুত করিবার জন্য কোয়ার্ট বোতলের ৬ বোতল ডিষ্টিল্ড ওয়াটার একটী কাচ পাত্র বা এনামেলের পাত্র করিয়া উনানে বসাইয়া জ্বাল দিতে থাক; যখন জল খুব ফুটিতে থাকিবে, তখন উহাতে ১৪০ গ্রেণ সোডা টার্ট নিক্ষেপ কর, সোডা জলে গলিয়া যাইবার পর ১৪০ গ্রেণ কষ্টিক্ ক্রিষ্ট্যাল উহাতে ফেলিয়া দাও। দিবামাত্র জলটী কাল হইয়া যাইবে। পরে ঐ জলটা উনান হইতে নামাইয়া রাখ। ঠাণ্ডা হইলে ফিলটারিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া কাল বোতলে পুরিয়া রাখ। কারিকরেরা ইহাকে কাল জল বলে। ২য় সলিউশন করিবার জন্য সাত বোতল ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ও ২০০ গ্রেণ নাইট্রেড সিলভার ক্রিষ্ট্যাল আবশ্যক। একটী স্বতন্ত্র কাচ পাত্রে অর্থাৎ যে পাত্রে কাল জল প্রস্তুত করিয়াছ, সে পাত্র ব্যবহার করিবে না। অন্য একটী পাত্রে ৭ বোতল ডিষ্টিল্ড ওয়াটার রাখ। উহা হইতে ২ আউন্স আন্দাজ জল একটী স্বচ্ছ কাচের গেলাসে করিয়া তুলিয়া লও। ঐ গেলাসের জলে ২০০ গ্রেণ কষ্টিক্ ক্রিষ্ট্যাল্ ফেলিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কষ্টিকের দানাগুলি গলিয়া যায় ততক্ষণ ঐ গেলাসটী নাড়িতে থাক। গেলাসটী এক হাতে এরূপভাবে নাড়িতে থাক, যেন উহার ভিতরের জল চক্রাবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে এবং অপর হাতে ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র দ্বারা ধীরে ধীরে এক এক ফোঁটা করিয়া লাইকার্ এমোনিয়া ঢালিতে থাক। ২।১ ফোঁটা এমোনিয়া ঢালিলেই জলটা প্রথমে ঘোলা হইয়া যাইবে, পরে ফোঁটা ফোঁটা ঢালিতে ঢালিতে

জলটা পুনরায় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইবে। যখন দেখিবে, স্বচ্ছ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর এমোনিয়া দিবে না। পরে ঐ গেলাসের জলটা কাচ পাত্রস্থ জলে মিশাইয়া ফেল। ১ম সলিউসনের ন্যায় ইহাও ফিল্টারিং কাগজে ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখ, কারিকরগণ ইহাকে সাদা জল বলে। সাবধান কাল জল প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত ফুঁদিল, বোতল ও পাত্রাদি যেন সাদা জলের জন্য ব্যবহার করিও না। সমস্ত নষ্ট হইবে।

পরে কাচগুলি বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। পরিষ্কার কাগজ লইয়া একটী সমতল টেবিলের উপর এক এক খানি করিয়া পাতিয়া রাখ। টেবিলটার উপরিভাগে সরু সরু তক্তা দ্বারা নির্ম্মিত ও তক্তাগুলি ৩।৪ ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করিয়া আঁটা থাকিবে এবং প্রতি জোড়া তক্তা এরূপ সমতল করা চাই, যেন উহার উপরিস্থ কাচগুলিতে জল ঢালিলে গড়াইয়া না পড়ে। পরে কাচের Jugএ অল্প পরিমাণ কাল জল ও সাদা জল মিশাইয়া কাচগুলির উপর ঢালিয়া দাও। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিবে যে কাচগুলির উপরিস্থিত জলের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। যখন বর্ণ পরিবর্ত্তন ক্রিয়া শেষ হইবে, তখন টেবিলের নীচে হেঁট হইয়া তক্তার ফাঁক দিয়া কাচগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তোমার প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। তখন এক এক খানি কাচের কিনারায় হাত দিয়া উঠাইয়া উপরিস্থ জল ফেলিয়া দিয়া কাচগুলি শুকাইয়া লও। সাবধান, যেন কলাই করা পৃষ্ঠে হাত না লাগে, তাহাহইলে কলাই উঠিয়া যাইবে। কেহ কেহ উক্ত কলাইয়ের উপর বার্ণিসের সঙ্গে মেটে সিন্দুর মিশাইয়া কোমল তুলি দ্বারা রং করে। কারণ রং শুকাইয়া গেলে হাত লাগিলেও আর কলাই উঠে না।

এইক্ষণে ঐ কলাইয়ের কাচগুলি কাঠের বা তোমার ইচ্ছানুরূপ অন্য কোন ফ্রেমে বাঁধিয়া ফেল। এইরূপে দর্পণ প্রস্তুত হইল। উপরোক্ত পদ্ধতিতে আমি করিয়াছিলাম এবং ইহাই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এই দর্পণ প্রস্তুতের কাজ বেশ অর্থকরী, এক্ষণে কলিকাতায় অনেক মুসলমান শিল্পি দর্পণের কাজ করিয়া থাকেন। পারদ সাহায্যে দর্পণ প্রস্তুত বিপজ্জনক, সেইজন্য বর্ত্তমান পদ্ধতিই অবলম্বন করা বিধেয়।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস।

মনে রাখিবার কথা

লর্ড রোজবেরী বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কেবল বাণিজ্যেরই সমর হইবে, অস্ত্র যুদ্ধ থামিয়া যাইবে। তাই হইতেছে।

—⁂—

মানুষের চরিত্র, চক্ষু এবং কর্ণ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। দেখ, শুন, আর বহুদর্শিতা দ্বারা চরিত্রের পরিপুষ্টতা লাভ কর।

—⁂—

দুঃখ কষ্টত চিরকালই আছে! তাহাতে বিষন্ন হও কেন? হতাশ হইও না। স্বার্থপর! কেবল নিজের দুঃখ ভাবিয়া কাতর হইবে, আর বিষাদ-কালিমা মণ্ডিত মুখ দেখাইয়া জগতকে বিষাদিত করিবে? যাও একবার রাজপথে যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখ, তোমাপেক্ষা কত দুঃখী কত শোকাতুর, কত অনাথ, ধূলায় ধূসরিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সুখের সঙ্গে দুঃখ এত সংমিলিত যে, দুঃখ বাদ দিয়া কদাচ সুখ পাইবে না, সর্ব্বদাই আনন্দে রহ—কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর।

—⁂—

যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই জীবনের মমতা বেশী করিয়া থাকে। এই রোগ সংক্রামক, দুই দিন অতি বড় সাহসীর নিকট থাকিলেও তাহাকে সংক্রামিত করিয়া তুলে।

—⁂—

"Fox praises his own tail" প্রত্যেক শৃগাল তাহার নিজের পুচ্ছটীরই প্রশংসা করে। বাঙ্গালীর সকলেই 'হাম বড়া' সে যখন তাহার নিজের যুক্তি দেখাইবে, ভুল বুঝিলেও তাহা স্বীকার করিবে না। নিজে কি বুঝিতেছ? যাহা নিজে ভাল বুঝিবে, তাহাই ঠিক। কারণ স্বাভাবিক বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট বুদ্ধি। Common sense is good sense

—⁂—

পৃথিবীর ৭টী আশ্চর্য্য বস্তু।

বর্ত্তমান জগতের সাতটী অশ্চর্য্য দ্রব্য কি, করনোয়াল ইউনিভারসিটীতে একবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাহাতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে, তারবিহীন টেলিগ্রাফ্ এবং টেলিফোন, সিন্থিটিক কেমিষ্ট্রী, রেডিয়ম, এ্যান্টিটক্সিন, এরোপ্লেন, অ্যাভিয়েশন, এবং পানামা ক্যানেল এই ৭টীই আশ্চর্য্য দ্রব্য।

—⁂—

লোকের ভাল করিবার উপায়।

জনৈক অভিজ্ঞ লেখক বলিতেছেন—"Try to make at least one person happy every day and then in ten years you may have three thousand six hundred and fifty persons happy" অনেকে বলেন যে, এক আধ জনের ভাল করিয়া আর কি এমন বড় কাজ হইবে, সেইজন্য জনৈক অভিজ্ঞ বলেন যে, প্রত্যেক দিন যদি ১ জনেরও উপকার করিতে পার, তাহাহইলে ১০ বৎসরে ২০৬৫০ জনের উপকার করা হইবে, কিন্তু একজনের উপকার করাই ত শক্ত কথা। পরের উপকার করা ত দূরের কথা, নিজের উপকারের কথাই মনে আসে কৈ?

—⁂—⁂—

ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত

শত শত ইংরাজ এবং আমেরিকানের মধ্যে আমরা নিম্নে মাত্র জন কয়েক ব্যক্তির নাম দিলাম, যাঁহারা অতি হীন অবস্থা হইতে আজ সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা অতি সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায়, সাহস এবং ধৈর্য্যের বলে সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন; ইহাদেরমূলধন কিংবা কোন সহায় সম্বল ছিল না। শুদ্ধ সময়ের সদ্ব্যবহার ও অধ্যবসায় লইয়া আজ তাঁহারা ধনকুবের হইয়াছেন।

Lord Strathcona এক্ষণে High Commissioner for Cannada ইনি একজন সামান্য Junior clerk রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া ছিলেন। লর্ড মাউণ্ট ষ্টিফেনস্ একজন মেষরাখাল ছিলেন, এক্ষণে লর্ড হইয়াছেন।

লর্ড পিরি—ইনি এখন শ্রেষ্ঠ জাহাজ নির্ম্মাতা (Ship Builder). ইনি ছিলেন আফিসের ছোকরা পেয়াদা (Office Boy)

W. H. Lover মসলার দোকানের কর্ম্মচারী ছিলেন, আজ ইনি স্যার ডবলিউ, লভার! গাম্বোজ—সেলাইয়ের দেকানের সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, এখন ইনি মিষ্টার হইয়াছেন।

আমেরিকায় এনড্রু কারনেজী জগদ্বিখ্যাত ধনকুবের—দাতা, অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইনি ছিলেন Bobbin Boy.

মিঃ টি এ, এডিশন, যিনি আজ অদ্বিতীয় আবিস্কারক, বলিয়া সমগ্র জগতে বিখ্যাত, তিনি সংবাদপত্রের ফেরিওয়ালা বালক (News) boy) আজ ইহারই অদ্ভুত উদ্ভাবনা শক্তিতে গ্রামোফোন ফটোগ্রাফ প্রভৃতির সৃষ্টি।

মিঃ চার্লস্ এম্ শোয়ার—ইনি একজন আমেরিকান ধনকুবের, ইনি ছিলেন ষ্টেজ-কোচ ড্রাইভার বা বড় গাড়ীর কোচম্যান।

স্যার রাজেন্দ্র মুখার্জ্জী, বটকৃষ্ণপাল, কৃষ্ণপান্থী, রামদুলাল সরকার প্রমুখ জন কয়েক বাঙ্গালী ছাড়া গোটা বাংলা দেশে এমন একটা জীবনী বর্ত্তমান যুগে দেখাও দেখি, যিনি সামান্য অবস্থা হইতে কিছু সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে উঠিতে পারিয়াছেন? পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় অধ্যবসায়শীল, উদ্যোগী পুরুষ এদেশে অতি বিরল, তাহা না হইলে এদেশের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? এ দুরবস্থাতেও এই কলিকাতা সহরে বা পল্লীগ্রামে যেখানেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, কেবল অলস অকর্ম্মণ্য লোকের বাথান; পেটে ভাত নাই, অথচ পল্লীতে পল্লীতে বালকগণ ক্লাব করিয়া থিয়েটারের রিহার্সাল দিতেছে। এরূপ দেশ উন্নতির আশা করে, ইহা কম আবদারের কথা নহে। সামান্য কোচম্যান হইতে বড় লোক হইবার কথা দূরে থাকুক, দস্তুর মাফিক, বিজ্ঞান পাঠ করিয়াও

এদেশের লোকে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিতে পারে না। কারণ উদ্যোগ নাই, অধ্যবসায় নাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই কিছু নাই,—আছে কেবল ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া আকাশ কুসুম রচনার স্বপ্নবিলাস। না হইবার কারণও অনেক, পড়িয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও দেশের ধনী লোকের বা রাজন্যবর্গের সাহায্য এবং মূলধন পাওয়া যায়না, কাজেই সমস্ত আশা ভরসা উদ্যোগ এবং আয়োজন মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এদেশে মুখের বাহবা দিবার লোক অনেক, কিন্তু পৃষ্ঠপোষক হইবার লোক নাই, গলদ এইখানে।

নবজাত সন্তান পালনের নিয়মাবলী।

নাভি হইতে দুই ইঞ্চি উপরে নবজাত সন্তানের নাড়ী সর্ব্ব প্রথমে বাঁধিবে এবং ফুল হইতে পৃথক করিয়া উহা কাটিয়া ফেলিবে। সন্তানের নাভির নাড়ী একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখিবে, নাড়ীর উপরে কাদা এবং অন্য প্রকার মালিশ ব্যবহার করিবে না, কিন্তু প্রত্যহ একখণ্ড কাপড় বদলাইয়া দিবে।

শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই গরমজলে স্নান করাইবে এবং সত্বর স্তন্য পান করাইবে।

পরিষ্কার গরম জলে প্রত্যহ শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করাইলে ক্ষতি নাই, বিশেষতঃ হাটু কনুই প্রভৃতি গাঁটের নীচের দিক ও চামড়ার ভাঁজ গুলির ভিতর প্রত্যহ ধোয়াইয়া পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ধৌত করাইবার পর গাত্রে তৈল মাখাইতে কোন ক্ষতি নাই।

শিশুদিগের সহজেই বিশেষতঃ রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, কারণ তাহারা গরম কিম্বা ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত নয়। গায়ে ঢাকা থাকিলে বাহিরের বিশুদ্ধ বাতাস সকল ঋতুতেই তাহাদের পক্ষে উপকারী, কেবল বৃষ্টির জলে না ভিজিয়া যায়, তাহাই দেখা দরকার; শিশুরা যতই ফাঁকা বাতাসে থাকিবে, ততই সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

রাত্রিতে শিশুদিগকে আবদ্ধ গৃহে রাখা উচিত নহে, শরীর ভালরূপে আচ্ছাদিত করিয়া জানালা দরজা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া রাখিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া শিশুদিগকে রাত্রে বিনা বস্ত্রে বা সামান্য মাত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া ঠাণ্ডায় ফেলিয়া রাখা ভাল নয়, ইহাই কলিকাতায় অনেক শিশুর মৃত্যুর কারণ। রাত্রিতে এবং শীতকালে শিশুদিগকে ভালরূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা প্রয়োজন।

শিশু যখনই ঘুমাইতে চাহে, তখনই তাহাকে ঘুমাইতে দিবে। কোন শিশু কেবল চীৎকার করিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোন যন্ত্রনা বা অভাব হইতেছে। অনেক সময়ে অল্প বা অন্যায়রূপ আহার করানই শিশুর কান্নার কারণ। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর চক্ষু নির্ম্মল গরম জলে একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় দিয়া সাবধানে মধ্যে মধ্যে মুছাইয়া দিবে। চক্ষু লাল হইলে বা জুড়িয়া গেলে বা সর্ব্বদা পিচুটি পড়িলে ডাক্তার দেখাইবে, কারণ এ অবস্থায় চক্ষুর যত্নের অভাবে অনেকে অন্ধ হইয়া যায়। শিশুদিগের আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

নবজাত শিশুকে স্নান করাইবার পরে মাতা যত শীঘ্র সম্ভব বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য পান করাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত কেবল মাতৃদুগ্ধই পান করাইবে। যদি কোন সময় মাতা বুঝিতে পারেন যে, শিশুটির ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য তাহার স্তনে প্রচুর দুগ্ধ নাই তখন মাতৃদুগ্ধ ছাড়া গাভী কিম্বা ছাগীদুগ্ধ জলের সহিতমিশ্রিত

করিয়া ফুটাইয়া এবং অল্প পরিমাণে চিনি দিয়া পান করাইবে। তিন মাস অবধি গাভী দুগ্ধ সমান পরিমাণ জল বা জলবালির সহিত মিশাইয়া, তিন মাসের পর তিন ভাগ দুগ্ধের সহিত ১ ভাগ জল মিশাইয়া আহার করাইবে। শিশুদিগকে সচরাচর বমি করিতে দেখা যায়, অধিক অথবা অনুপযুক্ত আহারই তাহার মূল কারণ। যদি গাভী কিম্বা ছাগল দুগ্ধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে যাহাতে দুগ্ধ টাটকা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ বাসি দুগ্ধে বমি ও পেটের অসুখ উৎপন্ন হয়।

আমাদের দেশে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই শিশুর নয়নে কাজল দিয়া থাকেন, তাহাতে চক্ষু অতীব নির্ম্মল থাকে। ডাক্তার দেখাইলে সময়ে সময়ে কুফল ফলিয়া থাকে, কাজলে সেরূপ সম্ভাবনা নাই।

বালি শ্বেতসার বিশিষ্ট পদার্থ; শ্বেতসার পরিপাক করিবার যন্ত্রাদি শিশু শরীরে পূর্ণতালাভ করে না। কাজেই জল বার্লী সেবনে শিশুর অনিষ্টেরই সম্ভাবনা।

ফরমুলা ও রিচিপি

স্বর্ণকার শিল্পীদের প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার মশলা

সোনার গহনায় অথবা স্বর্ণনির্ম্মিত অন্যান্য দ্রব্যে রংকরিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী মশলা ব্যবহার হয়,—

১। সোরা (Salt Peter) ৪০ ভাগ
ফট্‌কিরী ৩০ ”
সামুদ্রিক ৩০ ”

২। তরল এ্যামোনিয়া
(Liquid Ammonia) ১০০ ভাগ
সামুদ্রিক লবণ ৩ ”
জল ১০০ ”

উপাদানগুলিকে গরম করুন,—কিন্তু সাবধান ফুটন্ত গরম করিবেন না। ঐ গরম মশলাতে সোনার জিনিসটীকে দুই তিন মিনিট ডুবাইয়া খুব নাড়া চাড়া করুন। তারপর প্রথমতঃ ফট্‌কিরীর জলে এবং শেষে পরিষ্কার জলে ধুইয়া লউন।

আর কয়েকটী ফরমুলা,—

৩। ক্যালসিয়াম্ ব্রোমাইড
(calcium bromide) ১০০ ভাগ
ব্রোমিন (Bromine) ৫ ”

প্রথমত সোনার জিনিসটীকে এই সলিউ-সানে দুই তিন মিনিট ডুবাইয়া নাড়া চাড়া করুন। তার পর সোডিয়াম হাইপো সালফাইট্ (Sodium hyposulphite) সলিউসানে এবং শেষে পরিষ্কার জলে ধুইয়া লউন।

আর দুইটী ফরমুলা,—

৪। ভারডিগ্রীস্ (verdigris) ৩০ ভাগ
সামুদ্রিক লবণ ৩০ ”
রক্ত প্রস্তর (Blood Stone) ৩০ ”
নিশাদল (Sal ammoniac) ৩০ ”
ফিট্‌কিরী ৫ ”

এই সকল উপাদান ভালরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে খুব জোরাল ভিনিগার (Strong vinegar) ঢালিয়া নাড়া চাড়া করিয়া লউন।

৫। ভারডিগ্রীস্ (Verdigris) ১০০ ভাগ
এ্যামোনিয়া হাইড্রোক্লোরেট্
(Hydrochlorte of Ammonia) ১০০ ”
সোরা (Saltpeter) ৬৫ ”
রেতিঘষা তামার গুঁড়া
(copper filings) ৪০ ”

এই সকল উপাদানকে ভালরূপ চূর্ণ করিয়া তাহাতে খুব জোরাল ভিনিগার মিশাইয়া লউন।

কম-দামী সোনা রং করিবার মশলা

সাধারণতঃ ১৮ ক্যারেট্ ও তাহার উপরের সোনা খুব ভাল ও বহুমূল্য। ১৮ ক্যারেটের নীচের সোনা রং করিতে নিম্নলিখিত মশলা বিশেষ উপযোগী। এমনকি সাবধানে প্রয়োগ করিলে ১২ ক্যারেট সোনাও রং করা যায়।

সোরা (Nitrate of Potash)	৪ ভাগ
ফট কিরী (alum)	২ ,,
সাধারণ লবণ (যাহা আমাদের খাদ্য)	২ ,,

এই সকল উপাদান গরম জলে মিশাইয়া মিহি পাতলা লেইয়ের মত করুন। ইহাকে একটী পাত্রে রাখিয়া উত্তাপে ফুটাইতে থাকুন। যে জিনিসটী রং করিবেন, তাহা একখানি তারে ঝুলাইয়া ঐ ফুটন্ত মশলায় ডুবাইয়া রাখুন। ১০ হইতে ২০ মিনিট সময় পর্য্যন্ত এইরূপ ডুবাইয়া রাখিবেন। বড় জিনিস হইলে একটু বেশী সময় রাখা দরকার। তারপর জিনিসটীকে তুলিয়া বুরুশের দ্বারা গরম জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লউন এবং পুনর্ব্বার কয়েক মিনিট সেই ফুটন্ত লেইয়ের মধ্যে ডুবাইয়া রাখুন। আবার তুলিয়া পূর্ব্বের মত বুরুশের দ্বারা গরম জলে ধুইবেন। প্রয়োজন মত আর দুই একবার ঐরূপ করিয়া শেষে সাবান ও গরম জলে ভালরূপে ধুইয়া বক্স্-উড্ (Box wood) কাঠের করাতের গুঁড়ার ভিতরে রাখিয়া দিবেন। কিছুক্ষণ পরে যখন দেখিবেন, জিনিসটীতে উজ্জ্বল সোনার রং ধরিয়াছে, তখন বাহির করিয়া লইবেন। এই মশলার দ্বারা ১২ ক্যারেটের নীচেকার সোনাতে রং ধরান যায় না। ১২ ক্যারেটের সোনাকে রং করিতেও খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সোনার গহনার লাল আভাযুক্ত রং ধরাইবার মসলা,—

লাল রংয়ের আভাযুক্ত রং ধরাইবার জন্য শিল্পীরা সোনার গহনায় বার্ণিশ মাখাইয়া থাকে। নিম্নে তাহার কয়েকটী ফরমুলা দেওয়া হইল,—

১। গালা (Shellac)	৬৫ ভাগ
বীজগালা (Seed-lac)	৩৫ ,,
ড্রাগন-রক্ত Dragon's blood)	৫০ ,,
গ্যাম্বোজ (Gamboge)	৫০ ,,
য়্যালকহল (Alcohol)	৪০০ ,,

প্রথম চারিটী উপাদানকে য়্যালকোহলে গলাইয়া লউন। অদ্রবণীয় মসলাগুলি তলায় পড়িয়া থাকিবে। উপরের পরিষ্কার সলিউ-সানকে অন্য পাত্রে আস্তে আস্তে ঢালিয়া পৃথক করুন এবং তাহার সহিত ৭৫ ভাগ ভিনিস্ তার্পিণ (Venice turpentine) মিশ্রিত করুন। প্রথম চারিটী উপাদানের ভাগ মাপের একটু পরিবর্ত্তন করিলে উজ্জ্বল সোণালী পীত আভা হইতে তামার মত রং পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বুরুশ দিয়া বার্ণিশটী লাগাইতে হয়। শুকাইলে য়্যালকহলে এক টুকরা পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া মুছিয়া ফেলিবেন।

২। হল্‌দে মোম (Yellow wax)	৩২ ভাগ
রেড্-বোল্ (Red bole)	৩ ,,
দানাদার ভারডিগ্রীস্ (Crystallized verdigris)	১২ ,,
ফট্‌কিরি	২ ,,

৩। হলদে মোম (Yellow wax)	৯৫ ভাগ
রেড্-বোল (Red bole)	৬৪ ,,
কলকথার (Colcothar)	২ ,,
দানাদার ভারডিগ্রীস্ (Crystallised verdigris)	৬২ ,,
তামার ছাই (Copper ashes)	২০ ,,
জিঙ্ক্ ভিট্রিয়ল (Zinc Vitriol)	৩২ ,,
গ্রীন ভিট্রিয়ল (Green Vitriol)	১৬ ,,
সোহাগা (Borax)	১ ,,

৪। হলদেমোম	১৯ ,,
জিঙ্ক্ ভিট্রিয়ল (Zinc Vitriol)	১০ ,,
সোহাগার খই (Burnt Borax)	৩ ,,

৫। সোরা (Saltpeter)	৬ ,,
গ্রীন ভিট্রিয়ল (Green Vitriol)	২ ,,
জিঙ্ক ভিট্রিয়ল (Zinc Vitriol)	১ ,,
ফট্‌কিরি (Alum)	১ ,,

এই শেষোক্ত মশলায় সোণালী রং-এর উপর একটু সবুজ আভা থাকিবে।

নকল হীরা তৈয়ারী করিবার প্রণালী

১। মিনিয়াম (Minium)	৭৫ ভাগ
সাদা বালি (White Sand)	৫০ ,,
ভাজা পটাশ (Calcined potash)	১৮ ,,
সোহাগার খই (Calcined borax)	৬ ,,
আরসেনিক ডায়ক্সাইড্ (Arsenic dioxide)	১ ,,

২। সাদা বালি (White Sand)	১০০ ,,
মিনিয়াম (Minium)	৩৫ ,,
ভাজা পটাশ (Calcined potash)	২৫ ,,
সোহাগার খই (Calcined borax)	২০ ভাগ
পটাশ নাইট্রেট্ (দানাদার)	১০ ,,
ম্যাঙ্গানিজ পেরক্সাইড্ (Manganese peroxide)	৫ ,,

উপাদানগুলিকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া মিশাইতে হইবে। সাদা বালিকে অনেকবার হাইড্রোক্লোরিক য্যাসিডে এবং পরিষ্কার জলে ধুইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। অগ্নির উত্তাপে সমস্ত উপাদানগুলি গলিয়া মিশিয়া গেলে ঠিক হীরার মত দানাদার পদার্থ তৈয়ারী হইবে। উহার আপেক্ষিক গুরুত্বও হীরারই প্রায় সমান। কম দামী গহনায় ইহা ব্যবহার করা চলে।

ডায়ম্যানটিন্ প্রস্তুত প্রণালী

বাজারে ডায়ম্যানটিন্ (Diamantine) নামে একপ্রকার অতি কঠিন জিনিস চলতি আছে। উহাও হীরার মত। সোহাগার মধ্যে বোরন (Boron) নামে যে মূল পদার্থ আছে, তাহারই দানাদার (Crystalline) আকৃতি এই ডায়ম্যানটিন্। ১০০ ভাগ বোরাসিক্ য্যাসিড (Boracic acid) এবং ৮০ ভাগ য্যালুমিনিয়াম দানা (Aluminium crystal) গলাইয়া যে মিশ্রিত পদার্থ লওয়া যায়, তাহাকে চলতি কথায় বর্ট্ (Bort) বলে। ইহাই ডায়ম্যানটিন। কখনও কখনও দেখা যায় ইহা বাজার চলতি ডায়ম্যানটিন অপেক্ষাও কঠিন। ইহাতে হীরাও কাটে।

অদাহ্যমান বা fireproof রং

কাঠ ও কাগজের পিস্‌বোর্ড প্রভৃতিকে অদাহ্যমান করিতে হইলে তাহাদের উপর এমন

একটী কোটিং বা আবরক পদার্থ থাকা আবশ্যক, যাহা দ্বারা সহজে অগ্নি স্পর্শ করিতে না পারে।

জনৈক পত্র প্রেরক বলেন যে,—

জল	৭০ ভাগ
বোরাক্স	১৫ ভাগ
এপসম্ সল্ট	১৫ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া কাষ্ঠাদির উপর তুলি দ্বারা মাখাইয়া দিলে অগ্নি হইতে কতকটা রক্ষা করা যায়। উপরোক্ত মিশ্রণের সহিত [illegible] রংও মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

অথবা

সলফেট অফ্ এমোনিয়া	২৫ ভাগ
বোরাক্স	১০ ভাগ
সিরিশ	২৫ ভাগ

এইগুলি ৮০ ভাগ জলের সহিত [illegible] কাষ্ঠের উপর মাখাইয়া দিলেও অগ্নি ভয় নিবারিত হইবে।

এই দুইটী ফরমুলা পরীক্ষা করা উচিত।

পত্রাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা বাণিজ্যে'র গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব, তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের [illegible]

দিবার এবং মাল পত্র বেচা-কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্ত এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্ত

৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ, এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—"ফ্যাও,—ফ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-ভুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান ভুলুক দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, [illegible] লাভবান হওয়া ত দূরের [illegible]

খরচ করিয়া তাঁহাদের [illegible] জবাইয়াছি। কিন্তু [illegible] সম্বন্ধে একটা [illegible] গ্রাহক না হইলে [illegible] কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

[illegible]

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের [illegible] "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার [illegible] অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। [illegible] তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে [illegible] করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, [illegible] সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে [illegible] দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র [illegible] করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি,—

আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ১৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন। গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে [illegible] ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর [illegible] কাগজেই দিব, [illegible] [illegible]

১নং পত্র

নিবেদন এই,

আমি কোন দিন আপনার প্রকাশিত ব্যবসা-বাণিজ্য পড়ি নাই। অদ্য হঠাৎ একখানা পড়িয়া একস্থানে দেখিতে পাইলাম যে, ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে আপনারা নাকি বিনা সঙ্কোচে বিস্তারিত জানাইয়া দেন। অদম্য উৎসাহ বুকে লইয়া তাই আপনাদের নিকট পত্র লিখিতে প্রয়াসী হইলাম।

অনেক দিন যাবৎ ব্যবসায় বানিজ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি; কিন্তু হৃদয়ের আশা হৃদয়েই থাকিয়া যাইতেছে। অদ্য প্রাণে খুবই আশা ভরসা নিয়া আপনাদের নিকট জানিবার প্রার্থী হইয়াছি। কাপড় কাচা সাবান, নানারকমের সুগন্ধি গায়ে মাখা সাবান, এসেন্স, পাউডার তেল, আলতা, এই কয়টা পদ কিভাবে অল্পমূলধনে প্রস্তুত করা শিক্ষা করা যাইতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহা বিস্তারিত জানাবেন। কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা তৈয়ারী হয়, কি কি ফরমুলার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় উহা যদি সবিস্তারে জানান তবে আমার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যদি কোন বইএর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় তবে কোন্ উৎকৃষ্ট বইএর সাহায্য গ্রহণ করিতে বলেন; কোথায় পাইব, দাম কত? আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে কি না, সত্বর লিখিয়া জানান। পত্রের প্রতি উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। আমাকে হতাশ করিবেন না। অনেক বাজে লেখকের স্বাধীন জীবিকা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কোন পুস্তকেই ফ্যাক্টরী খোলা যায় এমন কিছু পাই নাই। তাই আপনাদের শরণাগত হইলাম। এখন আপনাদের উপর আমার জীবন যাত্রার পথ নির্ভর করে। ইতি

বিনয়াবনত
শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল
সাং—ভাঙ্গদী
পোঃ—দিগনগর
ফরিদপুর

১নং পত্রের উত্তর

আপনার পত্র পড়িয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আপনি "আকাশ-কুসুম" রচনা করিতেছেন। আপনি আশা করেন, আমরা দু'চার লাইনের একখানি পত্র লিখিয়া সাবান, তেল, এসেন্স, পাউডার প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার প্রণালী আপনাকে জানাই। আপনি আমাদের পত্র পাইবার দু'দিনপরেই একটী ফ্যাক্টরী খুলিয়া বসিবেন এবং ফ্যাক্টরী খোলা হইবার পরদিনই হাজার হাজার টাকার সাবান ও সুগন্ধি তৈল ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া যাইবে এবং আপনি একজন ধনী লোক হইয়া উঠিবেন!

আমরা সাধারণতঃ আমাদের গ্রাহক ছাড়া অন্য কাহারো পত্রের উত্তর দিই না। কিন্তু আপনার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গানো আবশ্যক,—সেইজন্যই উত্তর দিলাম;—বিশেষতঃ আপনার মত আরও অনেকে এইরূপ "আকাশ-কুসুম" রচনা করিতেছেন, তাঁহাদেরও ভুল ভাঙ্গুক।

আজ আঠার বৎসর ধরিয়া আমরা এই "ব্যবসা ও বানিজ্য" পত্রিকায় নানাবিধ ব্যবসায়ের সন্ধান ও বিবরণ, আধুনিক ফরমুলা-নুযায়ী অসংখ্য শিল্পদ্রব্য তৈয়ারীর কৌশল,—

ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান করা এবং তাহাতে সফলতা লাভের উপায় সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে নানা প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বৎসরের পর বৎসর আলোচনা করিয়া আসিতেছি। সেই সকল মহাভারতের মত বিরাট বিষয় আপনাকে দু'চার লাইনের পত্রে লিখিয়া জানাইব,—এই আপনি আশা করেন?

যদি যথার্থই আপনার কারখানার আকারে ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার গ্রাহক হউন,—

এবং পুরাতন ব্যবসা ও বাণিজ্যের বাঁধান সেটগুলি কিনিয়া পড়ুন,—তাহাতে সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারিবেন এবং কোথায় কি পাওয়া যাইবে সমস্ত সন্ধান সুলুক খবরাখবর আমরা জানাইয়া দিব। আপনাকে দুই একবার কলিকাতায় আসিতে হইবে, আমরা আপনাকে সাবান তেল প্রভৃতি দ্রব্যের কারখানার মালিকদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিব,—আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া আপনাকে আর কোন সুপরামর্শ দিতে পারি না।

২নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনাকে দুই রকম শিমুল তুলার নমুনা পাঠাই। এই দুই রকমের মধ্যে যেটী খুব পরিষ্কার সেটীর মণ ৭।০ (সাত টাকা চারি আনা)। যেটীর রং অপেক্ষাকৃত ময়লা সেটীর মণ ৬॥০ (সাড়ে ছয় টাকা)। আমি প্রত্যেক রকমের তুলা পাঁচ মণ হইতে দশ মণ পর্য্যন্ত আপনাদিগকে পাঠাইতে পারি। আপনার পছন্দ হইলে আপনি নিম্ন ঠিকানায় বিস্তারিত বিবরণ সহ পত্র দিবেন। এখান হইতে রেলওয়ে পার্শেল যোগে মাল পাঠান সুবিধাজনক কেননা ষ্টেশন বাজার হইতে এক মাইল দূরে। যাহা হউক আপনার অর্ডার পাইলে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিব। ইতি

শ্রীননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়
কাটোয়া গৌরাঙ্গপাড়া
কাটোয়া—পোঃ
বর্দ্ধমান—জিলা

২নং পত্রের উত্তর

আমরা নিজে কোন জিনিস বেচা কেনার কারবার করি না। আপনার পত্রের মর্ম্ম আমরা এইখানে প্রকাশ করিলাম। শিমুল তুলা ব্যবসায়ীরা আপনার সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে পত্র ব্যবহার করিলে আপনি দরদস্তুর কথা-বার্ত্তা ঠিক করিয়া তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে পারেন। আপনি যদি আমাদের পত্রিকার গ্রাহক হইতেন তবে আমরা নিজেরাই ঐ সব ব্যবসায়ীর নাম ঠিকানা আপনাকে জানাইতে পারিতাম, এবং কারবারে যাহাতে আপনি আরও নানাবিধ সুবিধা পান তাহার চেষ্টা করিতাম।

৩নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য পত্রিকার গ্রাহক। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিস্তারিত সদুত্তর আপনার পত্রিকায় আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

১। Japanese Gloss Starch (জাপানী চক্‌চকে বিশুদ্ধ শটী) কলিকাতায় আমদানী হয় কিনা? যদি হয়,—কোন ঠিকানায় পাওয়া যায় এবং দর কি?

২। কলিকাতায় আমাদের দেশী পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ শটী (Loose) পাওয়া যায় কিনা, যদি পাওয়া যায় কোন ঠিকানায় এবং প্রতিমণ কি দর?

৩। অন্য কোন বিদেশী কোম্পানীর Gloss Starch কলিকাতায় আমদানী হয় কিনা এবং ঠিকানা কি?

৪। শটীর মত দেখিতে অন্যকোনরূপ Starch কলিকাতায় পাওয়া যায় কিনা?

অক্ষয়কুমার গুহ এম্, বি,
টাঙ্গাইল
(ময়মনসিং)

৩নং পত্রের উত্তর

১। Japanese Gloss Starch সম্বন্ধে আপনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিলে বিস্তারিত অবগত হইবেন :—

(ক) Japanese Consulate General 5 & 6, Esplanade Mansions, Calcutta.

(খ) Secretary, Japanese Commercial Museum 15 Clive Street, Calcutta.

(গ) Calcutta Mineral Products Supply Co. Ld. Jackson Lane, Calcutta.

২। শঠি বাঙ্গলা ও আসামের নানা গ্রামে জঙ্গলে জন্মে। কলিকাতায় শঠি বিক্রয় হয় না। কলিকাতায় যে কয় একটী কারখানায় শঠির পালো তৈয়ারী হয়, তাহাতে মফঃস্বল হইতে শঠির চালান আসে।

৩। ফেরিনা, টেপিওকা প্রভৃতি নানাবিধ ষ্টার্চ্চ বিদেশ হইতে আসে। সেগুলি আমাদের ঠিক শঠি নহে,—তবে শঠিজাতীয় বৃক্ষের মূল হইতে প্রস্তুত হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিলে এসম্বন্ধে জানিতে পারিবেন ;—

১। Chemical Trading co. 2, Sukea's Lane, Calcutta.

২। Keymer Bagshawe & Co. Ld. 4, Lyons Range, Calcutta.

কলিকাতার বাহিরের তিনটী ঠিকানাও দিলাম ;

১। Indo British Chemical Co. Kapasiabayar Ahmedabad.

২। Pearl Products Co. Ld. Cawnpore.

৩। Sizing Materials Co. Ld. Hornby Road, Bombay.

৪। শঠির মত অন্য রকম ষ্টার্চ্চও ঐ সব ঠিকানায় পাইবেন।

৪নং পত্র

মহাশয়,

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট একখানা পত্র লেখা হইয়াছিল। প্রায় ১৫।২২ দিন গত হয় আপনি বিচিত্রা পত্রিকাতে ঠিকানা দিয়াছেন যে পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি বৎসরের বাঁধাই সেটের সার সংগ্রহ নমুনা স্বরূপ বিনা মূল্যে পাঠান হয়। দুঃখের বিষয় তাহার কোন সারা শব্দ পাইলাম না। বিশেষ অনুরোধ, পত্র পাঠমাত্র ১৩৪৪ সালের ব্যবসা বাণিজ্যের বাঁধাই সেটের নমুনা বিনা মূল্যে পাঠাইবেন। তাহাতে অন্যথা না হয়। উক্ত ব্যবসা বাণিজ্যের নমুনা প্রাপ্ত হইয়া উহা পড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া পরে গ্রাহক হইব। কিন্তু আগে নমুনা বিনা মূল্যে চাই। মহাশয়, আগে ক্ষতি না দিলে লাভ হয় না। ব্যবসা ও বাণিজ্য নামক মাসিক পত্রিকা খানির সন ১৩৪০ হইতে ১৩৪৫ সালের মধ্যে যত নিকটবর্ত্তী সনের নমুনার ১ বৎসরের সেটের সার সংগ্রহ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন তাহাতে অন্যথা না হয়। অনেক গ্রাহক আছে ; তবে আগে বিনা মূল্যে নমুনা খানা দেখিয়া পরে গ্রাহক হইব নিশ্চয় জানিবেন। বিশেষ অনুরোধ অন্যথা না হয়। নিবেদন ইতি

Jogendra Chandra Debnath
Vill. & Post—Dubail
Dt.—Mymensing

৪নং পত্রের উত্তর

আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার যে বর্ষ-সূচী আছে, তাহাই বিনা মূল্যে পাঠান হয়; পত্রিকার নমুনা বিনামূল্যে দেওয়া হয় না। একথা নিজেই লিখিয়াছেন, অথচ পত্রে ব্যবসা ও বাণিজ্যের বাঁধাই সেটের এক খানা নমুনা চাহিয়াছেন। একহাজার পৃষ্ঠার মহাভারতের মত এক খানা বই বিনামূল্যে বিনা ডাকমাশুলে আপনার বাড়ী পৌছাইয়া দিব এরূপ আব্দার, তাহা আবার গ্রাহক হইবার এবং অনেক গ্রাহক জুটাইয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া চাওয়া কম ধৃষ্টতার পরিচায়ক নহে। পুস্তক খানি পাঠাইবার ডাকমাশুল খরচাই প্রায় এক টাকা। যাহারা বুঝিতে না পারিয়া পাগলামির সহিত ধাপ্পাবাজির পরিচয় দেয়, তাহাদের চিঠির জবাব দেওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। "আগে বিনামূল্যে নমুনা চাই, তারপর গ্রাহক হইব, আরও অনেক গ্রাহক হইবার লোক আছে"—ইত্যাকার ধাপ্পাবাজী এই ১৮ বৎসরের মধ্যে আমাদের ঢের দেখা আছে; সুতরাং জানিবেন,—"এ বড় শক্ত মাটী"। "আগে ক্ষতি না দিলে লাভ হয় না,"—মহাশয়ের এমন সুন্দর ব্যবসায় বুদ্ধি আমাদিগকে শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া নিজেই একবার প্রয়োগ করুন এবং বিনামূল্যের আশা ছাড়িয়া ট্যাকের কড়ি কিছু বাহির করুন।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্তা গৃহিণী হইতে শুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী-সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায় না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

সম্পাদক

কাকের উপর কামানের চোট

*

ধরি মাছ না ছুই পানি

*

গরু মেরে জুতা দান

*

সস্তায়—কস্তায়

*

খেয়া পার হলে পাটনী আমার শালা

*

মিঠা কথায় চিড়া ভিজেনা

*

জিব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি

*

সকল মাছে গু খায় নাম পড়ে চিংড়ীর

*

এক হাতে তালি বাজে না

*

খোদার মার দুনিয়ার বা'র

*

কোথা রাণী রাসমণি
কোথা ক্ষুদে মেছুনী

*

রাণী মরে আনির চিন্তায
কানি মরে দুই চক্ষের চিন্তায়

*

রাজার সঙ্গে সাজা,
কোতোয়ালের সঙ্গে দোহাই

*

মা মরলে বাপ তালুই

*

যত দোষ নন্দ ঘোষ

*

মাসে দুই বছরে বিশ
তার বেশী হলেই ডাক্তারের ফিস্

*

মূর্খের তিন হাসি——
দেখে হাসি, শুয়ে হাসি, ও বুঝে হাসি

*

যেমন দেবা তেমনি দেবী

*

ঠক্ বাছতে গাঁ' উজার

*

আঁতে তিতা দাঁতে নুন,
পেট ভরা তিন কোন,
কানে কচু চোখে তেল,
তার কাছে বৈদ্যি না গেল

*

ঢাল নাই তরোয়াল নাই—
খামচি মারেঙ্গা

*

বেল্লিকের বাড়ীর নিমন্ত্রণ
মা আঁচালে বিশ্বাস নাই

*

লাভের গুড় পিপড়ায় খায়

*

যার প্রতি যার মজে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম

*

দুই নৌকায় পা দেওয়া

*

পথে পথ দেখায়

*

যার মাটি তার লাটী

*

শ্বশুড় বাড়ি মথুরা পুরী
আদর থাকে দিন দুই-চারি

*

উড়তে পারে না চড়া
পাথায় বাঁধে কুটো আর কুলা

*

পরের ঘর থুথুর ডব

*

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই

*

নিদান কালে হরি নাম

*

এক হাড়ি তেল, কাৎ হলেই গেল

*

পোষ্যি——দস্যি

*

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া

*

মিথ্যা কথা বড় দোষ
নাকের আগে বিষফোঁট

*

উলুর পাখা উঠে মরিবার তরে

*

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া

*

নিকুলে ঝিকুলে ঘর
কামালে চামালে বর

*

কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন

*

ফল খেয়ে জল খায়
যম বলে আয় আয়

*

গুয়ের এপিট আর ও পিঠ সমান

*

দা-এরে বালু, কুড়ালরে শিল
দাসীরে লাথি আর বান্দীরে কিল

*

ঠেকলে দাসীর পায় ধরতে হয়

*

সব শিয়ালের একই রব

*

দিনে ডাকাতি

*

ধর্ম্মের ঢোল আপনিই বাজে

*

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি

*

আপনি বাঁচলে বাপের নাম

*

অ্যাঙ্ উজায় ব্যাঙ্ উজায়
খলসে-পুটি বলে আমিও উজাই

*

ধরে বেঁধে প্রেম আর
মেজে ঘষে রূপ

*

যে কয় রাম
তার সঙ্গেই যাম্

*

কয় জন বড় নয়, সয় জন বড়

বোবার শত্রু নাই

*

বড়'র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ

*

ব্যাপার গেল হ্যাপার দিয়া
আসলের দেখা নাই

*

বাহির বাড়ি লণ্ডন
ভিতর বাড়ি ঠন্ ঠন

*

ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামৎ বাড়ে

*

আপনার বেলা ষোল আনা
পরের বেলা চন্ চনা

*

দশ চক্রে ভগবান ভূত

*

শান্তির চেয়ে স্বস্তি ভাল

*

ব'সলে শোবার জায়গা হয়

*

আপন পাঠা লেজে কাটি

*

আরশুলাও পাখী
ফরিদপুরও সহর

*

এক মাঘে শীত যায়না

*

বার রাজপুতের তের হাঁড়ি

*

কান টানলে মাথা আসে

*

কার বা গোয়াল কেবা দেয় ধুঁয়া

*

কাশীতে ভূমিকম্প

*

কাঁথায় হাগ্‌লে যমে ছাড়ে না

*

চেলার নাম বাবাজী

*

চাকরের আবার শ্বশুর বাড়ী

*

মরদ্‌কা বাদ হাতীকা দাঁত

*

মশা মারতে গালে চড়

*

বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়

*

নড়ে চড়ে বার, ঘরে বসে তের

*

পুন পুনে মেঘে সাঁতার

*

ঠেকলে বাঘে ধান খায়

*

লাফ দিলেই বাঘ হওয়া যায় না

*

সভায় গেলেই সভ্য হয় না

*

বানর বুড়া হলেও গাছ বাওন ছাড়ে না

*

চোরের বাড়ী দুর্গোৎসব

ছেলে জন্মালেই বাপ হয়না

*

কুকথা বাতাসের আগে ধায়

*

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে

*

সাপ মেরে লেজে বিষ

*

অহঙ্কারে পুরী নাশ

*

শুইলেই স্বপন দেখে

*

আগে হাটলে সর্ব্বনাশী
পাছে হাটলে পোড়ার মুখী

*

ঠেকলেই বৈরাগী হয়

*

হরে কৃষ্ণ হরে রাম
পরের বোচকা ঘরে আন্

*

ধন জন যৌবন মান
চিরকাল থাকেনা সমান

*

বাপের চেয়ে ছেলে বড়
বাপ জ্যেঠা কয়

*

বিনা লাভে পা বাড়ায় না

*

শাশুড়ী বৌ মিল থাকলে
নাং রাখলে ধরে কে ?

কৃষি সংবাদ

কৃষকের কথা ও ব্যথা

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী)

১। জমি ও চাষী

কাছাড়ের শতকরা ৮০ জন কৃষির উপরই বাঁচিয়া আছে।

মাঠে ফসল করিয়া যে ধান বা শস্য পায় তাহা দ্বারাই স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়া খায়, বাঁচে। ফসল বিক্রি করিয়াই উৎসব, আমোদ, বিলাসিতা, মামলা, মোকদ্দমা, মদ, গাঁজা, ভাঙ, আফিংয়ের নেশা সব কিছু করে।

কাছাড়ের জন পিছু কতটুকু জমি আছে জানেন কি?

গত বৎসর (১৯৩৭ সালে) ৯ লক্ষ বিঘা জমিতে কাছাড়ে ফসল হইয়াছে।

পৌনে ছয় লাখ লোকের ভাগে

মাথা পিছু আমাদের দেড় বিঘা জমি পড়িয়াছে!

২। পতিত জমি

কিন্তু

কাছাড়ে চাষোপযোগী

৩৬ লক্ষ বিঘা জমি এখনও পতিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

আর কৃষক সাধারণ মাটী বা জমির অভাবে হাহাকার করিতেছে।

[কাছাড় জেলার জামিরা, লক্ষ্মীছড়া, কালার হাওর, তুলারজল, সিঙ্গের হাওর প্রভৃতি ফরেষ্ট রিজার্ভ ক্ষেত্রের ভূমি চায আবাদের জন্য গরীব কৃষকদের বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য পরিষদে কংগ্রেস পার্টি চেষ্টা করিতেছেন]

৩। কৃষি ও জমি

কাছাড়ে ১৯৩৭ সালে

ধান উৎপন্ন হইয়াছে---প্রায় ৯ লক্ষ বিঘা জমিতে

চা ফসল হইয়াছে--- ,, ১½ ,, ,, ,,

আখ জন্মিয়াছে— ,, ২২ হাজার বিঘায়।

মোট ফসল ফলিয়াছে--- ১০ লক্ষ ৮৯ হাজার বিঘা জমিতে।

তন্মধ্যে অজন্মা ও বন্যায় কত জমির ফসল প্রতি বৎসর ভাসাইয়া নেয় —জানেন কি?

৪। চাষী ও গোচারণ ভূমি

চাষের—জন্য চাষীর গরু রাখিতেই হয়।

কিন্তু প্রতি বৎসর—

কাছাড়ে চাষী তাদের গো-মহিষকে ঘাস খাওয়ানর জন্য 'গোচারণ ভূমির' খাজনা বাবত সরকারকে

১২০০০্ শত টাকা খাজনা দেয়।

হায় সরকার !!!

৫। সর্ব্বহারা কৃষক

১৯৩০ সালে—ধানের মণ বিক্রি হইয়াছিল

৪্ চারি টাকা হইতে ৫্ পাঁচ টাকা

কিন্তু

১৯৩৮ সালে ধানের মণ বিক্রি হয় ১ টাকা হইতে ১।০ সিকা।

চাষলব্ধ ফসলই চাষীর একমাত্র সম্বল। ৮ বৎসর পূর্ব্বে চাষী ১০ মণ ধান বিক্রয় করিয়া যেখানে পাইত ৪০ চল্লিশ কিম্বা ৫০ পঞ্চাশ টাকা, আজ সেখানে পায় ১০ কিংবা ১২ টাকা। চাষীর টাকার দাম প্রতি টাকায় ৸৹ বার আনা কমিয়া গিয়া।০ চারি আনা হইয়াছে।

কিন্তু কৃষকের

সরকার কিংবা জমিদারের খাজনা—

মহাজনের ঋণ--চৌকিদারের ট্যাক্স।—

লবণ কেরোসীন, দেশলাই ট্যাক্স, কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প ফি, পোষ্ট কার্ডের দাম, রেল ভাড়া, জাহাজ ভাড়া, তৈল, ডাইল, মরিচ, প্রভৃতি নিত্যকার অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম কমিয়াছে কি ?

৬। পেটে-মরা কৃষক

সরকারের খাজনা, মহাজনের ঋণ নিয়মিত দিতে পারে নাই বলিয়া—

১৯৩৭ সালে কাছাড়ে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল —

২১০০০ হাজারেরও উপর

কাছাড়ে মোট রাজস্ব প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অনাদায়ী রাজস্বের জন্য গত বৎসর ২৯৮টী মহাল নিলামে চড়িয়াছিল—দেশের এই নিদারুণ অবস্থায় প্রাণ কাঁদে কি ?

---

*শিলচরের সুরমা পত্রিকায় চাষীর দুঃখ এবং কৃষকের অন্ন সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী একটী তথ্যপূর্ণ এবং সারগর্ভ অথচ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল তথ্যের মধ্যে যদি ভুল অঙ্ক (figures) প্রকাশিত হইয়া থাকে তবে আসামের কৃষি-বিভাগীয় মন্ত্রীর তাহা সংশোধন করতঃ প্রকৃত figures বা অঙ্ক জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা উচিত। আর অঙ্কগুলি সত্য হইলে দেশময় প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত। আসামের শাসন যন্ত্র সম্প্রতি কংগ্রেস পার্টির হাতে গিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় যে এবার এই সকল বিষয়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে। সম্পাদক।
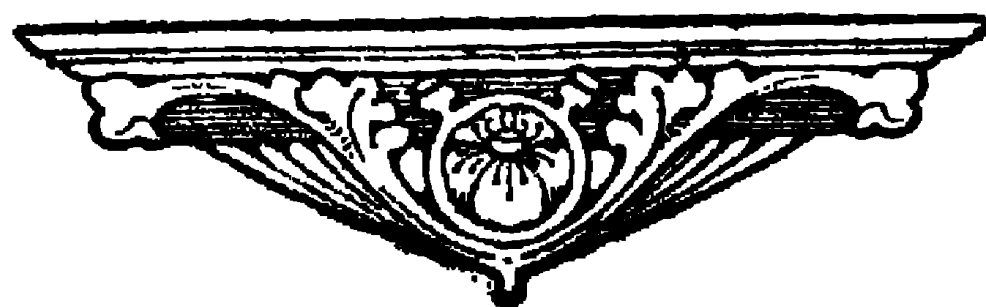
ছোলার চাষ

ছোলাকে চনক, কেহবা চানা প্রভৃতি নানা নামে ডাকিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নাম। ছোলার ডাল, ছোলার ছাতু, ছোলার ব্যাসন্, ছোলার ডালের লাড়ু, মোহনভোগ প্রভৃতি নানা জিনিষ ছোলা হইতে হইয়া থাকে। ইহা একটী পুষ্টিকর ডাল। ছোলার চাষ বেশ লাভজনক; কাঁচা ছোলা হইতে সুপক্ক ছোলা সমস্তই বিক্রয় হয়; কলিকাতা সহরে গাছ ছোলা বিক্রয় করিয়া অনেক লোক ডাল বিক্রয় অপেক্ষা অনেক অধিক লাভ করিয়া থাকে।

চাষের প্রক্রিয়া

সাধারণ খন্দেরই মত ইহার চাস দিতে হয়, শরৎকালে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে দো আঁশ জমী হইতে পাট ও আউশ ধান কাটিয়া লইবার পরই যখন জমিতে বেশ রস থাকে, তখন সেই জমিতে উত্তমরূপে ঘুটে পোড়া ছাই, গোবর প্রভৃতি সার ছড়াইয়া দিয়া উত্তমরূপে চাষ করিয়া তাহার পর ছোলা বুনিয়া দিয়া পুনরায় একটা চাস ও মই দিয়া ছিটা জলে সেচন কার্য্য সমাধা করিতে হয়। তাহার পর যখন চারা বাহির হয়, এবং পাতার ডগ্ বাহির হইতে থাকে, তখন সযত্নে গাছের পাতা ২।৩ বার ছাটিয়া দিলেই গাছ খুব ঝোঁপ পানা হইয়া উঠে। ছোলার চারা রক্ষার জন্য বেড়া দেওয়া উচিত, কিন্তু এদেশে কেহ তাহা করে না। কাঁচা ছোলা গরু বাছুর, ছাগল, ছাড়া মানুষেও ছোলার ক্ষেত হইতে গাছ উপড়াইয়া খাইতে খাইতে চলিয়া যায়, সেই জন্য বেড়া দিলে ক্ষতিটা অনেক পরিমাণে কম হয়।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে ছোলার দানা পুষ্ট ও সুপক্ক হইয়া থাকে, এই জন্য ছোলা পুষ্ট হইলে এবং পাকিলেই ছোলার গাছ সমেৎ ছোলা উপড়াইয়া বা কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিতে হয়, তাহার পর ঝাড়িয়া ইহা হইতে ছোলার দানাগুলি পৃথক করিয়া লইতে হয়। প্রতি বিঘা জমীতে ১০।১২ সের বীজ লাগে. ঐ বীজ গুলি হইতে প্রতি বিঘায় ১৫।২০ মণ কেহ কেহ বলেন ৩০মণ পর্য্যন্ত ছোলা জন্মিয়া থাকে। খুব কম করিয়া ধরিলেও ২০ মণের কম নহে। যদি ছোলা ২৲ টাকা মণ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে তাহার লাভালাভ খতাইয়া দেখাইতেছি, ধরুন জমীর খাজনা—বিঘা প্রতি ৫৲ টাকা হিসাবে ৫৲টাকা। ইহার ভিতর ধান্য চাষের অর্দ্ধেক বাদ দিলে ২॥০ টাকা

লাঙ্গল প্রভৃতির খরচা বাবদ	১॥০ "
ছোলা তুলিয়া আনিবার খরচ	১৲ "
অন্যান্য ব্যয় বাবদ আরও	১০৲ "
মোট	১৫৲ টাকা

আয়ের হিসাব।

উৎপন্ন ছোলা বিঘা প্রতি ২০ মণ ধরিলেও ২০ মণ ২৲ টাকা হিসাবে ৪০৲ টাকা

মোট খরচ ১৬৲ টাকা ধরিলেও দেখা যাইতেছে।

মোট জমা ৪০৲ টাকা মোট খরচ ১৬৲ টাকা
বাদ খরচ ১৬৲ টাকা

২৪৲ বাকী ২৪৲ টাকা লাভ।

সুতরাং ইহা যে একটী লাভজনক চাষ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

ছোলার ডাল উষ্ণবীর্য্য, স্বাদু, মুখরোচক, কাঁচা ছোলা পিত্তনাশক, সারক।

ছোলার চাষ করিবার সময় বীজ পরীক্ষা করিতে হয়; অনেক সময় ছোলা কাট দষ্ট থাকে বলিয়া পরীক্ষা করিয়া ভাল বীজ সংগ্রহ করা উচিত, নচেৎ পণ্ডশ্রম হইয়া পড়ে, সুতরাং ক্ষেত্রে যেরূপ শস্য জন্মান উচিত অনেক সময় তাহা ফলে না। নদীর চরে পলী মাটীতে ছোলা গম ভাল হয়। যেখানে নদী নাই, সেখানে জমীতে সার দিয়াও ইহার চাষ হইয়া থাকে। এদেশের কৃষকগণ ভয়ানক আয়াসী ও বিলাসী। ধান চাস করিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে, আর অন্য চাষ করে কখন? শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য মনোযোগ দেন, তাহা হইলে পুনরায় কৃষকগণ কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারে।

আলুর কালো রোগ।

আলুর কালো রোগ আলুর পক্ষে মড়ক বলিলেই হয়, ইহা দ্বারা পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহের আলুর খুবই ক্ষতি হয়। এখন সমতল ভূমিতেও ইহার উপদ্রব হইতেছে; এই রোগ অতিশয় সংক্রামক, ইহার রোগাঙ্কুবীজ সমূহ অন্যান্য জীব জন্তু, বৃষ্টি এবং বাতাসের দ্বারা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ রোগাক্রান্ত আলুকে সিদ্ধ করিলে যে স্থান আক্রান্ত, তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না। কাটিলে কালো রং দেখা যায় এবং এক প্রকার বিসদৃশ গন্ধ অনুভব করা যায়। এদেশে এইরূপ রোগাক্রান্ত আলুকে আমরা পচা আখ্যা দিই, কিন্তু ইহা পচা নহে কালো রোগাক্রান্ত।

প্রতিকারের উপায়।

চাষের সময়, ভাল সুস্থ বীজ বপন করা উচিত। রোগাক্রান্ত আলু ক্ষেত্র হইতে আনিয়া পৃথক স্থানে রাখা উচিত, নচেৎ ভাল আলুও এই রোগাক্রান্ত হইয়া যাইবে। আলুর গাছে যখন এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইবে, তখন Bordeaux mixture ব্যবহার করা উচিত।

বোর্দ্দো মিকশ্চার প্রস্তুত প্রণালী।

একটা মাটীর জালায় ১ মন শীতল জল রাখিয়া ইহা হইতে ৫ হইতে ১৯ সের জল তুলিয়া লইয়া ইহাতে ৮ ছটাক sulphate of copper অর্থাৎ তুঁতে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর সদ্য পোড়ান চূণের (অর্থাৎ যে চুণ পোড়ান হইয়াছে, কিন্তু এখনও জল স্পর্শ হয় নাই) এইরূপ চূণ, ।৵০ ছয় ছটাক লইয়া চূর্ণ করিয়া সামান্য জল দিয়া আটার মত করিতে হইবে। তাহার পর ইহাতে খানিকটা জল অর্থাৎ তুঁতে গলাইবার জন্য যেমন জল লওয়া হইয়াছিল, সেইরূপ পরিমাণ জলে সম্পূর্ণভাবে গুলিয়া ফেলিতে হইবে। এই তুঁতে গোলা ও চূণ গোলা জলটাকে বড় মাটীর জালায় যে জল আছে, তাহাতে ঢালিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাক। ইহাই হইল, বোর্দ্দো মিকস্চার। একটু শীতল হইলে পরিষ্কার জলের নীচে এক প্রকার নীলাভ তলানি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা।

জলটা ঠিক হইয়াছে কিনা দেখিতে হইলে একখানা ছুরির ফলককে এই জলে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলেই যদি ছুরির ফলাটা তামা রঙ্গের হইয়া যায়, তাহা হইলে এই মিক্শ্চার ঠিক হয় নাই বুঝিতে হইবে, তখন ইহাতে আরও কিছু চুণ মিশান আবশ্যক; যদি ছুরির ফলার রঙ্গের কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। প্রতি বিঘা জমীতে মোটামুটী ৩ মণ উক্ত আরক বা মিকশ্চার দিবসে একবার ছিটাইয়া বা ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। খুব

খারাপ অবস্থায় ৩ বার দৈনিক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই মিকশ্চার ছিটাইবার অনেক প্রকার "স্প্রে বা কল" বাহির হইয়াছে, তাহাতে ২০ সের মিকশ্চার ধরিয়া থাকে, মূল্য ৬০৲ টাকা। বাকেট পম্প নামক আর এক প্রকার কল আছে, তাহা দ্বারা অল্প স্থানে বেশ কাজ হয়, মূল্য ১১৲ টাকা।

কৃষির মাসিক ডাইরী

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষি

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই আলুর চাষের প্রশস্ত সময়, তবে অগ্রহায়ণ মাস পর্যান্ত আলু বপন করা যাইতে পারে।

পটল, মুলা, বিট, মটর, টোমাটো, সিলেরী প্রভৃতিও কার্ত্তিকমাসে বপন সমাধা না হইলে এই মাসেই করিয়া ফেলা সঙ্গত।

কোন কোন স্থলে ফুলকপি বাঁধা কপির চারাও এই সময় লাগান হইয়া থাকে। শীত প্রধান স্থানে বিশেষ করিয়া আসামে ও হিমালয়ের তরাই প্রদেশে অগ্রহায়ণ মাসে ফুল ও বাঁধাকপির চারা লাগান হয়। নিম্ন বঙ্গের কপির চারা লাগান কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই শেষ করা কর্ত্তব্য, বাকী থাকিলে অগ্রহায়ণ মাসের গোড়াতেই লাগাইয়া ফেলিবে, কাল বিলম্ব করিবেনা।

তরমুজ, খরমুজ, লাউ, কুমড়া, ভুঁয়ে শশা, করলা, উচ্ছে, কাঁকুড়, পেঁয়াজ, মটর, পালম শাক, লাল শাক, প্রভৃতির বীজ এই সময় বপন ও রোপন করা আবশ্যক।

যে সমস্ত কপিরচারা ও বিদেশী সব্জী বীজ কার্ত্তিক মাসে বসান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এই সময় পরিচর্য্যা করা বিশেষ আবশ্যক। গাছ বেশ বসিয়া গেলে প্রথমতঃ সেই সমস্ত গাছের গোড়ায় মাটী টানিয়া উঁচু করিয়া দিবে। লাউ, কুমড়া, শশা, তরমুজ, খরমুজা প্রভৃতির গাছ বাহির হইয়া থাকিলে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বে রোপিত আলু ও বিদেশী সব্জীর ক্ষেতে এই সময় জল সেচন করা চলিতে পারে। আকের জমিতে জল সেচন করিয়া আকের পাতা বাঁধিয়া দেওয়া এই সময়ের কাজ।

যব, গম, ছোলা, মুগ, মটর প্রভৃতি রবিশস্য অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বে বপন করা সঙ্গত, সে সময়ে উহা বপন না হইয়া থাকিলে কাল বিলম্ব না করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের গোড়াতেই উহা শেষ করিবে।

মুসুর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই বপন করা কর্ত্তব্য। তামাকের চারাও এই সময় রোপন করা কর্ত্তব্য।

বেগুন, লঙ্কা ও কার্পাস এই সময়ে চয়নের উপযুক্ত হয়।

ভার্বেনা, এন্তাইরেন্থিয়া, ডায়েন্থাস, সুইটপি, ক্ল্যাশটারসিয়াম, ফ্লক্স, এষ্টার, প্যান্সি, পিটুনিয়া মিগ্নোনেট্, প্রভৃতি মরশুমি ফুল কার্ত্তিক মাসে লাগান না হইয়া থাকিলে এই মাসে অবিলম্বে উহা লাগান উচিৎ। মরশুমি ফুল বীজের চারা সংগ্রহ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই লাগাইতে পারিলে ভাল হয়।

গোলাপ গাছের যে সমস্ত ডাল হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে ছড়াইয়া পড়ে, সেগুলি এই সময় ভাল করিয়া ছাটিয়া দিতে হইবে। ডাল ছাটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৭ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া লইয়া গাছের গোড়ায় নীরস জমি হইলে তরল সার এবং সরস জমি হইলে গুড়া সার প্রয়োগ করিবে। মার্শালনীল প্রভৃতি লতানিয়া গোলাপের ডাল ছাটিবার আবশ্যক করে না; হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, এজন্য সেগুলির গোড়া ঘেসিয়া ছাঁটিবার আবশ্যক নাই। যে সব ডাল অত্যন্ত পুরান এবং যে গুলি শুকাইয়া আসিয়াছে সেগুলি ছাঁটিয়া একেবারেই বাদ দেওয়া আবশ্যক। Pruning shear ব্যবহারে ডাল ছাটিবার কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়।

পচা গোবর সার, সরিষার খইল, পচা পাতা সার ও প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া গোলাপ গাছে সার হিসাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে। মিশ্রিত বস্তুর সহিত ভূষি মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। কারণ ভূষির সার ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল করে। পুরাতন পাকাবাড়ীর রাবিশ চূর্ণ গোলাপের ভাল সার অভাবে পোড়া মাটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। রাবিশ বা পোড়ামাটীর সহিত সামান্য গুড়া চুণ মিশাইয়া গোলাপ গাছের গোড়ায় দিলে ফুলের সংখ্যা বেশী হয়।

পিঁয়াজের বপনও অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। মাটিতে কিম্বা গামলায় বীজ বপন করিয়া মাটি চাপা দিয়া উত্তমরূপে চাপিয়া দিবে কারণ পিঁয়াজের বীজ উত্তমরূপে চাপিয়া না দিলে বীজ অঙ্কুরিত হইবে না। পিঁয়াজ পুতিলেও চাষ হয়। পিঁয়াজ চাষের জন্য জলের দরকার খুব বেশী, এই জন্য পিঁয়াজের চাষ নদী, খাল কিম্বা যে স্থানে জল সহজে পিঁয়াজ ক্ষেতে দিবার জন্য পাওয়া যায় সেইরূপ স্থানে করিতে হয়।

পিঁয়াজের জমি খুব গভীর করিয়া চাষ করিবে এবং ছাই, খইল, চুণ পচা গোবর ও পটাশ প্রয়োগ করিবে। চারাগুলি ৩।৫ ইঞ্চি বড় হইলে মাটি হইতে তুলিয়া বড় জাতীয় পিঁয়াজের চারা বিঘৎ অন্তর ব্যবধানে সারবন্দী ভাবে লাগাইবে। একটী সারের সহিত অপর সারের ব্যবধানও একহাত হওয়া আবশ্যক। ভালভাবে চাষ করিতে পারিলে প্রতি বিঘায় ১০০।১২৫ মণ পিঁয়াজ ফলিতে পারে।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

গত ৭ই অক্টোবর মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও শ্রমিক বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ভি ভি গিরি বোম্বাইর শ্রমিক নেতাদের সহিত এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, গবর্ণমেণ্ট "বেকার-বীমা" (unemployment insurance) সম্বন্ধে একটী আইন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এযাবৎ কোন প্রদেশেই এইরূপ আইন প্রচলিত হয় নাই। বেকার অবস্থায় শ্রমিকদের দুর্দ্দশা লাঘব করাই আইনের উদ্দেশ্য।

আমরা অবগত হইলাম "ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটীর" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই নাম পরিবর্ত্তন মঞ্জুর করিয়াছেন। সোসাইটীর হেড আফিস ৮।২নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট হইতে ১০০ চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ "হিমালয়-হাউস" ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পুরাতন আপিসে সোসাইটীর হাইকোর্ট ব্রাঞ্চ থাকিবে।

মেট্রোপলিটান ইনস্যুরান্স কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ বি বি মজুমদারকে কর্ত্তৃপক্ষগণ সেক্রেটারীর পদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে উক্ত কোম্পানীর অর্গানাইজিং অফিসার মিঃ এ বি চ্যাটার্জ্জি এম. এস. সি. সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তিকেই যোগ্য পদে উন্নীত করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

মিঃ এন এস ব্যাঙ্কট সুব্রহ্মণ্যম্ ব্যাঙ্গালোরের মহীশূর ইনস্যুর্যান্স কোম্পানীতে কার্য্য

করিতেন। গত ২রা জুলাই তারিখ হইতে তাঁহার কাজে জবাব হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার সহিত কেহ কোন কারবার করিলে তার জন্য কোম্পানী দায়ী হইবেনা, এইমর্ম্মে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মিঃ ডি শেষ আইয়ার এম্ এ, এ আই এ, আজমীরের জেনারেল য়্যাস্থর্যান্স্ সোসাইটীর য়্যাকচুয়ারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

আগামী ১৯৪০ সালের ২৪শে জুন হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্ণ সহরে দ্বাদশ আন্তর্জ্জাতিক য়্যাকচুয়ারী কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

ভারত ইন্সুর্য়্যান্স্ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি ডি খোস্লা গত ১লা অক্টোবর হইতে উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুনাযায়, তিনি শীঘ্রই একটী নূতন ইন্সুর্য়্যান্স্ কোম্পানী গঠন করিবেন।

গ্রেট্ পেনিনস্থলার ইন্সুর্য়্যান্স্ কোম্পানি ডিপজিট্ সম্বন্ধে বার বার আইন লংঘন করায়

ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর গণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

—※—

ইণ্ডিয়ান মেডিকাল য়্যাসোসিয়েশনের মুজাফর নগর, ঝাঁসী, এলাহাবাদ, মুঙ্গের, এবং কাঁকুড়গাছি শাখা সমূহ পৃথক পৃথক সভা করিয়া বীমাসম্পর্কিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মেডিক্যাল ফিস কমাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেই সকল সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ১০০০৲ টাকার বীমায় সর্ব্বনিম্ন ৮৲ টাকা ফিস্ না পাইলে কোন ডাক্তার বীমাপ্রস্তাবকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন না।

—※—

আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স্ কোম্পানী ভারতীয় বীমার নূতন কারবার বন্ধ করিবেন।

—※—

হিন্দুস্থান কো অপারেটিভের স্পেশ্যাল এজেন্ট্ মিঃ ভি পি জোসান এজেন্টদের ইন্স্পেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সোসাইটীর লাহোর ব্রাঞ্চের অধীন লায়ালপুর নূতন ইউনিট আপিসে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

—※—

মেসার্স্ রাউ এণ্ড কোং (মালিক, মিঃ আর রায়) ম্যাঙ্গালোরের পপুলার ইনস্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর আসাম, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার চীফ্ এজেন্ট্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

—※—

তরুণ য়্যাস্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট্ মিঃ জে এম্ মেটা উক্ত কোম্পানীর সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—※—

ভারত ইন্স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর স্পেশ্যাল এজেন্ট্ মিঃ সনৎকুমার সাম বি. এ উক্ত কোম্পানীর মালদহ আপিসে ইন্স্পেক্টার অব এজেন্টস্ পদে উন্নীত হইয়াছেন।

—※—

গয়াল ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং নেপচুন ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর বিহারের (ছোটনাগপুর বিভাগ ছাড়া) চীফ এজেন্টস নিযুক্ত হইয়াছেন।

—※—

শুনা যায়, ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে নূতন বীমা আইন কার্য্যকরী হইবে। ইতিমধ্যে ব্যবস্থাপক সভায় ডিপজিট প্রভৃতি সম্পর্কে নূতন আইনের কয়েকটী পরস্পর বিরোধী ধারার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পুনশ্চ একটী সংশোধন বিল উপস্থিত করা হইবে।

—※—

আজমীরের জেনারেল ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি জি ম্যারাথে য়্যাকচুয়ারী বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড গমন করায় সেই পদে য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ব্রহ্ম দত্ত বি এস সি, এল এল বি নিযুক্ত হইয়াছেন।

—※—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর লাহোরের হিন্দুস্থানী বীমা কোম্পানীর অংশীদারদের এক সভায় স্বেচ্ছামূলকভাবে এই কোম্পানীর কারবার গুটাইয়া দেওয়া সম্পর্কে একটী প্রস্তাব পাশ হয়। চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট মিঃ এস পি চোপরা উহার লিকুইডেটর নিযুক্ত হইয়াছেন।

—※—

সেন্ট্রাল য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী ১৯৩৭ সালে ১১১৪৫৫০ টাকার নূতন বীমার কারবার

করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল, ১০০৫৫৫০ টাকা।

আর্য্যস্থান ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীর ১৯৩৭-১৯৩৮ (এপ্রিল মার্চ) সালের নূতন কারবারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১৭২০০০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৬-৩৭) ইহার পরিমাণ ছিল, ১০২৬০০০ টাকা।

হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর পাটনা ব্র্যাঞ্চের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী মিঃ সমরেশ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি দিল্লী ব্র্যাঞ্চের চার্জ্জে উন্নীত হইয়াছেন। ইনি বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পরলোকগত মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃতী পুত্র। দিল্লী একদিকে যেমন সমগ্র ভারতের রাজধানী তেমনি ভারতীয় আর্থিক সংস্থানের কেন্দ্রস্থান। মিঃ চক্রবর্ত্তী এইবার তাঁহার প্রতিভা দেখাইবার উপযুক্ত সুযোগ এবং অবসর পাইয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগ, আয়োজন এবং প্রচেষ্টা সফল হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে লক্ষ্মী সমগ্র ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের সকলের অপেক্ষা বাংলা ব্র্যাঞ্চের কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে; সকলেই বাগচীর কৃতিত্বের তারিফ করিতেছে, কিন্তু হইলে কি হয়, বামুনের কপাল পাথর চাপা এ প্রবাদ এদেশে বহুকাল ধরিয়া চলিত আছে।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সম্প্রতি বাঁকুড়ায় একটী ব্র্যাঞ্চ খুলিয়াছেন। বাসন এবং বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিশেষতঃ তসর ও মটকার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঁকুড়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এইজন্য বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এই শাখা স্থাপনে ব্যবসায়ীদিগের কাজের খুব সুবিধা হইবে।

ইন্সিওরেন্স এ্যাকাডেমী সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায়ের পত্র

দি ইন্সিওরেন্স এ্যাকাডেমী

৮৮, [illegible]
ক্যালকাটা
১৯-৯-৩৮

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক সমীপেষু—
৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিনীত নিবেদন,

আপনার ভাদ্র সংখ্যার পত্রিকায় ইন্সিওরেন্স অ্যাকাডেমী সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইন্সিওরেন্স অ্যাকাডেমি সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আপনি মন্তব্য করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে সমস্ত বিষয় আপনি অবগত থাকিলে আপনার মত উদারচেতা ও বীমা ব্যবসায়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কখনই এরূপ মন্তব্য করিতেন না।

প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে কোনও প্রতিষ্ঠান বিশেষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতায় এমন কোনও প্রতিষ্ঠান এখন নাই যেখানে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বীমা কর্ম্মীরা মিলিত হইতে পারে। অ্যাকাডেমির ইহাই প্রথম বিশেষত্ব। দ্বিতীয়তঃ এপর্য্যন্ত এমন কোনও প্রতিষ্ঠান এখন নাই যাহাতে মেম্বরদের কোনও শ্রেণীবিভাগ নাই। আমাদের অ্যাকাডেমিতে জেনারেল ম্যানেজার বা আফিসের কেরাণী যে কেহ মেম্বর হইলে সমান অধিকার লাভ করিবেন। তৃতীয়তঃ, কলিকাতায় বীমাকর্ম্মিগণের জন্য এমন কোনও ক্লাবগৃহ বা আড্ডার স্থান নাই, যেখানে সকলে সন্ধ্যার সময় মিলিত হইয়া খেলাধূলা বা পড়াশুনার মারফতে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন।

চতুর্থতঃ আমাদের অ্যাকাডেমিতে কলিকাতার প্রায় ত্রিশটি কোম্পানীর কর্ম্মী উচ্চতম হইতে নিম্নতম পদের—সভ্য হইয়াছেন। কলিকাতায় এখন এমন কোনও বীমা প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া আমি শুনি নাই যাহাতে ৩০টি কোম্পানীর লোক সভ্যশ্রেণীভুক্ত আছেন।

আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে "জর্ণাল" প্রকাশ করার উল্লেখ আছে। আপনি ইহাকে সাময়িক পত্রিকা প্রচারের চেষ্টা ধরিয়া লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সে সব মন্তব্য আমাদের একাডেমি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আমাদের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য অভিজ্ঞ বীমা-

কর্ম্মীদের দ্বারা বক্তৃতাদান; বক্তৃতাগুলি আমাদের শিক্ষা আন্দোলনের অঙ্গ। সব বক্তৃতায় সব সভ্য কিংবা মফঃস্বলের সভ্যগণ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং যে সব বক্তৃতা হইবে, সেইগুলি একত্র করিয়া তিনমাস বা চারিমাস অন্তর মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিব। এগুলি সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন। সাধারণের জন্য ইহা নহে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মত ইহা হইবে। বিলাতে Insurance Institute ও Actuaries Instituteদের এরূপ জর্ণাল আছে।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর আাকাডেমির তরফ হইতে একটি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন দেশের বীমা ব্যবসার পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এ সম্বন্ধে অদ্যকার আনন্দবাজার পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। আশা করি দেখিয়াছেন।

আশা করি আাকাডেমি সম্বন্ধে আপনি এখন সঠিক একটা ধারণা করিতে পারিবেন। পূজার বন্ধের পর আমাদের মুদ্রিত নিয়মাবলী ও বিবরণীপুস্তিকা আপনাকে পাঠাইয়া দিব। আপনার ন্যায় সৎকার্য্যে উৎসাহশীল ও মহানুভব ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা নিরপেক্ষ সমালোচনা আশা করি।

ইতি—
বিনীত
শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়
জয়েন্ট সেক্রেটারী

আমার বক্তব্য

ইন্সিওরেন্স এ্যাকাডেমীর জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায় এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্রখানি পাইয়াছি তাহা এইখানে মুদ্রিত করিলাম। এ পত্র যদি নিছক ব্যক্তিগত হইত তবে প্রকাশ করিতাম না। কিন্তু আমাদের ভাদ্র সংখ্যার কাগজে উক্ত এ্যাকাডেমী সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে পাঠকদিগের মনে যে ধারণা হইবার সম্ভাবনা তাহার দূরীকরণ কল্পে সুধীন্দ্রবাবুর সমগ্র পত্রখানাই প্রকাশ করা আমার নিকট ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হইল।

এ্যাকাডেমীর প্রস্পেক্টাস বা অনুষ্ঠান পত্র, নিয়মাবলী কিম্বা কোনও বিবরণ আমরা পূর্ব্বেও পাই নাই এবং এখনও পাই নাই। আজ আঠারো বৎসর যাবৎ আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের কল্যাণ কামনায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি এবং আসিতেছি। ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রতিমাসে ইন্সিওরেন্স অধ্যায় নামক একটী বিশেষ অধ্যায় প্রকাশিত হয়। আমরাই বাংলা ভাষায় বীমা-বার্ষিকী বা Insurance Year Book বাহির করিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের সহিত বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের পরিচয় করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছি এবং আমাদিগের এই অবদান দেশীয় বীমাকোম্পানী সমূহ বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এই সকল কারণে নবস্থাপিত এ্যাকাডেমীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র প্রাপ্তির আশা করা খুব একটা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা নাও হইতে পারে;—অন্ততঃ বীমা সম্পর্কীয় একখানি পুরাতন মাসিকের নিকট সংবাদ হিসাবে ইহা পাঠানো কর্ম্মকর্ত্তাদিগের উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। তাহা না

পাওয়ায় ইংরাজ সম্পাদিত ইংরাজী কাগজে ইহার যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা ভাদ্রের সংখ্যায় আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম।

সুধীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "পূজার বন্ধের পর আমাদের মুদ্রিত নিয়মাবলী ও বিবরণী পুস্তিকা আপনাকে পাঠাইয়া দিব"। পূজার বন্ধের পর শ্যামাপূজার বন্ধও শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সুধীন্দ্রবাবুর নিকট হইতে আজিও কোনও বিবরণী পুস্তিকা পাই নাই। সুতরাং এ্যাকাডেমী সম্বন্ধে আমাদের উক্তির পুনরালোচনা করা এ সংখ্যায় সম্ভব হইল না। তবে সুধীন্দ্রবাবু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমরা আশ্বস্ত এবং বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সংবাদপত্রে যদি এই কথাই প্রকাশিত হইত তাহা হইলে আমা-

দিগকে কোনওরূপ বিরুদ্ধ বা অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতে হইত না; বরং আমরা কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে বীমা বিষয়ক এইরূপ নূতন সাহিত্য স্থষ্টির প্রচেষ্টার জন্য অশেষ ধন্যবাদ দিতাম। ইন্‌সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের বহুপূর্ব্বে এই কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সংবাদপত্রে এ্যাকাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কর্ম্মকর্ত্তারা যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে আপনাদের পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য সাময়িক সংবাদপত্র বাহির করা নহে, বীমা-বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়া-ইয়া তাহাই পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিয়া নূতন বীমা সাহিত্যের স্থষ্টি করা। আপনারা যদি উচ্ছে ভাজিয়া লোকদের পটল বুঝাইতে চা'ন তবে সে দোষ কা'র তাহা আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

এ সম্বন্ধে আমার আর একটী বক্তব্য আছে। এই পুস্তিকাগুলি আপনারা ইংরাজীতে প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই; তা' করুন, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলাদেশের বীমাকর্ম্মী ও বীমা সার্কেলের মধ্যেও বিশেষভাবে এইসকল পুস্তিকা প্রচার করিতে অনুরোধ করি। কেন, তাহার কারণ বলিতেছি—

ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ যে সকল লোক বীমা সাহিত্যের (Insurance literature) প্রতি অনুরক্ত এবং আকৃষ্ট তাঁহারা ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি বীমা বিষয়ক পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িক পত্রিকা, বুলেটীন ইত্যাদি পাঠ করিবার যথেষ্ট স্থযোগ এবং স্থবিধা পাইয়া থাকেন এবং ইচ্ছা করিলে পাইতে পারেন। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অন্যান ১২।১৪ খানা কেবল মাত্র বীমা বিষয়ক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় বাহির হয়; এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি স্থপ্রসিদ্ধ Commercial Monthly, ও Weekly কাগজ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয় যাহাদের প্রত্যেক সংখ্যায় বীমাবিষয়ক নানা মূল্যবান প্রবন্ধ বাহির হইয়া থাকে। স্থতরাং ইংরাজী ভাষা-ভিজ্ঞ পাঠকদিগের মধ্যে যাহাদিগের এ বিষয়ে পড়িবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আছে তাঁহাদের পুস্তক, পুস্তিকা বা সাময়িক পত্রের কোনও অভাব নাই। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাল জানেন না এরূপ অসংখ্য বাঙ্গালী আজকাল বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং বাংলাদেশের হাটে বাজারে বন্দরে এমন হাজার হাজার ইংরাজী অনভিজ্ঞ ধনী ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা বীমার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া আজকাল ব্যাপকভাবে বীমা গ্রহণ করিতেছেন। বাংলা ভাষায় বীমা বিষয়ক পুস্তিকাদি প্রকাশ করিলে ইঁহাদের মধ্যে বীমা সাহিত্যের প্রচার হইতে পারে এবং তাহার ফলে দেশের জনসাধারণ বীমার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে—ইংরাজীতে যাহাকে Insurance minded বা বীমা মনোভাবাপন্ন বলা যায়। বীমাবিষয়ক পুস্তিকা ইংরাজীতে বাহির করা আর তেলামাথায় তেল দেওয়া একই কথা। ইংরাজীতে যাহাকে carrying coal to Newcastle বলে। কারণ যাহাদের মধ্যে এই সকল পুস্তিকা প্রচারের আয়োজন করা হইবে বলিয়া মতলব করা হইতেছে তাহাদের আশে পাশে বীমা বিষয়ক শত শত Standard

বই, মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি গড়াগড়ি যাইতেছে। সুতরাং ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোকদের মধ্যে ইংরাজীতে বীমাবিষয়ক পুস্তিকা প্রচারের প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া আমার তুলসীদাসের সেই দোঁহাটী মনে পড়িতেছে,—

"পানিমে মীন্ পিয়াসীরে
মোক শুনত শুনত হাঁসি লাগে"

জলের মধ্যে থাকিয়াও যাহারা জল না খাইয়া পিপাসু থাকে তাহাদিগকে বাহির হইতে জল আনিয়া দিলেও তাহারা উহা ছুঁইবে না—যে পিপাসু সেই পিপাসুই থাকিবে। ববং যাহারা পিপাসু হইয়াছে অথচ পুকুরের নাগাল পাইতেছে না, তাহাদের কাছে জল নিয়া গেলে তাহারা আকণ্ঠ পান করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

আর একটী কথা বলিয়া আজকের মত আমার বক্তব্য শেষ করিব। এ্যাকাডেমীর সভ্যশ্রেণীর মধ্যে বিস্তর বিদেশী বীমাকোম্পানীর হোম্‌রা চোম্‌রা দিগের নাম দেখিলাম। এতদিন ধরিয়া ভারতীয় বীমাকোম্পানী সমূহ একযোগে সংঘবদ্ধ হইয়া বৈদেশিক অভিযানের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া লড়িতেছিল এবং তাহার ফলে প্রতিবৎসর ভারতীয় বীমাকোম্পানী সমূহের কাজ বায়ুবেগে লক্ষ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাইতেছিল এবং বৈদেশিক কোম্পানীসমূহের জীবনবীমার কাজ ঠিক সেই অনুপাতে কমিয়া যাইতেছিল। কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈদেশিক বীমা কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানী সমূহের এই প্রচার ও প্রপ্যাগ্যাণ্ডার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জীবনবীমার কাজ এদেশে বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে Standard এর ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত বীমা কোম্পানীও অতঃপর নূতন বীমার কাজ গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।
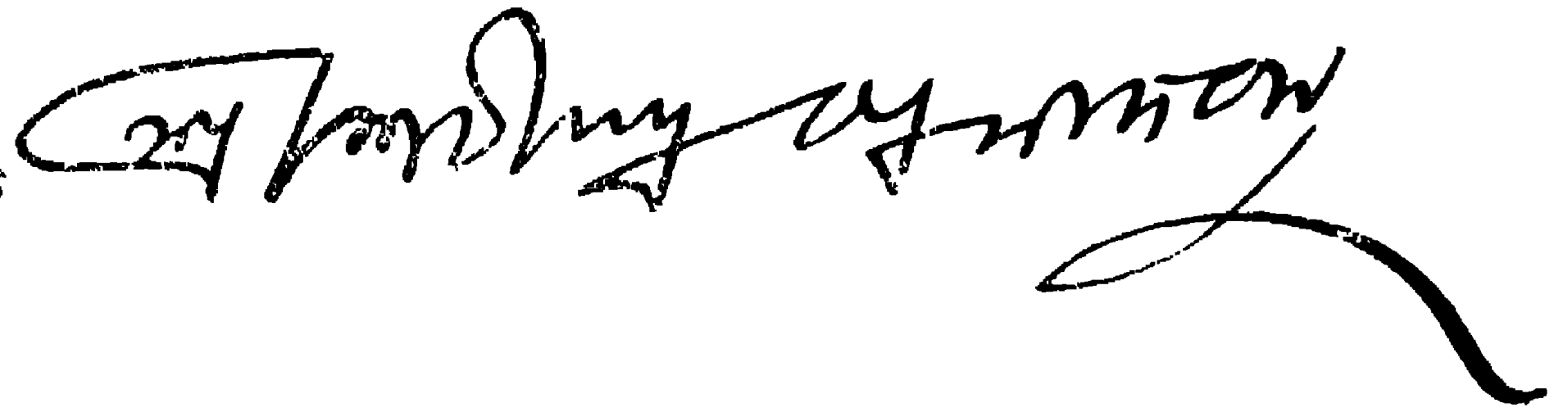
চারিদিকে যখন এইরূপ অবস্থা তখন হঠাৎ যুদ্ধ থামাইয়া দিয়া বিদেশীদের সহিত কোলাকুলি করিবার কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তার পর সংশোধিত বীমা আইনে বোনাস্ ঘোষণা এবং লগ্নীর ব্যাপার লইয়া বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে যে সুবিধা এবং সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলে দেশী বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে—বিশেষতঃ যাহারা শিশু এবং নবীন—বিদেশীয় বীমাকোম্পানীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কাজ জোগাড় করা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

এই সমূহ বিপদ হইতে আত্মরক্ষার এক মাত্র উপায়,—বীমা সম্বন্ধে Buy Indian Slogan খুব প্রবল ভাবে চালানো এবং দেশময় স্বদেশী ভাবের এবং স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তোলা। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে যদি ধোলায় কালোয় কোলাকুলি সুরু হয় এবং কালায় ধলায় মিশিয়া গিয়া এক প্রয়াগ সঙ্গমের সৃষ্টি

রে তবে সেই প্রবাহের মধ্যে Buy Indian ogan ভাসিয়া যাইবে কিনা সে বিষয়ে আমি বন্ধুবর সুধীন্দ্রলালকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন। বড় বড় জাঁদরেল বিদেশী কোম্পানীর সহিত এই সকল টুনুক প্রাণ দেশী কোম্পানীর Entente Cordialle এর ফলে The big fish swallows the small fish এর দশা হইবে কি না, অথবা Æsop's Fables এ বর্ণিত মৃন্ময় পাত্রের সহিত কাংস্য পাত্রের মিলনের পরিণতি হইবে কি না তাহা সুধীন্দ্র-বাবুকে ভাবিয়া দেখিতে বলি।

৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্‌

১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট।

হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন কারবার

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৪৫৬৫০০ টাকা মূল্যের ১৬৫৩টী বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১২০৪২৫০ টাকা মূল্যের ১৩৪৭টি প্রস্তাব গৃহীত এবং তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ১০০৫২৫০ টাকা মূল্যের ১৪৩৪টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ১৩৮০৮৭ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম ১২৪৫৮৬ টাকা, সুদ ৩১৫৭ টাকা। সিকিউরিটীর মূল্য বৃদ্ধি বাবদে আয় হইয়াছে ৫২৩৫ টাকা। অন্যান্য বিবিধ আয় ৫১০৮ টাকা। ব্যয় হইয়াছে মোট ৮২৯৯৬ টাকা। তন্মধ্যে দাবী শোধ বাবদে গিয়াছে ১৯৮৫ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ৭৪০৫৮ টাকা। অন্যান্য বিবিধ খরচ ৪৯৫২ টাকা।

জীবনবীমা তহবিল

সমস্ত খরচ বাদে বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিল হইয়াছে ৮৯৬৭৬ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৪৫৮৫ টাকা। সুতরাং দেখা যায় জীবনবীমা তহবিল আড়াই গুণেরও অধিক বাড়িয়াছে।

বণ্টন প্রথার বীমা

নূতন বীমা আইনে বণ্টন প্রথার বীমা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কোম্পানীর পরিচালকগণ বণ্টন প্রথার বীমাকে উচ্চতর সাধারণ বীমায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছেন। আলোচ্য বৎসরের শেষে এইরূপ ৭৪৯টী বণ্টন প্রথার বীমা পরিবর্ত্তিত হইবার বাকী রহিয়াছে। এই বিভাগের হিসাবে দেখা যায় খরচা বাদে ৫০১২ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই টাকা কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা হইয়াছে।

সম্পত্তি ও দায়

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২৩৪৩৮ টাকা। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী আছে ১৪০৭০৯ টাকা। পলিসি বন্ধকী ঋণ ১৭৬৭ টাকা। আসবাবপত্র, মোটর গাড়ী ও পুস্তকাদির মূল্য ০১১৬ টাকা। অনাদায়ী প্রিমিয়াম ২২১০২

এবং অনাদায়ী সুদ ১০৭০ টাকা। কোম্পানীর গঠন ও প্রচার কার্য্যের জন্য যে ২৮০৮০ টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা সম্পত্তির ঘরে দেখান হইয়াছে। এজেণ্টদের নিকট এবং ব্রাঞ্চ্ আপিসে অগ্রিম দেওয়া আছে ৯৩৫২ টাকা। নগদ ব্যাঙ্কে ও হাতে জমা আছে ৪৮১৯ টাকা।

ভাগ্যলক্ষ্মীর ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মের—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী।

কোম্পানীর রেজেষ্টারীকৃত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা বিক্রীত মূলধন ১১৯০৩০ টাকা। মূলধন ১০৩৯৬০ টাকা। জীবনবীমা তহবিলের ৮৯৬৭৬ টাকা এবং রিজার্ভ্ ফাণ্ডের (বণ্টন প্রথার বীমা হইতে আনীত) ৫০১২ টাকা দায়ের ঘরে দেখান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিকিউরিটী ডিপজিটের ১০৩৫ টাকা, ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌কর্ত্তৃক অগ্রিম দেওয়া ১৫৪০৯ টাকা, বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ২৬৯৪ টাকা এবং দাবীশোধ, এজেণ্টদের কমিশন এবং মেডিক্যাল ফিস্ বাকী ৫৯৭৭ টাকা খরচের ঘরে রহিয়াছে।

খরচের অনুপাত

কোম্পানীর খরচের অনুপাত ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। আলোচ্য বৎসরে উহা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩·৬ টাকা কমিয়াছে।

উন্নতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নিম্নলিখিত দফায় উন্নতি বিশেষ দ্রষ্টব্য,—

ইস্যুকরা পলিসির		
মূল্য	১২০৪২৫০	টাকা
প্রিমিয়াম আয়	১২৪৫৮৫	”
বৎসরের শেষে		
জীবনবীমা তহবিল	৮৯৬৭৬	”
দাবী শোধ	৩৯৮৫	”

আমরা ভাগ্যলক্ষ্মীর সকল দিকেই উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। ইহার নূতন কারবার, আদায়ী মূলধন, জীবনবীমা তহবিল সবই বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ খরচের অনুপাত কমিয়া গিয়াছে। ভাগ্যলক্ষ্মী দাবীর টাকা মিটাইবার পক্ষেও যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইয়াছেন। চারিদিকে ইহার তোড়্জোড়্ যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে কালে ইহাও একটী প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীতে উন্নীত হইবে।

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্

১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।)

নূতন কারবার

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৯০০৪৮৭৫৲ টাকা মূল্যের নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৭৫২৩৬২৫৲ টাকা মূল্যের প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু হইয়াছে। দেখাযায়, কোম্পানীর নূতন কারবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে।

আয় ব্যয়

আলোচ্য বৎসরে আয় হইয়াছে মোট ৮৭০৬৭০৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে পাওয়া গিয়াছে ৮২৭০৪৬৲ টাকা। সুদ আসিয়াছে ৪৩০৩৯৲ টাকা। অন্যান্য আয় ৫৮৪৲ টাকা। ব্যয় হইয়াছে মোট ৫৪৩৭০৯৲ টাকা। তন্মধ্যে পলিসির দাবী শোধ বাবতে গিয়াছে ১১৮১১৯৲ টাকা। বোনাস সহ সারেণ্ডার ভ্যালু দিতে হইয়াছে ১৭২৭৲ টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ৪১৯০৭১ টাকা।

জীবনবীমা তহবিল

বৎসরের আরম্ভে জীবনবীমা তহবিলে ছিল ৭০০৮৮৮৲ টাকা। বৎসরের শেষে খরচা বাদে উক্ত তহবিলে আরও ৩২৬৯৬১৲ টাকা জমে। সুতরাং আলোচ্য বৎসরের শেষে মোট জীবনবীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে ১০২৭৮৪৯ টাকা।

খরচের অনুপাত

আলোচ্য বৎসরে খরচের অনুপাত হইয়াছে শতকরা ৪৮·১ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে খরচের অনুপাত ছিল শতকরা ৫৩৲ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, খরচের অনুপাত শতকরা ৫৲ টাকা কমিয়াছে।

সম্পত্তি ও দায়

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২২৭৯২৭৭৲ টাকা। তন্মধ্যে লগ্নীতে আছে ৮৯৭৪৪৩৲ টাকা। আসবাবপত্র ও পুস্তকাদি ১৯৭৫১৲ টাকা। এজেণ্টদের নিকট এবং ব্রাঞ্চ্ ও সাব্অফিসে ব্যালান্স্ আছে ৪২৫১৩৲ টাকা। প্রিমিয়াম ও সুদ বাকী রহিয়াছে ৮৩৪৭৫৲ টাকা। গঠন কার্য্যে (অর্গ্যানিজেসান) খরচ ৩১৯৭৭৲ টাকা। ব্যাঙ্কে ও নগদ হাতে আছে ১৯৪৫০২৲ টাকা।

দায়ের ঘরে রহিয়াছে কোম্পানীর বিক্রীত ও আদায়ী মূলধন একলক্ষ টাকা। জীবনবীমা তহবিলে ১০২৭৮৪৯৲ টাকা। ইনকম্ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্সের জন্য রিজার্ভ ১৫০০৲ টাকা। অপরিশোধিত পলিসির দাবী ১১৪৬০১৲ টাকা। (এই টাকার মধ্যে ৪৫৩০৯৲ টাকা ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়া গিয়াছে)। প্রিমিয়াম ডিপজিট্

১৭৫১২৲ টাকা। অন্যান্য বিবিধ দেনা ১০৮১৭৲ টাকা।

লগ্নীর বিবরণ

১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে জীবন বীমা তহবিলের শতকরা যত টাকা বিভিন্ন প্রকার লগ্নীতে খাটিতে দেখা যায় তাহার বিভাগ এই,—

১। গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে শতকরা ৪২৲ টাকা

২। পলিসি বন্ধকী ঋণ শতকরা ১০ টাকা

৩। বাড়ী ও জমিবন্ধকী মটগেজ্ শতকরা ৯৲ টাকা

৪। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীতে ঋণ দাদন শতকরা ১৭৲ টাকা। এই সকল লগ্নী হইতে গড়ে সুদ পাওয়া গিয়াছে শতকরা ৫'১ টাকার উপর।

সাত বৎসরের কার্য্য

কোম্পানীর ৭ বৎসরের কার্য্যের ফল দাঁড়াইয়াছে এই,—

মোট চল্‌তি বীমার পরিমাণ ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকার উপর।

জীবনবীমা তহবিল ১০২৭৮৭৮৲ টাকার **উপর**

মোট সম্পত্তি ১২৭৯২৭৭৲ টাকার **উপর**

বৎসরের পর বৎসর **মেট্রোপলিটানের** এইরূপ অগ্রগতি দেখিয়া আমরা **বিশেষ** আনন্দিত হইয়াছি। এ বৎসরের **উন্নতির** বিশেষত্ব এই যে কোম্পানী কাগজ, রিজার্ভ ফাণ্ড ও নূতন বীমার পরিমাণ গত বৎসর **অপেক্ষা** অনেক বেশী বাড়িয়া গেলেও খরচের **অনুপাত** পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা [illegible] **টাকা** হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। ইহাই **মেট্রোপলিটানের** এবারকার অসাধারণ কৃতিত্ব।

আমরা শুনিয়া আরও **সুখী** হইলাম যে, প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী এবং **সদালাপী** শ্রীযুক্ত অমলভূষণ চাটার্জীকে **সম্প্রতি** কোম্পানীর সেক্রেটারীর পদে উন্নীত করা **হইয়াছে**। যদিও সকলে এতদিন অমল **বাবুকেই** কোম্পানীর দায়িত্বশালী কর্ম্মচারী এবং **de facto** সেক্রেটারী বলিয়াই জানিত তথাপি **অফিসিয়াল** হিসাবে তিনি নিম্নের পদেই ছিলেন। এবার যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যাসনে নিযুক্ত **করায়** **আমরা** বিশেষ সুখী হইয়াছি।

মামলা মোকর্দ্দমা
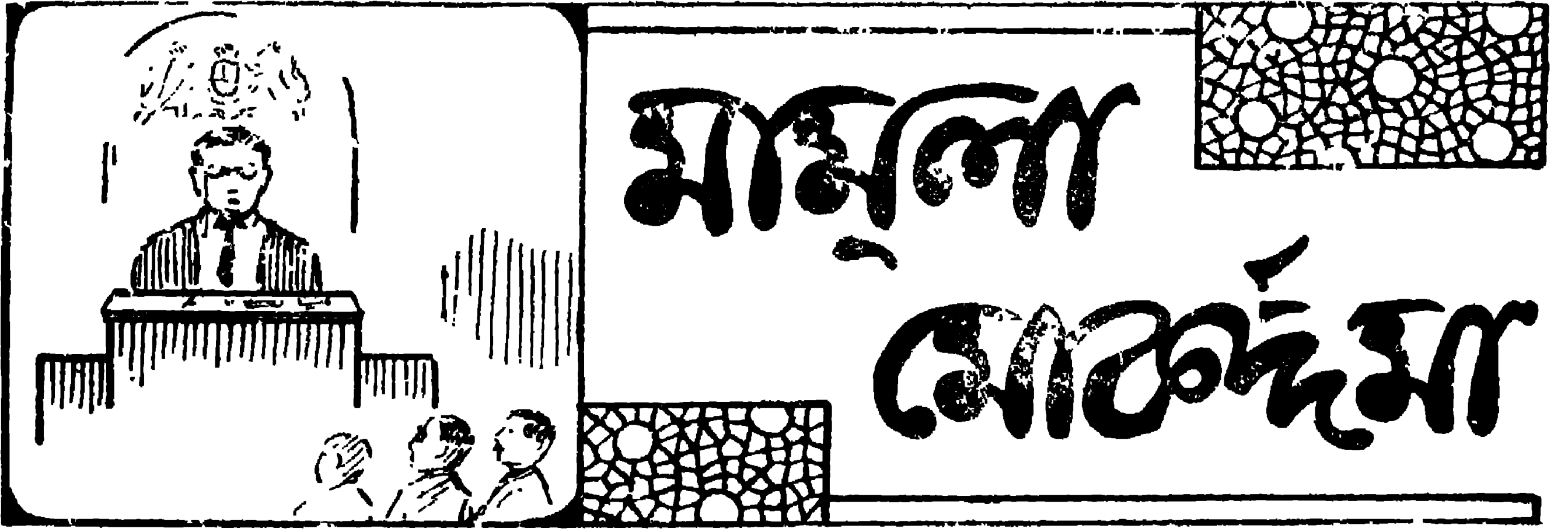
নফর চন্দ্র পাঠক নামক এক ব্যক্তি "ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্ ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীতে ১০০০ টাকার জীবন বীমা করে। ১৯৩৬ সালের ২৩শে জুলাই তাহার বীমার প্রস্তাব গৃহীত এবং পলিসি ইস্যু করা হয়। ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে নফর চন্দ্র মারা যায়। তাহার পুত্র প্রফুল্লকুমার পাঠক, কোম্পানীর নিকট পলিসির ১০০০ টাকা দাবী করে। কিন্তু বয়সের প্রমাণে গোলযোগ আছে বলিয়া কোম্পানী টাকা দিতে অস্বীকৃত হয়। অগত্যা প্রফুল্লকুমার কলিকাতার প্রেসিডেন্সী স্মলকজেজ্ কোর্ট বা ছোট আদালতে নালিশ করে। জজ মিঃ এ এস্ এম আক্রামের এজলাসে মামলার শুনানী হয়।

বিবাদী কোম্পানী বলে যে, বীমার প্রস্তাবের সময় বাদী প্রতারণা পূর্ব্বক জাল কোষ্ঠি দেখাইয়া ভুল বয়স লিখাইয়াছে সুতরাং পলিসির দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু বিচারক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি লইয়া সাব্যস্ত করেন যে, যখন কোম্পানী ঐ কোষ্ঠি রীতিমত স্বীকার করিয়া একবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তখন আর উহাকে প্রতারণামূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। তদনুসারে তিনি মামলা খরচা সহ ডিক্রী দিয়াছেন।

মহীশূরের এশিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী দিল্লীর নিউ-এশিয়াটিক লাইফ ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, বিবাদী কোম্পানীর নামে "এশিয়াটিক" শব্দটী থাকাতে জনসাধারণের মনে উহা বাদী কোম্পানীর নাম বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। সুতরাং নাম পরিবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত বিবাদী কোম্পানীর কারবার বন্ধ রাখিবার আদেশ দেওয়া হউক।

বিচারপতি মিঃ জষ্টিস মকেট অভিযোগের সকল দিক আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেবলমাত্র "এশিয়াটিক" শব্দটীর দ্বারা জনসাধারণের মনে ভ্রম জন্মিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ উহার পূর্ব্বে যখন নিউ শব্দটী যুক্ত রহিয়াছে। উভয় কোম্পানীই চারিবৎসর ধরিয়া কারবার চালাইতেছেন। ইতিমধ্যে এরূপ ভ্রম ঘটিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বাদী কোম্পানীর

অভিযোগ ভিত্তিহীন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মামলা খরচা সহ ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে।

হরিদাস বরাট, সুধীরচন্দ্র পাঠক এবং বরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী,—ইহারা কলিকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত অটো সার্ভেটিং কোম্পানীর পরিচালক ও অংশীদার ছিল। এই কোম্পানী ঘোষণা করে, ৫৲ টাকার পলিসি লইলে ছয়মাস পর হইতে ১২ কিস্তিতে ৬০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া বহুলোক ৫৲ টাকা মূল্যে কোম্পানীর পলিসি ক্রয় করে। কোম্পানী এইরূপ আরও দুই তিনটী লাভজনক পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া ৬ মাসের মধ্যে মোটের উপর প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। ইহার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পলিসিহোল্ডারদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, অবশিষ্ট টাকা কোম্পানীর পরিচালকগণ আত্মসাৎ করে।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ্‌ কে দের এজলাসে আসামীগণ অভিযুক্ত হয়। বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। আসামীগণ এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে।

১৯০২ সালের ২১শে জুলাই হইতে ১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি ইউনিক য়্যাসুর‍্যান্স্‌ কোম্পানীর এজেন্সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিল। সেই সময়ে চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে সুরেশচন্দ্র মাঝে মাঝে কোম্পানীর নিকট হইতে কিছু টাকা অগ্রিম লয়। কমিশন বাবতে তাহার পাওনা টাকা হইতে উহা কাটান যাইবে এইরূপ কথা ছিল। ১৯৩৬ সালের নবেম্বর মাসে হিসাব পরিস্কার হইলে দেখা গেল সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট কোম্পানীর ১৪৮৮৲ টাকা পাওনা হইয়াছে। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে সুরেশচন্দ্র এক লিখিত দলিলে কোম্পানীর ঐ পাওনা স্বীকার করে। সুরেশচন্দ্রের অধীনে অসিতা-চক্রবর্ত্তী নামক একজন এজেণ্ট কার্য্য করিত। সুরেশচন্দ্রের মারফৎ কোম্পানী তাহাকেও অগ্রিম টাকা দিয়াছিল। ১৯৩৬ সালের মে মাসে হিসাব নিকাশে দেখা যায় অসিতাচক্রবর্ত্তীর নিকট ৭৫২৲ টাকা কোম্পানীর পাওনা হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জষ্টিস্‌ প্যাংক্রিজের এজলাসে উক্ত ১৪৮৮ এবং ৭৫২ টাকার দাবী করিয়া কোম্পানী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই। সুতরাং সুদ ও খরচা সহ মামলা একতরফা ডিক্রী হইয়াছে।

১৯৩৩ সালে ২৫শে মার্চ্চ আবদুল রেজাক ও তাহার স্ত্রী জামিলা খাতুন একযোগে আজমীরের জেনারেল য্যাসিওর্যান্স্‌ সোসাইটীতে ১০০০ টাকার জীবন বীমা করে। তাহার সর্ত্ত এইরূপ ছিল যে, একজনের মৃত্যু হইলে আর একজন পলিসির টাকা পাইবে। ১৯৩৩ সালের ২৬শে অক্টোবর সন্তান প্রসব-কালীন জামিলাখাতুন মারা যায়। তখন আবদুল রেজাক কোম্পানীর নিকট ঐ পলিসির টাকা দাবী করে। কিন্তু কোম্পানী টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জষ্টিস্‌ লর্ট উইলিয়ামসের এজলাসে মামলা দায়ের হয়। বিবাদী কোম্পানী এই জবাব দেয় যে, বীমার প্রস্তাব করিবার সময় জামিলাখাতুন গর্ভবতী ছিল এবং তাহার বয়স ২৫ বৎসরের কম ছিল, সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং

কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে সত্য গোপন করার দরুণ বাদী আবদুল রেজাক পলিসির টাকা পাইতে পারে না।

বিচারপতি মন্তব্য করেন, বিবাদী কোম্পানী প্রতারণার কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই। অক্টোবর মাসে সন্তান প্রসব হইলেই যে কোন স্ত্রীলোক তার পূর্ব্বের ফেব্রুয়ারী কিম্বা মার্চ মাসে গর্ভবতী ছিল একথা বলা যায় না। কারণ অনেক স্থলে দশ মাসের কম সময়েও সন্তান প্রসব হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ গর্ভধারণের দুইমাসের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক বলিতে পারেনা, বাস্তবিক সে গর্ভবতী হইয়াছে কিনা। পুনশ্চ জামিলা খাতুনের বয়স যে ২৫ বৎসরের কম ছিল, তাহার কোন প্রমাণ বিবাদী কোম্পানী দিতে পারে নাই। এইসকল কারণে বাদী যে প্রতারণা করিয়াছে তাহা মনে হয় না। সুতরাং বাদী বিবাদী কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা খরচা ও শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ সহ ডিক্রী পাইয়াছে।

ইন্সিওরান্স্ কোম্পানীর নিকট হইতে প্রতারণা পূর্ব্বক অগ্নিবীমার টাকা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে নুরুল আমীন, গুজুমিয়া প্রমুখ ১১ জন লোক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের গত ৭ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার আসাদগঞ্জ নামক স্থানের কয়েকটী কাঠগুদামে আগুণ লাগাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। এ সংবাদ ভাদ্র মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেসন জজ মিঃ ইউ সি মজুমদারের এজলাসে উক্ত মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। স্পেশাল জুরী এবং এসেসারের মতানুসারে বিচারক প্রধান আসামী নুরুল আমিনকে প্রথমতঃ আগুণ লাগাইবার অপরাধে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে তাহার দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ৬ মাস জেল খাটিতে হইবে। এই দুই দফা অপরাধে গুলমিঞার যথাক্রমে ৬ বৎসর ও দেড় বৎসর এবং নবীর আহাম্মদের যথাক্রমে ৫ বৎসর ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। মকজ্জোয়া নামক অন্য একজন আসামীর দুই বৎসর জেল হইয়াছে। বাকী সাক্ষী কাসেম আতাশিম ও অন্যান্য আসামীগণ খালাস পাইয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ এই মামলার বিচার চলিয়াছিল। চট্টগ্রামে জন সাধারণের মধ্যে ইহাতে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

হরিপদ সাধুখাঁ নামক একব্যক্তি কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর নোনাপুকুর ডিপোতে মিস্ত্রির কার্য্য করিত। গাড়ীতে বিজলীর তার লাগান (wiring) তাহার কাজ ছিল। ১৯২৭ সালের ৭ই অক্টোবর কাজ করিবার সময় দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ সে একটা বেঞ্চিতে খুব জোরে ধাক্কা খায়। এই আঘাতের ফলে শেষে একটী ফোড়া জন্মিয়া তাহার সেপ্টিসেমিয়া (septicemia) হয়। অবশেষে কিছুকাল ভুগিয়া হরিপদ মারা যায়। তাহার বিধবা পত্নী সিন্ধুবালা দাসী ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া ট্রাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। বাংলার ওয়ার্কমেনস্ কম্পেন্‌সেসান কমিশনার মিঃ ডি এন মজুমদার আই সি এস্ মহোদয়ের এজলাসে মামলার বিচার হয়। কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হয়, কারখানায় কাজ করিবার

সমস্ত আঘাত পাইয়া ফোড়া হয় নাই,—উহা অন্য কারণে হইয়াছে। বিজ্ঞ বিচারক কোম্পানীর ডাক্তারের সাক্ষ্য হইতে বলিতে পারেন যে আঘাতের দরুণই ফোঁড়া হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি রায় দিয়াছেন, সিন্ধুবালা দাসী বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবতে ১২৫৩ টাকা পাইবে।

—:—

পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেড সালে ভাই বল্লীভাই নামক একব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করে। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহার বিচার হয়। মামলার বিবরণ এই,—কলিকাতার আর্মেনীয়ান ষ্ট্রীটে মেসার্স আমীজিমুল্লা তাব বদরুদ্দিন নামক একটী কারবার আছে। সালেভাই বল্লীভাই ছিল তার ম্যানেজার। সে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এস বসুর হাতে কতকগুলি বিল, রেলওয়ে রসিদ এবং তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র দিয়া বলে যে তাহারা বিলাসপুরের কোন ব্যবসায়ীকে ১২০০ টাকা মূল্যের জিনিষ সরবরাহ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক যদি তাহাদিগকে ঐ ১২০০ টাকা দেন, তবে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। বিলাসপুরের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মারফতে ঐ সকল বিল ও রেলওয়ে রসিদের সাহায্যে ব্যাঙ্ক সেই টাকা আদায় করিতে পারেন। তাহার উক্ত কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যাঙ্ক ১২০০ টাকা তাহাকে দেন, কিন্তু বিলাসপুরের সেই ব্যবসায়ী মাল লইতে অস্বীকার করায় ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করিতে পারেন না। অতঃপর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এস বসু বিলাসপুর যাইয়া ঐ মালপত্র সমস্ত কলিকাতায় লইয়া আসেন। মিঃ বসু সংবাদ পাইলেন যে উক্ত সালেভাই বল্লীভাই নামক লোকটী কলিকাতার আরও কোন কোন ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীকে প্রতারণা করিয়াছে। সেইজন্য তিনি অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ লোকের দ্বারা ঐ মালপত্র পরীক্ষা করান। তাহাতে দেখা যায় জিনিষগুলি অতি নিকৃষ্ট ধরণের এবং চিঠিপত্রে যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ নহে।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে সালেভাইর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা হয়। সে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। জষ্টিস বার্টলী এবং মিঃ জষ্টিস হেণ্ডারসনের বিচারে নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ বহাল রহিয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

ডাল কলাই

	প্রতি মণ
অড়হর কানপুর	৫॥৵ হইতে ৭।০
ঐ দেশী	৪৸৵০—৫৸৵০
খাঁড়ী মশুর	৪৵০—৪।০
মশুর ডাল পাটনাই	৪॥৵০—৫৲
ছোলার ডাল	৩৸০—৪।০
মটর ডাল	—৪।০
সোণামুগ	৫॥৵০—৬॥০
বিবলি কড়াই ডাল	৫৴—৫।০
কাঁচা মুগের ডাল	৫।০—৫৸০
ভাজা মুগের ডাল	৬।০—১০।০
পাটনাই বুট	৩৴০—৩॥০
খেঁসারী ডাল	৩৲—৩৵০

মসলার দর

হরিদ্রা	৯৲, ১০৲, ১১৲
জিরা	১৫॥০, ১৭॥০, ১৯॥০
মরিচ	১৫॥০, ১৬৲, ১৭॥০
ধনে	৪॥০, ৫৲
লঙ্কা	১৭॥০, ১৮॥০, ২২॥০
সরিষা	৫৸০, ৬॥০, ৭॥০
মেথী	৬৸০, ৭॥০
কালজিরা	১০৲, ১০॥, ১১৲
পোস্তদানা	১২৲, ১৩৵০, ১৪৲
দেশী সুপারি	৫৬৲, ১৭৲, ১৭৸০
জাহাজী কাটা সুপারি	১১॥০, ১১৸০, ১২৲
ঐ গোটা সুপারি	১১।০, ১১৸০
পাল কোকো়া	৭।০, ৭৸০
জাবা কোকো়া	৮৸০, ৯।০
১নং কোকো়া ফ্লাওয়ার	৭।৵০, ৮॥০
ছোট এলাচ প্রতি সের—	৪॥০, ৫৲, ৫॥০
বড় এলাচ	৩৫৲, ৩৭৲, ৩৮৲
দারচিনি	১৪।৵০, ১৫৲
লবঙ্গ	৬২৲, ৬৮৲
মৌরী	৬॥০, ৭॥০, ৮॥০
গুটী খয়ের	১৯৲, ২০৲, ২১॥০

কলিকাতার লৌহ ও হার্ডওয়ারের বাজার দর

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি, জয়েণ্ট ব্রাণ্ডেড	৮৴০—৮।৵০
ঐ বে-মার্কা, হাল্কা ওজন	৭৸০—৮৵০
বরগা, টী আয়রণ	৯।০—৯৸০
এঙ্গেল আয়রণ কোণা	৬৸০ ৭৲
রি-ইনফোর্স ও রড, কনক্রীটের জন্য	৭।০—১০।০
গ্যাঃ করোগেট টীন ২৪ গেজ	১১।৴০—১২।৵০
বাগানঘেরা কাঁটা তার বাণ্ডিল	১১॥০—১৪৸০
ষ্টীল পাটি, বোল্টু, গরাদে	৭।০—৮।০
গোল রড৴০—।০ সুতা হন্দর	৬।৵—৬॥৵০
টানা রড৴০—।০ সুতা	১১॥০—১২॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা	মণ ৩॥০—৩৸
প্লেট ৵০—।০ সুতা	১০৵,—১১৲ হন্দর
চাদর ৩—১৬ খানা বাণ্ডিল	১১৵০—১৪৸০
গরাদ ধুরা ১॥"-১৸" পিস	৪।০—৫॥০
তারের পেরেক (পিন) ১"-৬"	১৪৸০ ১৫॥০ হন্দর
প্যাটেণ্ট পেরেক ২"—।৮"	১৪৲—২০৲ ,,
ঢালাই কড়াই ১—৬নং সাট	৸০—১৸৵০
ঐ ৭—৬নং সাট	১৸০—১৸৵০
ঐ ১—১০ সাট	৩৸৵০—৪৵০
বিট ডুলি গুটীদার ১০নং পিস	॥৵১০,-৸০
টাটার কোদাল ৪—৬নং	৮৵০—১০৵০ ডজন

ঐ দেশী বিলাতী	৭৸৹	,,
গ্যাঃ রিঃ বালতি ৭"–১২"	২৸০—৭৸৹	,,
ঐ কেবলমাত্র ১–৮"	৩৲—৪৲	,,
লোহার চেয়ার গোল ও চৌকা	১১৲	,,
লোহার স্ক্রু পা ॥০ ৩"	৶০ ১৶০	
ঐ কব্জা ১॥" ৪" পেঃ ৬৲	॥৴০—১॥০	
গ্যাং তার ১৬—২০নং	১৬৲	

পাটের বাজার

২৭শে অক্টোবর

পাকা গাইট ঃ অদ্য লণ্ডনের ১নং পাটের দর গতকল্য অপেক্ষা ২॥০ শিলিং কম ছিল। রপ্তানী কারকদের সহিত কোন কারবার হয় নাই। তৈরী ১নং কাটিংসের দর অপেক্ষা ২।০ কমদরে বিক্রেতা ছিল।

কাঁচা গাইট ঃ— অদ্য জাত পাটের গোড়া মধ্যভাগ প্রতিমণ যথাক্রমে ৫॥৵০ ও ৬৵০ ছিল বিক্রেতা কোন কারবার হয় নাই।

সোনার দর

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৩৬৴০
বরাবর	,,	৩৬৲
গিনি		২৩॥৴১

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫২॥৴০
ঐ খুচরা	৫২॥৵০

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
মাজা চাল	৫৲—৫৸০
নূতন ঐ	৫৲
বাঁকতুলসী	৮৸০—৫৲
নাগরা পুরাতন	৩৸০
এভারেজ কোয়ালিটী	৩॥০
সিদ্ধ বালাম	৩॥০
নূতন আতপ	৪৲
পেশোয়ারী	৮॥০—১০৲
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
রেঙ্গুন	৩৵০

ঘৃতের দর

	প্রতি মণ
ঐ	৫৮৲
পানতী	৫১৲
মুরজা	৫২৲
সিকেন্দ্রাবাদ (খুরজা মার্কা)	৪৭॥০
লক্ষ্মী	৪৭॥০
বড়োদা	৩১॥০
ভাগলপুর	৩১॥০

তৈলের দর

	প্রতি মণ
আড়ুয়া	১৬৲
বিনোদ	১৬॥০
নারিকেল তৈল	১২॥০

আটা ময়দা

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫।৵০—৫॥০
সুপারফাইন	ঐ	৫৵০—৫।০
হাউস হোল্ড	ঐ	৪৸০—৪৸৵০
সুজী		৫৵০—৫৲
আটা (বি)		৪৸৴০—৫৲
আটা নং (২)		৩।৶০—৩॥৴০
আটা (এস)		৪।৴০—৪॥০

চিনির দর

বিকাইন টাইপ	১১৴০
মরিশাস ১০০নং	৯৸৶১০
মালকোরা সাদা	৮॥১৫—৬৸০
কাশীপুর লাল	৭৸০—৬॥০

নূনের দর

এডেন সোনার ফাইন	৪৪৲
করাচী থসরা করকচ	৪৭৲
হামবার্গ ফাইন	৬৪৲
বোম্বাই করকচ	৭২৲

বিবিধ শস্য

কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর

গম

কানপুর	৮৴০
চন্দৌসী	৩॥৵০

তিসি

মোটা	৪৸৶৩
সরু	৪৸৶০

সরিষা

ভাগলপুর	৬৲
তামাম	৬৸০

হরিতকী ১৶০

তেঁতুল

৫% বীজ সমেত	৪৲

হলুদ

পাবনা	৯৸০

সিমুলতুলা

বীজ ছাড়ান	১৮॥০

বিবিধ সার

কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর মূল্য

	প্রতি মণ
রেড়ির খৈল ৫% নাইট্রোজেন	১৸০—২৸৴০
সরিষার খৈল	৭৶০
তিসির খৈল	২৸৶৩

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ } অগ্রহায়ণ---১৩৪৫ { ৮মসংখ্যা

লাক্ষা শিল্পের প্রতিষ্ঠা

(বিহার গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ মামুদের অভিভাষণ)

গত ২৩শে আগষ্ট পাটনা সহরে বিহার গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিং গৃহে লাক্ষা কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। বিহার গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন বিভাগের (Development) মন্ত্রী ডাঃ মামুদ এই সভা আহ্বান করেন। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম এবং পরিশ্রমে সভার উদ্দেশ্য সফল হয়। যুক্তপ্রদেশের উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ কাটজু, মধ্যপ্রদেশের উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ভারুকা এবং লাক্ষা শিল্প ও ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

আলোচনার ফলে লাক্ষা শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবিত এবং উন্নতির পন্থা নিরূপিত হইয়াছে। মাননীয় ডাঃ মামুদের চেষ্টায় ইতিমধ্যে লাক্ষার দরও একটু চড়িয়াছে। আশা করা যায়, লাক্ষা উৎপাদনকারী শিল্পিদের ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। এই সভার উদ্বোধনে মাননীয় ডাঃ মামুদ যে অভিভাষণ করেন, আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত করিলাম। আমাদের আশ্বিন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" "লাক্ষা প্রস্তুত প্রণালী" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই সম্পর্কে পাঠকগণ তাহা দেখিবেন।

মাননীয় ডাঃ মামুদের অভিভাষণ

আমি প্রথমে লাক্ষা শিল্পের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে লাক্ষা শিল্প সম্বন্ধে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য এই আলোচনা অনেকটা সাহায্য করিবে।

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে লাক্ষা শিল্প প্রচলিত আছে। অথর্ব্ব বেদে এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। লাক্ষা হইতে প্রধানতঃ রং ও রজন এই দুইটী জিনিস তৈয়ারী হইয়া থাকে। দেখা যায়, প্রাচীন কালে রং এর জন্যই লাক্ষা ব্যবহার হইত খুব বেশী। লাক্ষার রংএর দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত। লাক্ষার রজন একটা অতিরিক্ত জিনিসের মত (By product) ছিল,—উহাকে কোন কাজে লাগান হইত না। মোগল শাসন সময়ের ইতিহাসে দেখা যায়, এই রজনের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। আসবাব পত্রাদি বার্ণিশ করিবার জন্য লাক্ষা রজন ব্যবহারের কথা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে বীজ লাক্ষা এবং তৈয়ারী লাক্ষা ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে রপ্তানী হইতে থাকে। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়কার কাগজ পত্রে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিদেশে ভারতীয় লাক্ষার চাহিদা বাড়িতে থাকে। তখন এইদেশে অনেক লাক্ষার কারখানা স্থাপিত হয়। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই সেই সকল কারখানার মালিক ছিলেন। এই সময়ে লাক্ষা হইতে রং তৈয়ারী করিবার নানা প্রকার বিশেষ উপায় উদ্ভাবিত হয়। সুতরাং তখন লাক্ষার রজনের উপর আর কাহারও আদর থাকে না। উহা এক রকম ফেলিয়াই দেওয়া হইত। স্যার জর্জ্জ ওয়াট্ (Commercial Products of India গ্রন্থের প্রণেতা) বলেন, বর্ত্তমান সময়ে লাক্ষার চাষ, সংগ্রহ ও নির্ম্মাণ শিল্প, যেভাবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, লাক্ষার রং-এর উন্নতির দিকেই ব্যবসায়ী, শিল্পী ও চাষীদের বেশী ঝোঁক;—রজন তৈয়ারীর দিকে তেমন বেশী মনোযোগ নাই।

ইউরোপে কৃত্রিম রং (Aniline Dye) আবিষ্কৃত হইবার পর এই লাক্ষা জাত রং শিল্প এমন একটা নিদারুণ আঘাত পায় যে, আর তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। সেই হইতেই লাক্ষার রঞ্জন শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সঙ্গে সঙ্গে লাক্ষার রজনেরও নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় কারখানার মালিকেরা রং তৈয়ারী ছাড়িয়া রজন বা গালা তৈয়ারীর দিকে মনোযোগ দিলেন। সেই গালাই বর্ত্তমান সময়ে একটী প্রধান পণ্য দ্রব্য;—লাক্ষার রং এখন একটা বাজে জিনিস বলিয়া গণ্য হয়।

লাক্ষা-শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় এইরূপ দেখা যায়, কখনও লাক্ষার রং,—কখনওবা লাক্ষার রজন বাণিজ্য জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শেষে কৃত্রিম রং এর সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া লাক্ষার রং বাজার হইতে চিরদিনের তরে বিলুপ্ত হয়। লাক্ষার রজন যদিও কিছুকাল প্রধান হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে কৃত্রিম রজন আবিষ্কার হওয়াতে লাক্ষার রজনের ব্যবসায়ও বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। কৃত্রিম রজন (Synthetic resin) আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য, বার্ণিশ, বিজ্‌লীর কলকব্জা, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছাঁচ প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য লাক্ষার রজন ব্যবহৃত হইত। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে লাক্ষার রজনের চাহিদা কিছু কম ছিল। যুদ্ধের

পর ইহার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। হিসাবে দেখা যায় যুদ্ধের পূর্ব্বে লাক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল গড়ে বার্ষিক ৪৩৪ হাজার হন্দর। যুদ্ধের সময় উহা কিছু কমিয়া দাঁড়ায় ৩৪৫ হাজার হন্দর। যুদ্ধের পরে একটু বাড়িয়া ৪১৬ হন্দরে উঠে। কিন্তু সম্প্রতি লাক্ষার চাহিদা আশ্চর্য্যরকম বাড়িয়া গিয়াছে। গত ৫ বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, লাক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ গড়ে বার্ষিক ৬৬০ হাজার হন্দর হইয়াছে। কৃত্রিম রঞ্জন আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও লাক্ষার চাহিদা কমে নাই,—তাহার কারণ এই যে, কৃত্রিম লাক্ষার মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী। সুতরাং প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক লাক্ষা এখনও বাজারে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম লাক্ষার মূল্য কমিয়া আসিলে এই চাহিদা কতদূর টিঁকিবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

ছোটনাগপুর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই লাক্ষাকীট ভাল জন্মে। ঐরূপ জলবায়ুর অবস্থাতেই তাহারা খুব জোরাল রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সেইজন্য ভারতীয় লাক্ষার অধিকাংশই ছোটনাগপুরে উৎপন্ন হয়। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ১০॥০ লক্ষ মণ লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ মণ উৎপন্ন হইয়াছিল ছোটনাগপুরে। ঐ ছয় বৎসরে ছোটনাগপুরে লাক্ষা ফসলের মূল্য হয় এক কোটী ১০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য ফসলের মূল্য পাওয়া যায় তিন কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে সমগ্র ভারতে উৎপন্ন লাক্ষার শতকরা ৭০ ভাগ উৎপন্ন হয় ছোটনাগপুরে এবং উহার লাক্ষাফসলের মূল্য অন্যান্য ফসলের তিনভাগের একভাগ। ধান্যই ছোটনাগপুরের কৃষকদের প্রধান চাষের ফসল কিন্তু ধান্যের চাষে কৃষকেরা সারাবৎসর ধরিয়া নিযুক্ত থাকিতে পারেনা। বাধ্য হইয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে আলস্যে কাটাইতে হয়। এমন অবস্থায় লাক্ষার চাষ তাহাদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। ইহার জন্য কৃষকদিগকে খুব বেশী টাকা মূলধন স্বরূপ নিয়োগ করিতে হয় না। যে জমিতে লাক্ষার গাছ জন্মে, সেই জমি সাধারণতঃ অন্য ফসলের অনুপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং সেই হিসাবেও কৃষকের কোন ক্ষতির কারণ নাই। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান সময়েও ছোটনাগপুরের কৃষকেরা অবসর সময়ে পরিশ্রম করিয়া লাক্ষার ফসল হইতে বার্ষিক অন্ততঃ এক কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

লাক্ষার ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা দরকার কিরূপে আমাদের স্বদেশেই বিবিধ শিল্পদ্রব্যে লাক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে পরিমাণ লাক্ষা উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ২ ভাগ মাত্র দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথচ বিদেশ হইতে লাক্ষা নির্ম্মিত বহু লক্ষ টাকার জিনিস ভারতে আমদানী হয়। লাক্ষার দর প্রতিমণ ২৫০ টাকা হইতে ১৫ টাকায় নামিয়া গেলেও ঐ সকল আমদানী শিল্পের মূল্য কিছু মাত্র কমে নাই; সুতরাং ভারতীয় লাক্ষা যাহাতে ভারতেই বেশীরভাগ ব্যবহার হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টের লাক্ষা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের দায়িত্ব গুরুতর। পেইণ্ট, বার্ণিশ, নানাপ্রকার ছাঁচ, গ্রামোফোনের রেকর্ড, বিজলী সংক্রান্ত যন্ত্র পাতি, এইসব তৈয়ারী করিতে প্রচুর লাক্ষা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে

লাক্ষার যে রংটা অকেজো বলিয়া ফেলা যায়, তাহাকেও কোন প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের লাক্ষা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

গত ৭৮ বৎসরে লাক্ষার মূল্য গড়ে প্রতি-মণ ২০ টাকা হইতে ১০০ টাকায় উঠা-নামা করিয়াছে। লণ্ডনের গুদামজাত লাক্ষার পরিমাণ কিছু কমিয়া আসিলেই কলিকাতার বাজার দর চড়িয়া যায়। সম্প্রতি লাক্ষার মূল্য ২০ টাকারও নীচে নামিয়াছে। লণ্ডনের গুদাম সঞ্চিত লাক্ষার পরিমাণ বৃদ্ধি, ভারতে অতিরিক্ত উৎপাদন, কৃত্রিম লাক্ষার আবিষ্কার এই সকল কারণ মিলিয়া ভারতীয় লাক্ষার দর কমাইয়া দিয়াছে। ১৯৩৫ সালে সমগ্র পৃথিবীতে স্বাভাবিক লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছিল ৪০ হাজার টন, কিন্তু কৃত্রিম লাক্ষা তৈয়ারী হইয়াছিল ১৬০ হাজার টন। ইহার সহিত প্রতিযোগীতা করিবার জন্য উত্তম লাক্ষা উৎপাদন এবং লাক্ষাব ব্যবহার বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

গাভী পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার বি. এল.)

ঢাকা কলেজের একজন সাহেব প্রফেসার (১৮৭৪ খৃঃ অঃ) বলিয়াছিলেন তিনি যখন বঙ্গদেশে প্রথমে আইসেন তখন এদেশের খর্ব্বকায় গাভী সকল দেখিয়া মেষ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার কোনও কোনও স্থলে গাভীর এরূপ অবনতি হইয়াছে যে, সাহেবের ঐ উক্তির সার্থকতা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঐ শ্রেণীর গাভীগুলির দুধের পরিমাণ এত অল্প যে, লোকে কেবল ক্ষেতের আবশ্যকীয় সারের জন্য তাহাদিগকে পালন করে। খাদ্যাভাবই ঐ অবনতির প্রধান কারণ।

অনেক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ গাভীর জাতের উপর দুগ্ধের পরিমাণ নির্ভর করিলেও দেখা যায় যে, দুগ্ধ নিঃসারক প্রচুর খাদ্য দিলে ঐ সকল গাভীই দৈনিক দুইসের দুধ দেয়। গাভী, বাস্তবিকই দুগ্ধপ্রদ একটা যন্ত্র স্বরূপ। গোপালন বিষয়ে ইয়ুরোপে, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ড দেশ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তথায় এক একটী গাভী দৈনিক ২৭ সের দুগ্ধ দেয়। এই দেশ দুইটী ইয়ুরোপের মধ্যে ক্ষুদ্র হইলেও, সমগ্র ভারতে যত গো আছে, ডেন্‌মার্কে তদপেক্ষাও অধিক গো-সংখ্যা দৃষ্ট হয়।

দুগ্ধ ও বৎস দ্বারা একটী উত্তমজাতের গাভীতে বার্ষিক হাজার টাকা আয় হইতে পারে। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে অনেক গরীব লোক কেবল গাভী পালন করিয়া তাহার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করে। দুগ্ধবতী ও প্রতিবৎসর বৎসপ্রসবিনী গাভী পালনই লাভজনক। শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে। ঐ সময়ে দুগ্ধ দেয় এইরূপ গাভী রাখিলে সমধিক লাভ হয়। পতি-পুত্রহীনা অসহায় বিধবাগণও গাভী পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

উত্তম জাতের গাভী বলিলে, তাহার পিতা ও মাতা উভয়ই এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ উত্তম জাতের (বংশের) হওয়া আবশ্যক। এইগুলি-কে ইংরেজীতে "পেডিগ্রী" (Pedigree) পশু বা কুলজী বিশিষ্ট পশু বলে এবং তাহাদের বিষয় পূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভালগাভী ও ভাল ষণ্ডের মিলনজাত গাভীর বংশের কুলজী রাখিতে হয় এবং এই গুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট বৎস ও উৎকৃষ্ট বৎসতরী, বংশবৃদ্ধির জন্য মনোনীত করা হয়। একই বংশের গাভী ও ষাঁড় মিলিত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

বিলাতী উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী কি ষাঁড়ের সহিত, দেশীয় ষাঁড় কি গাভীর মিলন জাত যে গাভী হয় তাহার দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হইলেও অসুবিধা এই যে, গো মড়কে এইগুলি সহজে মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

ইংল্যাণ্ডের বাকিংহাম্ শায়ারের একটী গাভী,—"ব্রিটিশ্ ফ্রিজিয়ান্ কাউ" (British Friesian Cow) ২৩ ঘণ্টায় ১০৫¾ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড ওজন—প্রায় অর্দ্ধসের) দুগ্ধ দেয় ; ইংল্যাণ্ডের ১৫টী ফ্রিজিয়ান্ জাতীয় গাভীর মধ্যে "২নং কল্টন্ সিক্রেট্" (Colton Secret II) একবৎসরে ২ হাজার গ্যালন (১ গ্যালন—৩ সের) দুগ্ধ দেওয়ায় দৈনিক গড়ে ১৬½ সের করিয়া দুগ্ধ দিয়াছে।

উত্তম জাতের গাভী ও বাছুর।

কানাডা রাজ্যের অন্টেরিওর পিটারবরো নগরের নিকট একস্থানে "হলষ্টিন্" (Holstein) জাতীয় একটী গাভী ১০৫ দিনে ১৯৬৬৯ পাউণ্ড)—দৈনিক গড়ে ৩২ সের) দুগ্ধ দেয় ও ৮১৯ পাউণ্ড (—দৈনিক গড়ে ৮/১০ ছটাক) মাখন তাহা হইতে প্রস্তুত হয়।

দ্বারভাঙ্গা জেলার সমস্তিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরবর্ত্তী পুষানামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত "পুষারিসার্চ্চ ইন্ষ্টিটিউটে" (Pusa-Research Iustitute) সপ্রমাণ হইয়াছে, যে উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড়ের সংযোগে যে বকনা বাছুর জন্মে সে অধিক দুগ্ধবতী হয়।

রঙ্গপুরের গোশালায় গাভী ও ষণ্ড নির্ব্বাচন দ্বারা সে এক উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী জন্মিয়াছে (১৯২৪) তাহাদের দুগ্ধ তথাকার সাধারণ গাভীর ৫ গুণ অধিক। তথায় ইংরাজী ১৯২০ সালে একটী গাভী বৎস প্রসবের পর ৩০০ দিনে ৫০০ পাউণ্ড (দৈনিক গড়ে ১৩¾ ছটাক) দুগ্ধ দিত এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৫০০ এবং ১৯২৩ খৃঃ অব্দে তথায় প্রত্যেক গাভী প্রসবের পর ৩০০ দিনে ৪ হাজার পাউণ্ড (দৈনিক গড়ে ৬¾ সের) দুগ্ধ দেয়। তৎপর কোনও কোনও গাভী দৈনিক ৯।১০ সের দুগ্ধ দিতেছে। বঙ্গদেশের মধ্যে এই গাভীগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতের।

সিন্ধু প্রদেশে করাচী নগরে মালির নামক স্থানে বোম্বে গভর্ণমেণ্টের গোপালনের যে একটী

গোশালা আছে, তাহার প্রত্যেক গাভীর দৈনিক গড়ে ৮ সের দুগ্ধ হয়। প্রসবের পর ৩০০ দিনে, ঐ গোশালার ভাল একটা গাভী ৫০০০ পাউণ্ড (দৈনিক গড়ে ৮৩ সের) দুগ্ধ দেয়।

দুগ্ধেলা গাই ও বাছুর।

পাঞ্জাবের হিসার জেলার গাভী সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দেশী গাভী ও বিলাতী জার্সি (Jersey) ষাঁড় সংযোগে যে গাভী উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও উৎকৃষ্ট। উপরোক্ত "পুষা রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ফারমে শাহাবাদ জেলার ষাঁড় এবং শাহাবাদ, বালিয়া, কোশী, * শোনপুর, বরাপুর প্রভৃতি মেলায় ভাল ভাল গাভী পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবের জলবায়ু অনুকূল বিধায় তথায় উৎকৃষ্ট জাতীয় গো-মহিষ জন্মিয়া থাকে। তথাকার "মণ্টগোমারী" গাভী, সিন্ধুদেশের, গুজরাটের, মান্দ্রাজের নেলোর জেলার গাভী উৎকৃষ্ট। কলিকাতার চিৎপুরে এবং গোয়াবাগানে অনেক ভাল জাতীয় গাভী আমদানী হয়।

গাভীর উপযোগী, সমান আকারের ষাঁড় থাকা আবশ্যক। দুই তিন গ্রামের লোক একত্র হইয়া একটি উৎকৃষ্ট জাতের ষাঁড় খরিদ করতঃ তাহা গ্রামের প্রধান লোকের জিম্বায় রাখাই সুবিধাজনক; কারণ তাহা হইলে ষাঁড় দ্বারা শস্যের অনিষ্ট হওয়ার কি ষাঁড় চুরি যাওয়ায় আশঙ্কা থাকে না। যে গাভীর সঙ্গে ষাঁড়ের যোগ হয় সেই গাভীর আকারও ষাঁড়ের তুল্য হওয়া আবশ্যক; কারণ ষাঁড়, গাভী অপেক্ষা বৃহৎকায় হইলে গর্ভস্থ বৎসও, বৃহৎকায় হওয়ায়, প্রসব কালে ক্ষুদ্রকায় গাভীর বিশেষ কষ্ট হয়।

উৎকৃষ্ট গাভীর লক্ষণ

যে ব্যক্তি, দুগ্ধ ও বৎসের জন্য গাভী পালন করে তাহার পক্ষে অন্য কোনও পশু প্রতি-পালন করা প্রশস্ত নয়।

শান্ত প্রকৃতি, গ্রীবা ছোট, পাছা বড়, পা ছোট ও সরু; লেজ লম্বা ও চামরযুক্ত; পেট মোটা; ওলান ও পাকস্থলী বড়; অধিক আহারী; লবণ খাইতে ভালবাসা; চর্ম্ম কোমল; দুইটী শিং কিছু চ্যাপটা ও বাঁকাইয়া ভিতর দিকে গত;—এইগুলি উৎকৃষ্ট গাভীর লক্ষণ।

গাভীর যত্ন

দুগ্ধবতী গাভী, শীত, গ্রীষ্ম, সূর্য্যোত্তাপ, বৃষ্টি, হিম ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না। মশা মাছি তাড়াইবার জন্য সন্ধ্যার সময় ঘরে ধূম দেওয়া হইবে; "উড অয়েল" (wood oil = কাষ্ঠ চোয়ান তৈল) কি কেরোসিন ছিটান আরক ঘরে ছিটাইয়া দিলে কিম্বা মোটা কম্বল

কি হেসিয়ান চট দ্বারা গাত্র ঢাকিয়া দিলেও মশা মাছির উপদ্রব নিবারণ হয়। গোবর ও চোনা পরিষ্কার করতঃ ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে; সর্ব্বদা বায়ু চলাচল তৈলের প্রক্ষেপযুক্ত জলে গাভীর গাত্র ধৌত করিয়া দিতে হইবে। শীতকালে শীত নিবারণ জন্য কম্বল, কি চট ইত্যাদি দ্বারা গাত্র ঢাকিয়া দিতে হইবে এবং মেজেতে শুষ্ক খড় ইত্যাদি
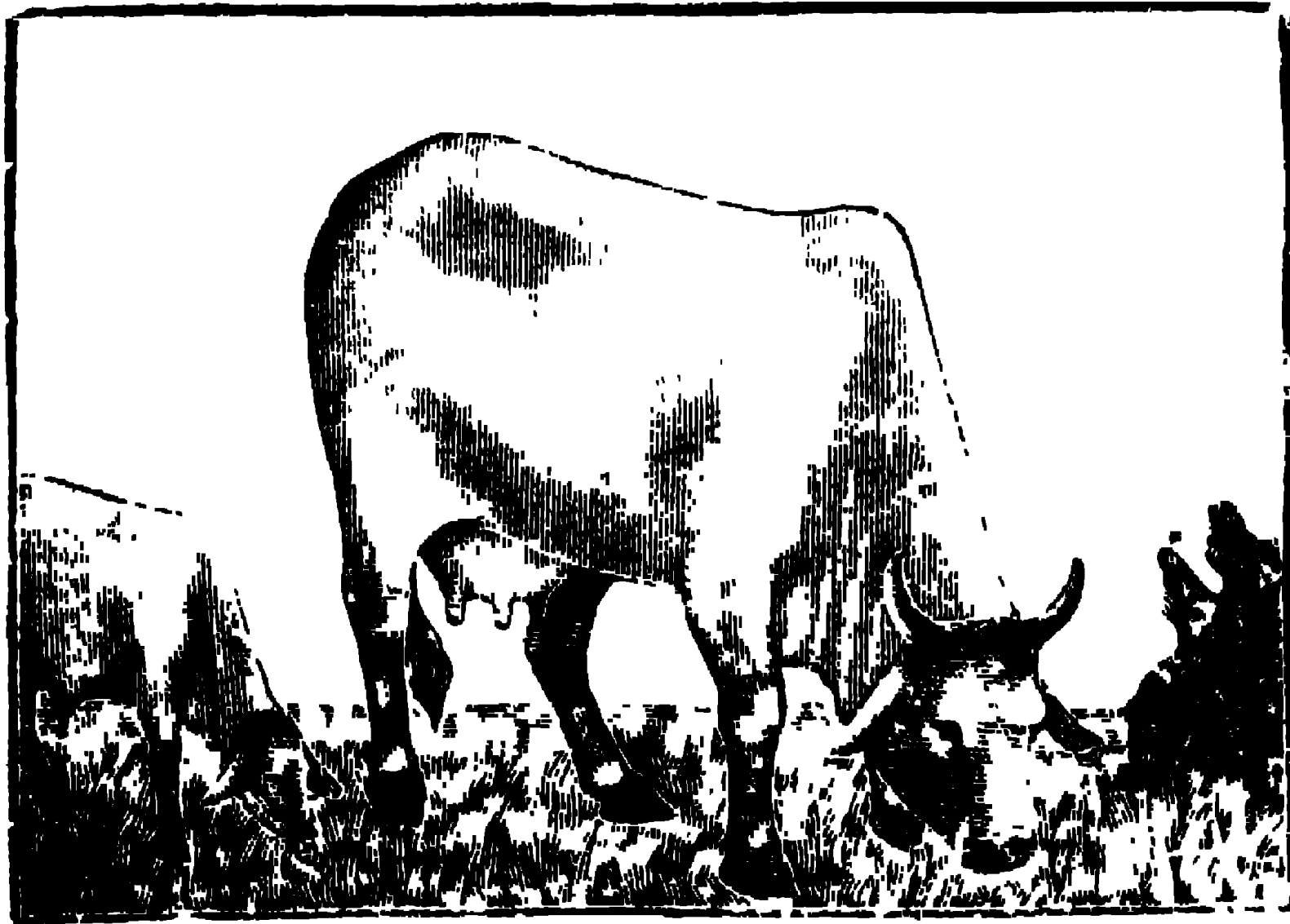
স্বাস্থ্যবতী গাভী ও বাছুর।

জন্য জানালার বন্দোবস্ত থাকিবে। আটালু ও ময়লা না থাকে তজ্জন্য গাভীর গাত্র ব্রাশ দ্বারা মাজিয়া দিতে হইবে এবং পারম্যাঙ্গানেট অব পোটাসিয়ামের কি তদভাবে কেরোসিন বিস্তৃত করিয়া দিতে ও মেজে সর্ব্বদা শুষ্ক রাখিতে হইবে; ঘরে কোনও প্রকার দুর্গন্ধ না থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

* কোশীমেলার গাভী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হইলেও দৈনিক ৭।৮ সের দুগ্ধ দেয়; তথাকার ষাঁড়ও উৎকৃষ্ট। সেই ষাঁড় সংযোগে যে বকনা বাছুর হয় তাহার অধিক দুধ হয় এবং এড়ে বাছুরও বলিষ্ঠ ও ভারবহন পটু হয়। নাগপুরী বলদ, ভারবহন ও গাড়ী টানা কার্য্যে উৎকৃষ্ট; তাহা বৃহৎকায় বিধায় তাহার জন্য অধিক খাদ্য আবশ্যক।

কিন্তু পুষা ফারমে, বিলাতের বিশুদ্ধ জাতীয় "আয়ার-সায়ার" (Ayreshire) ও "মণ্টগোমারী" Montgomery) গাভী ও ষাঁড়ও আছে। এই দুই জাতের মিলনে যে সঙ্কর জাতীয় গাভী ও ষাঁড় উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও উত্তম।

যন্ত্রশিল্প বনাম খাদির বাণী

গান্ধীবাদের অন্যতম বিশেষত্ব হ'ল খাদির বাণী প্রচার। এই বাণী যদি কোন সাধারণ লোকে প্রচার করতো তাহ'লে কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু এ বাণী যিনি প্রচার করেন তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর সমস্ত প্রভাব নিয়োজিত হয়েছে খাদির বাণী প্রচার কল্পে। অপরাপর দার্শনিক মতবাদের মত এ বাণী কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা নয়, মানুষের কষ্টপূর্ণ জীবনযাত্রার দৈনন্দিন দ্বন্দ-সংঘাতের সমন্বয় এতে পাওয়া যায়—অন্ততঃ প্রচারকেরা তাই ত বলে থাকেন। মহাত্মাজী এমন মতও প্রকাশ করেছেন যে, খাদীর বাণীর মধ্যে জনগণের মুক্তির সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে! ভারতবর্ষের মধ্যে এই মত পোষণকারী ব্যক্তি বহু আছেন, কংগ্রেসের মধ্যেও খাদীভক্তের সংখ্যা কম নয়। সুতরাং খাদির বাণীর যথার্থতা ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

পাঠকদের বোধহয় স্মরণ আছে যে কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানকে কি করে জাতীয় উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করা যায় তারই পন্থা উদ্ভাবন করা। সেদিনকার সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে এবিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ডাঃ সাহা একজন ভারত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ভারতের বাইরে আন্ত-র্জাতিক বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট তাঁর সমাদর আছে। কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি এইমর্ম্মে সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন যে, বৃহৎ শিল্প ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ছাড়া ভারতের জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। তাঁর ঐ বিবৃতির পেছনে সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ছিল, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল এবং সবচেয়ে বড় যে-জিনিস ভারতবর্ষের প্রতি জাতীয় দরদ সেটাও ছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেইটাই খাদিভক্তদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। তাই নিখিল ভারত চরকাসঙ্ঘ ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের প্রতিনিধি শ্রীকুমারাপ্পা এক আক্রমণাত্মক বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর বিবৃতির মধ্যে খাদির প্রতি অন্ধ ভক্তির জন্য যুক্তির ছিটে-ফোঁটাও পাওয়া যায়নি। অপরাপর খাদিবাদীর মত তিনিও ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়েছেন কিন্তু একথা ভাবেননি যে আধ্যাত্মিকতার দোহাই একটা যুক্তি নয় এবং বিংশ শতাব্দীতে ঐ জিনিস চলে না। সেইজন্যই ডাঃ সাহা বিশেষ করে উক্ত সভার আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এসম্পর্কে দেশবাসীর নিকট প্রকৃত তথ্য বিবৃত করা। আরও একটি বিষয় ডাঃ সাহাকে ঐরূপ সভার অনুষ্ঠান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কংগ্রেস আজ ভারতবর্ষের সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছে এবং কংগ্রেস বরাবরই বলে আসছে যে তার উদ্দেশ্য দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা। কংগ্রেসের হস্তে যখন রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল না তখনকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বর্ত্তমানে সে আংশিক রাজ্যভার আয়ত্ত করার দরুণ তার উচিত জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি কল্পে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত সেরকম কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় নি। একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি কিংবা অন্যায় হবেনা যে, গান্ধীবাদীদের হস্তে যতদিন কংগ্রেসের পরিচালনাভার ন্যস্ত থাকবে ততদিন কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। বৃহৎ শিল্প প্রবর্ত্তন অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্য ব্যতীত যে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় একথা বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন মননশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝে থাকেন, অথচ গান্ধীবাদীরা যন্ত্রশিল্পের বিরোধী! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-গান্ধীবাদী যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধতা করেন সেই ব্যক্তিই জলস্রোত থেকে বিজলীশক্তি উৎপন্নের ব্যাপার সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হন। এদের ঘরে বিজলীবাতি পাখা চাই, যানবাহনের জন্য মোটরকার, ষ্টীমার, রেল, এরোপ্লেন, খবরের-

কাগজ ছাপার জন্য latest and uptodate Rotary machine প্রভৃতি সকল রকম যন্ত্র শিল্পের সাহায্য চাই। এই জন্য লোকে এঁদের কথায় ও কাজে কোনও মিল দেখিতে পায় না।

আমরা উপরোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম এই দেখানোর জন্য যে, খাদীভক্তদের মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই বরং স্ববিরোধিতা আছে। নইলে তাঁদের খাদিভক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা যন্ত্রশিল্পের বিরোধিতা করেন, আবার জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাপারে তাঁরা যন্ত্রশিল্পেরই কামনা করেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁদের মতবাদের পেছনে কোন যুক্তি নেই, বরং প্রচুর মোহ আছে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সামাজিক উন্নতির ব্যাপারে এ জিনিসটা ক্ষতিকারক। সেই জন্যই বিজ্ঞান কলেজের সভায় ডাঃ সাহা রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে যন্ত্রশিল্পের প্রসারতা সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করেন। ব্যক্তিগতভাবে সুভাষবাবু জানান যে তিনি শিল্প প্রসারতার পক্ষপাতী। সুভাষচন্দ্রের একথা থেকে কংগ্রেস বৃহৎ শিল্প-প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী কি'না সেটা বোঝা যায় না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সেইখানে। পূর্ব্বেই বলেছি যে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশের আংশিক রাজ্যপরিচালনা ভার গ্রহণ করেছে। সুতরাং সেখানে যান্ত্রিক শিল্প-প্রসারতার যদি কোন ব্যাপক পরিকল্পনা অনুসৃত না হয় তাহলে কিছুতেই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। অথচ ব্যাপার হচ্ছে যে, খাদীর বাণী এই যান্ত্রিক শিল্প প্রসারতার বিরোধিতা করে।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, খাদির বাণীর সঙ্গে শিল্প প্রসারতার কী সম্পর্ক থাকিতে পারে? সাধারণের পক্ষে এপ্রশ্ন উত্থাপন করা স্বাভাবিক। খাদীর বাণী যদি শুধু খাদির প্রচার বার্ত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু তার সঙ্গে বৃহৎ শিল্প প্রচেষ্টার সংঘাত বেধেছে। সেইজন্যই আমরা ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও শ্রীকুমারাপ্পার বিবৃতির কথা উল্লেখ করিলাম। উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হবে যে উভয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে কোন মিল নেই বরং পার্থক্য আছে প্রচুর। মতবাদের এই যে সংঘর্ষ তা' সমাজজীবনের শান্তিকে ভয়ঙ্কর ব্যাহত করছে। যে মহান্ পুরুষ ঐ খাদির বাণী প্রচার করছেন তিনি যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী অথচ আমরা দেখতে পেয়েছি যে যন্ত্রশিল্পের প্রসারতা ছাড়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সুতরাং খাদির বাণীকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না।

তবুও আমাদের খাদির বাণীর স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে তা আলোচনা করা যাক্। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এক মহৎ ব্যক্তির আজীবন প্রচেষ্টা খাদির স্বপক্ষে কাজ করছে। তিনি বলেন যে, খাদি হচ্ছে আমাদের সামাজিক জীবনের শান্তির অগ্রদূত, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও হ'ল একান্ত স্বাবলম্বী। এই যে যুক্তি, এর স্বপক্ষে এবার বিচার করা যাক্। আমরা সরাসরি বলতে পারি যে, বর্ত্তমান যুগে ও-যুক্তি মোটেই গ্রহণীয় নয়। ও যুক্তি তখনি চলতো যখন প্রাচীনযুগে গ্রামগুলি ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃনির্ভরশীল। প্রত্যেক গ্রামের উৎপাদন তার নিজের সীমার মধ্যে বণ্টন হ'ত, বাইরে থেকে কোন সাহায্য দরকার করতো

না। বিনিময় প্রথা তখন মোটেই রূপ নেয় নি, কিংবা যদি নিয়ে থাকে ত তা' অতি অল্পই। আজ কি সেই অবস্থা বর্ত্তমান আছে? আজ কি ভারতের বা জগতের প্রত্যেক গ্রাম স্বতঃ-নির্ভরশীল ও বিচ্ছিন্ন? মোটেই নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর যন্ত্রবিপ্লব প্রাচীন যুগের শেষ ধাপকেও একেবারে নিঃশেষে ভেঙ্গে দিয়েছে। সুতরাং আজ আর আমরা বিজ্ঞান বিরোধী হয়ে প্রাচীন-যুগে ফিরে যেতে পারিনে, যদিও বা যাই তাতে আমাদের লাভ নেই বরং লোকসানই প্রচুর।

গান্ধীবাদীরা কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে চান না, তাঁদের এ ব্যাপারটা কিছুতেই বোঝানো যায় না, যে শিল্পের দিক দিয়ে মিলের বস্ত্রের কাছে হাতের খাদী অচল। মিলের বস্ত্র যেখানে সস্তায় বিক্রী হয়, সেখানে লোকে চড়ামূল্যে খাদি কিনবে কেন? দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে যদি লোককে খাদি কিনতে বাধ্য করানো যায় এবং তর্কের দিক দিয়ে যদি এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, অধিকাংশ লোক খাদিই কিনলো। তাহ'লে মিলবস্ত্রের কি হবে? প্রথমতঃ চড়া দামে লোকে যদি খাদি কেনে ত তাহলে তার আর্থিক লোকসান; দ্বিতীয়তঃ, খাদির দ্বারা দেশের লোকের বস্ত্রের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়, তৃতীয়তঃ, খাদি উৎপাদনে শ্রমিকের যে শ্রম ব্যয়িত হয় সেটা অপর কিছুতে নিয়োজিত হলে তা' অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারতো। খাদিভক্তেরা আর একটি যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, খাদির দ্বারা বহু বিধবা প্রতিপালিত হয়, সুতরাং খাদি ক্রয় করা উচিৎ এ যুক্তিও টেঁকসই নয়। সত্যই যদি বিধবারা খাদির দ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহলে তাতে কারোও কিছু আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু একজনের প্রতিপালনের জন্য আর একজন লোকসান দেবে কেন? ব্যবসার ক্ষেত্রে ত দাতব্যের স্থান নেই; যদি আমরা তখনি কিনতে পারি। যখন তার সুবিধা অপর বস্ত্রর তুলনায় বেশী বা সমান সমান। আমরা জানি খাদির সুবিধা কিছুই নেই বরং অসুবিধাই বেশী, এক্ষেত্রে খাদির বাণী আমাদের কর্ণে কেন প্রবেশ করবে?

কিন্তু খাদির পক্ষে খাদিভক্তেরা আর একটা বড় যুক্তি দিয়ে থাকেন যদিচ কার্য্যতঃ তার কোন মূল্য নেই। তাঁরা বলে থাকেন যে, খাদি হচ্ছে ভারতীয় কৃষকের একটা একস্ট্রা বা অতিরিক্ত অবলম্বন যার থেকে সে কিছুটা উপকার পেতে পারে—সুতরাং সেই হিসাবে কৃষিশিল্পের সঙ্গে অতিরিক্ত শিল্প হিসাবে খাদিরও প্রচলন প্রয়োজন। ব্যাপারটা প্রকৃতই যদি সত্য হত অর্থাৎ অতিরিক্ত শিল্প হিসাবে খাদিকে অব-লম্বন করে কৃষকেরা যদি কিছু লাভ করতে পারতো তাহ'লে খাদির প্রচলনে কেউ আপত্তি করতো না। কিন্তু আসলে তা' হয় না। কোন কৃষক খাদির সূতা কেটে লাভ করা ত দূরের কথা তার নিজের বস্ত্রই উৎপাদন করতে পারে না। প্রাণপণ পরিশ্রমে যদিও বা পারে তাতে তার মজুরী পোষায় না। যেখানে আজ ১০৷১২ আনা খরচ করলে একখানা মিলের কাপড় আসে সেখানে ঐ ১০৷১২ আনার জন্য সে কেন মাসের পর মাস পরিশ্রম করবে? সে সেই পরিশ্রমটা অপর কোন ফলপ্রসূ কাজে নিয়োগ করবার দিকেই ঝোঁকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাস্তবক্ষেত্রে খাদি শিল্পকে অতিরিক্ত জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলেও চাষীরা লাভ-বান হয় না। সেইজন্যই কংগ্রেস, নিখিল

চরকা সঙ্ঘ প্রভৃতির প্রচারকের দ্বারা হাজার খাদির বাণী প্রচার করা সত্ত্বেও সাধারণ চাষী কিছুতেই সে কথায় কর্ণপাত করেনি।

এই হ'ল বাস্তব অবস্থা কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গান্ধীবাদীরা কিছুতেই এই বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে চান না। যে সম্পদ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাছে ও ব্যবহারিক পরীক্ষার কাছে অনবরত হটে যাচ্ছে তাকে ক্রমাগত জোর করে টিকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টার মধ্যে মতবাদের প্রতি অন্ধভক্তি থাকতে পারে কিন্তু বিচারবুদ্ধি থাকে না। এতে করে আমাদের জাতীয় উন্নতি ভয়ঙ্কর ব্যাহত হয় এবং জাতীয় সম্পদও বেড়ে ওঠে না। আমাদের প্রয়োজন কোন' আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা নয়, আমাদের প্রয়োজন আয় বৃদ্ধির। পেটে যে খেতে পাচ্ছে না, ক্ষুধার জ্বালা' যে জর্জ্জরিত তার কাছে মজুরীর বাণীই একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ, খাদির বাণীর আধ্যাত্মিকতা তাকে কি সান্ত্বনা দেবে? সেইজন্যই তোকলী বা চরকার কথা বললে তাদের পেট ভরবে না, তাদের পেট ভরবে এমন কোন যন্ত্রের কথা বললে যাতে কম সময়ে বেশী উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। সেইজন্যই খাদিকে যদি চালাতেই হয় ত প্রচলিত চরকায় চলবে না, এমন চরকা উদ্ভাবন করো যার উৎপাদিত সুতো থেকে তারা দৈনিক অন্ততঃ ছ'টী পয়সাও লাভ করতে পারে—নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের মারফৎ প্রচার করো সেই যন্ত্র গ্রামে গ্রামে। তখন দেখা যাবে যে, আয়ের লোভে চাষীরা যেচে গ্রহণ করছে সেই যন্ত্র। নইলে খাদীর বাণী তাদের কি কাজে আসবে? সমাজেরও তা দিয়ে হবে কি কল্যাণসাধন?

সে যন্ত্র যদি উদ্ভাবন করিতে না পারা যায় ত বৃহৎ শিল্পপ্রসারতার বাধা দেওয়া চলবে না। আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ ভারতবর্ষে শিল্প-প্রসারতার এখন বহু ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, সুতরাং বৃহৎ শিল্প প্রবর্ত্তনের বাণীই প্রচার করতে হবে চারধারে। তা' যদি করা যায় তবেই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে---বেড়ে উঠবে লোকের মাথা-পিছু আয়ের পরিমাণ। যে কৃষিক্ষেত্রের ওপর অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ পড়েছে সেই কৃষি-ক্ষেত্র থেকে লোক তখন শিল্পক্ষেত্রে ঠেলে যাবার দরুণ কৃষির আয়ও বৃদ্ধি পাবে। এই হ'ল একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা—এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আমরা উপরে সমস্ত বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি। এর থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে যে খাদির প্রতি কোন বিরূপভাব পোষণ করে আমরা কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি, বরং খাদির স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে সেগুলি পরিপূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার গলদ কোথায় তা' পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। তার থেকে এটা আমরা জানতে পেরেছি যে, খাদির বাণী জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়। অথচ যে মহান্ পুরুষ খাদিব্রত সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁর প্রতিও আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা কিছু কম নেই, কিন্তু একথা বলতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিনে যে, ব্যক্তিম চেয়ে জাতির প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের অনেক বেশী। যেখানে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানে ব্যক্তির সমালোচনা করতে আমরা মোটেই ইতস্ততঃ করিনে। সেইজন্যই আমরা বলছি যে, গান্ধীবাদ আমাদের ক্ষতি করছে, আমাদের আর্থিক জীবনের প্রতি
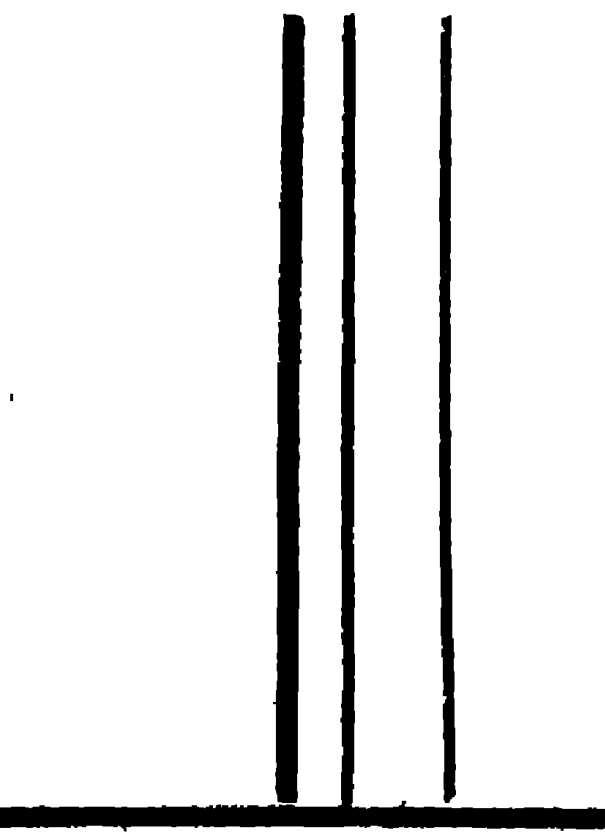
রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা' সৃষ্টি করছে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। তাই একে ত্যাগ করে বৃহৎ শিল্প-প্রবর্ত্তনের বাণী আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তির ক্ষেত্রে একস্-পেরিমেণ্ট চলে কিন্তু সারা জাতির ক্ষেত্রে তা' চলে না—যে তা ক'রে মহান ব্যক্তি হলেও তার ভুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার দিন আজ এসেছে।

চকোলেট প্রস্তুত প্রণালী

বাংলা দেশের সহরে এমন ছেলে খুব কমই আছে যে চকোলেটের নাম শোনেনি। বস্তুতঃ চকোলেটের মতো মুখরোচক খাদ্য ছেলেদের আর কিছু নেই বললেই হয়। শুধু ছেলেরা কেন অনেক বুড়ো লোকও এখনো চকোলেটের নেশাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। এর থেকেই বোঝা যায় চকোলেট সকলকার কী প্রিয় জিনিস। বর্ত্তমান সময়ে সহরের সভ্যতা কতকটা পল্লী-গ্রামেও ঠেল মেরেছে, পল্লীর ছেলেরাও এখন সহরের দ্রব্যসমূহের আস্বাদ পেয়ে থাকে। সেই হেতু পল্লীর ছেলেরাও এখন চকোলেটের পক্ষপাতী। কাজে কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে চকোলেটের কিরকম বিরাট বাজার পড়ে রয়েছে। দেশী কোম্পানীর মধ্যে কেউ কেউ চকোলেট প্রস্তুতের প্রতি মনোসংযোগ করেছেন। ভারতবর্ষে এখন দেশী চকোলেট তৈরী হয় কিন্তু তাদের উৎপাদন এত কম যে চাহিদার তুলনায় তা' অতীব সামান্য। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চকোলেটের আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হবার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা যদি না করি তাহলে নিজেদের নিতান্ত বোকামীর পরিচয় দেওয়া হবে। দেশী চকোলেটের অভাবে বিদেশী চকোলেট বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আমরা যদি আরও কারখানা স্থাপন করতে পারি তাহলেই সে-জিনিসটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে! শুধু তাই নয়, বহু বেকারের তাতে অন্নসংস্থান ঘটবে।

চকোলেট প্রস্তুতের প্রক্রিয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, সুতরাং এর কারখানা স্থাপনের জন্য খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এ জিনিস প্রস্তুতের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে চিনি আর কোকো। কোকো নামক একপ্রকার গাছ হইতে যে ফল হয় তাহারও নাম হ'লো কোকো। ঐ কোকো ফল বস্তা বোঝাই হয়ে বাজারে চালান আসে এবং তাকে ভেজে গুঁড়া ক'রলে চকোলেটের কোকো তৈরী হয়। কিন্তু ভাজবার পূর্ব্বে একটু সতর্কতার প্রয়োজন। বাজারে বস্তা বোঝাই হয়ে যে কোকো ফল চালান আসে তার সঙ্গে পাথর; কাঠের টুকরো, চটের ফালি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে, সুতরাং কোকো ফল ভাজবার পূর্ব্বে ওগুলি পৃথক করা প্রয়োজন। বড় বড় কারখানায় যন্ত্র সাহায্যে ঐ কাজ সাধিত হয়ে থাকে।

কোকোফলকে উক্ত প্রকারে ভেজে নিলে বা ঝলসে নিলে অনেক সুবিধা। প্রথমতঃ উত্তাপে ফলের ভিতরকার তৈলাক্ত পদার্থে পরিবর্ত্তন ঘটনের দরুণ সুগন্ধ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ উত্তাপে ঝলসে নেওয়ার দরুণ রং পালটে যায়। তৃতীয়তঃ, আগুনে সেঁকে নেওয়ার দরুণ ফলের উপরের খোলাটী কুঁকড়ে যায় এবং তাকে সহজেই আলাদা করে নেওয়া সম্ভব হয়।

তাছাড়া, ফলের ভেতরকার শাঁস বাষ্পশূন্য হওয়ার দরুণ তাকে ভালভাবে গুঁড়ানো যায়। বাষ্পযুক্ত শাঁস থেকে ভাল চকোলেট প্রস্তুত হতে পারে না। চতুর্থতঃ উত্তাপে ঝল্‌সানোর দরুণ ফলের ভিতরকার ট্যানিন্ পদার্থের সংস্কার সাধিত হয়।

এইখানে এটা বলা প্রয়োজন যে, উক্ত ঝল্‌সানো কার্য্য কোন আনাড়ি লোকের কর্ম নয়, ওর জন্য রীতিমত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে বেশী ঝল্‌সে না যায় আবার কম ভাজা না হয়ে পড়ে। সামান্য মুড়ির চাল তৈরী করার ব্যাপারটা যারা জানেন তাঁরাই এ জিনিসটা সহজেই বুঝতে পারবেন। সুতরাং এটা বোঝা যায় যে, এই ভাজার ব্যাপারটায় রীতিমত সতর্কতার প্রয়োজন। সাধারণতঃ একপ্রকার ঘূর্ণায়মান ড্রামের ভিতর উক্ত ঝল্‌সানি কার্য্য সম্পন্ন হয়ে থাকে, উক্ত ড্রাম কয়লার আগুণ বা গ্যাসের আগুণে উত্তপ্ত হয়। ড্রামটি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকার দরুণ সকল ফলগুলি সমান উত্তাপ প্রাপ্ত হয় এবং ওগুলিকে আর পৃথকভাবে নাড়ানাড়ির প্রয়োজন হয় না। উক্ত ড্রামটিকে ঠিক কফি ভাজবার ড্রামের মতই দেখতে। ভেতরে ফলগুলি যতই উত্তপ্ত হয় ততই তাদের সুগন্ধ বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ ১৩৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে একঘণ্টাকাল ভাজলেই যথেষ্ট।

ভাজবার পর শাঁস আর খোলাকে আলাদা আলাদা করে নিতে হয়। এ কাজটা অতি সহজ, কেননা, ঐ ঝলসানো ফলকে একটু চাপ দিলেই তার শাঁস আর খোলা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে যায়। খোলাটা শাঁসের চেয়ে হালকা হওয়ার দরুণ তাকে সহজেই কুলোয় করে ঝেড়ে ফেলা যায়। কারখানায় অবশ্য হস্তদ্বারা ঐ জিনিস সম্পন্ন হয় না, যন্ত্রদ্বারা হয়ে থাকে। প্রথমে রোলারের সাহায্যে ভাজা ফলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁচা হয়, তৎপরে ফ্যানের বাতাসের সাহায্যে শাঁসের টুকরো ও খোলার টুকরো পৃথকীকৃত হয়ে থাকে। উক্ত শাঁসের টুকরোকে টেক্‌নিক্যাল ভাষায় নিব (Nib) বলে।

এইবার ব্লেণ্ডিং-এর পালা। অর্থাৎ বিভিন্ন কোয়ালিটির ফলে বিভিন্ন রকমের নিব প্রয়োজনীয় ভাগ অনুযায়ী সংমিশ্রিত হয়ে থাকে। এই সংমিশ্রনের ফলে চকোলেটের সুগন্ধ বৃদ্ধি পায় এবং কোয়ালিটি উৎকৃষ্ট হয়। এই ব্লেণ্ডিং কার্য্যও একটা আর্ট বিশেষ। যে যতো নিপুণতার সঙ্গে স্বল্প উৎপাদন খরচে উৎকৃষ্ট ব্লেণ্ডিং সম্ভব করে সে ততো লাভবান হয়। এই ব্লেণ্ডিং এর বিভিন্নতার জন্যই চকোলেটের কোয়ালিটির তারতম্য ঘটে।

এই ব্লেণ্ডিং-এর পর নিবগুলোকে পিষে গুড়োবার ব্যবস্থা করতে হয়। নিবগুলোর ভিতরকার প্রায় অর্দ্ধেক পদার্থ হচ্ছে চর্ব্বিজাতীয়। যন্ত্র-সাহায্যে যখন নিবগুলো পেষাই হয় তখন ঐ চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ নির্গত হ'তে থাকে এবং উক্ত যন্ত্রের পেষণ কার্য্যের জন্য যে তাপ উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারাই তা' গলে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা অটোম্যাটিক্ প্রক্রিয়া। দু'খানি পাথরের যাঁতার মধ্যে যখন নিবগুলো পেষিত হয় তখন চর্ব্বি নিষ্কাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁতার ঘর্ষণের উত্তাপের দরুণ তা' গলতে সুরু হয়—পরে সেই গলা চর্ব্বিকে বার করে নেওয়া হয়। এ সমস্ত কাজ যন্ত্র সাহায্যে

সম্পন্ন হয়ে থাকে। যন্ত্রটা আর কিছুই নয়, মাঝখানে দু'খানা যাঁতায় পাথর আঁটা। তার উপরিভাগে একটু গর্ত্ত আছে, সেটার মধ্য দিয়ে নিবগুলোকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যাঁতার পাথর দুখানির মধ্যে এক খানি স্থির থাকে আর অপরখানি ঘোরার দরুণ নিবগুলো ঘর্ষণ পেয়ে গুঁড়িয়ে যায়, এবং চর্ব্বি-পদার্থ বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাতে পাথরের ঘর্ষণজনিত উত্তাপ লাগে এবং তদ্দরুণই একরকম কাই কাই পদার্থ পাথরের গা দিয়ে নির্গত হয়। টেক্‌নিক্যাল ভাষায় উক্ত কাই কাই পদার্থকে বলে 'মাস' (Mass)। ঐ মাস-এর উপরের চর্ব্বি পদার্থটা চকোলেট প্রস্তুতের জন্য কাজে লাগে, বাদ বাকী পদার্থে কোকো তৈরী হয়।

'মাস' প্রস্তুতের পরের ব্যাপারটা হ'ল মাস-এর সঙ্গে চিনি মিশ্রিতকরণ। এও যন্ত্র দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। এই যন্ত্রের মধ্যে মাস ও চিনি স্থাপন করিলে পর ঘূর্ণায়মান রোলা-রের চাপে চিনি ও মাস উভয়েই মিহি গুড়ায় পরিণত হয় এবং রোলারের গায়ে সেঁটে থাকে। সেই জন্যই সব সময় ঐ সংমিশ্রিত পদা-র্থকে গরম রাখা দরকার, নইলে ও পদার্থ জমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই কারণেই চকোলেট কারখানায় কয়েকটা 'হট-চেম্বার' স্থাপন করার প্রয়োজন আছে।

উক্ত সংমিশ্রনের পর সমস্ত পদার্থটা চকো-লেটের রং ও চকোলেটের স্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং এইবার একে ছাচে ফেলতে হয়। কিন্তু ছাচে ফেলার পূর্ব্বে দু'টী বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, যদি কোন সুগন্ধ মিশ্রিত করতে হয় ত ছাচে ফেলার পূর্ব্বে তা' করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, মিশ্রিত পদা-র্থের ভিতরে যদি কোন হাওয়ার বুড়বুড়ি ঢুকে গিয়ে থাকে ত কম্‌প্রেসিং মেসিনে ফেলে তাকে বায়ুশূন্য করার প্রয়োজন। এ যদি না করা হয় ত তৈয়ী চকোলেটের গায়ে ফুটো ফুটো দাগ থাকে এবং খদ্দের তা' পছন্দ করে না। সুগন্ধ মিশ্রিত করা প্রয়োজন এইজন্য যে, তাতে চকোলেটের গুণাগুণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। এ কথা সত্য যে, কোকোর গুণেই চকোলেট আপনা থেকেই বেশ সুরভিত ওঠে কিন্তু তথাপি চকোলেটকে আরও মনো-রম ও সুস্বাদু করার প্রয়োজন আছে। সেই জন্য স্বাভাবিক সুগন্ধ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম সুবাস মিশ্রিত করা হয়ে থাকে। এই সুরভি মিশ্রণ ব্যাপারটা প্রত্যেক কোম্পানীর একটা ট্রেড সিক্‌রেট।

ছাচের মধ্যে ভরে আবশ্যকীয় সাইজে চকোলেটকে বার করে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার, তবে উত্তাপের দিকে একটু নজর রাখা দরকার। ২৮° থেকে ৩২° সেন্টীগ্রেডের মধ্যে উত্তাপ থাকলে চকোলেটের রঙ খুব ভাল হয়।

সাধারণ চকোলেট ছাড়াও মিল্ক চকোলেট নামে আর এক প্রকারের চকোলেট পাওয়া যায়। চকোলেটের কোকো, চিনি ও দুধের শুকনো গুড়ো মিশ্রিত করেই উক্ত মিল্ক চকো-লেট প্রস্তুত হয়। উহার মধ্যে কতটা পরিমাণ দুধের গুড়ো মিশ্রিত করতে হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, বিভিন্ন কোম্পানীর রুচির ওপর তা' কতকটা নির্ভর করে। তবে এমন

পরিমাণে চকোলেটের নিব ও দুধের গুঁড়ো মিশ্রিত করতে হয় যাতে উভয়েরই নিজস্ব স্বাদ ও ফ্ল্যাভার বজায় থাকে। তা' যদি না করা হয় ত মিল্ক চকোলেটের আসল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়। সাধারণ চকোলেটের খুব চাহিদা আছে, মিল্ক চকোলেট ও বেশ বিক্রয় হয়।

এতক্ষণ আমরা চকোলেটের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এবার সে সম্বন্ধে কতকগুলি ফরমূলা নিম্নে লিখিত হল :—

সাধারণ চকোলেট

Caracat	...	১৬½ পাউণ্ড
Para	...	৯½ ,,
Trinidad	...	১৮½ ,,
চিনি	...	৫৫¼ ,,
ভ্যানিলা	...	½ ,,

কিংবা

কোকো মাস	...	৪৯ পাউণ্ড
চিনি	...	৪৯ ,,
দারুচিনি	...	১½ ,,
ভ্যানিলা	...	½ ,,

অথবা

কোকো মাস	...	৩৯ পাউণ্ড
চিনি	...	৫৯ ,,
দারুচিনি	...	১½ ,,
লবঙ্গ	...	½ ,,

মিল্ক চকোলেট

কোকো মাস	...	১০ ভাগ
কোকো-বাটার	...	২০ ,,
চিনি	...	৪৪¾ ,,
মিল্ক পাউডার	...	২৫ ,,
সুগন্ধ	...	¼ ,,

গৃহস্থালীর তথ্য

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি. এস্-সি

চা তৈয়ারী ও চা পান

খুব ফুটন্ত জল চা-য়ের পাতার উপরে ঢালিয়া দিলে দুই তিন মিনিটের মধ্যেই চা তৈয়ারী হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রথমবারের তৈয়ারী চা উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার পরে ঐ চা পাতায় পুনরায় ফুটন্ত জল ঢালিয়া চা তৈয়ারী করিলে সেই চা বিস্বাদ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক হয়। কারণ তখন চা-য়ের মধ্যস্থিত ট্যানিক য়্যাসিড বাহির হইয়া পড়ে। উহাতে চা-য়ের তৃপ্তিকর স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়। চা-য়ের পাতায় যে রাসায়নিক পদার্থ থাকার দরুণ (Essential oil) উহার এমন প্রীতিকর সুগন্ধ হয়, সেই পদার্থটী প্রথমবারের ফুটন্ত জলের সহিতই নিঃশেষে বাহির হইয়া আস। সুতরাং পরে ঐ পাতায় গরম জল ঢালিয়া যে চা তৈয়ারী হয়, তাহাতে আর চা-য়ের সুস্বাদটী থাকে না।

এইজন্য ভাল চা তৈয়ারী করিতে হইলে ফুটন্ত জল চা-য়ের পাতার উপর একবার ঢালিয়া দিবেন এবং দুই তিন মিনিট পরেই নির্য্যাসটী ছাঁকিয়া লইবেন। কিন্তু সাবধান, জল খুব ফুটন্ত হওয়া চাই। তাহা না হইলে চা-য়ের সুগন্ধযুক্ত নির্য্যাস বাহির হইবে না। গরম জল দিয়া দুইতিন মিনিটের বেশী সময় রাখিলে ট্যানিক য়্যাসিড্ বাহির হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং চা-য়ের সুস্বাদ নষ্ট হইয়া যায়। একটু হাল্কা রকমের চা করিতে হইলে ছাঁকুনীর উপরে চা পাতা রাখিয়া খুব ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিবেন।

বাঁধাকপি রন্ধন

একটা অপ্রীতিজনক গন্ধ বাঁধাকপিতে থাকে। বাঁধাকপি কুটীয়া একবার গরম জলে একটু সিদ্ধ করিয়া লইলে সেই গন্ধটা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বাঁধাকপি সুস্বাদু করিয়া রাঁধিতে হইলে প্রথমে একবার গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলটা ফেলিয়া দিবেন। তারপর রীতিমত রান্না করিবেন। যে তৈলময় রাসায়নিক পদার্থের দরুণ বাঁধাকপিতে একটা অপ্রীতিকর

জঙ্গলীগন্ধ থাকে, উহা গরমজলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

কাঁচা মুলা খাওয়া

মুলা না রাঁধিয়া কাঁচা খাওয়াই ভাল। ছোট মুলা উত্তমরূপে ধুইয়া আস্ত কামড়াইয়া খাইতে হয়। বড় মুলা হইলে উহাকে ছুরি দিয়া কাটিয়া দুই তিন খণ্ড করিলেই যথেষ্ট। এক এক খণ্ড এক এক জনকে পরিবেশন করা যায়। মুলা কখনও ছুরি দিয়া চাকলা চাকলা করিয়া প্লেটে সাজাইয়া পরিবেশন করিবেন না। যাঁহারা মুলা খাইবেন, তাঁহারাও পরিবেশন করার পর অবিলম্বে অমনি কামড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিবেন,—যাকে কথায় বলে "প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্য"। ইহার কারণ এই যে, মুলাতে যে জৈব তৈল সমন্বিত রাসায়নিক পদার্থ থাকে তাহা সহজেই উবিয়া যায়, যাকে ইংরাজীতে বলে "ভোলাটাইল" (Volatile) যেমন পেট্রোল, স্পিরিট প্রভৃতি। সেই তৈলাক্ত জিনিসটি উবিয়া নষ্ট হইয়া গেলে মুলার তেমন স্বাদও থাকে না এবং মুলা খাওয়ার কোন উপকারও পাওয়া যায় না।

ঢিলা পোষাক বেশী গরম

অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে আমরা শীতের সময় আলোয়ান বা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া ব্যবহার করি। সেই আলোয়ান বা র‍্যাপার দিয়া কোট তৈয়ারী করিয়া গায়ে দিলে শীত নিবারণ হয় না। ধুতির খুঁট বা আঁচল গায়ে দিলে যেমন গরম লাগে, একটা সুতি জামা গায়ে দিলে তেমন বোধ হয় না। ইহার কারণ এই যে, ঢিলা পোষাকে কাপড় ও শরীরের মধ্যে বায়ুর ব্যবধান থাকে। এই বায়ুস্তর ভেদ করিয়া দেহের উত্তাপ বাহিরে যাইতে পারে না অথবা বাহিরের শীতলতা শরীরকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই কারণেই খুব ভালরূপে ধুনা তুলোর লেপ গরম বোধ হয়। তুলা চাপ খাইয়া গেলে উহাতে আর বায়ু আবদ্ধ থাকে না. সেই জন্য লেপ চাপ খাইয়া গেলে আর তেমন শীত মানায় না। যাঁহারা আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ বেশী দামী পশমী গরম জামা ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহারা দুইটি সুতি ঢিলা জামা একটীর উপরে আর একটী গায়ে দিয়া বেশ গরম বোধ করিবেন এবং শীতের সময় আরাম পাইবেন।

বাংলার রেশম ও নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ

বাংলার রেশম শিল্পের অবস্থা যে ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে ইহা সকলেই জানেন। এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির আমরা সবাই কামনা করি, কিন্তু ইহার অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায় আমরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারি নাই। এমন দিন ছিল যখন বাংলাদেশ হইতে বহু কোটী টাকার রেশম তন্তু ও রেশম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইত। কিন্তু আজ অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বিদেশ হইতে আমদানী না করিলে আমাদের তাঁত অচল হইয়া থাকিবে। এই শিল্পের অবনতির পরিমাণ নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

তুঁতের চাষের পরিমাণ দেখিলেই রেশম উৎপাদনের কমতি বাড়তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। গত সাত বৎসয়ে তুঁতের চাষ কিরূপ কমিয়া গিয়াছে নিম্নের অঙ্কগুলি হইতে তাহা দেখা যাইতেছে :—

তুঁতের চাষ

১৯২৭—২৮	১৭,৫৭৫ একর।
১৯৩৫—৩৬	৯,২৪৭

পালকের সংখ্যা

১৯২৭—২৮	৩০,৪৫৭
১৯৩৫—৩৬	১৬,০৮৭

১৯৩৭-৩৮ সালে ২৪,৬৭,৩৬২ টাকার রেশম তন্তু ও ৮৯৯২৫৫২ টাকার রেশম বস্ত্র আমদানী করা হইয়াছে। এই রেশম শিল্প এক দিন বাংলার গৌরব ছিল, আজ সে গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে।

১৯৩৩ সালে ট্যারিফ্ বোর্ড রপ্তানীর উপর পাউণ্ড প্রতি ২ টাকা ৬ আনা অথবা মোট মূল্যের উপর শতকরা ৫০ টাকা ধার্য্য করিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার শতকরা ২৫ টাকা এবং ১ টাকা ১০ আনা পাউণ্ড প্রতি শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে বিদেশী রেশমের আমদানীর বিশেষ কোনই প্রতিবন্ধক হয় নাই। এ বৎসরেও ট্যারিফ বোর্ড একদফা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, সরকারের হাতে তাহাদের কি অবস্থা ঘটিবে তাহা আমরা আজিও জানি না।

কিন্তু এই শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচানর পথে বেশীর ভাগই নির্ভর করিতেছে প্রাদেশিক সরকার ও জনসাধারণের উপর। কোন কোন প্রদেশে সরকার খদ্দর উৎপাদনের জন্য প্রতি স্কোয়ার গজের উপর এক আনা করিয়া সরকারি সাহায্য দিতেছেন। ইহাতে বেকার সমস্যারও কিছু সমাধান হইতেছে। বাংলা সরকার যদি মনে করেন যে রেশম শিল্পকে

বাঁচানো তাঁহাদের কর্ত্তব্য তবে রেশমের জন্যও তাহারা পাউণ্ড পিছু একটা সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু সরকার যদি সাড়া না-ই দেন আমরা অলস থাকিতে পারি না। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিয়া যাইতে পারি। ক্রেতারা যদি একটু বাছা বাছি করেন তবে এই শিল্পকে তাঁহারা অনেকখানি বাঁচাইতে পারেন। বিদেশী রেশমে বাজার ছাইয়া গেছে। সস্তা বিদেশী জর্জ্জেট ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী রেশম হইতে প্রস্তুত হইলেও বেনারসী ও মুর্শিদাবাদী কাপড় স্বদেশী বলিয়া চলিতেছে। ভাগলপুরের কাপড়ও এইরূপ। আমরা ভাবিয়া দেখিনা যে ১০০ টাকার রেশম কিনিলে তার ৬০ টাকা রেশমের মূল্য বাবৎ বিদেশে চলিয়া যায়। বাকী ৪০ টাকা মাত্র বয়ন-মজুরী ও ব্যবসায়ীর মুনাফায় থাকিতে পারে। অথচ এই সব জিনিষকে স্বদেশী বলিয়া চালাইতে আমাদের ব্যবসায়ীরা ইতস্ততঃ করেন না, এবং যে সব ক্রেতা স্বদেশী জিনিষ কিনিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল তাঁহারাও শতকরা ৪০ ভাগ স্বদেশী রেশম পাইয়া সন্তুষ্ট হন।

সম্প্রতি নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘও রেশম প্রস্তুতে লাগিয়াছেন। সূতা প্রস্তুত হইতে সুরু করিয়া রীল করা (বা জড়ান) এবং শেষে বয়ন পর্য্যন্ত সবগুলি প্রক্রিয়াই তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে আছে। যে সব ব্যবসায়ী তাঁহাদের নিকট হইতে তন্তু ক্রয় করেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের পরিচালনায় তন্তু উৎপাদন করেন তাঁহাদিগকে সঙ্ঘ হইতে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে বাঁকুড়ার সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর, বীরভূমের বসোয়া, মুর্শিদাবাদের চক্ ইসলামপুর, মালদহের সারসাহি, আটগাঁও, সাদুল্লাপুর ও ভোলাহাট প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের অনেক প্রস্তুতকারককে তাঁহারা সার্টিফিকেট দিয়াছেন। এইসকল সঙ্ঘ ও এই সব প্রস্তুতকারকেরা ১৯৩৭ সালে ৩,০৫,৭১১ টাকার রেশম তন্তু ও বস্ত্র বিক্রয় করিয়াছেন। বিদেশের আমদানীর সহিত তুলনায় এই উৎপাদনের পরিমাণ অবশ্য অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমরা আশা করি যে, যদি ক্রেতারা পুরাপুরি স্বদেশী রেশমের জন্য জিদ করেন তবে উৎপাদন আরো বাড়িয়া যাইবে। কাটুনী-সঙ্ঘ সম্পর্কে বাংলার সেরিকালচার ডিপার্টমেণ্টের নিম্নলিখিত রিপোর্ট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক "সুজাপুর ও কালিয়াচকের সুতাওয়ালারা আমাকে বলিয়াছেন যে তাহাদের রীল করা সুতার উপর সের প্রতি একটাকা করিয়া লাভ দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি হইয়াছে।

তাহা ছাড়া, কাটুনীসঙ্ঘ 'সিল্ক্ ইউনিয়ন' প্রবর্ত্তিত বাতিল-মালের কাজকর্ম্মও (যেমন সূতা প্রস্তুতের সময় বাতিল তুলা হইতে সতরঞ্চি কম্বল প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়)। পুনরায় সুরু করিয়াছেন।

আমি কিন্তু মনে করি যে বাজারে চাহিদা যখন বাড়িয়াছেই তখন চরখার সাহায্যে রেশমের সূতা প্রস্তুতের কাজকে সরকার হইতে উৎসাহিত করা উচিত, এবং ইহার জন্য প্রদর্শক নিযুক্ত করা উচিত।"

কাটুনীসঙ্ঘের কাজ সফল হইতে পারে যদি, বাংলার জনসাধারণ তাঁহাদের সহানুভূতি করেন ও তাঁহাদের প্রস্তুত মাল ক্রয় করেন। চেষ্টা করিলে এক কলিকাতাতেই বহুলক্ষ টাকার রেশম বিক্রয় হইবে। ক্রেতারা যদি ভারতে

প্রস্তুত রেশম ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ করেন তবেই দেশে রেশম উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে। সরকারী সাহায্য যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন জনসাধারণকেই উদ্যোগী হইয়া এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। আমি আশা করি বাংলার জনসাধারণ ভুলিয়া যাইবেন না, যে দেশের রেশম উৎপাদনকারীদের উপর তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। এ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করার একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ স্বদেশী ভিন্ন অন্য কোন রেশম ক্রয় না করা।

আর্থিক সংবাদ

লাহোরের "মুসলিম্ ব্যাঙ্ক্ অব্ ইণ্ডিয়া" গত ৭ই অক্টোবর লিকুইডেশনে যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের কলিকাতা আফিস্ ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীটে নিজ বাড়ীতে গত ৫ই অক্টোবর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার মেয়র ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের ভবানীপুর শাখার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত দুই বৎসরে ভারতীয় প্রধান পাঁচটী শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে লিখিত হইল ;—

	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
বস্ত্র	৩৫৭২০০০০০০ গজ	৪০৮৪০০০০০০ গজ
লৌহ	৩০০৫০০০ টন	৩৩৮৯০১০ টন
কাগজ	৯৭০২২৫ হন্দর	১০৭৬২২২ হন্দর
কয়লা	২০০৬৪০০০ টন	২৩৪৭৯০০০ টন
পাটজাত দ্রব্য	১২৫২০০০ ,,	১৩০৩০০০ ,,

১৯৩৮ সালের ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ১৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বোম্বাই হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

বরোদা রাজ্যে একটী সরকারী মৎস্য বিভাগ খোলা হইয়াছে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিশেষজ্ঞ মিঃ এস টি মজেজ্ ঐ মৎস্য বিভাগ গঠন করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা গুদাম (cold storage) স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে এবং নওসরীর ধীবরদের মধ্যে সমবায় কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে।

গত ১৯৩৭-৩৮ সালের যে মরশুমে যে পাট উৎপন্ন হয় তাহার মোট ৯৬ লক্ষ ৬২ হাজার বেল পাট ঐ সালে বিক্রয় হয়। ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারতীয় পাটকলগুলিতে ৩৭ লক্ষ বেল পাট মজুত ছিল। ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন বাজারে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বেল পাট মজুত ছিল। ভারতের বাহিরে ঐ তারিখে মজুত পাটের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ বেল। ১৯৩৮-৩৯ সালের মরশুম আরম্ভ হওয়ার সময় ১লা জুলাই তারিখে উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪৭ লক্ষ ৯৯ হাজার বেল।

গত ১৯৩৬ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যে মোট ৪ কোটি ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার তিষি উৎপন্ন হইয়াছিল। হায়দরাবাদে তিষি হইতে তৈল উৎপাদনের শিল্পও খুব গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যে বর্ত্তমানে বৎসরে ৭০ হাজার টন তৈল ও প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন খৈল উৎপন্ন

হইতেছে। গত ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত বাহিরে তৈল রপ্তানির পরিমাণ শতকরা ৫০০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদ রাজ্যে গড়ে বৎসরে ৪৫ লক্ষ টন তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

—⁂—

কিছুকাল পূর্ব্বে এলাহাবাদে ডাঃ নীলরতন ধরের চেষ্টায় জমির উন্নতি বিষয়ক কার্য্য পরিচালনার জন্য ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব্ সয়েল সায়েন্স নামক একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটী বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের গোরাউন, সায়দাবাদ, মীরাট, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে ভূমির সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদের যত্ন ও চেষ্টা নিয়োগ করিতেছে। যুক্তপ্রদেশের সরকার ইতিপূর্ব্বেই এই প্রতিষ্ঠানটীর কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বাৎসরিক ৫০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ হইতেও উহার হাতে ১০ হাজার টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে।

—⁂—

১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতবর্ষে ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড কার্পাস সূতা আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ঐ চারি মাসে আমদানী হইয়াছিল ৫২ লক্ষ পাউণ্ড। বিদেশ হইতে কাপড় আমদানী হয় ১৯৩৭ সালে (এপ্রিল-জুন) ১২ কোটি ৯৪ লক্ষ গজ এবং ১৯৩৮ সালে (এপ্রিল-জুন) ১৪ কোটি ৬৭ লক্ষ গজ। জাপান হইতে আমদানীর পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে

—⁂—

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৩৭ সালে ভারতে ২১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয়। ইহার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর (১৯৩৬) অপেক্ষা ৫ কোটী টাকা বেশী। উত্তোলিত খনিজ দ্রব্যসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান :—

কয়লা	৭ কোটী	৮১ লক্ষ	টাকা
ম্যাঙ্গানীজ	৪ ,,	৫২ ,,	,,
স্বর্ণ	৩ ,,	৪ ,,	,,
পেট্রোলিয়াম	১ ,,	৩৭ ,,	,,

—⁂—

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী জানাইয়াছেন, বাংলাদেশে শর্করা শিল্প প্রসারের জন্য শীঘ্রই একটী "সুগার কমিটী" গঠিত হইবে। আমরা কেবল আশা করিয়াই রহিয়াছি। কবে এ আশা ফলবতী হইবে, কে জানে? ভারতে মোট ১৩৬টী চিনির কলের মধ্যে যুক্তপ্রদেশে আছে ৬৮টী, বিহার প্রদেশে আছে ৩৩টী। আর আমাদের বাংলাদেশে আছে মাত্র ৬টী। নিম্ন তালিকায় ভারতীয় চিনির কল সমূহে চিনি ও গুড় উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হইল,—

	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
চলতি কারখানার সংখ্যা	১৩৭	১৩৬
পিষাই ইক্ষু	১১৬৮৭২০০ টন	৯৯১৬৪০০ টন
চিনি উৎপন্ন	১১১১৬০০ ,,	৯৩০৭০০ ,,
গুড় উৎপন্ন	৩০৬৪০০ ,,	৩৪৯৬০০ ,,

—⁂—

ভারতীয় রেশম ব্যবসায়ে গত বৎসর হইতে খুব লোকসান হইতেছে। বিদেশী মালের প্রচুর আমদানী এবং মূল্য হ্রাস ইহার প্রধান কারণ। ১৯৩১-৩২ সালে ৩২২৭৪৬৭ টাকার বিদেশী শিল্ক আমদানী হয়। ১৯৩৭ ৩৮ সালে

ঐ আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ২৪৬৭২৭২ টাকাতে উঠে। কৃত্রিম রেশম ১৯৩১-৩২ সালে আমদানী হইয়াছিল এক কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা বাড়িয়া এক কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে।

১৯৩৭ সালে বঙ্গেশ্বরী কটন মিলের ৭ লক্ষ ২১ হাজার ৮০৭ টাকার কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৬) ৪৩৪৫৭৫ টাকার কাপড় বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে মিলের নিট্ লাভ হইয়াছে ৩১৪৯৩ টাকা।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ সমূহের উদ্যোগে বৃহৎ শিল্প সংগঠনের পরিকল্পনা

নয়া দিল্লীতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগের মন্ত্রীদের একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে যে যে বিষয় আলোচনা হইয়াছে এবং যে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার সার মর্ম্ম এই :—

গোটা ভারতের শিল্প সংগঠনের জন্য প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মিলিত উদ্যম চাই। শিল্প বলিতে অবশ্য কুটির শিল্প, মাঝারি রকমের যন্ত্রশিল্প এবং বড় বড় কল কারখানার সাহায্যে মূল শিল্পগুলির (Key industry) গঠন, সবই বুঝাইবে। শিল্প সংগঠন কল্পে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির একযোগে একটি পরিকল্পনা নিয়া কাজ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজগুলি করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অর্থে একটি পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হইবে। সমগ্র ভারত সম্বন্ধে এই সমিতির কার্য্যকরী সিদ্ধান্ত রচিত হওয়ার আগেই প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলি সমবেতভাবে নিম্নলিখিত শিল্পগুলি গড়িয়া তোলার কাজ হাতে লইবেন :—

(১) সমস্ত প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কাজ।

(২) মোটর গাড়ী ও মোটর বোট এবং তাদের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম।

(৩) তড়িৎ-যন্ত্র ও তাহার সরঞ্জাম।

(৪) রাসায়নিক ও Fertiliser যন্ত্র সমূহ।

(৫) ধাতু-শিল্প।

গোটা ভারতের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম শিল্প সম্বন্ধে ব্যাপক পরিকল্পনার জন্য এই পরিকল্পনা সমিতির প্রথম অধিবেশনের চার মাসের মধ্যে একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা Planning Commisson গঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় রাজ্য, ফেডারেশন অফ্ ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্স, পল্লীশিক্ষা সংঘ হইতে প্রতিনিধি ও উপরোক্ত প্রাথমিক পরিকল্পনা সমিতির সভ্যদের লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে।

বৈঠকে আরো স্থির হইয়াছে যে Power Alcohol ভারতেই প্রস্তুত হওয়া জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এর জন্য ঝোলা গুড় প্রভৃতি যে সব কাঁচা মাল দরকার সেগুলি এদেশে প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সম্প্রতি সেগুলার নিছক অপচয় হইতেছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার যে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়াছেন বৈঠকে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, এবং বৈঠক মনে করেন যে Power Alcohol এবং অমিশ্রিত পেট্রল বিক্রী করা বে-আইনী ঘোষিত হওয়া দরকার।

বৈঠকে মোটর শিল্প সম্বন্ধে যে প্রস্তাবনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে, বৈঠক তাহার অনুকূলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরিকল্পনা সমিতিকে এ বিষয় বিবেচনা করিতে সুপারিশ করিয়াছেন।

পরিশেষে বৈঠক সমস্ত প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যকে এই বৃহৎ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য একযোগে কাজ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপযুক্ততম স্থান নির্দ্ধারণ করা, শিল্প সংগঠনের পদ্ধতি স্থির করা, বিশেষ কোন্ কোন্ শিল্প সরকারী অথবা ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা, ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বের স্থলে কোনরূপ সরকারী সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে কিনা তাহা স্থির করা, এবং শিল্পগুলির আর্থিক সংস্থান ও পরিচালনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া এই কমিশনের কাজ হইবে।

যে সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সহযোগীতা করিতে রাজী হইবে তাহারা প্রত্যেকে অর্থ সাহায্য দান করিয়া কমিশনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। মাদ্রাজের শিল্পবিভাগের মন্ত্রী মিঃ ভি. ভি. গিরি এই কমিশন গঠন করিবার ভার লইয়াছেন এবং ইহার প্রথম অধিবেশনও তিনিই আহ্বান করিবেন।

Key industry অর্থাৎ মূল শিল্প কি কি, এবং ইহাদের কোন্‌গুলি কোন্ প্রদেশে সংগঠিত হইতে পারে তাহাও এই বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রতিযোগীতা দূর করিবার জন্য স্থির হইয়াছে যে একই প্রকার ট্যারিফ পলিসি ও আইন দ্বারা সব শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

মিঃ গিরি বলিয়াছেন যে বিশ্বেশ্বরীয় স্কীম অনুযায়ী বর্ত্তমানে সমস্ত প্রদেশের সম্মিলিতভাবে এই শিল্পকে হাতে লওয়ার সময় আসিয়াছে। মোটরকার বাবদ প্রতি বৎসর আট কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করা বৈঠকের উচিত।

আকাশ মার্গে উড়ো বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারত সরকার এ দেশের ফ্লাইং ক্লাবগুলিকে তিন বৎসরের চুক্তিতে যে সাহায্য দিতেছেন তাহা এই বৎসর শেষ হইবে। দেখা গিয়াছে যে এই সরকারী সাহায্য, এম্পায়ার এয়ার মেইল্ স্কীমের এর প্রবর্ত্তন ও রাত্রিতে উড়িবার স্মবিধা দানের ফলে শিক্ষিত পাইলটের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

১৯৩৬-৩৭ সালে সাতটি ক্লাবের জন্য মোট দেওয়া হইয়াছিল ১৪৩১২৮ টাকা। ১৯৩৭-৩৮ সালে দেওয়া হইয়াছে ১৩৬৫০০ টাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উড়িবার ঘণ্টা বাড়িয়া যাওয়ার ফলে যত পেট্রল বেশী খরচ হইতেছে তাহার উপর কর বাবদ সরকারের লাভ হইয়াছে ৫১০০০ টাকা।

১৯৩৬-৩৭ সালের সরকারী সাহায্য ৭টি ক্লাবে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর কোন্ ঘাঁটি কত ঘণ্টা উড়াইয়াছে ও কতজনকে 'এ' লাইসেন্স দিয়াছে, এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী ঘাঁটিতে অন্তঃপ্রাদেশিক ঘাঁটিগুলি হইতে ব্যয় কম হয় বলিয়া টাকা যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্লাবগুলিতে ১৯৩৬-৩৭ সালে ৮৭৮২ ঘণ্টা উড়া হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে ১০৩৮৩ ঘণ্টা। দেশীয় রাজ্যের ঘাঁটিগুলিতে ১৯৩৬-৩৭ সালে উড়া হইয়াছিল ১৫৬০ ঘণ্টা। এ বৎসর হইয়াছে ২৯৮৫ ঘণ্টা।

এ বৎসর 'এ' পাইলটের সংখ্যা বাড়ে নাই। কমার্শিয়াল পাইলটদের শিক্ষার জন্যই বেশী সময় দেওয়া হইয়াছে। রাত্রিতে উড়িবার সময়ও এইজন্য বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৬ সালে রাত্রে উড়া হইয়াছিল ৬৬ ঘণ্টা। ১৯৩৭ সালে হইয়াছিল ৩৪৪ ঘণ্টা।

শিক্ষিত কমার্শিয়াল পাইলটের সংখ্যা :—

১৯৩৫—৯

১৯৩৬—১৮

১৯৩৭—২০

এম্পায়ার এয়ার মেইল স্কীমের ফলে উড্ডয়ন শিক্ষার্থীর ও শিক্ষা ব্যপদেশে নিযুক্ত অন্যান্য লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যাইবে—

	৩১-১২-৩৬		৩১-৭-৩৮	
শাসন সংক্রান্ত	ই	আই	ই	আই
	৩	২৭	৩	৫১
পাইলট ও বেতার পরিচালক	৫	৭	২	২৪
গ্রাউণ্ড ইন্‌জিনিয়ার	৫	১০	৬	১৩
ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষানবিশ	—	৭	—	৪
ট্রাফিক	১	৯	৩	৯০
অন্যান্য	—	৪১	—	৭৩
মোট	১৪	১০১	১৪	২৫৫

পাইলটদের উচ্চতর শিক্ষাদানের অসুবিধা বিশেষ অনুভূত হইয়াছে। ফ্লাইং ক্লাবের ছোট

ছোট যন্ত্র লইয়া যাহারা শিখিয়াছেন তাঁহাদের আরো শিক্ষিত না করিয়া বড় বড় উড়ো জাহাজ চালাইতে দেওয়া যায় না। ভারত সরকার এবিষয়ে কিছু সাহায্য করিয়াছেন—! Aero. X. এরোপ্লেনে একটি বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। টাটাও নিজের খরচে একটি উন্নততর ধরনের স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের এই সকল ফ্লাইংক্লাবে মাত্র প্রাথমিক শিক্ষাই লাভ হয়; উচ্চ শিক্ষার্থীদের অভাব ইহাতে দূরীভূত হইতেছে না।

উড্ডয়ন শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এমন কি ছোট যন্ত্রের সাহায্যে নিছক প্রাথমিক শিক্ষা যাহা দেওয়া হইতেছে তাহাতেও ঘণ্টায় ৩০ টাকা ব্যয় হয়। শিক্ষার ব্যয় আরো না কমিলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতে পারে না। অবশ্য এম্পায়ার এয়ার মেইল স্কীম যখন প্রবর্তিত হইয়াছে, তখন আমরা এবিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতিই আশা করি।

পৃথিবী প্রসঙ্গ
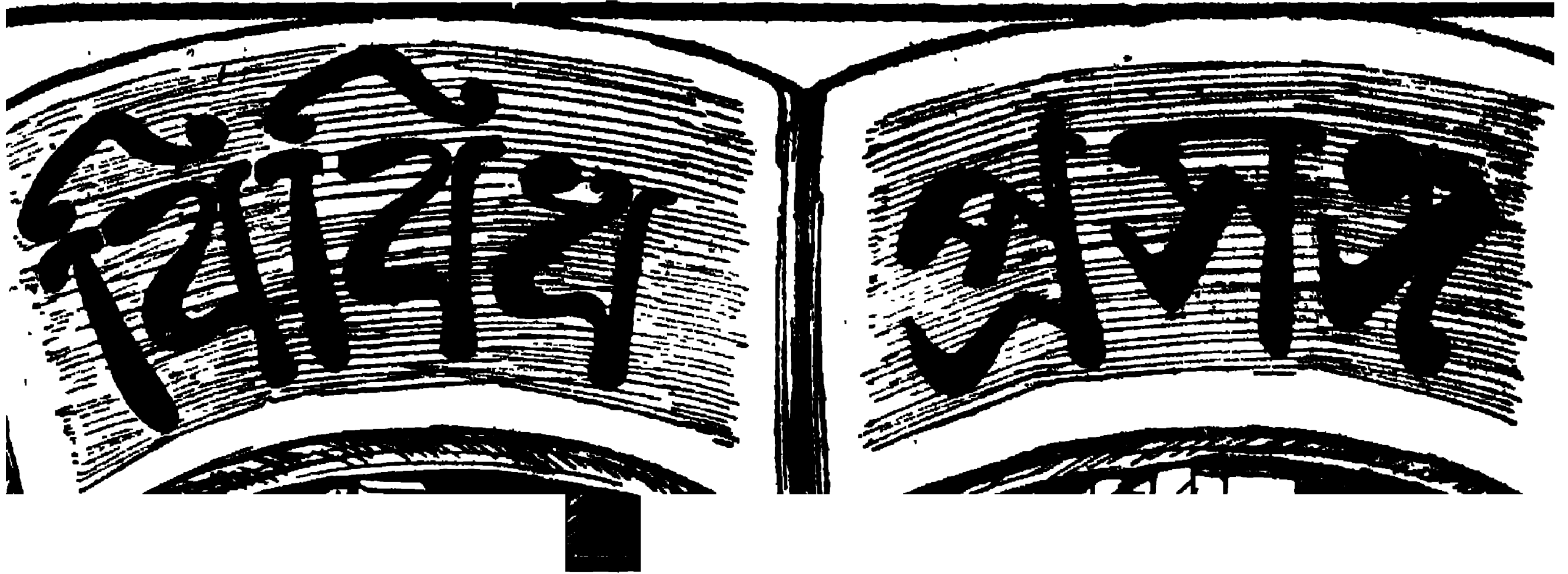
পাটের নিম্নতম মূল্য

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট পাট-সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কমিটির নিকট পেশ করিয়াছেন। উহা এখন কমিটির বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের পরিকল্পনার মূলসূত্র এই যে, পাটের ব্যবসায়ী এবং অনুরূপ মধ্যব্যবসায়ীদের মারফতে গভর্ণমেণ্ট এই বন্দোবস্ত করিবেন যে, উক্ত মধ্যব্যবসায়ীরা—মণ প্রতি সাত টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া সমস্ত পাট উৎপাদক কৃষকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মত বিক্রয় করিবে। মূল্য বেশী হইলে, তাহারা গুদাম ভাড়া এবং কমিশন কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকা কৃষককে দিবে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস জুটবেলার্স এসোসিয়েশন ও জুট ডিলার্স এসোসিয়েনের সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রকাশ যে উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় কতকগুলি সর্ত্তসাপক্ষে শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য করিতে রাজী হইয়াছে।

ভারত সম্রাটের যক্ষ্মানিবারণী তহবিলে বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ দান

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যক্ষ্মানিবারণী তহবিলে যে-সমস্ত দান গৃহীত হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, বাংলা দেশ সকল প্রদেশ হইতে বেশী টাকা দান করিয়া নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

১।	বাংলা	৩৮৬৭২০৮২	পাই
২।	পাঞ্জাব	৩৩৮১১৩৻২	„
৩।	বোম্বাই	৩৩০৪৯৪৶৩	„
৪।	মাদ্রাজ	৩১৫২২৫৵০	
৫।	যুক্তপ্রদেশ	১২৫৩৪২॥৶৩	„
৬।	দিল্লী	৭০০২৬॥/০	
৭।	আসাম	৬২৭০০৲	
৮।	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৭৪২৮॥/	
৯।	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৬৪৮৯॥৵৩	„
১০।	উড়িষ্যা	৩৫৫৭৯৲	
১১।	বিহার	৩২১৭৭/০	
১২।	সিন্ধু	২৮৩৮ ৫৵০	

কমিটির বিবরণীতে প্রকাশ যে, প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সমূহ হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ উক্ত

প্রদেশেই ব্যয়িত হইবে। অর্থে যতদূর কুলায় প্রত্যেক জেলার সদরে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসাগার স্থাপন ও আধুনিক প্রথায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে, উপরন্তু তাহার পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে সংক্রামিত না হয় তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

বাঙ্গালায় তুলার চাষের চেষ্টা

প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশে লম্বা আঁশের তুলার চাষ হইত বলিয়া অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত হইত। এই সূক্ষ্ম বস্ত্রের সুনাম য়ুরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবহেলায় ও উৎপীড়নে সূক্ষ্ম তুলার বস্ত্র তৈয়ারী ও লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদন বঙ্গদেশে বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, বাঙ্গালাদেশে লম্বা আঁশের তুলা গাছের চাষই উঠিয়া গিয়াছে। দুই একটা গাছ মাত্র দুই একটা জিলায় দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার মিল মালিকগণ বাঙ্গালার এই অবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আংশিকভাবে মিল মালিকগণ যে অর্থ সাহায্য করিতেছেন তদ্দ্বারা বাঙ্গালার ছয়টি জিলার গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগ তুলার চাষ করিতেছেন। মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন মঞ্জিলে ৫০ বিঘা জমিতে গভর্ণমেণ্ট ডিমন্সট্রেটার তুলার চাষ করিয়াছেন। যাহাতে ঐ জেলায় স্বতন্ত্রভাবে তুলার চাষ হয় তাহার জন্য ঢাকেশ্বরী কটন মিলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের এগ্রিকালচার অফিসার পাঠাইয়াছেন। তিনি মুর্শিদাবাদের কৃষকদের মধ্যে তুলার চাষ প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বিনামূল্যে তুলার বীজ দিতেছেন। তাঁহারা কৃষকদিগকে বলিয়াছেন যে, বীজ ছাড়ান তুলা তাঁহারা ২৫ টাকা মণ দরে ক্রয় করিতে পারেন। তুলা মিলে পাঠাইলে, তাঁহারা নিজেরা বীজ ছাড়াইয়া লইবেন। তুলার চাষে পাটের অপেক্ষা চারিগুণ অধিক মূল্য পাওয়া যায়। তজ্জন্য মুর্শিদাবাদের জমিদার ও ভদ্রলোকগণ তুলার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

ঢাকার তিনটী মিল বাঙ্গালার তুলার চাষ প্রবর্ত্তনের জন্য আগ্রহশীল হইয়াছেন। ঢাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন ও লক্ষ্মীনারায়ণ মিল কর্ত্তৃপক্ষের আগ্রহে এই বৎসর ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলায় তুলার চাষ হইয়াছে। এ বৎসর অতিরিক্ত বর্ষায় তুলার ক্ষতি হইবে এবং সেই কারণে বীজ রোপণও দেরীতে হইয়াছে। তথাপি এ বৎসর মেদিনীপুরের তুলার ফসল আশাতিরিক্তভাবে সফল হইয়াছে।

বাঙ্গালায় তুলার চাষ প্রবর্ত্তিত হইলে যে সকল অঞ্চলে পাট চাষ হয় না তথাকার অধিবাসিগণ একটা লাভজনক চাষ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত তুলার চাষে পাট অপেক্ষা অধিক লাভ। বাঙ্গালায় মিল স্থাপন করিয়া যেমন পরলোকগত নেতাগণ বাঙ্গালার প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তেমনি এই সকল মিল মালিক এক্ষণে পুনরায় এদেশে তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালার কৃষকদের উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নিজের জুতা খাইয়াছে

তুর্কীর ডেমির ড্রির এক কৃষক বাজী ধরিয়া তাহার এক জোড়া চটি জুতা খাইয়া ৩ শিলিং ৪ পেন্স জিতিয়াছে। খাইবার আগে সে জুতাজোড়াটা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া মাখন লাগাইয়া ভাজিয়া লইয়াছিল।

ভালুকের বাসায় মানুষের মেয়ে

কয়েকজন তুর্কী শিকারী এডানার পাহাড়ে একটি ১৬ বৎসরের মেয়েকে ভালুকের বাসায় পাইয়াছে। রৌদ্রে জলে মেয়েটির রং কালো হইয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম সে রান্না করা কোন জিনিষ খায় নাই। ১৪ বছর আগে এ অঞ্চলের একটি দু বছরের মেয়ে উধাও হইয়াছিল। অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। সাধারণের বিশ্বাস যে এই মেয়েটিই সেই হারানো শিশু।

মাকড়ষার জেলী

সবাই জানে যে মাকড়ষা মাছি খায়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে তারা জীবাণুও খায়। প্রাচ্যের কোন কোন জাতির মনে বিশ্বাস আছে যে মাকড়ষা ধরিয়া খাইলে ম্যালেরিয়া, এগু প্রভৃতি রোগ সারিতে পারে। এই বিশ্বাসের সুবিধা লইয়া লণ্ডনের একদল রাসায়নিক প্রাচ্যে রপ্তানী করিবার জন্য জেলীর মধ্যে ভরিয়া মাকড়ষা অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

৮০০ মাইল গড়ান

একটী ভারতীয় মহিলা পুনা হইতে কাশী পর্য্যন্ত গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এ পর্য্যন্ত তিনি ভালভাবেই আসিয়াছেন। আবহাওয়াও বেশ ভালই ছিল। এই মহিলাটি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গড়াইয়া চলিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। পুলিশ তাঁহাকে সহমরণে যাইতে দেয় নাই। নয় মাস ধরিয়া প্রতি রাত্রে তিনি স্বামীর চিতার উপর শয়ন করিতেন। অবশেষে একদিন তিনি দেখিতে পান যে তাঁহার স্বামী আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে প্রায়শ্চিত্তের জন্য গড়াইয়া কাশী যাইতে হইবে। তাই তিনি চলিয়াছেন। পুনা হইতে কাশী ৮০০ মাইল।

শিল্প সংক্রান্ত বৃত্তি

কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অফ্ সুগার টেকনোলজিতে শিক্ষা করিবার জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে তিনটি বৃত্তি দিয়াছেন।

১। বাবু বিন্ধ্যানাথকে তিন বৎসরের জন্য মাসিক ৫০ টাকা করিয়া একটি বৃত্তি এবং পুস্তকাদির জন্য ১০০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

২। সুগার বয়লাস সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষা করিবার জন্য বাবু পাণ্ডে গোপালনন্দকে দুই বৎসরের জন্য ৩০ টাকা মাসিক হিসাবে একটি বৃত্তি দিয়াছেন।

৩। সুগার টেকনলজিতে ফেলোসিপের জন্য বাবু ইউ, এস, সহায়কে দুইবৎসরের জন্য মাসিক ৩০ টাকার একটি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিহারে শিল্পের উন্নতির জন্য বিহার গবর্ণমেণ্টের এই বৃত্তি দানের আমরা প্রশংসা করিতেছি।

ঢাকেশ্বরী মিলের বদান্যতা

বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র এবার ভীষণ জলপ্লাবনে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে। দেশবাসীর এই বিপদে যাঁহারা মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারাই মানবের বন্ধু। ঢাকেশ্বরী মিল নিম্নলিখিত বন্যাপীড়িত স্থানের দুঃস্থ জনসাধারণকে ধুতি ও সাড়ী

দান করিয়া মানব সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

১। এস, ডি, ও মাণিকগঞ্জ ১০০ জোড়া
২। এস, ডি, ও টাঙ্গাইল ,, ,,
৩। এস, ডি, ও মুন্সীগঞ্জ ,, ,,
৪। এস, ডি, ও সিরাজগঞ্জ ,, ,,
৫। শ্রীযুক্ত প্রাণেশ কুমার সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, পাইকপাড়া ,, ,,
৬। প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন বেলুর মঠ, হাওড়া ,, ,,
৭। সেক্রেটারী ধুবড়ী জেলা কংগ্রেস রিলিফ কমিটি ,, ,,
৮। ঢাকা কংগ্রেস কমিটি ,, ,,
৯। অল ইণ্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স ,, ,,
১০। শ্রীযুক্ত সতীস সেন সেক্রেটারী রাজনৈতিক বন্দীদিগের সাব কমিটি ৯৯ প্রেমচাঁদ বড়ালষ্ট্রীট কলিকাতা ,, ,,
১১। শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ রায় খোকসা থানা কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ কমিটির সম্পাদক জনিপুর, নদীয়া ১০০ জোড়া
১২। মেহেরপুর বন্যা রিলিফ কমিটি মেহেরপুর, নদীয়া ,, ,,
১৩। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন সেক্রেটারী মুর্শিদাবাদ বন্যা রিলিফ কমিটি ১০০ জোড়া
১৪। শ্রীযুক্ত সুশীল চ্যাটার্জ্জি সেক্রেটারী, কৃষ্ণনগর বন্যা রিলিফ কমিটি, নদীয়া ,, ,,
১৫। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন ,, ,,
১৬। শিবপুর রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার শিবপুর, হাওড়া ,, ,,
১৭। মাণিকগঞ্জ কংগ্রেস কমিটি ,, ,,
১৮। ময়মনসিংহ কংগ্রেস বন্যা রিলিফ কমিটি, ময়মনসিংহ ,, ,,
১৯। ফরিদপুর কংগ্রেস বন্যা রিলিফ কমিটি ,, ,,
২০। মাণিকগঞ্জ কংগ্রেস রিলিফ কমিটি ,, ,,
২১। মুন্সীগঞ্জ কংগ্রেস রিলিফ কমিটি ,, ,,
২২। এস, ডি, ও, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ ,, ,,
২৩। বরিশাল বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রিলিফ কমিটি ৬, মুরলীধর সেনলেন। ,, ,,
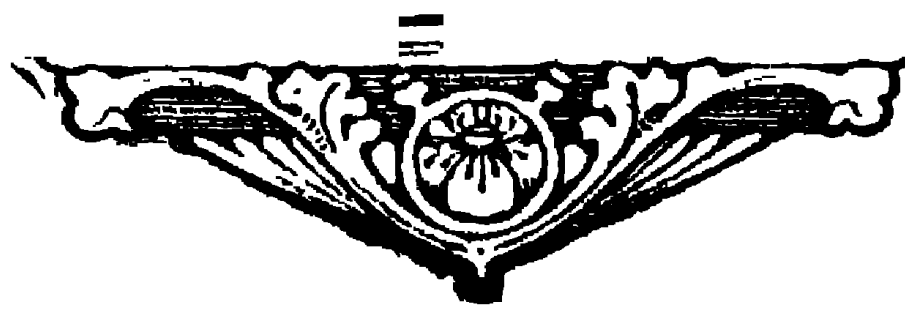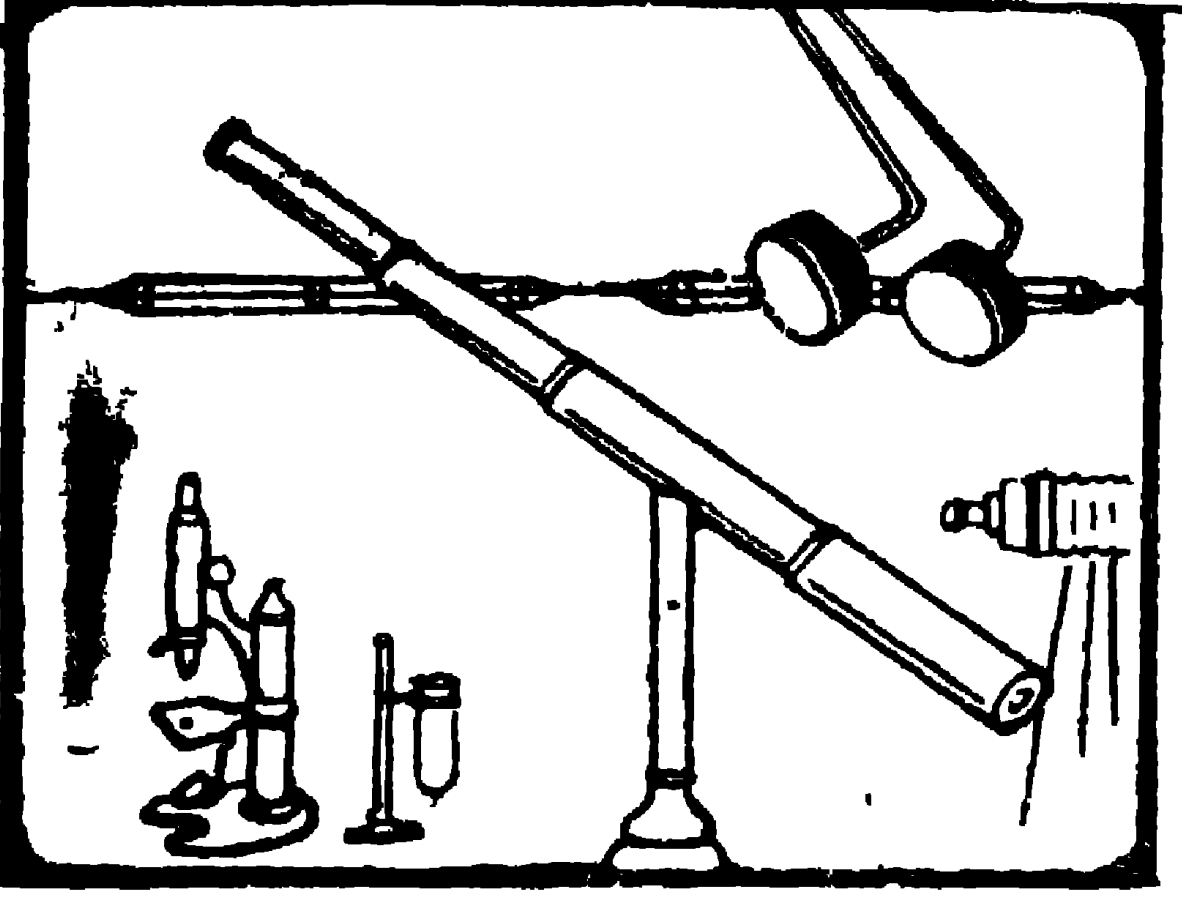
বৈজ্ঞানিক নোটস

ফল তাজা রাখা-সম্বন্ধে গবেষণা

পুণায় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রি-কালচারেল রিসার্চ্চের যে গবেষণা-কেন্দ্র আছে তাহাতে বর্ত্তমানে ঠাণ্ডা গুদামের সাহায্যে কমলা লেবু এবং আলু প্রভৃতি এদেশীয় ফলফলারী দীর্ঘকাল তাজা রাখা সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। প্রকাশ, এখন পর্য্যন্ত এরূপ গবেষণার কাজ খুবই ফলবতী হইয়াছে এবং সেইজন্য ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ-সোসাইটী উক্তরূপ গবেষণার পরিকল্পনা আরও তিন বৎসর কার্য্যতঃ চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

১৯৩৬ সালের গবেষণার ফলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নাগপুরের কমলালেবু পাকা অবস্থায় ৪০ ডিগ্রী তাপের ভিতর ৩ মাসকাল তাজা রাখা যায়। মাল্টার কমলালেবু অনুরূপ অবস্থায় ৪ মাস কাল তাজা রাখা যাইতে পারে। পুণা কেন্দ্রে সুবিখ্যাত আল্‌ফান্‌সো আম ধানের খড় প্রভৃতির সহযোগে ঠাণ্ডা গুদামজাত রাখিয়া বেশীদিন সংরক্ষিত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাছাড়া বীজের জন্য নির্দ্ধারিত আলু পূর্ব্বে না ছাড়াইয়া ঠাণ্ডাগুদামের সাহায্যে ৫ ডিগ্রী তাপের ভিতর এক বৎসর কাল তাজা রাখা যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

মুক্তার ডিম্ব

সিঙ্গাপুর হইতে প্রকাশিত "ষ্টেটস টাইমস" নামক ইংরাজী পত্রিকায়, মুক্তার ডিম্ব প্রসব বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক মিষ্টার উইলিয়ম ক্লার্ক বলেন যে, বোর্ণিও ও যবদ্বীপের উপকূলবর্ত্তী সমুদ্র গর্ভে যে সকল মুক্তা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর মুক্তা আছে, যাহা কোন বাক্সের মধ্যে তুলা দ্বারা আবৃত করিয়া ও কয়েকটী তণ্ডুলকণার সহিত রাখিয়া দিলে উহার মত আর একটী মুক্তা প্রসব করিয়া থাকে। ক্লার্ক সাহেব আরও বলেন, যে তিনি পরীক্ষা দ্বারা এরূপ অনেক মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন।

টেলিফোনে দেখা

নিউ ইয়র্কের একজন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি একটি টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহার সাহায্যে কথা বলা এবং দেখাও যাইবে। বর্ত্তমানে অল্প দূরত্বের মধ্যেই ইহার দ্বারা কার্য্য চলিতেছে, তবে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে

ক্রমে ইহা দ্বারা আটলান্টিকের এপার ওপারেও কার্য্য চলিবে।

বিশুদ্ধ জলে মাছ বাঁচেনা

খাঁটী বিশুদ্ধ জলে রাখিলে মাছ মরিয়া যায়। তাহা লইয়া মাচের অবশ্য কোন দুশ্চিন্তা করিতে হয় না। কারণ খাঁটী বিশুদ্ধ জল কোথাও পাওয়া যায় না। নদী নালায় সর্ব্বত্রই জলে এমন সব জিনিষ গলিত অবস্থায় থাকে যাহাতে মাছ সহজেই নিজেদের খাদ্য পায় এবং বাড়িতে পারে। তবে কয়েক রকম খনিজ পদার্থ জলে থাকিলে মাছ বাঁচিতে পারে না। অনেক দেশে জলে এই সব পদার্থ যাহাতে লোকে না ফেলে তাহার জন্য আইন হইয়াছে।

ফরমুলা ও রিসিপি

গ্রোপার নীল বড়ি

আমাদের জামা কাপড় পরিষ্কার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে ধোপা। অনেকে আবার নিজ হস্তে কাপড় ধৌত করিয়া থাকেন। এই পরিষ্কার করণ কার্য্যে সাবান সোডা অত্যাবশ্যক, কিন্তু শুধু সাবান সোডা দিয়া কাচিয়া কাপড শুকাইয়া লইলে কাপড জামা শাদা না হইয়া লালচে হইয়া থাকে। অথচ একবার নীল জলে ডুবাইয়া হইলে সমস্ত পরিষ্কার ধবধবে শাদা হইয়া যায়। সেই জন্য নীল বড়িব ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়। নিম্নে নীল বড়ি প্রস্তুতের একটি ফরমূলা দেওয়া হইল :—

আল্ট্রামেরিন (Ultramarine)	৬ আউন্স
সোডিয়াম কার্ব্বোনেট	৪ ,,
গ্লুকোস	১ ,,

উপরোক্ত দ্রব্যগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে এবং আবশ্যকীয় পরিমাণ জল সাহায্যে সমস্ত পদার্থকে কাই কাই অবস্থায় পরিণত করিতে হয়। পরে তাহাকে চাদরে পরিণত করিয়া বড়ি কাটিয়া লওয়া চলে।

সেলাই কলের তৈল

সকল মেসিনকেই ভালভাবে চালু রাখিবার জন্য তাহার বিভিন্ন অংশে তৈল প্রদান করা কর্ত্তব্য, নহিলে মেসিন নষ্ট হইয়া যায়। সেলাইয়ের কলের জন্যও ঐরূপ তৈল আবশ্যক হয়। নিম্নে তাহা প্রস্তত করিবার একটি ফরমূলা দেওয়া গেল : –

নিকৃষ্ট বাদাম তৈল	৯ আউন্স
পরিষ্কৃত বেঞ্জোলীন	৩ ,,
ল্যাভেণ্ডার তৈল	১ ,,

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিশাইলেই আবশ্যকীয় তৈল প্রস্তুত হয়।

মশক নিবারণী তৈল

আমাদের দেশে মশার কিরকম উপদ্রব তাহা বাঙ্গালী মাত্রই অবগত আছেন। শুধু বাঙ্গালী কেন, অপরাপর প্রদেশবাসীরাও মশার কামড়ে অস্থির হইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় মশক নিবারণের কোন ব্যবস্থা যে সাধারণের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় তাহা বলাই বাহুল্য। নিম্নে মশক নিবারণের জন্য এক প্রকার তৈল প্রস্তুতের ফরমূলা দেওয়া গেল, উহা গায়ে মুখে মাখিলে মশা বসিতে পারে না।

অলিভ্ অয়েল	৩ ভাগ
Oil of Pennyroyal	২ "
গ্লিসারিন	১ "
এ্যামোনিয়া	১ "

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মিশাইলেই তৈল প্রস্তুত হয়। উহা মাখিবার সময় তৈলটি বেশ করিয়া নাড়িয়া লইতে হয় এবং সতর্ক থাকিতে হয় যাহাতে উহা চোখে না লাগে।

অক্সিজেনেটেড্ টুথ পাউডার প্রস্তুতপ্রণালী

বাজারে নানাপ্রকার টুথ্ পাউডার প্রচলিত আছে এবং ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, টুথ্ পাউডারের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এতৎসত্ত্বেও অক্সিজেনেটেড্ টুথ্ পাউডার বড় বেশী প্রচলিত নাই এবং ইহা প্রস্তুত করিয়া যে কেহ লাভবান হইতে পারেন।

প্রিসিপিটেটেড্ চক্	১ পাউণ্ড
ম্যাগনেসিয়াম পেরক্সাইড্	২ আউন্স্
থাইমল	২০ গ্রেণ
বোরাক্স	১ আউন্স
মেন্থল	২০ গ্রেণ
স্যাকারিণ	৬ গ্রেণ
সোডা পাউডার	½ আউন্স্

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মিশাইয়া ও মিহি করিয়া গুড়াইয়া ভাল ভাবে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

শিশিবোতল সাফ্ করিবার মসলা

অনেকেই অবগত আছেন যে, যে শিশি বোতল একবার ব্যবহৃত হয় তাহা বাতিল হইয়া যায় না, পরন্তু তাহা ভালভাবে পরিস্কার করিয়া অপর কাজে লাগান হয়। কিন্তু শুধু জল দিয়া ধুইলে উক্ত শিশিবোতল ভালভাবে পরিস্কার হয় না, অথচ কতকগুলি দ্রব্যের সলিউশন দ্বারা তাহা ধৌত করিলে উহা উত্তম রূপে পরিস্কৃত হইয়া থাকে। নিম্নে উক্ত সলিউশন প্রস্তুতের একটী ফরমুলা দেওয়া হইল :—

সোডিয়াম মেটাসিলিকেট	১ ভাগ
সোডা এ্যাস্	২ ভাগ
ট্রি-সোডিয়াম্ ফস্‌ফেট্	২½ "

উপরেক্তে পরিমাণ পদার্থগুলি জলে গুলিলেই আবশ্যকীয় সলিউশন পাওয়া যায় এবং ইহার সাহায্যে শিশিবোতল ভালরূপে পরিস্কৃত হইয়া থাকে।

দোমড়ানো ফটোগ্রাফ্ সিধা করিবার উপায়

ফটোগ্রাফ্ সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, নেগেটিভ থেকে কাগজে ছবি ছাপা হইবার পর তাহা ধুইয়া শুকাইতে দিতে হয় এবং ছবি শুকাইবার পর কাগজখানি দুমড়াইয়া যায়। উক্ত দোমড়ানো ছবি সহজে সিধা হয় না। কিন্তু একটি বিশেষ সলিউশনে ভিজাইয়া লইলে উহা আর দুমড়াইয়া যায় না। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পরিমাণানুযায়ী মিশাইলে উক্ত সলিউশন প্রস্তুত হয় :—

Gelatine	১ আউন্স্
জল	১০ "

দোমড়ানো ছবির পিছন দিকে ব্রুস সাহায্যে ঐ সলিউসন ভিজাইয়া দিয়া ছবিখানি কোন ভারী জিনিসের তলায় ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে আর ছবি দোমড়াইয়া যায় না।

ধাতু বা কাষ্ঠের সঙ্গে সেলুলয়েড জুড়িবার আঠা

সেলাক	২ আউন্স
মেথিলেটেড স্পিরিট	৪ ”
স্পিরিট অব্ ক্যাম্ফর্	৩ ”

মেথিলেটেড স্পিরিটে সেলাক্ গুলিয়া তৎপরে স্পিরিট অব ক্যাম্ফর মিশাইয়া সমস্ত দ্রব্যকে একটি বদ্ধ পাত্রে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। যদি দেখা যায় যে, সমস্ত সেলাক গলে নাই তাহা হইলে সমস্ত পদার্থটি সতর্কতার সহিত ‘ওয়াটার বাথ্’ সাহায্যে ফুটাইয়া লইতে হয়।

কাচের উপর লিখিবার রঙীন্ পেন্সিল

সকলেই জানেন যে, কাচের উপর লিখিবার জন্য রঙীন পেন্সিলের বেশ চাহিদা আছে। উক্ত বিভিন্ন রঙের পেন্সিল সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। নিম্নে ইহার ফরমুলা দেওয়া গেল :—

কালোপেন্সিল।

ল্যাম্প ব্ল্যাক	১০ ভাগ
হোয়াইট্ ওয়াক্স	৪০ ”
ট্যালো	১০ ”

সাদা পেন্সিল।

হোয়াইট্ লেড্	৪০ ভাগ
হোয়াইট্ ওয়াক্স	২০ ”
ট্যালো	১০ ”

নীল পেন্সিল।

বার্লিন্ ব্লু	১০ ভাগ
হোয়াইট্ ওয়াক্স্	২০ ”
ট্যালো	১০ ”

হলদে পেন্সিল।

ক্রোম্ ইয়লো	১০ ভাগ
হোয়াইট ওয়াক্স	২০ ”
ট্যালো	১০ ”

ঘননীল পেন্সিল।

বার্লিন ব্লু	১৫ ”
ল্যাম্প্ ব্ল্যাক্	১ ”
গাম্ এ্যারেবিক	৫ ”
ট্যালো	১০ ”

উপরোক্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রথমে ট্যালো ও মোমকে একত্রে গলাইয়া লইয়া পরে অপরাপর পদার্থ মিশ্রিত করিতে হয়। তৎপরে ছাঁচে ঢালা হইয়া পেন্সিল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুলভ কাপড়কাচা সাবান

আজকাল সাবানের ব্যবসা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বহু কারখানা স্থাপিত হইয়াছে যাহারা কাপড়কাচা সাবান উৎপাদন করিতেছে। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে কুটির শিল্প হিসাবে পাল্লা দেওয়া খুবই শক্ত, তবুও বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিলে সময়ে সময়ে বাড়ীতে কুটির শিল্প হিসাবে সাবান প্রস্তুত করিয়া লাভবান হওয়া যায়। নিম্নে সুলভ কাপড়কাচা সাবানের একটি ফরমুলা দেওয়া হইল :—

মহুয়া তৈল	১ মণ
বাদাম তৈল	৩০ সের
ক্যাষ্টর অয়েল	১৫ মণ
সিসেম্ অয়েল	১৫ সের
কস্টিক্ সোডা	১৪ ”
জল	৩৬ ”
লবণ	১০ ”
সোডা এ্যাস্	১০ ”
Wheat flour	২০ ”
জল	২½ মণ

প্রথমে সমস্ত তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া গরম করিতে হয় এবং যখন তাহা হইতে কস উত্থিত হইতে থাকে তখন তাহার মধ্যে জল ও কস্টিক্ সোডার কাই মিশাইয়া জ্বাল দেওয়া বন্ধ রাখিতে হয়। পরে আবার জল মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা জ্বাল দিতে হয়, তৎপরে জ্বাল বন্ধ রাখিয়া লবণ, সোডা এ্যাস্ ও Wheat flour এই তিন দ্রব্যকে একত্রে গুড়া করিয়া উহা পূর্ব্বোক্ত কাই-এর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক অনবরত নাড়িতে হয়। অতঃপর তাহা ছাঁচে ফেলিলেই প্রয়োজনানুরূপ সাবান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্নো ক্রিম্

বাজারে আজকাল স্নোক্রিমের প্রচুর চাহিদা হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রস্তুতের একটি ফরমুলা প্রদত্ত হইল :—

ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড্	২০০ ড্রাম
কস্টিক্ পটাশ	১৪ ”
জল	৮০০ সিসি
এ্যালকোহল (৯০%)	৪০ ”

সুগন্ধদ্রব্য প্রয়োজনানুরূপ।

সাদা সুতা এবং কাপড় হলদে ও কমলা রঙ্গে রঞ্জিত করণ :

প্রথমে কাপড় ও সুতা পরিষ্কাররূপে ধৌত করতঃ ক্রমে শুষ্ক করিয়া লইবে। ⁄২॥ সের জলে ২॥ আউন্স সুগার অফ লেড (শিশা শর্করা) দ্রব করিয়া ঐ জলে উক্ত কাপড় ও সুতা দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। কাপড় ও সুতা শুষ্ক হইলে চুণের জলে চুবাইয়া ব্যাক্রামেট্ অফ পটাসের জলে রঞ্জিত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে পাকা হলদে রং হইবে। পটাসের জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে পাকা কমলা রং হইবে। ইহাতে বিশুদ্ধ তারপিন তৈলে রবার দ্রব করিয়া কাপড়ে মাখাইয়া শুষ্ক করিলে জলরোধক বা ওয়াটার প্রুফ কাপড় প্রস্তুত হইবে। ক্লোরোফরম অথবা ন্যাপথায় রবার বার্ণিষের মত দ্রব হয়।

ইঁদুর মারা বিষ

নিম্নলিখিত ঔষধটি Dr Ure ইঁদুর মারিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ইঁদুর মারিবার জন্য যত প্রকার ঔষধ বাজারে প্রচলিত আছে তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

একটি চওড়া মুখ বোতলে শূকরের চর্ব্বি রাখুন। এই শূকরের চর্ব্বিতে ফসফরাস মিশাইতে হইবে। প্রত্যেক পাউণ্ড (১ পাউণ্ড ½ সের) শূকরের চর্ব্বির সহিত এক আউন্স ফসফরাস মিশাইতে হইবে। এই ওজন অনুযায়ী যতখানি ঔষধ তৈরি করা দরকার ততখানি শূকরের চর্ব্বি ও ফসফরাস লইতে হইবে। এই ওজন অনুযায়ী একটি পাত্রে শূকরের চর্ব্বি ও অন্য একটি পাত্রে ফসফরাস রাখুন। প্রথমে শূকরের চর্ব্বি একটি চওড়া মুখওলা বোতলে পুরুন। পরে একটি বড় সসপ্যানে জল দিয়া ঐ বোতলটি তন্মধ্যে বসাইয়া দিন। এখন ঐ জল গরম করিতে থাকুন। ঐ গরম জলে যখন শিশির মধ্যস্থ চর্ব্বি গলিয়া যাইবে তখন পূর্ব্বের ওজন অনুযায়ী সব ফসফরাস ঐ শিশির মধ্যে ঢালিয়া দিন। তৎপরে ১ পাইণ্ট Proof Spirit অথবা Whiskey উহার মধ্যে ঢালিয়া দিন। সব দ্রব্যগুলি একত্রে মিলিয়া গেলে উত্তমরূপে ছিপি আঁটিয়া বোতলটি জল হইতে তুলিয়া নিন এবং যতক্ষণ সব দ্রব্য মিশিয়া দুধের মত তরল পদার্থে পরিণত না হয় ততক্ষণ ঝাঁকাইতে থাকুন। ইহা ঠাণ্ডা হইলে ইঁদুর মারা বিষ প্রস্তুত হইল। ইঁদুর মারিবার সময় আটার সহিত চিনি মিশাইয়া তাহাতে এই ঔষধ গরম করিয়া ঢালিয়া দিয়া রুটির নেচির মত তৈয়ারী করিবেন এবং তাহারই টুকরা গুলি ছড়াইয়া দিবেন। ঐ টুকরাগুলি খাইলেই ইঁদুর মরিবে। ইঁদুর খুব চালাক প্রাণী। একবার যে জিনিষ খাইয়া ইঁদুর মরিতে আরম্ভ করে, দ্বিতীয়বার সে জিনিষ আর কখনো মুখে দিবে না। সুতরাং উপরোক্ত ঔষধ বিভিন্ন জিনিসে মিশাইয়া দিতে হইবে। যেমন কখনো পাঁউরুটির টুকরা, কখনো নারিকেল কোরা, কখনো তিলের নাড়ু, পিঠা প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের সহিত উক্ত ঔষধ মিশাইয়া দিবেন।

সব্জী বাগিচার শত্রু।

কপি, শালগম, আলু, গাজর, মূলা প্রভৃতির প্রধান শত্রু নানা প্রকার কীট পতঙ্গ। এই সকল কীট পতঙ্গের উপদ্রবে অনেক সময় বাগান ধ্বংস হইয়া যায়। নিম্নভূমিতে যদি সব্জীবাগ থাকে তবে সেখানে অনেক সময় শামুক এবং শামুক জাতীয় নানা প্রকার কীট পতঙ্গ সব্জী বাগ ধ্বংস করে। এই সকল কীট পতঙ্গ ধ্বংস করিবার দুইটি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১) কতকগুলি বাঁধা কপির পাতা উনুনের পাশে রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহা আমরিয়া যাইবে; এই পাতাগুলিতে তখন মাখন, চর্ব্বি অথবা তৈল ঘষিয়া লাগাইয়া লইবেন এবং পাতাগুলি সব্‌জী বাগের আলের মধ্যে মধ্যে রাখিয়া দিবেন। কয়েক ঘণ্টা বাদেই দেখিবেন যে সব শামুক এবং কীট পতঙ্গ ঐ সকল পাতায় চড়িয়া বসিয়া আছে। তখন কীট সহ পাতাগুলি আগুণে পোড়াইয়া মারিবেন।

(২) কয়েকটি টার্ণপ বা শালগম কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া সব্‌জী বাগের আলের মধ্যে মধ্যে রাখিলে তাহা খাইবার জন্য পোকাগুলি উক্ত স্থানে আসিয়া জড় হইবে। তখন পোকাগুলি লইয়া আগুণে পোড়াইয়া মারিবেন।
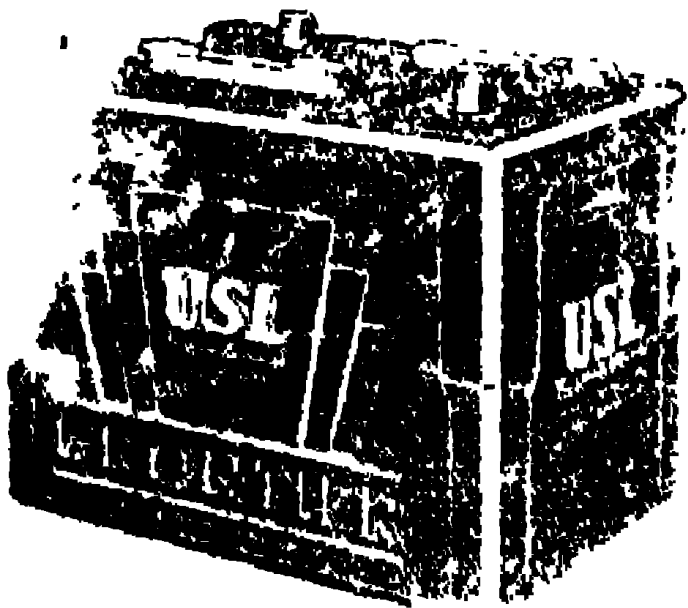
নানারূপ Disinfectant বা শোধক দ্রব্যের বিবরণ

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এস, সি

আমাদের ঘরের মেজে এবং বাতাস নিত্য নানা প্রকারে দূষিত হইতেছে। উহাদিগকে শোধন না করিলে বাড়ীর স্বাস্থ্য নষ্ট ও বিবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। অতি সহজ উপায়ে এবং খুব কম খরচে এই শোধন কার্য্য করা যাইতে পারে। নিম্নে তাহার কয়েকটী উপায় বর্ণিত হইল।

রোগ বীজানু নষ্ট করিবার তরল মশলা

বর্ত্তমান সময়ে দুর্গন্ধ ও রোগবীজানু নষ্ট করিবার জন্য ফিনাইল, কার্ব্বলিক য়্যাসিড, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিষ ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটীরই সুবিধা অসুবিধা আছে। এইগুলির দ্বারা বায়ু মণ্ডলকে শোধন করা যায় না। মেজের উপরে যত দূর স্থানে ইহাদিগকে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্তই শোধিত হয়। নিম্নে একটী তরল মশলা তৈয়ারী করিবার পদ্ধতি লিখিত হইল। ইহা কোনস্থানে ছড়াইয়া দিলে সেখানকার ঘরের মেজে যেমন শোধিত হয়, তেমনই উহা হইতে বাষ্প বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলকেও শোধিত এবং দুর্গন্ধ শূন্য করে।

এক বোতল শীতল জলে দুই আউন্স লেড য়্যাসিটেট্ (Lead acetate or Sugar of lead) বা সুগার অব্ লেড গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত দুই আউন্স (তরল মাপের) জোরাল নাইট্রিক য়্যাসিড্ (Strong Nitric-acid) মিশাইয়া বোতলটীকে খুব ঝাকিয়া লউন। এইবার মশলাটী তৈয়ারী হইয়া গেল। এক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। রন্ধনের পাত্রাদি ও আহারের থালা বাসন ইহার দ্বারা একবার মুছিয়া নিলেই হয়। অতি সামান্য পরিমাণ দুই চারি ফোঁটা মশলায় একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া উহার দ্বারা থালা-বাসন মুছিবেন। ঘরের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য কিছু পরিমাণ মশলা লইয়া উহার সহিত আটগুণ বা দশগুণ জল মিশাইবেন। ঐ জল মিশ্রিত মশলায় এক টুকরা পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া উহাকে ঘরের কোন স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবেন। যদি বড় ঘর হয়, তবে ঐরূপ দুই তিনখানি ন্যাকড়া ঘরের বিভিন্ন স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবেন। দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু উহার সংস্পর্শে আসিয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শোধিত হইয়া যায়। এইভাবে বায়ু শোধন করিতে একথা মনে রাখা আবশ্যক, ঘরে প্রচুর পরিমাণে বাহিরের পরিষ্কার খোলা বাতাস চলাচল করা চাই।

শোধনকারী ধুম

সাধারণ লবণ, যাহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহার তিন আউন্স লউন। ম্যাঙ্গানীজ (Manganese) এক আউন্স, সালফিউরিক

র‍্যাসিড এক আউন্স এবং জল দুই আউন্স। এই সকল দ্রব্য একটী পাত্রে মিশাইয়া ঐ পাত্রটিকে গৃহের মধ্য দিয়া অথবা যে ঘরে রোগী ছিল এরূপ দূষিত বায়ুপূর্ণ ঘরের মধ্য দিয়া দুই চারিবার ঘুরাইয়া লইয়া যাওয়া আসা করুন, যেমন সন্ধ্যা বেলা ধুনোচিতে করিয়া ধূপ দেওয়া হয় সেইরূপ। পাত্রের মধ্যস্থিত মশলা হইতে ধোঁয়ার মত বাষ্প উঠিয়া ঘরের বাতাসে ছড়াইয়া পড়িবে এবং বায়ুকে বিশুদ্ধ দুর্গন্ধ বিহীন ও রোগ বীজাণু শূন্য করিবে। যদি ঘর বড় হয়, অথবা যদি খুব ভালরূপে শোধন করা আবশ্যক হয় তবে ঐ মশলাপূর্ণ দুই তিনটী পাত্র ঘরের মধ্যে রাখিয়া উহার দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিবেন এবং আন্দাজমত একঘণ্টা দুই ঘণ্টা অথবা তিন ঘণ্টা পরে দরজা খুলিবেন।

কফি একটী শোধনকারী পদার্থ

আমাদের দেশে দক্ষিণ ভারতে মহীশূর, কুর্গ, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে কফি উৎপন্ন হয়। চা'য়ের মত অনেকে কফি পান করেন। আরব দেশের কফি বিখ্যাত। ভারতীয় কফি বিদেশে রপ্তানী হয়। রাত্রি জাগরণ করিবার জন্য অনেকে কফি পান করিয়া থাকে। বাংলা দেশে সাধারণ লোকেরা কফি পান করে না, তাহাদের মধ্যে চা পানই প্রচলিত। তবে উচ্চশিক্ষিত সমাজে এবং বড় লোকদের মধ্যে কফি পানের নেশা আছে।

যাহা হউক এস্থলে কফি পান সম্বন্ধে কোন কথা বক্তব্য নহে। অনেক পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কফি একটী শোধনকারী (Disinfectant) পদার্থ। ইহাতে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব দুর্গন্ধ গ্যাস এবং রোগ বীজাণু সমূহকে কেবল শক্তিহীন করে না, একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই কার্য্যের জন্য কফিকে ভাজিয়া (Roasted) ব্যবহার করিতে হয়। কোন ঘরে মাছ মাংস বা শাক্ সব্‌জী অধিক সময় যাবৎ পড়িয়া থাকিলে ঐ সকল জিনিষ পচিয়া একটা দুর্গন্ধ উঠে, ইহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। আধ-সের আন্দাজ কফি ভাজিয়া উহা একটী পাত্রে লইয়া যদি ঐ ঘরের মধ্যে সকল জায়গায় ধুনোচির মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লওয়া যায় তবে অল্প ক্ষণের মধ্যেই দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে। ভাজা কফি হইতে এক প্রকার ভাপ্ উত্থিত হয়, তাহাতেই দুর্গন্ধ বিনাশ করিয়া বায়ুমণ্ডলকে শোধিত করে। গো-শালায় অথবা ঘোড়ার আস্তাবলে যে দুর্গন্ধ হয়, তাহাও এইরূপে দূর করা যায়।

এই সকল দুর্গন্ধ নাশক এবং রোগ বীজাণুনাশক শোধন কার্য্যের জন্য নিম্ন লিখিতরূপে কফি ব্যবহার করিবেন। প্রথমতঃ কফির কাঁচা সুটীকে (Raw bean) শুকাইয়া লউন; তারপর উহাকে হামানদিস্তায় গুঁড়া করুন। এক্ষণে এই গুঁড়াকে একটি লোহার তাওয়ায় অল্প আচে ভাজিয়া লউন। যখন দেখিবেন গুঁড়াগুলি গাঢ় বাদামী রং (Dark brown) ধরিয়াছে, তখন বুঝিবেন যে, ভাজা হইয়াছে। আজকাল যেমন অপরিস্কৃত এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder) ছড়াইয়া দেওয়া হয় সেইরূপ এই ভাজা কফির গুঁড়াও ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অথবা একটি পাত্রে সদ্য ভাজা গুঁড়া খানিকটা লইয়া দুর্গন্ধযুক্ত ঘরের মধ্যে একটু ঘোরা ফেরা করিতে হয়।

কফি হইতে একপ্রকার য়্যাসিড্ এবং তৈল তৈয়ারী হইয়া থাকে। ঐ য়্যাসিড্ কিম্বা তৈল অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিলেও শোধন কার্য্য হইতে পারে।

কাঠ-কয়লা ও জান্তব কয়লা উত্তম শোধক পদার্থ

অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা প্রকার পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে কাঠ কয়লা (Wood Charcoal) এবং জান্তব কয়লা (Animal Charcoal) এই দুইটা অতি উত্তম শোধক পদার্থ। ইহারা দুর্গন্ধময় এবং রোগ বীজাণু যুক্ত গ্যাস সমূহকে শোষণ করে। শুধু তাহাই নহে, ঐ সকল খারাপ গ্যাসকে অক্সিডাইজ করিয়া পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে। ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার পদার্থের পচনহেতু দুর্গন্ধযুক্ত এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতিজনক যে সকল গ্যাস্ উঠে, তাহাদের উপাদান সমূহ অতি জটিলভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। কয়লার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় উহাদের গঠনের জটিলতা বিনষ্ট হইয়া অধিকতর সরল গঠন বিশিষ্ট জল ও অঙ্গারাম্ল (Water and Carbonic acid) উৎপন্ন হয়। জল বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পরূপে মিশ্রিত থাকে এবং যথাসময়ে উহা বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। অঙ্গারাম্ল গ্যাস্ উদ্ভিদের পরিপোষণ করে।

জল শোধন করিবার জন্য দীর্ঘকাল হইতে কয়লার ফিল্টার ব্যবহার প্রচলিত আছে। কয়লার ফিল্টারের দ্বারা শুধু যে জলের সাধারণ ময়লা ছাঁকা হয় তাহা নহে;—জলে যে সকল জৈবিক দূষিত পদার্থ (Organic impurities) আছে, তৎসমস্তই কয়লার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় নষ্ট হইয়া যায়। কয়লার এই অক্সিডাইল্ করিবার ক্ষমতা এবং শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই উহা শোধক ও দুর্গন্ধনাশকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই কয়লার আর একটী গুণ আছে; ইহা জান্তব পদার্থের পচন নিবারক। মাছ মাংস প্রভৃতি কিছুক্ষণের মধ্যেই পচিতে আরম্ভ করে। দেখা গিয়াছে, কাটা মাছ মাংসের উপরে কাঠ কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে ঐ মাছ মাংস অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টাটকা অবস্থায় থাকে। রন্ধন করিবার সময় পরিষ্কার জলে ঐ কয়লার গুঁড়া ধুইয়া লইলেই হয়।

পাইখানায়, নর্দ্দামায়, গোয়ালঘরে, আস্তাবলে বহুরোগীর আবাস হাঁসপাতালে, জনসমাকীর্ণ সভা স্থলে, থিয়েটার-সিনেমার ঘরে, হাটবাজারের বদ্ধ জায়গায় নানাপ্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত গ্যাস উত্থিত হয় এবং তাহার ফলে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। এই সকল স্থানের বায়ু শোধন করিবার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে বিবিধ যন্ত্র উদ্ভাবিত এবং তাহাদের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের ইংরাজী চলতি নাম ভেন্টিলেটর (Ventilator), রেস্পিরেটর (Respirator), ডিওডরাইজার (Deodoriser) গ্যাস্-মাস্ক্ (Gas-mask) প্রভৃতি; এই সকল যন্ত্রের প্রধান উপকরণ কাঠ-কয়লা।

দুইখানি তারের জালির (Wire gauze) মধ্যে কাঠকয়লার গুঁড়া সাজাইয়া একটা পুরু পরদার মত করা হয়। ইহাকে দূষিত বায়ু চলাচলের পথে সুবিধাজনকভাবে রাখিয়া দিলে কয়লার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার এবং কয়লার শোষণ ক্ষমতার প্রভাবে বায়ু শোধিত হইয়া যায়। প্রয়োজন মতে ঐ পরদার পুরুতা, আয়তন ও আকৃতি নানা প্রকারের করিয়া লইতে হয়। কোন কোন স্থানে তারের জালির পরিবর্ত্তে চটের থলি ব্যবহার করা যায়। চটের থলির মধ্যে কয়লা পুরিয়া ঐ থলি দূষিত বায়ুযুক্ত স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এই উপায়ে খুব অল্প খরচায় এবং সহজে পাইখানা, গোয়ালঘর, আস্তাবল প্রভৃতির দুর্গন্ধ নষ্ট করা যায়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, তারের জালি বা চটের থলির মধ্যস্থিত কয়লা মাঝে মাঝে বদলান আবশ্যক।

কাঠকয়লা উত্তপ্ত হইলে ইহার শোধন শক্তি বৃদ্ধি পায়। কোন পাত্রের মধ্যে পাতলা এক স্তর কাঠকয়লা সাজাইয়া ঐ কয়লাকে উত্তপ্ত করুন। এক্ষণে এই পাত্রটিকে দূষিত বায়ুযুক্ত কোন ঘরে রাখিয়া দিলে অথবা ঐ পাত্রটীকে লইয়া ঘরের ভিতর কয়েকবার যাওয়া আসা করিলে ঘরের বায়ু শোধিত ও দুর্গন্ধশূন্য হয়। আমাদের দেশে সন্ধ্যায় সকালে ধুনোচিতে করিয়া ধূপধূম দিবার যে রীতি আছে, বায়ু-শোধন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ধুনোচিতে কাঠকয়লা ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য এবং উহার আকৃতি ও আয়তন অগভীর ছোট থালা বা ট্রে-র মত হওয়া দরকার। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ গভীর বাটীর আকৃতি ধুনোচি তৈয়ারী ও ব্যবহার করা হয়, তাহাতে

কয়লাকে পাতলা স্তরে সাজান যায় না এবং বিস্তৃত কয়লার অধিকতর প্রশস্ত উপরি ভাগ (Wider surface of coal) বায়ুর সংস্পর্শে আসে না। সুতরাং ধুনোচি ব্যবহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হয়।

আমাদের দেশের গৃহস্থ জন সাধারণ সকালে সন্ধ্যায় ধূপ ধূনো দেয় এবং ইহাকে তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ-স্বরূপ মনে করে। কিন্তু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে বায়ু শোধন, তাহা কেহ জানে না। নব্য সভ্যতানুরাগী শিক্ষিত সমাজের লোকেরাও ধূপ-ধূনো ব্যবহার করেন, তাঁহারা ধুনোচির পরিবর্ত্তে ধূপ-কাঠি জ্বালাইয়া থাকেন। ইহার দ্বারা ঘরের বায়ু সুবাসিত হয়, এইমাত্র। বাস্তবিক বায়ু শোধন ইহাতে হয় না। দুর্গন্ধের স্থলে সুগন্ধ ছড়াইলে মানসিক প্রফুল্লতা আসিতে পারে ; কিন্তু বায়ু শোধন করিতে হইলে উহার মধ্যস্থিত রোগ-বীজাণুসমূহ নষ্ট হওয়া দরকার এবং দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর গ্যাস সমূহকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একেবারে বিলুপ্ত করা আবশ্যক। প্রশস্ত-মুখ ধুনোচিতে কাঠকয়লা জ্বালাইয়া তাহাতে ধূপ পোড়াইলে বায়ুশোধন ও বায়ু সুবাসিত করণ দুই কার্য্যই হয়। ধুনোচিতে টিকিয়ার আগুণ ব্যবহার করা উচিত নহে।

পচা ঘা, গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি সারাইবার জন্য কাঠ কয়লার গুড়া অব্যর্থ ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় হাঁসপাতালসমূহে বিশেষতঃ যুদ্ধ সংক্রান্ত হাঁসপাতালে দুষ্ট-ক্ষত ও গ্যাংগ্রীন্ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশী। সেই সকল স্থানে দেখা গিয়াছে, কাঠকয়লার গুঁড়া ব্যবহারের দ্বারা বিযাক্ত ক্ষত ও গ্যাংগ্রীনের প্রসার কমিয়া আসিয়াছে এবং রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কয়লার গুড়া ঠিক ক্ষতস্থানের উপরেই লাগাইতে হয় না। ব্যাণ্ডেজ বা ড্রেসিংএর উপরে ছড়াইয়া দিতে হয় ; অথবা কয়লার গুঁড়ার দ্বারা ছোট গদীর মত তৈয়ারী করিয়া ঘায়ের উপর চাপান দিয়া রাখিতে হয়। গ্যাংগ্রীন আক্রান্ত অনেক দুরারোগ্য রোগী ইহাতে সারিয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য শোধক দ্রব্য

বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকার শোধকদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার কয়েকটী নামও উল্লেখ করিয়াছি। এইসব ব্যবহার করিতে নানাদিকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। কোন বিশেষ রোগ বীজাণু নষ্ট করিতে হইলে,—যেমন কলেরা, টাইফয়েড্, বসন্ত প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঘর শোধন করিতে হইলে চিকিৎসকদের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। কোন শোধক পদার্থের দাম কম, কোনটী ছড়াইয়া দিতে সুবিধা ; কোনটী গুড়া, কোনটী বা তরল, কোনটীর দ্বারা মেজে শোধন করা যায়, কোনটীর দ্বারা বাতাস বিশুদ্ধ হয় ইত্যাদি নানা প্রকারের সুবিধা অসুবিধা যুক্ত বিবিধ শোধক পদার্থ আছে। নিম্নে কয়েকটীর বিবরণ লিখিত হইল ;—

(১) বার্ণেটের মশলা, (Burnett's Disinfecting Fluid)। অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য এবং মাছ মাংস প্রভৃতি টাটকা রাখিবার জন্য এক প্রকার তরল মশলা ব্যবহার হইয়া থাকে। স্যার উইলিয়াম্ বার্ণেট তাহার আবিষ্কারক। তাঁহার নামানু-

সারে ইহার বাজার চলতি নাম বার্ণেটস্ ডিস্-ইন্‌ফেক্টাণ্ট ফ্লুইড। সকলেরই নিকট ইহা সুপরিচিত। রোগীর ঘর শোধন করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধের দোকানে অথবা রাসায়নিক মশলা বিক্রেতার নিকট (Chemist and Druggist) ইহা পাওয়া যায়।

(২) গ্ল্যাসিয়ালাইন (Glacialine)। ইহা একটি বিখ্যাত শোধক ও রোগ বীজাণু প্রতিষেধক (auticeptic) দ্রব্য। মাছ মাংস প্রভৃতি জান্তব খাদ্য এবং বীয়ার (Beer), দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থ টাটকা রাখিবার জন্য ইহার ব্যবহার খুব প্রচলিত। রাসায়নিক মশলা বিক্রেতা, ঔষধের দোকান এবং অয়েলম্যান ষ্টোর্সে (Oilman Stores) ইহা পাওয়া যায়।

(৩) ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder) ইহার রাসায়নিক নাম ক্লোরাইড অব লাইম (Chloride of Lime)। এই মশলাটী আমাদের দেশে সকলেরই নিকট সুপরিচিত। মিউনিসিপ্যালিটীতে আজ কাল ব্লিচিং পাউডার খুব ব্যবহার হয়। নর্দ্দামাতে, পাইখানাতে এবং যে-কোন আবর্জ্জনা দুষ্ট স্থানে ইহা একটু জলের সহিত মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলে অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। ঘরের মেজে মুছিবার সময় জলের সহিত কিছু ব্লিচিং পাউডার গুলিয়া দিলে ভাল হয়। তাহাতে মেজে শোধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ব্লিচিং পাউডার ছড়াইলে একপ্রকার বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়, উহা ক্লোরিণ গ্যাসের গন্ধ। কেমিষ্ট এবং অয়েলম্যান ষ্টোর্সে ব্লিচিং পাউডার ক্রয় করা যাইতে পারে।

কার্ব্বলিক য়্যাসিড

(৪) ইহা খুব জোরাল এবং ঘণীভূত (Concentrated) শোধক পদার্থ। সেইজন্য ইহাকে জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। কি পরিমাণ জলের সহিত কি পরিমাণ কার্ব্বলিক য়্যাসিড মিশাইতে হইবে, তাহার ভাগ ও মাপ শোধন কার্য্যের রকম অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। কার্ব্বলিক য়্যাসিড একটী ভীষণ বিষ। সুতরাং ইহা ঘরে রাখিতে খুব সাবধান হওয়া দরকার। অনেকে ঔষধভ্রমে কার্ব্বলিক য়্যাসিড খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে। সেইজন্য কার্ব্বলিক য়্যাসিড নিষিক্ত একরকম পাউডার বা চূর্ণ বাজারে বাহির হইয়াছে। উহার ব্যবহার নিরাপদ। সেই কার্ব্বলিক পাউডারকে ব্লিচিং পাউডারের মত ছড়াইয়া দিতে হয়। কার্ব্বলিক পাউডারের রং সাধারণতঃ পিঙ্ক অর্থাৎ গোলাপী রকমের।

(৫) Phenyle—ইহা আজকাল খুব প্রচলিত। ইহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী-সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

পুরুষের প্রতিদিন
মেয়ের একদিন

*

কৃপণের ধন যক্ষিলে খায়

*

ঘরের বুড়ী সর্ব্বনাশী

*

হাকিম ছাড়া আদালত
স্ত্রী ছাড়া শ্বশুর বাড়ী

*

সর্ব্বস্ব হারালে তীর্থবাস

*

নিজের কপালে মাগ নাই
দাদার শ্বশুড় বাড়ী যাই

*

পীরিতের মজা বুঝা দায়

*

না-পাইয়া পাইছে ধন
বাপেপুতে কীর্ত্তন

*

চোরের বাড়ী দালান উঠেনা

*

পুনর্মূষিকো ভব—

*

খালি বনে খাটাস বাঘ

*

মায়ের এক ছেলে যমে বুঝে না

*

কথার বেলায় সবার আগে
কাজের বেলায় সবার পাছে

*

মাকাল দেখিতে লাল
টুক্ টুক্ টুক
ভিতরে তাহার বর্ণ—
বিষ মাখা বুক

*

একে তো পাগলা বুড়ী
আরও দেয় ঢোলের বাড়ি

*

জামাই যে উপযুক্ত
মেয়ের খোপায় বুঝা যায়

*

কইয়া লও গো পুতের বৌ
খোদায় ভরে দিছে
আমার আছিল এমন দিন
খোদায় নিয়া গেছে

*

এইছা দিন নাহি রহে গা

*

আপনি আছেন গভীর জলে
পোলারে পাঠাইছেন বাত্তান'তি
মুইতা চিড়া ভিজামু
তবু জলে নাম্মু না

*

টিকি রাখলেই পণ্ডিত হয় না

*

টাক্ প'ড়িলেই বড়লোক হয় না

*

ওস্তাদের মার শেষ রাত

*

বেহায়ার রাজ্য সমান

*

খাইতে খাইতে পেট বাড়ে
কইতে কইতে মুখ বাড়ে

*

কাজে এঁড়া ভোজনে দেড়া

*

বামুনের মুখে ডাল ভাত
শূদ্রের পাতে ঘি

*

গরীবের বাড়ি হাতীর পাড়া

*

তেঁতুল না হয় মিষ্টি
শেক্ না হয় ইষ্টি

*

সামনে রাম রাম
পাছে শয়তানের কাম্

*

সর্ব্বস্ব গুরুর পদে
পুরের ঝাড়ের ভাঁইখা বাদে

*

মুখে মুখে সর্ব্বস্ব দান

*

পেট ভরে খাওয়াইয়া
পিঠ ভরে কিল

*

ধনী মরে ক্ষুদের জাউ খেয়ে

*

চোরের রাত্রি বাসও লাভ

*

ঘোড়ামুখো দেবতা
মাষ কলাই তার আধার

*

পরের ভাগ্যে পোলার বাপ

*

নিষ্ফলা গাছে বানর উঠে না

*

শালা হলেও মাগের কুটুম

*

বাঁকীর নাম ফাঁকি

*

চাপ দিলে বাবা ডাকে

*

উনা ভাতে দুনা বল,
ভরা ভাতে রসাতল

*

পরের তেলে বামুন তাজা

*

থাকলে কাঁচি হারালে দাও

*

মরলেই স্বর্গ পায় না

*

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়েনা

*

স্ত্রী বুদ্ধি কেলেঙ্কারী

*

কথায় বার্ত্তায় বচনে সার
এমনি করে চৌদ্দআনা পার

*

হরি ও বলে কাপড় ও তুলে

*

পরের ধনে পোদ্দারি

*

ঘরে নাই ঘোটা ভাঙ্
পাগড়ী বান্ধে তেড়া

*

রামায়ণ পাঠে ভূতের ক্যাচক্যাচি

*

পাগলের চৈত্র পরব

*

পাগলের গোবধে আনন্দ

*

বাড়ির গরু ঘাটের ঘাস খায় না

*

ফকির হাটে ফিকিরে

*

উরু দেখিয়ে ছয় মাস

*

আকাড়া চাউলের দোকানদারী

*

রাম যে গেল বনে
সে কথা উঠে মনে

*

ধন থাকলে শ্যামবাবু
ধন না থাকলে শ্যামা

*

কালনেমির লঙ্কা ভাগ

*

মুখেন মারিতং জগত

*

চোরের উপর বাটপাড়ি

*

মাগ নাই যার
পোড়া কপাল তার

*

শ্বশুড় বাড়ী জামাই চাকর
মামার বাড়ী ভাগনে চাকর

*

মামার শালা পিসার ভাই
তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই

সাধ নাই বেটা শ্বশুর বাড়ী যায়
পুরাণ লেপে পেশে

সুর নাই বেটা গান গায়
মনের অভিলাষে

অধিক ভোজে ব্রাহ্মণ নষ্ট
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীঅমৃত লাল আচার্য্য

ডেনমার্কের উন্নতির বিবরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস, সি।

ডেনমার্কে কৃষি কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার একদিনে হয় নাই। পৃথিবীর বাজারে বিদেশীয়-দের সহিত প্রতিযোগীতায়, বাইরের নানা অবস্থার সহিত সংগ্রামে এবং রাজ্য শাসন নীতির পরিবর্ত্তনে ইহা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। জনসাধারণের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং দৃঢ় সংকল্পের সহিত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহানুভূতি মিলিত হইয়া ডেনমার্কের উন্নতি সাধন করিয়াছে।

আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার হওয়ার পর ইউরোপ হইতে বহুলোক ঐ সকল দেশে যাইয়া চাষ বাস আরম্ভ করে। তথায় ভূমি উর্ব্বরা এবং মজুরী কম বলিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সস্তা হয়। ক্রমশঃ অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, পৃথিবীর বাজারে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার শস্যাদি খুব কম দামে বিক্রয় হইতে লাগিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থা যখন চরমে উঠে, তখন ইউরোপের দেশ সমূহের মধ্যে ডেনমার্কেরই বিপদ হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ শিল্পদ্রব্যে সমৃদ্ধ। ইহাদের খনিজ সম্পদও প্রচুর। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিতে না পারিলেও ইহারা ঐ সকল শিল্প ও খনিজ দ্রব্য বিক্রয়ের দ্বারা নিজ নিজ ক্ষতিপূরণ করিয়া লইত। কিন্তু ডেনমার্কের সেইরূপ শিল্প বা খনিজ সম্পদ কিছুই ছিল না।

এই বিপদের সময় ডেনমার্কবাসীদের চিন্তায় এক অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশল উদ্ভাবিত হয়। তাহারা কৃষিকার্য্যের চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া সেই নূতন পথ অবলম্বন করিল। তাহাতে শস্য বিক্রয় ব্যাপারে বিদেশীর সহিত প্রতি-যোগিতা নাই। কৃষিজাত দ্রব্যকে রূপান্তরিত শিল্পের আকারে বাজারে উপস্থিত করাই এই অভিনব নীতির বিশেষত্ব। ডেনমার্কবাসী কৃষকেরা দেখিল সস্তার বাজারে শস্য বিক্রয় করিয়া কোন লাভ নাই। সেই সস্তাদামের শস্য তাহারা গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগকে খাওয়াইয়া দুগ্ধ, মাখন, চর্ব্বি, মাংস, ডিম প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিবার ব্যবস্থা করিল। সেই সময় হইতে ডেনমার্কে কৃষি কার্য্যের সহিত পশু পক্ষী পালনের কারবার প্রচলিত হয়। ডেনমার্কের কৃষকেরা বাহিরের বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য শস্য উৎপাদনে আর মনোযোগ দিল না। যে সকল জমিতে তাহারা পূর্ব্বে শস্যের চাষ করিত তাহাতে গৃহপালিত পশু পক্ষীদের খাদ্যোপযোগী শস্য ও তৃণ-ঘাস প্রভৃতি জন্মাইতে আরম্ভ করিল। দেখা গেল, গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হাঁস, মুরগী, টার্কি প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে ঐ সকল

শস্য ও তৃণ খাওয়াইয়া উৎকৃষ্ট দুগ্ধ, মাখন, ডিম, চর্ব্বি, মাংস পাওয়া যায় এবং তাহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ হয়। ডেন্‌মার্কবাসী কৃষকদের এই অপূর্ব্ব পন্থার নাম হইয়াছে, Industrialisation of Agriculture। আজ কাল সুবিধা বুঝিয়া অনেকেই এই নূতন পথ ধরিতেছেন।

কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও ডেন্‌মার্কের মধ্যে এই বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রুশিয়া, ইতালী হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষি কার্য্য (Farming) এবং দুগ্ধজাত শিল্প (Dairy) একেবারে পৃথক্; কৃষি কার্য্য এবং পশু-পক্ষী পালন (Poultry) এই দুইটীর মধ্যেও ব্যবধান রহিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই তিনটী কারবার পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করে। ডেন্‌মার্কে তাহা নহে। সেখানে কৃষিকার্য্য, দুগ্ধ শিল্প এবং পশু-পক্ষী পালন অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। এই শ্রেণীর লোক তিনটী কারবার চালায়; একই ব্যক্তি চাষী, গোয়ালা ও রাখাল।

কৃষক জমিতে শস্য জন্মায়, বিক্রয় করিবার জন্য নহে, তাহার গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে খাওয়াইবার জন্য। সে দুগ্ধ শিল্পের কারখানায় (Diary তে) দুধ বিক্রয় করে। দুগ্ধে শতকরা যত ভাগ চর্ব্বি আছে, সেই হিসাবে সে দাম পায়, এবং মাখন তোলা দুগ্ধ ফেরৎ লইয়া আসে। ঐ মাখন তোলা দুগ্ধ সে গৃহপালিত শূকরকে খাওয়ায়। তাহাতে শূকরগুলি খুব পরিপুষ্ট ও চর্ব্বিযুক্ত হয়। এই সকল পরিপুষ্ট শূকরের মাংস খুব বেশী দামে বেকন ফ্যাক্টরীতে (Bacon factory) বিক্রয় হয়। সুতরাং কৃষক সেইদিকেও লাভ করে। হাঁস মুরগী ডিম এবং মাংসও উৎকৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ সব বিক্রয়ের দ্বারা বেশী লাভ পাওয়া যায়। এইরূপে কৃষি-কার্য্য দুগ্ধশিল্প এবং পশু-পক্ষী পালন একযোগে পরস্পরের সাহায্যে চলিয়া থাকে। এমন অনেক কৃষক আছে যাহাদের ৬।৭ বিঘা জমি থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জমিতে পশু-পক্ষীদের খাদ্য শস্যই চাষ করে। নিজেরা বাজার হইতে খাদ্য কিনিয়া লয়। হিসাব করিয়া দেখা যায়, ইহাতে তাহাদের লাভই হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে ডেনমার্কের শতকরা ১৫ ভাগ জমিতে গৃহপালিত পশুপক্ষীদের শীতকালেও খাদ্যের জন্য শস্য ও মূল চাষ হয়। এই জমি অবশ্য পশুচারণ যোগ্য নহে। অন্য কোন দেশে গৃহপালিত পশু-পক্ষীদের খাদ্যের জন্য এই পরিমাণ জমির চাষ হয় না। বিভিন্নদেশে প্রতি ১০০ জন অধিবাসীর কয়টী গরু ও শূকর আছে, নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া হইল;

	গরু	শূকর
ডেনমার্ক	৪৬	১৪৮
জার্ম্মাণী	১৬	৩৪
হল্যাণ্ড	১৫	২৫
ইংল্যাণ্ড	৭	৬

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায়, পশু পালন কার্য্যে ডেনমার্ক সর্ব্বপ্রথম, জার্ম্মাণী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

কেবলমাত্র এই নূতন পন্থাতে চলিয়াই যে ডেনমার্ক বাসী কৃষকেরা সফলতা ও উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। আরও অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটী হইল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা। ইহা বুঝিতে হইলে ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্টের ইতিহাস একটু জানা দরকার। বর্ত্তমান সময়ে ডেনমার্কে

নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র (Limited monarchy) শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। পার্লিয়ামেণ্টের সাহায্যে রাজা শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ শাসনপ্রণালী পূর্ব্বে ছিলনা। সুতরাং তখন জমিজমা সম্পর্কিত আইনকানুনও কৃষকদের প্রতিকূল ও দুর্দ্দশার কারণ ছিল। চাষীরা চাকরের মত তাহাদের মনিবের জন্য খাটিত। মধ্যবর্ত্তী দালালেরাই কৃষকদের পরিশ্রমের ফল শোষন করিয়া লইয়া যাইত। জমির প্রতি কৃষকদের কোন মায়া মমতা ছিলনা। ধনীলোকেরাও জমির উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করিতনা। কারণ তাহাদের যে পরিমাণ জমি ছিল, তাহাতে অবহেলায় অযত্নে চাষ করিলেও তাহাদের বিলাস-ব্যসনের উপযোগী প্রাচুর্য্যের অভাব হইত না। চাষী এবং ধনী উভয়েরই এইরূপ অবহেলার দরুণ জমির অবস্থা কখনও উন্নত হয় নাই।

তারপর যখন দেশের গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল,—যখন পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপিত হয় এবং দেশের লোকের হাতে শাসনভার যায়, তখন কৃষকদের প্রতিনিধিই অধিক সংখ্যায় পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। সুতরাং কৃষকের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সুযোগ ঘটিল।

১৯১৯ সালের ৭ই অক্টোবর ডেনমার্কের নূতন গবর্ণমেণ্ট জমি জমা সম্বন্ধে এক নূতন আইন পাশ করেন। তাহাতেই কৃষকের অবস্থা খুব ভাল হইয়া উঠে এবং জমিজমায় তাহার স্বত্ব

সুদৃঢ় ও নিরাপদ হয়। ডেনমার্কের রাজনীতিক ইতিহাসে উহা একটী প্রধান এবং বিখ্যাত ঘটনা। সেই আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট জমিদারদের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং ঐ বাজেয়াপ্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দেন। জমিদারেরা যাহাতে কোন অসুবিধায় না পড়ে,—কিম্বা কোনপ্রকারে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেইজন্য আইনে এইরূপ একটী সর্ত্ত থাকিল যে, জমিদারেরা ইচ্ছা করিলে উক্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা দিয়া কিনিয়া লইতে পারেন। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। জমিদারগণকে আর একটী সুবিধা দেওয়া হইল এই যে তাঁহারা তাহাদের জমি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে জমিদারদের এই ক্ষমতা ছিলনা। এই আইন পাশ হওয়ার ফলে দেড়লক্ষ বিঘা জমি জমিদারদের দখল হইতে মুক্ত হইল। উক্ত জমি গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের মধ্যে ছোট ছোট জোতরূপে ভাগ করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৯০ হাজার বিঘা পতিত জমি সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহাও কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তাহাতে বহুসংখক ছোট ছোট ফার্ম্মের সৃষ্টি হয়। এহ সকল বন্দোবস্তের দ্বারাও যদি কোন স্থানে দেখা যায়, কৃষকের জমির অকুলান হইতেছে, সেইস্থানে গবর্ণমেণ্ট জমি কিনিবার জন্য কৃষকদিগকে প্রচুর টাকা দিয়া থাকেন। ঐ টাকাতে কৃষকেরা জমিদারের নিকট হইতে জমি কিনিতে পারে। ১৯২১ সালে গবর্ণমেণ্ট এইরূপে কৃষকদিগকে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা এইখানেই শেষ হয় নাই। জমি, বীজ, চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনিবার জন্য কৃষকদিগকে গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে ঋণ দিয়া থাকেন। এই সকল ঋণের সুদের হার খুব কম,—সাধারণতঃ শতকরা ৩ টাকা এবং পরিশোধের মেয়াদও দীর্ঘকাল,—সাধারণতঃ ৪৫ বৎসর। ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এইরূপে কত টাকা ঋণ দিয়াছেন নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল ;—

সাল	যতটাকা ঋণ দেওয়া হয়
১৮৯৯	৭৫ লক্ষ টাকা
১৯০৪	১১২৫০০০০ ”
১৯০৯	১৫০ লক্ষ টাকা
১৯১৪	১৮৭০০০০০ ”
১৯২১	৯০ লক্ষ টাকা
১৯২৪	২৭০০০০০০ ”
১৯২৭	১৮০০০০০০ ”

যাহারা খাঁটী কৃষক,—অর্থাৎ যাহারা স্বহস্তে জমি চাষ করে, তাহারাই কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উক্ত প্রকার অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। গবণমেণ্টের নিকট ঋণ পাইতে হইলে দরখাস্তে জানাইতে হয় প্রার্থী যে পরিমাণ জমি কিনিতে চায়, তাহার মূল্য কত। উক্ত মূল্যের একদশমাংশ ঋণ প্রার্থীকে সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশিষ্ট $\frac{9}{10}$ অংশ গবর্ণমেণ্ট ঋণ-স্বরূপ দিবেন।

(ক্রমশঃ)

সৌন্দর্য্য সঙ্কেত

১। মহিলাগণের মুখশ্রীর প্রধান অন্তরায় সূর্য্য-দগ্ধা বা যাহাকে বাঙ্গালায় বলে মেছেতা; চিরদিন দাগশূন্য ঢল ঢল মুখশ্রী রক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে মুখশ্রী চিরদিন সমান থাকিবে। দধি ইহার একটী উৎকৃষ্ট উপকরণ। অঙ্গুলি দ্বারা কিঞ্চিৎ দধি লইয়া মুখ মণ্ডলে মর্দ্দন করিলে অতি শীঘ্রই মুখের সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিবে, কোন বিখ্যাত অভিনেত্রী বলেন, ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। দুগ্ধের সরও মুখশ্রী রক্ষার উৎকৃষ্ট উপকরণ। দধিতে যে ল্যাকটিক্ এ্যাসড থাকে, তাহা গাত্রত্বকের উপর অদ্ভুত কার্য্যকারী।

২। একটা লেবুকে কাটিয়া সেই লেবুর অর্দ্ধাংশ মুখ মণ্ডলে ঘর্ষণ করিলে সূর্য্যদগ্ধা ব্রণ, মেছেতা বিদূরিত হইবে। কিন্তু ঠোঁট্ বা মুখে ক্ষত থাকিলে লেবুর রস লাগিলে জ্বালা করিতে পারে, সেইজন্য ক্ষতাদি না থাকিলে মুখশ্রী রক্ষার ইহাও একটী উৎকৃষ্ট উপাদান। এই লেবুর রস মুখমণ্ডলে সূর্য্যাস্তের পর হইতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহার পর মুখখানি ধুইয়া কোমল তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া কোল্ড ক্রিম মাখাইয়া মুখ মুছিয়া শয়ন করিতে হয়। মুখের উপর সূর্য্য কিরণ যথাসম্ভব লাগিতে না দেওয়াই উচিত। এইজন্য আমাদের অবগুণ্ঠন প্রথা খুবই কার্য্যকরী! সুসভ্য পাশ্চাত্য মহিলাগণও বাহিরে যাইবার সময় মুখে ভেল্ বা ঘোমটার মত জাল ব্যবহার করেন, আমাদের ঘোম্‌টাটা খারাপ নয়।

৩। শীতল জলে স্নান ও মুখমণ্ডল ধৌত করিলে অনেক সময় উপকার হয়। কিন্তু বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া অকস্মাৎ ঠাণ্ডা জল মুখে দেওয়া উচিত নয়, এইজন্যই মুখে মেছেতা পড়িয়া থাকে, ঠাণ্ডা জলে স্নান ও মুখমণ্ডল ধৌত করিয়া কোমল তোয়ালে দ্বারা চাপিয়া মুছিয়া ফেলিলে শীতল জলের সংস্পর্শে শোণিত যে চর্ম্মের অতি নিম্নস্তরে চলিয়া যায়, তাহা জানা উচিত। কিন্তু তোয়ালে দ্বারা মুখ চাপিয়া মুছিলে শোণিত উপরে উঠিয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে।

৪। সুন্দরীগণের চক্ষের সৌন্দর্য্য ও দীপ্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রাতে গাত্রোত্থান করা উচিত। যথাসাধ্য প্রাতঃসমীরণে ভ্রমণ করিলে চক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। ক্রমাগত অবরুদ্ধ কক্ষে থাকিলে সাধারণতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও যথাসাধ্য পরিমিত ব্যায়াম দ্বারা নয়নের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।

লাইমস্টোন বা চুণা পাথরের ব্যবহার

চুণাপাথরের নাম শোনেননি এমন লোক এদেশে বিরল, কিন্তু চুণাপাথরের গুণাবলীর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত নন্ এমন ব্যক্তি এদেশে বহু আছেন। বস্তুতঃ সকল দিক দিয়ে চুণাপাথরের ব্যবহার বলে শেষ করা যায় না। ইহা নিঃসন্দেহে লিপিবদ্ধ করা চলে যে, চুণা-পাথরের কাটতির পরিমাণ দেশের শিল্পোন্নতির আংশিক পরিমাপক। বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাষণ ব্যাপারে অর্থাৎ ইংরাজী টেক্‌নিক্যাল্ ভাষায় যাকে মেটালার্জি (metallurgy) বলে সেই ব্যাপারে চুণাপাথর না হলে চলে না। এক টন লোহা উৎপাদন করতে গেলে কম্‌সে কম আধা টন চুণাপাথর প্রয়োজন হয়। এর থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় চুণা-পাথরের কাটতি কি ভয়ঙ্কর। শুধু মেটালা-র্জির ক্ষেত্রেই নয়, অপরাপর বহু ব্যাপারেই চুণাপাথর আবশ্যক হয়। সিমেণ্ট কিংবা লাইমের ব্যাপারই ধরুন। অধুনা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ যে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মাণ করেছে, প্রকৃতির করাল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করবার স্পর্দ্ধা তারা রাখে—এমনি তারা সুদৃঢ় মজবুত ও শক্ত বনিয়াদ পুষ্ট। কিন্তু মানুষের এই খোদকারী সম্ভব হয়েছে সিমেণ্টের কল্যাণে। নইলে মানবের সাধ্য কি প্রকৃতির দুরন্ত খেয়ালের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে? ইঞ্জিনিয়ারিং কলাকুশল-বিদ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, লোহা 'পাথর' ও সিমেণ্টের মত জমাট শক্ত জিনিস আর কিছু নেই; সেইজন্যই আজকাল অট্টালিকা মিনার স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে সিমেণ্ট অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, ট্রামপথ, রেলপথ, বাঁধ, সেতু, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে সিমেণ্ট না হলে চলে না। অথচ সিমেণ্ট প্রস্তুত ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে চুণাপাথর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সিমেণ্ট ছাড়াও রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে যে পাথর ব্যবহৃত হয় তাও চুণা পাথর সম্ভূত। অট্টালিকা নির্ম্মাণ কার্য্যে আজ-কাল পাথরের ব্যবহার ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েছে এবং সে পাথরও ঐ চুণাপাথর বংশজাত। ফারনেস্ অর্থাৎ বৃহদাকার উনুনের জন্য যে 'ডলোমাইট' ব্যবহৃত হয় সেটাও চুণাপাথর হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কেমিক্যাল শিল্পোৎপাদনের কারখানাসমূহেও চুণাপাথর কাজে লাগে। এবং এছাড়া আমরা যাকে চক্ বা চা-খড়ি বলি, সেটাও চুণাপাথরের নিরস কোয়ালিটির দ্রব্যের গুঁড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সমস্ত ব্যাপার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, চুণাপাথর আমাদের সমাজে কী পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় জিনিস। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জিনিসটাই সাধারণের কাছে মোটেই প্রতিভাত হয় না

নিম্নে একটি তালিকা থেকে চূণাপাথরের কাটতির পরিমাণ কতকটা বোঝা যাবে,—

কি ব্যাপারে ব্যবহৃত	মোট উৎপাদনের কত অংশ ব্যবহৃত	
	১৯২৬	১৯৩২
	শতকরা	শতকরা
সিমেণ্ট ও লাইম প্রস্তুত ব্যাপারে	৩৩.০ ভাগ	২৮.৫ ভাগ
ব্লাষ্ট ফারনেসে ফ্লাক্স হিসাবে	৩১.০ ,,	১১.০ ,,
রাস্তা ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ ব্যাপারে	৩১.০ ,,	৪৮.৩ ,,
ফারনেসে ব্যবহৃত ডলোমাইট হিসাবে	৩.০ ,,	২.৩ ,,
কেমিক্যাল শিল্প ইত্যাদি ব্যাপারে	২.০ ,,	৯.৬ ,,

চূণাপাথর সম্পর্কে সকল তথ্য অবগত হতে গেলে চূণাপাথরের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার। সমুদ্র ও হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানে মাটি ও অপরাপর বস্তু স্তূপীকৃত হয়ে হয়ে যে পাহাড় জমা হয় ইংরাজীতে তাদের সেডিমেণ্টারী রক্স্ (sedimentary rocks) বলে। চূণাপাথর এই সেডিমেণ্টারী রক সম্ভূত। এক হিসাবে দেখতে গেলে চূণাপাথর প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। আমাদের এই পৃথিবীর শিল্পী স্রষ্টা তার গাত্রাবরণের তলায় রহস্যময় ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে; সে রহস্য উদ্ঘাটন করবার দায়িত্ব রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ওপর। পাতালপুরীর ভেতরকার স্তরে স্তরে সাজানো মাটির থাক জীবজন্তুর কঙ্কাল সমূহের ধ্বংসাবশেষ ও বিভিন্ন পাহাড় পর্ব্বতাদি হচ্ছে সে-রহস্যমন্দিরের চাবিকাঠি। চূণাপাথর উক্ত পাহাড় পর্ব্বত সম্ভূত সুতরাং ঐ রহস্যেরই একটা অংশবিশেষ। সুতরাং ক্রমবিবর্ত্তনবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে চূণাপাথরের খানিক মর্য্যাদা আছে। যে পাহাড় পর্ব্বতের বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি তা অর্থাৎ সেডিমেণ্টারী রক্ দুরকমে সৃষ্টি হতে পারে, প্রথমতঃ সাগর বা হ্রদ সৈকতের পলির দ্বারা তা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব দ্বিতীয়তঃ, নানারকম দ্রব্যের ধ্বংসাবশেষ স্তূপীভূত হওয়ায় তা' জন্ম নিতে পারে। প্রথমোক্ত পাহাড় হতে বালি পাথর কাদামাটি ইত্যাদি পাওয়া যায় কিন্তু শেষোক্ত পাহাড় সমূহে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম্ জমা হয়। চূণাপাথর এই শেষোক্ত পাহাড় সম্ভূত। কিরকমভাবে পাহাড়ে ক্যালসিয়াম জমা হয় তারও একটা ইতিহাস আছে। সমুদ্রস্থ বা সমুদ্রোপকূলস্থ প্রাণী সমূহ ও উদ্ভিদ সমূহ যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন তারা তাদের সঞ্চিত সল্টসমূহ সাগরগর্ভে ও সৈকতভূমে ফেলে রাখে। উক্ত পরিত্যক্ত সল্টসমূহের সঙ্গে যখন সাগর কিনারের কাদা ও বালুকারাশি মিশ্রিত হয়ে স্তূপীকৃত আকার ধারণ করে তখন তা' পাথরে পরিণত হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা' হয়ে দাঁড়ায় বালি পাথর। পরন্তু উক্ত পরিত্যক্ত সল্ট সমূহ যখন কোন মাটি বা বালির সঙ্গে মিশ্রিত না হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় জমা থাকে তখন পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সাগর সৈকত সমূহ যখন পাহাড়ে পরিণত হয় তখন উক্ত ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বোনেট সমূহ সিমেণ্টের মত জমে গিয়ে চূণাপাথরে পরিণত হয়। এই হ'ল চূণা পাথরের সংক্ষিপ্ত জন্ম বৃত্তান্ত।

উপরে চুণাপাথরের উৎপত্তির বিষয় লিপিবদ্ধ হ'ল। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, চূণাপাথরের প্রাথমিক আদিম উপাদান হচ্ছে জীবসমূহের ধ্বংসাবশেষ সম্ভূত ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বোনেট। বিভিন্ন প্রকার জীবসমূহের বিভিন্ন প্রকৃতির ধ্বংসাবশেষ থাকার দরুণ উৎপন্ন ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বোনেটের গুণাগুণের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য বিভিন্ন স্থানের চুণাপাথরের প্রকৃতির মধ্যেও কতকটা পার্থক্য ঘটে থাকে। এছাড়া আরও একটা কারণ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সর্ব্বস্থানে সমান রুদ্রশক্তি নিয়ে দেখা দেয় না, তারও গভীরতার তারতম্য ঘটে। এই তারতম্যের জন্যই নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের হ্রাসবৃদ্ধি হেতু চূণাপাথরের গুণাগুণের বিভিন্নতা দেখা দেয়। কোন কোন চূণাপাথরে ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বোনেট ছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম কার্ব্বোনেট থাকে, তখন তাদের ম্যাগনেসিয়াম্ লাইমষ্টোন্ বা ডলোমাইট লাইম্‌ষ্টোন্ বলা হয়। যদি ম্যাগনেসিয়ামের ভাগ খুব বেশী থাকে তাহলে সে লাইম্‌ষ্টোন্‌কে ডলোমাইট বলে, তবে ঠিকভাবে ধরতে গেলে শতকরা ৪৫·৬৫ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম্ কার্ব্বোনেট বর্ত্তমান থাকলে তবেই তাকে ডলোমাইট বলা যায়। ডলোমাইটের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকার দরুণ তা' বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যেখানে শুধু চূণাপাথরে কাজ চলে না, সেখানে ডলোমাইট যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করা চলে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, বিভিন্ন জীবজন্তুর ধ্বংসাবশেষের পার্থক্যের দরুণ চুণাপাথরও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে এবং এই ভিন্ন ভিন্ন পাথরের নাম হচ্ছে সেলি (Shelly) লাইম্‌ষ্টোন, কোরাল (coral) লাইম্‌ষ্টোন, এ্যালগল্ (algal) লাইম্‌ষ্টোন ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রকারের চুণাপাথর ব্যতীত কোলাইট (Colite) লাইম্‌ষ্টোন নামে অপর এক প্রকারের পাথর পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে চুণাপাথরের বহুবিধ ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং তাতে একথাও বলা হয়েছে যে, একটন লোহা উৎপাদন করতে গেলে অন্ততঃ অর্দ্ধ টন চুণাপাথরের প্রয়োজন হয়। লৌহ ও জ্বালানী দ্রব্যের সঙ্গে চুণাপাথরকে ফারনেসের মধ্যে রাখা হয় এবং ইহারই সাহায্যে লৌহের মধ্যস্থিত ধাতব পদার্থ (ore) বালি, কাদা ইত্যাদি নিষ্কাষিত হয়। ইহা লৌহের মধ্যস্থিত গন্ধক পদার্থকেও দূরীভূত করে। তাহা ছাড়া ফারনেসের আভ্যন্তরিক গাত্রাবরণের জন্য লাইম্‌ষ্টোনের ব্যবহার অপরিহার্য্য। কেমিক্যাল্ ইণ্ডাষ্ট্রীতে এবং কাচ, কাগজ, সাবান প্রভৃতি উৎপাদনের জন্যেও চুণাপাথর একান্ত প্রয়োজন।

অবশেষে একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কালসিয়াম কারবোনেটের প্রয়োজন। মানুষ আজ নিজের বুদ্ধি কৌশলে চুণাপাথরকে সদ্ব্যবহারে লাগিয়েছে এবং এই জন্যই ইহার আজ এত চাহিদা। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে যে দেশে চুণাপাথর পাওয়া যায় না সে দেশ মিনারেল বা খনিজ সম্পদ বাড়াইবার প্রধান উপাদান হইতেই বঞ্চিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান; কিন্তু একে যে ব্যবসা সম্পদে পরিণত করা যায় সে জ্ঞান অল্প লোকেরই আছে। আমরা ঐ চুণাপাথরের বিরাট পাহাড়ই প্রত্যক্ষ করি কিন্তু সেই পাহাড়ই যে অর্থকরী হয়ে দাঁড়ায় তা'

ভেবে দেখিনে। শুধুমাত্র রাস্তা ও ইমারৎ নির্ম্মাণের জন্য ইহা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে তা' থেকে একথা বলা চলে যে ইহার একটী বিরাট ক্রমবর্দ্ধমান বাজার বর্ত্তমান। সুখের বিষয় কয়েকটী বাঙ্গালী কোম্পানী চুণাপাথরের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং পাকুড় চুণার প্রভৃতি যায়গা হ'তে ইহা চালান দিচ্ছেন। আমরা অপরাপর বেকার বাঙ্গালীদের এ-ব্যবসাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

আমরা অবগত হইলাম, বেঙ্গল ইন্‌সুর‍্যান্স য়্যাণ্ড রিয়্যাল প্রপার্টি শীঘ্রই কলিকাতায় তাঁহাদের নিজস্ব বাড়ী করিবেন।

আমরা সানন্দে প্রকাশ করিতেছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বন্যা-সাহায্য ভাণ্ডারে লাহোরের লক্ষ্মী ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানী ২৫০ টাকা এবং মছলীপত্তনের অন্ধ্র ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিলাম, ভারত ইন্‌সুর‍্যান্সের কলিকাতা ব্রাঞ্চ্ ম্যানেজার মিঃ অশোক চাটার্জ্জি বি, এ, (ক্যাণ্টাব) ভারত ইন্‌সুর‍্যান্সের কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন। আমরা আরও শুনিলাম, তিনি মেসার্স মার্টিন য়্যাণ্ড কোম্পানীতে কোন উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ওরিয়েণ্ট্যাল গবর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটীর চীফ্ য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মিঃ মিনোকার খ্রাস্ এফ্ এম্ এস্ (লণ্ডন) ৫০½ বৎসর চাকুরীর পর উক্ত কোম্পানীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি ১৮৮৮ সালে ১৮ বৎসর বয়সে এই কোম্পানীর কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি একদিনের জন্যও আফিসে অনুপস্থিত হন নাই। চাকুরী-ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। ওরিয়েণ্ট্যালের হেড্ আফিসের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বিদায়ক্ষণে একখানি অভিনন্দন পত্র এবং বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, কলিকাতার ইউনিভারস্যাল প্রোটেক্টার ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর পরিচালকগণ জীবনবীমার কারবার বন্ধ করিবার মতলব করিয়াছেন।

মেসার্স ফ্রেণ্ড্স্ য়্যাণ্ড্ কোং পাটনার অল-ইণ্ডিয়া মিউচুয়্যাল ইন্সুর‍্যান্স করপোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্টস্ ছিলেন। উঁহার একজন অংশীদার উক্ত করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কার্য্য করিতেন। আমরা শুনিলাম, তাঁহার বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ আনিত হওয়াতে মেসার্স ফ্রেণ্ডস্ য়্যাণ্ড কোং উক্ত করপোরেশনের ম্যানেজিং এজেন্টস্ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূকৃষ্ণপ্রসাদ বর্দ্ধন নামক একজন স্থানীয় উকীল এক্ষণে উক্ত করপোরেশনের ম্যানেজিং এজেন্ট্ হইয়া কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

মিঃ এ বি চ্যাটার্জ্জি এতদিন পর্য্যন্ত মেট্রোপলিটান ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর সেক্রেটারীর পদে অফিসিয়েটিং (অস্থায়ীভাবে কার্য্য) করিতেছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে ট্রপিক্যাল ইন্সুর‍্যান্সের নব-নির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু সেই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। ট্রপিক্যালের বয়স মাত্র দুই বৎসর।

১৪নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় সম্প্রতি নবজীবন ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ্ খোলা হইয়াছে। মিঃ আর কেজরীওয়ালা ইহার ব্রাঞ্চ্ ম্যানেজার এবং মিঃ আর কে ভারতীয়া ইহার ডিরেক্টার ইন্‌চার্জ্জ হইয়াছেন।

ওরিয়েণ্ট্যাল প্রভিডেন্ট্ ইন্সুর‍্যান্স লিমিটেডের হেড আফিস্ গত ৩১শে অক্টোবর হইতে ১৭নং ম্যাঙ্গোলেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট্ মিঃ দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, উক্ত কোম্পানীর সুপারভাইজিং ডিরেক্টার হইয়াছেন।

মাদ্রাজ, মাউণ্ট রোড ইণ্ডিয়া মিউচুয়্যাল লাইফ্ য়্যাসোসিয়েসনের নব-নির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার পি এস্ শিবস্বামী আয়ার পৌরহিত্য করেন।

স্যার এন্ বি সাক্‌লাতবালার মৃত্যুতে তাঁহার স্থলে স্যার চুনীলাল ভি মেটা কে সি এস আই, "নিউ ইণ্ডিয়া"র চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

মিঃ করুণাকুমার নন্দী বি এ, আসানসোলে ভারত ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কার্য্যস্থল হইয়াছে আসানসোল।

বোম্বাইতে হিমালয় ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর যে নূতন ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে, মিঃ সি জে সাহা তাহার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

যশোহরের মিঃ সুধীর রায় চৌধুরী এবং মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র উভয়ে নিউ এশিয়াটিকের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

মিঃ আর এল খান্না ন্যাশনাল ফায়ার য়্যাণ্ড জেনারেল ইন্সুর‍্যান্সের লাহোর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে এণ্ড্ ইউল কোম্পানীতে কাজ করিতেন।

আহমদাবাদের দৈনিক সংবাদপত্র "ষ্টার" প্রকাশ করিয়াছেন, বরোদার গাইকোয়াড স্বরাজ্যে ষ্টেট ইন্সিওরেন্স পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবার মতলব করিতেছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বেঙ্গল ফ্যামিন্ ইন্সুর‍্যান্স বিল্ পাশ হইয়াছে। একটী স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব উৎপাত জনিত দুর্দ্দশায় জনসাধারণকে সাহায্য করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান বর্ষে গবর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকা দিয়া এই ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং প্রতিবৎসর দুইলক্ষ টাকা হিসাবে দিয়া ঐ ধনভাণ্ডারে ১২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত রাখিবেন।

মিঃ এম্ সুন্দর রাম চেট্টী ট্রপিক্যাল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর ব্যাঙ্গালোর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ ডি শেষ-আয়ার এম্ এ, এ আই এ আজমীরের জেনারেল য়্যাস্যুর‍্যান্স সোসাইটীর য়্যাক্চুয়ারী নিযুক্ত হইয়াছেন।
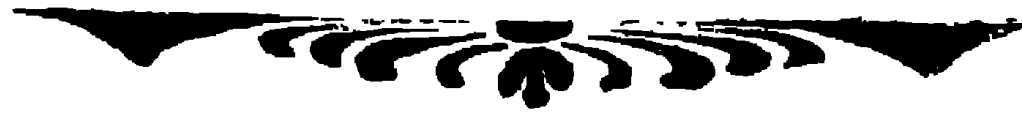
ভারত গভর্ণমেণ্টের বীমাবিষয়ক Blue Book এবং মেট্রোপলিট্যান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী

ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৬ সালের "ইন্‌সু-র‍্যান্স্ ইয়াব বুক" ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বীমাব্যবসায় সম্বন্ধে সঠিক খবর জানিতে হইলে সকলে এই পুস্তকখানিই দেখিয়া থাকেন। পুস্তকের মলাটে ৩৬ সাল ছাপা থাকিলেও এই পুস্তকের ভিতরে বীমা কোম্পানী সমূহের ৩৫ সালের কার্য্য বিবরণীই দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বীমা কোম্পানী সমূহের authoritative statistical বিবরণ গভর্ণমেণ্টের Blue Book এ ৩৮ সালে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা তিন বছরের পুরাণো বস্তাপচা খবর এবং তাহার মধ্যে যে সকল মারাত্মক ভুল বাহির হইয়াছে তাহা পড়িলে লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হইতে হয়। কারণ এদেশের লোক Goverment publication এ যাহা বাহির হয় তাহাই অকাট্য বলিয়া মানিয়া লয়, এইজন্য ইহাতে যদি কোন ভুল থাকে তবে তাহা শুধু জনসাধারণের পক্ষে নয়,—কোম্পানীর পক্ষেও মারাত্মক ক্ষতিজনক। ১৯৩৬ সালের "ইন্‌সুর‍্যান্স্ ইয়ার বুকে" কলিকাতাব সুপ্রসিদ্ধ মেট্রোপলিটান ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানী সম্বন্ধে একটা মারাত্মক ভুল বাহির হইয়াছে এবং তাহার জন্য উক্ত কোম্পানীব বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সেই ভুলটী এই,—

১৯৩৬ সালের ইন্‌সুর‍্যান্স্ ইয়ার বুকের ৪৭ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন কোম্পানীর ১৯৩৫ সালের শেষে মোট মজুত বীমাব পরিমাণ দেখান হইয়াছে। তাহাতে মেট্রোপলিটান ইন্‌সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর নামে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

ভারতে চলতি পলিসিব সংখ্যা	১৪৫৪
মোট বীমাব পরিমাণ	৮৮৬০০০৲ টাকা
প্রিমিয়াম আয়	১৫৩০০০৲ "

এই হিসাব একেবারে ভুল। বাস্তবিক উহা এইরূপ হইবে,—

ভারতে চলতি পলিসির সংখ্যা	৭২৯৯
মোট বীমার পরিমাণ	১,১৭,২৯,৪৯৯৲ টাকা
প্রিমিয়াম আয়	৫,৮৬,৮৪৫৲ "

এ সম্বন্ধে মেট্রোপলিট্যান ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর সেক্রেটারীর সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের য়্যাকচুয়ারীর যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম ;—

মেট্রোপলিট্যান ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর সেক্রেটারীর পত্র

THE METROPOLITAN INSURANCE Co. LTD.

Head Office : 28, Pollock Street

P.O. Box No. 622.

Calcutta, 31st January 1938.

Ref. No. 7/46281.

(Regd. A/D).

To

The Actuary to the Government of India, New Delhi.

Sir,

I beg to draw your immediate attention to p.47 of the Indian Insurance Year Book 1936 (Published in 1938) wherein under the head of total assurances in force at the end of the financial year ending 1935, against the Metropolitan Insurance Co. Ltd., under column "policies effected in India," the figures No. 1454 and sums assured 8,86,000/-with a premium income of 1,53,000/-have been incorrectly shown in place of No. 7299 policies and—business in force 1,17,29,499/- with a premium income of 5,86,845/- vide our Actuary's report dated 11.-9.35 copies whereof were already filed with you along with our different statements under our covering letter No. 17913 of the 2nd Octobor 1935. A copy of the Actuary's said report is again being sent herewith for your ready reference.

In view of the stated incorrect publication in your said Year Book we have been put to enormous business losses and serious damages in reputation. As such, we request you hereby to correct the mistakes forthwith and issue supplementary correction slips and also publish the above corrections in the principal newspapers of different provinces of India as also in—Government Gazettes and inform us of your having done so.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant,

Sd. B. B. Mozumder

Secretary.

বঙ্গানুবাদ

মহাশয়,

আমি ১৯৩৬ সালের ইণ্ডিয়ান ইন্সুর্যান্স্ ইয়ার বুকের (যাহা ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছে) ৪৭ পৃষ্ঠায় আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে ১৯৩৫ সালের শেষে মোট চল্‌তি বীমার পরিমাণ দেখাইতে মেট্রোপলিটান ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর সম্বন্ধে চল্‌তি পলিসির সংখ্যা ৭২৯৯, মোট বীমার পরিমাণ ১২৭১২৯৪৯৯৲ টাকা এবং প্রিমিয়াম আয় ৫৮৬৮৪৫৲ টাকা,—ইহাদের পরিবর্ত্তে ভুলবশতঃ চল্‌তি পলিসির সংখ্যা ১৪৫৫, মোট বীমার পরিমাণ ৮৮৬০০০৲ টাকা এবং প্রিমিয়াম আয় ২৫৩০০০৲ টাকা লিখিত হইয়াছে। এবিষয়ে আমাদের য়্যাকচুয়ারীর ১১-৯-৩৫ তারিখের রিপোর্ট দেখিতে আপনাকে অনুরোধ করি। সেই রিপোর্ট আপনার নিকট আমাদের কোম্পানীর অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত ১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর ১৭৯১৩নং পত্রে পাঠান হইয়াছে। আপনার সুবিধার জন্য সেই রিপোর্টের একখানি প্রতি-লিপি এই পত্রের সঙ্গে পুনরায় প্রেরিত হইল।

উক্ত ইয়ার-বুকে আমাদের কোম্পানী সম্বন্ধে ভুল বিবরণ বাহির হওয়ায় আমাদের কারবারের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং আমাদের সুনামেও গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। সুতরাং আপনাকে অনুরোধ করি, অবিলম্বে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া ইয়ার-বুকে একটী অতিরিক্ত শুদ্ধি-পত্র সংযোজিত করুন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে ও গবর্ণমেণ্ট গেজেট সমূহে তাহা প্রকাশিত করুণ।

আপনি যে এই প্রকার ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আমাদিগকে জানাইতেও অনুরোধ করিতেছি।

ইতি—

ভবদীয়

বি বি মজুমদার

সেক্রেটারী

—※—

উক্ত পত্রের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট্ য়্যাকচুয়ারী যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এই ;—

গবর্ণমেণ্ট্ য়্যাক্‌চুয়ারীর পত্র

OFFICE OF THE ACTUARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

New Delhi,
the 14th February 1938.

No. 27-I (i)/38

From

A. Rajagopalan, Esquire, B. A., A. I. A.,
Assistant Actuary to the Government of India.

To

The Secretary,

Metropolitan Insurance Company, Limited,

P. O. Box No. 622, Calcutta.

Sir,

With reference to your letter No. 7/46158 dated the 29th January 1938 I regret to notice that the particulars of business in force of your company at the end of the financial year ending in 1935 were incorrectly printed in the last issue of the Insurance Year Book. I have instructed the Manager, Government of India Press, to issue corrigendum slips in the matter and to paste them in the copies stocked for sale.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant,

Sd. A. Rajagopalan

Assistant Actuary to the

Government of India.

বঙ্গানুবাদ

মহাশয়,

আপনাদের কোম্পানীর ১৯৩৫ সালের কারবার সম্বন্ধে ইয়ার বুকে যে ভুল বিবরণ বাহির হইয়াছে তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। এই ভ্রম সংশোধন করিয়া সেই শুদ্ধি-পত্র এক্ষণে বিক্রয়ার্থ মজুত ইয়ারবুক সমূহে আঁটিয়া দিতে আমি ভারতগবর্ণমেণ্টের ছাপাখানার ম্যানেজারকে বলিয়া দিয়াছি।

ইতি

ভবদীয়

এ রাজা গোপালম্‌

ভারত গবর্ণমেণ্টের

য়্যাসিষ্টাণ্ট্‌

য়্যাকচুয়ারী

পত্রাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা বাণিজ্যে'র গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব, তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে

পত্র লেখকগণের প্রতি

(যাঁহারা গ্রাহক নহেন

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** ব্যবসায়ের সন্ধান দিবার এবং মাল পত্র বেচা কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য

৫।৶০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—"ফ্যাও,—ফ্যাও,—ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,— অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, এই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে এবং পোষ্টেজ না পাঠাইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র জোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি,— **আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ১৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দানে বাধিত করিবেন ও আপনাদের দোকানের যাবতীয় যন্ত্রপাতির ১ খানা মুল্য তালিকা পাঠাইয়া দিবেন।

১। ১৩৩৪ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্য নামক পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় লেখা আছে স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় এবং তাহাতে ১। সাবান প্রস্তুত শিল্প ও ২। সুগন্ধি কেশ-তৈল প্রস্তুত প্রণালী পুস্তক ও তাহাদের মূল্যাদিও আছে, কিন্তু ঐ সমস্ত পুস্তক কোথায় পাওয়া যায় তার ঠিকানা নাই। যদি আপনারা উহা বিক্রয় করেন তবে লিখিয়া জানাইবেন। ঐ উভয় প্রকার শিক্ষা করিতে গেলে ফিঃ বা মূল্য অগ্রিম কত পাঠাইতে হইবে বা সম্পূর্ণ মূল্য কত পাঠাইলে মাশুল আপনারা বহন করিতে পারেন ও উহা পাঠাইতে পারেন অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন।

২। সাবান প্রস্তুতের যাবতীয় মসলা ও ডাইস কোথায় পাওয়া যায়। ডাইস ও সাবান প্রস্তুতের কল আপনারা বিক্রয় করেন কিনা ও উহাদের মূল্যাদি কত জানাইবেন।

৩। ছাতার হাতল ও চিনি তৈরীর স্কুলে কাজ শিখিতে গেলে কত ফিঃ বা মাহিনা দিতে হয়, শিক্ষা করিতে কত দিন সময় লাগে, সেখানে সাবান তৈরী শিখান হয় কিনা ?

৪। গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ কাপড় কাচা সাবান শিক্ষা দেন, তাহার ফিঃ বা মাহিনা কত লাগে ? ঐ স্কুলে কোন সময় ভর্ত্তি হইতে হয় ও কত দিন শিক্ষা করিতে লাগে, সেখানে ছাতার হাতল চিত্রণ শিক্ষা দেন কিনা ?

৫। আপনাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য নামক

পত্রিকা পুরাতন সংখ্যা কোন সাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায় ও মূল্য কত ?

৬। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতির ১ খানা মূল্য তালিকা সহ সুবৃহৎ বাংলা ক্যাটালগ পাঠাইয়া দেন তবে বড়ই বাধিত হইব। উহা পাঠাইতে যে মাশুল লাগে তাহা আমায় জানাইলে পাঠাইয়া দিব। ইতি

ইউসুফ সরকার
বেতবুনিয়া—সাং
গড়াইখালী—পোঃ
খুলনা

১নং পত্রের উত্তর

আমরা সাবান সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালীর পুস্তক বিক্রয় করি না। ইহার জন্য আপনি কলিকাতার বড় বড় পুস্তকের দোকানে পত্র লিখিবেন; কয়েকটীর নাম ঠিকানা দিলাম,—১। Thacker Spink & Co. Ltd. 3, Esplanade East, Calcutta. ২। Industry Book Depot 22, R. G. Kar Road, Calcutta. ৩। Chakravarti, Chatterjee & Co. Ltd. 15, College Square, Calcutta, ৪। Macmillan & Co. Ltd. 294, Bowbazar Street, Calcutta.

সাবান, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করা সম্বন্ধে আমাদের এই "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় জন সাধারণ ইংরাজী পুস্তক পড়িতে বা বুঝিতে পারে না। সেইজন্য সরল বাংলা ভাষায় আমরা ঐ সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি। উহা পাঠ করিলে আপনি বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং ঐ সকল ব্যবসায়ের আনুপূর্ব্বিক সকল তথ্যই জানিতে পারিবেন।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগে সাবান তৈয়ারী শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। সে সম্বন্ধে আমাদের নাম লইয়া আপনি নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন;—Director of Industries, Bengal, 7, Council House Street, Calcutta. গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে যিনি শিল্পবিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার,—সেই ডাঃ আর এল দত্ত মহাশয়ের সাবান প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ক প্রবন্ধই আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাতার বাঁট তৈয়ারী করিবার প্রণালীও গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে আপনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট পূর্ব্বোক্ত চিঠি লিখিবেন। কলিকাতায় ছাতার বাঁট তৈয়ারী করিবার অনেক ছোট ছোট কারখানা আছে। সেই সকল কারখানায় আসিয়া আপনাকে দিনমুজুরের মত খাটিয়া হাতে কলমে কাজ শিখিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষাই উৎকৃষ্ট। পুস্তক পড়িয়া তাহা লাভ করা যায় না।

আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার পুরাতন বাঁধাই সেট্ ১৩৩৬ সাল হইতে পাওয়া যায়। প্রতি খণ্ডের (এক বৎসরের বাঁধানো) মূল্য ২॥০ টাকা। উহা পড়িলে নানারূপ শিল্পপ্রস্তুতপ্রণালীর সন্ধান ও উপায় জানিতে পারিবেন। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমাদের ব্যবসা ও

বাণিজ্যে যে সকল বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহা ছাড়া আমাদের স্বতন্ত্র কোন ক্যাটালগ বা মূল্য তালিকা নাই।

২নং পত্র

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে আপনারা যে গুলি-সুতার মেসিন বিক্রয় করেন, ঐ মেসিনে প্রস্তুত গুলিসুতা বাজারের "আলেকজাণ্ডার" গুলি-সুতার ন্যায় শক্ত হইবে কিনা? কারণ বাজারে একপ্রকার গুলিসুতা দেখা যায় উহা শক্ত নয়, সুতরাং দরজীর সেলাইয়ের কাজের অনুপযুক্ত। আমি আপনাদের নিকট হইতে একসেট পুরানা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কিনিয়াছিলাম, উহাতে উক্ত মেসিনের বিজ্ঞাপন দেখিলাম। আমি ঐ মেসিন একটী লইয়া ঢাকা সহরের উপরে কাজ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করি তাই আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আশাকরি ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ঐ মেসিনে প্রস্তুত সুতা শক্ত হইবে কিনা? এবং উহাদ্বারা দুইজন লোক কাজ করিলে মাসিক কত উপার্জ্জন করিতে পারিবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রের দ্বারা জানাইবেন কারণ আপনাদের পত্র পাইলে আমি কলিকাতা আসিয়া উক্ত মেসিনে কাজ চালাইতে শিক্ষা করিয়া একটী মেসিন খরিদ করিতে ইচ্ছা করি।

নিবেদক

মজিবর রহেমান

পোঃ বালিয়া,
জিঃ ঢাকা।

২নং পত্রের উত্তর

আমরা যে গুলিসুতার কল বিক্রয় করিয়া থাকি, তাহাতে সুতার গুলিই পাকান হয়, সুতা কাটা হয়না। সুতরাং সুতা শক্ত হইবে কিনা, আপনার এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। আমাদের এই মেসিনে আপনি নরম, শক্ত সকল রকম সুতার গুলিই ছোট বড় নানাপ্রকার সাইজের তৈয়ারী করিতে পারিবেন। সুতা আপনাকে বাজার হইতে কিনিয়া লইতে হইবে।

আমাদের এই মেসিন চালাইয়া কারবার করিতে কিরূপ খরচা পড়ে,—সুতার দাম, মজুরী প্রভৃতি বাদে কিরূপ লাভ থাকে,—একজন লোক প্রতিদিন কত সংখ্যক গুলি তৈয়ারী করিতে পারে ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ আমাদের ১৩৪৪ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত পত্রাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে ১নং পত্রের উত্তরে জানিতে পারিবেন। যদি আপনার প্রয়োজন হয়, আমাদের আফিস হইতে ২॥০ টাকা মূল্যে ঐ বৎসরের বাঁধানসেট পাইতে পারেন।

৩নং পত্র

মহাশয়,

আপনার বিখ্যাত পত্রিকার মারফৎ অথবা আমার বরাবরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উত্তর জানাইলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব ও আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

(১) বাংলার মিলগুলি Damage বা লাট কাপড় ওজন দরে বিক্রয় করে কিনা?

(২) ওজন দরে বিক্রয় না করিলে পাইকারী দরের উপর অতিরিক্ত কিরকম কমিশন দেয়।

(৩) বড় বাজারে, বাংলার বাহিরের কাপড় ওজন দরে কোথায় বিক্রয় হয় ও কোন ঠিকানায়। ওজনদরে বিক্রয় না করিলে কিরকম কমিশনে বিক্রয় করে

(৪) পুরাতন লোহা কিরকম দরে ক্রয় করিতে হয় এবং কোথায় কোথায় বিক্রি করা যায়।

(৫) সস্তা Stationary মাল যাহা প্রত্যেক বড় বড় রাস্তায় এক আনা দুই আনা দরে বিক্রয় হয়—তাহা সস্তায় পাইকারী দরে কোথায় কিনিতে পারা যায়।

ইতি

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

সুবোধকুমার বিশ্বাস

৩।এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা।

৩নং পত্রের উত্তর

ড্যামেজ্ বা লাট্ কাপড় বিক্রয় করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। ওজন কিম্বা গুণতি হিসাবে বিক্রী খরিদদার ও মিলের মালিক উভয়ের চুক্তিমূলক কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে। তবে ইহা ঠিক, প্রত্যেক মিলেরই ড্যামেজ্ কাপড় কিনিবার লোক আছে। তাহাদের সহিত মিলের কনট্রাকট্ বা চুক্তি থাকে। তদনুসারেই কারবার চলে। বিভিন্ন মিলের পৃথক পৃথক নিয়ম।

মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গেশ্বরী, বঙ্গশ্রী, শ্রীদুর্গা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল ইত্যাদি বাঙ্গলার কাপড়ের কল সমূহে বিস্তর দাগী কাপড় (যাহাকে ইংরাজীতে Wastage বলে) বিক্রয় হয়। এই সকল মিলের ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া দাগী কাপড় কেনার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নচেৎ ঘরে বসিয়া কেবল চিঠিবাজী করিয়া কোনও ব্যবসা করা যায় না—এমন কি মুড়ি মুড়কীরও না। এই সকল মিলের ঠিকানা আমাদের কাগজে

তাঁহারা যে বিজ্ঞাপন দিতেছেন তাহা দেখিলেই পাইবেন। যদি সত্য সত্যই কারবার করিতে চান তবে ইহাদের সহিত আসিয়া দেখা করুন। দাগী কাপড়ের গাঁইট সব পরীক্ষা করুন, কিরূপ দামে বেচিতে পারিবেন তার একটা এষ্টিমেট মনে মনে ছকিয়া ফেলুন। তারপর সব ব্যাপার বুঝিয়া যত দূর কম দামে এবং সুবিধা মত সর্ত্তে সব মাল কিনিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন।

বড় বাজারে বা অন্যত্র কোন স্থানে ওজন হিসাবে কাপড় বিক্রয় হয়না, গাঁইট হিসাবে বিক্রয় হয়। কিরকম কমিশন, তাহা বিক্রেতার সহিত খরিদদারই ঠিক করিয়া লইয়া থাকে।

কলিকাতায় একশ্রেণীর দরিদ্রলোক গৃহস্থের ঘরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন লোহা কিনিয়া থাকে। কলিকাতার মানিকতলা, চাল্‌তা বাগান, ঠনঠনিয়া, বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে পুরাতন লোহা ক্রয় বিক্রয়ের বৃহৎ কারবার চলিতেছে। আপনি যে স্থান হইতে চিঠি লিখিতেছেন, সেই স্থানের একেবারে সোজা পশ্চিমেই চাল্‌তা বাগান, দুই মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই দেখিবেন, কি বিরাট কারবার এবং বুদ্ধি থাকিলে সেইখানেই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিত পারিবেন। পুরাতন লোহা বিদেশে চালান যায়,—জাপানই বেশীর ভাগ ক্রয় করে।

সস্তা মনোহারী জিনিস সম্বন্ধে কলিকাতায় মুরগীহাটা ও রাধাবাজার অঞ্চলে খোঁজ করিবেন। সেইখানেই সব পাইকারী দরে বিক্রয় হয়।

আপনি আমাদের পত্রিকার গ্রাহক নহেন,—আপনাকে ইহার অধিক আর কিছু জানাইতে পারিনা।

৪নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনাদের একজন গ্রাহক। পত্র পাঠ নূতন ইনসিওরেন্স Act সম্বন্ধে বই ভি পি করিয়া পাঠাইবেন। আরও জানাইতেছি কোন Insurance Company হইতে District Agency পাইতে হইলে কিরূপে কণ্টাক্ট করিতে হয় বা কি নিয়ম তাহাও জানাইবেন। ইতি—

নিবেদক
শ্রীযামিনী ভূষণ দাস
আমতা বন্দর,
হাবড়া

৪নং পত্রের উত্তর

আপনি লিখিয়াছেন, আপনি আমাদের পত্রিকার একজন গ্রাহক, কিন্তু আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করেন নাই। ভবিষ্যতে এরূপ ভুল করিবেন না।

ইন্‌স্যুর‍্যান্স্ সম্বন্ধীয় নূতন আইন বিষয়ক পুস্তক পাইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন,—

(১) India Book Depot, 8, Hastings Street, Calcutta.

(২) M. C. Sarkar & Sons, 15 College Square, Calcutta.

(৩) Eastern Law House, 15 College Square, Calcutta.

আমাদের ১৩৪৫ সালের বীমা-বার্ষিকীতে নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত

বিবরণ, সমালোচনা এবং আইনের প্রধান ধারাগুলি সমস্তই একটি পৃথক অধ্যায়ে সরল বাংলা ভাষায় বিস্তারিতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় লিখিত আইন জন সাধারণের বোধগম্য নহে। আপনি আমাদের বীমা-বার্ষিকীর ঐ অধ্যায়টী পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন, আশা করি।

ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর এজেন্সী লইতে হইলে, কোম্পানীর হেড্ আফিসে চিঠি লিখিয়া এজেন্ট্ হইবার নিয়মাবলী জানিয়া লইবেন। আমাদের বীমা-বার্ষিকীতে এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি। কারণ, বীমা ব্যবসায়ের ইহা একটী প্রধান বিষয়। কেবলমাত্র কাগজে কলমে এজেন্সী লইলেই হয় না। কিরূপে বীমা সংগ্রহ করিতে হয়,—কিরূপে ক্যান্ভাস্ করিবার কৌশল খাটাইতে হয়,—বীমাকারীদের সহিত কিরূপে কথাবার্ত্তা বলিতে হয়,—কোম্পানীর সহিত কিরূপে চুক্তি করিতে হয়,—কিরূপে বিদেশে চলাফেরা করিতে হয়,—সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটী বিস্তারিতরূপে আমরা বীমাবার্ষিকীতে প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং আপনাকে আমাদের একখানা নূতন বীমা-বার্ষিকী কিনিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

৫নং পত্র

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন বিশেষ

মহাশয়,

আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য অফিস হইতে কলিকাতায় এবং অপরাপর কোন্ কোন্ জায়গায় বড় বড় দেয়াশালাইর খরিদ বিক্রীর কারখানা ও কারবার আছে, আমাকে জানাইলে বড়ই অনুগৃহীত হইব। যদি অপরাপর জায়গার খোঁজ করা কষ্টকর বোধ করেন অন্ততঃ আমাকে কলিকাতার দেয়াশালাইর ফ্যাক্টরীর ঠিকানা জানাইলেও যথেষ্ট উপকৃত হইব। বহু খোঁজ করিয়াও কোথাও জানিতে পারিতেছি না। আর আপনাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার বাঁধাই সেটের যে কোন বছরের Synopsis বা সার সংগ্রহ পাঠাইবেন। ফেরৎ ডাকে এক সেট্ বাঁধান পত্রিকা আনাইবার ইচ্ছা রহিল। আপনাদের অফিসের মফঃস্বল হইতে চিঠিপত্র আদান প্রদানের উত্তর লইতে হইলে কি নিয়ম আছে জানিনা। তজ্জন্য আগের জিজ্ঞাস্য বিষয় ও সার সংগ্রহের তালিকা আমার নামে বিয়ারিং চার্য্য করিয়া পাঠাইলেও কোন দুঃখিত হইব না বরং উপকৃত হইব। আরও এই সুবিধা যে বিয়ারিং চার্য্যের দ্বারায় আমি ভিন্ন আর কাহাকেও উক্ত চিঠিপত্রাদি বিলি হইবে না। অতএব কোন সন্দেহ না করিয়া যে কোন রকমে আমার লিখিত বিষয়গুলি ফেরৎ ডাকে জানাইবেন। এইটি আমার বিনীত অনুরোধ। আমি পথ চাহিয়া রহিলাম।

পুনঃ আপনারা ব্যবসায়ের অনেক গুপ্ত খবর রাখেন। সেইজন্য উক্ত দেয়াশালাইগুলি কোথা হইতে লইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে পাওয়া যাইবে এইটী আমার জানিবার ইচ্ছা, জানাইবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ করণ

গ্রাম—সাটকুমারী

পোঃ—খেজুরী

জিলা—মেদিনীপুর

৫নং পত্রের উত্তর

কলিকাতার, বঙ্গদেশের ও আসামের কয়েকটি দিয়াশলাই কারখানার ঠিকানা আপনাকে জানাইলাম,—

১। Prasanna Match Factory 30, Becharam Dewry, Dacca.

২। Dipali Fire Works, Konnagar Hoogly. এই কারখানায় রঙ্গীন আলোর দিয়াশলাই তৈয়ারী হয়।

৩। Assam Match Co Ltd. Dhubri Goalpara, Assam.

৪। Jalpaiguri Industries Ltd. Jalpaiguri.

৫। Bangia Diasalai Karyalaya 76, Jessore Road, Calcutta.

৬। Esavi Match Manufacturing Co. 46-47-1-1 Muraripukur Road, Maniktala, Calcutta.

৭। Haydari Match Co. 150 A Beliaghata Main Road, Calcutta.

৮। Pioneer Match Factory, 16, Dumdum Road, Calcutta.

৯। Western India Match Co. Ltd. Po. Alambazar, (24 Pergs.)

১০। Bengal Match Industries Ltd. Khulna.

যোগ্যতার পুরস্কার

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত এম. এ. বি. এল. বহুদিন ধরিয়া বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সেক্রেটারীর পদ যোগ্যতার সহিত অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। বাঙ্গলা দেশের নানারূপ শিল্পোন্নতির জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক Industrial Survey Commission নিয়োগ করিয়াছেন এবং জিতেনবাবুকে এই কমিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন। লোক বাছাই করিবার নলিনী বাবুর এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে। ন্যাশন্যাল চেম্বারে যখন তিনি জিতেন বাবুকে আনেন তখন তাঁহার মধ্যে যে যোগ্যতা দেখিয়া আনিয়াছিলেন তাহার পরিচয় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জিতেন বাবু নানা আকারে তাঁহার দেশবাসীর নিকট দিয়াছেন। কিন্তু এযুগে যে গুণ (??) না থাকিলে মানুষ উপরে উঠিতে পারে না সেই গুণের তাঁহার একান্ত অভাব ছিল। তিনি নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে পারিতেন না অথবা জানিতেন না। অপর সকলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেকে লোকের নিকট জাহির করিতে পারিতেন না। Footlights এবং publicityকে এড়াইয়া চলিতেন। এরূপ লোকের ভিতরকার গুণের আদর যে কখনও হইবে তাহাত আমাদের বিশ্বাসই ছিল না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। যথার্থ যোগ্যতার সম্মান দেওয়া হইয়াছে। আমরা কমিশনের সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

কৃষির মাসিক ডায়েরি

পৌষমাসের কৃষি

সব্জী বাগান

বিলাতী শাক সব্জীর বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যান পালক এমাসেও বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন।

কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে উহার গোড়ায় মাটী দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে।

শালগম, গাজর, বিট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসলাদি যদি ঘন হইয়া থাকে তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত পাতলা করিয়া দিতে হইবে।

আগে বসান জলদি জাতীয় কপির এখন গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি খুব বড় হয়।

কৃষিক্ষেত্র

আলু গাছের গোড়া আর একবার মাটি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনায় আলুর ফসল তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালী দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকা ভাল। ইহাতে আলুগুলি বেশ পুষ্ট হয়। ইহা করিলে ইতিমধ্যে নিড়ানী দিয়া খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি সতেজে বাড়িতে থাকিবে।

আলুর ক্ষেতে এই মাসে আবশ্যক মত দুই একবার জল দেওয়া দরকার। যব, মটর, মসুর প্রভৃতি ক্ষেতের বিশেষ কোন পাট নাই।

টেপারি ক্ষেতে এই সময় জল দেওয়া আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শশা, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

চর ও পলি পড়া মাটিতে তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড় খুব ভাল হয়। জমি উত্তমরূপে চাষ দিয়া তৈয়ারী করিয়া ৪।৫ হাত ব্যবধানে মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২।৩ টী বীজ পুঁতিতে হয়। দুই হাত মুখ চওড়া দুই হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া পলি মাটী বা পাঁক ও অন্যান্য সার মিশাইয়া লইয়া মাটি উত্তমরূপে চাপিয়া দিয়া মাদা তৈয়ারী করিতে হয়।

বীজ পুতিবার পূর্ব্ব দিবস গর্ত্ত হইতে অর্দ্ধেক মাটি তুলিয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিতে হয় এবং গর্ত্ত মধ্যে ২।১ কলসী জল ঢালিয়া দিতে হয়। পর দিবস জল শোষিত হইয়া 'যো হইলে গর্ত্তের মাটির উপরিভাগ ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া দুই তিনটী বীজ পুতিবে এবং চারা যত বড় হইবে ততই পার্শ্বস্থ মাটি দিয়া গর্ত্ত ভরাট করিয়া দিবে। এই প্রথায় বীজ বপনে তরমুজ খুব বড় হয় এবং বেশী ফলে।

ফুলের বাগান

মরশুমি ফুল এখন প্রচুর ফুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিকালে ঐ সকল গাছে জল দেওয়া উচিত।

হলিবুক, পিটুনিয়া প্রভৃতি কএকটী মরশুমি ফুল এদেশে খুব নাবিতে ফুল দেয়, এমন কি চৈত্র বৈশাখেও উহার ফুল পাওয়া যায়। এখনও ঐ জাতীয় ফুলের চারা বসান যাইতে পারে। পিটুনিয়া টবে বা বাক্সে খুব সুন্দর হয়, তবে মাটি খুব সারবান হওয়া উচিত।

লঙ্কা মরিচ ও বেগুন ক্ষেতে যদি আদৌ রস না থাকে এবং জমি ফাটিয়া যাইতে দেখা যায় তবে জল দিয়া পাটাইয়া দিলে ভাল হয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ } পৌষ—১৩৪৫ { ৯মসংখ্যা

আসামী আলুর চাষ

আসামে যে আলু উৎপন্ন হয় তাহাকে মোটামুটী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, (১) শিলং অথবা খাসিয়া পাহাড়ী আলু এবং (২) সমতল জমির অথবা অন্যান্য পাহাড়ের আলু। শিলং আলু সাদা ও বড় রকমের। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ ইংল্যাণ্ড হইতে ইহার বীজ আনাইয়া পরীক্ষার জন্য প্রথমতঃ "আপার শিলংকৃষি ফার্ম্মে" উহার চাষ করেন। আসামের জলবায়ু যখন ইহার সহিয়া গেল, তখন গবর্ণমেণ্ট ঐ আলুর বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। খাসিয়া পাহাড়ের কৃষকেরা একণে ঐ আলুর চাষে বিশেষ সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালই আলুর প্রধান ফসলের সময়। পূর্ব্বে ইহার জন্য বীজ রক্ষা করিতে চাষাদের খুব অসুবিধা ছিল। একণে সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে। আজকাল সেখানকার কৃষকেরা শীতকালে আলুর একটা ফসল জন্মায়। সেই ফসল হইতে তাহারা পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালের ফসলের জন্য বীজ রাখিয়া দেয়। সুতরাং পূর্ব্বে যেমন দীর্ঘকালে বীজ নষ্ট হইবার ভয় ছিল, এখন আর তাহা নাই। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র খাসিয়া পাহাড় হইতে প্রতিবৎসর আড়াইলক্ষ মণের অধিক পরিমাণ আলু নগদমূল্যে চালান যায়। সমতল জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে শীতকালে রবিশস্য হিসাবে শিলং আলুর চাষ করা যায়। কিন্তু সমতল জমির আবহাওয়াতে বীজ রক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রতিবৎসরই বীজ কিনিতে হয়। এই কারণে সমতল জমিতে শিলং আলুর চাষ বেশী পরিমাণ করা যায় না।

সমতলজমিতে যে জাতীয় আলুর চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, তাহা একটু ছোট আকারের। ভিতরটা শক্ত এবং সাবানের মত। আসামে যে একপ্রকার আদিম বুনো আলু দেখা যায়, ইহা অনেকটা সেই জাতীয়। ইহার ভিতরটা শক্ত বলিয়া ইহাকে বেশীদিন গুদাম জাত করিয়া রাখা যায়, তাহাতে নষ্ট হয়না। কিন্তু শিলং আলুর এই সুবিধাটী নাই, কারণ উহা একটু নরম। তবে বীজরক্ষা হিসাবে এই ছোট জাতের আলুতেও শিলং আলুর মতই অসুবিধা বর্ত্তমান। এক ফসল তোলার সময় হইতে আর এক ফসল রোপনের সময় পর্য্যন্ত বীজ রক্ষা করিতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। শিলং আলু অপেক্ষা এই ছোট জাতের আলুর দাম কম। দার্জ্জিলিং আলুও এইরূপ শক্ত ও ক্ষুদ্রজাতীয় কিন্তু ইহার ফলন অনেক বেশী। সেইজন্য সমতলভূমিতে কৃষকেরা দার্জ্জিলিং আলুর চাষ করিতেই অধিক আগ্রহান্বিত হয়। ইহার বীজের মূল্য একটু বেশী। তবে প্রথমে একবার সংগ্রহ করিয়া চাষ আরম্ভ করিলে, তার পর বীজ রক্ষা করিতে আর তেমন অসুবিধা কিছু থাকেনা। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট আসামের সমতলভূমিতে ব্রহ্মদেশীয় আলু এবং ইতালীদেশীয় আলু উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বত্র ইহাদের চাষ হইয়া থাকে।

বীজ সংগ্রহ

আসামগবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ সম্প্রতি শিলং আলুর চাষ বিস্তারেই অধিক মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা ইহার জন্য খুব ভাল বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। Govt. Experimental Farm. Upper Shillong এই ঠিকানায় উহার ম্যানেজারের নিকট চিঠি লিখিলে বীজ এবং তৎসক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যাইবে। দার্জ্জিলিং আলুর বীজও কিছু সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীহট্ট, গৌহাটী অথবা জোরহাটে ডিপুটী ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার, (Deputy Director of Agriculture) এর নিকটেও বীজের জন্য দরখাস্ত করা যাইতে পারে।

জমিতে বপন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। রোগ যুক্ত, ক্ষীণ পচা বীজ বপন করিলে ফসলও খারাপ হইবে। বীজের আকৃতি অনুসারে প্রতিবিঘা জমিতে আড়াই মণ হইতে পাঁচমণ বীজ আবশ্যক হয়। যে আলুর বীজের অঙ্কুর বা গেঁজ বাহির হইয়াছে, তাহা রোপন করাই প্রশস্ত। কারণ তাহাতে ভালমন্দ বাছাই করিবার সুবিধা হয় এবং একেবারেই ভাল বীজ বাছাই করিয়া রোপন করা যায়। সুতরাং জলসেচ ও অন্যান্য পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়। যে সকল বীজের অঙ্কুর ভাল হইবে না, সেগুলিকে ক্ষেত্রে বপন করিয়া, তাহাদের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম সবই বৃথা। সুতরাং প্রথমতঃ আলুর বীজের অঙ্কুর উদ্গম আবশ্যক। ইহার জন্য আলুর বীজকে একটী অগভীর ঝুড়িতে এমন ভাবে ছড়াইয়া রাখিতে হয়, যেন উহার চোখ্‌গুলি উপরের দিকে থাকে। তার পর উহাদিগকে ভিজা খড় দিয়া ঢাকিয়া দিনের বেলায় সূর্য্যালোকে রাখিয়া দিতে হয়।

আসামের কৃষকেরা সাধারণতঃ ছোট আকারের আলুই বীজরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। মাঝারি সাইজের আলু বীজরূপে ব্যবহার করা উচিত। কারণ

ছোট আলুগুলি ফসল তোলার সময় অপরিণত অপরিপক্ক অবস্থায় থাকে। সুতরাং তাহা হইতে সুস্থ ও পরিপুষ্ট অঙ্কুর জন্মিতে পারে না।

চাষের পদ্ধতি

আলুর জন্য আলগা মিহি এবং গভীর মৃত্তিকা আবশ্যক। ভিজা এবং জমাট মাটিতে আলু ভাল জন্মেনা। বর্ষার আরম্ভে পাহাড়ের ধারে আলু রোপন করিলে জমির জল নিকাশের সু-বন্দোবস্ত করা চাই। সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ের জমি ঢালু বলিয়া এই জল নিকাশের কার্য সহজেই হইয়া থাকে। সমতল ভূমিতে আলুর চাষ করিলে জমি একটু ভিজা থাকা দরকার, কিন্তু বেশী ভিজা যেন না হয়। জলসেচের সময়েও ইহা লক্ষ্য রাখা উচিত, জমিতে যেন বেশীক্ষণ যাবং জল দাঁড়াইয়া না থাকে। কারণ তাহাতে ফসল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

জমিতে তিন চারিবার ৯ ইঞ্চি আন্দাজ গভীর করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়,---যেন মাটী একেবারে মিহি গুঁড়া হইয়া যায়। সমতল বাগান জমিতে আড়াই ফুট অন্তর ৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া লাঙ্গল দিলেই চলে। প্রতি বিঘায় ৮।১০ গাড়ী (৮০ হইতে ১০০ মণ) পচা গোবর সার দেওয়া আবশ্যক। সারের উপরে পাতলা করিয়া মাটী ছড়াইয়া দিতে হয়। এক্ষণে আলুর বীজগুলিকে লাঙ্গলের লাইনের উপর দিয়া এক হাত অন্তর দুই ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে রোপন করিবেন, যেন উহাদের অঙ্কুর অথবা চোখ্ উপরের দিকে থাকে। তার পর উপরে মাটী চাপা দিবেন।

কাঠের ছাই আলুর পক্ষে উত্তম সার। জমিতে যদি অতিরিক্ত খড়, শুক্‌না জঙ্গল গাছ অথবা কচুরী পানা থাকে, তবে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে সেগুলিকে আগুনে পোড়াইয়া দিলে খুব ভাল হয়। ক্ষেত্রে ছাই দেওয়া থাকিলে পোকা এবং পিপড়া লাগিয়া ফসল নষ্ট করিতে পারে না। যদি খুব ভাল এবং দামী ফসল পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কৃত্রিম সার ব্যবহার করা আবশ্যক। আপার শিলং ক্যাম্পে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে প্রতি বিঘায় ৩৫ সের নিচিফস্ (Niciphas) এবং ৩৫সের পটাস সালফেট (Potash Sulphate) সাররূপে ব্যবহার করিলে খুব ভাল ফসল পাওয়া যায়। বীজ রোপন করিবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই সার লাঙ্গল চষা লাইনের উপর ছড়াইয়া মাটী চাপা দিতে হয়।

পাহাড়িয়া জমিতে ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে এবং সমতল জমিতে অক্টোবর-নবেম্বর মাসে বীজ বপন করিতে হয়। ঠিক কখন বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা কৃষক স্থানীয় অবস্থা, বর্ষা আরম্ভ হইবার সময়, প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিবেন। আলুর চারাগুলি ৬ ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা হইলে উহাদের গোড়ায় মাটী জড় করিয়া ৪ ইঞ্চি উঁচু করিয়া দিতে হইবে। যদি ফসল বেশ জোবাল দেখা যায়, তবে তিন সপ্তাহ পরে আর একবার ঐরূপে গাছের গোড়ায় মাটী জড় করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে একদিকে যেমন মাটী চাপা থাকিয়া আলুগুলি রক্ষা পায় অন্যদিকে তেমনি নূতন আলু জন্মিবার খুব সুবিধা ও সাহায্য হয়। যখন আলুর গাছে ফুল দেখা দেয় তখন আলুগুলি ছোট ও অপরি-পক্ক থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত আলু গাছের ডাঁটা ও পাতা শুকাইয়া মরিয়া না যায়, ততদিন

পর্য্যন্ত আলুগুলি বড়, পরিপক্ক ও তুলিবার যোগ্য হয় না। আলু তোলা হইয়া গেলে কতগুলি পচা এবং কতগুলি কাটা ও দাগী হইয়াছে দেখা যায়। সেগুলিকে অবিলম্বে খাইয়া ফেলিবে বা অন্য প্রকারে কাজে লাগাইবে।

শ্রেণী বিভাগ

বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে আলু উপস্থিত করা হয়, তাহার শ্রেণী বিভাগ করা আবশ্যক। ছোট বড় দুইরকম সাইজের আলু পৃথক পৃথক বিক্রয় করিলে ভাল দাম পাওয়া যায়। কিন্তু মিশাইয়া বিক্রয় করিলে খরিদদার গড়ে যে দাম দেয়, তাহা খুব কম হয়। সেইজন্য সাইজ অর্থাৎ আকার হিসাবে ছোট বড় দুই রকম আলু পৃথক করা দরকার। বীজের জন্য মাঝারি সাইজের খুব পরিপুষ্ট এবং রোগ ব্যাধি শূন্য খুব ভাল আলু বাছাই করিয়া লইবেন। বীজের আলু গুলিতে যেন অঙ্কুর গজাইবার জন্য অনেক চোখ থাকে।

জমি পরিবর্ত্তন

কোন জমিতে পর পর দুই বৎসর আলুর চাষ করা উচিত নহে। তাহাতে ফসল ভাল হয় না। ফসলে নানা প্রকার রোগ ধরে। কোন জমিতে ৪ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র আলুর চাষ করা যাইতে পারে। এইরূপ করিলে ফসল বেশ জোরাল থাকে এবং ফসলে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা হয় না। দেখা গিয়াছে, যদি একই জমিতে ৪ বৎসরের মধ্যে একবারের বেশী আলুর চাষ করা যায়, তবে ফসলে নানা রকম রোগ জন্মে, তাহার ফলে অনেক আলু পচিয়া নষ্ট হয়। রোগ ধরা ফসল হইতে কখনও বীজরক্ষা করা উচিত নয়। যদি আলুর গাছগুলি জোরাল না হয়, পরিপক্ক হইবার পুর্ব্বেই অকালে গাছ মরিয়া যায় কিম্বা আলুগুলিতে পচন ধরে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ফসলে খারাপ রোগ প্রবেশ করিয়াছে। তখন ঐ ফসল হইতে বীজ না রাখিয়া নূতন বীজ ক্রয় করা কর্ত্তব্য এবং ঐ জমিকেও কয়েক বৎসর ফেলিয়া রাখা দরকার।

সঞ্চয় ও বীজরক্ষণ

পাহাড়িয়া অঞ্চলে বর্ষার প্রথমভাগে আলু জন্মে, ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে বীজ বপন করা হয় এবং জুলাই আগষ্ট মাসে ফসল তোলা হয়। এই আগষ্ট মাস হইতে পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৭।৮ মাস কাল বীজ রক্ষা করা কঠিন কার্য্য। সেইজন্য খাসিয়া পাহাড়ের কৃষকেরা আগষ্ট মাসে ফসল তুলিয়া সেপ্টেম্বর মাসেই পুনরায় কিছু বীজ বপন করে এবং পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে শীতের ফসলরূপে তাহারা উহা তুলিয়া লয়। ঐ ফসল হইতে ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চে বপন করিবার জন্য বীজ রক্ষা করা অসুবিধা-জনক নহে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পাহাড়িয়া অঞ্চলে আগষ্ট মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আলু সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে। আপার শিলং গবর্ণমেণ্ট্ ফার্ম্মে এইরূপ গুদাম-জাত করার ব্যবস্থা আছে। তাহার প্রণালী এইরূপ ;—গুদাম ঘরে সুবিধামত সেল্ফ বা তাক্ তৈয়ারী করিয়া তাহার উপরে আলু-গুলিকে একস্তরে ছড়াইয়া সাজাইয়া রাখুন। দিনের বেলা গুদাম ঘরের জানালা সমস্ত যেন খোলা থাকে। অন্ধকারে আলুর গেঁজ বা আকুর জন্মিবার সুবিধা হয়। আলোক লাগিলে আকুর জন্মেনা,—সেই কারণেই জানালা খোলা

রাখা আবশ্যক, যেন দিনের বেলায় সূর্য্যালোক আলুর গায় লাগে। গুদাম জাত সঞ্চিত আলুগুলিকে প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর একবার বাছাই করিবেন। যেগুলি একটু পচন ধরিয়াছে, সেই আলুগুলিকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহা না হইলে একটা পচা আলু পার্শ্ববর্ত্তী আরও দশটা আলুকে পচাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ভাবে আগষ্ট হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আলুকে রাখিয়া দিতে পারিলে বীজের জন্য আর শীতের ফসল করিবার প্রয়োজন হয়না।

আসাম প্রদেশের সমতল ভূমি অঞ্চলে অক্টোবর-নবেম্বর মসে বীজ বপন এবং ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে ফসল তোলা হইয়া থাকে। এই ৮।৯ মাস কাল বীজের আলু রাখা খুব কঠিন এবং অসুবিধাজনক। বায়ুর আর্দ্রতার দরুণ আলুতে শীঘ্রই পচন ধরে। সুতরাং গুদামজাত আলুগুলিকে সাবধানে শুষ্ক অবস্থায় রাখা দরকার এবং মধ্যে মধ্যে পচা আলুগুলিকে বাছাই করিয়া সরাইয়া ফেলা আবশ্যক।

পাহাড়িয়া অঞ্চলের প্রধান ফসল পাওয়া যায় জুলাই-আগষ্ট মাসে। সুতরাং সমভূমি অঞ্চলে অক্টোবর নবেম্বরে বপন করিবার জন্য পাহাড়িয়া অঞ্চলের ফসল হইতে তাজা নূতন বীজ পাওয়া যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে শিলং বীজ হইতে সমভূমি অঞ্চলে যে আলু উৎপন্ন হয়, তাহা মার্চ্চ মাসে পুনরায় শিলং বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে। কারণ তখন পাহাড়িয়া দেশে আলু থাকে না।

ফলনের পরিমাণ

আলুর রকম, ভূমির উর্ব্বরতা, চাষে যত্ন ও সাবধানতা, এবং সার প্রয়োগ,—এইসব বিভিন্ন কারণে প্রতি বিঘায় আলুর উৎপাদন পরিমাণ কম বেশী হইয়া থাকে। খাসিয়া পাহাড়ে গড়ে প্রতিবিঘায় ২০ মণ হইতে ২৫ মণ এবং সমভূমি অঞ্চলে ১৫ মণ হইতে ২০ মণ আলু উৎপন্ন হয়। আপার শিলং গবর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে প্রতিবিঘায় ৬৫ মণ পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া গিয়াছে এবং গড়ে সেখানে প্রতিবিঘায় ৩০ মণ আলু জন্মে। ইউরোপে প্রতিবিঘায় গড়ে ৫০ মণ আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইতিহাস

৪০০ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকার বন্য অধিবাসীরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন জাতি আলুর চাষ বা ব্যবহারের কথা কিছুই জানিত না। আমেরিকায় ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের পর হইতে আলুর চাষ ক্রমে ক্রমে ইউরোপের নানাদেশে আরম্ভ হয়। এখন পৃথিবীর সকলদেশে আলুর চাষ হইতেছে এবং আলু মানুষের একটী প্রধান খাদ্যরূপে গৃহীত হইতেছে। ভারতবর্ষে প্রথমতঃ পাহাড়িয়া অঞ্চলে আলুর চাষ আরম্ভ হয়। এক্ষণে উহা সমতলভূমি অঞ্চলেও বিস্তারলাভ করিয়াছে।

গাভী পালন।

ষাঁড় দেখান

৪ বৎসরের ন্যূন বয়সের ও ৭ বৎসরের অধিক বয়সের ষাঁড় সঙ্গে, ৩ বৎসরের ন্যূন বয়সের বকনা বাছুরকে জনন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। বকনার বয়স ৪ বৎসর পূর্ণ হইলে অর্থাৎ ৪ দাঁত উঠিলেই ভাল হয়। কোনও কোনও গাভী প্রতি বৎসর, কোনও কোনও গাভী (এবং তাহাদের সংখ্যাই সাধারণতঃ অধিক দেখা যায়) এক বৎসর অন্তর এবং কোনও কোনও গাভী ৩ বৎসর পর একবার গর্ভবতী হয়। প্রথমোক্ত জাতের গাভীকে প্রসবের ছয় সাত মাস পর ষাঁড় দেখাইবে। একবৎসর পর একবার প্রসবকারিণী গাভীকে প্রসবের ৮ মাস পর ষাঁড় দেখাইবে। ষাঁড় ও গাভী দুইটী তুল্যাকার হওয়া আবশ্যক, ক্ষুদ্রকায় গাভীর বৃহৎকায় ষাঁড় সঙ্গে সংযোগ হইলে কষ্টপ্রসবের আশঙ্কা, কারণ গর্ভস্থ বৎসও বড় আকারের হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রথম ঋতুর প্রত্যেক তিন সপ্তাহ পর একবার করিয়া এবং প্রসব করার দুইমাস মধ্যে গাভীর ডাক আইসে (ঋতু উপস্থিত হয়)। প্রথম ২।১ ডাকে ষাঁড় না দেখালেও ক্ষতি নাই কিন্তু চতুর্থ ডাক অবহেলা করলে বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা। সন্তান প্রসবের তিন মাসের মধ্যে গাভী ঋতুবতী হইলে, উত্তেজনা নিবারণার্থ মধ্যে মধ্যে প্রাতে ও বৈকালে ধনিয়ার জল তোকমা ভিজাইয়া চিনির সরবত করতঃ গাভীকে পান করিতে দিবে। ভাল গাভীকে মাঠে চরিতে না দেওয়াই ভাল কারণ, মাঠে চরিলে, সংক্রামক রোগ, রৌদ্রতাপ, নিকৃষ্ট ষাঁড় সঙ্গম, প্রভৃতি নানা আশঙ্কা ও অসুবিধা থাকে।

গর্ভধারণ কাল

৭। ষাঁড় দেখানের দিন হইতে ৯মাস পর প্রসব প্রতীক্ষায় গাভীকে সতর্কতাসহ স্বতন্ত্র স্থানে রাখিতে হইবে। গাভী ২৮৩ হইতে ৩০০ দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে। গর্ভধারণের পূর্ব্বে প্রতি তিন সপ্তাহ পর, গাভীর একবার করিয়া ডাক আইসে। নিম্নলিখিত খাদ্যে গাভীর শীঘ্র ডাক আইসে:-- কার্পাস বীজ সিদ্ধ ১ কি ২সের সঙ্গে দেওধান্য প্রত্যহ খাইতে দিবে।

কামধেনু

৮। যে বকনা উপযুক্ত বয়সেও ঋতুমতী হয় না তাহাকে প্রত্যহ দোহন করিলে "কামধেনু" প্রস্তুত করা যায়; যে কোনও সময়ে দোহন করিলে কামধেনুর দুগ্ধ পাওয়া যায়।

গর্ভবতী গাভীর যত্ন

৯। গর্ভবতী ও সদ্য প্রসূতি গাভীর যত্ন। প্রসবের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে গাভীকে দৈনিক আধসের যব সিদ্ধ, একপোয়া মাতগুড়

ও দুই ছটাক মসিনার তৈল আধ ছটাক লবণ সহ খাওয়াইলে তাহা মৃদু বিরেচক, পুষ্টিকর ও দুগ্ধজনক খাদ্য স্বরূপ কাজ করিবে * (১)

প্রসবের পর যত্ন †

প্রসবের পর ৪।৫ দিন যাবৎ গাভীকে গমের কাটা, গমের কুঁড়া, গুড় আদা ও তৈল খাইতে দিলে কিম্বা সরিষার খইল ৩।৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া শুষ্ক খাদ্যের জাবের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়ান ভাল। তাহার গাত্রে যে রসভার থাকে তাহা দূর হয়। প্রসবের পর তিন সপ্তাহ কি এক মাস যাবৎ গাভীর দুগ্ধের বিরেচক গুণ থাকে। প্রসবের ২।৩ মাস মধ্যে গাভীকে স্থানান্তর করিলে কি তাহার রক্ষক পরিবর্তন করিলে, দুগ্ধ কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা।

দুগ্ধ বর্দ্ধক খাদ্য

১। মাঠে চরিয়া ঘাস খাইলেও নিম্নোক্ত খাদ্য গাভীকে খাইতে দিলে দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়:—(ক) ২সের মাস কালাই ও এক সের থেঁথ্‌লান মিঠা দেওধান ৫ সের জল দিয়া সিদ্ধ করতঃ সেই পাতলা জাউ, (খ) ছোলা ভিজান; (গ) প্রাতে শিশির

---

* (১) গর্ভবতীগাভীর যত্ন। গর্ভবতী স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যেরূপ, গর্ভবতী গাভী সম্বন্ধেও তদ্রূপ যত্ন ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন আবশ্যক। প্রসবের দেড় কি পৌনে দুই মাস পূর্ব্ব হইতে গমের ভুষি, তিসির খইল, ও কাঁচা দুর্ব্বা ঘাস খাইতে দিবে। প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে গাভীর যোনীদ্বার হইতে ক্রমান্বয়ে শাদা শ্লেষ্মা, ঈষৎ রক্তবর্ণ শ্লেষ্মা, ও জল ভাঙ্গা দেখা যায়। জল ভাঙ্গার ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রসব হয়। প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে তথায় কেহ যাইবে না, অধিকাংশ স্থলে আপনা হইতেই গাভীর সুপ্রসব হয়। যদি জল ভাঙ্গা দেখা দেওয়ার পর ৪ ঘণ্টা গত হইলেও প্রসব না হয়, অথচ যোনীদ্বারে বাছুরের মস্তক ও সম্মুখের দুই পার খুর দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় দুর্ব্বলতা বশত গাভী কোঁথ দিতে না পারায় ঐরূপ হইয়াছে। তখন নিম্নোক্ত ঔষধটী সেবন করাইলে সহজে প্রসব হইবে,—১ আউন্স স্পিরিট এ্যামোনিয়া এ্যারোমেট, ২ আউন্স স্পিরিট এ্যামোনিয়া নাইট্রিসি, টিংআর্গট ২ হইতে ৪ আউন্স ও জল তিন পোয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। গর্ভস্থ বাছুর ঐরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় যোনীদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষার্থ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলির চাড়া (নখ) কাটিয়া ফেলিয়া সাবান সোডা, কি খইল দ্বারা হাতের কনুই পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া নারিকেল তৈল কি তদভাবে কোনও খাদ্য তৈল হাতের ঐ পর্য্যন্ত মাখিয়া তাহা যোনী দ্বারের ভিতর প্রবিষ্ট করিবে কারণ ঐ হাতে ময়লা থাকিলে গাভীর রক্ত দুষ্টি জন্মিতে কি ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে। গাভীকে যে স্বতন্ত্র খোপে একা রাখিবে তাহাতে পুরু করিয়া খড় পাতিয়া দিলে প্রসূত বাছুর তাহার উপর ভূমিষ্ট হইয়া পতন জনিত আঘাত পাইবেনা।

† ২। প্রসবের পর যত্ন। প্রসবের পর গাভী বাছুরের গাত্র ক্লেদ চাটায়, বাছুরের গাত্রে রক্ত সঞ্চালন আরম্ভ হওয়ায় শীঘ্র শীঘ্র দাঁড়াইতে পারে, গাভী বাছুরের গাত্রের একপার্শ চাটিলে বাছুরের অপর পার্শ চাটার জন্য পাশ পরিবর্তন করে শোয়াইতে হয়। গাভীর বাঁট পরিস্কার করিয়া দুগ্ধ টানিয়া ফেলিয়া দিতে হয় নচেৎ বাছুর দুগ্ধ পানের সময় তাহা উদরস্থ করিয়া রুগ্ন হইতে পারে। প্রসবের অল্পকালপরই ধারাল কাঁচিদ্বারা নাড়ী কাটিবে। কিন্তু তৎ পূর্ব্বেই কাঁচি সাবান, খইল, কি সোডা দিয়া গরম জলে পরিস্কার করতঃ অগ্নির উত্তাপে বিশোধিত করিতে হইবে, কাঁচিতে ময়লা থাকিলে বাছুরের রক্ত বিষাক্ত কি ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে। কর্ত্তিত স্থানে নারিকেল তৈল ফেনাইল কি কেরাসিন তৈলের পট্টী দিবে তাহা হইলে তাহাতে ধূলি কি মাছি পড়িবেনা এবং ঘা শীঘ্র শুকাইবে প্রসবের ৩।৪ ঘণ্টা পর গাভীর ফুল পড়ে। নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করালে শীঘ্র ফুল পড়ে:—টিং আর্গট ও শুঠ চূর্ণ প্রত্যেকটি আধ ছটাক ও ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দুই ছটাক, উষ্ণ জলমধ্যে একটি শিশিতে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ফুল পড়িলে উষ্ণ জলে গাভীর গা ধুইয়া দিবে। প্রসবের পরই ঘর পরিস্কার করিয়া খড় পাতিয়া দিবে। শীতকালে অগ্নি জ্বালিয়া ঘরের ভিতর উষ্ণ রাখিবে। সিম-পাতা সিদ্ধ জলদ্বারা যোনীদ্বার ধৌত করিয়া পরিস্কার করিয়া দিবে।

ভিজা ঘাস; (ঘ) কার্পাস বীজ সঙ্গে কুল গাছের পাতা। (ঙ) জাগ দেওয়া ঘাস ১০ সের ও কুঁড়ো ২ সের (চ) লাউসিদ্ধ, বাবলার কাঁচাফল ইক্ষুর ছোব্‌ড়া ও চিনির গাদ; মদের ভাটির ছোবড়া; নারিকেল খইল। (ছ) প্রসবের পর কিছুদিন গাভীকে কাঁচা ঘাস দিবে কারণ তখন তাহার পাকস্থলী দুর্ব্বল থাকায় শুষ্ক ঘাস সহজে জীর্ণ হয় না; তজ্জন্য তৎপর ক্রমশঃ শুষ্ক ঘাস খাওয়া সহ্য করাইবে।

২। যে সকল বৃহৎকায় গাভী দৈনিক ১৩।১৪ সের দুগ্ধ দেয়, তাহাদিগকে প্রত্যহ দুইবার:—(ক) ৫ সের ভূষি, ১ সের মাতগুড় আধমণ পঁচিশ সের জলে মিশাইয়া ও (খ) গরম জলে ভিজান ১ সের তিলের খইল, ৫ সের কলাইর ভূষি কি চাউলের বা গমের কুঁড়ো ও যথা প্রয়োজন লবণ, মিশাইয়া খাইতে দিবে। (গ) ম্যান্‌গোল্ড, সয়বীন্‌ (Soybean) চীনাবাদাম্‌ ইত্যাদি।

৩। কসিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপে প্রত্যেক গাভীকে দৈনিক ২৫।৩০ সের 'প্রিক্‌লী পেয়ার' (prickly pear—নাগফল) সহ ভূষি কি শুষ্ক ঘাস খাওয়ান, হয় তাহাতে দুগ্ধ-বন্ধ গাভীরও পুনঃ দুগ্ধ নিঃসরণ আরম্ভ হয়। মেক্সিকো দেশে অধিক শীতে দুগ্ধ কমিয়া যাওয়ায়, ইহা খাওয়ানতে এখন শীতকালেও দুগ্ধ কমে না। বর্ষাকালের কাঁচা ঘাস খাওয়ায় দুধ পাতলা ও জলবৎ স্বাদ হয় তজ্জন্য তাহার সঙ্গে সম পরিমাণ শুষ্ক ঘাস খাওয়াইবে।

৪। দুগ্ধ নিঃসারক নিম্নোক্ত খাদ্য পানীয় সকল গাভীকে দিতে হইবে:—

(ক) প্রচুর বিশুদ্ধ জল, (খ) কাঁচা ঘাস, (গ) কার্পাস বীজ, তিল, মসিনা, চীনাবাদাম, কি তাহাদের খইল, ম্যান্‌গোল্ড (mangold) অরহরের ভূষি, গমের কুঁড়ো, চাউলের কুঁড়ো, (ঘ) লবণ, (ঙ) রাত্রিতে কাঁচা ঘাস, প্রাতে বাসী ভাতের মাড়, চাউল ধোয়া জল, লবণসহ খাইতে দিয়া প্রথমবার দোহন, তৎপর শিশির ভিজা ঘাস খাওয়াইয়া দ্বিতীয়বার পূর্ব্বাহ্ণে দোহন, কখন বা প্রাতে প্রথমবার দোহনের পূর্ব্বে তিন চারি সের জল ও কিছু মাতগুড় তৎসঙ্গে মিশাইয়া খাওয়ালেও এবং পাকা কাঁঠাল ও আমের চোঁচা খাওয়ালেও দুগ্ধ অধিক হয়। (চ) তৎপর গমসিদ্ধ কি মাসকালাইর খিচুড়ী খাওয়াইবে। লাউসিদ্ধ ও মাসকালাই সিদ্ধ লবণ সহ, পাটনাই শালগম, বাবলার কচি গাছ পাতা ও ফল বাবলা বীজ চূর্ণ। লবণ খাইতে না দিলে দুধ কমিয়া যায় ও গাভী দুর্ব্বল হয়। তজ্জন্য বড় একখণ্ড সৈন্ধব লবণ তাহাকে চাটিতে দিবার জন্য গোয়াল ঘরে রাখিয়া দিবে।

৫। গাভীর শরীরের ওজনের $\frac{1}{২০}$ ভাগ দৈনিক দুগ্ধ হইতে পারে। বঙ্গদেশে গরুর ওজন সাধারণতঃ ৭।৮ মণ হয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গাভীর ওজন ২১ মণ ও তাহার দৈনিক দুগ্ধও প্রায় ৫২ সের হইতে পারে।

সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য দ্রব্য প্রস্তুতের কাঁচা-মালের ব্যবসা

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সভ্য মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ-প্রবৃত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করে এমন মানুষ শিক্ষিত সমাজে বিরল। অশিক্ষিত ও গোঁড়া সমাজের লোকেরা সৌন্দর্য্য চর্চ্চাকে বিলাসিতা বলে অভিহিত করলেও সৌন্দর্য্য চর্চ্চার রীতিমত প্রয়োজন আছে। সেইজন্যই দেখা যায় যে, পৌরাণিক যুগ হ'তে আজ পর্য্যন্ত সকল সময়েই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপকরণ সমূহ প্রভূত সমাদর পেয়ে এসেছে। সেকালে যাঁরা সৌন্দর্য্য বিলাসী ছিলেন তাঁদের বলা হ'ত এ্যারিষ্টোক্র্যাট্ বা অভিজাত। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এককালে এই এ্যারিষ্টোক্র্যাটরাই ছিল সভ্যতার অগ্রদূত। সৌন্দর্য্য চর্চ্চার বস্তুসমূহের তারাই ছিল প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাই তখনকার দিনের চুয়া-চন্দন-কুঙ্কুম-আবির, লোধ্ররেণু মুখবিলাস প্রভৃতি সাধারণ দ্রব্যসমূহ প্রভূত প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছে। এছাড়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত আরও কত যে দুর্লভ বস্তু আছে তার ইয়ত্তা নেই।

অতীত যুগে যে সমস্ত বিলাস দ্রব্য ব্যবহৃত হ'ত তা' অধিকাংশই ছিল প্রকৃতিদত্ত অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-বিপ্লবের যুগে সে প্রণালী আর বর্ত্তমান নেই, এখন কৃত্রিম উপায়েই প্রায় সমস্ত জিনিস প্রস্তুত হয় এবং এই কারণেই অধুনা বিলাস দ্রব্যসমূহ এতটা সহজলভ্য হয়েছে। পূর্ব্বে যে জিনিসটার উৎপাদন ছিল সীমাবদ্ধ, আজ সেটাই সুলভ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে বিজ্ঞান তার অপরূপ খোদকারীর দ্বারা বিলাস দ্রব্যের রত্ন ভাণ্ডারের দ্বার অর্গলমুক্ত করেছে সৌন্দর্য্য-লোভীদের জন্য। তাই দেখি অভিজাতেরা যখন এক টাকা দেড় টাকা খরচ করে স্নো কেনে, গরীবরাও এক আনা পয়সা খরচ করে বাজে ক্রীম সংগ্রহ করতে কসুর করে না। বিজ্ঞান সাধারণ লোকেদের আর্থিক অবস্থার দিক দিয়েই শুধু সুবিধে করে দেয় নি, পরন্তু সৌন্দর্য্য দ্রব্য ব্যবহার করবার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এনে দিয়েছে। ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির দিক দিয়ে সেটা একটা পরম লাভ। অথচ আজও যদি সেই পুরাকালের প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হ'ত তাহ'লে এটা সম্ভব হ'ত কি'না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের দ্বার অর্গলমুক্ত হওয়ার দরুণ আমাদের দেশেও বিলাসোপকরণ প্রস্তুতের বহু কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং আজও তারা

ক্রমবর্দ্ধমান শ্রীবৃদ্ধি সহকারে জাতীয় শিল্পের উন্নতি সাধনই করে চলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, আমরা সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুতের কাঁচামালের প্রতি মনোনিবেশ করি না, আমরা বিদেশ থেকে নানাপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য আমদানী করে এখানে সেগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে অর্থাৎ blending করে বাজারে একটি বিশেষ পদার্থরূপে বিক্রয় করি যেমন এইচ বসুর দেলখোস প্রভৃতি। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শিল্প প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবসার প্রয়োজন ছিল, সেদিন সেইটাই দেশীয় বস্তুরূপে জাতির সশ্রদ্ধ সহানুভূতি লাভ করেছে এবং জাতীয় শিল্পের অগ্রগতির সহায়তা করেছে; কিন্তু বর্ত্তমানে তাতে জাতীয় শিল্পের ক্ষুধা মিটছে না। তাই এখন প্রয়োজন হয়েছে এদেশেই কাঁচামাল সমূহ উৎপাদন করা। বিদেশ থেকে কাঁচামাল আনিয়ে প্রারম্ভিক অবস্থায় কাজ চলেছে বটে কিন্তু আজও যদি সেই খেলাই খেলা হয়, তাহ'লে সেটাকে আর দেশী জিনিস বলা চলে না—সেটা দেশী জিনিস বলিয়া লোককে ধাপ্পা দেওয়া মাত্র এবং ভাবের ঘরে চুরি করা।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপায়ের চেয়ে কৃত্রিম ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার দরুণই সুগন্ধ শিল্প ব্যাপারে এক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কৃত্রিম উপায়ের নিকট টি'কে থাকতে পারছে না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তথ্যের আংশিক ব্যতিক্রম ঘটবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ প্রভূত সম্পদশালী এবং সুগন্ধদ্রব্যের প্রাকৃতিক উপাদান সমূহ যদি কাজে লাগানো যায় তাহ'লে তা' সগৌরবে কৃত্রিম বস্তু সমূহের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় টি'কে থাকতে সক্ষম হবে। আমরা এতদিন এই প্রাকৃতিক সম্পদকে উপেক্ষা করে এসেছি অর্থাৎ এধারে যতখানি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল ততখানি মনোযোগ প্রদান করিনি, কিন্তু—এধারে যদি যথাযোগ্য নজর প্রদান করি তাহলে আমাদের পারফিউমারী শিল্প ভালভাবে গড়ে উঠতে পারবে। এ জিনিসটারই বর্ত্তমানে ভয়ঙ্কর দরকার। সৌন্দর্য্যদ্রব্য বা সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের এ-ও একটা অঙ্গ। এ-ব্যাপার যদি আমরা ভালভাবে পরিচালন করতে পারি তাহ'লে কাঁচামালের জন্য আর আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী হ'য়ে বসে থাকতে হবে না, দেশের জাতীয় শিল্পেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া কৃত্রিম উৎপাদনের প্রতিও আমাদের ব্যবসায়ীদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হলেও তার অধিবাসীরা আর্থিক সম্পদে বলশালী নয়, সুতরাং তাদের আর্থিক অবস্থার অনুযায়ী মাল প্রস্তুত করা দরকার। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ সাহায্যে Manufacture করলে ব্যবসায়ীদের পড়তা পোষাবে না, সুতরাং ব্যাপকভাবে এ ব্যবসায়ে নাবিতে গেলে কৃত্রিম বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভূত যে বস্তু তা' সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সেইজন্য বহুমূল্য। এই বহুমূল্য দ্রব্য আয়ত্বে আনবার ক্ষমতা অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া আর কারও খুব বেশী নেই, অথচ এই মুষ্টিমেয় অভিজাত সমাজকে নিয়ে ব্যবসায়ে বাজার জমানো যায় না। অভিজাত সাম্রাজ্যের বাইরে যে বিরাট সমাজ পড়ে রয়েছে তার লোকসংখ্যা অগণিত কিন্তু সেখানে অর্থস্রোত একেবারে সঙ্কীর্ণ; অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী কালক্রমে কোথায়ও বা আরও সঙ্কীর্ণতর আকার ধারণ করছে কোথায়ও বা একেবারে মজে গিয়ে দেখা দিয়েছে বালুচর। অথচ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সে সমাজের অধিবাসীরাও রক্তমাংসের মানুষ, ধনীদের ন্যায় তাদের অর্থের সচ্ছলতা না থাকলেও লোভ আছে, ভোগ করবার স্পৃহা আছে, অমার্জ্জিত রুচির সস্তা সৌখীনতাও আছে। প্রকৃত ব্যবসায়ীর দৃষ্টি হল এই অগণিত নরনারীর সাম্রাজ্য অনুযায়ী রুচিকর দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাদের বিলাসবাসনায় চরিতার্থ করিতে সাহায্য করা। তাহলে আজিকার এই সঙ্কীর্ণ বাজারের ওপর তাঁদের নির্ভর করে থাকতে হয় না, বিক্রয় কেন্দ্রের পরিধি নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পায়—হ'তে পারে তার লাভ অল্প কিন্তু তাতে ব্যবসার প্রতিষ্ঠা বিপুল। তাতে সমস্তই পুষিয়ে যায়।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, সুগন্ধদ্রব্যের ব্যবসার জন্য দেশীয় ব্যবসায়ীগণ বিলাত থেকে কাঁচা মাল আর আমদানী না করে নিজেরাই

সেই সমস্ত জিনিষ উৎপাদনে ব্রতী হো'ন। এবং দেশের মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর জন্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করা ছাড়াও সাধারণ শ্রেণীর জন্য সাধারণ সস্তা দ্রব্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করুন। তা' যদি করা যায় ত দেশের শিল্প-ব্যাপারের প্রভূত উন্নতি হবে। পূর্ব্বেই বলেছি যে. প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুমাত্র লোকসানের নয়, বরং এতদিন যে জিনিসটীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে এসেছি সেটীর সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। সুগন্ধদ্রব্যের কাঁচামাল তিনপ্রকার দ্রব্যজাত হতে পারে,—প্রথমতঃ, উদ্ভিদসম্ভূত; দ্বিতীয়তঃ, প্রাণীসম্ভূত; তৃতীয়তঃ, সিন্‌থেটিক্ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম দ্রব্যসম্ভূত। প্রথমোক্ত দুটি জিনিসের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার এপর্য্যন্ত ঘটে ওঠেনি, অথচ আমরা জানি প্রাচীন ভারতে সুগন্ধদ্রব্য উৎ-পাদনের পক্ষে ঐ দুটি দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হ'ত। উদ্ভিদজাত প্রাকৃতিক কাঁচা মালের মধ্যে নানাপ্রকার সুগন্ধ পুষ্প, গাছের ছাল, শিকড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বেলচামেলী, সেফালি গন্ধরাজ, বকুল,জুঁই হেনা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পের কুঁড়ি ও পাপড়ী হতে তৈলজাতীয় পদার্থ নিষ্কাষণ করা যায়। চন্দনবৃক্ষের সুগন্ধের কথা সর্ব্বজনবিদিত এবং মহীশূরে এই চন্দন হ'তে সুগন্ধ নিষ্কাষনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। প্রাণীজ পদার্থের মধ্যে মৃগনাভি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম পদার্থের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হয়েছে। এই কৃত্রিম পদার্থের কল্যাণেই মানুষ আজ প্রকৃতির ওপর টেক্কা দিয়েছে। প্রাকৃতিক পদার্থ যদি নাও পাওয়া যায় তাহলেও মানুষ কৃত্রিম পদার্থ দিয়েই হুবহু তার কাজ চালিয়ে নেয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কমলালেবুর তেলের কথা ধরুন। কমলার তৈল প্রাকৃতিক পদার্থ, অয়েল অব্ নিরোলি কৃত্রিম পদার্থ। কিন্তু আপনি কমলার তৈলের পরিবর্ত্তে যদি অয়েল অব্ নিরোলি ব্যবহার করেন তাহলে কারও সাধ্য নেই যে পার্থক্য টের পায়। অথচ কৃত্রিম পদার্থের ব্যয়ভার অনেক কম।

অতএব আমরা উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একথা সত্যি যে, আজ অলিতে গলিতে বহু সংখ্যক সৌন্দর্য্যদ্রব্য উৎপাদনের কোম্পানী স্থাপিত হয়েছে এবং তাদের কয়েকটি দ্রব্য সারা ভারত-বর্ষময় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছে কিন্তু সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে সৌন্দর্য্যদ্রব্য সমূহের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য খুব অল্প সংখ্যক কারখানাই এদেশে আছে। মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে বস্‌রার গোলাপ আনিয়া দিল্লীর আশেপাশে যে বিরাট গোলাপ বাগের সৃষ্টি হইয়াছিল তারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এখনও গাজীপুরের গোলাপজল, আতর, বেল, চামেলী ইত্যাদি তেল ভারতের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের ভোগ বিলাসের বাসনা চরিতার্থ করার সম্ভব করিয়া রাখিয়াছে। উৎকৃষ্ট খাঁটী ফুলেল তেলের পৃথিবীতে তুলনা নাই। কি গুণে কি গন্ধে ইহা অপরাজেয়। আমরা আজ ২৫ বৎসরের উপর ৮৲ টাকা সেরের ফুলেল তেল ব্যবহার করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছি। এখনও ৮০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা ভরির আতর গাজী-পুরে তৈরী হয়। চাই ফ্রান্সের ন্যায় বিরাট আকারে ফুলের চাষ করা। সুগন্ধদ্রব্যের ব্যব-সায়ে এই সমস্ত কাঁচামালের চাহিদা যে প্রচুর তা' বোধ হয় বুঝিয়ে

বলতে হবে না এবং দেশীয় জিনিসের অভাবেই সৌন্দর্য্যদ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানীগণ বিদেশী জিনিস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। সুতরাং এদেশে সৌন্দর্য্যদ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করবার যোগ্য সময় উপস্থিত হয়েছে। এই সময়ের যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তাহলে অতিরিক্ত একটি শিল্পের পত্তন ঘটবে এ দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।
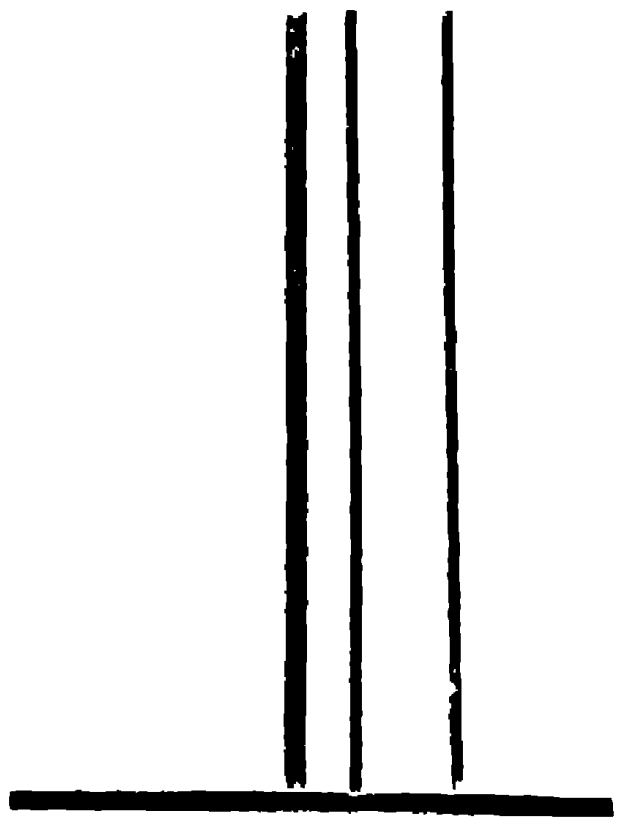
ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্প

(শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি)

বর্ত্তমান যুগে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে এবং কংক্রিটের কাজে যে সিমেণ্ট ব্যবহার করা হয়, অনেকে হয়ত মনে করেন, তাহা নিতান্ত আধুনিক সময়ের উদ্ভাবিত জিনিস। বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাচীন রোমক জাতি সিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী এবং তাহার ব্যবহার জানিত। যে সময়ে সমগ্র ব্রিটেন রোমান্ অধিকারে ছিল, তখনকার নির্ম্মিত গৃহ প্রাসাদ দুর্গ রাজপথ প্রভৃতিতে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন হিন্দুদের নিকটেও সিমেণ্ট অজ্ঞাত ছিলনা। বরাহ মিহির রচিত সুবিখ্যাত বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে সিমেণ্ট নির্ম্মাণ ও ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কালক্রমে এই শিল্প বিদ্যা এবং উহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যায়। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে ইংরাজ ইঞ্জীনিয়ার জন্ স্মীটন সিমেণ্ট শিল্পের পুনরুদ্ভাবন এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এই কার্য্যের জন্য প্রকৃত প্রশংসাভাজন জেম্‌স্ য়্যাস্পডিন নামক একজন ইংরাজ রাজ-মিস্ত্রী। আজকাল যে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উদ্ভাবন কর্ত্তা এই রাজমিস্ত্রী জেমস্ য়্যাস্পডিন। ইঁহার চেষ্টাতেই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম সিমেণ্টের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় সিমেণ্টের কারখানা সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ সহরে। সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড নামক ব্যবসায়ীসঙ্ঘ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারখানাটী ছিল ক্ষুদ্র এবং মালও বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইত না। তখন যে প্রণালীতে সিমেণ্ট তৈয়ারী হইত, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অবলম্বিত অধিকতর উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার তুলনায় লাভজনক ছিলনা। বাজারে প্রতিযোগিতাও ছিল খুব তীব্র। সেই সময়ে দেশীয় শিল্পব্যবসায়ে জনসাধারণের কিম্বা অর্থশালী লোকের কাহারই আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল না। এই সকল কারণে সেই কারখানাটী কিছুকাল চলিবার পর উঠিয়া যায়।

তারপর ১৯১২ সালে "ইণ্ডিয়ান সিমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড" নামে একটী কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরিচালনায় সেই বৎসরেই পোরবন্দরে (করাচী) একটী সিমেণ্টের কারখানা খোলা হয়। পরবর্ত্তী দুইবৎসরে কাটনী এবং বুঁদি নামক দুইটি পৃথক কোম্পানী স্থাপিত হয়; তাহারাও সিমেণ্টের কারখানা খোলে। কিন্তু এই সকল কারখানাতে প্রচুর পরিমাণে সিমেণ্ট উৎপন্ন হইতনা। ১৯১৪ সাল ইউরোপে মহা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভারতীয় সিমেণ্ট কার-

খানাগুলির পক্ষে ইহা সৌভাগ্যের কারণ হইল। বাজারে বিদেশীয় প্রতিযোগী আর কেহ না থাকাতে ভারতে প্রয়োজনীয় সিমেণ্টের চাহিদা সমস্তই ভারতীয় কারখানা হইতে মিটাইবার সুযোগ পাওয়া গেল।

ভারতের ধনী ব্যবসায়ীরা খুব উৎসাহের সহিত এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। সিমেণ্ট তৈয়ারীর শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থ, শ্রম এবং বুদ্ধি নিয়োগ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। ফলে, ১৯২৩ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ৯টী দেশীয় সিমেণ্টের কারখানা চলিতে লাগিল। কিন্তু এই অতিরিক্ত উৎসাহের একটা কুফলও দেখা দিল। কারখানা পরিচালকগণ ভুলিয়া-গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের লোকেরা রক্ষণশীল; তাহারা দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিনীতি আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ঘরবাড়ী তৈয়ারী ব্যাপারেও তাহারা সেইরূপ। সিমেণ্টের কারখানাগুলিতে যে পরিমাণ মাল তৈয়ারী হইল, বাজারে চাহিদা তেমন উঠিল না' সুতরাং কারখানা উৎপন্ন অতিরিক্ত মাল গুদামজাত হইয়া রহিল। আর এক মুস্কিল ঘটিল এইযে, পুরাতন কারখানাগুলি যে এলেকা বা সীমানার মধ্যে মাল বিক্রয় করিত, নূতন কারখানাগুলি সেই সীমানার ভিতরেই স্থাপিত হয়। এই কারণে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দর কাটাকাটি আরম্ভ হইল ভীষণ ভাবে। কোন একটী কারখানা, নিজের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী কারখানাকে জব্দ করিবার জন্য বাজার মাটী করিয়া কারবার নষ্ট করিয়া, যা তা দামে মাল ছাড়িতে লাগিলেন। এইরূপে অতিরিক্ত উৎপাদন এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এই দুইটি কারণে ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্প উন্নতির মুখেই একটা দারুণ ক্ষতিজনক প্রবল বাধা পাইল। ফলে দুইটী কোম্পানী লিকুইডেশনে যাইতে বাধ্য হয়।

কিছুকাল পরে কারখানার মালিকদের চৈতন্য হয়। তাঁহারা দেখিলেন তাঁহাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষের ফলে তাঁহারা শক্তিহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এমন অবস্থায় তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। বিদেশী প্রতি-যোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে রক্ষণশুল্ক বসাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ট্যারিফ বোর্ডের তদন্তের ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন ধরা পড়ে। নিজেদের মধ্যে তৈয়ারীতে যে পরিমাণ সিমেণ্টের ব্যবহার হয়, কেবল মাত্র তাহার উপর নির্ভর করিলে মাল কাটতি হইবার কোন আশা নাই। ভারতের বাহিরে ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধারণ ঘরবাড়ী তৈয়ারী ব্যতীত অন্যান্য প্রকার কার্য্যে সিমেণ্ট ব্যবহার হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা কেহ জানিত না এবং তাহা প্রচলিত করিবার চেষ্টাও কেহ করে নাই। আজকাল প্রপ্যাগ্যাণ্ডা (Propaganda) অর্থাৎ বিপুল প্রচার কার্য্য ব্যতীত কোন ব্যবসায় উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারেনা। সিমেণ্ট কারখানার মালিকগণ ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং সিমেণ্টের নূতন নূতন ব্যবহার জন-সাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইলেন। ইহার ফলে ১৯২৭ সালে "কংক্রীট য়্যাসোসিয়েসান অব ইণ্ডিয়া" নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোট বড় নানাবিধ কার্য্যে সিমেণ্টের নূতন নূতন ব্যবহার সম্বন্ধে জন সাধারণকে জানান এবং সিমেণ্ট ব্যবহার বিষয়ে

প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া সাহায্য করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। "ইণ্ডিয়ান কংক্রীট জার্ণ্যাল" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা এই সমিতি হইতে প্রকাশিত হয়। এইরূপ প্রচার কার্য্যের ফলে, জনসাধারণের মনে সিমেণ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে একটা অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং দর কাটাকাটির কথাও গোপন রহিল না। সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানী সিমেণ্টের উপর রক্ষণশুল্ক বসাইতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইলেন না। দেশীয় কারখানাগুলিকে কিছু টাকা দিয়া সাহায্য করিতে ট্যারিফ বোর্ড সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভে বিফল মনোরথ হইয়া কারখানার মালিকেরা বুঝিলেন, ইহার প্রতিকার নিজেদেরই হাতে। নিজেরা একজোট একতায় বদ্ধ না হইলে আর অন্য উপায় নাই। সুবুদ্ধির উদয় হইলে ১৯২৫ সালে "ইণ্ডিয়ান সিমেণ্ট ম্যানুফ্যাক্চারার্স য়্যাসোসিয়েসান্" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির চেষ্টায় আসন্ন বিপদ অনেকটা কাটিয়া গেল। বাজার দর একটা ধরা বাঁধা করিয়া দেওয়াতে পরস্পরের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা দূর হইল। ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্প একটা নূতন জীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিল।

তখনও আর একটা কাজ বাকী থাকে। যে অতিরিক্ত মাল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাজারে কাটাইবার উপায় কি? সিমেণ্টের চাহিদা বাড়ান যায় কিরূপে? ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে রক্ষণশীলতাব ভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইল। বাজারে ভারতীয় সিমেণ্টের চাহিদা বাড়িয়া চলিল।

কারখানার মালিকেরা দেখিলেন, পরস্পরের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার প্রয়োজন। তাঁহারা উন্নতির আর এক ধাপে উঠিলেন। ১৯৩০ সালে "সিমেণ্ট মার্কেটিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্" নামক আর একটী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইহার তত্ত্বাবধানে, ইহার সদস্যভুক্ত কারখানা সমূহের মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত এবং প্রত্যেক কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা হইল। সম্মিলিত তহবিলের দ্বারা আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্য্য অধিকতর ফলদায়ক হইয়া উঠিল। বিক্রয় মূল্যও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গেল। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রধান প্রধান সহরে সিমেণ্ট বিক্রয়ের দোকান খোলা হইল এবং খরিদদার তাহার প্রয়োজনমত মাল যেন যথাসম্ভব কমখরচায় পায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইল। কিরূপে বিবিধ কার্য্যে সিমেণ্ট্ ব্যবহার করিতে হয়, সেই বিষয়ে নানাপ্রকার পুস্তিকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ছাপাইয়া ঐ সকল দোকানদারের মারফতে জন সাধারণের মধ্যে বিলি করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে লোকের প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতা দূর হইতে লাগিল।

ভারতীয় সিমেণ্ট্ শিল্পের এই ক্রমোন্নতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং উহাকে অধিকতর স্থায়ী করিবার জন্য আর একটী উপায় অবলম্বিত হইল। ইহার নাম Merger Scheme বা সম্মেলন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে ছোট ছোট অনেকগুলি কারখানা মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ কারবারে পরিণত হয়। বাজারে সিমেণ্টের চাহিদা বাড়িয়া গেলে তাহার সহিত তাল সামলাইয়া চলা ছোট ছোট কারখানাগুলির পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু কারখানা বড় হইলে এই অসুবিধা থাকে না। কয়লা, চটের থলি প্রভৃতি কারখানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে ছোট কোম্পানীর পক্ষে অনেক টাকা খরচ পড়ে। বড় কারখানায় এই সকল জিনিস বেশী পরিমানে ক্রয় করা হয় বলিয়া দাম কম পড়ে, সুতরাং মাল উৎপাদন খরচাও কম হয়। বৃহৎ কারবারের পক্ষে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগীতা করাও কঠিন কার্য্য নহে। সিমেণ্ট-শিল্প সংশ্লিষ্ট বড় বড় ধনীব্যবসায়িগণ এই "সম্মিলন পদ্ধতি"র সুবিধা বুঝিতে পারিয়া ১৯৩৬ সালের আগষ্ট-মাসে "য়্যাসোসিয়েটেড্ সিমেণ্ট কোম্পানীজ অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড" নামে একটী বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেক ছোট ছোট সিমেণ্ট কারখানা উহার অন্তর্ভূক্ত হয়।

এই বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন এবং পুস্তিকা প্লাকার্ড্ প্রভৃতির সাহায্যে প্রচারকার্য্য খুব জোর চলিতে থাকে। পূর্ব্বে আর্থিক অভাব ও টানাটানির দরুণ যে কার্য্য সম্ভব ছিল না, মিলিত তহবিলের স্বচ্ছলতা পাওয়াতে সেই কার্য্য আর অসম্ভব রহিল না। সিমেণ্ট নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা এবং নানাপ্রকার জটিল সমস্যার সমাধান করিবার সুবিধাও উপস্থিত হইল। এই সময়ে কারখানার মালিকগণ শিল্পীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন। তদনুসারে কংক্রীট স্কুল স্থাপনের চেষ্টা হয়। এক্ষণে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ঐরূপ কয়েকটী কংক্রীট স্কুল চলিতেছে। কারখানার মালিকদের তরফ্ হইতেই ঐসকল স্কুল পরিচালিত হইয়া থাকে। ছাত্রগণ সাধারণতঃ সাব্ ওভারসিয়ার এবং

মিস্ত্রি শ্রেণীর যুবক। বৃহৎ সেতু, ঘর বাড়ী তৈয়ারীর কার্য্যে, মেজে দেওয়াল প্ল্যাষ্টারিং, নল, পাত্র, টেবিলের উপর তক্তা, প্রভৃতি নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং সিমেণ্ট রংএর কার্য্য কিরূপে করিতে হয় এই সকল বিষয়ে ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

সিমেণ্ট ব্যবহার প্রচলিত করিবার জন্য কারখানার মালিক ও ব্যবসায়িগণ আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। একটী বৃহৎ মোটর লরীতে সিমেণ্ট, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র, অভিজ্ঞ শিল্পী ও মিস্ত্রি প্রভৃতি বোঝাই করিয়া বিভিন্ন সহরে, এমন কি সম্ভব হইলে, গ্রামে গ্রামেও ভ্রমণ করা হয়। ইহাকে ডিমনষ্ট্রেশান লরী (Demonstration Lorry) বলে। সিমেণ্ট ব্যবহার করিবার প্রক্রিয়া সমাগত লোকদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহার সুবিধা দেখাইয়া দেওয়াই এই ডিমনষ্ট্রেশান লরীর কার্য্য। ইহার ফলে গ্রামবাসীরাও ক্রমে ক্রমে সিমেণ্ট ব্যবহারের সুবিধা উপলব্ধি করিতেছে। জলনিকাশের পাইপ, নর্দ্দমা, ঘরের মেজে ও ছাদ, টেবিল, শেল্‌ফ্, রেলিং, পুল, থাম প্রভৃতি নানারকম জিনিস মজবুত এবং সুন্দরভাবে কমখরচায় কিরূপে সিমেণ্ট কংক্রীটের দ্বারা তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা এক্ষণে জনসাধারণের বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের সিমেণ্ট কারখানাগুলিতে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করিতেছে। প্রতি বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ টন ভারতীয় কয়লা এই সকল কারখানায় ব্যবহৃত হয়। পাটশিল্পকেও ইহা সাহায্য করে। সিমেণ্ট বস্তা বন্দী করিবার জন্য প্রায় দুই কোটী চটের থলির দরকার হয়। এতদ্ব্যতীত সিমেণ্ট শিল্প সংক্রান্ত মালপত্র বহন করিতে রেল কোম্পানীও প্রচুর আয় করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টনেরও অধিক পরিমাণ সিমেণ্ট রেলপথে চলাচল করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের প্রধান সিমেণ্ট কারখানা কাথিয়াবাড়, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার প্রদেশে অবস্থিত। বাংলাদেশে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সিমেণ্ট কারখানা চলিতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।
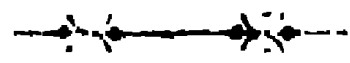
অরণ্যে মানবে নিগূঢ় সম্পর্ক

পৃথিবীর আদিকাল হইতে মানুষ চিরদিনই উদ্ভিদের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। এইরূপে ক্রমাগত সংগ্রামের পরে মানুষ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলের জঙ্গল নষ্ট করিয়া আবাস স্থল ও শস্যক্ষেত্র তৈয়ারী করিয়াছে। কোন কোন সময়ে উদ্ভিদ নূতন তেজে অন্যপথে মানুষের চেষ্টাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু মানুষ উদ্ভিদের বিজয়ী হইবার চেষ্টাকে বিফল করিয়াছে। উদ্ভিদের বিজয় যাত্রা কোন কোন স্থলে যুগপৎ ব্যাপক রোগাক্রমণের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। কোন স্থলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সহিত অথবা কোন স্থলে রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে সম্ভব হইয়াছে। যখনই যেখানে মানবের সতর্ক দৃষ্টি ও প্রচেষ্টার অভাব হইয়াছে সেইখানেই উদ্ভিদ রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। এই সকলের উদাহরণের জন্য আমাদিগকে বেশী দূর যাইতে হয় না। সুন্দরবনের বৌদ্ধযুগের বড় গ্রাম ও নগর পূর্ণ স্থান আজ বিরাট জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুন্দরবনের জঙ্গলে বৃহৎ দীর্ঘিকা দেখা যায়, একস্থানে বকুল গাছের বীথিকা আছে, বড় বড় মন্দির অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড় পাণ্ডুয়ায় একই প্রকারে জঙ্গল পূর্ণ হইয়াছে যদিও তাহা তুলনায় আধুনিক। আসামের নওগাঁও জঙ্গলে সম্প্রতি বিরাট সহরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ স্থানেও বনানী বিজয়ী।

একদিকে অধিক জঙ্গল থাকিলে মানুষ যেমন তাহার আধিপত্যবিস্তার করিতে পারে না, তেমনি জঙ্গল ব্যতীত মানুষ তাহার সভ্যতা রক্ষা করিতে পারিবে না। জঙ্গলের উপকারিতা, প্রয়োজন ও ইহার অভাবে মানুষের ক্ষতি ও বিপদ যে কত তাহা আমাদের পরিমাণ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে এই সকলের প্রতি সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে দিল্লীতে সেচ বিভাগের সভায় মিঃ রিচার্ডসন ও শিলংএ আসামের গবর্ণর বক্তৃতা করেন। বনানী রক্ষার জন্য তাহারা বলেন যে মালভূমি হইতে জমির উপরিভাগ ধৌত হইয়া ক্ষয় হইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর প্লাবনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাহার জন্য শস্যের ক্ষতি হইতেছে। আবার যে অঞ্চলে প্লাবন নাই সে অঞ্চলে বৃষ্টি নিয়মিত নহে। মানুষের জমি লাভের জন্য চিরন্তন বুভুক্ষার ফলে মানুষ জঙ্গল বিনষ্ট করিয়াছে। জঙ্গল বিনষ্ট করায় মাটীর মধ্যে বৃষ্টির জল আটকাইয়া থাকেনা এবং মাটি যে জল শোষণ করে তাহা জঙ্গলের আচ্ছাদন ব্যতীত ধরিয়া রাখিতে পারে না। ভূমির মধ্যস্থিত জলের অভাব ঘটিলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। জঙ্গলের আচ্ছাদন ব্যতীত বৃষ্টির ফলে ভূমির উপরিভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া উর্ব্বরা শক্তি সম্পন্ন ভূমির শ্রেষ্ঠ পদার্থ ধৌত

হইয়া যায়। জঙ্গলের আচ্ছাদন না থাকিলে বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাবে ভূমি শুষ্ক হয়, তাহার ফলে জমিতে শস্য হয় না ও মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জল কমিয়া যাওয়ায় সেই অঞ্চলের কূপ আরও গভীরতর না করিলে আর জল পাওয়া যায় না। বনানী নাশে জল আটকাইয়া না থাকিয়া বন্যা হইয়া থাকে। তখন জলের অভাবে শীতকালে নদী সকল বিশুষ্ক হয়, কারণ মৃত্তিকা অভ্যন্তরে জল থাকে না। বৃক্ষের অভাবে বাতাসে জমির মৃত্তিকা ধূলিরূপে উড়াইয়া জমির ক্ষতি করে। সে জন্য জঙ্গল ও গুল্মের প্রয়োজন।

ভূতত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন হিমালয় পর্ব্বতের ওজন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে তাহাতে উহা নূতন ভাবে সংস্থাপিত হইবার জন্য উহা নড়িয়া যায় ও উপরদিকে উঠে। ইহার ফলে হিমালয়ে ও তাহার পাদদেশে অবস্থিত অঞ্চল সমূহে ভূমিকম্প হয়। বিগত বিহারের ভূমিকম্পের কারণ ইহাই। জঙ্গল সকল কাটীয়া ফেলায় হিমালয় পর্ব্বত হইতে মাটি বৃষ্টিতে ধুইয়া পড়িতেছে ও সেই সঙ্গে পর্ব্বত ধ্বসিয়া পড়িয়া প্রস্তরখণ্ড অনবরত পড়িয়া যাইয়া পর্ব্বত হাল্কা হইয়া যাইতেছে। পর্ব্বতের ভার কমিয়া যাওয়াতেই ভূমিকম্প হইয়াছে। সুতরাং জঙ্গলের অভাবে যে এ সকল হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য।

জঙ্গল নষ্ট করিবার ফল সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায় না। কয়েক পুরুষ পরে যখন অনিষ্টের কথা বুঝিতে পারা যায় তখন তাহার প্রতিকার সাধ্যাতীত হয়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে দিকের অবস্থা অনেকটা বাংলার ন্যায়। সিন্ধু নদ গঙ্গার ন্যায় সকলস্থান প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। কিন্তু নদী মরুপথ দিয়া প্রবাহিত কেন? ইহার কারণ প্রাচীন কালের মানব, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল নষ্ট করিয়াছে।

নদীর তীরে যদি জঙ্গল না থাকে তবে সেই সকল স্থানের ও তদঞ্চলের ভূমির ক্ষয় আরও অধিক হয়। যমুনা, চম্বল প্রভৃতি নদী সমূহের উভয় তীর বনানী বিহীন, তাহার ফলে উহার দুই পার্শ্বের ভূমি হইতে যে মাটি বৃষ্টি দ্বারা ধৌত হইয়া নষ্ট হয় তাহার পরিমাণ জঙ্গল দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চল অপেক্ষা ২০ গুণ অধিক। রাজপুতানার প্রাচীন জনপদ বহুল স্থান সকল মরুভূমি মধ্যে অবস্থিত, একই কারণে।

বাঙ্গলার বন্যা দূর করিতে বাঙ্গালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ছোটনাগপুরের মালভূমির জঙ্গল কাটিতে কাটিতে প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিল। এক্ষণে ঐ অঞ্চল ও সোন নদীর উৎপত্তির স্থলের অঞ্চলে জঙ্গল কম থাকায় বৃষ্টি হওয়া মাত্র সমস্ত জল নদীপথে ধাবিত হয় বলিয়া বিরাট প্লাবনে দেশ ডুবিয়া যায়। জঙ্গল না থাকায় বৃষ্টির জল আটকাইয়া থাকে না। সেই সঙ্গে উর্ব্বরাশক্তিপূর্ণ ভূমির উপরিভাগের মৃত্তিকা যাহা অমূল্য, তাহা ধৌত হইয়া নদীপথে সমুদ্রে বাহিত হয়। দামোদর প্রভৃতি নদীতে যদি বাঁধ না থাকিত তাহা হইলে নদী পথে বাহিত উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন এই সকল মৃত্তিকা পশ্চিম বঙ্গের জমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঐ অঞ্চল উর্ব্বরা হইত এবং জমির শস্য উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইত ও তথাকার মৎস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া "শয়তানী বাঁধের" মধ্য দিয়া সমুদ্রে যাইয়া পতিত হইতেছে।

যে জমির উপরিভাগের উর্ব্বরাশক্তিপূর্ণ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া একবার চলিয়া যায় তাহা প্রায় চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। জমির উর্ব্বরাশক্তির শতকরা ১॥ ভাগও যদি ধুইয়া নষ্ট হয় তবে জমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। দেশের মধ্যে মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে, জমির উর্ব্বরতা কমিলে খাদ্য উৎপন্ন হইবে কিরূপে?

ছোটনাগপুরের পরে উত্তর বিহারে, সাঁওতাল পরগণায়, উত্তরবঙ্গ ও আসামের জঙ্গল বিনষ্ট করিবার ফলে বঙ্গদেশে প্লাবনের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল সকল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে বলিলেই চলে। তথাকার পাহাড় পর্ব্বতে আর বৃক্ষ না থাকায় মাটি ধৌত হইয়া প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আর তথায় কখনও বৃক্ষ জন্মিবে না, সেজন্য বৃষ্টির জল না আটকাইয়া প্লাবনের সাহায্য করিবে। উত্তরবঙ্গে হিমালয় পর্ব্বতে শস্য ক্ষেত্র করিবার প্রয়োজন হইয়াছে জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। তাহার জন্য হিমালয় পর্ব্বতের যে সকল স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তাহা শাকসব্জীর ক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়াছে। বৃষ্টির জল পড়িয়া এক্ষণে সোজা নদী পথের দিকে ধাবিত হয়। কয়েক বৎসর পরে উন্মুক্ত পর্ব্বত গাত্র হইতে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলে কেবল প্রস্তর পড়িয়া থাকিবে তখন শত চেষ্টাতেও ঐ স্থানে আর বৃক্ষ জন্মিবে না। তখন বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ প্লাবনই স্বাভাবিক হইবে ও শস্য শ্যামল ক্ষেত্র সকল বার বার ডুবিয়া যাইবার ফলে কৃষকগণ ক্ষতি সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষি ছাড়িয়া দিয়া দিন মজুর হইতে বাধ্য হইবে। তখন যন্ত্র দানবের আহ্বানে দিন মজুরগণ বড় বড় সহরে যাইয়া কারখানায় ও কলে যোগ দিবে। বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চল শূন্য হইবে ও সরল কৃষক কুলেরও কৃষি সম্পদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং যাইবার পথে দেখিতে পাওয়া যাইবে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বনানী ছিল তাহা এখন চা বাগান, গৃহে ও শস্য ক্ষেত্রে পূর্ণ, মাত্র সামান্য স্থানে মধ্যে মধ্যে যে জঙ্গল আছে তাহা কেবল গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল বলিয়া তাহার অস্তিত্ব আছে।

আসামের জঙ্গল কাটিয়া ফেলাই পূর্ব্ববঙ্গের হঠাৎ প্লাবন বৃদ্ধির কারণ। পূর্ব্ববঙ্গে প্লাবনই স্বাভাবিক। তথায় প্লাবন হয় বলিয়াই তথাকার

অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল ও জমি উর্ব্বরা ছিল। এইজন্যই প্রাচীন কালে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী ঐ দেশে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। তথাকার অধিবাসীগণ প্লাবনকে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বলিয়া জানে। হঠাৎ প্লাবনই তথায় ক্ষতিকর। কয়েক বৎসর যাবৎ হঠাৎ প্লাবন পূর্ব্ববঙ্গে দেখা দেওয়ায় শস্যের ক্ষতি হইতেছে। ইহার কারণ আসামে ঝুম প্রথায় পাহাড় অঞ্চলে শস্য বপন ও তাহার ফলে বনানী নষ্ট।

আসামে পার্ব্বত্য জাতিগণ এক এক বৎসর এক এক স্থানে আসিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা যেখানে চাষ করিতে আসে সে স্থানের গাছ পালা কাটিয়া, আগুন দিয়া বৃক্ষ লতা পুড়াইয়া চাষ করে। তাহার ফলে সমস্ত জমিতে আচ্ছাদন থাকে না। বৃষ্টিতে ঐ মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি কমিয়া গেলে পার্ব্বত্য জাতির লোক পুনরায় অপর স্থানে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চাষ আবাদ করে। এইরূপে পাহাড়ের প্রায় সমস্ত স্থানের মৃত্তিকা আচ্ছাদন-হীন হওয়ায় পাহাড়ে চাষ উৎপন্ন দ্রব্য ও উর্ব্বরা শক্তি যেমন কমিয়া যাইতেছে, বনানী ধ্বংস হইয়া তেমনই মানব জাতির অশেষ ক্ষতি হইতে চলিয়াছে। এই প্রথা এযাবতকাল চলিয়া আসিতেছিল তাহার ফলে উত্তরোত্তর জমি আচ্ছাদনহীন হওয়ায় আসামে প্লাবন বৃদ্ধি পাইতেছে। আসামে হঠাৎ প্লাবনের ফলে পূর্ব্ব বাঙ্গালাকেও ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে।

আসামের কৃষক দিবস উপলক্ষে কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ উডফোর্ড আসিয়া পাহাড়ে জঙ্গল কাটা ও ভূমি ক্ষয়ের বিপদ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি তথাকার অধিবাসীদিগকে পাইন বৃক্ষ রোপণ করিতে বলিয়াছেন। গাছ কাটিলে প্রতি ১০পদ দূরের গাছ কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন ও ঘাস অগ্নিতে দগ্ধ করিতে মানা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন এই সকল পরামর্শ কার্য্যে না লাগাইলে খাসিয়া পাহাড়ের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে ও জমির উর্ব্বরতা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে।

বৃষ্টির জন্য, নদী সকল সারা বৎসর যাহাতে জলপূর্ণ থাকে তাহার জন্য, দেশের কৃষি রক্ষার জন্য, মানব জাতির আহার ও পানীয় জল যোগাইবার জন্য দেশের মধ্যে জঙ্গলের প্রয়োজন। বাঙ্গালার প্রত্যেক কৃষকের বৃক্ষ রোপণ করা এবং বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল রক্ষা করা ও তাহা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। এ সকল না করিলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালা দেশের ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হইবে। এখনও বাঙ্গালা দেশে ২০ হাত নীচে কূপে জল পাওয়া যায়। যুক্ত প্রদেশে বনানী নষ্ট করায় কূপের জল ৭০ হাতেরও বেশী নীচে আছে ও তাহা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ঐ প্রদেশের এই অবস্থার প্রতি ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে যাহাতে ঐ অবস্থা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ সকলেরই অবহিত হইতে হইবে।*

*বাংলাদেশের বিশাল অরণ্যানী সমূহ বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করিয়া ফেলায় বৃষ্টিপাতের নিয়ম, সময় এবং গতি এরূপভাবে ব্যাহত হইয়াছে যে পর্য্যায়ক্রমে অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির ফলে বাংলার কৃষি ক্ষেত্রাদি ফসল শূন্য হইয়া পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী প্রবন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সম্প্রতি সঞ্জীবনী পত্রিকায় এ বিষয়ে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। —সম্পাদক।

শিল্প-প্রসঙ্গ

এনামেলের বাসন প্রস্তুত প্রণালী

দরিদ্র ভারতবাসী মাত্রই এনামেলের তৈজসপত্রাদির সহিত পরিচিত। এনামেলের বাসন কোসন মূল্যের দিক দিয়াও সুবিধাজনক, কার্য্যের দিক দিয়াও সুবিধাজনক। সেইজন্যই গরীব গৃহস্থমাত্রই এনামেলের বাসন পছন্দ করে থাকেন। শুধু গরীব গৃহস্থই নয়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকও কলাই-এর জিনিস ব্যবহার করেন। তাঁদের বাড়ীতে ছোটবড় এনামেলের গামলা, বাটি, প্লেট, পেয়ালা ইত্যাদির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বস্তুতঃ এনামেল বাসনের সুবিধা বহু। প্রথমতঃ, এ-জিনিস খুব পরিষ্কার এবং ঝকঝকে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক নাড়ানাড়ি হেঁচড়া হেঁচড়িতেও তা' ভাঙ্গে কম। তৃতীয়তঃ, দরের দিক দিয়ে পিতল কাঁশার বাসন অপেক্ষা এর দাম অনেক সস্তা। শুধুমাত্র গৃহস্থের ঘরেই নয়, হাসপাতালের সরঞ্জাম ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বহু ব্যাপারে এনামেল পাত্রাদি কাজে লাগে। এই সকল কারণে ইহার চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে যিনিই গিয়েছেন তিনিই দেখেছেন যে, কত বিভিন্ন রকমের এনামেলের জিনিসপত্র সেখানে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের দেশে ঐ সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার কী-রকম বেড়ে গেছে। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা সুনিশ্চিত যে, এনামেলের জিনিসপত্র ছাড়া হাসপাতাল সরঞ্জামের কাজের সুবিধা হয় না। অমন ঝকঝকে পরিষ্কার জিনিস আর কিসে পাওয়া যাবে? সেইজন্যই এনামেল দ্রব্যের এত কদর।

এই সকল কারণে এনামেল বাসনের একটা বিরাট বাজার পড়ে রয়েছে। এটা সত্য যে, সেই বাজারের সদ্ব্যবহারের জন্য এদেশে কয়েকটি কারখানা গঠিত হয়েছে কিন্তু তাতে চাহিদা ঠেকানো যায় না। এর প্রমাণ এই যে, জাপান ও অষ্ট্রীয়া থেকে এখনো বহু টাকার মাল আমদানী হয়। সুতরাং এই বিদেশীয় আমদানী বন্ধ করার জন্য এদেশে আরও কয়েকটি এনা-মেলের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। দেশের ধনী ব্যক্তিরা যদি এধারে মনোনিবেশ করেন তাহলে এনামেল শিল্প প্রস্তুতের অনেকটা

সুবিধা হয়। এনামেলের কারখানা স্থাপনের পথে একটা অন্তরায় আছে—সেটি হচ্ছে জাপানী প্রতিযোগিতা। কয়েকমাস পূর্ব্বে 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র পৃষ্ঠায় আমরা জাপানী প্রতিযোগিতার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তাতে এই দেখিয়েছিলাম যে, জাপানী কলাইয়ের বাসন আমাদের বাজারে সস্তায় আমদানীর ফলে দেশীয় কলায়ের বাসনের কারখানাসমূহ ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিম্নে জাপানী দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১৯৩৪-৩৫	৯,৬৩,৮৯২ টাকা
১৯৩৫ ৩৬	১১,০৫,৫২৪ ,,
১৯৩৬-৩৭	৮,৮৩,৫৪৬ ,,

সুতরাং উক্ত তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জাপান থেকে বেশ মোটা টাকার মাল ভারতে চালান আসে এবং সে জিনিষটা সস্তায় বিক্রীত হওয়ার দরুণ ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ হয়। ভারতে এনামেল শিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মূলধন লাগানো আছে, সুতরাং জাপানী প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ হওয়া একটুও বিচিত্র নহে।

এইজন্য এনামেল শিল্পের বিরাট বাজার পড়ে থাকা সত্ত্বেও এ-শিল্পের সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে জাপানী প্রতিযোগিতা এবং এই মারাত্মক প্রতিযোগিতার দরুণ যেখানে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলি রীতিমত ঘা খাচ্ছে সেখানে নতুন কোম্পানী গজিয়ে উঠতে সাহস পায় না। অথচ পূর্ব্বেই বলেছি যে, এ-শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরাপর সমস্ত সুযোগ বর্ত্তমান রয়েছে। কাজে কাজেই এবম্বিধ অবস্থায় এবং এবম্বিধ ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে সংরক্ষণ শুল্ক সাহায্যে দেশীয় শিল্পকে জাপানী প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা। তা' যদি না করা হয় ত একটি দেশীয় শিল্পের প্রতি মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেওয়া হবে। কোন গবর্ণমেন্টের পক্ষেই সে কার্য্য প্রশংসার যোগ্য নয় বা প্রজা-বাৎসল্যের পরিচায়ক নয়।

এইখানে এনামেল জিনিসটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এ জিনিসটা আর কিছুই নয়, শুধু ধাতব পদার্থের উপর এক প্রকার চকচকে পালিসের পুরু প্রলেপ বিশেষ। এ্যাসিড কিংবা ক্ষার পদার্থ এই প্রলেপের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। ভাল এনামেল উত্তাপ লাগলেও ফাটে না। যে এনামেলের সহজে চটা উঠে না সেই এনামেলই লোকে বেশী পছন্দ করে, সুতরাং এনামেল উৎপাদনকারীদের এদিকে নজর রাখা একান্ত উচিত।

এনামেলের যে প্রলেপের কথা উল্লেখ করা গেল তাহা দ্বিবিধ—একপ্রকার প্রলেপ ধাতব পাত্রের উপরে লাগাতে হয়। অপর প্রকার এনামেল পাত্রের উপরিভাগে প্রয়োগ করতে হয়। ইংরাজীতে উক্ত দু' প্রকার প্রলেপের নাম হ'ল যথাক্রমে Ground Enamel ও Cover Enamel। গ্রাউণ্ড এনামেল হচ্ছে আমাদের মূর্ত্তিগঠনের এক-মেঠে কাজের মত। ধাতব পাত্রটী হ'ল তার কাঠামো। কভার এনামেল যেন বাইরেকার রং বিশেষ। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এনামেল পাত্রাদি উৎপাদনের পক্ষে তিনটী জিনিস বিশেষ আবশ্যক—(১) ধাতব পাত্র, (২) গ্রাউণ্ড এনামেল, (৩) কভার এনামেল। ধাতব পাত্র প্রয়োজনানুযায়ী তৈরী করে নিতে হয় কিংবা আমদানী করতে হয়। সাধারণতঃ লোহার জিনিসই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উক্ত পদার্থে গ্রাউণ্ড এনামেল লাগানোর পূর্ব্বে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ধাতব পাত্রকে রীতিমত পরিষ্কার না করে যদি এনামেল লাগানো যায় তাহ'লে শীঘ্র শীঘ্র এনামেলের চটা উঠে যায়। সেইজন্যই ধাতব পাত্রে এনামেল লাগাবার পূর্ব্বে তার গা থেকে সমস্ত ময়লা, গ্রীজ ইত্যাদি পদার্থ তুলে ফেলার প্রয়োজন। পরে পরিষ্কৃত ধাতব পাত্রকে সালফিউরিক এ্যাসিড সলিউসনে ডুবিয়ে অক্সাইড মুক্ত করতে হবে। উক্ত সলিউসনে ১ ভাগ এ্যাসিডে ২০ ভাগ জল থাকা

দরকার। পাত্রটি ১২ ঘণ্টাকাল নিমজ্জিত রাখলেই যথেষ্ট, তবে যদি এই দীর্ঘ সময় নিমজ্জনের পক্ষে কোন অসুবিধা থাকে তাহ'লে এ্যাসিডের ভাগ একটু কড়া করে কম সময়েই কাজ চলে। এ্যাসিড সলিউশন থেকে তুলে নিয়ে ধাতব পাত্রকে ঠাণ্ডা জলে ধুতে হয় এবং তারপর পরিষ্কার বালির সাহায্যে মাজতে হয়। তৎপরে আবার সেই বালি পরিষ্কার করে ফেলে পাত্রটিকে কয়েক সেকেণ্ড গরম জলে ডোবাতে হয় এবং তারপরে তাকে হাওয়ায় শুকোবার পর যখন সেটা একেবারে বাষ্পশূন্য হয় তখন তার ওপর গ্রাউণ্ড এনামেল লাগানো হয়ে থাকে; মুখে বলার দিক দিয়ে এই গ্রাউণ্ড এনামেল লাগানোর ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয় কিন্তু কাজে করতে গেলে সেটা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ খুব অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক না হলে এ কাজ সম্পাদন করতে সমর্থ হয় না—একটু এধার ওধার হ'লে এনামেল চিড় খেয়ে যায়। ঠিক উপযুক্ত উত্তাপে ঠিক রকম ভাবে গালিয়ে ইহা লাগানোর নিয়ম। নিম্নে গ্রাউণ্ড এনামেল প্রস্তুতের ফরমূলা দেওয়া গেল :—

Flint meal	৩১ ভাগ
সোহাগা	১৬·৫ ,,
হোয়াইট লেড	৩·৫ ,,
ছাঁকা মাটি	২৫ ,,
ম্যাগনেশিয়া	৫ ,,

কিংবা

Flint meal	৩০ ভাগ
সোহাগা	১০ ,,
ম্যাগনেশিয়া	৪ ,,
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	২·২৫ ,,
সোডা	১·৭৫ ,,

এর সঙ্গে আরও flint meal (সমস্ত পদার্থের মোট ওজনের শতকরা ১৮ ভাগ) মিশাতে হয়।

উক্ত গ্রাউণ্ড এনামেলের ওপর কভার এনামেল লাগাবার নিয়ম। পূর্ব্বেই বলেছি যে, কভার এনামেল হচ্ছে চক্‌চকে পালিশ বিশেষ এবং গ্রাউণ্ড এনামেলের উপর তা' চড়াবার মাত্রই এনামেল পাত্র পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে। সেইজন্যই কভার এনামেল এতটা প্রয়োজনীয়। নিম্নে কভার এনামেল প্রস্তুতের ফরমূলা প্রদত্ত হল :—

flint meal	৩৫·৫ ভাগ
সোহাগা	২৭·৫ ,,
টিন অক্সাইড	৩০ ,,
সোডা	১৫ ,,
সল্ট্ পিটার	১০ ,,
এ্যামোনিয়াম্ কার্বোনেট্	৭·৫ ,,
ম্যাগনেশিয়া	৭ ,,

উপরোক্ত পরিমাণ দ্রব্যগুলিকে একসঙ্গে গালিয়ে নিয়ে নিম্নপরিমাণ পদার্থগুলি মিশ্রিত করতে হয় :—

flint meal	৬·১২ ভাগ
টিন অক্সাইড্	৩,৬৬ ,,
সোডা	০·৭০ ,,
ম্যাগ্নেশিয়া	০·৭০ ,,

—কিংবা—

flint meal	২৫ ভাগ
পোর্সিলিন্	২৫ ,,
সোহাগা	২৫ ,,
টিন্ অক্সাইড্	২০ ,,
হোয়াইট্ লেড্	২০ ,,
সোডা	১৫ ,,
সল্ট্ পিটার	১১ ,,
এ্যামোনিয়াম্ কার্বোনেট	৭·৫ ,,
ম্যাগনেশিয়া	৬ ,,

উপরোক্ত পরিমাণ দ্রব্যগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে পুনরায় নিম্নলিখিত পরিমাণানুযায়ী পদার্থগুলি যোগ করতে হয় :—

flint meal	৬ ভাগ
টিন্ অক্সাইড্	৩·৭৫ "
সোডা	০·৭৫ "
ম্যাগনেসিয়া	০·৮০ "

আমরা উপরে গ্রাউণ্ড এনামেল ও কভার এনামেল উভয়েরই ফরমূলা প্রদান করিলাম। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে, উক্ত প্রকার এনামেল লাগাবার সময় সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। গ্রাউণ্ড এনামেলের ওপর কভার এনামেল চড়াবার সময় গ্রাউণ্ড এনামেলকে এমনভাবে উত্তপ্ত করতে হয়, যাতে তাপের এতটুকু কমবেশী না ঘটে। তাপের তারতম্য ঘটলে কভার এনামেল ঠিক ধরে না। তাপ ঠিক হয়েছে কিনা জানবার উপায় হচ্ছে গ্রাউণ্ড এনামেলের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নেওয়া। যদি তা' আঠা আঠা হয়ে হাতের সঙ্গে উঠে আসে তাহলে বুঝতে হবে যে, উত্তাপের তারতম্য ঘটেছে। সেক্ষেত্রে আরও খানিকটা flint meal মিশিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কভার এনামেল লাগাবার পর পাত্রকে উনুন থেকে বার করে নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে এটা লক্ষ্যরাখা দরকার যে, এনামেলের উত্তাপ যেন হঠাৎ বেশী থেকে একেবারে কমে না নেমে যায়, কেননা, সেক্ষেত্রে এনামেল চটে যাবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং উনুন থেকে বার করে নিয়ে পাত্রকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করতে হয়।

এই এনামেল ধরাবার ব্যাপারে দেখা যায় যে, কতকগুলি ভাল উৎরেছে, আবার কতকগুলিতে চটা উঠেছে। সেক্ষেত্রে চটাওঠা পাত্রের এনামেল সম্পূর্ণ তুলে ফেলে আবার নূতন করে এনামেল লাগাতে হয়। তাহলে আর কোন জিনিস বাতিল হয় না।

এই হ'ল এনামেল-বাসন প্রস্তুতের সার কথা। আমরা ব্যবসায়ী ও মূলধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এ শিল্পটির প্রতি আকর্ষণ করছি, সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকেও অনুরোধ করছি যে, তাঁরা এই শিল্পটিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করুন।

দুনিয়ার পাটের বাজার হইতে ভারতকে বিতাড়ণের চেষ্টা

ইটালীয় কোম্পানীর পরিকল্পনা

জাপান, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে চটের পরিবর্ত্তে কাগজের ব্যাগ ব্যবহার

পাটের বাজারে এখন ভারতের একচেটিয়া অধিকার। ভারতবর্ষ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোথাও পাটের চাষ কিম্বা পাট উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সম্প্রতি ভারতকে এই একচেটিয়া অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইটালী, আফ্রিকা এবং জাপানে পাট কিংবা পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কোন জিনিষের চাষের ব্যবস্থা হইতেছে। নববিজিত ইথিওপিয়ায় পাট কিংবা পাটের অনুরূপ আঁস বিশিষ্ট কোন গাছ উৎপন্ন করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সম্প্রতি ইটালীর অন্তর্গত মিলানে একটি কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে। আপাততঃ দশ লক্ষ লীরা (ইটালীয় মুদ্রা) মূলধন লইয়া কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। সিনর প্যাটারনো এই কোম্পানীর অন্যতম উদ্যোক্তা। পূর্ব্ব আফ্রিকায় পাট কিংবা পাটের অনুরূপ কোন গাছের চাষের চেষ্টা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোম্পানীর প্রধান চেষ্টা থাকিবে পূর্ব্ব আফ্রিকায় পাট উৎপাদন করিবার দিকে।

মিলানে গঠিত কোম্পানীটির নাম দেওয়া হইয়াছে "কোম্পেনিয়া ডিলা জুটা ই ডি ফাইবার সিমিলার ডি'ইটিওলিয়ো"।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ইটালী বিদেশ হইতে পাট আমদানী করিয়াছে প্রায় ২৩০৭০ মেট্রিক্ (ইটালীয় ওজন), জুন মাসে সেই তুলনায় ভারত হইতে ইটালীতে অপেক্ষাকৃত কম পাট রপ্তানী হইয়াছে।

লাল শণ পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে কিনা দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহার চাষ করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে লাল শণ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর জন্মে। উত্তর ন্যাটালের পথের পাশে পাশে এবং পতিত জমিতে আপনা হইতেই প্রচুর লাল শণ জমিতে দেখা যায়। এই গাছের আঁশ বেশ শক্ত ও মজবুত। ন্যাটালবাসীরা সাধারণ কাজের জন্য ইহার আঁশ দিয়া দড়ি তৈয়ারী করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ কয়েক বৎসর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যথেষ্ট লাল শণের চাষ করা যায় এবং পাটের পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহার করা চলে। পাট গাছ হইতে যেভাবে আঁশ বাহির করা হয় লাল শণ হইতেও প্রায় সেইভাবেই আঁশ লওয়া যায়। উহার চাষের নিয়মও প্রায় পাটচাষের অনুরূপ।

পাটের সহিত তুলনায় লাল শণের বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা চলে যে ইহার আঁশ পাটের মত টেঁকসই হয় না এবং পাটের ন্যায় সস্তা দরে পাটের পরিবর্ত্তে উৎপন্ন করাও সম্ভবপর নহে। ন্যাটালের জল-বিহীন এলাকায় লাল শণের গাছ প্রায় সাত ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। এই শ্রেণীর শণ হইতে বৎসরে দুইবার আঁশ লওয়া চলে এবং প্রতি একর জমিতে এক হইতে দুই টন পর্য্যন্ত শণ হয়।

আজ পর্য্যন্ত ব্যবসায় হিসাবে লাল শণের চাষ করা হয় নাই। ব্যবসায়ীগন যদি বুঝিতে পারে যে এই জাতীয় শণ বাজারে বিক্রয় করা চলিবে এবং উহা হইতে চট তৈয়ারী করা চলিবে তাহা হইলে এজন্য কারখানা তৈয়ারী করিতে ব্যবসায়ীদের বিলম্ব হইবে না।

পাটের পরিবর্ত্তে অপর জিনিষ ব্যবহারের আয়োজন যে শুধু ইটালী এবং আফ্রিকায়ই চলিতেছে তাহা নহে। জাপানে ডাঃ জুনজি টোলি নামক জনৈক রাসায়নিক কাগজের মণ্ড হইতে পাটের ন্যায় আঁশ তৈয়ারী করিয়া ব্যাগ প্রস্তুত করিয়াছেন। জার্ম্মেনীতেও কাগজের মণ্ড হইতে প্রস্তুত সুতার ব্যাগ উৎপন্ন হইতেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত যে তুলা উৎপন্ন হয় পূর্ব্বে তাহা পোড়াইয়া ফেলা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই অপচয় নিবারণ করিয়া তুলা হইতে প্রস্তুত সুতায় ব্যাগ তৈয়ারী করিয়া চটের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে। ব্রেজিলেও অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ে পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ ব্যবহার করিতেছে।

এইরূপে প্রত্যেক দেশই পাটের অভাব ঘুচাইয়া স্বাবলম্বী হইবার জন্য উদগ্রীব। এক মাত্র আমাদের দেশেই এই মূল্যবান জিনিষ দ্বারা নূতন কোন প্রকার জিনিষ তৈয়ারীর চেষ্টা নাই। অথচ সামান্য চেষ্টাতেই হয়তো আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ পাটের নূতন ব্যবহার করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

কৃষির মাসিক জাহিরি

মাঘ মাসের কৃষি

বিলাতী সব্জী এখন যাহা ক্ষেতে আছে তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতেবেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিৎ। লঙ্কা চাষের জন্য মাঠান ও উচ্চ জমি আবশ্যক। উন্মুক্ত ও রৌদ্রওয়ালা জমিতে লঙ্কা ভাল জন্মে। চারা হইবার পর যদি বৃষ্টির অভাব হয় তবে গাছে রীতিমত জল দিতে হয়। মাটি কঠিন হইয়া গেলে জমি কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গাছে ফল দেখা গেলে গাছের গোড়ায় বিট লবণ দিলে ফল বড় এবং অধিক হয়। গাছের গোড়ায় লবণ দিবার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্ষেতে জল সেচন করা আবশ্যক কারণ তাহা হইলে লবণ অচিরে গলিয়া গিয়া গাছের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি দশ সের লবণ লাগে। লবণের সহিত সম পরিমাণ মাটি মিশাইয়া লওয়া উচিৎ।

লঙ্কার আবাদে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব এক জমিতে বারংবার উহার আবাদ করা ভাল না। যদি করিতেই হয় তবে জমিতে উত্তম রূপ সার দিতে হইবে খোঁয়াড় ও গোয়াল বাড়ীর আবর্জ্জনা লঙ্কার জমির উত্তম সার।

বেগুন গাছে চারা অবস্থায় অনেক সময় লোণা লাগিয়া থাকে। ফলতঃ সেই সকল গাছের গোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। লোণার লক্ষণ দেখা গেলে ভাটির চারিদিকে আইল বাঁধিয়া উত্তমরূপে প্রচুর জল সেচন করিতে হয়। মাটি শুকাইলেই মাটির উপরিভাগে লোণা ফুটিয়া উঠে। তেঁতুল বা খৈলের জল দিলে লবণ নষ্ট হইয়া থাকে। চুণের জলেও লবণ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু চুণের ঝাঁজে গাছ মরিয়া যাইতে পারে সুতরাং চুণ ব্যবহার না করাই ভাল।

বেগুন গাছে অনেক সময় পোকার আবির্ভাব হয়। হুকার জল ও ছাই ব্যবহারে উপকার না

হইলে লণ্ডনপর্পল নামক একপ্রকার বিলাতি ঔষধ দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। মাত্র ২।১টী গাছে পোকা ধরিলে উহা তুলিয়া ফেলিয়া পোড়াইয়া ফেলাই ভাল।

আবার বেগুণ গাছেই একপ্রকার পোকা জন্মে। প্রথমতঃ ডিম্বাবস্থায় উহা সবুজ থাকে, পরে কীটের বর্ণ পতঙ্গাবস্থায় ফিকে হয় ও মস্তক কাল রংএর হইয়া থাকে। পাতার নিম্নভাগে কীট আশ্রয় লইয়া ডিম প্রসব করে। গাছের পাতা কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহা কীটাক্রান্ত হইয়াছে।

গাছে এই পোকা দেখা দিলেই অবিলম্বে সেই অংশটী গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিৎ। তীব্র হুকার জলে এই পোকা নষ্ট হয়। ক্ষীণ তেজ বা ফিঁকে "কেরোসিন ইমাল্‌সন" ছড়াইয়া দিলেও এই পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পোকা বিনাশ না করিলে উহা শীঘ্রই ক্ষেতটীকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

শশা করলা তরমুজ প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিৎ। তরমুজ মাঘ মাস হলেই বপন করা উচিৎ। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

প্রচুর জল সেচন করা এবং মাটি খুলিয়া দেওয়া ভিন্ন ভূঁয়ে শশা বা চৈতে শশায় বিশেষ কোন পাট নাই।

একপ্রকার লাল বর্ণ পতঙ্গ শশা গাছের পরম শত্রু। উহাদিগকে বিনাশ করার কোনও উপায় নাই। তবে গাছের গোড়ায় ও পাতায় কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা মাকড় আর যায় না। গাছের গোড়ায় বা তলায় ধোঁয়া দিলে কিছুদিনের জন্য উহা তাড়ান যাইতে পারে। সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যাকালে গাছের গোড়ায় এবং শশার গাছের মাচার তলায় ঘুঁটে বা দোক্তাপাতার ধোঁয়া দিলে পাতায় ধোঁয়া গন্ধ হয়, সেজন্য ঐ পোকা সেদিকে ধাবিত হয় না। কপির ডগা ও কপি পাতাই উহাদের আক্রমণের বিষয় কিন্তু সেগুলি ৫।৬ দিনে পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ থাকে না। পাকা বা শক্ত পাতা উহারা স্পর্শ করে না। নূতন পাতা উঠিলেই তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়া দেওয়াই কীট পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম উপায়।

জোনাকী পোকা তরমুজ গাছের পরম শত্রু। গাছ জন্মিলেই এই পোকা আসিয়া জুটে। প্রথমতঃ উহারা পাতা খায়; ক্রমে তাহারা গ্রন্থী হইতে কাণ্ড পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। তীব্র তামাক অথবা গন্ধকের গুঁড়া অথবা কাঠের ছাই গাছের গোড়া ও পাতার উপর ছড়াইয়া দিলে অনেক পরিমাণে উহারা দমন থাকে। চারাগুলি যতদিন নিতান্ত শৈশব অবস্থায় থাকে ততদিন উহাদিগকে ভয় করিতে হয়। গাছগুলি কোন রকমে ৮।৯টী পাতা বিশিষ্ট হইয়া লতাইতে আরম্ভ হইলে আর তত ভয়ের কারণ থাকেনা। দিনের মধ্যে ২।৩ বার করিয়া উক্ত পোকাগুলি ধরিয়া মারিয়া ফেলিলে অনেক সুবিধা হয়। প্রতি মাদায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সবল ও সুপুষ্ট গাছটী রাখিয়া অপরগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায় একটীর অধিক গাছ রাখা কোন মতেই উচিৎ নয়।

মাদায় পুষ্করিনীর পাঁক, গোয়াল বাড়ীর আবর্জনা ও পোড়ামাটি দিয়া বীজ পুতিলে গাছের বিপুল তেজ হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল হয়।

মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। ক্ষেতে রসা থাকিলে আদৌ জল দেওয়া আবশ্যক হয়না।

খেড়ো, খরমুজ, ফুটি প্রভৃতির আবাদ ও তরমুজের ন্যায় এবং উহার শত্রু (পোকা) ঐরূপে নষ্ট করিতে হয়।

ফলের বাগান।

আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের এই সময় ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরে ও ফুল ঝরিয়া পরে না।

আনারসের গাছের গোড়া এই সময় চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। গোড়ায় ছাই ও পাঁক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার।

আঙ্গুর গাছের গোড়া যদি ইতিপূর্ব্বে খুঁড়িয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে আর বিলম্ব না করিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া উচিৎ।

ফল বাগানের অনতিদূরে তৃণকাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধুঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম এবং ফল ঝরাও নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলের আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পারে এইরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল বড় বড় গাছ পুতিবে সেই সকল স্থানে প্রায় ২ হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটি কিছুদিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটী দ্বারাও তাহার সঙ্গে কতক সাদা মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া খোঁড়া মাটির দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিয়া রাখিবে।

পুরাতন ডালের ফুল ও পিয়ারা ছোট হয় এবং তাহাতে পোকা ধরে, সেইজন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাটা উচিৎ।

কৃষি ক্ষেত্রে

সম্বৎসরের চাষ এই সময়ই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে তাহাতে এই মাসে সার দিবে।

আলু ও কপির জন্য এই সময় পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখিবে।

এইমাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মুলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মুলার আগার দিকের চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিয়া এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া উঠাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হয়। এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর হলুদ ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিয়া শুকাতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুখনা হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার করিয়া দলিয়া দিবে। দলিয়া দিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়।

চীনাবাদাম এই মাসেই উঠাইয়া ফেলিবে।

ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে।

বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাটিয়া দিবে।

শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন আষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্ক, ফ্লাক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপন করিবে এবং শীত কালের যথা গাজর, শালগম, লেটুস, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

হলিহক, পিটুনিয়া, পিঙ্ক, ফ্লাক্স প্রভৃতি কতকগুলি মুরসমি ফুলের এখনও চারা বসাইয়া যত্ন করিলে উহাদের ফুল আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত থাকে। এইসকল গাছে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় উপরে ভালরূপ আবরণ দিয়া রৌদ্রান্তে উহা অপসরণ করিতে হয়। সন্ধ্যাকালে গাছে প্রচুর জল দিতে হয়। যাহাতে মাটি সকল সময় আর্দ্র থাকে সেদিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

হাবড়ায় বাঙ্গালীর দ্বিতীয় চটকল

বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন ব্রাহ্মণ-বেড়িয়ায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন বাঙ্গালী হিন্দুর বেকার-সমস্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আত্মহত্যায় পরিণত হইয়াছে। ভারতের অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা এত প্রবল নহে। ইহার কারণ বাঙ্গালী যে অপদার্থ তাহা নহে। কেবল বাঙ্গালী যুবকগণ ধ্বংস-মূলক কার্য্যের মধ্যে শক্তি পরিচালনা করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছেন। নেতাগণ বর্জ্জননীতি অবলম্বন করিয়াছেন আর যুবকগণ কারাবরণ করিয়াছেন। সেই সুযোগে বোম্বাই ও আমেদা-বাদের চতুর ব্যবসায়িগণ কলপ্রতিষ্ঠা করিয়া ও আমাদিগকে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া লইলেন। গবেষণা করিলে দেখা যায়, বাংলার ইতিহাসবিশ্রুত অর্থ "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী" হইতে আরম্ভ করিয়া মাড়োয়ারী পর্য্যন্ত সকলেই সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক পি, এন, বসু মহাশয় লৌহ-শিল্প প্রতিষ্ঠা ও মালমসলা ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলে আবিষ্কার করিলেন আব ফলভোগ করিলেন পারসীগণ। বাংলার ৯৪টী চটকলের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠটী মাড়ওয়ারী ধনীদের, মাত্র একটী বাঙ্গালীর। এই কলটি হাওড়া জেলাতেই প্রতিষ্ঠিত। রাজা জানকীনাথ রায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। আর একটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে হাওড়ার কদমতলার নিকট সানপুরে। শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই কলটিতে দুই শত তাঁত ও চৌদ্দশত লোক কাজ করিতেছে। তাঁহার নিজ কারখানায় সমস্ত যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের বিষয় নহে। তাঁহার কারখানায় ওজন যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হয়। সাতশত ব্যক্তি ঐ কারখানায় কাজ করে।

শ্রীযুক্ত দাস ১৪ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মুড়ি ফেরি করিতেন ও রাত্রিতে একটী মুড়ির দোকানে চটের উপর শুইয়া থাকিতেন। এই ভাবে কিছুদিন কাজ করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ায় দুইটি মুড়ির দোকান করেন। কিছু-দিন পরে কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ কারখানায় বোঝাই বেলগাড়ী প্রভৃতি ওজন করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইহা প্রথম চেষ্টা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের নিকট হইতে টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন তাঁহারা টাকা চাহিলে ফেরত দিতে না পারায় তাঁহারা কারখানায় চাবী দেন। তিনি লজ্জায় রেঙ্গুন চলিয়া যান। সেখানে তিন বৎসর ব্যবসা করিয়া পুনরায় সঙ্গতিসম্পন্ন হন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া হাওড়ায় কারখানা নির্ম্মাণ করেন।

বাংলার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁহার মত উদ্যোগী বাঙ্গালীর আদর্শ সর্ব্বদা অনুকরণীয়। আশা করি, বাংলার যুবকগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা মোটা থাম পরিবেষ্টিত গগনস্পর্শী সৌধের অন্তরালে থাকিয়া একবার ভাবিয়া দেখিবেন বাঙ্গালী কোন্ পথে।

বিচিত্র বার্ত্তা

২৮ মণ কয়লায় একটি আধুনিক রেল এঞ্জিন মাত্র এক ঘণ্টা চলিতে পারে। ২৮ মণ কয়লার পরমাণুর শক্তি যদি আমরা কার্য্যে লাগাইবার সঠিক প্রক্রিয়া জানিতাম তাহা হইলে উহার দ্বারা সমগ্র ইংলণ্ডের আলো জ্বালাইতে, উত্তাপ দিতে ও শক্তি উৎপাদনে এক দিনে যাহা প্রয়োজন হয় তাহা একশত বৎসর যোগাইতে পারিতাম।

আধুনিক রেল এঞ্জিনে ৩০ হাজার বিভিন্ন অংশ আছে।

একজন লোকের চুল কাটিতে নাপিতকে গড়ে ৭৫০ বার কাঁচি চালাইতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ বহুদূর হইতে রক্তের গন্ধ পায়।

কলিকাতার টালার পরিশ্রুত পানীয় জলের জলাধারে ৯০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে।

জাহাজ হইতে সমুদ্রতলে এক প্রকার লাঙ্গল ফেলিয়া সমুদ্রতলে খাত কাটা হয়, তাহার মধ্যে টেলিগ্রাফের তার ফেলা হয় যাহাতে মৎস্য-জীবিগণ তাহা উঠাইয়া না ফেলিতে পারে।

সকলের বিশ্বাস নদী তীরে যখন কুম্ভীর রৌদ্রতাপ উপভোগ করে তখন বড় রকমের বক তাহার দন্তের পার্শ্ব হইতে পোকা বাহির করিয়া খায়। ইহা ঠিক নহে। ঐ সকল পক্ষী কুম্ভীরের দুই দন্তের মধ্য সংলগ্ন খাদ্যদ্রব্য আহার করে। কুম্ভীর আরামের জন্য মুখব্যাদন করিয়া থাকে।

পৃথিবীতে এক্ষণে যতগুলি বাইসাইকেল আছে তাহা লইয়া এক সারিতে ২৫ জন করিয়া যদি থাকে ও প্রত্যেকে সারির মধ্যে এক গজ ব্যবধান থাকে তাহাহইলে যে এক দীর্ঘ বাহিনী হইবে তাহা লণ্ডন হইতে পারস্যের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পৌছিবে।

আফ্রিকার গোয়াণ্ডু সহরের অধিবাসীর সংখ্যা ১০ হইতে ১৫ হাজার। উহা ডিম্বাকৃতি। সহরের চতুর্দ্দিকে শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য দীর্ঘ বৃক্ষ কাণ্ড সকল প্রোথিত আছে ও প্রত্যেক বৃক্ষের শিরোভাগে একটী করিয়া নরকপাল রক্ষিত আছে। ছয়টি দ্বারের মেজে নর কপাল দ্বারা বাঁধান। প্রতি দ্বার বাঁধাইতে ২ হাজার নর কপাল লাগিয়াছে। প্রত্যহ লোক যাতায়াত করায় নর কপালগুলি পরিষ্কার হইয়া যাওয়ায় বাঁধান স্থানটী শ্বেতবর্ণের।

কেবল যে মানুষই উন্মত্ত হয় তাহা নহে।

সারমেয়, শৃগাল প্রভৃতিও ক্ষিপ্ত হয়। হস্তী ক্ষিপ্ত হওয়ার বিভীষিকা অনেকেই জানে। পক্ষীকেও উন্মত্ত হইতে দেখা গিয়াছে। উন্মত্ত হংস কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন।

চীনের সম্রাটই একমাত্র চীনদেশের পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে পারিতেন। চীনে অপর কাহারও দিন বা মাসপঞ্জী প্রকাশের অধিকার ছিল না। প্রতি বৎসর কয়েক কোটি পঞ্জী বিক্রয় হইত। এই পঞ্জিকা আমাদের দেশের পঞ্জিকার ন্যায় ছিল। ইহাতে নক্ষত্রাদির অবস্থান ব্যতীত দৈনিক কার্য্যের শুভ অশুভ লগ্ন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকিত। আমাদের দেশের ন্যায়ই প্রত্যেক কার্য্য করিবার শুভ ও অশুভ ক্ষণ সম্বন্ধে চীনের অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল।

অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় দক্ষিণ আমেরিকার চিলি প্রদেশে কবির সংখ্যা অধিক।

মানুষের বয়ঃবৃদ্ধির সহিত তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু প্রৌঢ় বয়স হইলে একটি ব্যতীত সকল শরীর যন্ত্রে বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। এই একটি যন্ত্র হইল চক্ষুর স্বচ্ছ পদার্থ। ইহা বয়স বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে প্যারিস সহরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

মহাপুরুষ মহম্মদের সমাধি দর্শন করিতে যাহারা মক্কা গমন করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জাহাজে আরোহণ করিয়া তথায় যান।

বলটিক সমুদ্রে বর্ণহম নামে ডেনমার্ক রাজ্যের অধীনে একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের মাটিতে চুম্বকের ন্যায় শক্তি আছে। ইহার জন্য দিগ্‌-নির্ণয় যন্ত্র সকল সঠিকভাবে উত্তর দিক নির্দ্দেশ করে না। ১০ মাইল দূর হইতে এই শক্তি অনুভূত হয়। দক্ষিণ আমেরিকারও কয়েক স্থানে এরূপ দ্বীপ আছে।

পেরুর সাদার্ণ রেলওয়ের সিকুয়ানে ষ্টেশন প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০৬ ফিট উচ্চ। য়ুরোপে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ রেলষ্টেশন জংশন ১৩৬৬৮ ফিট উচ্চ। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ রেলষ্টেশন স্নোডনে অবস্থিত।

তুরস্কের সুলতানের দন্তে ব্যাথা হয়, তিনি বেদনার ভয়ে দন্ত তুলিয়া ফেলিতে অস্বীকার করেন। তখন আটজন দাসের কসের দন্ত উঠাইয়া ফেলিয়া সুলতানকে দেখান হয় যে দন্ত উৎপাটন তেমন বেশী কষ্টদায়ক নহে। তথাপি সুলতান দন্ত উৎপাটন করিতে রাজী হন নাই।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরে অবস্থিত সহর হইল নরওয়ে রাজ্যের হ্যামারফেষ্ট সহর এবং সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে অবস্থিত সহর হইল চিলি রাজ্যে পাণ্টা এরোনাস সহর।

এরূপ বলা হয় যে বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত মৎস্যপ্রিয়। কিন্তু ইংলণ্ডে ১৯৩৬ সালে ১৫৮১৩০০ হন্দর মৎস্য ধৃত হইয়াছিল। উহার মূল্য ১১৯৩১০০০ পাউণ্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পঙ্গপালের উপদ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কুমীরের সহিত লড়াইতে মহিষ খুব পটু। মহিষ যখন সাঁতরাইয়া নদী পার হয়, তখন কুমীর তাহার কাছেও ঘেঁসে না।

হাতীর ঘাড়ের পেশী খুব জোরাল। এতটুকু ছোট ঘাড়ে শুঁড় সহ অত বড় মাথা ঝুলান আছে।

ময়ূর পুচ্ছে ইন্দ্র ধনুর বিচিত্র বর্ণ কোন রঙ্গীন পদার্থের সংযোগ হেতু নহে। পালকের মধ্যে কৌশলে বিন্যস্ত স্বচ্ছ পরদাতে সূর্য্যকিরণ সম্পর্কই উহার কারণ।

বার্লিন সহরে ঘর বাড়ীর এমন সব দরজা জানালা আছে যে বৃষ্টি অথবা বরফ পড়িতে আরম্ভ করিলে উহা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়।

পশমকে অথবা পশমের সুতা ও কাপড়কে এক ঘণ্টাকাল সালফিউরিল ক্লোরাইড্ সলিউসনে (Sulphuric chloride solution) ডুবাইয়া নিলে উহা আর শেষে জলে ধুইলে ছোট হইয়া যায় না।

রেডিওর সাহায্যে ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ ছাপিয়া লইবার কৌশল আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৮॥০ × ১২ ইঞ্চি পৃষ্ঠার ৩ ফিট করিয়া ঘণ্টায় ছাপা হয়।

মশক এবং সংক্রামক রোগ

জাপানে পাইরেথ্রাম নামে এক প্রকার গাছ জন্মে। এই গাছ চন্দ্রমল্লিকা জাতীয়। এই গাছের রস অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া অগ্নি সংযোগ করিলে যে ধূম হয় তাহাতে মশক দূর হয়। বাজারে জিলাপীর আকারে চীনাদের নির্ম্মিত এই দ্রব্য বহুল বিক্রয় হইতেছে। আমাদের দেশে এই গাছের চাষ করা সম্ভব কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের পাব্লিক হেলথ কমিশনার ভারতের কৃষি বিভাগের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া নিবারক ও সেঁকো বিষ শূন্য কীট ধ্বংসকারী এই পাইরেথ্রাম ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকার কেনিয়াতে এই গাছের চাষ হইয়াছে এবং তাহা হইতে কীট ধ্বংসকারী নির্য্যাস বাহির করা হইয়াছে। ভারতের প্রায় ১২টী স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে যে কীট ধ্বংসকারী উত্তম গুণ বিশিষ্ট পাইরেথ্রাম সুলভে উৎপন্ন করা যায় কিনা।

বাঙ্গলায় মৎস্যের চাষ

বাঙ্গালায় মিঠা জলে মৎস্য চাষের উন্নয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে মিঠা জলের মৎস্যগুলিকে অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করা যায় তজ্জন্য উহার জীবনেতিহাস ও খাদ্যরূপের ব্যবহারের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহ অনুসন্ধানের চেষ্টা চলিতেছে। মৎস্য সম্বন্ধে উপরোক্ত অনুসন্ধানাদি দ্বারা মৎস্যের চাষ কিরূপ লাভজনক হইবে তাহাও যেমন জানা যাইবে, তদুপরি যে সকল মৎস্য মশকের শূক কীট খাইয়া ফেলে, তাহা চাষ করিয়া ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণেও বহু সাহায্য হইবে। অর্থকরী দিক হইতে মৎস্য চাষের এই গবেষণা কার্য্যকরী করিবার জন্য মৎস্যজীবিগণ যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে, গবেষণাগারেও ঐ সকল প্রণালী অবলম্বনের কথা হইয়াছে।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মৎস্য চাষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বঙ্গদেশে মৎস্যের চাষের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মৎস্যের বৃদ্ধি সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা দেশের ইলিশ মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ও মৎস্য হ্রাস বন্ধ করিতে বাঙ্গালায় ডিম্ব ফুটিবার জন্য স্থান সংরক্ষণের জন্য এবং ডিম্ব সহ মৎস্য ধরা বন্ধ করিবার জন্য আইন গঠন করিতে হইবে। বহরমপুরের নিকট ভাগিরথী নদীতে, লালগোলাঘাট ও গোয়ালন্দের মধ্যে পদ্মা নদীতে, সিরাজগঞ্জের নিকট যমুনা নদীতে ও ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনা নদীতে অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে ইলিশ মৎস্যের ডিম্ব ছাড়িবার স্থান। পরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীতে ডিম্বশূন্য ইলিশ মৎস্য পাওয়া যায়। ডিম্ব ছাড়িবার পরে আর বড় ইলিশ মৎস্য এই সকল নদীতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাহাদিগকে সমুদ্রে দেখা যায়। মাদ্রাজের সমুদ্র তীরের নিকট ইলিশ মৎস্য পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় যে ইলিশ মৎস্য মিষ্ট ও লবণ উভয় রকম জলেই বাস করে। উহারা সমুদ্রে বাস করে কিন্তু ডিম পাড়িবার জন্য নদী দিয়া মধ্যে মধ্যে উজাইয়া আসে তাহাতে মিষ্ট জলে বাস করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইলিশ মৎস্য আবদ্ধ মিষ্ট জলে ডিম্ব পাড়ে কিনা তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

বাংলাদেশে মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ হইতে ডাঃ

এম্ আর নাইডু নামক একজন মৎস্য বিশেষজ্ঞকে মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করিয়া আনাইয়াছেন,—কারণ বাংলাদেশে বোধ হয় তেমন পণ্ডিত লোক পাওয়া গেল না! যাহা হউক, বিশেষজ্ঞ মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা দেশে সফর করিয়া যথারীতি এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

"বাঙ্গলা দেশের নদনদীর জল ইলিশ মৎস্য উৎপাদন ও বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী। নদী জলে ইলিশ মাছের ডিম প্রসব ও বাচ্চা পরিপালনের সুব্যবস্থা করিয়া ইলিশ মাছের সংখ্যা প্রয়োজনীয়রূপ বাড়ান চলে। ইলিশ মৎস্য প্রথমতঃ সামুদ্রিক মৎস্য বলিয়া খ্যাত ছিল। উহারা ডিম প্রসবের জন্য সমুদ্রের জল ছাড়িয়া নদী জলে আসিত। ঐরূপভাবে নদীজলে আসিবার হেতু ক্রমে ক্রমে এই মৎস্য নদীজলে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা ও বর্দ্ধিত হওয়ার অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে এক্ষণে উহাকে নদীর জলের মাছ বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভাগীরথী নদীর বহরমপুরের সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে, লালগোলাঘাট হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পদ্মার জলে, যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে এবং ভৈরববাজারের নিকট মেঘনার জলে ইলিশ মৎস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। পুকুর ও বিল প্রভৃতির বদ্ধ জলে ইলিশ মৎস্য ডিম্ব প্রসব করিতে পারে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজনীয়।"

বাংলাদেশের জনসাধারণের নিকট এই সব কি নূতন কথা?

কোন্ প্রাচীন কালে আমাদের দেশের কোন বিশেষজ্ঞ ইলিশ মৎস ধরা বন্ধ রাখিবার জন্য ধর্ম্মের সহিত এই ব্যবস্থার সংযোগ করিয়াছিলেন বলা যায় না। সেইজন্য বিজয়া দশমী হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত ইলিশ মৎস ধরা বন্ধ থাকিত। তাহার ফলে ইলিশ মৎস্য ডিম্ব পাড়িয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পাইত। এক্ষণে চাহিদার জন্য ও অর্থলাভের আশায় হিন্দু ধীবরগণ এই সকল প্রাচীন সুবিজ্ঞ নিয়ম আর মানে না। তাহার ফলে ইলিশ মৎস্যের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এক্ষণে আইন করিয়া ঐ সময়ে ইলিশ মৎস্য ধরা বন্ধ না করিলে বাঙ্গালী এই সুস্বাদু ও কড মৎস্য হইতে অধিকতর পুষ্টিকর ইলিশ মৎস্য পাইবে না।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল

সম্প্রতি বাংলাদেশে যে সকল জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং প্রধান কয়েকটীর নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

কোম্পানীর নাম	মূলধন টাকা	আফিস
ইণ্ডিয়ান ফিশারী য়্যাণ্ড য়্যালায়েড ইনডাষ্ট্রীজ	২০,০০০	৮০ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা
ওরিয়েণ্ট্যাল কমার্শ্যাল কোম্পানী	২ লক্ষ ৫০ হাজার	৫নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
রহিমপুর টী কোম্পানী	৫০,০০০	জলপাইগুড়ী
য়্যাসোসিয়েটেড প্রডাক্‌সান্‌স্‌	২ লক্ষ	১২নং প্রিন্স্ আনোয়ার শা রোড, কলিকাতা
দেশকল্যাণ কটন মিলস্	২০ লক্ষ	ত্রিপুরা
মেদিনী কটন মিলস্	১৫ লক্ষ	মেদিনীপুর
জাহাঙ্গীর নগর কটন মিলস্	১ লক্ষ	১নং নয়াসড়ক রোড, ঢাকা
বেঙ্গল মার্কেটিং করপোরেশন	১ লক্ষ	৫নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১। টাইপ রাইটার ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং লিমিটেড। আফিস্;—১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূলধন একলক্ষ টাকা।

২। ইণ্ডিয়া রাবার ইন্‌ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড্। আফিস,—৫৭ ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা।

৩। ফাইনান্স করপোরেশন, লিমিটেড। আফিস,—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। মূলধন ২০ হাজার টাকা।

৪। গৌরীশঙ্কর অয়েল য়্যাণ্ড রাইস্ মিল্‌স্ লিমিটেড। আফিস,—বীরভূম। মূলধন দেড় লক্ষ টাকা।

৫। ভারত রাবার ওয়ার্কস্ লিমিটেড; আফিস,—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কামারহাটি পোঃ। জেঃ ২৪ পরগণা। মূলধন এক লক্ষ টাকা।

৬। মোহন কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড। আফিস, কলিকাতা। মূলধন ৫০লক্ষ

টাকা। উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় পরিচালিত।

৭। হাবড়া ফাইনান্স লিমিটেড। আফিস ৮নং তেলকল ঘাট রোড; হাবড়া, মূলধন এক লক্ষ টাকা।

—

১। লক্ষ্মী জুট মিলস্ লিমিটেড্। মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। আফিস, ৩০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। নিখালী জুট বেইলিং কোম্পানী লিমিটেড্। মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। আফিস ৮নং রয়্যাল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

৩। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিমিটেড। মূলধন একলক্ষ টাকা। আফিস, কুমিল্লা; ত্রিপুরা।

৪। ইলেকট্রীক্ ল্যাম্প ম্যানুফ্যাক্চারার্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড। মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। আফিস ২৬ নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা।

৫। ইণ্ডিয়া বেল্টিং য়্যাণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড্। মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। আফিস ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। কুমার কেমিক্যাল য়্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্। মূলধন আড়াই লক্ষ টাকা। আফিস ৮নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

৭। ইণ্টার প্রভিন্স্যাল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিমিটেড্। মূলধন ২০ হাজার টাকা, আফিস জলপাইগুড়ী।

৮। বি এইচ্ স্মিথ য়্যাণ্ড কোং লিমিটেড, আমদানী ও রপ্তানীর কারবার। মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। আফিস্ ৪৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট কলিকাতা

—

বাংলাদেশে ৮০ লক্ষ মণ লবণ ব্যবহৃত হয়। তাহা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশেই তৈয়ারী করা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে তদন্ত করিতেছেন। আবগারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রায় সাহেব ডি এন্ মুখার্জ্জি এবং খুলনার বন বিভাগের ডিপুটী কন্সারভেটর মিঃ ভি এস রাও, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বাংলাদেশে যে পরিমাণ লবণের দরকার, তাহার অর্দ্ধেক সুন্দরবন অঞ্চলেই তৈয়ারী হইতে পারে। ব্রহ্মদেশে আংশিক সূর্য্যতাপে এবং আংশিক অগ্নি তাপে লবণ প্রস্তুত হয়। ঐ প্রণালী বাংলাদেশেও অধিকতর সফলতার সহিত অনুসৃত হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। আমরা আশা করি, রিপোর্ট অনুসারী শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

—

বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ মৃৎ শিল্প শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটী নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতায় ক্যানেল সাউথ রোডস্থিত ইন্ডাষ্ট্রীয়্যাল রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরীতে ক্রমান্বয়ে আট মাস কাল শিক্ষার্থীরা কাজ শিখিবে। যে সকল বেকার যুবক জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য শিল্প ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করা হইবে।

—
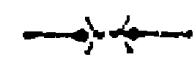
বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত ডাঃ এইচ্ কে সেন (Imperial Institute of Sugar technology) বলেন, পাথরে বাঁধান রাস্তা অপেক্ষা মাৎ গুড়ের মশলায় প্রস্তুত রাস্তা বেশী মজবুত এবং অধিক ভার ধারণে সমর্থ হয়।

ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে ১৫০টী চিনির কারখানায় প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ টন মাৎ গুড় উৎপন্ন হয়। উহার দ্বারা প্রতি বৎসর ৭ হাজার মাইল পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

বোম্বাইয়ের মিল্ ওনার্স য়্যাসোসিয়েসান গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত একবৎসরের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় ভারতে চল্‌তি কাপড়ের কলের সংখ্যা মোট ৩৮০। এই ৩৮০টী কলে এককোটী ২০ হাজার মাকু এবং দুই লক্ষ ২৮৪ টী তাঁত চলিতেছে। বাংলাদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা ২৬ হইতে বাড়িয়া ২৮ হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ হইতে মোট ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৯১ গাঁইট্ পাট রপ্তানী হইয়াছে। (একগাঁইট—৫ মণ)। ইহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৬৪ গাঁইট কলিকাতার বন্দর হইতে এবং ১৬ হাজার ৭২৭ গাঁইট চট্টগ্রামের বন্দর হইতে রপ্তানী হয়। ১৯৩৬ সালে মোট রপ্তানী হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭২৫ গাঁইট এবং ১৯৩৭ সালে রপ্তানী হইয়াছিল ৪লক্ষ ২৭ হাজার ১৩৪ গাঁইট। দেখা যায়, রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

কলিকাতায় প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশম আমদানী হয়। তন্মধ্যে ১৪ লক্ষ টাকার রেশম জাপান হইতে আসে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস ১৫ বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া বয়ন শিল্পে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পানিহাটীতে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী করিবার জন্য "প্রভাতী টেক্সটাইল মিল্‌স" নামে একটী কারবার স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৪শে নবেম্বর উহার কারখানার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়। আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কারখানা গৃহের ভিত্তিস্থাপন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় পৌরহিত্য করেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক ডাঃ বিনয় কুমার সরকার প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। যদিও বর্ত্তমানে কারখানাটী ক্ষুদ্রাকারে গঠিত হইয়াছে, আমরা আশাকরি অচিরে ইহা একটী বৃহৎ কারবারে পরিণত হইবে। বাংলাদেশে ইহাই সর্ব্ব প্রথম কৃত্রিম রেশম শিল্পের কারখানা।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টারগণের এক সম্মেলন হইয়াছিল। রেশম শিল্প সম্বন্ধে নিযুক্ত ট্যারিফ বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম্ আই রহিমতুল্লা উক্ত সম্মেলনের সভাপতি হন। আলোচনায় জানা যায়, গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে নিম্ন লিখিত পরিমাণ কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়,—৪০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠিবার সম্ভাবনা আছে এবং সেই ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের ১২লক্ষ পাউণ্ড বাংলাদেশেই উৎপন্ন হইতে পারে। ভারত গবর্ণমেণ্ট রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে একলক্ষ টাকা মাত্র দিয়াছেন। এই "সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ" সাহায্যে বাস্তবিক কোন ফল হয় না। বাংলা গবর্ণমেণ্ট এখনই রেশম শিল্পের জন্য প্রতি-বৎসর দেড়লক্ষ টাকা খরচ করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী এক লক্ষ টাকার স্থলে তিন লক্ষ টাকার সাহায্য পাইবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ দাবী জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে জাপান গবর্ণমেণ্ট নিজ তহবিল হইতে শতকরা ৬৪ টাকা ঘাটতি দিয়াও জাপানী রেশম ভারতে কাটতি হইবার সুবিধা করিয়া দেন। সেই তুলনায় ভারত গবর্ণমেণ্ট কত পশ্চাতে।

আর্থিক সংবাদ

গত বৎসর যে মাসে ভারতগভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন, পোষ্টাফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা ২॥০ টাকা হইতে কমাইয়া শতকরা ২ টাকা হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সুদের হার আরও কমান যায়। সুতরাং ঠিক হইয়াছে, ১লা ডিসেম্বর হইতে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ১॥০ টাকা হইবে।

শুনা যায়, আসাম গবর্ণমেণ্ট ভূমি রাজস্বের পরিমাণ শতকরা ৫০ টাকা কমাইবার মতলব করিতেছেন। ইহাতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। তাহা পূরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছেন, কৃষি কার্য্য হইতে লাভবান নিম্নতম ২০০০ টাকা আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ইনকম্ ট্যাক্স বসাইবেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতগবর্ণমেণ্টের নগদ তহবিল ছিল ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। তন্মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ১১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, ভারতের বিভিন্ন ট্রেজারীতে ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং লণ্ডনে মজুদ ষ্টার্লিং বাবদ ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।

১৯শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার মধ্যে বোম্বাই হইতে ৩১০৩০৩৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ (বার গোল্ড) বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর এ পর্য্যন্ত ৩২১৯৪২৫৫৯১ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

গত ৯ই নবেম্বর ৩৬নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় "আর্য্যস্থান ব্যাঙ্ক" লিমিটেড স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুত কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক ইহার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।
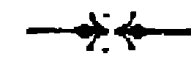
গত ১৯শে নবেম্বর ৭৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা রংমহল বিল্ডিংসে ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিমিটেডের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ সন্তোষ কুমার বসু ইহার উদ্বোধন সভায় সভাপতি হন। গত ৪ঠা নবেম্বর ময়মনসিংহ সহরে ক্যালকাটা কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী ব্রাঞ্চ আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১২ই নবেম্বর ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কলিকাতা ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। ইহার আফিস বসিয়াছে, ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, (কমার্সিয়াল হাউস) কলিকাতা, এই ঠিকানায়।

চট্টগ্রামের সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ কলিকাতায় একটী ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন। ইহাদের আফিস হইয়াছে ৪২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা। ঢাকাতে কম্রেড ব্যাঙ্কের একটী ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্যোগী ঢাকার বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী খানবাহাদুর হাফিজ মহম্মদ হোসেন।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

মিঃ উমাকান্ত এস্ দেসাই এম্ এ, বম্বে মিউচুয়্যালের লাইফ্ য়্যাস্যুর‍্যান্স সোসাইটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ লালজীগোকুল দাস বি এ, এল্ এল্ বি, পদত্যাগ করাতে, তাঁহার স্থলে মিঃ আম্বালাল এস্ পারেখ বি এ, এল্ এল্ বি ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ডাঃ ডি এ ডি'মণ্টির স্থলে মিঃ হোরমারজী এ ওয়াদিয়া ডিরেক্টারবোর্ডের সদস্যরূপে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত অপরেশচন্দ্র বসু স্যাঙ্গুইন ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর এজেন্সী ম্যানেজারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অল-ইণ্ডিয়া মিউচুয়্যাল ইন্স্যুর‍্যান্সের ম্যানেজার পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

৮৪।এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট (কলিকাতা) স্থিত মেসার্স গাঙ্গুলী য়্যাণ্ড্ কোং দিল্লীর সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ইন্স্যুর‍্যান্স্ কোম্পানীর বাংলা বিহার আসাম উড়িষ্যার জন্য চীফ্ এজেণ্ট্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম য়্যাক্মী ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম্ এল চ্যাটার্জ্জি এবং সেক্রেটারী মিঃ এ কে হালদার তাঁহাদের নিজ নিজ পদ ত্যাগ করাতে নূতন ম্যানেজিং এজেণ্ট্ নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ডিরেক্টারগণ স্বয়ং পরিচালনার ভার লইয়াছেন

আমরা অবগত হইলাম, লক্ষ্মী ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে ৭নং এস্প্লানেড্ ইষ্ট, কলিকাতা এই ঠিকানার উহার যে আফিস বাড়ী রহিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ঐ স্থানে একটী ১৫ তলাবিশিষ্ট বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন। আগামী

ফেব্রুয়ারী (১৯৩৯) মাসে এই কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং আশা করা যায় ১৯৪০ সালের মধ্যে উহা শেষ হইবে। এই নব-পরিকল্পিত গৃহের ৪ তলা পর্য্যন্ত লক্ষ্মীইন্‌সুর্যান্স্‌ এবং অন্যান্য কারবারের আফিস থাকিবে। অবশিষ্ট অংশে সাধারণের বাসোপযোগী আধুনিক উন্নত ধরণের এবং নানাবিধ সুবিধাযুক্ত ফ্লাট্‌ নির্ম্মিত হইবে। ইহাই হইবে ভারতের সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ। আমরা এই জন্য লক্ষ্মীইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর পরিচালকগণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পুনার কমনওয়েলথ য়্যাসুর্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস্‌ গত ১লা নবেম্বর হইতে ২৯ নং বেণ্টিক্‌ ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে।

কাউন্সিল অব্‌ ষ্টেটের সদস্য এবং বিখ্যাত জমিদার মাননীয় মিঃ কুমার শঙ্কর রায় বার-য়্যাট্-ল পীয়ারলেস্‌ ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টারবোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

গত ২৭ শে নবেম্বর নয়াদিল্লীতে হিন্দুস্থান কো অপারেটিভের নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ঐ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।

ভারত ইন্‌সুর্যান্সের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ পি সি চ্যাটার্জ্জি সম্প্রতি বিহার ন্যাশন্যাল ইন্‌সুর্যান্সের য়্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

লাহোরের ইষ্টার্ণইণ্ডিয়া ইন্‌সুর্যান্স্‌ কোম্পানী যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ সহরে একটী ব্রাঞ্চ আফিস্‌ খুলিয়াছেন। কলিকাতা ব্রাঞ্চের মিঃ আর আব সাগরকে উহার চার্জ্জ দেওয়া হইয়াছে।

পাটনাতে বেঙ্গল ইন্‌সুর্যান্স য়্যাণ্ড রিয়্যাল প্রপার্টি কোম্পানীর একটী ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। ভারত ইন্‌সুর্যান্সের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ গোরক্ষনাথ সিংহ উহার ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুনাযায়, মিঃ পি ডি খোস্‌লা যে নূতন ইন্‌সুর্যান্স্‌ কোম্পানী করিবেন তাহার নাম হইবে ন্যাশন্যাল ট্রাষ্ট্‌ ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্‌ এবং তাহার হেড আফিস থাকিবে দিল্লীতে।
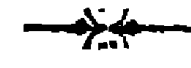
আমরা অবগত হইলাম, মেট্রোপলিটান ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানী কলিকাতার ক্লাইভ রো অঞ্চলে একটী সুবৃহৎ ত্রিতল বাটী খরিদ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বন্যাপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যের জন্য ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ য়্যাসুর্যান্স কোম্পানী এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

কমন্স ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস ২নং চার্চ্চ লেনে উঠিয়া গিয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর হইতে ওরিয়েণ্ট্যাল প্রভিডেণ্ট ইন্‌সুর্যান্স কোম্পানীর হেড আফিস্‌ ১৭নং

ম্যাঙ্গোলেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় আসিয়াছে। ইহার রংপুরের পূর্ব্বতন আফিস এখন হইতে ব্রাঞ্চ আফিস বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা অবগত হইলাম, আলীগড়ের প্রভিডেন্স্যাল ইনস্যুরান্স কোম্পানী এবং লাহোরের গ্লোরী অব ইণ্ডিয়া ইন্স্যুরান্স কোম্পানী, এই দুইটী বীমার কারবার লাহোরের গ্রেট ওরিয়েণ্ট ইনস্যুরান্স কোম্পানীর সহিত শীঘ্রই মিলিত হইবে।

মেট্রোপলিটানের এজেন্সী ইন্স্পেক্টার মিঃ হীরালাল মুখার্জ্জি উক্ত কোম্পানীর চট্টগ্রাম সাব ব্রাঞ্চ আফিসের ম্যানেজার পদে উন্নীত হইয়াছেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন-ষ্টিটিউটের উদ্যোগে বাঙ্গলার দার্শনিক পণ্ডিত বেদান্তরত্ব শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল, পি আর এস্, মহোদয় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের হলে একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবার বনাম ইন্‌সিওরেন্স সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবারে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের প্রভাবে সামাজিক যে সুন্দর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং বর্ত্তমানকালে সেই একান্নবর্ত্তী প্রথার লোপ এবং উচ্ছেদের ফলে আধুনিক মধ্যবর্ত্তী হিন্দুপরিবারের যে অভাব অনটন এবং হাহাকারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার একমাত্র প্রতিকারের পথ যে দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বীমার প্রচার এই বিষয় প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া হীরেন্দ্রবাবু যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গবেষণা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সকলে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সভায় উপস্থিত হন নাই তাঁহারা একটা স্বর্ণ সুযোগ হারাইয়াছেন।

—✤—
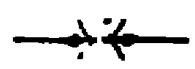
গত ৬ই সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ভাগ্যলক্ষ্মী এবং প্যালে-ডিয়াম এই দুইটী ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টরবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সম-বেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—✤—

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েশনের মুজাফরনগর ও ঝাঁসী ব্রাঞ্চ্‌ বীমার সম্পর্কে ডাক্তারী পরীক্ষার ফিস্‌ কমাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ে ফরিদপুর রাজবাড়ী এবং অন্যান্য-স্থানের ব্রাঞ্চের সহিত একমত। কোন কোন বীমা কোম্পানী একই প্রকার বীমার প্রস্তাব-সংগ্রহ ব্যাপারে গ্রাজুয়েট ও লাইসেন্সিয়েট ডাক্তারদের মধ্যে ফিসের পার্থক্য করিয়া থাকেন। ঝাঁসীব্রাঞ্চ তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

—✤—

মি: প্রশান্ত রায় হিন্দুস্থান-কো অপা-রেটিভের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিউইণ্ডিয়াতে যোগ দিয়াছেন। তিনি উক্ত কোম্পানীর বর্দ্ধমান বিভাগের এজেন্সী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন।

—✤—
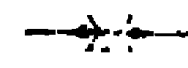
গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে য়্যাসোসিয়েটেড্‌ ইণ্ডিয়া ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ হইয়াছে,—"য়্যাসোসিয়েটেড্‌ ইণ্ডিয়া (প্রভিডেণ্ট) ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড।"

—✤—

মডার্ণ ইণ্ডিয়া ও আর্য্যইন্‌সুর‍্যান্স, এই দুই কোম্পানী মিলিত হইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং আর্য্য ইন্‌সুর‍্যান্স এক্ষণে ১৫৩০০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী ডিপাজট্‌, ১৩৫০৩৩৲ টাকা জীবনবীমা তহবিল, এবং ৫২৯৩৯ টাকা উদ্বৃত্ত সম্পত্তি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

—✤—
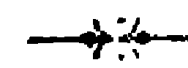
ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল ইনসুর‍্যান্স কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড গত ১০ই আগষ্ট খুলনাতে একটী ব্রাঞ্চ আফিস্ স্থাপন করিয়াছেন। খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসনজজ মিঃ এস্ সেন উহার উদ্বোধন উৎসবে পৌরহিত্য করেন।
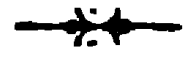
ফরিদপুরের (সালিদা) মেসার্স বসু এণ্ড কোং পুনার ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ ইনসুর‍্যান্স কোম্পানীর বাংলা ও আসামের চীফ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

আর্য্যস্থানের ম্যানেজার এবং ইনসুর‍্যান্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এস্ সি রায় শ্রীরামপুর স্থিত গবর্ণমেণ্ট উইভিং ইনষ্টিটিউটের গবর্ণিং বডির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।
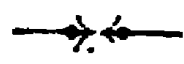
গত ১৯শে আগষ্ট ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েসানের ঢাকা ব্রাঞ্চের উদ্যোগে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ডাক্তারগণ এক সভায় সমবেত হইয়া বীমাসম্পর্কে মেডিক্যাল ফিস্ কমাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন।
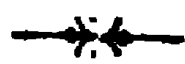
গত ১২ই আগষ্ট ১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট (কলিকাতা) ভবনে গুজরাট লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর একটী চীফ এজেন্সী আফিস খোলা হইয়াছে।

গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতার হুকুমচাঁদ লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর পঞ্চমবার্ষিক উৎসব কোম্পানীর আফিসগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ অ্যাসুর‍্যান্স কোংর রাজসাহী শাখার সেক্রেটারী মিঃ এইচ, পি, চক্রবর্ত্তী গত ২২শে নভেম্বর দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রতিভানাথ রায়কে এক সান্ধ্যসম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করেন। এই সম্মিলনীতে রাজসাহীর এস্, ডি, ও, মিঃ করুণাময় মিত্র, সিভিলসার্জ্জন ডাঃ এস, সি সেন, ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, এন, ভাদুড়ী, কুমার প্রভাত নাথ রায়, কুমার হিমাদ্রীশেখর রায়, জমিদার মিঃ এম, এন, সাহাচৌধুরী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মিঃ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়দিগকে সমাদরে পরিচর্য্যা করেন। সম্মিলনীটি অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

সেয়ারের বাজার ও সেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

বাংলার জনসাধারণ যে অসম্ভবরকমের দরিদ্র সেবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে একদল লোক আছেন যাঁরা কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদি কেনাবেচার ব্যবসা করে থাকেন। অবশ্য হ'তে পারে যে তাঁরা মুষ্টিমেয় ধনী অথবা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক; কিন্তু মুষ্টিমেয় বলেই এই শ্রেণীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, দেশের যা কিছু উন্নতি তা এই ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে সুতরাং মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের যা কিছু সদ্গুণ তার আমরা প্রশংসা করতে বাধ্য। এই মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ই দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রবর্ত্তনে সহায়তা করেছে, তারাই শেয়ারের কেনাবেচা ইত্যাদি করে থাকে—সুতরাং কোন্ রকমের সেয়ার কেনাবেচা করলে লোকের ক্ষতির সম্ভাবনা কম সেবিষয়ে কিছু আলোচনা বোধ হয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আর্থিক জগতের কার্য্যের সুবিধার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই শেয়ার কেনা-বেচার একটি বাজার থাকে যার নাম হ'ল "ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও সেয়ার মার্কেট"—আমাদের বাংলা-দেশেও কলকাতায় ঐ রকম একটি বাজার রয়েছে। উক্ত বাজারে এদেশের বিভিন্ন রকম ষ্টক ও সেয়ারের কেনাবেচা হয়। সাধারণ লোকে এই ভেবে আশ্চর্য্য হয় যে, নানান্ রকম জিনিসপত্তর বেচবার বাজার দেখেছি কিন্তু সেয়ার বেচবার আবার বাজার কি রকম? তাদের অব-গতির জন্য এটা জানানো যেতে পারে যে, এ বাজার সাধারণ বাজারের চেয়ে আরও বিচিত্র। কল্‌কাতার একটি প্রাসাদতুল্য বাড়ীর একতলায় হ'লে এ বাজার বসে—হলখানির বাইরের ও ভিতরের মনোহারিত্ব অতীব চমৎকার। হলে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, শুধুমাত্র রেজিষ্টার্ড দালালরা, ষ্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বাররা ও তাঁদেরই সাঙ্গপাঙ্গরা এখানে ঢুকতে পান। হলখানির বাইরে রাস্তার দুপাশে অসম্ভব গাড়ীর ভীড়—গাড়ীগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, তাদের দরজা কাটা। গাড়ী বা মোটর বাড়ীখানার সামনে লাগতে না লাগতেই সেই চলন্ত গাড়ীথেকেই কাটা দরজা দিয়ে লোকগুলো লাফ দেয়, তারপর একদৌড়ে হলের মধ্যে পড়ে। তাদের সেই অবস্থায় দেখলে মনে হয় এক সেকেণ্ডের মধ্যে বুঝি বা তাদের হাজার হাজার টাকা লোকসান হয়ে যাবে। লোক পরম্পরায় শুনেছি যে, উক্ত ব্যক্তি যদি মাড়োয়ারী হয় তাহ'লে সে দৌড়ে গিয়ে ক্রেতা বা

বিক্রেতার গায়ে 'লেও, দশ আনা" বলে এমন এক চাপড় মারে যাতে সাধারণ লোকের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তাদের কিছুই হয় না। উক্ত 'লেও, দশ আনা বা বার আনা বা চৌদ্দ আনার' মানে হ'ল যে অত টাকা অত আনায় সে কিন্‌তে বা বেচতে রাজী আছে। ক্রেতা বা বিক্রেতা যদি তাতে রাজী হয় ত উভয় ব্যক্তির মধ্যে তখন আবশ্যকীয় কণ্ট্রাক্ট বা চুক্তিপত্র সই হয়ে যায়।

সাধারণ বাজার তবুত পদে আছে কিন্তু ঐ সেয়ারের বাজারের মত ক্রয় বিক্রয়ের স্থান পৃথিবীতে বিরল। ঐ রকম প্রাসাদসম বাড়ী তার মধ্যে ভদ্র পোষাক পরিচ্ছদ পরিহিত ব্যক্তিদের গতাযাত, বাড়ীর সামনে দামী দামী মোটরের আসর:—কিন্তু হলের ভেতরকার যে চীৎকার তা' সাধারণ মেছোহাটাকেও হার মানায়। উঃ, সে কি কলরব! গেঁয়ো-লোক যদি তার সামনে দিয়ে যায় ত নিশ্চয়ই

ভাববে যে, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। আমাদের সাধারণ বাজারেও এ চীৎকার হয় কিন্তু এখেন তার দশগুণ। পাঠকবর্গ অবাক হয়ে ভাবতে পারেন যে, সেয়ার কেনাবেচায় এত চীৎকার কিসের জন্য? তার জবাবে বলা চলে যে, যারা চলন্ত গাড়ীথেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়তে পারে তারা যে চীৎকার করবে এ আর বিচিত্র কি? ব্যাপার হচ্ছে যে, ৫০০ বা ১০০০ লোক যেখানে "কেয়া ভাও" "কেয়া ভাও"? (কি দর?) বলে একসঙ্গে রব তোলে সেখানে যে একটা উচ্চ গোলমালের সৃষ্টি হবে তাতে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? শুধু কি তাই? এর ওপর সেই 'লেও দশ আনা,' 'কামার হাটি চলা যাতা চৌদ্দা—চৌদ্দা,' 'হাওড়া এগারো,' আরে কেয়া দেখ্‌তা ডিভিডেণ্ড ট্রয়াল্‌ভ হাফ, 'ছে আনামে ক্লোজ,, প্রভৃতি অপরূপ বাণীর সংযোগে যে সুর কল্লোল উত্থিত হয় তাতে শুধু দ্বিপদী মানুষ কেন চতুষ্পদী জীবদেরও লজ্জা পাবার কথা। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার এই যে, সেথার বাজারের লোকেরা এতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করে না। এছাড়াও আরও বিচিত্র ব্যাপার আছে—সেটা সুরের সংঘর্ষ নয়, দেহের সংঘর্ষ। গাড়ী থেকে লাফ মেরে যারা তীরবেগে ছোটে তাদের তখন দিগবিদিক জ্ঞান থাকে না, মাথায় তাদের তখন হয়ত ঘুরছে 'বরাকর এগারো আনা।' সুতরাং এক্ষেত্রে কজনের সঙ্গে যে তারা ধাক্কা খায় তার ঠিক নেই। দৃশ্যটী কল্পনা করবার মতই বটে! হয়ত একজন মাড়োয়ারীর বিরাট জালার মত ভুঁড়ির মধ্যে একজন শীর্ণকায় ব্যক্তি একেবারে আছড়ে পড়ল—অন্য সময় হলে হয়ত এবম্বিধ ব্যাপারে দু'জনের হাতাহাতি হবার উপক্রম ঘটত কিন্তু তখন কাজের ব্যস্ততার মধ্যে কেউ সেধারে খেয়াল করলে না; কিংবা হয়ত কোন সাহেবের পালিশকরা চকচকে বুটের ওপর কোন কর্দ্দমাক্ত জুতা এসে ঠেকলো, তখন কিন্তু সেধারে কারও লক্ষ্য করবার অবসরই নেই, মুখ দিয়ে সামান্য 'সরি' (sorry) বাক্য পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় না। হলের বাইরের দৃশ্য আরও চমৎকার! রাস্তার দু'ধারে লোকের ভীড়, যারা ভেতরে ঢুকতে পায় না তারা এইখানে জনতা করে; এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা রেজিষ্টার্ড দালাল নয় কিংবা উক্ত দালালদের কোন জানাশুনা লোক নয়, অথচ তারা ফাঁকতালে টুকটাক কাজ করে। এই সমস্ত ব্যক্তি রাস্তার দু'পাশে ভীড় জমায় এবং মাঝে মাঝে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে দরজা জানালা দিয়ে হলের ভেতরে উঁকি মারে। এদের মধ্যেও ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির বিরাম নেই। সমস্তটা মিলিয়ে যেন একটী মেছোহাটার বাজারই। তফাৎ এই যে, প্রাসাদসম বাড়ী, ভদ্রবেশ, ভদ্র পরিস্থিতি ইত্যাদি বর্ত্তমান রয়েছে আর সেয়ার ও ষ্টকের লেনদেন চলেছে—শুধু যেন কেবল কাগজের কারবার।

এই হলো সেয়ারের বাজারের বাহ্য দৃশ্য। পাঠকগণের মনে এইবার এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে ঐ বাজারে কি হয়? এতই বা ভীড় কেন ও যায়গায়? প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা সাধারণ লোকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। ষ্টক ও শেয়ার বাজারে যারা ঘোরে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দালাল। ক্রেতা বা বিক্রেতার দল খুব কমই সেখানে হাজির থাকে। সেয়ারের দালালী করা একরকমের উপজীবিকা এবং বহুলোক একাজে লিপ্ত আছে। সাধারণ বাজারে

যেমন কেনাবেচা হয় উক্ত বাজারেও ঠিক সেইরকম কেনাবেচা হয়ে থাকে তবে তফাৎ এই যে ক্রেতা-বিক্রেতা নিজেরা এখানে অধিকাংশ সময় হাজির থাকে না, দালালদের দ্বারাই সব কাজ হয়ে থাকে এবং এ-বাজারে আলু-পটল মাছ ইত্যাদি বিক্রী হয় না—সেই আলু-পটল-মাছ উৎপাদনকারী কোম্পানীর সেয়ার বিক্রী হয়ে থাকে।

এই সেয়ার বিক্রয়ের ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা যাক্। বাংলাদেশে এই শিল্প প্রসারতার প্রারম্ভিক যুগে সেয়ার জিনিসটার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত; কেননা, মাঝে-মাঝে কাপড়ের কল, চিনির কল, নুনের কল, প্রভৃতির সেয়ার গছাবার জন্য দালালেরা বাড়ীতে এসে ধর্ণা দেয়। অবশ্য এই সমস্ত দালালের সঙ্গে সেয়ার বাজারের দালালের কোন সম্পর্ক নেই। তারা কোম্পানীর নিযুক্ত দালাল এবং ঐ সমস্ত সেয়ারের সঙ্গে সেয়ারের বাজারেও তখনও কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। কোন কোম্পানী খুলতে যদি পাঁচ লক্ষ টাকার মূলধন প্রয়োজন হয় তাহলে সে-টাকাটা একজনের কাছ থেকে আদায় করা কষ্ট হয়ে পড়ে কিন্তু সেটা যদি একশো জনে চালিয়ে দেয় ত কারও কিছু গায়ে লাগে না। তাছাড়া একজনের প্রাইভেট কোম্পানীর ফ্যাসাদ অনেক, কোম্পানী যদি ফেল মারে ত ভিটেমাটি একেবারে পাওনাদারের ডিক্রীর চোটে উচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই জন্যই পাঁচজনকে নিয়ে লিমিটেড কোম্পানী খোলবার ব্যবস্থা রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

কয়লার খবর

১৯৩৭ সালের সরকারী রিপোর্ট

ভারতীয় খনিসমূহের ইন্সপেক্টর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৩৭ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে জানা যায় যে, গত বৎসরের শেষভাগে সকল কয়লা খনিতেই কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ও শ্রমিক নিয়োগ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে মজুরীর হার ও কয়লার দর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৫ সালে প্রায় ২ কোটী ২৫ লক্ষ টন কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে এবং তাহার মূল্য প্রায় ৭ কোটী টাকা। ১৯৩৬ সালে ১৭॥ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা ৮'৫১ ভাগ কয়লা বেশী উত্তোলিত হইয়াছে। উহার মূল্য বাবদ ১॥ কোটী টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৪'৮২ টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে।

বৃটিশ ভারতে গত বৎসরে কোন স্থানে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

প্রদেশ	টন
আসাম	২৪৩,৬৫০
বেলুচিস্থান	১০,৬২
বাংলা	৬,৫ ৭,৮২০
বিহার	১৩,৮৩৫,৫১৬
মধ্যপ্রদেশ	১,৫০৪,১৫৯
উড়িষ্যা	৩০,১২৭
পাঞ্জাব	১৭৬,৬৩২
মোট	২২,৬৩৫,৫২৮

ঝরিয়া, বোকারো, কারণপুরা এবং আসামের কয়লাখনিগুলিতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রাণীগঞ্জ, গিরিডি এবং পেঞ্চ উপত্যকার খনিগুলিতে ও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গড়ে প্রত্যেক শ্রমিক কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটী

হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ টনে প্রদত্ত হইয়াছে :—

	জমির নিম্নে	উপরে ও নিম্নে
বৃটিশ ভারত	১৮৯	১৩১
বাংলা ও বিহার	১৯২	১৩২
আসাম	১৬৯	১১৭
বেলুচিস্থান	৪২	৪
মধ্যপ্রদেশ	১৭৫	১২৬
উড়িষ্যা	১৯৮	১৪৬
পাঞ্জাব	১১০	৬৯

উড়িষ্যা ও বেলুচিস্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থনে গড়ে প্রত্যেক শ্রমিকদের কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালে শ্রমিক প্রতি কয়লা উত্তোলন গড়ে সংযুক্ত রাজ্যে ২০৮ টন, জাপানে ২০৭, ফ্রান্সে ২১০, জার্ম্মানী ৩১১ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৬৭১ টন হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে খনি হইতে প্রায় কোটি টন অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৭½ লক্ষ টন কয়লা অধিক প্রেরিত হইয়াছিল। বিদেশে রপ্তানী হইযাছিল ১৮ লক্ষ টন। ১৯৩৬ সলে রপ্তানীর পরিমাণ ১৭ লক্ষ টন।

কয়লার চাহিদা খুবই ছিল এবং প্রয়োজ-নানুযায়ী কয়লা সরবরাহ না করিতে পারায় বৎসরের শেষভাগে কয়লার মূল্য বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় খনির মালিকেরা সিংহল গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের কয়লা সরবরাহ ঠিক মতই করিতে-ছেন।

যন্ত্রের আবশ্যকতা

কয়লার মূল্য বৃদ্ধি ও মজুরী হ্রাসের জন্য কয়লা খনিসমূহে বিদ্যুৎ ও কয়লা কাটিবার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বাদার বাজারে এই যন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ৫০টী খনিতে বিদ্যুতের সাহায্যে ১৪০ যন্ত্রের কাজ চালান হইয়াছে এবং এইজন্যই ঐ বৎসর কয়েকটী খনিতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোন কোন খনিতে যন্ত্রের বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কয়লার ন্যায় আলোচ্য বৎসরে ম্যাঙ্গানিজও অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে যথাক্রমে ৬¼ লক্ষ ও ৮ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। উত্তোলিত লৌহের পরিমাণও অনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৬ সালে প্রায় ২৩ লক্ষ টন ও ১৯৩৭ সালে প্রায় ২৬ লক্ষ টন লৌহ পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে খনির উপরিভাগে, অভ্য-ন্তরে ও অন্যান্য বিভাগে কার্য্যনিরত মোট স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিকের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

	পুরুষ	স্ত্রী
খনির অভ্যন্তরে	১১৮,১২০	৩,৮৮
বাহিরে	১৮,২৬৮	২৪,৪৭৯
খনির উপরিভাগে	৫২,৩৮৭	১৯,৯১৭
মোট	২১৯,৫৭৫	৪৮,২৮৩

ভূগর্ভে ৩৮৮৭ জন নারী শ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কয়লার খনির মধ্যে শতকরা ৩'৭৯ জন নারী শ্রমিক কাজ করে। ভূগর্ভে যে সকল নারী শ্রমিক কাজ কবে, প্রদেশ হিসাবে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রদেশ	কঃ খনি	লঃ খনি	মোট সংখ্যা
বাংলা	১৩৫২	"	১৩৫২
বিহার	১,৮৫	"	২১৮৫
মধ্যপ্রদেশ	৩৩৫	"	৩৩৫
উড়িষ্যা	"	১৫	"
পাঞ্জাব	"	"	১৫
মোট সংখ্যা	৩৮৭২	১৫	৩৮৮৭

গড়ে দৈনিক ১৭১১৪৯ জন লোক কয়লার খনিতে কাজ করে। ১৯৩৬ সালে যত জন লোক কাজ করে আলোচ্য বর্ষে তাহা অপেক্ষা ১৭১১৪৯ জন লোক বেশী কাজ করে।

১লা অক্টোবর হইতে ভূগর্ভে নারীশ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হওয়ায় দুইটী প্রধান কয়লা খনিতে শ্রমিক সমিতি কর্ত্তৃক মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন হয়। অধিকাংশ কয়লার খনিতে ঝুড়ি প্রতি দুই আনা হইতে তিন আনা মজুরী বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। ১লা অক্টোবর হইতে যখন খনিতে নারী শ্রমিকের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখন কোথাও কোনও প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় নাই।

কিন্তু নারী শ্রমিকের কার্য্য নিষিদ্ধ করিবার প্রায় একপক্ষকাল পরে ঝরিয়ার একটী বৃহৎ কয়লার খনিতে আংশিক ধর্ম্মঘট হয়। আবার একটী খনিতেও প্রায় ৩০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে এবং পরে তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইলে ধর্ম্মঘটের অবসান হয়। যে সকল নারী শ্রমিকের ভূগর্ভের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহাদের অনেককে কয়লার খনির অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস

আলোচ্যবর্ষে ২০০টি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে এবং ২৪ জন লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৩৬ সালে ২১৪টী দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ৪৭৪ জন মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

মারাত্মক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার কারণ সমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	মারাত্মক দুর্ঘটনার সংখ্যা	মারাত্মক দুর্ঘটনার শতকরা হার
দুঃসাহস	১৩৬	৬৫'৩৯
মৃত ব্যক্তির ত্রুটি	২৯	১৩'৯৪
সহকর্ম্মীর ত্রুটি	৯	৪'৩৩
নিম্নতম কর্ম্মচারী বর্গের ত্রুটি	১৭	৮'১৬
উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব	১৬	৭'৬৯
দোষযুক্ত ব্যবহার্য্য সামগ্রী	১	৩'৪
মোট সংখ্যা	২০৮	১০০'০

মারাত্মক দুর্ঘটনার দরুণ ১১৫৬ জন আহত লোকের মধ্যে ৮৭ জন সারাজীবনের জন্য অক্ষম হইয়াছে এবং ১০৬৯ জন অল্পকালের জন্য কার্য্য-ক্ষম ছিল।

রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা খনি সমূহে স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল ছিল বলিয়াই জানা যায়।

আসানসোলের খনিসমূহের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সাধারণ অধিবাসী-গণের মৃত্যুর হার অপেক্ষা কয়লার খনি অঞ্চলের অধিবাসীবর্গের মৃত্যুর হার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা-ও কম ছিল।

পক্ষী পালন

ডিম্ব ও ডিম্বজাত পণ্যের ব্যবসায়ে ভারতের সুযোগ সুবিধা

ডিম সংরক্ষণের উপায়

ভারতবাসীর পক্ষে নূতন ব্যবসা ক্ষেত্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

ডিম্ব ও ডিম্বজাত পণ্যের ব্যবসায়ে এতকাল চীনাদের দুনিয়ার বাজারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু জাপানের সহিত যুদ্ধের ফলে চীনের সেই ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হইতে চলিয়াছে। এই সুযোগে ভারতীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ চীনের ডিম্বের ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট অধিকার বিস্তার করিতে পারে।

চীনের বাহির হইতে এই ব্যবসায় চালান সম্ভবপর কিনা ব্যবসায়ীগণ তৎসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ডিম্ব ও ডিম্বজাত ব্যবসায়ে চীনের প্রধান বাজার ইউরোপ। চীনের বর্ত্তমান অসুবিধার সুযোগে ভারতের ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসায় হাতে করিতে পারেন। ইউরোপের বাজার ভারতের অপেক্ষাকৃত নিকটতর হওয়ায় এই ব্যবসায়ে ভারতীয়দের বিশেষ সুবিধা হইবারই সম্ভাবনা।

ডিম্বজাত দ্রব্যাদি শুষ্ক এবং তরলরূপে বড় বড় হোটেল, রুটি বিস্কুটের কারখানা ইত্যাদি স্থানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আইসক্রীম চাটনি, বিস্কুট কেক ইত্যাদিতেও ব্যবসায়ীবৃন্দ প্রচুর ডিম্ব ব্যবহার করিয়া থাকেন! ডিম্বের শ্বেতাংশ পরিষ্কার করা, চামড়া ট্যান করা, আঠা প্রস্তুত এবং ফটোগ্রাফের ফিল্ম প্রস্তুতের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গ্রেট বৃটেন ডিম্বজাত দ্রব্যের একটি খুব বড় বাজার! সেখানে ডিম্বের কুসুম এবং তরলীকৃত ডিম্ব খাদ্য দ্রব্যাদিতে ব্যবহৃত হয় এবং শ্বেতাংশ ব্যবসায়ীগণ কারখানার কাজের জন্য কিনিরা লয়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সেই বৎসর লণ্ডনের বাজারে চীন হইতে আমদানি জমাট ডিম্ব বিক্রয় হইয়াছে প্রতি টন ৪৮ পাউণ্ড ৬

শিলিং হিসাবে। আমদানি শুল্ক সহ প্রতি টন ডিম্বের মূল্য ছিল ৫২ পাউণ্ড।

বর্ত্তমানে ভারতের বাজারে একশত মুরগীর ডিম্ব (২২০টা হিসাবে একশত ধরা হয়) বিক্রয় হয় ৩ শিলং ৩পেনি মূল্যে এবং ১২০টি ডিম্বের ওজন হয় দশ পাউণ্ড। এই ওজন হইতে শতকরা ১১ ভাগ খোলার ওজন রূপে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এই হিসাবে ভারতের বাজারে খোলা ছাড়া মুরগীর ডিম্ব প্রতি টন বিক্রয় হয় ৪০ পাউণ্ড ৬ শিলিং হিসাবে। হাঁসের ডিম (১২০টি) ভারতের বাজারে বিক্রয় হয় ৩ শিলিং ১ পেনি দরে এবং খোলার ওজন বাদ দিয়া প্রতি টন হাঁসের ডিমের দর পড়ে ৭ পাউণ্ড ৭ শিলিং।

ইহার উপর ডিম্ব জমাট করিবার ও বিদেশে চালান দিবার ব্যয় পড়ে প্রতি টনে অনুমান ৫ পাউণ্ড। অতএব দেখা যায় ভারতবর্ষ হইতে চালানী মুরগীর ডিম্ব লণ্ডনের বাজারে পৌছাইয়া দিতে ব্যয় পড়ে প্রতি টনে ৪৮পাউণ্ড ৬ শিলিং এবং জমাট হাঁসের ডিম পৌছাইয়া দিতে প্রতি টনে ব্যয় পড়ে ৩৫ পাউণ্ড ৭ শিলিং। অতএব দেখা যায় চীন হইতে রপ্তানি ডিম্বের তুলনায় ভারত হইতে জমাট মুরগীর ডিম্বের রপ্তানীতে প্রতি টনে ৪ পাউণ্ড ৭ শিলিং

৪ পেনি এবং হাঁসের ডিম্বে ৭ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৪ পেনি কম ব্যয় পড়ে।

এই হিসাব করিলে দেখা যায় যে কারনায় প্রতিদিন দুই টন হিসাবে মুরগীর ডিম্ব ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় ডিম্ব কিনিলে উহার প্রতি বৎসর তিন হাজার পাউণ্ডের অধিক বাঁচিয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া হাঁসের ডিম ব্যবহার করিলে ব্যয় সংক্ষেপের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। অতএব দেখা যায় ভারতে এই শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। ভারতে হাঁস পালনের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে হাঁস পালনের ক্ষেত্রে হাঁসের সংখ্যা ৫০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত।

ডিম্ব জমাট করিতে কিংবা শুখাইতে হইলে কারখানা ও যন্ত্র পাতির প্রয়োজন। প্রতিদিন দুই টন ডিম্ব জমাট করিয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা যাইতে পারে, এইরূপ একটী কারখানা স্থাপনের ব্যয় পড়ে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা। যদি কোন বরফের কারখানার মালিক এই ব্যবসায়ে হাত দেয় তবে কারখানা স্থাপনের ব্যয় আরও কম পড়িবে। প্রতিদিন দুইটন হিসাবে ডিম জমাট করিতে হইলে দৈনিক ৬০ হাজার টাটকা মুরগীর ডিম অথবা ৪৫০০০ হাঁসের ডিমের প্রয়োজন। কারখানার মালিক যদি উক্ত পরিমাণ ডিম্ব দৈনিক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন হইতে ডিম্ব সরবরাহের ব্যবস্থা অনায়াসে করা যাইতে পারে।

ডিম্ব শুষ্ক করিবার কারখানা স্থাপনে কত ব্যয় পড়ে তাহা বলা সম্ভবপর হয় নাই। তবে এটুকু বলা যাইতে পারে যেহেতু এজন্য ডিম জমাট করিবার প্রয়োজন হয় না তজ্জন্য মনে হয় কারখানা স্থাপনের ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম পড়িবে। সাধারণ অবস্থায় ডিম চালান দেওয়া সম্বন্ধেও একথা বলা চলে।

ভারতে এইরূপ কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে ডিম্ব বাছাই, ডিম সংগ্রহ এবং কারখানা পরিচালনার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

ভারতে ডিম্বের ব্যবহার

ভারতবাসী কি পরিমাণ ডিম্ব খাদ্যরূপে ব্যবহার করে এবং ডিমের ব্যবহারের কিরূপে উন্নতিসাধন করা যায় নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা অনেকটা উপলব্ধি হইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ৩৫ জন ভারতবাসী যে পরিমাণ ডিম্ব খাদ্যরূপে গ্রহণ করে কানাডার একজন মাত্র অধিবাসী সেই পরিমাণে ডিম্ব খাইয়া থাকে। পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ ডিম্ব খাদ্যরূপে গ্রহণ করে খুব বেশী পরিমাণে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় সেই বৎসর জনে সিদ্ধ ডিম্ব লাগিয়াছিল আইরিশ ফ্রী ষ্টেটে ২৮৩, কানাডায় ২৬০, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৩৬, বৃটেনে ১৫৮, জার্ম্মেনীতে ১১৫, এবং ডেনমার্কে ১৪৬ পাউণ্ড হিসাবে।

ভারতের অধিকাংশ লোক নিরামিশাষী। এদেশে প্রতি বৎসর গড়ে মানুষ পিছু ডিম্ব ব্যবহার হয় ৮টী করিয়া। বিভিন্ন প্রদেশ হিসাবে দেখা গিয়াছে কোন কোন প্রদেশে বৎসরে গড়ে মাথা পিছু মাত্র একটি ডিম্ব এবং কোন কোন দেশে ২২টি পর্য্যন্ত ডিম্ব খাদ্যরূপেও গৃহীত হয়।

ভারতের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরে ডিম ব্যবহৃত হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেখানে ডিম উৎপন্ন হয় প্রচুর এবং বৎসরে গড়ে মাথা পিছু ডিম ব্যবহৃত হয় কিঞ্চিদধিক ২৪টি। রাজপুতানা ও পশ্চিম

ভারতের অধিবাসীগণ ডিম্বব্যবহার করে খুব কম। হিসাবে বৎসরে তাহাদের মাথা পিছু একটি করিয়াও ডিম পড়ে না, অবশ্য এই অঞ্চলের লোকসংখ্যাও খুব কম।

ভারতে মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, শিখ, পার্শী বা উপজাতীয়গণই খাদ্যরূপে ডিম ব্যবহার গ্রহণ করে সমধিক। ইহাদের সংখ্যা ভারতের মোট অধিবাসীর সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মাত্র। হিন্দুরা সাধারণতঃ ডিম খায় না। কিন্তু পল্লী এবং নগরবাসী ভেদে ডিমের ব্যবহার কম বেশী হয়।

পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাওলপিণ্ডি এবং মুলতান বিভাগের অধিবাসীগণ ডিম্ব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। সেখানে প্রতি বৎসর গড়ে মাথা পিছু ডিম্ব ব্যবহৃত হয় প্রায় ৮৭টী। পাঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলে, আম্বালা এবং কাঙ্গারা প্রভৃতি জেলায় ডিম্ব খুব কম ব্যবহৃত হয়। সেখানকার লোক প্রতি বৎসর মানুষ পিছু গড়ে ১৯ টির অধিক ডিম খায় না।

দিল্লী প্রদেশে মোট অধিবাসী হিসাবে সহর এলাকায় মাথা পিছু গড়ে ডিম ব্যবহৃত হয় ৭টি এবং পল্লী অঞ্চলে হয় মাত্র ২ টি। যাহারা ডিম খায় তাদের হিসাব ধরিলে মাথা পিছু ব্যবহৃত হয় সহরে ৫৩টী এবং পল্লী অঞ্চলে ১৬টী।

ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডিম ব্যবহৃত হয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে। সেখানে সহরবাসীরা গড়ে মাথা পিছু ডিম খায় ১৪১টী এবং পল্লী-বাসীরা ৪৫২টী। মাদ্রাজে দুই তৃতীয়াংশ লোক এবং বাংলার সহর অঞ্চলের প্রায় অর্দ্ধেক লোক ডিম খাইয়া থাকে। নিজাম রাজ্যে হায়দ্রাবাদ সহরে প্রতি বৎসর গড়ে মাথা পিছু ডিম ব্যবহৃত হয় ৭৮ টি।

তাজা রাখিবার উপায়

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল ব্যবসায়ী ব্রহ্মদেশে ডিম চালান দেয়, তাহারা দুই তিন মাস পর্য্যন্ত ডিম তাজা রাখিবার জন্য এক চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে চালানী সমস্ত ডিমই এই উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়।

এই সকল ব্যবসায়ীদের ডিম সংরক্ষণের একমাত্র উপায় ডিমকে গোলা চুণের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা। অনেক সময় চুণের সহিত মাটি এবং লবণও মিশান হইয়া থাকে! ব্যবসায়ী-গণ সাধারণতঃ মুরগীর ডিম সংরক্ষণের জন্যই এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

চুণের গোলা প্রস্তুত করিবার জন্য সাধা-রণতঃ সাধারণ চুণ অথবা শামুক পোড়া চুণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। প্রধানতঃ চট্টগ্রাম দৌলতগঞ্জ, কোকনদ এবং মাদ্রাজ প্রভৃতি যে সকল স্থান হইতে ব্রহ্মদেশে ডিম রপ্তানী করা হইয়া থাকে সেই সকল স্থানের ব্যবসায়ীরা ৩ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট দীর্ঘ এবং ২ ফুট গভীর করিয়া পাকা চৌবাচ্চা তৈয়ারী করে এবং তাহাতে জলে ও চুণে মিশাইয়া চুণের গোলা করে। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা কাল চুণ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ২৫০০ডিম রাখা যায় এইরূপ একটি টিন চুণের গোলায় পূর্ণ করিতে ১২।১৩ সের চুণের প্রয়োজন হয়। চুণে এরূপ পরিমাণ জল দিতে হয় যাহাতে

চুণ সম্পূর্ণ গলিয়া গিয়া মাখনের ন্যায় নরম হয়। অনেক সময় চৌবাচ্চায় চুণ গুলিয়া সেইখানেই ডিমের গায়ে কাদা চুণ মাখান হয় এবং কাদা চুণ সহ রপ্তানীর জন্য টিনে ভরা হয়। ডিম টিনের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাইয়াও উহার উপর কাদা চুণ ঢালিয়া দিলে চলে। টিন চুণের কাদায় পূর্ণ হইলে উহা ঢাকিয়া পাঠালেই হইবে।

এই উপায়ে ২০০০০ ডিম সংরক্ষণের ব্যয় গড়ে মাত্র এক টাকা। এই টিনগুলি ব্রহ্মদেশে পৌছিতে পৌছিতে অভ্যন্তরস্থ চুণ শুষ্ক ও জমাট হইয়া যায়। ডিমবিক্রেতরা টিনে জল ঢালিয়া চুণ গলাইয়া ফেলে এবং প্রয়োজন মত ধীরেধীরে ডিম বাহির করিয়া লয়। চুণের গোলায় ডুবান ডিম দেখিতে ধবধবে সাদা হয় এবং কাঁচা থাকায় তাহার স্বাদেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু রন্ধন করিলে এই ডিম উহার নিজস্ব স্বাদ ফিরিয়া পায়।

কৃষি তত্ত্বের কথা
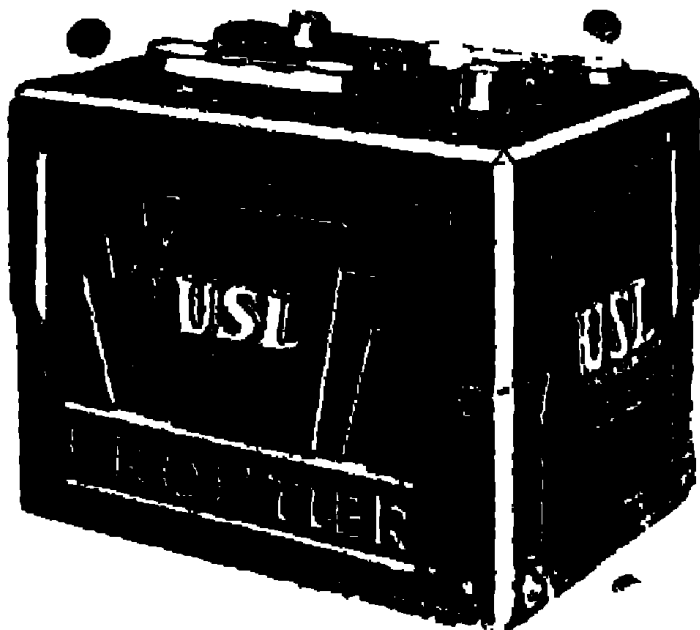
বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্য উৎপাদনের অভিনব পন্থা

বিজ্ঞানে অনেক গবেষণা সাধিত হইয়াছে। আমরা প্রতিদিন সেই সংবাদ পাইয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি কার্য্যের যে প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে 'ট্রেইনী কেমিষ্ট' সেই সম্বন্ধে অভিনব খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বারকোষ বা থালায় কৃষি কার্য্য করা ততটা অত্যাধুনিক না হইলেও তাদৃশ পুরাতন নহে।

সম্প্রতি ঐ প্রণালীর কৃষিকার্য্যের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহাতে কৃষিকার্য্যের সহিত ভূমির যে মাতৃত্ব সম্বন্ধ আছে তাহার ব্যত্যয় ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা হইয়াছে। আজকাল ঐ প্রণালীতে যে শস্য উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে কোন কোন দেশে শাকশব্জি এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার চাহিদা মেটাইবার সমস্যারও কথঞ্চিত পরিমাণে সমাধান করা হইয়াছে। অথচ একদিন রাসায়নিক গবেষণায় হঠাৎ বৃক্ষাঙ্কুরের উৎপত্তি সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে এই প্রণালীটী উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

কেহ কখন এ আশাটা করেন নাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের মধ্যে যে সত্য উদ্ভাসিত হইল এ ভাবি সেদিন শুধু মাত্র সফলতা বা তৃণাঙ্কুরের খোরাক নহে পরন্তু ভবিষ্যতে কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্যই উৎপন্ন করিবে, সেদিন বিশ্ববাসীর বিশ্বাস করা ছিল না। তারপর খ্রীষ্টাব্দের প্রথম 'রাসায়নিক কৃষি' নামে পরিচালনার ফলে আজ কোন কোন দেশে ঐ প্রণালীতে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যে বাজারের চাহিদা পর্য্যন্ত মেটান হইতেছে।

বিগত ১৯২৯ সালে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম গারিকি সর্ব্বপ্রথম এই প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তৎপরে ৭ বৎসর গবেষণার ফলে তিনি কালিফোর্ণিয়াবাসীদিগকে তাঁহার শিল্পশালায় উপজাত টমেটো সরবরাহ করিয়াছিলেন। এই প্রণালীতে আজকাল আরও বহু শাকশব্জি উৎপন্ন হইতেছে। এমনকি ধান্য প্রভৃতিও উৎপন্ন হইতেছে।

বর্ত্তমানে দুইটি উপায়ে 'খঞ্চিয়া কৃষি' পরিচালিত হইতেছে। প্রথমতঃ ডাঃ গারিকির প্রণালী। ওই প্রথায় শস্যের বীজ অঙ্কুরিত হইবামাত্র ঐ গুলিকে একটি তারের জালের বারকোষে রাখিয়া এক প্রকার রাসায়নিক জলে রাখিয়া দিতে হয়। ক্রমে অঙ্কুর ক্ষুদ্র চারাগাছে রূপান্তরিত হইলে চারা গাছের অঙ্কুরগুলিকে কেবলমাত্র রাসায়নিক জলে রাখিতে হয়। মধ্যে (অন্ততঃ প্রতি দুই দিনে একবার) চারাগাছগুলিকে বায়ু সেবন করাইতে হইবে। শস্যের কালপ্রাপ্ত হইলে গড়ে সাধারণ ভূমিজাত কৃষির তুলনায় এই রাসায়নিক প্রণালীতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অধিক ছাড়া কোন অংশেই ন্যূন হইবে না।

দ্বিতীয় প্রণালী। প্রথমোক্ত প্রণালীতে লতা গুল্ম ও তৃণাদির শিশুর বায়ুসেবনের যে অসুবিধা বিদ্যমান তাহা বিদূরীত হইয়াছে। এই নিয়মে প্রথমে বালুকা, ছাই বা ভস্ম অথবা ঝামার মধ্যে বীজ বপন করা হয়। তৎপরে যে পদার্থে বীজ উপ্ত হইল তাহাতে শস্যের তরল রাসায়নিক খাদ্য ঢালিয়া সিক্ত করিয়া দিতে হইবে। বালুকা ঝামারগুঁড়া ও ভস্মাদিতে সচ্ছিদ্র পদার্থ থাকায় সহজেই ঐ রাসায়নিক দ্রব্য শুষিয়া লইবে এবং শস্যের অঙ্কুরও আবরিয়া রাখিবে। বাতাস সহজেই তথায় বিচরণ করিতে পারিবে। আর অপটুহস্তে বালুকা প্রভৃতির মধ্যে রাসায়নিক দ্রাবক ঢালিবার ফলে বেশী পড়িয়া গেলে তাহাও অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য খঞ্চিয়া বা বারকোষের নীচে একটি পাত্র রাখিয়া দিলেই ঐ পাত্রে দ্রাবক চোলাই হইয়া পড়িয়া যাইবে। এই প্রকারে যতদিন শস্য উৎপন্নের কাল পূর্ণ না হয় ততদিন পুনঃপুনঃ রাসায়নিক দ্রাবক ঢালিয়া দিলেই চলিবে।

খঞ্চিয়া চাষের সুবিধা

সহর অঞ্চলে প্রায়ই কর্ষণোপযোগী ভূমির অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ অত্যাধিক মূল্যেই অনেক সময় 'টাট্‌কা' শাক শব্জি পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। সেই ক্ষেত্রে এই প্রণালীতে শস্য উৎপাদন করিলে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হইয়া যাইবে।

তবে স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে যাবতীয় বৃক্ষ লতা গুল্মাদিই কি এই প্রণালীতে চাষ করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহাতে শাক শব্জি উৎপাদনই সমধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। টমেটো, আলু, কপি, বিন, শশা, প্রভৃতি এই প্রণালীতে ভালই উৎপন্ন হয়। সর্ব্বপ্রকার পুষ্পই চাষ করা যাইতে পারে। যে সকল ফলের গাছ গৃহমধ্যে নাড়াচাড়া করা কষ্টসাধ্য তাহাও 'খঞ্চিয়া চাষ' প্রণালীতে চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে বেশ 'তেজালো' গাছে পরিণত করিতে পারা যায়। তবে একেবারেই সকল প্রকার চাষে হাত দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন পর্য্যন্ত সকল প্রকার গাছের খাদ্য ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কাজেই এক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহারে সকল প্রকার চাষ আরম্ভ করা বিপজ্জনক। সুফলও না পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তবে বিজ্ঞানের যে ভাবে উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে এই অসুবিধা বিদূরীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।
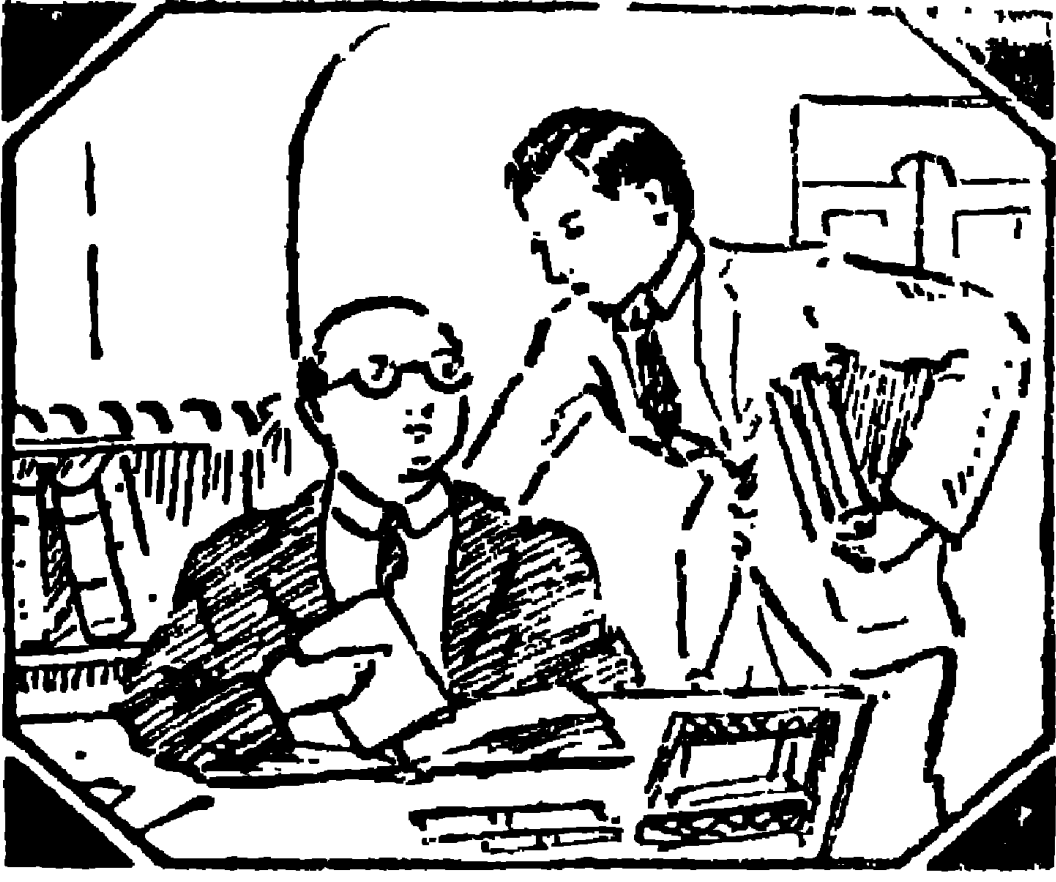
কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সুর‍্যান্স্ সোসাইটী লিমিটেড্

গত ১০ই ডিসেম্বর শনিবার হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর অংশীদিগের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় মারা যাওয়ায় তাঁহার স্থলে অন্য একজন ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হ'ন। ইহা ছাড়া পূর্ব্বের বোর্ডের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কোম্পানীর কার্য্যের পরিমাণ বিশেষরূপ বাড়িয়া যাওয়ায় অডিটর মেসার্স রায় এণ্ড রায় এর পারিশ্রমিক বৎসরে পাঁচশত টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনারেবল্ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের স্থলে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কোম্পানীর সেক্রেটারীর কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট, ব্যালান্সসীট ইত্যাদি অনুমোদন ও গ্রহণ করিবার মন্তব্য উপস্থিত করিলে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়। অংশীদিগের পক্ষ হইতে তিনি কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং কর্ম্মীদিগকে ধন্যবাদদান করেন।

১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট ঃ

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

নূতন কারবার ঃ—

আলোচ্য বৎসরে সোসাইটী ৪০৭৩৭২৫৮ টাকা মূল্যের ২৫৩০০টী নূতন বীমার প্রস্তাব প্রাপ্ত হন। ৩০৭১১১৩০ টাকা মূল্যের ১৯২৪৮টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা নূতন কারবারে পলিসির সংখ্যা ১৬০১ বাড়িয়াছে এবং বীমার পরিমাণ ২৩৪৭৬৮০ টাকা বাড়িয়াছে। পুনর্বীমার পরিমাণ ২৪১৯৯৪ টাকা। নূতন কারবারের দরুণ বার্ষিক প্রিমি-

মাম আয় (পুনর্বীমা বাদে) হইয়াছে ১৪৮৩৫৬৫ টাকা।

হিন্দুস্থানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা—

অনারেবল মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার

মোট মজুত বীমা :—

আলোচ্য বৎসরের শেষে মোট মজুত বীমার পরিমাণ দেখা যায় ৮৮৫৫৩ পলিসিতে (বোনাস্-সহ) ১৪৬০৯৭২৯৪ টাকার বীমা। ইহার মধ্যে পুনর্বীমা করা আছে ৮৮৪০০৮ টাকা। এই সকল পলিসির মধ্যে ভারতের মধ্যে ৮৫০৯৩ এবং ভারতের বাহিরে ৩৪৬০টী পলিসি আছে। ভারতে বীমা করা আছে (পুনর্ব্বীমা বাদে)

১৩৭৭৮৩৩০১ টাকা এবং ভারতের বাহিরে **বীমা করা আছে (পুনর্ব্বীমা বাদে)** ৭৪২৯৯৮৫ টাকা।

আয় ব্যয় ঃ—

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবতে আয় হইয়াছে ৬৯৬১৪৭৬ টাকা (পুনর্ব্বীমা বাদ)। সুদ পাওয়া গিয়াছে (ইন্‌কম্ ট্যাক্স বাদ) ৯৮১১৭১ টাকা। খরচের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

দাবীশোধ (মৃত্যুজনিত)	১০৬৯৭০৩	টাকা
দাবীশোধ (মেয়াদ শেষজনিত)	৮৯২৭৮৩	,,
সারেণ্ডার	৩২৮০৮	,,
পরিচালনা ও বীমা		
সংগ্রহের খরচ	২০৮৪৪৫৪	,,
কর্ম্মচারীদের অতীতকার্য্যের		
পুরস্কারের ব্যবস্থা	৭৫০০০	,,
কর্ম্মচারীদের প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ড্	১৭১৬৬	,,
লগ্নীর মূল্য হ্রাসের দরুণ		
রিজার্ভ্	৬৫০০০	,,

জীবনবীমা তহবিল ঃ—

উপরি উক্ত খরচ বাদে বৎসরের শেষে জীবন বীমা তহবিলে ২৬৭৮৩০৫৩ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। বৎসরের আরম্ভে এই জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৩১৯৭৯৪৭ টাকা।

সম্পত্তি ও দায় ঃ—

সোসাইটীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৯৭৩০২১২ টাকা। তন্মধ্যে ভূমিসম্পত্তি বন্ধকী ঋণ ৫৫৫০২৬১ টাকা, পলিসিবন্ধকী ঋণ ২৮৫৮৯৬৩ টাকা, অন্যান্যঋণ ৫৩১০৪ টাকা। গবর্ণমেণ্ট্ লোন, শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিবিধ সিকিউরিটীতে লগ্নী আছে মোট ১০৯৬৮১২৬ টাকা। ভারতীয় বাড়ী সম্পত্তির মূল্য ৩২৯৭৩৬২ টাকা। ভারতীয় ভূমি সম্পত্তির মূল্য ৩৩৮৫০৫৬ টাকা। প্রিমিয়াম বাকী ৯৬৭৬৭৫ টাকা।

সোসাইটীর আদায়ী মূলধন ৩৯১৬১০ টাকা। কম্বাইণ্ড্ শেয়ার ৫৪৮২৫ টাকা। বিভিন্ন ফাণ্ড্ ব্যতীত অন্যান্য দায় ৫৬৬১৫২ টাকা। কম্বাইণ্ড্ পলিসিকে সাধারণ পলিসিতে পরিবর্ত্তিত

হিন্দুস্থানের হেড্ অফিস বিল্ডিং

করার খরচের জন্য ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ভ্যালুয়েসন ঃ—

১৯৩৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে পঞ্চবর্ষ শেষ হইয়াছে তাহার ভ্যালুয়েসন রিপোর্ট আলোচ্য বৎসরের ভিতরেই পাওয়া গিয়াছে। উহা সকল দিকেই সন্তোষজনক দেখা যায়। অধিকাংশ বীমার পদ্ধতিতে নীট্-প্রিমিয়াম প্রণালীকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া ভ্যালুয়েসন করা হইয়াছে। উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে মেয়াদী বীমায় ১৮ টাকা এবং আজীবন বীমায় ১৫ টাকা হিসাবে বোনাস্ দেওয়া হইয়াছে। এই বোনাসের পরিমাণ পূর্ব্বেকার বোনাস্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। তাহার কারণ এই যে সুদের হার শতকরা ৪॥০ টাকা হইতে শতকরা ৪ টাকা ধরা হইয়াছে।

খরচের অনুপাত ঃ—

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৯.৯ টাকা খরচ হইয়াছে। ১৯৩৬—৩৭ সালে ইহার পরিমাণ ছিল শতকরা ৩১.১ টাকা।

অংশীদারগণ ঃ—

এখনও অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ট পান নাই। তাহাদের হিসাব হইতে ৩৩০৫০ টাকা কন্টিঞ্জেন্সি ফাণ্ডের জন্য ছাড় দেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে যাহাতে অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ট পাইতে পারেন, ডিরেক্টরগণ সেই ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের মন্তব্য

অংশীদিগের মধ্যে অনেকে এবং যাহারা হিন্দুস্থানের হিতাকাঙ্খী তাঁহারাও আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে বাংলাগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব রূপে কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র হইতে নলিনীবাবুর অনুপস্থিতির দরুণ উহার কার্য্যের এবং কার্য্যপ্রসারের বিশেষ ক্ষতি হইবে—এমন কি নলিনীবাবুকে হয়ত মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির মানস পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু নলিনীবাবু সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে আমি যাহাকে আমার স্থলে বসাইয়া যাইতেছি তিনি যে কি ধাতুতে গড়া জনসাধারণ শীঘ্রই তাঁহার পরিচয় পাইবেন। নলিনীবাবুর মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধবাদীরা কোম্পানীটিকে ধ্বংস করিবার জন্য দিনের পর দিন sledge hammering সুরু করিয়াছিল—প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রাদির মাসাধিককাল ব্যাপী প্রবল প্রচেষ্টাও প্রপ্যা-গাণ্ডার ফলে চারিদিকে "হিন্দুস্থান গেল গেল" রব হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের উপরদিয়া সে যে বড় রকম ভূমিকম্প গিয়াছে তাহার তুলনা ভারতীয় বীমার ইতিহাসে কেহ কখনও দেখে নাই। সেই আন্দোলনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নলিনীবাবু এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদিগের সহায়তায় fact figures এবং statisties সম্বলিত যে সত্যের আগুণ জ্বালিলেন তাহার মুখে পড়িয়া সকল

হিন্দুস্থানের সেক্রেটারী

মিঃ নরেন্দ্র নাথ দত্ত

মিথ্যার অভিযান এবং অলীক আন্দোলন পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। আন্দোলন থামিল বটে, কিন্তু তাহার aftermath তখনও যায় নাই। এই অবস্থার মধ্যে মন্ত্রীত্বগ্রহণের জন্য নলিনীবাবুর অতর্কিতে ডাক পড়িল; সুতরাং হিন্দুস্থান সম্বন্ধে উদ্বেগ আশঙ্কা শূন্য হইয়া তিনি যাইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় নরেন্দ্রবাবুর হাতে তরী পরিচালনার ভার পড়িল। নরেন্দ্রবাবুকে যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন এরূপ একজন অল্পভাষী অথচ মিষ্টভাষী ধীর, স্থির, বিচক্ষণ, নম্র, বিনয়ী অথচ কর্ত্তব্যে দৃঢ়, Bulldog tenancity সম্পন্ন লোক সচরাচর দেখা যায় না। ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে Taste of the pudding is in the eating। বাংলায় তাহার অনুরূপ প্রবাদ আছে। বৃক্ষের গুণ ফলেন পরিচীয়তে নরেনবাবুর কৃতিত্ব এবং সাফল্য তাঁহার কাজের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। তাহার কার্য্যকালে কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার এবং প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ খরচের হ্রাস করিয়া আসিতেছে। আমরা এই সাফল্যের জন্য অংশী এবং সম্পাদক হিসাবে নরেন্দ্রবাবুকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং লোক বাছাই করিবার অসাধারণ ক্ষমতার জন্য নলিনীবাবুকেও ধন্যবাদ দিতেছি।

হিন্দুস্থানের চেয়ারম্যান কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক মহাশয়ের অভিভাষণ

সোসাইটীর বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক মহাশয় যে অভিভাষণ করেন তাহার সার মর্ম্ম এই,—

দেশের আর্থিক দুরবস্থা এখনও দূরীভূত হয় নাই। ইহার মধ্যেও হিন্দুস্থানের নূতন বীমার পরিমাণ যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সাড়ে তেইশ লক্ষ টাকা বাড়িয়া তিনকোটীর উপর উঠিয়াছে, ইহাই হিন্দুস্থানের ক্রমোন্নতি এবং কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়। হিন্দুস্থান তাহার পলিসি হোল্ডারদের যথার্থ সেবা ও উপকার করিতেছেন; হিন্দুস্থানের পরিচালনা মিতব্যয়িতার উপরে এবং ইহার গঠন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইসকল কারণেই হিন্দুস্থান দিন দিন জনসাধারণের অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

প্রিমিয়াম আয় পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৭½ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। সোসাইটী কিরূপ মূল্যবান বীমা সংগ্রহ করেন, তাহার প্রমাণ এইখানেই পাওয়া যায়। মেয়াদ শেষ পলিসির বোনাস্ বাবতে সোসাইটী একলক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন। এইসকল পলিসিতে যে পরিমাণ টাকা বীমা করা হইয়াছিল, তাহার উপর শতকরা ১৮ টাকা হিসাবে বীমাকারিগণ অতিরিক্ত পাইয়াছেন। হিন্দুস্থানের পলিসি কিরূপ লাভ জনক, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

আলোচ্য বৎসরে বোনাস্ ব্যতীত মৃত্যুজনিত দাবী দিতে হইয়াছে দশ লক্ষ দশ হাজার টাকা। পূর্ব্ববৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। সোসাইটীর কারবার প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়াতেও মৃত্যুজনিত দাবী বিশেষ বাড়ে নাই। বাস্তবিক ভ্যালুয়েশন রিপোর্টেও দেখা যায় যে, সোসাইটীর কারবার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হার বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিশেষ সন্তোষজনক হইতেছে।

পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা আলোচ্যবৎসরে খরচের অনুপাত শতকরা ১·২ টাকা কমিয়াছে। সোসাইটীর নূতন কারবার যে পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং নূতন নূতনস্থানে সোসাইটীর কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে খরচের অনুপাত কিছু বৃদ্ধি পাইলেও আশঙ্কার কারণ ছিল না। সে স্থলে খরচের অনুপাত যে কমিয়াছে, তাহা সোসাইটীর পরিচালনকৃতিত্বেরই পরিচয়। জীবন বীমা তহবিলও ৩৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে লাভজনক এবং নিরাপদ লগ্নীর পন্থা পাওয়া কঠিন। তদুপরি নূতন বীমা আইনের ফলেও অনেক বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। গতবারের বক্তৃতায় আমি একথার ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। দিনের দিন এই সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সোসাইটীর সমস্ত লগ্নীই গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে। আলোচ্য বৎসরে তাহার পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। এইজন্য সোসাইটীর অর্জ্জিত সুদের হারও হইয়াছে কম। সম্প্রতি সোসাইটী কলিকাতা করপোরেশনের এলেকার মধ্যে এক বৃহৎ জমি

ক্রয় করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার আশে পাশে এবং অন্যত্র জমি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা সোসাইটী যেরূপ লাভবান হইয়াছেন, ইহাতেও সেইরূপ লাভ করিতে পারিবেন আশা করা যায়। কলিকাতা করপোরেশনের এলেকার মধ্যে আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ নিজে বাড়ী করিয়া বাস করিতে পারেন না। তাহা বহু ব্যয় সাধ্য। "হিন্দুস্থান" তাঁহাদের জন্য অল্পব্যয়ে বাড়ী পাইবার ব্যবস্থা করিবেন। সুবিধারকম কিস্তিতে অল্পে অল্পে টাকা পরিশোধ করিয়া তাঁহারা একখানি বাড়ীর মালিক হইতে পারিবেন। সোসাইটী যে টাকা এই কারবারে মূলধন স্বরূপ নিয়োজিত করিবেন, তাহাও ক্রমশঃ উঠিয়া আসিবে।

নূতন বীমা আইনের ফলে লগ্নী বিষয়ে যে, ধরা বাঁধা কড়াকড়ি হইয়াছে, তাহাতে সকল কোম্পানীই অল্পবিস্তর অসুবিধায় পড়িবেন। হিন্দুস্থানের পক্ষে, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই

হিন্দুস্থানের চেয়ারম্যান—

কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক

আইনের নির্দ্ধারিত শতকরা ৫৫ টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নীকরা হইয়া যাইবে। তার পর অবশিষ্ট শতকরা ৪৫ টাকা সোসাইটী নিজের পছন্দমত সুবিধাজনক সিকিউরিটীতে স্বাধীন ভাবে লগ্নী করিতে পারিবেন।

১৯৩৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সোসাইটীর পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশন হইয়াছে। তাহাতে সোসাইটীর সকলদিকেই উন্নতি এবং উহার আর্থিক অবস্থার দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্যালুয়েশনে প্রকাশ, সোসাইটীর মোট উদ্বৃত্ত হইয়াছে, ৩৬১৫০৫৯ টাকা। অর্জ্জিত সুদের হার কম হওয়াতে এবং রিজার্ভ তহবিলকে অধিকতর পরিপুষ্ট করাতে সোসাইটী পূর্ব্বের মত উচ্চ হারে বোনাস্ দিতে পারেন নাই।

কম্বাইণ্ড পলিসির দরুণ অংশীদারদের যে দায়িত্ব ছিল, তাহা যদিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাঁহাদিগকে ডিভিডেণ্ড দিবার মত অবস্থা এখনও সোসাইটীর হয় নাই। শীঘ্রই এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে আশা করা যায়। তখন অংশীদারগণ নিশ্চয়ই লভ্যাংশ পাইবেন। এবারে তদর্থে অংশীদারদের হিসাব হইতে ৩৩ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে "হিন্দুস্থানের" নিজের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের আইন সদস্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সেই উৎসবে পৌরহিত্য করেন। সোসাইটীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার বাংলা গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিবের পদে নিযুক্ত হওয়ায় দীর্ঘকালের ছুটী নিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ হইতে সোসাইটী কখনও বঞ্চিত হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি সোসাইটীর কার্য্যপরিচালনার জন্য আফিসে ও বাহিরে যে সকল নিয়ম প্রণালী এবং কর্ম্ম কৌশল প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণ সফলতা লাভ করিতেছেন।

মহাবীর ইনস্যুরান্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৮ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব ও রিপোর্ট।

হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন কারবার

আলোচ্য বৎসরে ৭৭৬ হাজার টাকার বীমার জন্য [illegible]৫০টী প্রস্তাব পাওয়া যায়। ইহাদের এবং পূর্ব্ববৎসরের অবশিষ্ট বীমার কাজ মিলাইয়া মোট ৫৬৫ হাজার টাকা বীমার ৪১০টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু হইয়াছে। এই নূতন কারবারের পরিমাণ পূর্ব্ববৎসরের কারবার অপেক্ষা শতকরা ১২॥০ টাকা অধিক।

আয়ব্যয়

আলোচ্যবৎসরে আয় হইয়াছে মোট ৮০০৬৮ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম আয় ৬৭৪৭৪৲ টাকা (পুনর্ব্বীমা বাদে) লগ্নীর সুদ এবং লীজহোল্ড সম্পত্তির আয় হইয়াছে ১২৪১০৲ টাকা। অন্যান্য আয় ১৮৩৲ টাকা।

ব্যয় হইয়াছে মোট ৫৩০৬৫৲ টাকা। তন্মধ্যে দাবীশোধ বাবত গিয়াছে ১০ হাজার টাকা। পরিচালনা খরচ হইয়াছে ৩৬৩৫০৲ টাকা। এই পরিচালনা খরচের মধ্যে কমিশন (ম্যানেজিং এজেন্টদের ২৮২৬৲ টাকা সহ) বাবতে গিয়াছে ১৬১৩৩৲ টাকা।

খরচের অনুপাত

প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৩·৮ টাকা কমিশন বাবতে খরচ হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে হইয়াছিল শতকরা ২৬·৮ টাকা। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অনুপাতের একটা তালিকা দেওয়া হইল। তাহাতে বুঝা যাইবে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এই অনুপাত কিরূপ কমিয়া আসিয়াছে। ইহাতে কোম্পানীর সুপরিচালনার পরিচয় পাওয়া যায়:—

	১৯৩৬—৩৭	১৯৩৭—৩৮
কমিশন, প্রিমিয়ামের শতকরা	টাকা ২৬·৮	টাকা ২৩·৮
মোট পরিচালনা খরচ প্রিমিয়ামের শতকরা	৬১·৭	৫৩·৮
মোট পরিচালনা খরচ, মোট আয়ের শতকরা	৫২·১	৪৫·৪

জীবনবীমা তহবিল

সমস্ত খরচ বাদে বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৫৭০৪৩৲ টাকা। বৎসরের আরম্ভে ইহার পরিমাণ ছিল ৩০০৪০৲ টাকা।

সম্পত্তি ও দায়

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২১৪১২৫৲ টাকা। তন্মধ্যে শেয়ার বন্ধকী ঋণ ৩ হাজার টাকা। গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে এবং জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে লগ্নী আছে ৯৮৬৪৫৲ টাকা। লীজ্‌হোল্ড বিল্ডিং

এর মূল্য ৫৯৮৫৯৲ টাকা। আসবাব পত্র (মূল্য হ্রাস বাবদে) ৩৭৭৭৲ টাকা। প্রিমিয়াম বাকী ৫৩২৭৲ টাকা। এজেন্টদের হাতে আছে ২৮৫১৲ টাকা।

জীবনবীমা তহবিলের ৫৭০৪৩৲ টাকা ব্যতীত দায়ের ঘরে নিম্নলিখিত কয়েকটী দফা প্রধান ;—কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ১২০৩৫০ টাকা। পলিসির দাবীশোধ বাকী ২১ হাজার টাকা। ডিপজিট ১৯৪৭৲ টাকা। কমিশন, মেডিক্যাল ফিস্' অডিট ফিস্ প্রভৃতি বাবতে দেনা বাকী ১৫১৫৪৲ টাকা।

পূর্ব্ববৎসরের মত এবারেও ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন ১২ হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

গত ৭ই ডিসেম্বর মহাবীর ইন্সুরান্স্ কোম্পানীর তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, সেই সভাতে চেয়ারম্যান মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, নিম্নে তার সার মর্ম্ম দেওয়া হইল :—

মহাবীরের চেয়ারম্যান—
লালা করমচাঁদ থাপর।

বীমাব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমাদের কোম্পানী যে আলোচ্যবৎসরে সন্তোষজনক

কার্য্য করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিচালকগণ দ্রুত উন্নতির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ধীর স্থির ও অবিচলিত গতিতে চলিয়াছেন। ইহাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, কারণ দেখা গিয়াছে যে, দ্রুত উন্নতির শেষ ফল বিপজ্জনক হইয়া পড়ে।

আলোচ্যবৎসরে জীবনবীমা তহবিল শতকরা প্রায় ৯০৲ টাকা বাড়িয়াছে এবং খরচের অনুপাতও সকল দিকেই কমিয়াছে। কোম্পানীর লগ্নী সমুদয় একদিকে যেমন লাভজনক, অন্যদিকে তেমনি নিরাপদ। এই সকল লগ্নী হইতে আলোচ্যবৎসরে শতকরা ৮·১৪ টাকা হিসাবে সুদ পাওয়া গিয়াছে। সুদের বাজারের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে ইহাকে নিশ্চয়ই সন্তোষজনক বলিতে হইবে।

আইন অনুসারে কোম্পানীর যত টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট ডিপজিট করা দরকার তদপেক্ষা অধিক টাকা ইতিপূর্ব্বেই ডিপজিট করা হইয়া গিয়াছে। আলোচ্যবৎসরে এই সিকিউরিটী ডিপজিটের পরিমাণ ৫৮৩২৩৲ টাকা হইতে ৭১১৫৮৲ টাকায় উঠিয়াছে। হিসাব প্রস্তুত হইবার তারিখের বারে আরও ডিপজিট করা হইয়াছে; তাহা হিসাবের অঙ্কে দেখান যায় নাই। এক্ষণে মোট ডিপজিটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৩৫০০৲ টাকা (ফেস্ ভ্যালু)।

নূতন বীমা আইনে আমাদের কোম্পানীকে কোন দিকেই বিচলিত করিতে পারিবেনা। এযাবৎ ভারতবর্ষের চারিটী প্রদেশে আমাদের কোম্পানীর কারবার সুগঠিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ তিনবৎসর ধরিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন ছাড়িয়া দিয়া কোম্পানীকে যে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদ ও প্রশংসার পাত্র।

মহাবীরের এই সাফল্যের জন্য আমরা কোম্পানীর হেড্ আপিশের ম্যানেজার মিঃ শীতল দাস সাইগল এম, এ, এবং এজেন্সী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হরিচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এল কে ধন্যবাদ দিতেছি।

আর্য্য ইন্‌সিওর‍্যান্স্‌ কোম্পানীর

প্রথম ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট

কিছুকাল পূর্ব্বে আর্য্য ইন্‌স্যুর‍্যান্স্‌ কোম্পানীর সহিত মডার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ্‌ য়্যাস্যুর‍্যান্স্‌ কোম্পানী মিলিত হয়। তখন একবার আর্য্য-ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ষ্ট্যাটুট্যারি ভ্যালুয়েশন নহে। কোম্পানীর যে তহবিল ঘাট্‌তি পড়ে নাই এবং মডার্ণ ইণ্ডিয়ার সহিত মিলিত হইবার জন্য কোম্পানীর যে আর্থিক সচ্ছলতা আছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্যই উক্ত ভ্যালুয়েশন করা হইয়াছিল, সুতরাং তাহা তেমন কড়াকড়ি ভাবে করা হয় নাই। সেই ভ্যালুয়েশনে ৫২,৯৩৯ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু সেই টাকা পলিসি-হোল্ডারদের মধ্যে বোনাস্‌ স্বরূপ বিলি করা যায় না। সুতরাং পুনরায় অধিকতর কড়াকড়ি রকমে এই ভ্যালুয়েশন করা হয়। ইহাই কোম্পানীর প্রথম ষ্ট্যাটুট্যারি ভ্যালুয়েশন।

এই ভ্যালুয়েশনে সুদের হার ধরা হইয়াছে শতকরা ৩৷৹ টাকা এবং খরচের জন্য রিজার্ভ ধরা হইয়াছে শতকরা ৩১'৭ টাকা। নীট প্রিমিয়াম ভ্যালুয়েশনে খরচের জন্য শতকরা যত টাকা ধরা হয়, এই ভ্যালুয়েশনে উহা তদপেক্ষা বেশী ধরা হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে কোম্পানী মিতব্যয়িতার বিশেষ সুযোগ পাইবেন এবং বোনাসের হার বজায় রাখিতেও সমর্থ হইবেন।

এই কোম্পানীর নূতন সংগৃহীত কারবারের পরিমাণ চল্‌তি কারবার অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য ইহার পক্ষে এইরূপ ভ্যালুয়েশন কড়াকড়িই হইয়াছে বলা যায়। ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত চল্‌তি পলিসির উপরে ভ্যালুয়েশন করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভ্যালুয়েশনে মোট উদ্বৃত্ত দেখা যায় ২১১৯৩্‌ টাকা। এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে বর্ত্তমান বীমাকারীদিগকে যে বোনাস দেওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাপেক্ষা অনেক উচ্চহারে বোনাস্‌ ঘোষণা করা যাইত। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ সতর্কতা-বলম্বন করিয়াছে এবং অত্যধিক বোনাস্‌ ঘোষণার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্য উদ্বৃত্ত টাকা হইতে আজীবন বীমায় (প্রতি হাজার টাকার পলিসিতে) ১৫্‌ টাকা এবং অন্যান্য প্রকারের বীমায় (প্রতি হাজার টাকার পলিসিতে) ১২্‌ টাকা বোনাস্‌ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই বোনাস্‌ বাবতে উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ৪৭২০্‌ টাকা খরচ হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট ১৬৪৭৩্‌ টাকার এক পাইও অংশীগণ লভ্য হিসাবে লইবেন না। পরন্তু কোম্পানীর ব্যালান্স সীটে গঠনমূলক কার্য্যের জন্য (organisation expenses) যে খরচকে assets বা সম্পত্তি বলিয়া দেখানো

হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা এই দশ হাজার টাকা দ্বারা কাটান দেওয়া (write off) হইবে। ইহাও কর্ম্মকর্ত্তাদিগের পক্ষে সুবিবেচনায় কার্য্য হইয়াছে। কারণ মডার্ণ ইণ্ডিয়া আর্য্য ইন্‌সিওরেন্সের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় তাহারও এইরূপ উদ্বায় assets। একত্রে মিলিত হইয়া মোটা অঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাকী ৬৪৭৩৲ টাকা পলিসিহোল্ডারদের প্রাপ্য বাবতে আগামী ভ্যালুয়েশনের জের জমাস্বরূপ থাকিবে। এবারের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে অংশীদারগণ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের পক্ষে ইহা সুবিবেচনার কার্য্যই হইয়াছে। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতিকামী অংশীদারগণের এই স্বার্থত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা আর্য্য ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এই সন্তোষজনক ভ্যালুয়েশনের ফলে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

গভর্ণমেণ্ট এ্যাক্‌চুয়ারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৩৭ সালের ইয়ার বুকের সার মর্ম্ম

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় বীমার কারবার অধিকতর প্রসারিত হইয়াছে। জনসাধারণ দিন দিন বীমার প্রতি অনুরক্ত হইতেছে। বীমা সম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদা উৎসুক ও আগ্রহান্বিত। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের য়্যাসিষ্টাণ্ট্ য়্যাকচুয়ারী ভারতীয় বীমা কোম্পানী সংক্রান্ত ১৯৩৭ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম দিলাম ;—

ভারতীয় কোম্পানী সমূহের বীমার কারবারের পরিমাণ

১৯২৭ সালের শেষে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের মোট চলতি কারবারের পরিমাণ ছিল, ৬০ কোটী টাকা। ১৯৩৬ সালের শেষে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭৫ কোটী টাকা। ইহাতে বুঝা যায়, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বীমার কারবার প্রায় তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে মোট প্রায় ৩৮ কোটী টাকা। তৎপূর্ব্বে দশ বৎসরের মধ্যে এত টাকার নূতন কারবার আর কখনও হয় নাই। ১৯২৭ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৪২৯ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬ সালে ঐ প্রিমিয়াম আয় উঠিয়াছে ১১৩৫ লক্ষ টাকা। ১৯৩৫ সালের প্রিমিয়াম আয় অপেক্ষা ইহা ২ কোটী টাকা অধিক হইয়াছে।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সংখ্যা

ভারতীয় জীবন বীমা বিষয়ক আইনের অধীনে যে সকল ভারতীয় বীমা কোম্পানী কার্য্য করিতেছে তাহাদিগের সংখ্যা ২১৩। ইহাদের মধ্যে ১৭৮টী কোম্পানী মালিকানা স্বত্ব বিশিষ্ট এবং ৩৫টী কোম্পানী মিউচুয়্যাল। ১৯১২ সালের ভারতীয় জীবন বীমা বিষয়ক আইনের অধীন এবং ১৯২৮ সালের ভারতীয় বীমা বিষয়ক আইনের অধীন কোম্পানীর সংখ্যা ৩৭৯। তন্মধ্যে ২৩২টী কোম্পানী ভারতে গঠিত এবং অবশিষ্ট বাহিরের।

প্রদেশ হিসাবে দেখিলে বীমার কারবারে বোম্বাই সর্ব্বপ্রথম এবং বঙ্গদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বোম্বাইতে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৬৯। বাংলাদেশে ৫০টী বীমা কোম্পানী আছে। অন্যান্য প্রদেশে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা এইরূপ ;—মাদ্রাজ ৪১ ; পাঞ্জাব ৩০ ; যুক্তপ্রদেশ ১২ ; দিল্লী ১০ ; মধ্যপ্রদেশ ৫ ;

বিহার ৪ ; সিন্ধু ৩ ; আজমীর মাড়ওয়ার ৩ ; আসাম ২ ; ব্রহ্মদেশ ২ ; উত্তরপশ্চিমসীমান্ত-প্রদেশ ১ ।

গত ইয়ার বুক (year book) প্রকাশিত হওয়ার পর বোম্বাইতে ২টী, বঙ্গদেশে ২টী, পাঞ্জাবে ১টী এবং মাদ্রাজে ১টী ; মোট ছয়টী নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটী কোম্পানী জীবন বীমার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে ।

১৮৫টী ভারতীয় কোম্পানী কেবলমাত্র জীবন বীমার কারবার করেন। ২৮টী ভারতীয় কোম্পানী জীবন বীমার সহিত অন্যপ্রকার বীমার কারবার করিয়া থাকেন। ১৯টী ভারতীয় কোম্পানী জীবন বীমা ব্যতীত অন্য প্রকার বীমার কারবার করেন।

নূতন বীমা ও মজুত বীমার পরিমাণ

১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী সমূহ ভারতে ৩৬ কোটী টাকার নূতন বীমার কারবার করিয়াছেন। ইহার প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ১৮৪ লক্ষ টাকা। ইহাতে ২৩৯ হাজার পলিসি ইসু করা হয়। যে সকল কোম্পানী বণ্টন প্রথায় (Dividing plan) কাজ করেন, তাঁহাদের হিসাব ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ঐ বৎসর মোট ভারতীয় নূতন জীবন বীমার পরিমাণ ২৭৩ হাজার পলিসিতে ৪৬৭৫ লক্ষ টাকা। ইহার প্রিমিয়াম আয় ২৪১ লক্ষ টাকা।

১৯৩৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় কোম্পানী সমূহের ভারতীয় কারবার সংক্রান্ত মোট মজুত বীমার পরিমাণ ৯৮৯ হাজার পলিসিতে বীমা করা ১৬৮ কোটী টাকা। ইহার প্রিমিয়াম আয় ৭৮৭½ লক্ষ টাকা। বিদেশী কোম্পানীর কারবার সহ ইহার সর্ব্বমোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৬১ হাজার পলিসিতে বীমা করা (বোনাস সহিত) ২৬১ কোটী টাকা। ইহার প্রিমিয়াম আয় ১৩ কোটী টাকা।

কয়েকটী ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী ভারতের বাহিরে তাঁহাদের কারবার প্রসারিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ ইষ্ট্ আফ্রিকা, সিংহল এবং ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্ট, প্রধানতঃ এই সকল দেশেই ভারতীয় কোম্পানীর বীমার কারবার রহিয়াছে। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের এই বিদেশীয় (ভারতের বাহিরে) নূতন কারবারের পরিমাণ ১৮০ লক্ষ টাকা এবং ইহার প্রিমিয়াম আয় ১১ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় কোম্পানীর বিদেশী কারবারে মোট মজুত বীমার পরিমাণ ৭ কোটী টাকা। ইহার প্রিমিয়াম আয় ৩৬½ লক্ষ টাকা।

অভারতীয় বীমা কোম্পানী

অধিকাংশ অভারতীয় কোম্পানী জীবন বীমা ব্যতীত অন্যপ্রকার বীমার কারবারও করিয়া থাকেন। ১৪৭টী অভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ১২২টী কোম্পানী জীবন বীমা ছাড়া অন্য প্রকার বীমার কারবার করেন। ১২টী কোম্পানী কেবলমাত্র জীবন বীমার কারবার করেন। অবশিষ্ট ১৩টী কোম্পানী জীবন বীমার কারবারের সহিত অন্য প্রকার বীমার কারবারও করিয়া থাকেন। শেষোক্ত ২৫টী কোম্পানীর মধ্যে ১৬টী গ্রেটবৃটেনে, ৭টী ব্রিটিশ ডমিনীয়ান এবং উপনিবেশে, ১টি জার্ম্মাণীতে এবং ১টী সুইজারল্যাণ্ডে গঠিত। ১৯৩৬ সালে এই সকল

অভারতীয় কোম্পানী ভারতে মোট যে পরিমাণ জীবন বীমার কারবার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রিটিশ কোম্পানী সাড়ে চারি কোটী টাকা, ডমিনীয়ান ও উপনিবেশের কোম্পানী ২½ লক্ষ টাকা, জার্ম্মাণ কোম্পানী এক কোটি টাকা এবং সুইজারল্যাণ্ডের কোম্পানী ১২½ লক্ষ টাকার কারবার করিয়াছেন।

অন্যবিধ বীমার প্রিমিয়াম আয়

১৯৩৬ সালে জীবন বীমা ব্যতীত অন্য প্রকার বীমা হইতে নীট ভারতীয় প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে মোট ২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর অংশ ৭৪ লক্ষ টাকা এবং অবশিষ্ট ২ কোটি টাকা অভারতীয় কোম্পানীর। কোন্ প্রকার বীমা হইতে কোন্ কোম্পানী কত টাকা প্রিমিয়াম পাইয়াছেন, তাহার তালিকা এই ;—

	ভারতীয় কোম্পানী	অভারতীয় কোম্পানী
অগ্নিবীমা	৩৬ লক্ষ টাকা	১০১ লক্ষ টাব
সামুদ্রিক বীমা	১১ ,, ,,	৪১ ,, ,,
অন্যান্য বিবিধ বীমা	২৭ ,, ,,	৫৮ ,, ,,

কতগুলি ভারতীয় কোম্পানী ভারতের বাহিরেও অগ্নিবীমা কিংবা সামুদ্রিক বীমার কারবার করিয়া থাকেন। ১৯৩৬ সালে এই সকল ভারতীয় কোম্পানীর বাহিরের কারবার হইতে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৭০ লক্ষ টাকা।

লগ্নীর পরিমাণ ও সম্পত্তির মূল্য

ভারতীয় কোম্পানী সমূহের তহবিলের অধিকাংশ টাকা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটীতে লগ্নী করা আছে। মোট সম্পত্তির শতকরা ৭০ টাকা হিসাবে এই লগ্নীর পরিমাণ ৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। সিকিউরিটীর মূল্যের উঠ্ তি পড়্ তি সামলাইবার জন্য যে তহবিল করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ব্যালান্স্ সিটে দেখা যায়, ৭৬ লক্ষ টাকা।

অ-ভারতীয় কোম্পানী সমূহের ভারতীয় সম্পত্তির পরিমাণ ৪৯ কোটি টাকা ইহার মধ্যে ৩৮ কোটি টাকা, গ্রেটব্রিটেনে গঠিত কোম্পানী সমূহের এবং ১০ কোটি টাকা ডমিনীয়ান ও উপনিবেশে গঠিত কোম্পানী সমূহের সম্পত্তি। যে সকল অভারতীয় কোম্পানী ভারতে জীবন বীমার কারবার (পৃথক অথবা মিলিত ভাবে) করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভারতীয় সম্পত্তির পরিমাণ (এই ৪৯ কোটির মধ্যে) ৪৪ কোটি টাকা।

পরিচালনা ও অংশীদারগণ

১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের মোট আয়ের শতকরা ২৪·১ টাকা পরিচালনা খরচ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে ইহার পরিমাণ ছিল শতকরা ২৪·৮ টাকা। ১৯১৩ সালে মোট আয়ের শতকরা ১৮ টাকা পরিচালনা খরচ হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালে অংশীদারগণ শতকরা ·৭ টাকা হিসাবে (হাজার করা ৭ টাকা) ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে এই ডিভিডেণ্ড্ পাওয়া গিয়াছিল শতকরা ·৫ (হাজার করা ৫ টাকা) টাকা হিসাবে। ১৯১৫, ১৯১৯, ১৯২৪ এবং ১৯৩০ এই চারি বৎসরে ডিভিডেণ্ড্ খুব কমিয়া নিম্নতম পরিমাণ শতকরা ·৩ টাকায় নামে। ১৯২৮ সালে অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড্

বাড়িয়া শতকরা ১·৮ টাকায় (হাজার করা ১৮ টাকা) উঠিয়াছিল।

জীবন বীমা তহবিল ও সুদ

১৯৩৬ সালে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ৪৮৭২ হাজার টাকা বাড়িয়া বৎসরের শেষে ৪০½ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। এই তহবিলের উপরে গড়ে শতকরা ৪⅘ টাকা হিসাবে (ইন্‌কম্ ট্যাক্স বাদে) সুদ পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমূহ ১৯৩২ সাল হইতে যে হারে সুদ পাইয়া আসিয়াছেন তাহার হিসাব এই,—

সাল	সুদের হার শতকরা
১৯৩২	৫·৩৮ টাকা
১৯৩৩	৫·১৭ ,,
১৯৩৪	৫·০৮ ,,
১৯৩৫	৪·৯৩ ,,
১৯৩৬	৪·৬৯ ,,

দাবীশোধ

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া মেয়াদ শেষ জনিত দাবী এবং মৃত্যুজনিত দাবীর মধ্যে যে অনুপাত দাঁড়াইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯১৩ সালে কোম্পানীসমূহের মোট খরচার শতকরা ৩২·৯ টাকা মৃত্যুজনিত দাবী শোধ করিতে গিয়াছে। পরন্তু মেয়াদ শেষ জনিত দাবী শোধ করিতে মোট খরচার শতকরা ৯·১ টাকা মাত্র লাগিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের হিসাব এইরূপ :—

সাল	মৃত্যুজনিত দাবী শতকরা	মেয়াদশেষ জনিত দাবী শতকরা
১৯২৩	২১ টাকা	১৫·৭ টাকা
১৯৩৩	১৩·৯ ”	১৩·৩ ”
১৯৩৬	১৩·৬ ”	১২·৮ ”

ভ্যালুয়েশন

ভারতীয় জীবনবীমা আইনের সর্ত্তানুসারে ১৬৫ টী জীবনবীমা কোম্পানী ১৯৩৬ সালের হিসাব ও রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৯১টী কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ইয়ার বুকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ কোম্পানীরই একাধিক ভ্যালুয়েশন হইয়া গিয়াছে। ভ্যালুয়েশনের ফলে দেখা যায় ৭২টী কোম্পানীর তহবিল উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং ১৯টী কোম্পানীর তহবিল ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। উক্ত ৭২ টী কোম্পানীর উদ্বৃত্ত তহবিল হইয়াছে মোট ৪১১ লক্ষ টাকা। ইহার ৩৬৫ লক্ষ টাকা পলিসি হোল্ডারদের মধ্যে এবং ৩০ লক্ষ টাকা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা অতিরিক্ত রিজার্ভ অথবা জের-জমা স্বরূপ রাখা হইয়াছে। ১৯টী কোম্পানীর ঘাট্‌তি তহবিলের পরিমাণ দেখা-যায় ৬২৫ হাজার টাকা। এই ১৯টী কোম্পানীর মধ্যে ১৭টী কোম্পানী তাঁহাদের আদায়ী মূল-ধনের টাকা দ্বারা ঘাট্‌তি পূরণ করিয়া আর্থিক অবস্থা সচল রাখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা বোনাস্ কিম্বা ডিভিডেণ্ড কিছুই দিতে পারেন নাই। অবশিষ্ট দুইটী কোম্প্যানী কোনপ্রকারে তাঁহাদের ঘাট্‌তি পরিপূরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অন্যকোম্পানীর সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বণ্টন প্রথার বীমা

কয়েকটী ভারতীয় কোম্পানী বণ্টনপ্রথায় বীমার কারবার করিয়া থাকেন। ইহাতে বীমার টাকার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে না। প্রতিবৎসরের প্রিমিয়ামের টাকা সেই বৎসরের দাবীদারদের মধ্যে বণ্টন হওয়ার উপর ঐ বীমার

টাকার পরিমাণ নির্ভর করে। অধিকাংশ কোম্পানী অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে এই ভাবে তাঁহারা বেশীদিন কারবার চালাইতে পারিবেন না। ১৯৩৮ সালের নূতন বীমা আইন অনুসারে এই প্রকারের বীমা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ অনেক কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে। এখনও যাঁহারা ঐ রকম বীমার কারবার চালাইতেছেন, তাঁহারা য়্যাকচুয়ারীর সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের কোম্পানীকে রীতিমত বীমার কারবারে পরিণত করিবেন।

প্রভিডেণ্ট্ ইন্সুর‍্যান্স্

এবম্প্রকার মন্তব্য প্রভিডেণ্ট্ ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রভিডেণ্ট্ সোসাইটীর সংখ্যাছিল প্রায় ১২০০। ১৯১২ সালে প্রভিডেণ্ট্ সোসাইটী বিষয়ক আইন পাশ হওয়ার পর অনেক সোসাইটী উঠিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ১৯১২ সালের প্রভিডেণ্ট্ ইন্সুর‍্যান্স্ সোসাইটী বিষয়ক আইন অনুসারে ভারতে ৫৫৪টী সোসাইটী রেজেষ্টারী করা আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বণ্টন প্রথায় কারবার করেন। এই ৫৫৪টী সোসাইটীর ২৯০টী বঙ্গদেশে, ৭৭টী বোম্বাইতে, ৬০টী মাদ্রাজে, ৮২টী পাঞ্জাবে, এবং ২৬টী সিন্ধুদেশে। অবশিষ্ট অন্যান্য প্রদেশের নানাস্থানে রহিয়াছে।

পোষ্ট্ আফিস্ ইন্সুর‍্যান্স্ ফাণ্ড্

ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদের সুবিধার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট ১৮৮৩ সালে এই ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেন।ক্রমশঃ সিভিল লিষ্ট্ভুক্ত অন্যান্য বিভাগের গবর্ণমেণ্ট্ কর্ম্মচারিগণও এই ফাণ্ডে যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে এই ফাণ্ডে ১১৫৭০ হাজার টাকা মূল্যের ৫৪৩৮টী পলিসি ইস্যু হইয়াছে। উহাদের প্রিমিয়াম আয় ৫৭১ হাজার টাকা। বৎসরের (১৯৩৭) শেষে মোট মজুত বীমার পরিমাণ (বোনাস্ সহ) ১৯৫৬৭৩ হাজার টাকা পলিসির সংখ্যা ৯৪৫৮৮ এবং জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ৭৪৫৩৪ হাজার টাকা।

রঙ্গরস

"—এ কি কথা
শুনি আজি
মন্থরার মুখে !"

জার্ম্মানীরা যখন জেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করে তখন লণ্ডন টাইমস্ লিখিয়াছিলেন, জার্ম্মানীরা যা চায়, সেটুকু তাকে ছাড়িয়া দেওয়াই ঠিক। ইহার সরলঅর্থ এই,—"ছিঃ পরের দেশ, পরের জাতিকে অধীন করিয়া রাখা ঠিক নহে। বিশেষ সুডেটান্‌রা যখন জেকোস্লোভাকিয়ার অধীনে থাকিতে চায় না।"

টাইমস্ এর এই উক্তি শুনিয়া ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই আশান্বিত হইয়াছে; ইংরেজ পরের দেশ দখল পছন্দ করেন না এবং যাহারা স্বায়ত্তশাসন চায় তাহাদিগকে অধীনে রাখা ঘোরতর অবিচার বলিয়াই মনে করেন।

রাশিয়ার সহিত এসিয়ার অন্ততঃ অবস্থান—গত নৈকট্যও আছে; সুতরাং রাসিয়া অতটা সৎসাহসের (!) পরিচয় দান করিতে পারে নাই, —আপদকালে বন্ধুকে 'গো টু হেল' করিয়া মুখ মুছিয়া দাঁড়ায় নাই: সে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে, "আমি আছি এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকিব, যে কেহ চেকদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে, আমি তাহারই সহিত লড়িব।"

বাঙ্গালী বেহারী সমস্যা

বেহারের কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদই যে বাঙ্গালী-বেহারী সমস্যার অন্ত হইতে দিতে রাজী নহেন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

যাহারা স্থানগত বিভেদের অন্ত কামনা করে না, তাহারা সম্প্রদায়গত বিভেদের অন্ত কামনা করে, এ কখনও সত্য নহে; পরন্ত সেরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন এই সমস্ত লোক ফেডারেল-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে লড়িবেন, অন্ততঃ আমরা তাহা বিশ্বাস করিনা।

বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে রাজেন্দ্র প্রসাদের মনোভাব পূর্ব্বেও যেখানে সেখানে আলোচিত হইত। ভূমিকম্পের পর যে বাঙ্গালীরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া বেহারীদিগকে সাহায্য করে, কিছুদিন পরে সেই বেহারীরাই বন্যাপ্লাবিত

এবং নিরাশ্রয় মালদহবাসীকে রাজমহল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

ভাষা শুনুন, সেই বেহারের কংগ্রেসী কাগজ লিখিয়াছেন,—

এরূপ নেমকহারামী ভাষার বঙ্গানুবাদও আমরা পাপ মনে করি। সংক্ষেপতঃ বলা হইয়াছে,—বাঙ্গলার অন্ধ-খঞ্জ এবং অপদার্থগুলির দানা যোগাইতে বেহার আর রাজি নহে; পরন্তু,

রঙ্গরস অধ্যায়ের লেখক—

শ্রীযুক্ত লালবিহারী মজুমদার *

Goths, Huns and Vandals or the lame, the halt, the blind from Bengal * * these worms must be crushed.

যে কোন উপায়ে হইক ঐ সমস্ত পোকামাকড়-গুলিকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতেই হইবে।

তা বেশ, এ যাবৎকাল যে সমস্ত বাঙ্গালী বেহারে বাস্তব্য করিয়া বেহারীদের গোজন্ম

*প্রৌঢ়ছুত সম্পাদকের লিখিত টীপ্পনী এবং হাস্য কৌতুক প্রসঙ্গ আমাদের "রঙ্গরস" অধ্যায়কে সমৃদ্ধশালী করিয়াছে। বস্তুতঃ অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ রসিকতা এবং ব্যক্তিগত কুৎসা, নিন্দা ও গ্লানি বা ভাঁড়ামী না করিয়াও যে সরস ও সুতীক্ষ্ণ টীকা টীপ্পনী করা যায় তাহার পরিচয় লালবিহারীবাবুর লেখার মধ্যে যথেষ্ট আছে। মফঃস্বলের এই অজ্ঞাত পুষ্পের সৌরভ বাংলার সুধীসমাজ এবং সমঝদারদিগের মধ্যে বিলাইবার জন্য আমরা তাঁহার টীকা টীপ্পনীগুলি সাদরে পত্রস্থ করিলাম এবং ভবিষ্যতেও করিব। সম্পাদক

ঘুচাইতে জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহারা সে সমস্ত পোকা-মাকড়দিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করুণ, অবশ্য যদি সাধ্যে কুলায়।

পক্ষান্তরে, বাঙ্গালীরাও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে, বাঙ্গলার কুলী-মজুরের কাজ বাঙ্গালী দ্বারা চলে কিনা। বাঙ্গলার ধোপা, নাপিত, পাচক ব্রাহ্মণ, ফেরীঘাটের মাঝি, ব্যাঙ্কের দরোয়ানী, আপিশের বেয়ারা খানসামা, পোষ্টাপিশের পিওনী, ট্রামের চালক ও কণ্ডাক্টরী, মুদীখানা, ফেরীওয়ালা, গাড়ীর গাড়োয়ানী এবং পাইক বরকন্দাজের কাজ বাঙ্গালীদের দ্বারা সম্ভব হয় কিনা! পরন্তু, অতঃপর বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কেহ যাহাতে কনেষ্টবলের অথবা সরকারী আরদালী চাপরাশীর কাজ না পায়, সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো সম্ভব কিনা!

বাঙ্গলার লাটদরবার পড়িয়া গিয়াছে একদল 'ইয়ের' হাতে, তা না হইলে এ কোলাকুলি কিছুই কঠিন হইত না!

মহাত্মাজীর ফাতোয়া

এবার বন্যা না ফাটে! মহাত্মাজী আবার বেগ দিয়াছেন,—

(ক) যাহারা সদা সত্য কথা না বলে, তাহাদিগকে কংগ্রেসে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

বস্তুতঃই সদা সত্য কথা **বলিতে** হইবে অথবা ঐ কথা **স্বীকার করিলেই** চলিবে? জোরে চাপ দিলে এইখানে একবার বন্যা ফাঁসিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

(খ) প্রত্যেককে সর্ব্বদা অহিংস থাকিতে হইবে।

কেহ জাত ধর্ম্ম তুলিয়া গালি দিলে অথবা নাহক্ কাণ মলিয়া দিলে 'উহুঃ' বলাও চলিবে কিনা? জাতির রাজনীতিক মুক্তি, না নির্ব্বাণ মুক্তিই মহাত্মাজীর কাম্য একথাটাও স্পষ্ট করিয়া নেওয়া ভাল।

(গ) যাহারা দৈনিক অন্ততঃ অত গজ সূতা কাটিতে না পারিবে, তাহারা কংগ্রেসের মেম্বার থাকিতে পারিবে না।

গৌতমসূত্র এবং কার্পাসসূত্র অবলম্বনে যে স্বাধীনতার আমদানী হইবে, তাহা কোন্ জালের ঘেরা বেড়া দিয়া রক্ষা করা সম্ভব হইবে সেটাও রাষ্ট্র রাখা সঙ্গত।

(ঘ) শেষ প্রশ্ন, অন্ততঃ ৫ বৎসর পাঠ সমাপন না করিলে কেহ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে স্থান পাইতে পারিবে না।

বেশকথা।—কিন্তু যদি কেহ বলে,

(ক) প্রয়োজনগতিকে ২।১টা মিথ্যা বলা অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং আত্মপ্রতারণা করা আমি অধিকতর অন্যায় এবং পাপ মনে করি।

(খ) যদি কেহ বলে,—আমার আত্ম-সম্মান অথবা বংশসম্মানের প্রতি আঘাত দান করিয়া কেহ কিছু বলিলে আমার চিন্তার কুঠুরী হিংসাপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন আমার চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইবে না, আমি সেটা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিব, পরন্তু সাধ্যে কুলাইলে উক্তির গুরুত্ব অনুপাতে "ঝ্যাঁও" করিয়াও উঠিতে পারি।

(গ) যদি কেহ বলে,—আমি আমার পছন্দমত দেশহিতকর আর দশটা কাজ করিব, কিন্তু স্বহস্তে সূতাকাটা আমাদ্বারা হইবে না।

(ঘ) যদি কেহ বলে,—পাঁচ বৎসর সাগ্‌রেতির পর, গোবর্দ্ধন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিবে, অথচ কামাতের মত প্রাণবান, স্বার্থত্যাগী এবং পণ্ডিতব্যক্তিকেও

তাঁহার হুকুমবরদার হইয়া থাকিতে হইবে, এটা আমি দেশের পক্ষে অহিতকর মনে করি।

যদি বস্তুতঃ মহাত্মাজীর এ সমস্ত আবদারও টিকিয়া যায়, তবে হয় তাঁহার সৃষ্ট কংগ্রেসের তিনিই দফা শেষ করবেন; অথবা হিংসায়, অসত্যে এবং অযোগ্য লোকের প্রাধান্যে কংগ্রেস একটা Pandemonium বা নরকগুল্জারদের আড্ডায় পরিণত হইবে। "Satanic Govt." এর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য মহাত্মাজী শেষটা কি একটা "Satanic Congress" সৃষ্টি করিবার রাস্তা খুলিয়া দিতেছেন ?

ঋণশালিসী বোর্ড

বিদেশী বণিকদিগকে ঋণশালিশী বোর্ডের বিচারাধীন করিলে মন্দ হয় না।

ঋণ সালিশী বোর্ডে প্রায়ই বলা হয়,—"তিনশ' টাকা ঋণ দিয়া তুমি যথেষ্ট টাকা সুদ পাইয়াছ, এখন তুমি পথ দেখ।"

সুতরাং বলা চলে,—"হে বিদেশী বঁধু, vested interest এর কথা তোমাদের মুখে শোভা পায় না, তোমরা যে টাকা এদেশে খাটাইয়াছ, তার অনেক বেশী গুণ উশুল করিয়া লইয়াছ, তোমরা এখন পথ দেখিতে পার!"

বর্দ্ধমানের দুর্গাপ্রতিমা

বর্দ্ধমানের যে সমস্ত মন্দিরে দুর্গাপ্রতিমা রাস্তায় ফেলিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছেন আমরা তাহাদিগকে হিন্দু মনে করিনা। যে সমস্ত লোক পাঁঠা বাঁচাইবার জন্য শেষটা মহিষদিগকে পিকেটিংয়ে নামাইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদিগকে কাপুরুষ মনে করিতাম।

যাহারা মাতৃর্গার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হয় কেন? আর রাস্তায় প্রতিমা ফেলিয়া রাখিয়া মুসলমান জব্দই যদি উদ্দেশ্য ছিল, তবে ও' প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই, ও'গুলি পুতুল মাত্রই ছিল, অমন দেবতার গমনে বাধাদিয়া এবং ঐ সমস্ত ভণ্ডদিগকে ডাণ্ডা পেটা করিয়া মুসলমানেরা ভালই করিয়াছে।

চীনজাপান যুদ্ধ

আমাদের কবিসম্রাট হয়ত মনে করিয়াছিলেন,—তিনি এবং তাঁহার শিষ্যজী (মহাত্মাজী) এই দুইজনে মিলিয়া চীন-জাপানের যুদ্ধটা থামাইয়া দিবেন। চীন এবং জাপান উভয় দেশই যখন ভারতকে তাহাদের গুরুপীঠ মনে করে, তখন মহাত্মাজীর কথায় চীনারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া "অসহযোগ" আরম্ভ করিবে; এবং নগুচি মারফত গুরুজীর বাণী লাভ করিয়া জাপানীরা সৈন্য-সম্ভার সমস্তই ঘরে ফিরাইয়া আনিবে।

অথচ চীনারা যুদ্ধ করিতে বিরত হইল না, আবার ইতিমধ্যে জাপানী কবি নগুচিও এক কঠোর পত্রাঘাত করিয়া আমাদের গুরুজীর দেশের ও যশের হাঁড়িটি ছাঁদা করিয়া দিয়াছেন। অল্প কথায় নগুচির সিদ্ধান্ত,—"আপনি একটি স্বপ্নবিলাসী।"

আমাদের কবিসম্রাটের
"সাহস আছে,
হিম্মৎ আছে,
আছে প্রতিভার ভাতি"

তদপেক্ষাও ফাকি দিয়া 'ফয়তা' মারিবার বুদ্ধি আছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী!

—একজনের "ত্যাগে' আর একজনের 'ছন্দে' ভারত উদ্ধার হইবে।

গান্ধিবাদ

লোকে নিজের ছেলেটিকে শাসন করে;—মা দুর্দ্দান্ত ছেলেকে 'মর্' পর্য্যন্ত বলে, তাই বলিয়া বস্তুতঃ ছেলেকে পঙ্গু করা অথবা মারিয়া ফেলা মায়ের উদ্দেশ্য থাকে না।

সুতরাং যাহারা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অথবা কংগ্রেসের প্রতি ষোলআনা সহানুভূতি-সম্পন্ন থাকিয়া সময় সময় কংগ্রেসের ত্রুটি বিচ্যুতি প্রদর্শণ করে, তাহাদিগকে কংগ্রেসের শত্রু সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের পেছনে ডালকুত্তা লেলাইয়া দেওয়া ঠিক হয় না।

কংগ্রেসের সংশোধন, উন্নতিসাধন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন অবস্থা প্রভৃতি আলোচনা-পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

অন্যথা—কংগ্রেসে Democracy বা গণ-তন্ত্রের নামে Gandhicracy বা গান্ধিবাদই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখনই কতকটা ঐরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে ঐ একই উল্লাসধ্বনি 'জয় মহাত্মাজীকী জয়"। শত লোকের সহস্র যুক্তিতর্ক এবং দশ সহস্র সিদ্ধান্তের সমাধান আজ "মহাত্মা বলিয়াছেন" এই সূত্র-সংঘাতে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যায় এবং যাইতেছে।

একটা inferiority complex বা আত্ম দৌর্ব্বল্যের কল্পনার আশ্রয় না লইয়া, মনস্বী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে, কংগ্রেসে তিষ্ঠিয়া থাকা ক্রমে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে।

"রাষ্ট্রপতির বাণী," "শরৎবাবুর উক্তি" "বিধানচন্দ্রের কল্পনা," "কিরণবাবুর মীমাংসা," "ডাঃ ঘোষের শুভইচ্ছা" ইত্যাদি কতকগুলি সূত্র কপ্‌চাইয়া এবং কতিপয় নরদেবের পূজা করিয়া গণতন্ত্রের সেবা অনেকের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। এমন কি আজ অল্প লোকই এ ভাবধারার সম্বন্ধে তাহাদের বিতৃষ্ণার সংবাদ ভাষায় প্রকাশের শক্তি পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে।

সুভাষবাবু যাহা ভাবেন, তাহাই আমাদের ভাব্য; শরৎবাবু যাহা করেন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং মহাত্মাজী যাহা বলেন তা' ছাড়া আমাদের আর কিছুই বক্তব্য থাকিতে পারে না মনের এ অবস্থা মানসিক দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা।

ফলে, ফোঁস্‌ফোঁসানী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এখন কখন যেন কি একটা ঘটিয়া বসে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা পঙ্গু করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আয়ত্ত করা সম্ভব হইতে পারে না; কংগ্রেসেরও উহাই সিদ্ধান্ত; অথচ কার্য্যতঃ এইরূপ আচরণে এবং জুলুমবাজীতে উক্ত সিদ্ধান্তেরই অবমাননা ঘটিতেছে।

সাম্প্রদায়িক গভর্ণমেণ্ট

পাঁচ আর দুই একবার 'সাত' আর একবার 'নয়' হইতে পারে না।

মিঃ জিন্না ভারতের জন্য "হিন্দু গবর্ণমেণ্ট" এবং "মুসলমান গবর্ণমেণ্ট" ব্যবস্থা করেন, অথচ পালেষ্টাইনের জন্য কেবলমাত্র "আরব গবর্ণমেণ্ট" চান; ইহুদিদের স্বতন্ত্র কোনও গভর্ণমেণ্ট থাকিবেনা; তারা আরবদেরই তাঁবে থাকিবে। "ইহুদি গবর্ণমেণ্টে"র নাম শুনিলেই জিন্না চটেন।

তবেই মনে করিতে হয়, তাঁহার মতে দেশগত স্বার্থচিন্তা ঠিক নহে, সম্প্রদায়গত স্বার্থই বড় কথা।

ভারতে মুসলমানগণ সংখ্যাল্প, সুতরাং তাহাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা

হউক ; প্যালেষ্টাইনে মুসলমানগণ সংখ্যায় বেশী, সুতরাং সেখানে মুসলমান গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়া ইহুদিদিগকে মুসলমানদিগের প্রভাবাধীন করিয়া রাখা হউক।

মিঃ জিন্নার আব্দার যে আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে, তিনি যে একজন মস্ত গরজবাদী লোক এবং গরজে তিনি পাঁচ কড়াতে গণ্ডা গণনা করিতেও প্রস্তুত সে সত্য প্রমাণিত হইতে আর বাকী থাকিল না।

বাংলার বারো ভুঁইয়া ক্যাবিনেট্

"দশ" ছিল "বার" হইল। নিজ নিজ দল ভাঙ্গিয়া মৌঃ সামসুদ্দিন এবং মৌঃ তমিজুদ্দিন আসিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন।

রাম বাঁচা গেল! এতদিন আমরা এই দুইজনেরই মুখ চাহিয়া ছিলাম। কেবলই মনে হইত, এমন দুইজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং দেশবরেণ্য ব্যক্তি এখনও কেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছেন। মনে হইত, বুঝিবা যোগ্যতা অনুপাতে দরমাহাটা কিছু কম বলিয়াই একটু ভাবনার মধ্যে পড়িয়াছেন। কারণ Every man has his price অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই ত একটা মূল্য আছে!

জিতা রহো, ভাই ছায়েবদ্বয়!

মিসেস নাইডু বিশ্বশান্তির জন্য নারীদিগকে আসরে নামিতে আহ্বান করিয়াছেন।

দ্রৌপদী নামিয়া মহাভারত এবং সীতা নামিয়া, রামায়ণ সৃষ্টি করেন, কে না জানে!

অবশ্যি, মোহিনী নামিয়া দেবাসুরের যুদ্ধ থামাইয়া দিয়াছিলেন!

অতএব মোহিনীরা নামুন্।

খুলনার ঘটনা। পাঁচু দাই সুমতীকে হরণ করে! পাঁচু যখন খাইতে যায়, লালমতী (পাঁচুর ধর্ম্মপত্নী) তখন দা' হাতে সুমতীকে পাহারা দেয়।

পাঁচুর পাঁচ বচ্ছর হইয়াছে!

লালমতীর মত পত্নীলাভ, বরাতের কথা!

প্রেমিক সাজাহান প্রিয়তমা পত্নী মুম্তাজের চিতার উপর 'তাজমহল' তুলিয়া দেন!

আবার সেই আগরার ঘটনা,—

অমৃতলালের সোমত্ত স্ত্রী দুই বৎসর বাপের বাড়ীতে আছে, অমৃত ছাদের কড়ি কাঠ গণিয়া রাত্রি কাটায়। প্রকাশ পায়, শ্রীমতী অন্যত্র কোর্টসিপও চালাইতেছে।

অগত্যা সত্যাগ্রহ!

৭ দিন না খাইয়া অমৃত শ্বশুরের অঙ্গনে পড়িয়া রহিয়াছে! বস্তুতঃ,—

একেই বলে প্রেম,
যাতে থাকেনা ফিউচারে'র চিন্তা,
থাকেনাকো 'সেম'!

পণপ্রথা রোধের জন্য আইন চাহিয়াছেন, এই সঙ্গে মিঃ সিং আরো একটা আইন দাবি করিতে পারেন,—

কালো বরণ, খুঁড়িয়ে চলন, চ্যাপ্টা নাক, দাঁতের ফাক ইত্যাদিতে যে যুবক অরুচি প্রকাশ করিবে, তার ৬ মাস জেল হইবে!

ইটালীতে বহু সন্তানের পিতামাতাকে নগদ টাকা 'বোনাস' দেওয়া হইতেছে।

আমাদের দেশে 'ল'কারান্ত নিরোধকের বিজ্ঞাপন হাটে-ঘাটে বিলি আরম্ভ হইয়াছে!...

ক্রমে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত না হয়!

বিদ্যাবত্তা এবং নিরাপত্তার কসরৎ চলিতেছে!

—:—

মহাত্মাজীর নবপর্য্যায় হুকুম,—আবার প্রত্যেক কংগ্রেসীকে সুতা কাটিতে হইবে!

শরৎবাবু সুভাষবাবু সকলকেই!

মুক্তি-সূত্র!

—:—

মিঃ জিন্নার উপদেশ, "যাহারা খাটি মুসলমান তাঁহারা যেন হিন্দুর হস্তে প্রস্তুত করা খদ্দর না বুনেন!" খদ্দর ভাল যদি তাহাতে হিন্দুর কাটা সূতো না থাকে।

অত্যর্থ, হিন্দুর দান ছাতু-চিড়া পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না।

এমন কি দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে কিম্বা অনশনেও না!

—:—

যাহারা স্বার্থত্যাগ করিয়া এবং জেল খাটিয়া শেষটা পদের লোভে ক্ষেপিয়া দাঁড়ায় তাহারা ঐ সেই,—

"দুধ বেচিয়া মদ খায়!"

—:—

মহাত্মাজীর সন্দেহ, অনেকে ডিঃ বোর্ড, ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতিতে ঢুকিবার জন্য কংগ্রেসে ঢুকিয়াছে!

তাহা হইলে সত্যাগ্রহীরা কি তা স্বীকার করিতেন না?

মহাত্মাজীর অপর সন্দেহ, বহু মেম্বারের চাঁদা ধনীরা দেন; প্রাদেশিক কমিটিতে ঢুকার সময় ঐ সমস্ত মেম্বারেরা তাঁহাদিগকে ভোট দেয়। ভোট সওদা আরম্ভ হইয়াগিয়াছে!

হবে!

তবেই খতিয়ানে পাওয়া যায়,—কতকগুলি স্বার্থপর, মতলববাজ এবং অসত্যাচারী লোক প্রাদেশিক কংগ্রেসটাকে আয়ত্ত করিয়াছে!

—শরৎচন্দ্র, বিধানচন্দ্র এ সত্য স্বীকার করেন কি?

পরিণামে, আমাদের কথা নহে, মহাত্মাজী নিজেই বলিতেছেন,—স্বার্থের কোন্দল-কলহ এবং হিংসাদ্বেষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অনুসন্ধান আবশ্যক, কেহ কেহ জাপানী খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিয়াছে কিনা!

সুতরাং আগামী কংগ্রেসে মেম্বারের প্রতিজ্ঞা সূত্রগুলি বুঝিবা সম্পূর্ণই ঢালিয়া সাজিতে হয়!

জয়, মহাত্মাজীর জয়!

—:—
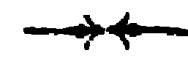
যাহারা হিন্দু তাহারা প্রাণ গেলেও দুর্গা প্রতিমা রাস্তায় ফেলিয়া পালায় না!

যথা,—যাহারা বীর, তাহারা স্ত্রীলোক দিয়া পিকেটিং চালাইয়া পিঠ বাঁচাইবার সুযোগ খুঁজে না!

পলিটিক্যাল মা দুর্গার এ দুর্গতির জন্য মুসলমানগণকে দোষ দেওয়া বৃথা!

বর্দ্ধমান বিদ্যাসুন্দরের মুলুক কি না!

—:—
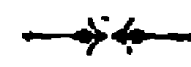
বর্দ্ধমানের খেয়াঘাটে নীরদা দাসী অকারণ ধমকাইয়া গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের নিকট গাড়ী প্রতি দুই পয়সা হিসাবে আদায় করিয়া লইতেছে! এই মুলুকেও প্রতিমা বিসর্জ্জন ঠেকে!

বর্দ্ধমানে নীরদা থাকিতেও দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জ্জণ হয়না!

—:—

অগত্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে,—

হিট্‌লার প্রথম যৌবনে নিজের ভাগ্নী গ্রীট্‌কে, মধ্যযৌবনে জনৈকা ছায়াচিত্র তারকা রিনেট্‌কে এবং বর্ত্তমানে এক ইহুদি রমণী লেনীকে কৃতার্থ করিয়াছেন!

একবার পছন্দ করিয়া আবার অপছন্দ করার দরুণ আসানসোলের এক শিক্ষয়িত্রী আদ্রা স্কুলের সেক্রেটারীর নামে ২৫৲ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালিশ করিয়া ফলবতী হইতে পারেন নাই; ঘেন্নার কথা!

দৌলতপুরে (ফরিদপুর) একটা লোক অনেকদিন যাবত খেজুর গাছের মাথায় বসিয়া নাকি কতকগুলি ভক্তের ভোগ খাইতেছে!

"বান্দর"!

কে "প্রধান পুরোহিত" ঠিক না হওয়ায় এবার কয়েকদিন কাশীতে বিশ্বেশ্বরের আরতি নাকি বন্ধ ছিল!

এই পুণ্যেই ভূমিকম্প হয়!

ছেলে ভাতের উপর রাগ করেছেন,

জব্বলপুরের বলবন্ত সিংকে কংগ্রেস প্যাণ্ডাল তৈয়ার করিতে দেওয়া হয় নাই;—তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

হতভাগা!

জার্ম্মানীর ওজর,—"ইহুদিরাই আমাদিগকে তামাক খাইতে শিখাইয়াছে!"

ইহুদিরা জার্ম্মানদের হাতে গাঁজা খাইত!

ন্যাকা!

কর্পূরতলার রাজকুমারী ইন্দিরা লণ্ডনের একটি রঙ্গমঞ্চে তুর্কী ক্রীতদাসীর অভিনয় করিবেন; 'পাঠ' বাছাই ঠিক হইয়াছে!

শ্রীমতী নাকি এ'ও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি আর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। বালাই গেল!

"কাঁদতে হবে অবশেষে!"

মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য বাবা-দাদার দল কত বেশী হন্যে হইয়া উঠিয়াছেন, তা'র দৃষ্টান্ত,—

স্নেহলতার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল, রাজকুমার চৌধুরী। কারণ মেয়ের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক চা-ই-ই।

স্নেহলতাকে লইয়া উধাও হওয়ার পর সাব্যস্ত হইল, উহার প্রকৃত নাম,—মহম্মদ রেজা করিম।

কন্যাগত কুল!

মহাত্মা এবং রবীন্দ্রনাথ এখন চীন জাপান বনাম স্পেন জেকোস্লাভাকিয়ার পেছনে লাগিয়াছেন! তাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিতে এবং message পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন! ভারত উদ্ধার হইয়া গিয়াছে!

"আপনি শু'তে পায়না ঠাঁই, শঙ্করারে ডাকে।"

পাংশা (ফরিদপুর) হইতে প্রকাশিত খাতকের ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশ,

ওখানে যা' ধান হইয়াছে উহার মধ্যে তণ্ডুল নাই।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় সম্পাদক ছাহেব জ্ঞাপন করিয়াছেন,

এ মন্ত্রিমণ্ডলীরও যাহারা নিন্দা করে, "তাহাদের মুখে থু-থু।"

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ!

বারাকপুরের ঘটনা, পাঞ্চজন্যে প্রকাশ,

দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য নালিশ করিয়াছেন জ্যোৎস্নার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া আমার শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁহাদের বড় কন্যা তটিনীকে আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন; জ্যোৎস্না চাই।

দুর্গাচরণ এখন পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেছেন।

জ্যোৎস্না চাই!

মতভেদবশতঃ নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারগণ নাকি খুবই মারামারি করিয়াছেন; পুলিশে না থামাইলে খুনাখুনীও হইতে পারিত! কা'র নাকি নাকটা একেবারে থ্যাতলাইয়া গিয়াছে। অহিংস-সংগ্রাম!

স্বরাজ আগত প্রায়!

বর্দ্ধমানে প্রতিমা বিসর্জ্জনে, এ যাবত আপত্তির কারণ ছিল, মজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ায়। এখন কথা উঠিয়াছে, "রাজনীতিক উল্লাসধ্বনি কেন করিল?" তহবিলের খবর!

"রাজার নন্দিনী প্যারি যা'কর তাই শোভা পায়!

অতএব স্থিরীকৃত হইল

নমাজের যখন সময় বাঁধা আছে,—আর বিসর্জ্জণে যখন কোন কালক্ষণ লাগেনা, তখন তোমাদেরও কর্ম্ম রাত্রি ৯টার পরে হবে।

বাপের শ্রাদ্ধ যখন দিন ক্ষণ না দেখিয়া কোন একটা রবিবার দেখিয়া করা যায় তখন প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য আবার কাল ক্ষণের দরকার কি?

গবচন্দ্র।

"বয়স্কাউটে" "ব্রতচারীতে" কুলাইলনা, সরকার "বীর ছাব্বিশী" আরম্ভ করিলেন।

ছাব্বিশ জন যুবককে শরীর চর্চ্চা ও প্রচার বিদ্যা শিক্ষা দিয়া জেলায় জেলায় ছাড়িয়া দিবেন, উহারা স্কুলে-স্কুলে ঘুরিয়া ছেলেদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে। শিক্ষকেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

যুক্ত ছাত্রদল (Students federation) বনাম বীর-ছাব্বিশী

বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিন সরকার জাপানের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করেন "হোজুর ইয়াংসী নদীর মুখ খুলিয়া দিতে মর্জ্জি হয়।"

জাপান, "আভি নেহি; অর্থ,—কভি নেহি।" সহজ-সরল ইঙ্গিত, "খুলা-নাখুলা, সে আমার ইচ্ছা।"

আবার নাকে হাত দিতে না চায় গো!

অসভ্য জাপান কি না!—

বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট বলিয়াছেন, "এইভাবে ইহুদি দলন জার্ম্মানীর অমনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
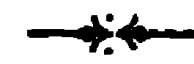
জার্ম্মানী জবাব দিয়াছেন, "জালিয়ান-ওয়ালা বাগে তোমরাও খুবই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলে!"

ইটের বদলে পাটকেলটী।
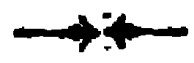
বোম্বাইয়ে শ্রমিকদিগের উপর গুলি চালান হয়। কথা বলা কিম্বা টুঁ ফুঁ করার জো নেই; কারণ কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের গুলি।

অহিংস গুলি।

সমালোচনা

ভারতের পণ্য

গ্রন্থকার কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের কিউরেটর শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ ৬ বি, রাজা বসন্তরায় রোড, কালীঘাট ও অন্যান্য পুস্তকালয়। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

আমাদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের পর বাঙ্গালীজাতির চিন্তাধারায় যে বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ব্যবসাবাণিজ্যের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে এবং এবিষয়ে সংবাদ পত্রাদিতে আন্দোলন আলোচনাও সুরু হয়। ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১০ সালে নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরাই সর্ব্বপ্রথম নিছক ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত মাসিক পত্র "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রকাশ করি এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করিতে থাকি। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বাঙ্গলা সাহিত্যে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক দুই এক খানি গ্রন্থ বাহির হইতে সুরু হয়। এই সকল পুস্তকের যথেষ্ট আদর হইয়াছে এবং দেশের মধ্যে এইরূপ পুস্তক প্রচলনের আবশ্যকতাও স্বীকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকাশক বা গ্রন্থকর্ত্তা আর্থিক হিসাবে কোনওরূপ লাভবান হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না, কারণ পুস্তকের Edition দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। তাহার প্রধান কারণ দেশের মধ্যে কৃষিশিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্যাদি শিক্ষাদিবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আঙ্গুল গুনিয় কয়েকটী মাত্র আছে তাহাছাড়া সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে এইসব শিক্ষাদিবার কোনও ব্যবস্থা বা curriculum নাই। তাহা যদি থাকিত তবে গ্রন্থকারগণ এইসব পুস্তক মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় তুলিয়া লাভবান হইতে পারিতেন এবং আরও অনেকে এইসব পুস্তকাদি প্রণয়ণ করিতে উৎসাহিত হইতেন। দ্বিতীয় কারণ, এযাবৎ এইসকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরাজীভাষা। অথচ ইংরাজীভাষোভিজ্ঞ ছাত্রেরা কদাচিৎ এইসকল সাধারণ ব্যবসায়াদিতে লিপ্ত হয়; তাহাদের আশা ও আকাঙ্খা থাকে বৃহৎ শিল্প ব্যবসায়ের পত্তন করিয়া লাখ্ লিখ্ মারিবে, যদিও এইসকল স্বপ্নবিলাসীদের প্রায় cent per cent এর কপালে ঘটিয়া থাকে,

> "আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ
> পশ্চাৎ ঝন্ঝনায়তে।"

যাহারা এইসব ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় অথবা হইতে চায় তাহারা ইংরাজী জানেনা; বাংলা ভাষায় পুস্তক থাকিলে ইহারা পড়িয়া উপকৃত হইতে পারিত। আশার কথা এই যে বিশ্ববিদ্যালয় এখন বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের মনে হয় যে এইসব পুস্তকের পাঠক সংখ্যা এখন অনেক বেশী হইবার সম্ভাবনা।

ন্যাংটো ছবি, প্রেমের গল্প, এবং আধুনিক ছাগ সাহিত্য যেমন চিত্তাকর্ষক এবং মুখরোচক, ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক পুস্তক পুস্তিকাদি তেমনি নীরস, এবং আস্বাদহীন; ইংরাজীতে যাকে বলে Dry as dust. কালীচরণবাবু আমার

বাছিয়া বাছিয়া ভারতের পণ্যবিষয়ে সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তকের মধ্যে এত অঙ্কপাত করিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া এইসকল লঘুসাহিত্যামোদী পাঠকদিগের ভীরমী লাগিবে এবং figures গুলি হয়ত বন্দুকের shots এর মত যাইয়া চোখে বিঁধিবে এবং তাহারা চোখে সরসেফুল দেখিবে। কিন্তু যাহারা জগতে কিছু করিতে চায়,—অতবড় কথা না হয় নাই বলিলাম,—যাহারা অন্ততঃ ছোট খাটো ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া অবাঙ্গালীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুখে টিকিয়া থাকিতে চায় এবং দু'মুঠা পেটের ভাত জোগাড় করিতে চায় তাহারা এই পুস্তকের মধ্যে ভারতের নানাবিধ পণ্য দ্রব্যের সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিতে পারিবে এবং সেই সকল জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাদের সাফল্য লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ পৃথিবীতে সব বিষয়ে এবং সকল ক্ষেত্রেই "knowledge is power" জ্ঞানই শক্তির উৎস। আগে সেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া ব্যবসায়ে নামিলে তাহাদের আর মার নাই।

আমরা ব্যবসা শিক্ষেচ্ছু বাঙ্গালী যুবকদিগকে এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি।

মুষ্টিযোগ ও স্বাস্থ্যকথা

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়, কবিরত্ন কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ সুবর্ণপুর, নদীয়া। মূল্য দশ আনা

আজকাল মুষ্টিযোগ পুস্তকের অভাব নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার অধিকাংশই লোকের উপকারে আসে না, কারণ ইহাতে এরূপ সব দুর্লভ এবং অজ্ঞাত পদার্থ সমূহের উল্লেখ দেখা যায় যে তাহা সংগ্রহ করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য।

জগতে যতপ্রকার ঔষধ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধাদির শ্রেষ্ঠত্ব সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায় যাহা না হয় অনেক স্থলে সামান্য কয়েকটী লতাপাতার দ্বারা তাহা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের চারিদিকে যে সকল লতা পাতা ফল মূল এবং বাকলাদি দেখা যায় তাহাদের রোগ আরোগ্যকারী ক্ষমতা দেখিয়া অনেক সময় লোকের তাক্ লাগিয়া যায়। জগদীশ্বর যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সৃজন করিয়াছেন, তাহাদের রোগ শান্তির জন্যও সেই সকল দেশে তদুপযুক্ত ভেষজ দ্রব্যেরও প্রচুর সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন।

গিরিজানাথ বাবু এই পুস্তকে যে সকল মুষ্টিযোগের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন লোকে তাহা সহজেই সংগ্রহ করিতে পারিবে। প্রয়োজনীয়তার হিসাবে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ এই পুস্তক খানা ঘরে রাখিলে উপকৃত হইবেন।

চিকিৎসা সহায়

গ্রন্থকার ডাক্তার সূর্য্যকান্ত দাস বি, এ, হোমিওপ্যাথ। প্রাপ্তিস্থান, টাঙ্গাইল রাজকান্ত ফার্ম্মাসী পোঃ টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)

মূল্য ১৷৹ টাকা

আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। সাধারণতঃ অনিয়মিত আহার বিহারাদির জন্যই রোগ হইয়া থাকে। সুতরাং সুস্থ শরীর কিরূপ খাদ্য রোগ প্রতিরোধক সে বিষয়ে মোটামুটী জ্ঞান লাভ সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই পুস্তিকায় আমাদের দৈনন্দিন আহারীয় সামগ্রীর গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তার পর রোগ হইলে রোগীর পথ্যাপথ্যের সম্বন্ধে সকল গৃহস্থেরই মোটামুটী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের উপেক্ষা ও অজ্ঞান তা দেখিলে লজ্জিত হইতে হয়। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকে নানারূপ রোগে পথ্য প্রস্তুত প্রণালী এবং রোগীর পথ্যাপথ্য নির্ণয়ের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

তাহাছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা এবং সর্পাঘাত প্রভৃতি বিষ চিকিৎসার প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ এই পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে।

ফলে নানাদিক দিয়া এই পুস্তক খানি গৃহস্থ মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ } মাঘ---১৩৪৫ { ১০ম সংখ্যা

সেয়ারের বাজার ও সেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই লিমিটেড কোম্পানী গঠনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব কম এবং কাজের সুবিধা বেশী। সেইজন্য উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা কোম্পানী গঠনের জন্য প্রথমে প্রসপেক্টাস প্রস্তুত করেন এবং সেই প্রসপেক্টাসের নিয়মানুযায়ী নিজেরা মোটা মোটা টাকার সেয়ার কিনে নেন। বাদ বাকী সেয়ার (ধরুন উক্ত পাঁচলক্ষ টাকা মূলধনের সাড়ে চার লক্ষ টাকার মোট ৪৫০০০ সেয়ার) জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য ফেলে দেন। একথা ঠিক যে, অতিরিক্ত লাভজনক কারবার না হলে উপযাচক হয়ে কেউ সেয়ার কেনে না, সেইজন্য কোম্পানী কমিশন বন্দোবস্তে উপযুক্ত দালাল নিযুক্ত করেন সেয়ার বিক্রয়ের জন্য। ঐ সমস্ত দালালরাই নানান যায়গায় ঘুরে উক্ত সেয়ার গছায় এবং এইভাবে মূলধন সংগৃহীত হলে পর কোম্পানীর কাজ সুরু হয়।

এপর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত সেয়ারের সঙ্গে সেয়ারের বাজারের কোনই সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, কেননা, উক্ত সেয়ার বিক্রয়ের জন্য সেয়ারের বাজারে ওঠেনি। অবশ্য একথা ঠিক যে, যদি অতিরিক্ত লাভজনক কোন কোম্পানী গঠনের পরিকল্পনা ঠিক হয় তাহলে তার সেয়ার কিনবার জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি লেগে যায় এবং সেক্ষেত্রে চাহিদা বেশী থাকার দরুণ সেয়ারের দর চড়ে; এই ব্যাপারে কোম্পানীর কাজ সুরু হ'তে না হতেই তার

সেয়ার সেয়ারমার্কেটে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ কোম্পানীরই প্রারম্ভিক অবস্থায় সেরকম সৌভাগ্য দেখা দেয় না এবং তজ্জন্যই প্রাইভেট দালাল দ্বারা সেগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। এখন ধরুন সেয়ার সমস্ত বিক্রয় হয়ে যাবার পর কোম্পানীর কাজ সুরু হ'ল কিন্তু কোম্পানীর কোন লাভ হ'ল না বা সামান্য লাভ হলেও কোম্পানী ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ ঘোষনা করতে পারলে না। সে অবস্থায় যারা সেয়ার কিনেছিল তারা দেখলে যে, লভ্যাংশ না পাওয়ায় টাকাটা আটকে থাকায় তাদের লোকসান; সুতরাং তারা সঞ্চিত সেয়ারগুলো বিক্রয় করে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং সেক্ষেত্রে সেয়ারের দর পড়ে যায়। এমনও দেখাগেছে যে, পর পর কয়েক বছর কোন লভ্যাংশ ঘোষণা না করার দরুণ দশ টাকার সেয়ারের দাম ক্রমশঃ নামতে নামতে আট আনায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই যে সেয়ার বিক্রয়ের জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হয়েছে কিন্তু তাদের ত জানা নেই কে সেয়ার কিনতে চায়—অত খোঁজ খবরও তারা রাখে না, কাজে কাজেই তারা সেয়ারের বাজারের দালালের নিকট সেগুলো ফেলে দেয় এবং এই সূত্রেই উক্ত সেয়ার এবার বাজারে উঠে। উক্ত দালাল তার কমিশনের আশায় প্রাণপণ চেষ্টায় বাজারে ঐ সেয়ারের খদ্দের খোঁজে। এমন অনেক লোক দেখা যায় যাদের ব্যবসা হ'ল সেয়ার কেনাবেচা করা, ইংরাজীতে একার্য্যকে Speculation বলে। তারা দেখেছে যে ১০৲ টাকায় সেয়ারটী বেশ সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে এবং তারা আশা করে যে কোম্পানীর অবস্থা এখন খারাপ গেলেও পরে ভাল হ'তে পারে এবং এখন যদি সেয়ার কিছু ধরে রাখা যায় ত পরে দর বাড়লে রীতিমত লাভবান হওয়া যাবে। এই ভরসাতেই তারা কম দামে সেয়ার কিনে নেয় এবং এই ভাবেই সেয়ার কেনাবেচা হয়।

কিংবা উপরোক্ত ব্যাপারের ঠিক উল্টোটাই ধরুন। কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হবার পর কারবারে খুব লাভ হল, সেক্ষেত্রে তারা সেয়ার পিছু মোটা লভ্যাংশ বিতরণ করলে এবং যারা সেয়ার কিনেছিল তারা খুব লাভবান হল। এই না দেখেই যারা সেয়ারে টাকা খাটায় তাদের অমনি চোখ টাটায় এবং তারা ঐ শেয়ার কিনবার জন্যে উসখুস করে। কিন্তু সেয়ার বেচবে কে? যদি আমার সেয়ার থেকে ডিভিডেণ্ড বাবদ টাকা আসে ত আমি নিশ্চয়ই তা' বেচতে গররাজী হব। কিন্তু লোককে বেচতেও হয়—কিরকম করে তাই দেখুন। সেয়ার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি দেখে যে, সেয়ারের দর যদি বেশী টাকায় দেওয়া যায় ত বোধ হয় লোকে তা বিক্রী করতে পারে এবং এইভাবে চাহিদা বেশী থাকার দরুণ সেয়ারের দর চড়ে। সেয়ার বিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি দেখে যে কম টাকায় কিনে বেশী টাকায় বেচার দরুণ তার থোক্ লাভ হচ্ছে সুতরাং সেক্ষেত্রে সে সেয়ার ছেড়ে দেয়। সেয়ারের দর কত উঠবে এবং কোন দরেই বা বিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি ছাড়তে রাজী হবে সেটা নির্ভর করে বাজারের পরিস্থিতি, কারবারের অবস্থা এবং ডিভিডেণ্ড ও সেয়ারের বৃদ্ধিকৃত দরের মারজিনের ওপর। আসলে দেখা গেছে যে, সেয়ারের দর বাড়তে বাড়তে যথাক্রমে ১০৲ টাকারটী ৫০।৬০ টাকায় এবং ১০০টাকার টী ৪০০০ টাকায় পৌছেচে এবং কোম্পানী উক্ত সেয়ারের উপর শতকরা ২০০।৩০০ টাকা পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করেছে। অবশ্য

একথা ঠিক যে, আজকাল আর ঐ রকম উচ্চ হারে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা সম্ভব হয় না। বর্ত্তমানে কোন কোন কোম্পানী যদি ২৫ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিলে ত সে খুব ভাল কোম্পানী হয়ে গেল। এই ভাবেই সেয়ারের বাজারে সেয়ারের দর উঠানামা করে।

অথবা অপর এক ব্যাপারের দরুণও সেয়ারের বাজারে সেয়ারের ক্রয় বিক্রয় সম্ভব হয়। কোম্পানী ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিলেও সেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে হয়ত কারও বিশেষ টাকার প্রয়োজন এবং হয়ত তার সেয়ারে হাজার টাকা লাগানো আছে। সেক্ষেত্রে সেয়ার যতক্ষণ না সে ভাঙ্গাচ্ছে অর্থাৎ বিক্রয় করছে ততক্ষণ তার টাকা পাবার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে সে সেয়ার বিক্রী করতে বাধ্য হয় এবং তজ্জন্য তাকে সেয়ার মার্কেটের দ্বারস্থ হতে হয়। কিংবা এর

উল্টোটি ধরুন। কোন লোকের হাতে টাকা জমে যাওয়ার দরুণ তার ইচ্ছা হল যে সেটা সে সেয়ারে খাটাবে। তখন তাকে সেয়ার মার্কেটের শরণ নিতে হয়। একথা ঠিক যে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখা অপেক্ষা লাভজনক শিল্পে টাকা খাটালে বেশী সুদ পাওয়া যায়। সেইজন্যই অনেকে হাতে টাকা থাকলেই তা' শিল্পবাণিজ্যে খাটাবার জন্য চেষ্টিত হয়। শিল্পবাণিজ্যে নিরাপদে টাকা খাটাবার প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল সেয়ার কেনা, আর সেয়ার কিনতে হ'লে সেয়ার মার্কেটের শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এইভাবেই সেয়ার বাজারে বেচাকেনা সম্ভব হয়।

সাধারণ লোকের সেয়ার বাজারে সেয়ারের দরের কি করে ওঠানামা হয় সে-সম্পর্কে একটা খট্‌কা আছে অর্থাৎ তাঁরা এই দর ওঠানামার ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারেন না। এই দর ওঠানামার ব্যাপারটা একটা বিচিত্র কিছু নয়, কারণ বাজারের মতই এর গতি ও প্রকৃতি। সাধারণ বাজারে মালের যোগান ও খরিদ্দারের চাহিদার সামঞ্জস্যের ওপরই দরের নির্দ্দিষ্টতা নির্ভর করে। সেয়ারের বাজারেও তাই। সেয়ার বিক্রয়েচ্ছুর সংখ্যা যদি বেশী হয় ও ক্রেতার সংখ্যা যদি কম থাকে তাহলে সেয়ারের দর ক্রমশঃ পড়ে যায়। পক্ষান্তরে, বিক্রেতার সংখ্যা যদি কম হয় ও ক্রেতার সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে চাহিদা বেশী থাকার দরুণ সেয়ারের দর চড়ে। এই হল দর ওঠানামার আসল রহস্য! তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দরের রীতিমত ওঠানামা ঘটে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁরা রীতিমত সংবাদপত্র পড়েন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, সম্প্রতি মাঞ্চুকু সীমান্তে রুশ-জাপানের যে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল তাতে তোকিওর সেয়ারের বাজারে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে যে যুদ্ধের মত একটা ভয়াবহ ব্যাপারে কারবার জগতের অবস্থা ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত আকার ধারণ করে। সেক্ষেত্রে লোকসানের আশঙ্কায় সবাই সেয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় (অবশ্য লাভজনক কারবার ছাড়া)। আবার যুদ্ধের সম্ভাবনায় কোন শিল্প ভালভাবে চালু হওয়ার আশা থাকে; সেক্ষেত্রে সেয়ারের দর চড় চড় করে চড়ে যায়। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধের নাম শুনলেই সেয়ার বাজারে একটা ওলটপালট ঘটে। ধরুন, কোন খাস্ ইউরোপীয় কোম্পানী বা ইউরোপে সংগঠিত এদেশে কারবারকারী কোন কোম্পানীর আপনি সেয়ার কিনেছেন, যদি যুদ্ধ বাধে বা যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সে সেয়ার বেচে দেবার জন্য ব্যগ্র হবেন, কেননা, যুদ্ধ লাগলে সেদেশ বা কোম্পানীর কি যে অবস্থা হবে তা' আপনি বলতে পারেন না, —এমনও হয়ে থাকে যে কোম্পানীর কারবার বন্ধ হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আপনার সমস্ত টাকা জলে যাবে কিন্তু আপনি যদি বেচে দেন ত আপনার টাকা আপনি উসুল করতে পারবেন। তবে মজা হচ্ছে এই যে, তখন কেহই কিনতে চায় না, অথচ সবাই ঝড়তি পড়তি যা থাকে বেচে দিতে ব্যগ্র হয়। কাজেকাজেই সেয়ারের দর হু হু করে নেমে যায় কিন্তু তবুও অত কম দামেও কেউ ভরসা করে কিছু কেনে না, কেননা কে টাকা জলে দিতে যাবে? সুতরাং সেক্ষেত্রে যারাই পূর্ব্বে সেয়ার ছেড়ে দিতে পারে তারাই বেঁচে যায়, নইলে, আর সবাই মরে। আবার পূর্ব্বেই বলেছি যে, এর উল্টোটিও ঘটতে পারে। যুদ্ধ লাগলেই গোটাকতক জিনিসের

অসম্ভব চাহিদা বাড়ে এবং সেইজন্তই সেই সেই দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহ প্রচুর লাভবান হয় কিংবা লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে ঐ সকল কোম্পানীর সেয়ারের দর ভয়ঙ্কর চড়ে যায়। শুধু যুদ্ধ নয়, এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর গোলমাল লাগলেও সেয়ার বাজারের দর ভয়ঙ্কর ওঠানামা করে। বেশ মনে আছে ১৯৩১ সালে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান ত্যাগ করবে বলে ঘোষণা করে তখন পৃথিবীর বিভিন্নস্থানের এক্সচেঞ্জ ও সেয়ারের বাজার কয়েকদিন বন্ধ ছিল।

এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি তার থেকে সেয়ারের বাজার কি জিনিষ এবং কি করেই বা সেখানে দর ওঠানামা করে সে সম্বন্ধে পাঠকগণ সবিশেষ ধারণা করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। এইবার কি ধরণের সেয়ার কিনলে লোকসানের ভয় কম থাকে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি মানসে দেশকে রীতিমত শিল্পসম্পন্ন করে তোলা দরকার এবং তা' করতে গেলেই অর্থশালী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কোম্পানীর সেয়ার ক্রয় করে শিল্পপ্রসারতার সাহায্য করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর নতুন কোম্পানীর সেয়ার ক্রয় করা সব সময় নিরাপদ নয়, কেননা, নতুন কোম্পানীর কাজকারবারে লাভ লোকসান কি দাঁড়ায় সে বিষয়ে পূর্ব্ব থেকেই সব সময় সঠিক ধারণা করা যায় না। সেইজন্য যাঁদের পুঁজি অল্প অর্থাৎ যাঁরা দু'দশশো নিয়ে কোন রকমে নাড়াচাড়া করে তার সুদ থেকে জীবিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পক্ষে নতুন কোম্পানীর সেয়ার না ক্রয় করে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা খাটানোই অধিকতর নিরাপদ। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, ষ্টক, সরগেজ ইত্যাদির একটা সুবিধা এই যে, এতে টাকা মারা যাবার কোন আশঙ্কা থাকে না কিন্তু তা' সত্ত্বেও একটা ভয়ঙ্কর অসুবিধা হচ্ছে যে এর সুদ অত্যন্ত অল্প। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি নিরাপদ হলেও এর থেকে লাভের পরিমাণ খুব কম। পক্ষান্তরে বে-সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সেয়ার ক্রয় করাটা নিশ্চিন্ত-নিরাপদের না হ'লেও তার থেকে লাভের পরিমাণটি খুব বেশী। অধিকতর লাভজনক কোম্পানীগুলি কি রকম উচ্চহারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করে সে-কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং যাঁদের বহুটাকা আছে এবং যাঁরা সেয়ারের কেনাবেচার ব্যবসা করে থাকেন তাঁদের পক্ষে এই রকম ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করা দরকার। তাঁরা যদি গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করে রাখেন তাহ'লে সেটা তাঁদের পক্ষে একান্ত লোকসানের। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নীকারী ধনীর সংখ্যাই বেশী—এটা দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে ভয়ঙ্কর অকল্যাণকর।

এর থেকে নাবালকের টাকা, বিধবার সম্পত্তি বা তদনুরূপ অর্থ গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে লগ্নী করা উচিত। অপরাপর নিরাপদ কোম্পানীর সেয়ারের উক্ত টাকা খাটানো যেতে পারে। কিন্তু ধনী লোকেরা দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারতাকল্পে যদি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে টাকা লগ্নী না করেন তাহাতে দেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে সকলের একটা

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। যে কোম্পানীতে লোকে টাকা লগ্নী করতে যাবে সে কোম্পানীর ব্যালান্স সীট ভালকরে পরীক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কোম্পানীর গলদ ঐ ব্যালান্সসীট থেকেই ধরা পড়ে। এমন কোম্পানীও দেখা যায় যার বাজারে খুব নামডাক কিন্তু ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে তার ভেতর ফোঁপরা। এই রকম কোম্পানীর সেয়ার কখনই কেনা উচিত নয়। পক্ষান্তরে এমন কোম্পানী দেখা যায় যার বাজারে তেমন নামডাক নেই কিন্তু ব্যালান্স সীটে কোন খুঁত দৃষ্ট হয় না। এইশ্রেণীর কোম্পানী দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজে কাজেই এর সেয়ার কেনায় কোন আশঙ্কা নেই।

সব শেষে আবার আমরা নিবেদন করছি যে, ধনীলোকদের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ইত্যাদিতে টাকা লগ্নী করা দেশীয় শিল্পপ্রসারতার পক্ষে একটী প্রতিবন্ধক। এতে তাঁরাও অল্প সুদ প্রাপ্তির জন্য আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হ'ন, জাতীয় সম্পদেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না। সুতরাং তাঁদের উচিত তাঁদের টাকাটা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যে নিযোজিত করা।

বাংলাদেশে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য

বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সংবাদ বাহির হইয়াছে ;—

এই প্রদেশের শিল্পোন্নতির কোন পরিকল্পনা ও কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে সমগ্র দেশটীকে একবার শিল্পের দিক হইতে ব্যাপক ভাবে জরীপ করিয়া দেখা দরকার এবং শিল্প সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই অনুসন্ধানের উপরেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট্ একটি তদন্ত কমিটি গঠিত করিয়াছেন। ডাঃ জন্ মাঠাই সি আই ই, ডি এস্ সি মহোদয় উক্ত কমিটীর চেয়ারম্যান। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার মেম্বার বা সদস্য হইয়াছেন,—

(১) মিঃ অমৃত লাল ওঝা
(২) ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ
(৩) ডাঃ জে পি নিয়োগী
(৪) মিঃ এম্ এ ইস্পাহানী
(৫) ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা
(৬) ডাঃ এস্ কে মিত্র
(৭) শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
(৮) মিঃ এস্ সি মিত্র
(৯) মিঃ বি এম্ বিড়লা।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ জে এন্ সেনগুপ্ত উক্ত কমিটির সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। ইহার তদন্তের বিষয়গুলি এই ,—

১। দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বৃহৎ ও মধ্যম রকমের শিল্প প্রচলিত আছে, তাহাদের অবস্থা পরীক্ষা। (ক) কোন্ শিল্প উন্নতির চরমে উঠিয়াছে (খ) কোন্ শিল্পের আরও প্রসার হওয়া সম্ভব ও আবশ্যক (গ) কোন্ কোন্ নূতন শিল্প এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যাহাতে নিশ্চিত সফলতা আসে।

২। বর্ত্তমান সময়ে দেশে প্রচলিত বড় ও মাঝারি রকমের শিল্পের উন্নতি পথে কি কি বাধা আছে,—এবং সে-সব কিরূপে দূর করা যায়।

৩। প্রচলিত শিল্পকারখানা সমূহের অবস্থান নির্দ্দেশ। দেশের বিভিন্ন বিভাগে কোন্ কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠার কল্পে সুবিধাজনক অবস্থা বিদ্যমান এবং কাঁচামাল, মূলধন ও মজুর,—শিল্পের এই তিনটী শক্তির ব্যবস্থা কোন্ বিভাগে কিরূপ আছে, তাহা নির্দ্ধারণ।

৪। বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের আনুষঙ্গিক এবং অধীন কোন্ কোন্ ছোট শিল্প চলিতে পারে। সাফল্যজনক ভাবে সে সব শিল্প কিরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৫। দেশে বৃহৎ ও মধ্যম রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প সমূহের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ। বিশেষতঃ যে সকল কুটীর শিল্প পুরুষানুক্রমে কোন বিশেষ শ্রেণীর অথবা জাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকারে তথ্যানুসন্ধান,—(ক) কি মূল্যে অথবা কিরূপ চুক্তিতে এবং কোন্ স্থান হইতে কাঁচামাল সরবরাহ হয়। (খ) মূলধন সংগ্রহ করিবার এবং কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধারে পাইবার কিরূপ সুবিধা আছে (গ) বাজারে মাল কাটৃতি করিবার ব্যবস্থা কিরূপ (ঘ) উৎপাদন বাড়াইবার কৌশল প্রয়োগের কি সুবিধা আছে।

৭। যে সকল কুটীর-শিল্প বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপে পুনর্জ্জীবিত করা যায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান।

৮। গ্রামে কোন্ কোন্ নূতন কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে অথবা কোন্ কোন্ নূতন কারবার ও কারখানা খোলা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান।

৯। গত ১৭ বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কতদূর ফলদায়ক হইয়াছে, এবং ঐ সকল উপায়ের মধ্যে কোন্‌টিকে বর্ত্তমান সময়ে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করা যায়, তৎপরিবর্ত্তে কোন্ কোন্ নূতন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও তথ্য নিরূপণ।

১০। প্রাদেশিক শিল্পোন্নতির সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট্ কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, সে বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান।

আশা করা যায়, এক বৎসরের মধ্যে এই শিল্প সম্বন্ধীয় জরীপ কার্য্য শেষ হইবে। তবে কমিটি প্রয়োজন বোধ করিলে কোন কোন বিষয়ের রিপোর্ট এক বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেও দিতে পারেন।

আমাদের মন্তব্য

বাংলাদেশের শিল্পোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টায় সকলেই আশান্বিত হইয়াছেন। সেইরূপ মামুলী ধরণের আশা আমরাও করিতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে অতীতের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাও আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তবে বর্ত্তমান সময়ের গবর্ণমেণ্ট অনেকাংশে দেশীয় লোকের হাতে এবং যাঁহারা এই কমিটির সদস্য হইয়াছেন, তাঁহারাও সকলে ভারতীয়। সুতরাং আমাদের আশা ভরসা যে একেবারে অমূলক একথাও বলিতে পারি না। আবার যখন সেই চলিত প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে,—"যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস"—তখন আমাদের আশার মধ্যে নিরাশার সঞ্চার হয়। ঐ গবর্ণমেণ্টের আসনে যিনিই বসেন, তিনি যতই শক্তিশালী, গুণসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান হউন না কেন,—কি এক মোহময়ী ছলনার আকর্ষণে জনসাধারণের হিতকর পন্থা হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। ইহাই আমাদের অতীতের দুঃখময় অভিজ্ঞতা।

প্রায় ২০ বৎসর হইল বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ যাবৎ গবর্ণমেণ্ট্ শিল্প সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ (Survey) বা জরীপ করিতে পারেন নাই;—

এতকাল পরে সেই কথা মনে পড়িল! এ যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা হইতেও সুগভীর! তবে নিদ্রা যে একেবারে মহানিদ্রা হয় নাই,—বর্ত্তমান প্রচেষ্টা তাহার প্রমাণ এবং এইটুকুই আমাদের সৌভাগ্য।

কিন্তু আমাদের ভয়,—ঐ তদন্ত কমিটীর গজেন্দ্র গমনকে। আর তদন্তই বা কি হইবে? বাংলাদেশের শিল্পব্যবসায়ের অবস্থা এখনও কি অজ্ঞাত? সাময়িক সংবাদপত্রে অথবা বিশেষজ্ঞ লিখিত পুস্তিকাদিতে যে সকল বিবরণ এবং আলোচনা প্রকাশিত হয় গবর্ণমেণ্ট কি তাহার কোন খোঁজ খবর রাখেন না? আমাদের মনে হয়, তদন্ত বা জরীপের পাঁয়তারা ছাড়িয়া এখন কাজ আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে।

পৃথিবীর বাজারে বাংলার পাটের স্থান নষ্ট হইতে চলিয়াছে,—তাহাকে বাঁচাইবার উপায় কি? পাটের নূতন ব্যবহার উদ্ভাবন,—উন্নত ধরণের পাট চাষ,—পাটের বাজার ও চট্‌কলের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ,—এই সব স্থির করিতে হইবে। বাংলাদেশে নারিকেল একটী প্রধান ফসল। অথচ নারিকেল চাষ, উহার তৈল নিষ্কাশন, এবং ছোবড়ার দড়ি তৈয়ারী এইসব কিছুরই ব্যবস্থা বাংলাদেশে নাই। বাংলার মৎস্যসম্পদ প্রচুর;- পৃথিবীর বাজারে তাহার স্থান হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বাজার দূরের কথা,—দেশের ক্ষুদ্র বাজারেও বাংলার মৎস্য সম্পদের ক্ষীণ চিহ্ন দেখা যায় না। মাছের তৈল, মাছের কাঁটার সার,—প্রভৃতি শিল্প দূরে থাক, দৈনিক আহারের জন্যই বাংলাদেশে মাছ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। তুলার জন্য বাংলাদেশকে পশ্চিম ভারতের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় কেন? ইক্ষুচাষ এবং শর্করাশিল্পের প্রসার বাংলাদেশে অসম্ভব ব্যাপার নহে। এই সকল বৃহৎ শিল্প ব্যতীত সাবান, চামড়া, মাটির জিনিস (পটারি), দিয়াশলাই, দুগ্ধ জাত দ্রব্য, কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য, প্রভৃতি নানা প্রকার ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনা বাংলাদেশে রহিয়াছে ইহাদের জন্য তদন্ত কমিটীর এমন কি প্রয়োজন আছে, আমরা বুঝিতে পারিনা।

কিছুকাল পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট নোয়াখালী, ২৪ পরগনা প্রভৃতি বাংলার কয়েকটি জেলার বিভিন্নস্থানে কেন্দ্র করিয়া যুবকদিগকে ছোবড়ার দড়ি, পাপোষ, মাদুর প্রভৃতি তৈয়ারী শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনেক যুবক এই শিল্পে শিক্ষিতও হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কোথায় গেল, তাহাদের কি হইল, এখন আর কিছুই দেখিতে পাইনা। তাহারা পুনরায় কেরাণীগিরি চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একথা শুনিলে আমরা আশ্চর্য্য হইবনা। গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল, অন্ততঃ দুই একটী নারিকেলের ছোবড়ার কারখানা খুলিয়া তাহাতে ঐ যুবকদিগকে কাজে লাগান। তাহা হইলে এদেশে নারিকেলের ছোবড়ার শিল্প যথার্থই গড়িয়া উঠিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা গবর্ণমেণ্টের সুবিবেচনার কার্য্যও বিস্মৃত হইতেছিনা। মুক্ত রাজবন্দী-দিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃৎশিল্পের উন্নতি কল্পে গবর্ণমেণ্ট বেলঘরিয়ার নিকট যে পটারিওয়ার্কস্ খুলিয়াছেন আমরা তাহার প্রশংসা করি। সবদিকে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ প্রচেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। এই পটারী ওয়ার্কসের জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার তদন্ত বসাইতে হয় নাই।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট শিল্প সম্বন্ধে জরীপের জন্য কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন, ভাল কথা। এক্ষণে আমাদের মন্তব্য এই যে উক্ত তদন্তের কার্য্য খুব শীঘ্র শেষ করিয়া তাহার রিপোর্ট অনুযায়ী অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করা হউক। অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে;—আর দেরী করা উচিত নয়। কাজ আরম্ভ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত ও জরীপ চলিতে পারে এবং উন্নতি ও প্রসারের জন্য যাহা যাহা পরিবর্ত্তন তাহা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

বাংলার নিজস্ব কতকগুলি বিশেষ শিল্প সম্পদ আছে। ধান, পাট, মাছ, নারিকেল, নানাবিধ ফল, দুগ্ধ, তৈল বীজ, প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। কাগজ তৈয়ারীতে বাংলার বাঁশ ব্যবহার হয়, বিবিধ বন্য বৃক্ষ দিয়াশলাই তৈয়ারীতে লাগে, দুগ্ধ হইতে ছানা বাংলাদেশ ব্যতীত (বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে) আর কোন দেশে তৈয়ারী হয় না। এই ছানা হইতে সুখাদ্য রসগোল্লা ও সন্দেশ আর কোন দেশের লোক তৈয়ারী করিতে জানেনা। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ভ্যাকুয়াম্ টিনে রসগোল্লা পুরিয়া সংরক্ষিত অবস্থায় বিদেশে চালান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এই সকল শিল্প সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের এই মাসিক পত্রিকায় আলোচনা এবং তৎ সংক্রান্ত বিবিধ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। অনেক বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী আমাদের পরামর্শ মত কাজ করিয়া এবং আমাদের প্রদর্শিত পন্থায় চলিয়া উপকৃত হইয়াছেন। আমাদের ইঙ্গিতে অনেক বেকার যুবক কাজের সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু গম্ভীরবেদী হস্তীর মত গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হয়না।

পরলোকগত স্যার কে, জি, গুপ্তের চেষ্টায় বাংলাগবর্ণমেণ্টের যে মৎস্য বিভাগ (ফিশারী ডিপার্টমেণ্ট) খোলা হইয়াছিল, তাহা অল্পকাল মাত্র কাজ করিয়াই উঠিয়া যায়। সেই ফিশারী ডিপার্টমেণ্টের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। মৎস্যের চাষ, মাছের ব্যবসায় এবং মৎস্যসংক্রান্ত বিবিধ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম। ফলে এই পর্য্যন্ত হইয়াছে,—গবর্ণমেণ্ট একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোককে বাংলার মৎস্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই মামুলী ধরণের 'তদন্ত' আর রিপোর্ট! কিন্তু যথার্থ কাজের দিকে কিছুই দেখিতে পাইনা।

এই সকল কারণে আমরা গবর্ণমেণ্টের তদন্ত কমিটি এবং তাহার রিপোর্টের উপর আস্থাহীন ও অবিশ্বাসী হইয়াছি। তথাপি আশাকরি বাংলাদেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা মন্থর গতি ছাড়িয়া দ্রুতগতিতে যথার্থ কাজের পথে আসিয়া পড়িবে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প মিউজিয়াম্

বাংলার শিল্পোন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এবং কিরূপে তাহাদের উন্নতি করা যায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। সেই সংবাদ এবং তাহার উপরে আমাদের মন্তব্য ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রকাশিত করিয়াছি। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় শিল্পদ্রব্যের একটী মিউজিয়াম খুলিবার আয়োজন করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন য়্যাভেনিউতে অবস্থিত (প্লট্ নং ৫৬) একটী প্রশস্ত গৃহে এই মিউজিয়াম স্থাপিত হইবে। ইহার প্রধানতঃ তিনটী বিভাগ থাকিবে।

প্রথম বিভাগে, নানাপ্রকার দেশী ও বিদেশী কাঁচা মাল,—তাহাদের সম্বন্ধে গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান,—ঐ সকল কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার। বিদেশী কাঁচামাল কোথায় কি পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তাহা কি কি শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল সংবাদ থাকিবে। দ্বিতীয় বিভাগে,—কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন বিবিধ শিল্পদ্রব্য এবং দেশ বিদেশের কাঁচামাল সম্বন্ধে গবেষণার ফল প্রদর্শিত হইবে। এই বিভাগে একই কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন দেশীয় শিল্পদ্রব্যের সহিত বিদেশীয় শিল্পদ্রব্যের তুলনা করিয়া বুঝা যাইবে কোন্ শিল্পের বাস্তবিক অবস্থান কোথায় এবং তাহার কতদূর উন্নতি করার আবশ্যকতা ও সম্ভাব্যতা আছে। তৃতীয় বিভাগে শিল্প সংক্রান্ত বিবিধ চিত্র, সংখ্যামূলক গণনার হিসাব প্রভৃতি সজ্জিত থাকিবে।

দেশে প্রচলিত নানা প্রকার যান বাহনের নমুনা এবং বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধীয় কল ও যন্ত্রপাতির ক্ষুদ্রাকৃতি মডেল সমূহ এই মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইবে। বিশেষ বিশেষ শিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা সপ্তাহে দুইটি কি তিনটি বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থাও করা হইবে। সুতরাং মিউজিয়মটি কেবলমাত্র কতগুলি জিনিষের প্রদর্শনী নহে; পরন্তু বিভিন্ন শিল্পের প্রক্রিয়া বাস্তবিক কিরূপে চলে এবং তৎসংক্রান্ত কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, সেই সব বিষয়ই মিউজিয়মে দেখান হইবে।

বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাহিরে খরিদদারদের সহিত শিল্প প্রস্তুতকারীদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া মিউজিয়ামের আর একটি প্রধান কার্য্য। শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী করিলেই হয় না,—বাজারে মাল কাটতি হওয়া চাই। সেইজন্য শিল্প প্রস্তুতকারী এবং খরিদদারের সঙ্গে যোগ থাকা আবশ্যক। প্রস্তাবিত মিউজিয়াম উভয়ের মধ্যে সেই যোগসূত্র স্থাপন করিবে। সুতরাং ইহা একদিকে যেমন শিল্পীদের শিক্ষাক্ষেত্র, প্রদর্শনী গৃহ, দোকান, এবং বিক্রয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারের উপায় স্বরূপ হইবে,—তেম্নি খরিদদার জনসাধারণের পক্ষেও একটি প্রধান সংবাদ বাহকরূপে কার্য্য করিবে।

ইহার আর একটি বিভাগ হইবে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী। কেবলমাত্র কলিকাতা সহরের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকিলে এই মিউজিয়ামের জনহিতকর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। গ্রামবাসীদের সহিত ইহার যোগ সাধন আবশ্যক। সুদূর পল্লীগ্রামের লোক যে প্রয়োজন মত কলিকাতায় আসিয়া এই মিউজিয়াম দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিবে এবং তদ্দ্বারা উপকৃতও হইবে, ইহা সম্ভব নহে। সেইজন্য প্রস্তাব হইয়াছে, এই মিউজিয়ামের সংশ্লিষ্ট একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী গঠিত হইবে। উহা পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যাইয়া নানাবিধ শিল্প তৈয়ারীর প্রণালী, শিল্পদ্রব্য সমূহের ব্যবহার এবং তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় সম্বন্ধে পল্লীবাসীদিগকে প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাইবে। প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা ম্যাজিক-লণ্ঠন বক্তৃতার সাহায্যে তাহাদের শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান অধিকতর সমৃদ্ধ করিবেন। বয়োবৃদ্ধদের শিক্ষার জন্য দেশে যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে এই ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর দ্বারা তাহারও বিশেষ সাহায্য হইবে।

লেবুর চাষ

ভারতবর্ষকে লেবুর দেশ বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। কত বিভিন্ন রকমের লেবু এদেশে জন্মায় তার সঠিক কোন হিসাব না থাকলেও নানান্ রকম লেবুরই আমরা আস্বাদ পেয়ে থাকি। চাষের খবর থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের অনেকখানি জায়গায়ই লেবুর চাষ হয়ে থাকে, যদিও সেই জমি খণ্ড খণ্ড ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। লেবুর মধ্যে কমলা ও সাইট্রাস্ ফলই সমধিক প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, কমলা ও সাইট্রাস্ ফল বৎসরের সব সময়েই সহজলভ্য নয়। একটি সময় আসে যখন লেবু প্রচুর পরিমাণে ফলে, তারপর সারা বছর আর তাদের দেখা মেলে না। কমলালেবুর মরশুম যে শীতকাল এটা সবাই জানেন অর্থাৎ ঐ সময়ে কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে ফলে, বাদবাকী সময় দু' একটা লেবু বাজারে পাওয়া গেলেও সে সময় লেবুর ফলনের সময় নয়। অথচ বৎসরের সব সময়ই লেবু খেতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। প্রকৃতি সারা বৎসর ব্যাপী ফলদা না হলেও মানুষ কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে সারা বৎসর লেবু ব্যবহার আয়ত্ত করে নিয়েছে। সে কৃত্রিম উপায় হচ্ছে লেবুকে জরিয়ে বোতলে পুরে রাখা বা লেবুর রস নিষ্কাষণ করে নিয়ে তা' বোতলে রক্ষা করা। এইভাবেই সারা বছর লেবুর আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। লেবুকে জরিয়ে রাখা বা লেবুর রস নিষ্কাষণ করা একটি বিশেষ শিল্প এবং পৃথক শিল্প; লেবু চাষে যে রকম লাভ এই ব্যাপারেও তার কাছাকাছি লাভ হতে পারে; শুধু তাই নয়, এই রকম কৃত্রিম উপায়ে যদি আমরা সমস্ত বছর ধরে লেবুর চাহিদা ও যোগান্ বজায় রাখতে পারি তাহ'লে লেবুর চাষের পরিমাণও ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, একটি পৃথক শিল্পও গড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে চাষীও দু পয়সার মুখ দেখে। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল দেশসমূহে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে একান্ত পশ্চাৎপদ। আমরা লেবুকে জরিয়ে রাখবার জন্য কোন চেষ্টাই করি না, অথচ আমাদের কত লেবু যে অপচয়ে নষ্ট হয় তার ইয়ত্তা নেই। এই পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ হ'ল আমাদের জ্ঞান ও ব্যবসায়-প্রবৃত্তির অভাব। নইলে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান যে জিনিস আয়ত্ত করে আমরাই সেটা আয়ত্ত করতে পারি না কেন? লেবুর রস, লেবুর মোরব্বা, লেবুর খোসা প্রভৃতির অসম্ভব চাহিদা জেনেও আমরা ঐ সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে চাই না কিসের জন্য?

কমলালেবু, পাতিলেবু, সাইট্রাস্ লেবু প্রভৃতির চাহিদা ও উপযোগিতা সম্পর্কে কিছু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। Anti-scorbutics হিসাবে ওগুলি সাধারণের নিকট

সুপরিচিত। শুধু টাটকা ফল হিসাবেই নয়, রস ও জেলি হিসাবেও লেবু খুব সমাদৃত হয়। অবশ্য সাইট্রাস্ ফলসমূহের রসকে স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষা করা অত্যন্ত শক্ত, কেননা, ফল হ'তে রস নিষ্কাষিত হবার পরমুহূর্ত্তেই তাতে একটা পরিবর্ত্তন আসে। এই পরিবর্ত্তনের সঠিক রূপ সম্বন্ধে কিছু না জানা গেলেও এ-সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা চলেছে এবং আশা করা যায় যে, শীঘ্রই আসল স্বরূপটি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রসকে স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষা করতে সমর্থ হ'ব। টেকনিক্যাল্ দিক দিয়ে সাইট্রাস্ জাতীয় ফল দু'ভাগে বিভক্ত ঃ তার বাইরেকার অংশের নাম হ'ল ফ্ল্যাভেডো (flavedo), ভিতরের সাদা অংশের নাম হ'ল য়্যাল্‌বেডো (albedo)। ফ্ল্যাবেডো অংশেই আবশ্যকীয় তৈল-পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, এই তৈল পদার্থের পরিমাণ যদি আবার শতকরা ·০৫ ভাগের বেশী হয় তাহ'লে রসের গন্ধে বেশ terpene আধিক্য ঘটে। যদি তৈল পদার্থের পরিমাণ শতকরা ০·০১ বা ০·০৩ থাকে তাহ'লে রসের স্বাদের কোন তারতম্য ঘটে না। য়্যাল্‌বেডোয় প্রচুর পরিমাণ পেক্টিন পদার্থ (pectin) বর্ত্তমান থাকে এবং এই পেক্টিন আধিক্যে রসের একটু তিক্ত স্বাদ হয়। সেইজন্য লেবুর রসকে ফ্ল্যাভেডো ও য়্যাল্‌বেডো থেকে মুক্ত রাখা দরকার এবং দেখা দরকার যাতে তৈল পদার্থের শতকরা ভাগের আধিক্য না ঘটে।

এই রস নিষ্কাষণের ব্যাপারে কি রকম ফল ব্যবহৃত হবে সেধারে লক্ষ্য রাখা দরকার। ফল কাঁচা বা অত্যধিক পাকা হ'লে রসের ভাল আস্বাদ থাকে না, সুতরাং গাছপাকা তৈরী ফলই ব্যবহার করা প্রয়োজন। পাকা তৈরী ফলে শর্করার ভাগ বেশী থাকে, কাজেই তার রসও খুব মিষ্ট হয়। কাঁচা ফল বা ঠিক তৈরী হবার পূর্ব্বে পাড়া ফলের রসের স্বাদ ও গন্ধ ভাল হয় না। তৈরী ফল পেড়ে তাকে পাকিয়ে নিলেও কাজ চলে। সকল দিক দিয়ে বিচার করলে গাছপাকা ফলই উৎকৃষ্ট কিন্তু তৈরী ফল নাড়ানাড়ি বা চালানী কাজের পক্ষে সুবিধা-জনক। নিকৃষ্ট ধরণের রসকে কোনমতেই উৎকৃষ্ট রসে পরিণত করা চলে না। রস নিষ্কাষণ করবার পূর্ব্বে ফলকে বিশেষভাবে ধুয়ে নেওয়া দরকার, নইলে, ফলের রসের নানারকম ক্ষতি হ'তে পারে।

এক্ষণে, ফলের রস নিষ্কাষণের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক্। রস-নিষ্কাষণের দ্বিবিধ প্রক্রিয়া আছে ঃ—(১) লেবুকে দু-আধখানা করে বিশেষভাবে নির্ম্মিত যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া ; (২) লেবুকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে হাইড্রোলিক প্রেস বা স্ক্রু এক্স্‌পেলারের সাহায্যে পেষণ করা। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে বেশী রস পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে অসুবিধাও আছে, কেননা, নিষ্কাষিত রসের সঙ্গে তৈল ও বায়ু মিশ্রিত থাকে।

কমলালেবুর রসকে টিন বা বোতলে ভর্ত্তি করে বেশী দিন ঠিক রাখা যায় না। বেশী দিন রাখলে ওর আস্বাদ ও সুগন্ধ নষ্ট হয়। এই আস্বাদ ও সুগন্ধ নষ্ট হওয়ার সঠিক কারণ নির্ণয় সম্পর্কে কেমিষ্টগণ রীতিমত গবেষণা চালাচ্ছেন এবং কি করে কমলালেবুর রসকে বেশী দিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ রাখা যায় সে সম্পর্কেও প্রভূত প্রচেষ্টা চলেছে। অনেকে অক্সিডেশন-কেই

ফলের স্বাদ নষ্ট হওয়ার কারণ বলে নির্দ্দেশ করেন। Pasteurisation এর দ্বারা এর হাত থেকে কতকটা রেহাই পাওয়া যায়। কমলা-লেবুর রস খারাপ হলেই তার রঙ্ কালো হ'তে সুরু করে—জল জমার তাপে ঠাণ্ডা গুদামে রেখে দিলে রঙ্ আর পাল্টায় না। কিন্তু তাতেও স্বাদ ও সুগন্ধের নষ্ট হয় না। তবুও সাধারণ তাপে রাখার চেয়ে ঠাণ্ডা গুদামে রাখলে জিনিষটা অনেকাংশে ভাল থাকে। রসের মধ্যে অক্সিজেনের অবস্থিতিই অনেকে আস্বাদের তারতম্যের কারণ বলে মনে করেন, সুতরাং বায়ুশূন্য অবস্থার মধ্যে যদি রস নিষ্কাষিত করা যায় তাহলে অক্সিজেনের অবস্থিতি দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু স্বাদের তারতম্য ঘটবার অক্সিজেনই একমাত্র কারণ নয়, ফলের কোয়ালিটির তারতম্যের দরুণও আস্বাদ খারাপ ভাল হয়ে থাকে। কাঁচা বা ভাল তৈরী হয়নি এমন ফল থেকে রস নিষ্কাশন করলে তার আস্বাদ খারাপ হয়। অনেকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ফলকে টিনে বা বোতলে রক্ষা করলে তার 'সি' খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই অভিমতের মূলে কোন সত্যতা নেই। ফলকে টিনে বা বোতলে রক্ষা করার দরুণ খাদ্যপ্রাণ 'সি' নষ্ট হয় না, খাদ্যপ্রাণ 'সি' নষ্ট হয় অক্সিডেশনের দরুণ। টিনের পাত্রে খাদ্যপ্রাণ 'সি' একবৎসর পর্য্যন্ত অটুট থাকে। জমাট বাঁধা অবস্থায়ও কমলালেবুর রসে খাদ্যপ্রাণ 'সি' বিশমাস পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না।

টিনে রক্ষা করা ছাড়াও সাইট্রাস্ ফলের রসকে বোতলে ভর্ত্তি করে রাখা যায় এবং এটিও একটি বিশিষ্ট শিল্প। এই শিল্পকার্য্যের দুটি টেক্‌নিক আছে—

(১) রস নিষ্কাষন করা

(২) বোতলে ভর্ত্তি করা

রস নিষ্কাষনের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বোতলে ভর্ত্তি করার ব্যাপারে বিষয়ীদৃষ্টি অর্থাৎ ব্যবসা বুদ্ধিটী একটু সজাগ রাখা প্রয়োজন। বোতল ও বোতলে প্যাক করার খরচ, ফলের দাম, ডিপ্রিসিয়েশন চার্জ্জ প্রভৃতি খতিয়ে দেখে এবং এইভাবে মোট উৎপাদন খরচ ঠিক করে তবে বাজার দর নির্দ্দিষ্ট করতে হয়। এই ব্যাপারে এটী বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, বাজারে ক্রেতারা যে দর পছন্দ করে তার বেশী চড়া দর যেন নির্দ্দিষ্ট করা না হয়, কেননা ক্রেতারা তখন কৃত্রিম ও সস্তা বস্তুর দিকে ঝোঁকে। তবে এটী ঠিক যে, টাটকা ফলের রস পেলে ক্রেতারা তা গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। ফলের রসের স্বাদ ও গন্ধ যদি মনোরম হয় তাহলে ক্রেতারা তা অতি-মাত্রায় পছন্দ করে। সাইট্রাস্ ফলের রসে চিনি এ্যাসিড্, এ্যাসিড্‌সল্ট, প্রভৃতি উপাদানসমূহ প্রধান, কিন্তু এই সমস্ত পদার্থের অবস্থিতির পরিমাণের তারতম্য ঘটে থাকে। এই তার-তম্যের কারণ হ'ল ঋতুর প্রভাব ও ফলের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা। অনেকে রসের তাজা রঙ্ পছন্দ করে থাকেন এবং সেইজন্য কৃত্রিম উপায়ে লেবুর রসকে রঙীন করা হয়। টিনে ভর্ত্তি রসের চেয়ে বোতলে ভর্ত্তি রস উপাদেয়।

ফলের রসকে ঠাণ্ডায় জমিয়েও ঠিক ভাবে রক্ষা করা যায়, তবে এটা ঠিক যে তাতে টাটকা ফলের মত আস্বাদ থাকে না। উক্ত রসকে ফিলটার করে নেওয়া প্রয়োজন এবং সন্ধ

পরিশ্রুত রসে অক্সিডেশন্ দেখা যায় না। ধীরে ধীরে জমানোর চেয়ে তাড়াতাড়ি জমানোই সুবিধাজনক। জমাট বাঁধার পর রসের পরিমাণ (volume) শতকরা ৭'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। লবণ-জল বা আইসক্রীম জমাবার কলের সাহায্যে উক্ত জমাটবাঁধার কার্য্য সম্পন্ন করতে হয়। যদি তাড়াতাড়ি ব্যবহার করবার হয় তাহলে কাগজের পকেটে মুড়ে তা' বিক্রয় করা চলে, যদি কিছুদিন পরে ব্যবহার করতে হয় তবে টিনের পাত্রে প্যাক করাই সমীচীন।

ফুটবল সম্পর্কিত ব্যবসা

আমাদের দেশের অধিকাংশ ফুটবল খেলোয়াড় ও দর্শকবৃন্দ খেলার মাঠে ফলাফল লইয়াই উত্তেজনায় মশগুল থাকেন, কিন্তু ফুটবল খেলার জন্য কি বিরাট ব্যবসা বাণিজ্য চলিয়া থাকে তাঁহারা তাহার হিসাব রাখেন কমই। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর ফুটবল খেলার জন্য যে ব্যবসা চলে, নিম্নে তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল।—

১। ইংলণ্ডের বড় বড় ফুটবল ক্লাবগুলির বৎসরে ৫০ হইতে ৮০ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত আয় হইয়া থাকে।

২। বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল, কলেজ, ও অন্যান্য ছোটখাট দলের খেলার জন্য বৎসরে ফুটবল বিক্রী হয় ২০ হাজার ডজন অর্থাৎ ২৪০,০০০টী। গড়ে প্রত্যেকটী ফুটবলের মূল্য ৭॥ শিলিং ধরিয়া লইলেও উপরোক্ত সংখ্যক ফুটবলের মূল্য ৯০,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১৩৫০০০০টাকা) হয়!

৩। ২৪০,০০০০টী বল তৈয়ারী করিতে কি পরিমাণ চামড়ার দরকার হয় তাহার হিসাব করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটী ফুটবল তৈয়ারী করিতে ৩ বর্গ ফুট চামড়ার প্রয়োজন হয়। একটা গরুর চামড়ায় ১৫ হইতে ২০টী বল তৈয়ারী হইতে পারে, সুতরাং ২৪০,০০০টী বল তৈয়ারীর জন্য দরকার হয় ১২ হাজার গরুর চামড়ারও অধিক। সাধারণতঃ গরুর চামড়ায় পেট ও বুকের অংশে ফুটবল তৈয়ারী হয় এবং বাকী অংশে তৈয়ারী হয় ফুটবলের বুট।

৪। ফুটবলের বিভিন্ন টুকরাগুলি সেলাইয়ের জন্য যে টোয়াইন সুতার আবশ্যক হয় তাহার হিসাব করিলে দেখা যায় যে গড়ে প্রত্যেকটী ফুটবল সেলাই করিতে ৬০ ফিট টোয়াইন সুতার দরকার, এই হিসাবে ২৪০,০০০ ফুটবল সেলাইয়ের জন্য দরকার ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ টোয়াইন সুতা অর্থাৎ এ্যাটলান্টীক মহাসমুদ্রের দৈর্ঘ্য পরিমিত সুতা।

ইংলণ্ডের কম বেশী ১৮,০০০টী ফুটবল খেলার মাঠ আছে, সুতরাং ১০ হাজার জোড়া গোল-পোষ্টও নিশ্চয়ই আছে। যে কাঠে সাধারণতঃ ফুটবল খেলার গোলপোষ্ট তৈয়ারী হয়, তাহাতে প্রত্যেক জোড়া পোষ্টের জন্য ব্যয় পড়ে ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিংএর মত। প্রত্যেক জোড়া গোলপোষ্ট ৫ বৎসর থাকে ধরিয়া লইলে ৫বৎসর গোলপোষ্টের জন্য ব্যয় হয় ২৭৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ বৎসরে ৫ হাজার পাউণ্ডের অধিক। অবশ্য এদিক হইতে আমাদের দেশের হিসাব চিন্তা করা দরকার হয় না, কারণ শহর ব্যতিরেকে পল্লী অঞ্চলে বংশদণ্ডেই গোলপোষ্ট তৈয়ারীর কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

৬। গোলপোষ্টের নেটের হিসাবে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের মোট খেলার মাঠের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ মাঠে অর্থাৎ ৬০০০ মাঠে নেট ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে ৩

হাজার জোড়া নেট দরকার হয়। প্রত্যেক জোড়া নেট বুননের ৮ শত গজ দড়ির বা নেট বুননের সূতার দরকার হয়। তাহা হইলে মোট দরকার হইল ৩ হাজার মাইল নেটের দড়ি। এক জোড়ায় ৫ বৎসর চলে ধরিয়া লইয়া নেটের মূল্য হিসাব করিলে দেখা যায় যে ৫ বৎসরে নেটের জন্য দরকার ১৪,২৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ বৎসরে ৩ হাজার পাউণ্ড।

এখন ফুটবল খেলোয়াড়দিগের সাজসজ্জা অর্থাৎ ফুটবল বুট, মোজা, প্যাণ্ট ইউনিফরম প্রভৃতির জন্য কি পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার একটা হিসাব দেখা যাউক। ইংলণ্ডের ১০ হাজার খেলার মাঠে খুব কম করিয়া ধরিলেও ২২০,০০০ লোক প্রত্যহ খেলিয়া থাকে এবং উক্ত সংখ্যক খেলোয়াড়দিগের শুধু মাত্র সার্টের খরচের জন্যই ১০০,০০০ পাউণ্ড দরকার হয়, প্যাণ্টের জন্যও কম বেশী ৭৫,০২০ পাউণ্ড দরকার হয়, আর মোজার জন্যও ৫০ হাজার পাউণ্ডের উপর খরচ পড়ে। প্রতি বৎসরে বুটের জন্য খরচা হয় ৭৫ হাজার হইতে ১ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে।

এইখানে ইংলণ্ডে ফুটবল খেলার সম্পর্কে যে বিরাট ব্যবসায়ের বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইল। কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে এমন কোনও স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা নাই যেখানে ছাত্রদের ফুটবল খেলার ক্লাব বা দল না আছে। বাংলার প্রত্যেক পল্লীতেই এখন ফুটবল খেলার বিপুল উদ্যোগ আয়োজন দেখা যায়। হকী, ব্যাডমিণ্টন, ভলীবল ক্রীকেট প্রভৃতি সহরের প্রগতিপরায়ণ স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ফুটবল কিন্তু ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে জন সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তাই এদেশেও ব্যাপকভাবে এই সম্পর্কীয় ব্যবসা অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। কলিকাতা সহরে অনেকগুলি বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত দোকানে এই সব দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু অবাঙ্গালীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীতা এব্যাপারেও কম নহে। কোয়ালিটীর দিকে বিশেষ নজর রাখিয়া Competitive price এ যাহাতে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারেন সেই বিষয়ে ইঁহাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আমরা পরামর্শ দিতেছি। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। তাঁতীরা যেদিন হইতে কাপড় বোনার মধ্যে খোলপাত এবং মুখপাত এর সুরুকবিল সেই দিন হইতে তাহাদের ব্যবসাতেও ঘুণ ধরিল। উপরে দেখতে খাসা ঠাস বুনানী কিন্তু ভিতরে একেবারে জাল—এরূপ চাতুরীর ব্যবসা কত দিন থাকে? ফুটবলের ব্যবসা সম্বন্ধেও এইরূপ নানা গলদ বাহির হইতেছে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ সাবধান।

কৃষি তত্ত্বের কথা

বাঙ্গলায় তুলার চাষ

বাঙ্গলা দেশে ক্রমেই কাপড়ের কলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। বাঙ্গালার কাপড়ের কলের জন্য বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ হইতে তুলা আমদানী হয়। অন্যান্য ফসল অপেক্ষা তুলার মূল্য অধিক, সেজন্য চাষিগণ লাভও পায় বেশী। বাঙ্গলা দেশ এই তুলা ক্রয় করিয়া মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইর চাষিগণকে লাভবান করিতেছে কিন্তু বাঙ্গলার চাষিগণ ধান্য ও অন্যান্য চাষে যে লাভ পায় তাহাতে তাহাদের সমস্ত বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলন হয় না, সেজন্য তাহারা ঋণগ্রস্ত হয়। বাঙ্গলা দেশে যদি তুলার চাষ করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গলার চাষিগণ বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের চাষিগণের ন্যায় লাভবান হইতে পারে। বাঙ্গলার চাষিগণ তুলার চাষ করিলে তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, তাহারা বাঙ্গলায় কাপড়ের কলসমূহে তুলা বিক্রয় করিতে পারিবে।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে কাপড় তৈয়ারী হইত তখন গ্রামেই তুলার চাষ হইত ও তন্তুবায়গণ তাহা হইতে সূতা তৈয়ারী করিয়া কাপড় বয়ন করিত। বাঙ্গালী তাঁতিগণ অপর প্রদেশ হইতে তুলা ক্রয় করিত না। প্রাচীনকালে যে সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বাঙ্গলা দেশ বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহারও তুলা বাঙ্গলায়ই উৎপন্ন হইত। আজকাল বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল হইয়াছে। এখন বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিকে কেন অপর প্রদেশের তুলার জন্য নির্ভর করিতে হইবে?

পূর্ব্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের চাষিগণ পাটের চাষ করিয়া অন্যান্য ফসল উৎপন্নকারীগণ অপেক্ষা অধিকতর লাভ করে। তেমনি পশ্চিম বঙ্গের চাষিগণ যদি তুলার চাষ করে তবে তাহারাও অধিক লাভ পাইতে পারে। কাপড়ের কলের জন্য যে তুলার প্রয়োজন তাহা লম্বা আঁশের হওয়া প্রয়োজন। এই লম্বা আঁশের তুলা পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে। সম্প্রতি ইহা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মিঃ বিরলা বাঙ্গালা গভর্ণ-

মেণ্টের কৃষি বিভাগের হস্তে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। এই পরীক্ষা সম্পর্কে বাঙ্গালার কাপড়ের কল সমূহের সমিতি স্থাপন ও তাহাতে সাহায্য করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমানের পশ্চিম অংশ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের পশ্চিম অংশে এই তুলা প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে। যদি ঐ সকল অংশে লম্বা আঁশের তুলার চাষ হয় তবে তথাকার চাষিগণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক আয় করিতে পারিবে।

বাঙ্গলা দেশে তুলার চাষ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে অপর এক কারণে। বাঙ্গলার যে ১২।১৩টি কাপড়ের কল চলিতেছে ও যতগুলি কাপড়ের কল স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে প্রচুর তুলার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে বাঙ্গালা দেশকে অপরাপর প্রদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। তদুপরি ঐ তুলা অপর প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় আনিবার জন্য রেল ভাড়া দিতে হয়। এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে যদি তুলা উৎপন্ন করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে তুলা উৎপন্ন হইলে তুলা ক্রয়ের অর্থ বাঙ্গালা দেশে থাকে। তাহার ফলে বাঙ্গালী টাকার মুখ দেখিতে পাইবে। ইহা ব্যতীত রেল ভাড়া দিয়া বাঙ্গলা দেশে তুলা আনয়ন না করায় উৎপন্ন কাপড়ের মূল্য কম হইবে। ইহাও বাঙ্গালীর পক্ষে সুবিধার কারণ হইবে। এই সকল কারণে বাঙ্গলাদেশে তুলার চাষের প্রয়োজন।

আমেরিকায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লইয়া তুলার চাষ করে। আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ জমি লইয়া তুলার চাষ করিলে অল্প দিনেই যে লাভ করিতে পারিবে, চাকুরী করিয়া সেরূপ আয় করা কখন সম্ভব হইবে না।

শিক্ষিত যুবকগণ আধুনিক প্রথা অবলম্বন করিয়া অধিক তুলা উৎপন্ন করিতে পারিবে। এইরূপে বেকার সমস্যা কতকটা সমাধান হইবে।

বাঙ্গলা দেশে তুলা উৎপন্ন হইলে বাঙ্গলা দেশেই তাহা হইতে কাপড় তৈয়ারী হইবে। তখন আমরা পুরাপুরি প্রাচীনকালের ন্যায় বাঙ্গলার উৎপন্ন তুলা দ্বারা বাঙ্গলা দেশের প্রস্তুত কাপড় পাইব অর্থাৎ বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এক একটি চিনির কল সেই এলাকার সমস্ত ইক্ষু যেমন ক্রয় করে বাঙ্গলা দেশেও কয়েকটি কলও তেমনি কোন কোন এলাকার তুলা ক্রয় করিয়া চাষী গণকে সাহায্য করিতে পারিবে। বাঙ্গলা দেশে তুলার চাষ বিস্তৃত করিবার জন্য বাঙ্গলার মিল পরিচালকগণ উৎসুক হইয়া নানা স্থানে পরীক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে ঢাকেশ্বরী মিল ঢাকায় তুলা গাছ উৎপন্ন করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ সকল তুলা গাছে উত্তম তুলা উৎপন্ন হইতে পারে। তুলা উৎপাদন সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া ঢাকেশ্বরী মিল পথ প্রদর্শক লইয়াছেন।

আমরা আশা করি গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা দেশে তুলার চাষ বিস্তৃত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন এবং বাঙ্গলা দেশকে তুলা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইবার জন্য সাহায্য করিবেন। বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশ যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হয় তাহার জন্য বাঙ্গালীর বাঙ্গলা-দেশের কাপড় ক্রয় করিয়া বাঙ্গলার মিলগুলিকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজনৈতিক নেতাগণ যে স্বপ্ন দেখিতেন ও তাহা সফল করিবার জন্য বঙ্গলক্ষ্মী মিল স্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদের সে স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কার্য্য করা বিশেষভাবে উচিত। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সকলের একদিকে তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করার জন্য উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, অপর দিকে মিল স্থাপন করিতে হইবে এবং কেবল বাঙ্গলার কাপড় ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হৌক বাঙ্গলার কাপড় কম মিহি, হউক না কেন বাঙ্গলার কাপড় বর্ণে ও সৌন্দর্য্যে নিকৃষ্টতর, তথাপিও দেশের উন্নতির জন্য, জাতির অর্থাগমের জন্য ও স্বাবলম্বী হইবার জন্য আমাদের সকলের বাঙ্গলার কাপড় ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা গান্ধী চরকা দ্বারা স্বরাজ আনিতে চাহিয়াছিলেন আমরা তুলার চাষ করিয়া বাঙ্গলাকে প্রথমে স্বাবলম্বী করিব, চাষীদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিব, ও বেকার সমস্যা সমাধান করিব বলিয়া বদ্ধপরিকর হই। দেশের উন্নতিসাধন আমাদেরই করিতে হইবে অপর কেহ উন্নত করিয়া দিবেনা।

পাটজাত দ্রব্যের নানা ব্যবহার

আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ড জেলায় সম্প্রতি যে প্লাবন হইয়াছে তাহাতে নদীর বাঁধ এবং নদীর গতিরোধ করিবার বাঁধে সহস্র সহস্র বালুপূর্ণ চটের থলিয়া দ্বারা ঐ সকল স্থান দৃঢ় করা হইয়াছে। রকভিলের লেকশ্লিপসিকে নদীর গতিরোধ করিবার বাঁধ দৃঢ় করিবার জন্য ১০ হাজারেরও অধিক বালুপূর্ণ থলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। মাঝিগণ বালুপূর্ণ থলিয়া নৌকায় বহন করিয়া হ্রদের গভীর স্থানে বালুর থলিয়াগুলি জলে ফেলিয়া দিয়া উক্ত বাঁধের উপর চাপ হ্রাস করিয়াছে। ঐ অংশে বহুতর স্থানে ঐরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসের ৮নং বুলেটিনে এই কৌতুহলপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীতে আর্জেণ্টাইন মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী, তুরস্ক, মাঞ্চুরিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় উক্ত বুলেটিনের পত্রলেখকগণ যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকল বহু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত উক্ত কমিটির মাসিক কার্য্যসমূহের বিবরণীও প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে পাট উৎপন্ন কত হয়, কত ব্যবহৃত হয় এবং পাট দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের পরিমাণ তৎসহ মজুদ পাটের পরিমাণও প্রকাশ করা হইয়াছে। আর্জেণ্টাইনের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ঐ সময়ে ভুট্টা চালানের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। শস্য বিক্রয়ের সর্ব্বাপেক্ষা আশা জনক সময় প্রায় আসিয়াছে। উহার অবস্থা এরূপ উত্তম যে তাহার পরিমাণ অনেক বেশী হইবে বলিয়া সাধারণতঃ সকলে আশা করিতেছে। তাহার ফলে অনেক চটের থলিয়া প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষই চটের দ্রব্য সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রধান।

আমদানীর শতকরা ৮০ ভাগ ভারত হইতে আসে। বাকী ১০ হাজার গাঁইট বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং য়ুরোপের অপরাপর দেশ সমূহ হইতে যায়। একটি কৌতুহলপ্রদ বিষয় এই যে, যে গম প্রচুর পরিমাণে আর্জেণ্টাইন হইতে এখনও চটের থলিয়ার ব্রেজিলে চালান হয় তাহা বিনা শুল্কে ব্রেজিলে যাইতে পারে এবং তাহা তৎক্ষণাৎ বিক্রয় হইয়া যায়। অপর দিকে নূতন চটের থলিয়ার উপর আমদানী ট্যাক্স ধার্য্য আছে। উক্ত বিবরণীতে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প কারখানা সমূহের জন্য চটের থলিয়া বিক্রয় ও রপ্তানী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বিদ্যুতের তারের কেবল্ পরিষ্কার করিতে একইরূপ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পাটের সূতার প্রয়োজন। গটাপার্চ্চা দ্বারা আবৃত তারের চতুর্দ্দিকে ঐ তারকে রক্ষা করিবার জন্য পাটের সূতার প্রয়োজন হয়। তারে ইস্পাতের তার জড়ান হয়। পাট এই তারের কেব্‌লকে রক্ষা করিয়া থাকে।

সমুদ্রতলের মধ্য দিয়া যে টেলিগ্রাফের তার যায় তাহাতে যে পার্ট ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণের যে হিসাবে ধরা হয় তাহার প্রতি মাইলে ১০ মণ পাটের সূতা প্রয়োজন হয়। ওয়েষ্টার্ণ য়ুনিয়ন কেব্‌ল্‌ কোম্পানী ৩২ হাজার মাইল কেব্‌ল্‌ বসাইতে ১৩ হাজার টন পাটের সূতা ব্যবহার করিয়াছে।

সম্প্রতি পাট ও রজন মিশ্রিত করিয়া হাইড্রলিক চাপ দিয়া যে জুটেক্স নামে এক পদার্থ অষ্ট্রিয়ার একটী কারখানা প্রস্তুত করিয়াছে তদ্দ্বারা ষ্টীম ইঞ্জিনের অংশ, মোটর ও মোটর গাড়ীর অংশ এবং শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত দ্রব্য সকল তৈয়ারী হইতেছে। ইহা ধাতুর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতু অপেক্ষাও উত্তম কাজ দেয়। এই দ্রব্য দ্বারা বহু জিনিষ তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

যেহেতু সুলভ বলিয়াই পাটের এত সমাদর এবং পাটের পরিবর্ত্তে অন্য পদার্থ ব্যবহার করিবার জন্য নানাদেশে চেষ্টা চলিতেছে তজ্জন্য যাহাতে উত্তম রকম পাট উৎপন্ন হয় এবং পাটের দ্রব্য উত্তম তৈয়ারী হয় তাহাই ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির উদ্দেশ্য।

পাটের পরিবর্ত্তে যে সকল অপর দ্রব্য তৈয়ারী হইয়াছে তাহার মধ্যে যাভার রোজেনস্ শনই উল্লেখযোগ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছে। যে কল এই দ্রব্য দ্বারা জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছে তাহা পূর্ণবেগে কার্য্য চালাইয়াছে। রোজেন থলিয়া পাট অপেক্ষা উত্তম এবং উৎপন্ন স্থানে পাটের থলিয়া অপেক্ষা সুলভ এবং তাহার চাহিদার সংখ্যা অনেক অধিক। যাভায় এখন কুড়ি হইতে ৩০ লক্ষ থলিয়া তৈয়ারী হয়।

থলিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আগামী ৩।৪ বৎসরের মধ্যে যাভার প্রস্তুত বলিয়া তথাকার চিনির কারখানার জন্য যত থলিয়ার প্রয়োজন এই কারখানা তত সরবরাহ করিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির কার্য্যের মধ্যে অপর একটি কার্য্য হইল পাবনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং শ্রীহট্টে লক্ষ্যে করিয়া পাট ক্রয় বিক্রয়ের অবস্থা পরিদর্শন এবং চুঁচড়ার গ্রীণ জাতীয় পাটের উন্নত বরণের বীজ সরবরাহের ঠিকা লওয়া। পাটের বীজ অধিকতর সরবরাহের জন্য অধিক পরিমাণে বীজ উৎপন্ন করিবার তদারক করা এবং শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা করাও কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য্য তালিকাভুক্ত।
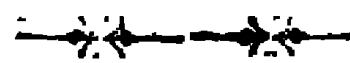
স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

ফল ও তাহার ব্যবহার

(শ্রীসুকুমার মিত্র)
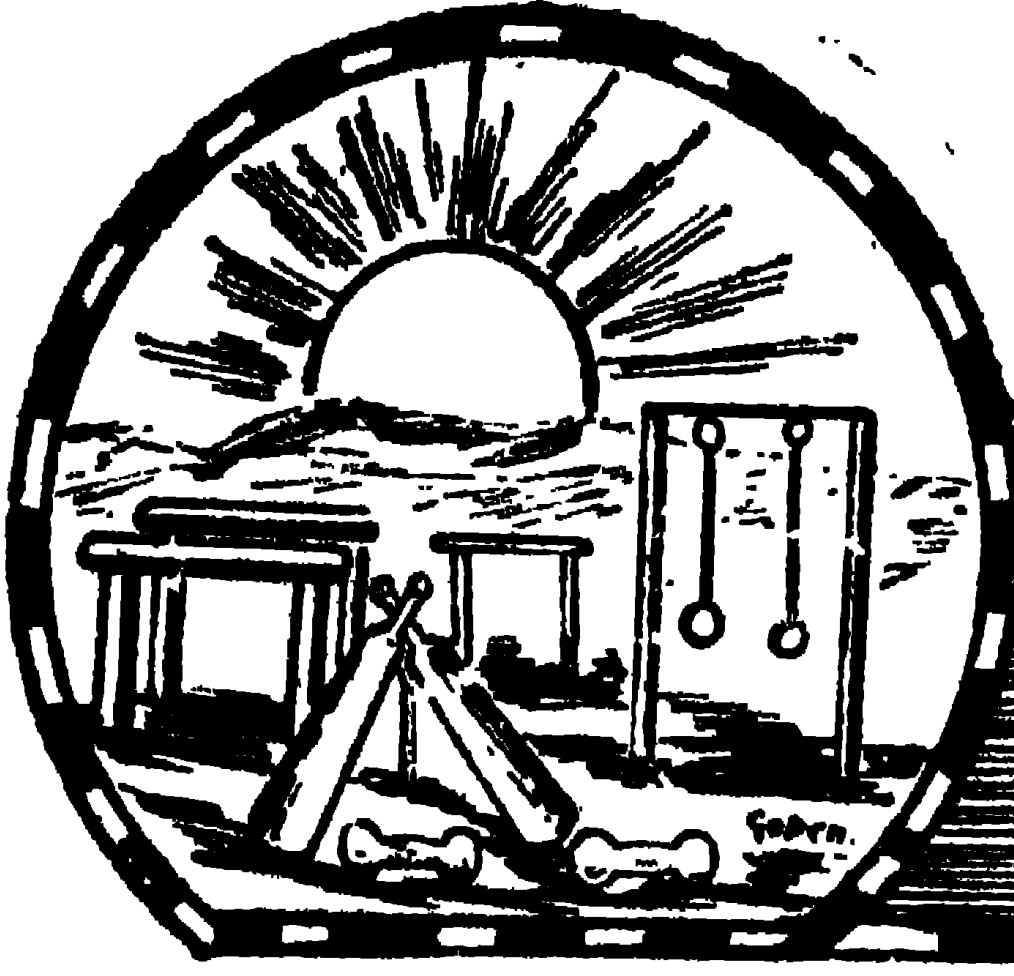
ফলে যে, পরিমাণ ফসফরাস ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আছে তাহার জন্য কেবল মস্তিষ্ক সবল হয় না, কিন্তু হজম করিতে মানুষের যে শ্রম হয় তাহা কমিয়াগিয়া অধিকতর রক্ত ও প্রাণশক্তি দ্বারা মস্তিষ্ক রক্ষা করার উপকার পাওয়া যায়। সাধারণ আহারের পরে আমাদের যে নিদ্রাকর্ষণ হয়, ফল আহারকারীর তাহা হয় না। ইহার জন্যই যাহারা ফল আহার করে তাহাদের মনে মাংস আহারকারীদের ন্যায় হতাশ্বাস অথবা মানসিক অবসাদ আসে না। ফল আহারকারীদের মন আনন্দপূর্ণ, ও চিন্তা ভাবনা হইতে মুক্ত থাকে। তাহার কারণ এই যে সকল রকম অবস্থার সম্মুখীন হইবার শক্তি ও উৎসাহ ফল আহারকারীদের থাকে।

সাধারণতঃ দেখা যায় ছোট ছোট বালক বালিকাগণের ফল আহার করিবার জন্য এক স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে। ইহাকে তাহাদের মিষ্টদ্রব্য খাইবার ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। কিন্তু ইহাতে বালক বালিকার চঞ্চল পেশী সকলের মিষ্টদ্রব্য পাইবার জন্য প্রকৃতির যে নির্দ্দেশ তাহা পূরণ হয়। কৃত্রিম মিষ্টদ্রব্য অপেক্ষা ফলের শর্করা অনেক উপকারী।

কাঁচা শাক সব্জী ও ফল আহারের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে অনেক পদার্থ হইতে রন্ধন করার জন্য ঐ সকল খাদ্যের উপকারী দ্রব্য নষ্ট হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এবং বর্দ্ধনশীল অবস্থায় ফল ও গাছ গাছড়ায় যে শক্তি নিহিত আছে তাহা রন্ধনে নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত যখন শাক সব্জী ও ফল সিদ্ধ করা হয় তখন অনেক মূল্যবান লবণ নষ্ট হয়। অনেক প্রকার শাক সব্জী—স্যালাড (salad) রূপে কাঁচা অবস্থায় প্রকৃতই উহা অধিকতর সহজে হজম হয় এবং রন্ধন করা খাদ্যাপেক্ষা গাঁজিয়া উঠার সম্ভাবনা কম থাকে।

মনে রাখা উচিত যে অধিকতর পাকা বা পচনোন্মুখ ফল আহার করা উচিত নহে। যদিও তাজা ফল পাওয়া গেলেও সূর্য্য কিরণের দ্বারা শুষ্ক ফল আহার বন্ধ করা উচিত

নহে। কিন্তু যাহারা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বা গাউট রোগাক্রান্ত তাহাদের শুষ্ক ফল আহার করা উচিত নহে। ইহা ব্যতীত প্রায় সকল রকম শুষ্ক ফল আহার করিবার পূর্ব্বে উহা ধৌত করা প্রয়োজন। কারণ উহা বাক্সে বন্ধ করিবার সময়ে অনেক ধুলা সঞ্চিত হয় এবং ঐ অবস্থায় জীবাণু ও ছাতা পড়িবার অনুকূল হয়। শুষ্ক ফল ক্রয় করিবার সময় বিশ্বাসযোগ্য দোকান হইতে ক্রয় করা উচিত। উহা সূর্য্য কিরণে শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন কিন্তু উহা গন্ধকের সাহায্যে শুষ্ক করা হইয়াছে না কিনা তাহা দেখা উচিত।

এইরূপও দেখা যায় যে যাহারা হঠাৎ মাংস আহার ত্যাগ করিয়া ফল আহার করিতে আরম্ভ করে তাহাদের যুগপৎ অনেক ফোঁড়া বা কোন প্রকার চুলকানি হয় বা শুঁয়ার মত দানা চর্ম্মের উপর দেখা দেয়। ইহাতে ভীত হইবার কারণ নাই। শরীরে বহু কাল যে বিষ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা বহিষ্কার করিবার ইহা প্রকৃতির অন্যতম উপায়। অজীর্ণ রোগী প্রথমে দেখিতে পাইবে যে ফল আহার আরম্ভ করিলে প্রথম প্রথম তাহাদের অম্লরোগ হয়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা উচিত। তাহার ফলে অসুবিধাজনক সমস্ত লক্ষণ দূর হইবে এবং সমগ্র শরীর তখন পরিষ্কৃত হইবার মতন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আপেল উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ঔষধ। উহা আহারে শরীর পরিষ্কৃত হয় এবং দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়। সেইজন্য য়ুরোপে মাংস আহার করিবার সহিত আপেল আহার করে। ইহা ব্যতীত আপেলের মধ্যে এমন হজম করিবার পদার্থ আছে যাহাতে মাংস ও দুগ্ধের কেসিন হজম হয়। আপেল গাউট রোগে ও অলস যকৃতের রোগে অত্যন্ত উপকারী এবং আহারের পূর্ব্বে আপেলের রসপান করিলে অম্লদোষ দূর হয়। আপেলের রস জীবাণুনাশক। ইহা টাইফয়েড রোগের জীবাণু নষ্ট করে।

অধিক পরিমাণে আহার না করিলে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ পেয়ারা ফল সাধারণতঃ হজম করিতে পারে। খোসা সহ পেয়ারা আহার করিলে উহার বিরেচক গুণ দেখা যায়। কিন্তু খোসা ব্যতিরেকে উহা অধিকতর ধারক হয়। উদ্ভিজ্জ বিষের ইহা প্রতিষেধক।

আঙ্গুর অতি উপকারী ফল। ইহার সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে সঞ্জীবনীতে আমি তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। যদিও ইহার গুণ সম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার আছে, তথাপি সংক্ষেপে কিছু বিবৃতি করা যাইতেছে। আঙ্গুরে পটাস সাইট্রেট আছে, সেজন্য জ্বরে ইহা অধিকতর উপকারী। এতদ্ব্যতীত অল্প বয়স্ক শিশুদের দন্তোদ্গমে ইহা অনেক উপকার করে। আঙ্গুরে যে শর্করা আছে তাহা শরীরে দ্রুত শোষিত হয়। আঙ্গুর আহারে দ্রুত শরীরে মাংস বৃদ্ধি হয়। যাহাদের হজম শক্তি কম আঙ্গুর আহার করিলে ক্রমে তাহাদের হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত শ্রম, দুশ্চিন্তা, বা রক্তস্রাব হইয়া যদি রক্তহীনতা হয় তবে মিষ্ট আঙ্গুর আহারে রক্তের অভাব দূর হয় ও শরীরে শীঘ্র রক্ত বাড়ে।

হজম শক্তি দুর্ব্বল থাকলে আঙ্গুরের রস পানে তাহা শক্তিশালী হয়। অত্যধিক পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তার জন্য রক্ত হ্রাস পাইলে তাহা আরাম হয়। যকৃত দুর্ব্বল হইলে ও তথায় রক্ত সঞ্চিত হইলে অম্লস্বাদযুক্ত আঙ্গুর খাইলে উপকার হয়।

আঙ্গুরের ন্যায় কমলালেবু আহার করিলেও জ্বর রোগে উপকার পাওয়া যায়। বাত জ্বরে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে অপর কোনও খাদ্য না খাইয়া যদি কেবল কমলালেবু আহার করা যায় তবে শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা কমলালেবু হইতে পাওয়া যায়। তদুপরি তাহাতে ঔষধের ক্রিয়া হয় ও রোগের লক্ষণ সকল দ্রুত দূর হয়। প্রত্যুষে কমলালেবু আহার করিলে মৃদু বিরেচকের কার্য্য করে, কিন্তু যাহারা ডিসপেপসিয়া রোগে ভুগিতেছে তাহারা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কমলালেবু আহার করিতে পারে না। মার্কিণ যুক্ত রাজ্যের ফ্লোরিডা প্রদেশে ফুসফুসের ব্রঙ্কিয়াল রোগে যাহাদের হাঁপানি হইয়াছে ও যাহাদের পিত্তরোগ আছে তাহাদিগকে কেবলমাত্র কমলালেবু খাইতে দিয়া চিকিৎসা করা হয়। কমলালেবু ও বিলাতী বেগুণের সংমিশ্রনে উত্তম স্যালাড তৈয়ারী হয়। বিলাতী বেগুণে যেমন খাদ্যপ্রাণ আছে তেমনি খনিজ পদার্থ আছে। সুতরাং কমলালেবুর সহিত ইহার আহারে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাল হইতে লেবু গাউট ও বাতরোগে উপকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে যে লেবুতে সামান্য পরিমাণে স্যালিসিলিক এসিড আছে। ইহার জন্য এই গুণ আংশিক ভাবে আছে। এই এসিডের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত করা যায় যদি ঐ লেবুকে একটি লৌহের পাত্রে রাখিয়া এক ইঞ্চি গভীর জলে বেক (bake) করা যায়। যতক্ষণনা লেবুর খোসা নরম হয় ততক্ষণ বেক করা প্রয়োজন। আহারের পূর্ব্বে যদি চিনি সংযোগ না করিয়া একটি লেবুর অর্দ্ধেক পরিমাণ রস পান করা যায় তবে অনেক অম্লযুক্ত অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়া রোগী আরাম হয়। যদি প্রত্যহ প্রত্যুষে এবং রাত্রে লেবুর রস পান করা যায় তবে পিত্ত নিঃসরণে সাহায্য হয় এবং তাহার ফলে পাথুরী রোগ আরাম হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত লেবুর রস পানে স্কার্ভি রোগ আরামের কথা সকলেই জানেন। লেবুর রস পানে হৃদযন্ত্র সুস্থির থাকে এবং বুক ধড়ফড়ানি কমাইয়া দেয়। স্যালাড তৈয়ারী করিতে লেবুর রস ব্যবহার করা উচিত। ইহা ভিনিগার অপেক্ষা উত্তম।

যাহারা ডিসপেপসিয়া রোগে ভুগিয়া থাকে তাহারা কলা খাইয়া ভালই থাকে। যাহারা সাধারণভাবে শ্বেতসার আহার করিতে পারেনা তাহারাও কলা খাইয়া কোনও অসুখ বোধ করেনা। কলার ময়দা দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিলে অল্প বয়স্কগণ তাহা সহজে খায়। ইহাতে কচিৎ দুই এক জনের গাত্রে চুলকানি হয়। এই ফলে অনেক শর্করা এবং অল্প শ্বেতসার আছে। এরূপ বলা হয় যে ১২টি পুষ্ট কলা রুটির পরিবর্ত্তে আহার করিয়া একজন লোকের এক সপ্তাহ কাটিয়া যায়।

আনারসে ব্রমেলিন নামক একটি পদার্থ আছে যাহা মাংস, দুগ্ধের কেজিন, এবং ডিম্বের সাদা অংশ হজম করিতে সাহায্য করে। সেইজন্য মাংস জাতীয় খাদ্য আহারের পরে ইহা খাইলে হজমের সাহায্য করে। সম্ভবতঃ সেইজন্য নিমন্ত্রণ বাড়ীতে মাংসাদি আহারের পরে আনারসের চাটনি খাইতে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। আনারসের হজম করিবার শক্তি আছে বলিয়া ইহা ডিপথেরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। আনারসের রস গলায়

যে পর্দ্দা হয় তাহা দূর করে। যদি পায়ের কড়ায় ৮ ঘণ্টা ধরিয়া আনারস স্থাপন করা যায় তবে ঐ কড়া নরম হইয়া যায় বলিয়া উহা উঠাইয়া ফেলা যায়। আনারসের রসের সাহায্যে আঁচিল উঠাইয়া ফেলা যায়।

জামের রস অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে হজম শক্তি বাড়ে। ইহাতে ট্যানিন নামক পদার্থ এবং লৌহের অক্সাইড আছে। আমাশয় রোগে ইহা উপকারী। ইহা হজমীকারক। কথিত আছে জামের বিচির শাঁস আহারে বহুমূত্র রোগ আরাম হয়।

বিলাতী প্লাম কাঁচা অথবা শুষ্ক করিয়া প্রুণ নামে বিক্রয় হয়। ইহা স্বাভাবিক মৃদু বিরেচক। ইহাতে আনারসের ন্যায় একটী পদার্থ আছে যাহার জন্য হজমের সাহায্য হয়।

উপরোক্ত ফল ব্যতীত আরও অনেক রকম ফল আছে যাহা আহারে নানা প্রকার উপকার পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ফল আহারে যে সকল উপকার হয় তাহার সম্বন্ধে যৎ সামান্য কিছু বলা হইল মাত্র। ইহা পাঠ করিয়া যদি সহজে ও সাদাসিধা বিশুদ্ধ খাদ্য আহার করিয়া শরীরকে বিষমুক্ত ও দোষহীন করিবার ইচ্ছা কাহারও হয় তবেই প্রবন্ধ সার্থক হইবে।

বাঙ্গালীর খাদ্য

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বা স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানকল্পে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছেন। বাঙ্গালায় প্রধানতঃ যে সকল খাদ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বাঙ্গলার সহরবাসী জনসাধারণ যেসকল খাদ্য সাধারণতঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা শৈশবাবস্থার বা যৌবনাবস্থার বা গর্ভাবস্থার ও প্রসূতি অবস্থার লোকের পক্ষে মোটেই প্রচুর নয়। জন্তুর উপর খাদ্যতত্ত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের খাদ্যে ও সহরের ছাত্র নিবাসগুলির খাদ্যে 'ক ও খ' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের অভাব থাকে। এই সকল সচরাচর গৃহীত খাদ্যদ্রব্যের সহিত সামান্য পরিমাণ কড্‌লীভার অয়েল গ্রহণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ 'ক ও খ' খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, ইহাতে শরীরেরও বিশেষ পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। খাদ্যতত্ত্ববিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কলিকাতায় সাধারণ পরিবারে বা মেস বোর্ডিংএ সচরাচর যে সকল খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তাহাতে উপরোক্ত খাদ্যপ্রাণের অভাব ব্যতিরেকেও শরীর গঠনের উপযোগী খনিজ দ্রব্যের—লৌহ ও চুণের অভাব থাকে। এতৎ ব্যতিরেকে পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় প্রোটিনের অভাবও থাকে। অবশ্য ইহা সত্য যে, খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ থাকা শরীর গঠনের জন্য নিতান্তই প্রয়োজনীয়; কিন্তু শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চুণ, ফস্‌ফরাস ও লৌহ ঘটিত লবণাদিরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ গ্রহণের পার্থক্য এই যে খাদ্যপ্রাণ থাকিলেই চলে এবং খাদ্যপ্রাণের উপকারিতা এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই।

খাদ্যে "ক ও খ" খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে বা প্রোটিন, লৌহ ও চুণের অভাব থাকিলে বিশেষ কোন রোগ লক্ষণ দেখা দিবেই এরূপ নহে, কিন্তু আধুনিক খাদ্যতত্ত্ববিদগণ বারংবার বলিতেছেন যে খাদ্যপ্রাণ অভাবে কোন রোগের উদ্ভব না হইলেও, শরীর বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হইবেই এবং আদর্শ স্বাস্থ্য গঠনে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য নিতান্তই দরকার। কোনো লোক বিশেষ কোনো খাদ্য সচরাচর গ্রহণ করিয়া অসুস্থ হন নাই বলিয়া ঐ খাদ্য যে আদর্শ গ্রহণীয় খাদ্য এরূপ ভুল বুঝা কখনও উচিত নয়। উপযুক্ত পুষ্টিকর তাজা দ্রব্য খাইতে হইলে পারিবারিক, হোটেল ও মেসের খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ, প্রোটিন, চুণ ও লৌহ পাওয়া যায় এরূপ খাদ্য নির্ব্বাচন করা দরকার। সুতরাং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচনে সাধারণতঃ যে সকল খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য গ্রহণে উপরোক্ত খাদ্যপ্রাণ ও পুষ্টিগুণ বিশিষ্ট খনিজ লবণ পাওয়া যাইবে সে বিষয় জ্ঞান থাকা উচিত। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বাংলা দেশে সাধারণতঃ যে সকল মাছ পাওয়া যায় তাহাদের যকৃতের তৈলে প্রায় 'ক' খাদ্যপ্রাণ

থাকে ; এমন কি বাংলায় সচরাচর পাওয়া যায় এরূপ অনেক মৎস্যের যকৃতের তৈলে কডলিভার অয়েল অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে "ক" খাদ্যপ্রাণ থাকে। মাছের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা যকৃতেই "ক" খাদ্যপ্রাণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঁচা শাকসব্জীতেও অনেক পরিমাণে ক্যারোটিন পাওয়া যায়। ক্যারোটিন শাকসব্জীর বর্ণজনক পদার্থ বিশেষ। শাকশব্জী আহারের পর উহার ক্যারোটিন "ক" খাদ্যপ্রাণে পরিবর্ত্তিত হয়। ঢেঁকি ছাঁটা চাউল বা যাঁতায় পেশা আটায় খ, খাদ্যপ্রাণ থাকে। খ খাদ্যপ্রাণ বেরী বেরী প্রতিরোধক।

পশুর যকৃতে ও মুত্রাশয়ে প্রচুর "খ" খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে আম, লিচু, কুল, পেয়ারা ও আনারসে প্রচুর "গ" খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। আমে 'গ' খাদ্যপ্রাণ ব্যতিরেকে 'ক' ও 'খ' খাদ্যপ্রাণ পাইবার পক্ষেও একটী আদর্শ খাদ্য। বিভিন্ন প্রকারের কাঁচা শাকশব্জী পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, 'পল্‌তায়' চুণ ও লৌহ জাতীয় লবণ প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু শাকসব্জী ও নানা জাতীয় ডাইল হইতে খাদ্যগুণবিশিষ্ট প্রোটিন বা ছানা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় না; সুতরাং দৈনিক যে পরিমাণ প্রোটিন বা ছানা জাতীয় পদার্থ খাওয়া উচিত তাহা কোনরূপ আমিশ আহার্য্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্ত্রীজাতীর গর্ভাবস্থায় বা প্রসূতি অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের গুণ বিচারে আহার্য্য নির্ব্বাচন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলা দেশের সন্তানসম্ভবা নারীদিগের ও প্রসূতিদিগের সাধারণ খাদ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, উক্তাবস্থায় নারীগণের খাদ্যে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থ থাকার দরকার থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে উহার নিতান্তই অভাব থাকে। ইহা মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয় যে খাদ্যে লৌহ জাতীয় দ্রব্যের অভাব থাকার জন্যই বাংলার সন্তানসম্ভবা নারীগণের মধ্যে রক্তাল্পতা দেখা যায়। বাংলার শিশুদিগের ক্ষুদ্র গঠন ও রিকেট রোগের অন্যতম কারণের অনুসন্ধানে দেখা যাইবে যে, ঐ সকল শিশুদিগের জননীরা গর্ভাবস্থায় বা প্রসূতি অবস্থায় পরিমাণ মত চুণ জাতীয় খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ আছে এরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন নাই। নারীদিগের খাদ্যে এইরূপে নানাজাতীয় খনিজ দ্রব্য ও খাদ্যপ্রাণের অভাবে গর্ভস্থ সন্তানের শারীরিক গঠনে যে অভাব থাকিয়া যায়, তাহা শিশুর জন্মের পর নানাপ্রকার খাদ্যের প্রচুরতায়ও আর গড়িয়া তোলা যায় না। সুতরাং বাংলার মাতৃজাতির শরীর পালনের জন্য এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সুস্থ সুঠাম দেহ গঠনের জন্য সন্তান সম্ভাবনা নারীদিগের আহার্য্যে চারি মাস ধরিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দুগ্ধ, লৌহ ও চুণের গুণ বিশিষ্ট পল্‌তা, অধিক পরিমাণ কাঁচা শাক শব্জী ইত্যাদি থাকা নিতান্ত দরকার। এতদ্ব্যতিরেকে মাঝে মাঝে "কড্‌লিভার অয়েল" এবং ঈষৎ জালে পাক করা মাংসের বা পক্ষীর যকৃত খাওয়া উচিত। মাতৃজাতির বিজ্ঞান সম্মত খাদ্যাখাদ্যের উপর জাতীয় জীবনের গুরুত্ব নির্ভর করে।

মৎস্য চাষ সম্পর্কে রোটারী ক্লাবে

ডাঃ নাইডুর বক্তৃতা

জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং সরকারী অবজ্ঞার ফলে বাংলায় ক্রমশঃ যে মৎস্যের অভাব হইতেছে বাংলা গবর্ণমেণ্টের মৎস্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম আর নাইডু সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবে তৎসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতায় ডাঃ নাইডু প্রথমেই বলিয়াছেন "বাংলার মৎস্যের চাষ কৃষির পরই অর্থকরী হইতে পারে। কৃষি ও মৎস্য চাষের সম্যক উন্নতি হইলে সুজলা সুফলা বাংলা প্রকৃতই প্রাচুর্য্যের ভাণ্ডার হইবে।

"মৎস্য চাষের বিরাট ক্ষেত্র এবং উহার যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বাংলায় ইহা চিরকাল উপেক্ষিত ও অজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৎস্যোৎপাদন ও সরকারী মৎস্য বিভাগের তত্বাবধানের অভাব এবং নির্ব্বিচারে ছোট ছোট মাছ ও ডিমপূর্ণ মাছ ধরিয়া ফেলায় বাংলার নদী নালা, খালবিলগুলি প্রায় সবই মৎস্য শূন্য হইয়া পড়িতেছে।"

"বাংলাকে এই মৎস্যাভাব হইতে রক্ষা করিতে হইলে বাচ্চা মাছ ও ডিমপূর্ণ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। যদি এইরূপ আইন প্রণয়ন এবং কৃত্রিম উপায়ে মাছের ডিম ছাড়িবার ব্যবস্থা করা না হয় তাহা হইলে বাংলার মাছ প্রায় লোপ পাইবে। বিশেষভাবে বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইলিশ মাছ সম্বন্ধে একথা অধিক খাটে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে মৎস্য খুব অপ্রচুর থাকা সত্বেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মৎস্য বিভাগের তত্বাবধানে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য রক্ষা ও মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় মৎস্যের প্রাচুর্য্য থাকা সত্বেও গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও ধীবরদের অজ্ঞতার জন্য উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। কতিপয় ধনীলোক ধীবরদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাহাদের সামান্য লাভ হইতেও বঞ্চিত করিতেছে।

"বাংলার ভৌগলিক পরিস্থিতি, দক্ষিণ পশ্চিমের মৌসুমী বায়ু সংযুক্ত উহার নিজস্ব আবহাওয়া মৎস্যের পক্ষে খুব অনুকূল। এইরূপ

আবহাওয়ার ফলেই বাংলায় কয়েক শ্রেণীর মাছ পাওয়া যায় যেগুলি বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাত্র আসে। নদী বহুল বাংলার বড় বড় নদীগুলিতে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে মাছের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া এই সকল অঞ্চলে যে প্রচুর পরিমাণে মাছ থাকিবে তাহা মোটেই আশ্চর্য্যজনক নহে।"

অতঃপর ডাঃ নাইডু বলেন, "বাংলার মাছকে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, (১) খাল, বিল জলাশয়ের মাছ, (২) নদী প্রভৃতির মাছ, (৩) নদীর মুখে ও সমুদ্রের উপকূলের মাছ এবং (৪) গভীর সমুদ্রের মাছ।"

প্রত্যেক শ্রেণীর মৎস্যের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের পর ডাঃ নাইডু বলেন যে মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাব ও অনেক স্থলে বিক্রয় করিবার বাজার না থাকায় প্রচুর মাছ শুষ্ক করিয়া রাখা হয়। মাছ শুষ্ক করিবার সময় উহার মাথা ও নাড়ীভুড়ি ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ মাথাগুলি হইতে উৎকৃষ্ট সার এবং নাড়ীভুড়িগুলি হইতে তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। এই প্রকার অপচয় হয় যখন দেখি প্রতি বৎসর বাংলায় বহুল পরিমাণ হাঙ্গরের যকৃৎ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কড্ মাছের যকৃতে যে পরিমাণ "ক" খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন থাকে বাংলার নদী ও সমুদ্রে প্রাপ্ত হাঙ্গর মাছের যকৃতে তদপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক "ক" খাদ্যপ্রাণ রহিয়াছে। অতএব এই হাঙ্গর মাছের যকৃত হইতে কড লিভার অয়েলের ন্যায় মূল্যবান তৈল প্রস্তুত করা সম্ভব। অন্যান্য মৎস্য হইতে প্রস্তুত তৈল, পাটকল, ট্যানারী, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের ফ্যাক্টরীতে ব্যবহার করা চলে। বর্ত্তমানে বাংলার প্রয়োজনীয় এই তৈল আমদানী হয় মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া হইতে।

ডাঃ নাইডু বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন, "বাংলা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার চিংড়ি মাছ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, সিদ্ধ করিয়া অথবা ধুঁয়া দ্বারা সেঁকিয়া সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হয়। সেখানে উহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হয় না। অথচ এই চিংড়ি মাছ অর্দ্ধ শুষ্ক করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ সংরক্ষণ করা চলে এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসাবে ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে রপ্তানী করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রন্ধন করিয়া টিনের কৌটায় কিংবা টিনের ঢাকনিসহ কাচের পাত্রে সংরক্ষিত অবস্থায় উহা বিক্রয় করা যায়। এইরূপে সংরক্ষিত ঘুসো চিংড়ির চাহিদাও বাজারে যথেষ্ট।

"ভেটকি, মুলেট, স্যামন্, চাঁদা প্রভৃতি মাছ টুক্‌রা করিয়া ধুঁয়া দ্বারা অর্দ্ধ শুষ্ক করিয়া টিনের কৌটায় বিক্রয় করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বাংলায় বিলাতী বেগুণ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বিলাতী বেগুণের রসে ডুবাইয়া রাখিয়াও উত্তম খাদ্যরূপে এই মাছ বিক্রয় করা যায়। যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভেটকি, মুলেট, চিংড়ি প্রভৃতি মাছের চাষ করা যায় তবে যে বাংলায় শুধু মৎস্যেরই প্রাচুর্য্য হইবে তাহা নহে এই ব্যবসায়ে সহস্র সহস্র শিক্ষিত বেকার যুবকের অন্নেরও সংস্থান হইবে।

বাংলায় মৎস্য ধরিবার বর্ত্তমান প্রণালীও অতি প্রাচীন ও অবৈজ্ঞানিক। নদীতে মৎস্য ধরিবার জন্য বর্ত্তমান প্রচলিত নৌকার পরিবর্ত্তে বেশ দ্রুতগামী মোটর বোট ব্যবহার করিলে

মাছ অধিক ধরা যায় এবং অতি শীঘ্র ধৃত মৎস্য সমূহ নিকটবর্ত্তী রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে চালান দেওয়ার সুবিধা হয়। ইহাতে অর্থাগমও অধিক হয়। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। এজন্য মৎস্য ধরিবার জাহাজের প্রয়োজন, এবং সেই সঙ্গে মৎস্য ধরিবার স্থানের সন্নিকটস্থ উপকূলে মাছ টাটকা রাখিবার জন্য বরফ কলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

বক্তৃতার উপসংহারে কতিপয় ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ নাইডু বলেন যে, ধনিকদের শোষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাংলায় দরিদ্র ধীবরদের সমবায় সমিতি স্থাপন করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সেই সমবায় সমিতিকে ঋণ দ্বারা সাহায্য করা। ডাঃ নাইডু আরও বলেন যে, ১৯০৮ সালে স্যার কে জি গুপ্তের রিপোর্টের পর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য একখানি ট্রলার আনা হইয়াছিল, কিন্তু পরে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। ধীবরগণ যাহাতে ট্যাক্স না দিয়া বিভিন্ন স্থানে মৎস্য বিক্রয় করিতে পারে সেই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন।

বিজ্ঞাপনে চিত্রের স্থান ও প্রয়োজনীয়তা

ব্যবসা বাণিজ্যের বিজ্ঞাপনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের ব্যবহার বেশী হইতেছে। ইহার নাম Illustration অর্থাৎ চিত্র দ্বারা কোন দ্রব্য বা বিষয়কে দর্শকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া। Illustration কাহাকে বলে? That which explains or elucidates. ডিক্‌সনারী অর্থাৎ ইংরাজী অভিধানে বলে যে, যাহা দ্বারা বুঝান যায়, তাহাই lllustration; কিন্তু যাহারা বিজ্ঞাপনে ব্লক ব্যবহার করেন, প্রকৃতই কি তাঁহারা এই কথাটা মনে রাখিতেছেন বা রাখেন? কোন আমেরিকান অভিজ্ঞ লেখক বলিতেছেন যে, "The purpose of illustration is to tell somethiug about the article advertised অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের ব্লক বিজ্ঞাপিত জিনিসের সম্বন্ধে যে কিছু বলিতেছে এমনটা বুঝান চাই; নচেৎ বিজ্ঞাপনে জীবন শূন্য ব্লক দিবার আবশ্যকতা নাই বলিলেই হয়,—It may show up the points claimed in the type matters অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের বিষয়ীভূত সারতত্ত্ব যাহা অক্ষর দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, চিত্রে সেই point টা ফুটিয়া উঠা চাই।

আর কি আবশ্যক? It may bring out the points that are tellable, বিজ্ঞাপনে যে টুকু বলিবার যোগ্য কথা, সেটুকু এই চিত্রে বাহির হওয়া চাই। অক্ষর দ্বারা রচনা করিয়া যাহা বলিতে চাই, সেটুকু চিত্রে ফুটান আবশ্যক। যদি অক্ষরে এবং চিত্রে উভয়ে একত্রে বর্ণিত বিষয়ের কাহিনী পাঠককে বুঝাইতে না পারে, তবে সে বিজ্ঞাপন নির্জীব। লেখা অপেক্ষা চিত্রে কাজ বেশী এবং করিবার বিষয়ও অনেকথাকে। অক্ষরে বর্ণিত বিষয় অনেক সময়ে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু চিত্রের প্রধান কর্ত্তব্য চিত্তাকর্ষণ করা—পাঠকের হৃদয়কে কিয়ৎক্ষণের জন্য ধরিয়া বর্ণিত বিষয় পাঠ করানো, এই জন্যই চিত্র ব্যবহার একটা সুচিন্তিত বিষয়।

চিত্র যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধক হয়, অর্থাৎ বর্ণিত বিষয় প্রকৃতই বুঝাইতে পারে, তাহা হইলেই পাঠকের হৃদয় ক্ষণেকের জন্য বর্ণিত বিষয় পাঠ করিতে চায়, কিন্তু যদি তাহা উদ্দেশ্য জ্ঞাপক না হয়, তাহা হইলে পাঠকের কোনও অনুসন্ধিৎসা বা ঔৎসুক্য হয় না সুতরাং পাঠ্য বিষয়ও সে পড়িতে চায় না। চিত্র যদি ভালভাবে অঙ্কিত না হয় কিম্বা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য প্রচারে সাহায্য না করে তবে ইহা যে শুধু পাঠকের চিত্তাকর্ষণে অক্ষম হইয়াই বসিয়া থাকে তাহা নহে, এইরূপ নিষ্ফল চিত্র প্রকাশের সমস্ত খরচটাও বিজ্ঞাপনদাতার ঘাড়ে যাইয়া চাপিয়া বসে। কেমন করিয়া? বুঝাইয়া দিতেছি। সংবাদ পত্রের মূল্যবান স্থান ক্রয়

করিয়াই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, ব্লক বা চিত্র ব্যবহার করিলে বিজ্ঞাপনে ব্যয় আরও অধিক হয়। যদি সেই চিত্র উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনদাতার অপব্যয় হয়, সুতরাং তাহাকে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের ব্লক আদৌ প্রস্তুত হয় না, কেবল কতকগুলি নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড কতকটা স্থান অধিকার করিয়া বিজ্ঞাপন দাতার সর্ব্বনাশ করে মাত্র। পাশ্চাত্য প্রত্যেক চিত্রই ভাবব্যঞ্জক—যেন চিত্রের মুখে চক্ষে কথা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে চিত্র বিদ্যার এদেশে আদৌ উন্নতি হয় নাই বলিলে অপরাধ হয় না। বিজ্ঞাপনের কথা ত দূরের কথা, যখন বাঙ্গলা সংবাদ পত্র সমূহে দেশের জীবন্ত বা মৃত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বা রাজা রাজড়ার অদ্ভুত বিকৃত ছবি বাহির হয়, তখন হাস্য সংবরণ করা বাস্তবিক দায় হইয়া উঠে। "যেন শিব গড়িতে বানর গড়া" হইয়াছে। জানি না, সে সকল ভদ্রলোকরা কেমন করিয়া এরূপ বিট্‌কেল্ চেহারা প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন? ইহাতে চিত্র কারকের দোষ নাই, ৵০ ইঞ্চির ব্লক কাটিয়া সে যে শিবকে বানর না বানাইয়াই থাকিতে পারে না; সংবাদ পত্র ওয়ালারা সেইরূপ বানরের ছবি ছাপিয়া দুপয়সা লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু এইরূপে এদেশের চিত্রকরগণের বানর গড়া রোগের প্রতিকার হইতে পায় না এবং পারেও না। ইহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইলে উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে, তবে এদেশে জীবন্ত চিত্র জন্মিতে পারিবে। যাক, কথায় কথায় আসল কথা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

Mr. Lewis, H. Mertz বলেন,

"The perfect advertisement illustrates, attracts, holds, talks, pleases and quite likely gets brief farewell glance after reading matter has had attention." অর্থাৎ প্রকৃত বিজ্ঞাপনের চিত্র, চিত্তাকর্ষণ করে, চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারে, পাঠককে সন্তুষ্ট করে, অবশেষে পাঠ্য বিষয় যে সময়ে মনোযোগ আকর্ষণে অক্ষম হয়, চিত্র তখন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

এমন চিত্র এদেশের অতি অল্প বিজ্ঞাপনেই দেখিতে পাই। চিত্র চিত্তাকর্ষকও নহে, সন্তোষজনকও নহে, যাহা বলিতে দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলিতেও অক্ষম, কাজেই হয় কি? কতকটা মূল্যবান স্থান অধিকার করিয়া বিজ্ঞাপন দাতার ব্যয়ের ঘরের অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে মাত্র। এমন চিত্র ব্যবহার করা অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক ভাষার বিজ্ঞাপন অধিক কর্ম্মক্ষম। ইহাদ্বারা ব্যয় সংক্ষেপের আশা করাও অন্যায় নহে। সকলেই এই বিষয়টি চিন্তা করেন, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা।

জীবন চরিত

এনড্রু কার্ণেজীর কৃতকার্য্যতার গূঢ় রহস্য

একটা সামান্য কাপড়ের কলে মিঃ এণ্ড্রু কার্ণেজী মাকুতে সুতা পরাইতেন। তিনি সেই স্থানে "Bobbin boy" বা "মাকুবালক" নামে অভিহিত ছিলেন। অবস্থার অতি নিম্ন সোপান হইতে এই মহামতি বালক বাণিজ্য জগতে অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "The first thing that a man should learn to do is to save his money" অর্থাৎ কর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠা এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে কাহারও বাসনা থাকিলে প্রথম হইতেই তাহাকে অর্থ সঞ্চয় শিক্ষা করিতে হইবে।"

"By saving his money he promotes thrift, the most valued of all habits. Thrift is the great fortune-maker" অর্থাৎ সঞ্চয় দ্বারা সে মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিবে; এই মিতব্যয়িতা অভ্যাস সমস্ত অভ্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই মিতব্যয়িতার অভ্যাসই ভাগ্যলক্ষ্মীর নির্ম্মাণ কর্ত্তা।

মিঃ কার্ণেজী বলিয়াছেন:—

"It (Thrift) draws a line between the savage and civilized man. Thrift not only devolops the fortune, but it develops also the man's character."

"এই মিতব্যয়িতা সভ্য এবং অসভ্যের মধ্যস্থলে রেখাপাত দ্বারা পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মিতব্যয়িতা শুধু যে সৌভাগ্যের পরিপুষ্টতা সম্পাদন করে, তাহাই নহে, ইহা মানবের চরিত্রেরও পূর্ণতা সম্পাদন করে।" জগতের অদ্বিতীয় ধন কুবেরের এই মন্তব্য।

সভ্যতার দোহাই দিয়া আমরা অনেকেই অপব্যয় করিয়া সভ্য নামে পরিচিত হইতে যত্ন করি বটে, কিন্তু মহাত্মা কার্ণেজীর মতে সঞ্চয়ী না হইলে বর্ব্বর এবং সভ্য জাতিতে বড় পার্থক্য থাকে না। কেন? সভ্যজাতি মাত্রেই দূরদর্শী। কাল যে কি হইবে, সে কথা তাহাকে ভাবিতে হয়। যাহারা বর্ব্বর, তাহারা সে কথা ভাবিতে জানে না, সঞ্চয় যে আবশ্যকীয় উপাদান, তাহা তাহারা শিক্ষা করে না। সেইজন্য আজ যাহা পায়, তাহাই ব্যয় করে, কল্যকার অনশনের কথা, দুঃখ দারিদ্র্যের কথা, রোগ শোকের কথা সে ভাবিতে পারে না। সেইজন্য আমরা সভ্য জাতি, তাহাদিগকে বর্ব্বর ও অসভ্য আখ্যায়

ঘৃণার চক্ষে দেখি, কেননা সে তাহার দরিদ্রতার কোন প্রতিকার করে না। সে সঞ্চয়ী নয়।

সঞ্চয় শিক্ষা করিলেই সে সুসভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। অর্থ ব্যতীত যে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কোন সৎকার্য্যই সম্ভব নহে, একথা বাল্মিকী এবং বেদব্যাসও বলিয়াছেন। মহাত্মা কার্ণেজী সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া আমেরিকার মধ্যে ধনকুবের নামে পরিচিত হইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। সংসারের জনসমূহের হিতার্থে তাঁহার অর্থ রাশি নিয়োজিত করিয়া স্রষ্টার মহান উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন, পদে পদে ইহা আবশ্যক, সঞ্চয় ব্যতীত স্বচ্ছলতা কদাচ সম্ভব নহে। আমাদের দেশে লোকে অপব্যয় করিতেই আগে শিখিয়া থাকে, তাহার পরিণাম ফল দরিদ্রতা। এই অভাবের জন্যই দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য, দেশ ও গ্রামের উন্নতি কিছুই সুসম্পন্ন হইতে পায় না। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই এককালীন লক্ষ টাকা বাহির করিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ ব্যবসায়ী অনায়াসে এক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে। ইহারা একটা জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া অতি কঠোর পরিশ্রম করে এবং প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় না করিয়া বিলাস বিভ্রমের দিকে দৃষ্টিপাতই করে না।

তাহার পর যখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন, তখন মুক্তহস্তে দেশের ও দশের উপকারার্থে অর্থকোষ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; তখন তাহার মহত্বের গুণে সমগ্র জগত বিমুগ্ধ হয়। আর সেই মহাত্মা পরলোক গত হইলেও তাঁহার অমর নাম, জগতে তাঁহার অক্ষয়স্মৃতি রক্ষা করিতে থাকে। এই অমরত্ব লাভের জন্য এদেশের লোক বড় চেষ্টিত নহে, এই স্থানেই গলদ। সেই জন্য দেশের জননায়ক হইতে রাজা, ধনী সকলেরই সমান অবস্থা। সেই ভিতরে ভিতরে অভাবের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস এবং হাহাকার। যে যাহা পারেন, কিছু উপার্জ্জন করিয়া, তাহা ন্যায়তঃই হউক, আর অন্যায়ভাবেই হউক, আত্মসুখ ও নিজের জঠর জ্বালা নিবারণের জন্যই নিয়োজিত করিয়া বসেন। সঞ্চয় আর হইতে পায় না। অধিকন্তু সভ্যতা দেখাইবার সাধদেশে অন্যায়রূপে অপব্যয় করিয়া থাকেন।

আয় এবং ব্যয় দুইটী মাত্র কথা, ব্যয়ের জন্যই আয়, আর আয়ের জন্যই ব্যয়। কিন্তু ইহার ভিতর "অপ" কথাটী বসিলেই সর্ব্বনাশ। আমাদের মধ্যে সর্ব্বরকমেই বেজায় 'অপ' প্রবেশ করিয়াছে; ঐ "অপ"র উচ্ছেদ সাধন না করিলে নিস্তার নাই।

আত্মসুখের চিন্তায় সদা সর্ব্বদা হন্যা কুকুরের মত ছুটিয়া বেড়ান বাস্তবিক বর্ব্বরতা। সঞ্চয় করিয়া আর দশ জনের দুঃখ কষ্টের জন্য যদি হস্ত প্রসারণ করিতে না পারিলে, তবে বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত হইলে কোথায় ভাই! সাজিয়া কি সভ্য হওয়া যায়? প্রত্যেক ব্যবসায়ী, প্রত্যেক যুবকের মিঃ কার্ণেজীর যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

ফরমুলা ও রিসিপি

চুল শক্ত করার Hair lotion.

Tinct	Cantharides	3 fl Dram
,,	Capcicum	1 ,, ,,
,,	Ammonia	2 ,, ,,
,,	Glycerine	2 ,, ,,
,,	Colognne water	

enough to make 16 oz.

এই সমস্ত গুলি বাজারের ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সমস্ত গুলি মিশাইয়া একটী শিশিতে পুরিয়া রাখিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে ইহার দ্বারা কেশ ধৌত করিলে অকাল পক্কতা, কেশ পতন নিবারিত হইবে এবং কেশ দৃঢ় হইবে। ইহা আপনি পেটেন্ট করিয়াও বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন।

চুলের গোড়া শক্ত করার লোসন
(দ্বিতীয় প্রক্রিয়া)

টিংচার ক্যান্থারাইডিস	১ ড্রাম
অ্যামোনিয়ার জল (Aq. Ammonia)	২ আঃ
গ্লিসিরিন	অৰ্দ্ধ আঃ
আলকোহল	১৭ আঃ
লিষ্টারিন (Listerin)	৪ আঃ

সমস্তগুলি একটী শিশিতে পুরিয়া ঝাঁকাইয়া মিশাইতে হইবে। ব্যবহারের সময় হাতের তালুতে একটু ঢালিয়া মাথার চুলের গোড়ায় ঘর্ষণ করিতে হইবে। প্রথম প্রথম দিবসে ২।৩ বার দিন কয়েক ব্যবহার করিতে হইবে। ক্রমে বিবর্ণ পক্ক কেশ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিবে। ইহা দ্বারা মাথায় খুস্কী ও কেশমূলের ক্ষত আরোগ্য হইবে। ডি, জে হিল্‌স, এম, ডি আমেরিকার "মেডিক্যাল ব্রিফ" নামক পত্রিকায় জানিতে চাহেন যে, নাইট্রেট অব্‌ সিলভার, আসিটেট অফ্‌ লেড প্রভৃতি ধাতব পদার্থ দ্বারা যে সকল চুলের কলপ প্রস্তুত হয়, আমি সে সকল প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন চাহি না, যাহাদ্বারা কেশের প্রকৃত স্বাভাবিক স্থায়ী স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া কেশ স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া পাইতে পারে, আমি সেইরূপ প্রেসক্রিপ্‌শনই চাই; তাহারই উত্তরে "মেডিক্যাল ব্রিফ্‌" পত্রে এই ব্যবস্থা বা উত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল।

কালীর প্যাড্‌

ব্ল্যাক আনিলাইন নামক একপ্রকার রং বাজারে পাওয়া যায়, তাহাতে কয়েক শিট্‌ কাগজ ডুবাইয়া একত্র করিয়া চাপ দিয়া জমাইয়া ফেলিতে হয়, তাহার পর শুষ্ক করিয়া লইতে

হয়। এই কাগজ বিদেশে সঙ্গে রাখিলে যেখানে সেখানে যে কোন পাত্রে একটু জল দিয়া একটু-খানি কাগজ তাহাতে ফেলিয়া দিলেই কালী হইবে। যেখানে সেখানে যাইতে দোয়াত ও কালী লওয়া অনেকেরই অসুবিধা হয়, এইরূপে কালীর কাগজ লইয়া যাইতে কোন অসুবিধা নাই, সেইজন্য ইহাকে পোর্টেবল ইঙ্ক বলে।

"মাছি মারা" কাগজ

১। অয়েল পেপারে টার্পিন ভার্ণিস লাগাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখিলে ইহাতে সমস্ত মাছি লাগিয়া জড়াইয়া যাইবে।

২। ভোমাকা নামক জনৈক লেখক লিখিয়াছেন,—

কোয়াসিয়ার কুচি	১৫০ ভাগ
ক্লোরাইড কোবাল্ড্	১০ ,,
টার্টার এমিটিক	২ ,,
টীং অফ দীর্ঘ মরিচ	৮০ ,,
Long pepper	৮০ ,,
জল	৪০০ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া কাগজে মাখাইয়া টাঙ্গাইয়া দিলে মাছি তাহাতে লাগিয়া মরিয়া যায়

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া

মাছি মারিবার জন্য চিনির সরবতে কোয়া-সিয়া কাষ্ঠের কুচি ফেলিয়া রাখিলে মাছি খাইয়া মারা পড়ে, ইহাই অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন। পরীক্ষা করিবেন। সমস্ত ছোট বড় ডাক্তারখানাতেই কোয়াসিয়ার কুচি পাওয়া যায়।

CURLOLINE কার্লোলীন

বা চুল কোঁকড়াইবার আরক

ইহা সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে, বিক্রয়ের সম্ভাবনাও ভাল।

অলিভ অয়েল	১ পাউণ্ড
অয়েল অরিগেনম	১ ড্রাম
অয়েল রোজমেরী	১॥০ ড্রাম

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শিশি পূর্ণ করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হইবে। যদি চুল খুব ছোট কাটা না হয় তাহা হইলে কড়া সোজা চুলও কুঞ্চিত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক ১ আউন্স শিশি ॥০ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

কাপড় কাচার পাউডার

সোডা অ্যাস (Soda ash) এবং কার্ব্ব-নেট অব সোডা সম পরিমাণ হামানদিস্তায় পিশিয়া চূর্ণ করিতে হইবে, তাহার পর শীরি-ষের খুব পাতলা সলুউশনে বা দ্রাবকে উপরোক্ত সোডা চূর্ণ এমন পরিমাণ ঢালিতে থাক, যেন ঠিক কর্দ্দমবৎ হইয়া যায়, সেইটাকে একখানা বোর্ডের উপর ছড়াইয়া অপেক্ষাকৃত গরম ঘরে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। শুষ্ক হইলেই ছোট ছোট চৌকা কাগজের বাক্সে পুরিয়া লেবেল দিয়া পাউণ্ড প্যাকেট ।৵০আনা হইতে ॥০ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে। খরচ ৵০ ৶০ আনার অধিক পড়েনা।

ব্যবহার বিধি—গরম জলে এই পাউডার বস্ত্রের পরিমাণ অনুসারে দিয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার পর কাচিয়া লইলেই কাপড় পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্রত্যেক কাপড়খানার জন্য ১ বা ২ বড় চামচ যথেষ্ট।

চর্ব্বি বাতি প্রস্তুতের উপকরণ।

গলান ভেড়ার চর্ব্বি	—১০ আউন্স
কর্পুর	—আধ আউন্স
মৌ মোম	—৪ আউন্স

গলাইয়া ছাচের মধ্যে পলিতা দিয়া ঢালিতে হইবে, শীতল হইলে বাতি প্রস্তুত হইবে।

গৃহপালিত পশুদিগের CRUSHED FOOD বা চূর্ণ খাদ্য

ইহা অশ্ব গবাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য। অনেকে ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহার পরিমাণ জানেন না। সেই জন্য অভিজ্ঞ লোকের হইতে নিম্নে তাহার একটী ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল, হয়ত অনেকের উপকার হইতে পারে।

এক মণের পরিমাণ।

ভাজা ছোলা বা দানা	১৫ সের
জৈ	✓৫ সের
যব	✓৫ সের
ভুষি	✓৫ সের

ইহাই বাজার বিক্রয়ের ব্যবস্থা। জৈ বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য, সেই জন্য ইহাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর করিতে হইলে জৈএর পরিমাণ একটু বাড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু বাজার বিক্রয়ের জিনিসে মূল্যবান দ্রব্য দিলে বিক্রয়ের পড়তা বেশী পড়িয়া যায়, সেইজন্য দোকানদারগণ জৈ, ভুষি যব কম দিয়া থাকে। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্রে মিশাইলে Crushed Food হইয়া গেল। অনেকে শুধু ক্রাসড্‌ফুড করিয়া বেশ ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। সহর বাজারে Crushed Food সরবরাহ করা একটি উৎকৃষ্ট ব্যবসার মধ্যে গণ্য।

LUBRICANTS or OILS FOR WAGONS

গাড়ীর মিগে এবং ওয়াগণের মিগেতে তৈল না দিলে বিপদ ঘটীতে পারে, সেই জন্য তৈল দেওয়া হয়, ইহাকে লিউব্রিক্যাণ্ট বলে। কল কারখানার যন্ত্র এবং চক্রাদিতে যে সকল তৈল ব্যবহার হয়, তাহা গরুর গাড়ী বা ওয়াগণের চাকায় দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ খরচ অধিক পড়ে। সেজন্য সুলভ তৈল আমদানী হইয়া এদেশে আসে। এদেশের লোক'ও ইহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা করিতে পারেন, নিম্নে তাহার প্রস্তুত প্রকরণ প্রদত্ত হইল।

সোডা	আধ আঃ
পটাস	” ”

৬ আউন্স জলে গলাইয়া ফেল।

তাহার পর—

ট্যালো বা চর্ব্বী ৫ আউন্সকে গলাইয়া ইহার সহিত স্পারম অয়েল (Spurm Oil) মিশ্রিত কর। তাহার পর পটাস এবং সোডা মিশ্রিত জল ঢালিয়া দাও এবং নাড়িতে থাক। ইহার সহিত ৮ আউন্স গ্রাফাইট (Graphite) দিয়া খুব নাড়িয়া মিশাইয়া ফেলিলেই আবশ্যকীয় দ্রব্যটী প্রস্তুত হইয়া গেল। ব্যবসায়ের আকারে তৈল তৈরী করিতে হইলে এই সকল দ্রব্য proportionally বা হারাহারি মত বাড়াইয়া লইতে হইবে।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভলুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী-সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামুল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

ভিক্ষার চাউল তা ক্ষুদ আর কাঁড়া।

*

একা আর বোকা সমান।

*

চাকরের আবার শ্বশুর বাড়ী।

*

খোদার মাইর দুনিয়ার বাইর।

*

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।

*

আপ্ ভাল ত জগৎ ভাল।

*

ভাঙ্গবে তবু হেল্‌বে না

*

ঘরের ইন্দুরেই বাঁধ কাটে।

*

রামগানে ভূতের কেচ্‌কেচি

*

টাকার নৌকা পাহাড় ডিঙ্গায়।

*

শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে।

*

ওস্তাদের মাইর শেষ যত্রে।

*

টাকায় মিলে বাঘের চোক্।

*

কুকুরের পেটে কি ঘি সয়?

*

শকুনের দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে।

*

মরণ কালে হরি নাম।

*

যে গাই দুধ দেয় তার লাথি সওয়া যায়।

*

যত গুড় তত মিঠা।

*

শকুনের সাপে গরু মরে না।

*

বয়স বাড়ে আর দোষ বাড়ে।

*

নদীর এক কূল গড়ে ত
আর এককূল ভাঙ্গে।

*

ধনীর প্রেম বালীর বাঁধ।

*

আকাঠা নায় সুন্দরীর গলৈ।

*

যার ঘা তার ব্যথা।

*

পোড়া ঘায় নুনের ছিটা।

*

কিবা বিয়ার বিষয়
তাতে আবার চিক্ বাদ্য।

*

ধরি মাছ না ছুই পানি।

*

আগে তিতা পাছে মিঠা।

*

বুদ্ধি থাকৃলে বাঘে খায় না।

*

বনের বাঘে খায় না,
মনের বাঘে খায়।

*

রাম না হতে রামের বিয়ে।

*

চেনা বামুনের পৈতা দরকার হয় না।

*

বামন হয়ে চাঁদে হাত।

*

খাইতে জোটে না
শুইতে চীকন পাটি।

*

মরা মেরে খুনের দায়।

*

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

*

স্যাক্‌রার ঠুকুর ঠাকুর
কামারের এক ঘা।

*

মার চেয়ে মায়া বেশী
তার নাম 'ডাইনী'।

*

একা রামে নিস্তার নাই
সাথে দেখি লক্ষ্মণে।

*

ভাত কাপড়ের কেউ না
কিলানের যম।

*

মোটে মায় রান্ধে না
তার তপ্ত আর পান্তা।

*

আগে জলের ছিটা
পাছে চৈরের গুতা।

*

যত বড় মুখ নয়
তত বড় কথা।

*

যে পাখী উড়ে সে
বাসায়ই ফর্ ফর্ করে।

*

সাধলে কাঁঠাল খায় না
পরে ভোথা ধরে টানে।

*

কর্ত্তার ইচ্ছায় কীর্ত্তন
নাড়া বনে গৈর।

*

যত চতুর তত ফতুর।

*

তিন মাথা যার বুদ্ধি লইও তার।

*

কারো ভাদ্র মাস কারো সর্ব্বনাশ।

*

যার না হয় নয়ে তার হয় না নব্বইয়ে।

*

কাজে কাজী অকাজে পাজী

*

যে জাগিয়া ঘুমায় তারে জাগান না যায়।

*

পাগলে বা না কয় কি
ছাগলে বা না খায় কি ?

*

নাইয়ার এক নাও, নিনাইয়ার শত নাও।

*

শরীরের নাম মহাশয়
যাহা সওয়াবে তাই সয়।

*

হাটে না পাইয়া ঠাঁই
ঘরে আইসা মাগ্ কিলাই।

*

যার প্রতাপে রামের মা
তারে তুমি চিন্‌লা না।

*

টাকায় করে কাম
মাগি সর্দ্দার নাম।

*

মুড়ি বল, চিড়া বল, ভাতের কাছে কিছু না
মাসী বল, পিসী বল, মার চেয়ে কেহ না।

*

যার হাতে খাই নাই সে বড় রাঁধুণী
যারে চোখে দেখি নাই সে বড় সুন্দরী।

*

বিপদ যখন আসে
বহু সাথী তার পাশে।

*

জন্ম হউক যেথা সেথা
কর্ম্মেতে হয় পরিচয়।

*

হাতে নাই এক কড়ি
পরের ধনে পোদ্দারী।

*

মা চায় মুখের পানে
বৌ চায় টেকের পানে।

*

আকাশের আছে শেষ
আশার নাহিক শেষ।

*

উনা ভাতে দুনা বল
ভরা ভাতে রসাতল।

*

নদী, নারী, পাহাড়
দূর থেকে বাহার।

*

খাইয়া হাগে শুইয়া জাগে
সে মানুষ না কোন কাজে লাগে।

*

নদী, নারী শৃঙ্গ ধারী
এ তিনেরে না বিশ্বাস করি।

*

আজ বুঝবানা বুঝবা কাল
মাথা চাপ্‌ড়াইয়া মরবা কাল।

*

যে দেশের যে ভাও
উল্টা হইয়া নাও বাও।

*

এক দেশের বুলি
আর এক দেশের গালি।

*

মুখে বলি হরি হরি
ভিতরে ভিতরে কাজ সারি।

*

উলীর যদি পাখা হয়
আগুনে তার মরণ নিশ্চয়।

*

সরকারে খায় মজিদে ঘুমায়।

*

বেশী আশা বুদ্ধি নাশা।

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী পাল
গাউপাড়া, ঢাকা।

বাবলা

পতিত জমিকে অনাদৃতভাবে ফেলিয়া না রাখিয়া পল্লীবাসীগণ অনায়াসে তাহা হইতে লাভবান হইতে পারেন; পতিত জমিতে এ গাছ প্রচুর জন্মে, ইহা আমি যেখানে গিয়াছি, সেই-খানেই দেখিয়াছি। ইহাকে কেহ যত্ন করে না, তথাপি আপনা হইতেই জন্মে, যত্ন করিলে ত কথাই নাই। বাব্‌লায় আমাদের যে কত কাজ হয়, তাহা এদেশের কৃষকের অবিদিত নাই, লাঙ্গল, গাড়ীর চাকা, কৃষিকার্য্যের অস্ত্রাদির বাঁট, লাঙ্গলের ঈশ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য বাবলা গাছের দ্বারা হইয়া থাকে। বাবলা কাষ্ঠ কঠিন, জলে সহসা পল্‌কায় না। এই বাবলার চাষ দ্বারা কত প্রকারে যে লাভবান হওয়া যায় আমরা সংক্ষেপে তাহা দেখাইতেছি;—

১। বাবলার আঠা মূল্যবান। ॥০ ॥৵০ সের দরে বিক্রয় হয়।

২। বাবলার কাষ্ঠ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহা বঙ্গের কৃষককুল বিলক্ষণই জানেন।

৩। বাবলার ছাল দ্বারা চামড়ার রং ও চামড়ার পাট হইয়া থাকে, এই বাবলার ছাল বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে, এবং বেশ উঁচু দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাবলার ছাল শুকাইয়া Decorticating machine এ গুঁড়া করিয়া তবে রপ্তানী করিতে হয়। মূলতান, সিন্ধু, রাজপুতানা ও মণ্টেগোমরীর উষর বালুকাময় প্রদেশে লক্ষ লক্ষ একর জমি কেবল বাব্‌লার জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেইজন্য পাঞ্জাবের Tannery সমূহে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে Crushed Babul Bark ব্যবহৃত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। এই বাবলার ছাল গুঁড়া করার জন্য পাঞ্জাবে অনেক Factory আছে। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি কেবল ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

৪। বাবলার পাতা ও শুঁঠি, ছাগ, মেষ ও গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; সকলেই জানেন ইহাতে পশুদিগের দুধ বাড়ে।

৫। বাব্‌লার কাঁটাযুক্ত ফেংড়ীগুলি দুর্ভেদ্য বেড়ার কাজ করে এবং উহা উৎকৃষ্ট জ্বালানী কাষ্ঠ। দোআঁশ মাটিযুক্ত ডাঙ্গা ও জলাশয়ের ধারেই ইহা প্রচুর জন্মিতে পারে। কোন স্থানে ৫০০ বাব্‌লা গাছ জন্মিলে ৫।৭ বৎসরে প্রত্যেক গাছটা অন্ততঃ ৫৲ টাকায় বিক্রয় হইলে ২৫০০ টাকা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহাপেক্ষা উচ্চ মূল্যেই ভাল পাকা সারাল গাছ বিক্রয় হইয়া থাকে। বাবলার ছাল, আটা এবং জ্বালানী কাষ্ঠ এগুলি উপরন্তু লাভ। বর্ষার পূর্ব্বে জমিটা কর্ষণ করিয়া বাবলা বীচি ছড়াইয়া দিতে হয়, বর্ষার জল পাইলে গাছ জন্মিতে থাকে; এই চারাগাছগুলি প্রথমে ছাগল গরুতে না খাইয়া ফেলে, কেবল এইটুকুই দেখিতে হয়। যত গাছ বড় হইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে ফেংড়ী ছাঁটিয়া দিতে হয় মাত্র। তাহার পর ৫।৬ বৎসরে প্রকাণ্ড গাছ হইয়া থাকে। সারাল বাবলা গাছ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, বাব্‌লার

বীজ ছাগলের মুখনিঃসৃত হইলে তাহাতে তেজস্কর বৃক্ষ জন্মে। বাবলার পাতা শুঁটি ছাগলের অতি প্রিয় খাদ্য। আমাদের দেশের সকলেই প্রায় এ সকল তথ্য জানেন কিন্তু কেমন আমাদের আলস্য, উপেক্ষা এবং ঔদাস্যের জন্য আমরা এগুলি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া রাখিলেও ৫০০ বাবলা গাছে ২৫০০৲, ৩০০০৲ টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। যদি পারেন, বিষয়টা চিন্তা করুন, এই মাত্র প্রার্থনা।

মৌমাছি পালনের ব্যবসায়

কিছু দিন পূর্ব্বে সঞ্জীবনীতে মৌমাছির চাষ ও মৌমাছির চাষে যে বিনা খরচায় মধু সংগ্রহ ও অর্থাগম হইতে পারে সে সম্বন্ধে একটী বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহার ফলে অনেকে মৌমাছির চাষ সম্বন্ধে বিবরণ জানিতে চাহেন। মৌমাছির চাষে গৃহস্থের বেশ আয় হয়। মৌমাছি পালন একটী লাভজনক ব্যবসায়। বর্ত্তমানে এদিকে বহুলোকের দৃষ্টি পড়ায় অনেকেই মৌমাছি পালন শিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আমরা নিম্নে মৌমাছির চাষ সম্বন্ধে কোথায় কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

১। গভর্ণমেণ্ট বি ফার্ম, পোঃ রাইসন (কুলু), পাঞ্জাব।

২। গবর্ণমেণ্ট বি ফার্ম, পোঃ জিওলিকোট, নাইনিতাল, যুক্তপ্রদেশ।

৩। দি এ, আই, ভি, আই এসোসিয়েশন মাগাণওয়াদি এভিয়ারী, ওয়ার্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশ।

৪। ওয়াই, এম, সি, এ রুর‍্যাল রি-কন্সট্রাকশন সেণ্টার (পল্লী পুনর্গঠন কেন্দ্র) কোয়েম্বাটোর দক্ষিণ ভারত।

৫। ওয়াই, এম, সি, এ রুর‍্যাল রিকনস্ট্রাকসন সেণ্টার (পল্লী পুনর্গঠন কেন্দ্র) মার্ত্তাণ্ডম, দক্ষিণ ভারত, ত্রিবাঙ্কুর।

উপরোক্ত শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে মৌমাছি পালন শিক্ষা করিতে এক মাস হইতে ৩ মাস সময় লাগে। যুক্তপ্রদেশের নাইনিতালের জেওলীকোটের গবর্ণমেণ্ট বি ফার্ম শিক্ষা কেন্দ্রে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এমনকি শিক্ষার্থীদের থাকা, এবং যাতায়ত ব্যয়ও ফার্ম্ম বহন করিয়া থাকেন।

মৌমাছি পালন শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা নয়। কারণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মৌমাছি পালকগণের মধ্যে অনেকেই কোন শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। যাহাদিগের এ বিষয়ে শিক্ষালাভের পর্য্যাপ্ত সময় বা সুযোগ নাই তাহারা এ সম্পর্কে ভূপেন এপীয়ারী (হিমালয়), আলমোড়া, যুক্তপ্রদেশ, হইতে "ভারতে মৌমাছি পালন" নামে যে ধারাবাহিক সংবাদ তথ্যাদি প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিয়াও অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারেন। পৃথিবীর নানা স্থানে অনেক নারী মৌমাছি পালন করেন। এমন কি অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণও আগ্রহের সহিত তাহা শিক্ষা করিতে চাহে। ১৯১৭ সালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে মৌমাছি পালন আরম্ভ হয়। এক্ষণে তথায় এক সহস্রেরও অধিক সংখ্যক মৌমাছি পালনাগার আছে।

১৯৩৬ সালের হিসাবে জানা যায় যে জেকোস্লোভাকিয়ায় ১৩৩০৭১টি মৌমাছি পালনাগার ছিল ও তাহাদের আগারের সংখ্যা ৬৮৯৭৫৩। তন্মধ্যে বাক্সের মধ্যে তৈয়ারী চাকের সংখ্যা ৫৭২২৩টি অর্থাৎ শতকরা ৭টি ছিল। মধুমক্ষিকাগুলিকে চাকের মধ্যে আধুনিক ব্যবস্থায় রাখা হয়। এই সকল বিষয়ে জেওলিকোটের মৌমাছি পালনাগারের ডিরেক্টরকে পত্র লিখিলে অনেক বিবরণ জানা যাইবে। যে সকল যুবক গৃহে বেকার আছে তাহারা এই মধুমক্ষিকা রক্ষা দ্বারা মধুর ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বারমাস কাগজী বা পাতি-লেবু ধরাইবার সহজ উপায়
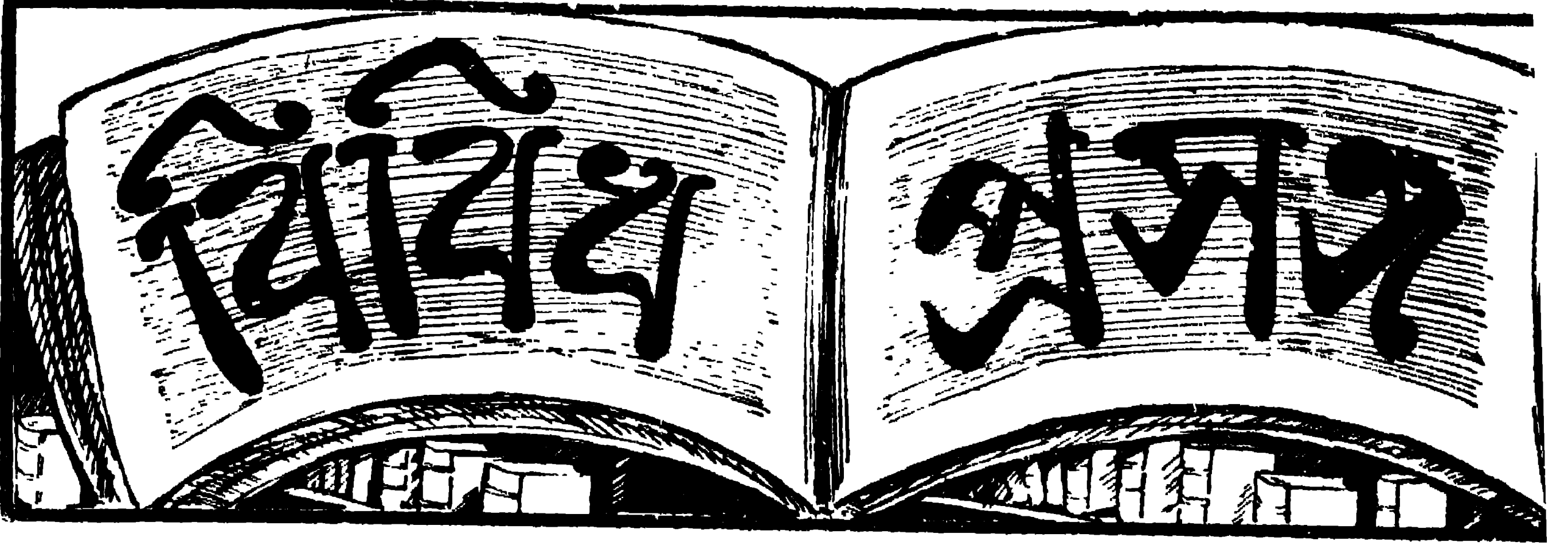
লেবুর ন্যায় হিতকারী ফল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেবু মুখরোচক এবং রোগ বীজ নাশক। কাগজী লেবুর ২।৪ ফোঁটা রস কলেরাদি সংক্রামক রোগের সময় জলে দিয়া খাইলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যেক সংসারেই লেবু গাছ রোপণ করা উচিত। বারমাস যাহাতে গাছে লেবু ধরিতে পারে, তাহার একটা সহজ উপায় আছে। যশোহর হইতে জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে, যখন বসন্তকালে লেবুর ফুল ধরে, তখন গাছের অর্দ্ধেক বা বারআনা আন্দাজ ফুল নষ্ট করিয়া দিতে হয়, অথবা লেবু কচি অবস্থাতেই ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। এইরূপ করিলেই বারমাস লেবু ধরিতে আরম্ভ করে। আমরা বহুকাল হইতে অনেক প্রবীণ মালির নিকট শুনিয়াছিলাম যে, এইরূপে আমের মুকুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বারোমেসে আম গাছ করা যায়। সাধারণের ইহা পরীক্ষা করা উচিত।

কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রয়োগ

কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রয়োগ দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির উপায় বহুকাল হইতেই জল্পনা কল্পনা হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে আমেরিকা ও ইউরোপের নানাস্থানে কৃষিক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার হইতেছে। প্রথমে দুইজন রুশ বৈজ্ঞানিক এইরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈদ্যুতিক ব্যাটারী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এক্ষণে উন্নত প্রণালীতে সভ্য জগতের নানাস্থানে ব্যবহার হইতেছে। ভারতের জমির উর্ব্বরতার জন্য ইহা যে কোন স্থলে এ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সংবাদ শুনা যায় না।

কারবারে কৃতিত্বলাভের সম্বন্ধে জগতের বিখ্যাত ব্যবসায়ীদিগের উক্তি

মিঃ রকফেলার বলেন,—he attaches great importance to routines,—বর্ত্তমান সময়ে মিঃ রকফেলার জগদ্বিখ্যাত ধনী; সামান্য অবস্থা হইতে ইনি কোটী পতি হইয়াছেন; তিনি বলেন, আমাকে যে কি করিতে হইবে,

তাহার সময় ও তালিকা প্রস্তুতের উপরেই আমি অধিক নির্ভর করি, এবং সেই রুটীন মত কাজ করিয়া আমি জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি।

লর্ড ষ্ট্রাথ্‌কোনা বলেন—কি করিতে হইবে এইটী স্থির করিয়া সময়ের বিভাগ করিয়া কাজ করিলেই সফলকাম হওয়া যায়। আগে কি করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া নিলে তবে সকল কাজের সুবন্দোবস্ত হয়।

স্যার টমাস ডিউয়ার বলেন—কারবারের প্রত্যেক হেড্‌ম্যান্ বা বড় কর্ম্মচারীকে তাহার বিভাগের সমস্ত কার্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য দায়ীক করা উচিত।

স্যার টমাস লিপটন বলেন, প্রত্যেক যুবকের মাথায় "কাজের তুল্য যে মজা আর নাই" ইহা ঢুকাইয়া দেওয়া উচিত "There is no fun like work".

স্যার ওয়াল্টার গিলবী বলেন, তিনি নিম্নলিখিত মহাজন বাক্যে নির্ভর করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন।

"Work while you work, and play while you play, অর্থাৎ ছেলে বেলায় যে শুনিয়াছিলাম, কাজের সময় কাজই করিবে, খেলার সময় কেবল খেলিবে, এই উপদেশই ঠিক।

এত গুলি জগদ্বিখ্যাত অভিজ্ঞের উপদেশ হইতে ইহাই সার সংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, আগে করণীয় কার্য্যের প্রত্যহ তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেই তালিকা মত প্রত্যহ কাজ করিয়া যাইলেই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে
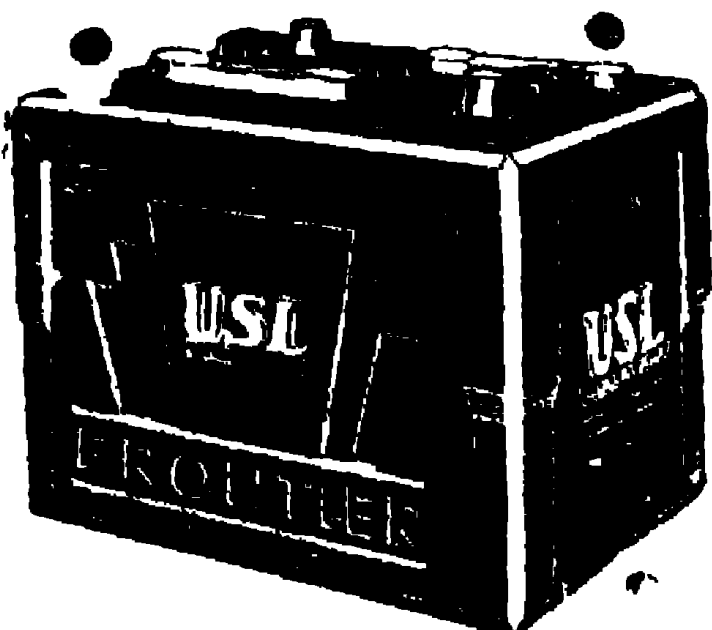
সম্পন্ন করিয়া অল্প সময়েই বড় হওয়া যাইতে পারে।

এদেশের কোনো ব্যবসায়ীর এই মহৎ গুণাবলী দেখা যায় না। করণীয় কার্য্যের তালিকাও নাই, কাজ শেষকরাও নাই। কাজ ও খেলার সময়ের ঠিক ও নাই। বাল্যকাল হইতে এ সকল না শিখিলে এ সকল হঠাৎ অভ্যাসও হয় না—এই গলদ।

মৌলিকত্বের জন্য।

বহুবার বলিয়াছি যে, কার্য্যের মৌলিকত্ব থাকিলে অকস্মাৎ প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারা যায়। অনুকরণে সে সম্ভাবনা থাকে না।

জার্ম্মানীর কোন পুস্তক বিক্রেতা জার্ম্মানীর বিখ্যাত সংবাদ পত্রগুলিতে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন যে,—

"Certain nobleman of wealth and high position desirous of finding a wife wanted one who resembles the heroine in the novel named"—

এই বিজ্ঞাপন প্রচারের পর রাজ্যের যাবতীয় সুন্দরী, বিবাহ যোগ্যা কুমারী সেই উপন্যাস খানি ক্রয় করিয়া নায়িকার চরিত্র পাঠের জন্য এরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, অবিলম্বে সেই পুস্তকখানি বারম্বার নিঃশেষ হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে প্রকাশক প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন। কেন? মৌলিকত্বের জন্য। এরূপ বিজ্ঞাপন আর কখনও কেহ প্রকাশ করেন নাই বা করিবার চিন্তাও করেন নাই।

গুড়ের রাস্তা

বর্ত্তমানে সিমেণ্ট দ্বারা রাস্তা তৈয়ারী করিতে প্রতি বর্গ গজে ৩॥৵০ ব্যয় পড়ে। আলকাতরা বাঁধান রাস্তা প্রতি বর্গ গজে ৮৵০ আনা ব্যয় পড়ে, কিন্তু ভারতে প্রতিবৎসর যে ৩১১০৯৯ টন গুড় উৎপন্ন হয় তাহা যদি রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে লাগান যায় তবে প্রতি বর্গগজে ॥৵০ ব্যয় হইবে। কানপুরে সুগার টেক্‌নলজিক্যাল এসোসিয়েসনের ৭ম সম্মেলনে ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অফ সুগার টেক্‌নলজির বাইওকেমিষ্ট ডাঃ সেন এক বক্তৃতায় উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়া গুড় দ্বারা রাস্তা তৈয়ারী করিবার উপায় নির্দ্দেশ করেন।

রাস্তা তৈয়ারী করিবার প্রধান উপকরণ গুড় ও আলকাতরা এদেশে অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের ১৫টি চিনির কারখানা হইতে গুড় পাওয়া যাইতে পারে, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া ও মধ্যপ্রদেশের কয়লার খনি হইতে আলকাতরা ও পিচ পাওয়া যাইবে। সেজন্য ভারতে গুড়ের তৈয়ারী রাস্তা নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা আছে। আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে গুড়ের রাস্তায় আলকাতরার তৈয়ারী রাস্তার ন্যায় কোন ক্ষতি না হইয়া ভারী গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে।

বিভিন্ন প্রদেশে চিনির কারখানার নিকটে ক্ষুদ্র আলকাতরা তৈয়ারীর কল বসাইয়া রাস্তা নির্ম্মাণকারী ঠিকাদারদিগকে দেওয়া যাইতে পারিবে কারণ তদ্দারা বহন ব্যয় কমিবে। যে পরিমাণ গুড় ভারতে উৎপন্ন হয় তদ্দারা প্রতি বৎসর ৬৮৭০ মাইল রাস্তা তৈয়ারী হইতে পারে। রাস্তা তৈয়ারী করিবার জন্য উত্তাপ দিয়া প্রথমে আর্দ্রতা দূর করিতে হয়। যতক্ষণ না উত্তাপ ১৩৫ (সেণ্ট) হয় ও সূতার ন্যায় গুড় টানা যায় ততক্ষণ উত্তাপ দিতে হয়। অতঃপর উহার

সহিত এ্যাসিড মিশাইতে হয় যতক্ষণ না উহার গলিয়া যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়। এই এসিডযুক্ত গুড় তখন আলকাতরায় অম্লের উপস্থিতিতে ও এ্যাসফ্যাল্ট মিশিয়া তাহাকে রঞ্জনের গুণ বিশিষ্ট করে।

এই দ্রব্য রাস্তায় দিলে তাহা টেঁকসই ও ধূলীহীন রাস্তায় পরিণত হয়।

পৃথিবীর সৈন্য সংখ্যা

দেশ	শান্তির সময়	যুদ্ধের সময়
মার্কিণ যুক্তরাজ্য	১৭৮০০০	১০০০০০০০
ফ্রান্স	৪৮৫০০০	৪২০০০০০
বৃটেম	২২৬০০০	৪৭০০০০০
জাপান	২৫৭০০০	১০০০০০০০
জার্ম্মানী	৫৫৬০৯০	৫৫০০০০০
রুষিয়া	১৩০১০১০	৩৫০০০০০০
ইটালী	২৬০০০০	৪০০০০০০
জেকোশ্লোভাকিয়া	১৬০০০০	১৮৭৫০০০
রুমানিয়া	৩০৫০০০	১৯০০০০০
যুগোশ্লাভিয়া	১২৪০০০	১০০০০০০
হাঙ্গেরী	৩৫০০০	৮০০০০০
পোল্যাণ্ড	২৬৬০০০	৩০০০০০০
বুলগেরিয়া	৬০০০০	৫০০০০০
তুরস্ক	১৯০০০০	১৫০০০০০
আয়ল্যাণ্ড	৬০০০	২৫০০০০
গ্রীস	৭০০০০	৬০০০০০
আলবানিয়া	১৪০০০	১০০০০০
স্পেন	১৩০০০০	২৫০০০০০
পর্টুগাল	২৩০০০	৬০০০০০
সুইজারল্যাণ্ড	৪৬০০০	৬০০০০
বেলজিয়ম	৭৩০০০	৭০০০০০
হল্যাণ্ড	১৯৬৭০	৭০০০০০
ডেনমার্ক	১০৯০০	৩০০০০০
নরওয়ে	১০০০০	১৫০০০০
সুইডেন	২২০০০	৫৭৫০০০
ফিনল্যাণ্ড	৩৩০০০	৩৫০০০০
ইস্টোনিয়া	৯০০০০	১১০০০০
ল্যাটভিয়া	২৫০০০	১৭০০০০
লিথুয়ানিয়া	২২০০০	২২৫০০০

মোরগ ও মুরগী পালন

মুরগী পালন একটী লাভজনক ব্যবসা ; ডিম, মুরগী ও মুরগীর বাচ্চা এই তিনটীই বিক্রয় করিয়া লাভ করা যায়। ডিমের ভিতরের কুসুম শুকাইয়া টিনজাত করিয়া পণ্য স্বরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করা যায়।

উৎকৃষ্ট জাতীয় মুরগীকে উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিষ্কার বাসস্থান দিলে ডিমের ও তাহাদের শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সমগ্র ফসল পরিমাণ এক এক বছর ৬০০ কোটী টাকারও বেশী হয়। ইয়ুরোপে ডেন্‌মার্ক, হল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়াম্‌, আয়াল্যাণ্ড, ও রুসিয়া হইতে বহু ডিম স্থানান্তরে রপ্তানী হয়। চীন দেশ হইতেও অনেক ডিম বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৩১ খৃঃঅঃ এক চীন দেশ হইতে ২ কোটী ডিম (মূল্য ৪২০০০ পাউণ্ড = ৬৩০,০০০ টাকা) কেবল ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল ; তদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশেও রপ্তানী হয়।
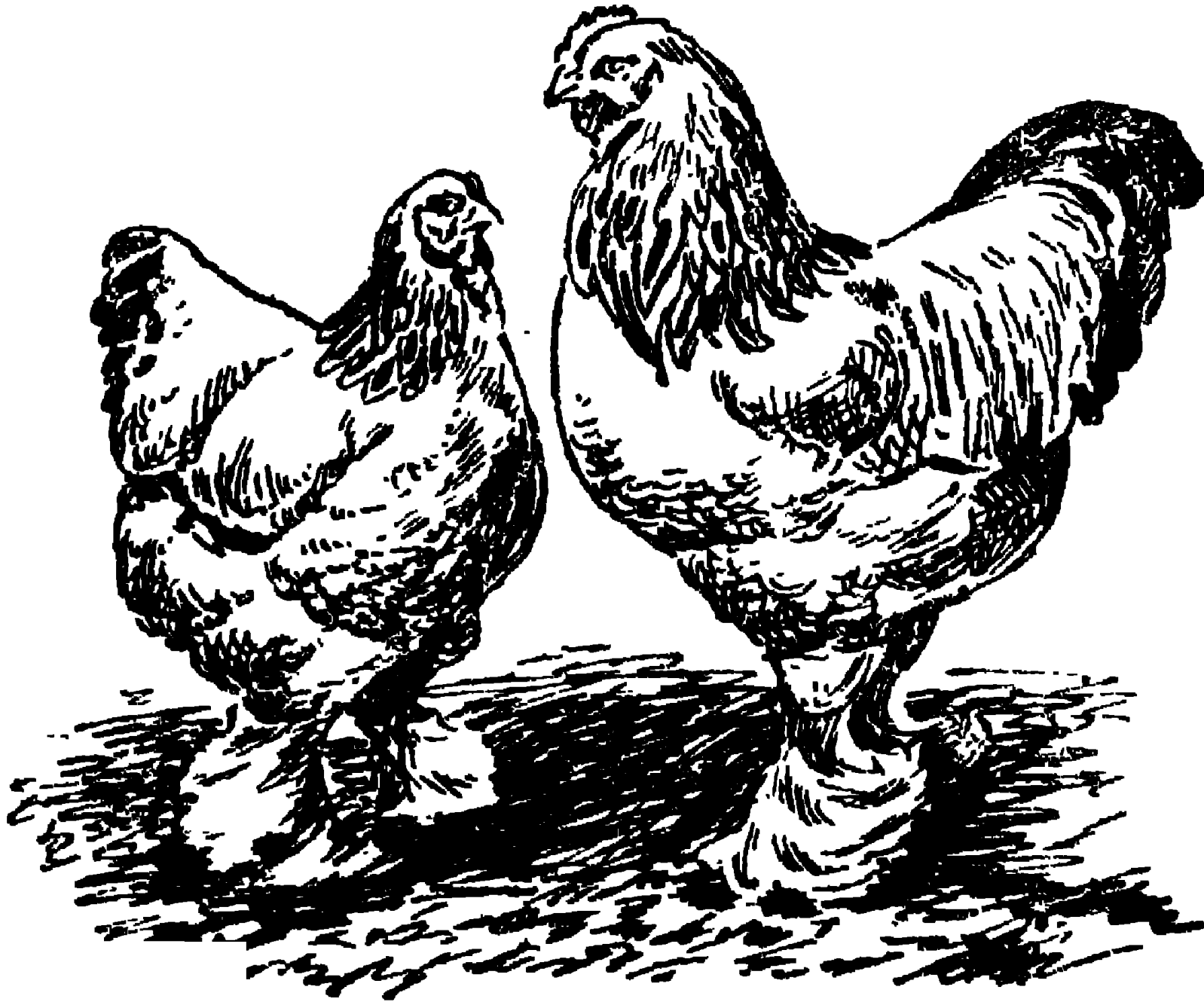
উৎকৃষ্ট জাতীয় প্রচুর ডিম্বদাত্রী বিলাতী মোরগ ও মুরগী

(**English Fowl**)

অপেক্ষাও অধিক মূল্যের ডিম উৎপন্ন হয়, কারণ সেখানে বছরে ডিম এবং মুরগী বিক্রয়ের

ভারতের জলবায়ু ও অন্যান্য অবস্থা মুরগী পালনের বিশেষ অনুকূল, এবং তাহা

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালন করিলে, প্রায় দুগ্ধতুল্য একটী পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান হয় ও বিদেশে রপ্তানী করিলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। পাশ্চাত্য জাতিগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মুরগী পালন করিয়া যে বিস্ময়কর উৎকৃষ্ট জাতের মোরগ মুরগী সকল জন্মাইয়াছেন, তাহাদের আদি পুরুষ চাটগা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশ সমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এদেশে অনেক বালিকা, বৃদ্ধা, ও অন্যান্য, বিশেষতঃ পর্দ্দানশীন গরীব স্ত্রীলোক, আলস্যে ও উদরান্ন সংস্থানের অভাবে দুঃখে দিন যাপন করে। তাহারা এই কার্য্য দ্বারা সহজে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে; ইহাতে অধিক পরিশ্রম, কি মূলধন নিয়োগ আবশ্যক করে না।

লক্ষ্ণৌ নগরে, গবর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় U. P. পোল্ট্রী এ্যাসোসিয়েশানের একটী বিদ্যালয় ও "ফারম" (farm—ক্ষেত্র) আছে। তথা হইতে অনেক ব্রাহ্মণ যুবকও শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের অনেকস্থানে মুরগী পালন ফারমে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কেহ কেহ নিজেরাও ঐ কার্য্য চালাইয়া লাভবান্ হইতেছেন। বিদেশ হইতে প্রথমতঃ অধিক ডিমপ্রদ মুরগী আনিয়া পালন করতঃ তাহার গর্ভজাত বাচ্চার এই দেশের জলবায়ু সহ্য হইয়া গেলে তাহা হইতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জাতের মুরগী জন্মান যায়।
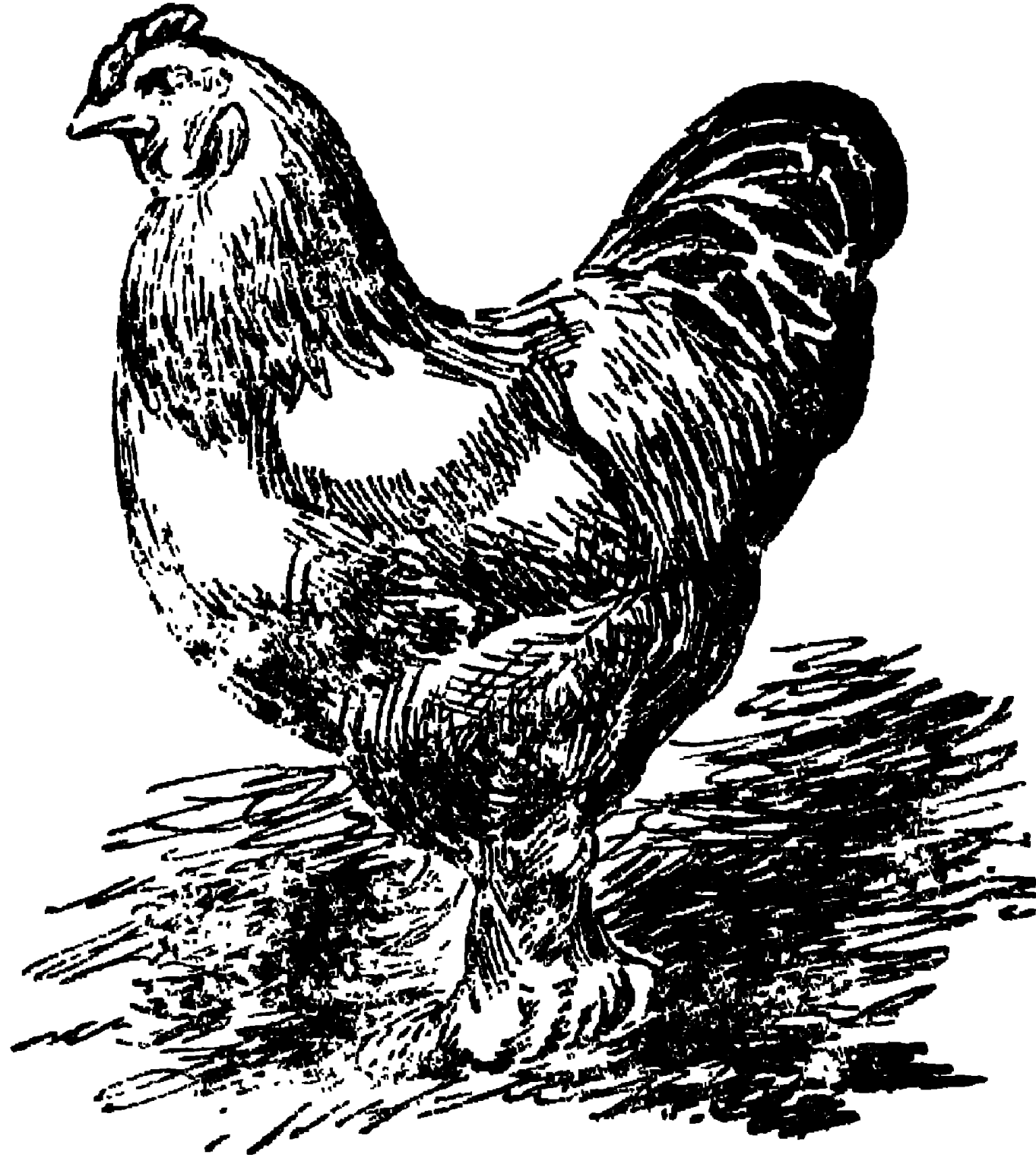
খুব বড় আকারের ডিম্বদাত্রী বিলাতী মুরগী
(**English Hen**)

যুক্ত প্রদেশে ইটা জেলায়, মিশানারীগণ যে একটী "সেন্ট্রাল্ পোল্ট্রী ফারম্ (Central Poultry Farm) পরিচালন করেন, প্রতি

বৎসরই তাহার অনেক শাখা "ফারম" স্থাপিত হইতেছে (১৯২৮)। প্রত্যেক "ব্রাঞ্চ" ফারমে "ব্ল্যাক্ মিনর্কা" মুরগী ১০টী, ও মোরগ ২টী "হোয়াইট্ লেগহরণ" মুরগী ১২টী ও মোরগ ২টী আছে। ঐ সেণ্ট্রাল ফারম হইতে, ব্রাঞ্চ ফারম্ সকলে, উৎকৃষ্ট জাতের ডিম, ফুটান জন্য, প্রত্যেকটী ডিম এক আনা মূল্যে বিতরণ করা হয়।

অধিক হয় না। যে সকল মুরগীর বৎসরে ৯।১০ বার ডিমে বসিবার অভ্যাস এবং তিন চারি বার ডিম দেয়, সাধারণতঃ তাহাদের সমস্তগুলি ডিম হইতেই ছানা হয়।

একটী অষ্ট্রালপ্ (Australop hen) মুরগী এক বৎসরে ৩০৯টা ডিম দিয়াছিল; এই ডিমগুলির প্রত্যেকটার সর্ব্ব নিম্ন ওজন এক ছটাক। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার মিষ্টার সী. বী. বাটালস্ মিয়াবের

চীনে মোরগ ও মুরগী

মাংস, ডিম ও উৎকৃষ্ট জাতের মুরগী ও মোরগ জন্মাইয়া, (breeding) বিক্রয় করা, এই তিন উদ্দেশ্যে তিন প্রকার মুরগী পালন করা হয়। ডিম পুষ্টিকর খাদ্য বিধায়, ডিমকেও, দুধের ন্যায়, আদর্শ খাদ্য মধ্যে গণ্য করা হয়। অধিক ডিম প্রসব করিলেই তাহাকে ভাল জাতের মুরগী বলা যায় না। কারণ, এইরূপ স্থলে ডিম ছোট হয় এবং ঐ সকল ডিমের অধিকাংশেরই ছানা হয় না। কোনও কোনও মুরগীর এক বৎসরে ২০০ ডিম হয়; আবার কতকগুলির ৩০।৪০টী ডিমের

একটী মুরগী এক বৎসরে ৩৩৮টা ডিম দিয়াছিল। ভারতবর্ষেও কোনও কোনও মুরগী দৈনিক দুইটী ডিম প্রসব করে। আমেরিকার লোকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও একটী মুরগী হইতে দৈনিক দুইটা ডিম পায় নাই।

মাংসের জন্য, চাটিগা, বর্ম্মা, ল্যাঙ্শান, অর্পিংটন্ প্রভৃতি এবং ডিমের জন্য মিনর্কা, ল্যাঙ্শান্, অর্পিংটন্, বসরা, ইত্যাদি ভাল। বিলাতী "ব্ল্যাকলেগহরণ" (Black Leghorn) ও "লাইটসাসেক্স" (Light Sussex) জাতীয় মুরগীও এ দেশের উপযোগী। কিন্তু বিদেশীয়

সকল মুরগীর পক্ষে বঙ্গদেশের জলবায়ু ভাল নয়; তজ্জন্য, চাটগাঁ জাতীয় মুরগী পালন করাই সুবিধাজনক।

উৎকৃষ্ট মোরগ ও মুরগীর লক্ষণ এই :—
(১) অল্প বয়স, ও পা দুইটী খাটি ও মসৃণ,
(২) বিস্তৃত বক্ষ,
(৩) হৃষ্টপুষ্ট ও চঞ্চল দৃষ্টি।

পালে দুই বৎসরের অধিক বয়সের মুরগী ও মোরগ রাখিবে না।

খাদ্য সম্বন্ধে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব উভয় প্রকার খাদ্যই আবশ্যক। ভাত, দই, দুধ, ঘোল, ডিমসিদ্ধ, ডিম শুষ্ক, মাংস, শুঁটকী মাছ চূর্ণ, ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য। তাহাছাড়া নানারূপ পোকা মাকড় কেঁচো ইত্যাদিও ইহারা খায়।

ধান, যব, গম, ছোলা, ভুট্টা, সকল প্রকার কলাই, শরিষা, তিসি, খইল, আবশ্যক মত চূর্ণ কি সিদ্ধ করিয়া কি গোটা দিবে। এই সকল খাদ্য এইরূপ পরিমাণ, মাটির উপর ছিটাইয়া দিবে যে

ব্যাণ্টাম মোরগ ও মুরগী

লেগ্‌হরন মোরগ ও মুরগী

তাহারা আগ্রহের সহিত তাহা খুঁটিয়া খাওয়ার পর একটী দানাও মাটিতে থাকিবে না, অথচ তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে এরূপও বুঝা যায়। উঠানের উপর মাটিতে খড় বিছাইয়া ঐ খাদ্য ছড়াইয়া দিলে তাহারা তাহা খুঁটিয়া খাইবে এবং তজ্জন্য অঙ্গচালনা জনিত পরিশ্রমে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে ও তাহারা হৃষ্ট-পুষ্ট হইবে এবং তাহাদের অধিক ডিম্ব প্রদান শক্তি জন্মিবে।

জলে ভিজাইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া নরম খাদ্য, এবং সন্ধ্যাকালে, কেবল দানা ইত্যাদি শুষ্ক খাদ্য দিবে। প্রাতে, মাসকালাই সিদ্ধের সঙ্গে কিছু লবণ কিম্বা ভাত ও ডাইলের সঙ্গে কিছু গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া খাইতে দিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে পাক ঘরের পরিত্যক্ত কি উচ্ছিষ্ট দ্রব্যও প্রাতে খাইতে দিবার পক্ষে উত্তম। সন্ধ্যার সময় গম বা ভুট্টার গুঁড়াই সর্ব্বোত্তম খাদ্য, কারণ তাহাতে মুরগী ও হাঁসের

ল্যাংশাম মোরগ ও মুরগী

যে সকল পাখীগুলিকে ঘরে কি ঘেরা আঙ্গিনায় আবদ্ধ রাখা হয় তাহাদিগকে দিবসে তিন বার এবং অন্যগুলিকে দুইবার খাদ্য দিবে। প্রাতে চাউলের কুঁড়া, ভাত, ডাইল, ইত্যাদি

ডিম্ব প্রদান শক্তি বৃদ্ধি করে। যদি ক্রমান্বয়ে মুরগীগুলিকে একবার পতিত ঘেরা জমিতে ও তাহার পর চাষকরা ঘেরা জমিতে রাখিয়া চরিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে

অল্প খাদ্য দিলেই চলিতে পারে। যে উঠানে পাখীগুলি চরিয়া বেড়ায় তাহাতে প্রচুর ঘাস থাকা আবশ্যক, এবং অল্প ঘাস থাকিলে মুরগী ও হাঁসকে কাঁচা খাদ্য, যেমন বাঁধা কপি, গাজর, সরিষা ইত্যাদির পাতা খাইতে দিবে। তজ্জন্য পতিত জমি চাষ দিয়া তাহাতে ঐ সকল কাঁচা খাদ্য আবাদ করাই ভাল।

বলা বাহুল্য, খাদ্যাদি অতিরিক্ত কিম্বা অত্যন্ত কম যেন না হয়, কারণ এ দুইটাই অপকারী।

পানীয় জল

বারান্দার নীচে ছায়াযুক্ত স্থানে একটী পাত্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় শীতল জল পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। উষ্ণজল মুরগীর পক্ষে ভাল নয়।

খাদ্য

১। উপরোক্ত জল পাত্রের নিকট একটী মেটে গামলায় সামুক, ঝিনুক, ঘুটিং পাথর প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাখিয়া দিতে হইবে।

দো আঁশলা বৃহৎ জাতীয় মোরগ ও মুরগী
(**Crossbred**)

২। বারান্দায় অপর একটী গামলায় চীনা-বাসন ও ছোট ছোট পাথরের টুক্‌রা রাখিয়া দিবে ইহা মুরগীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় খাদ্য।

৩। মুরগীর বাসস্থানেরনিকটে সর্ব্বদা পরিষ্কার শীতল জল রাখিয়া দিবে যেন, তাহারা ইচ্ছামত যে কোনও সময়ে পান

করিতে পারে। মুরগীর ওলাউঠা রোগ (chicken cholera) বড় মারাত্মক। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময়ে তাহাদের পানীয় জলের মধ্যে এরূপ অল্প পরিমাণ হীরাকস চূর্ণ মিশাইয়া দিবে যে তাহাতে জলে যেন তাহার ঐরূপ সামান্য গন্ধ মাত্র থাকে। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটও ঐরূপ অল্প মাত্রায় মিশ্রিত করিলে, হীরাকসের ন্যায় কার্য্য করে।

দো আঁশলা বৃহৎ জাতীয় মোরগ ও মুরগী
(**Crossbred**)

(ক্রমশঃ)

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

ম্যাঙ্গালোরের পপুলার ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) হইতে মাদ্রাজে একটী ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন। মিঃ এ শ্রীনিবাস রাও বি এ, বি এল ইহার সেক্রেটারী হইয়াছেন।

মিঃ ডব্লু এল রস সম্প্রতি জেনারেল য়্যাসুর‍্যান্স সোসাইটীর দিল্লীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে মিঃ পিয়ারী লাল ঐ কার্য্য করিতেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, গত ১১ই নবেম্বর (১৯৩৮) "এশিয়া মিউচুয়্যালের" ডিরেক্টর ডাঃ সি আর বসু এম্ বি পরলোক গমন করিয়াছেন। হ্যাপী ইণ্ডিয়া ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানীর মেডিক্যাল অফিসার রূপে বীমাব্যবসায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

১৯৩৭ সালে ওয়াডেন ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী প্রায় ৫৩½ লক্ষ টাকার নূতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার প্রিমিয়াম আয় সাড়ে চারি লক্ষ টাকার উপর। আমরা এই কোম্পানীর ক্রমোন্নতিতে আনন্দিত হইতেছি।

মিঃ সচ্চিৎ সরকার প্যালেডিয়াম্ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর আরম্ভ হইতে উহার সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে সংযুক্ত ছিলেন। আমরা শুনিলাম তিনি ঐ কোম্পানীর জন্য বহু টাকার বীমা সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি তিনি ইণ্টারপ্রভিন্স্যাল ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যাঙ্কিং কারবারের নাম পূর্ব্বে ছিল কোরকন্দী (জেলা ফরিদপুর) ইন্ডা-

ষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড। ৯ নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা এই ঠিকানায় ইহার আফিস বসিয়াছে।

মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ অমর সিংহ সাহা র‍্যাডিক্যাল্ ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া আর্য্য ইনস্যুর‍্যান্সের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, ভারত গবর্ণমেন্টের আইন-সদস্য মাননীয় স্যার এন্‌ এন্‌ সরকার ১৯৩৮ সালের নূতন বীমা আইনের সংশোধন কার্য্যের ভার লইয়াছেন। এই সংশোধন অতি সামান্য রকমেরই হইবে; তাহাতে মূল আইনের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

ওয়াডেন্ ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর পুনা ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী মিঃ অভ্যাঙ্কর বি এ, এল্ এল্ বি উক্ত কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চে বদলী হইয়াছেন।

কাশ্মীর রাজ্যে বীমার কারবার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তথায় একটী নূতন আইন তৈয়ারী হইতেছে।

গত ৬ই নবেম্বর (১৯৩৮) মাদ্রাজ প্রদেশের বেজওয়াদা সহরে অন্ধ্রদেশীয় পলিসি-হোল্ডারদের তৃতীয় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ ভি এল শাস্ত্রী তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পলিসি-হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নূতন বীমা আইনে কয়েকটী সংশোধন-ধারা যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই,

(১) পলিসি হোল্ডারদের পক্ষীয় ডিরেক্টর নির্ব্বাচনে প্রত্যেক পলিসি-হোল্ডারই পোষ্টাল ডাক যোগে অথবা উপস্থিত হইয়া ভোট দিতে পারিবেন।

(২) প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বাবদে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৬০ টাকার কম কোন স্থলেই সারেণ্ডারভ্যালু হইতে পারিবে না।

(৩) কোন অংশীদার তাঁহার প্রদত্ত শেয়ার মূল্যের শতকরা মূল্যের শতকরা ১২ টাকার অধিক ডিভিডেণ্ড বা বোনাস্ পাইবে না।

(৪) পেড্‌-আপ পলিসির হারা-হারি বোনাস্ সাধারণ পলিসির বোনাসের মতই দিতে হইবে।

গত ৫ই নবেম্বর মাদ্রাজ প্রদেশের বেজ-ওয়াদা সহরে অন্ধ্রদেশীয় ইণ্ডিয়ান ইন্‌সুর‍্যান্স এজেন্টগণের পঞ্চম কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ এম্ তিরুমালা রাও এম্ এল এ তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতার ১৯ নং বেন্টীক ষ্ট্রীটে জলপাই-গুড়ীর নবজীবন ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর একটী ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। মিঃ আর কেজরীওয়াল ইহার ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বোম্বাইর নেপচুন ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর আফিস উহার নিজ বাড়ী "নেপচুন বিল্ডিং" নামক ভবনে উঠিয়া গিয়াছে। অতঃপর উক্ত কোম্পানীর ঠিকানা, নেপচুন বিল্ডিং, ১৭০ নং হর্ণবী রোড ফোর্ট বোম্বাই হইবে।

১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইউনিক য়্যাসিওর‍্যান্স কোম্পানীর আফিস ১-এ, ভান্সিটার্ট রো (ড্যালহৌসী স্কোয়ার সাউথ), কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

নূতন ইনকম্ ট্যাক্স আইনের ১০ নং ধারার বিধান অনুসারে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে যে, বীমা-কোম্পানীর উদ্বৃত্ত তহবিলের যে অংশ পলিসি হোল্ডারদার মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাহার অর্দ্ধেকের উপর ইনকম্ ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না। এই সুবিধা পাওয়াতে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের বাৎসরিক প্রায় ২ কোটি টাকা আয় হইবে, অনুমান করা যায়।

শুনা যায়, সিংহলে বীমাব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য সিংহল গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন আইন প্রণয়নের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহাতে এইরূপ বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে যে, সিংহলে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী বীমার কারবার করেন, বা করিবেন, তাঁহাদিগকে সিংহল গবর্ণমেণ্টের নিকটেও টাকা জমা রাখিতে হইবে এবং এই জমার টাকা সিংহলী বীমা কোম্পানীর মত কিস্তি হিসাবে দিলে চলিবে না, এককালীন দিতে হইবে।

লাহোরের নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানী শিয়ালকোটে একটী ব্রাঞ্চ্ আফিস্ খুলিয়াছেন। হেড্ আফিস হইতে মিঃ এল্ নারায়ণ দাস ভাণ্ডারীকে উহার পরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছে।

বিশ্বভারতীর কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় এম্ এ, কলিকাতার য়্যাসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট্ ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসারে বীকন ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান নাম, বীকন প্রভিডেণ্ট ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানী।

১৯৩৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে পুনার কমনওয়েল্থ য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী ৪০৩৯৭৭৩ টাকার নূতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ৬৩৪৬৭১ টাকা।

১৯৩৭-৩৮ সালে ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্স্যুর‍্যান্স কোম্পানী ১২ লক্ষ টাকার উপর নূতন বীমার কারবার করিয়াছেন। উহার লগ্নীর পরিমাণ ১৩৫৫০০ টাকা।

ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ পি সি চাটার্জ্জী সম্প্রতি এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী হিসাবে বিহার ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন।

—✻—

মেসার্স গাঙ্গুলী এণ্ড কোং দিল্লীর সার্ভেণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার আসাম এবং উড়িষ্যার চীফ্ এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন; ৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতায় তাঁহাদেব আফিস অবস্থিত।

—✻—

ভারত গবর্ণমেণ্টের নবনিযুক্ত বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে এইচ টমাস এফ আই এ গত ডিসেম্বর (১৯৩৮) মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে কয়েকটী প্রীতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় এবং কতিপয় প্রতিনিধিসংঘ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতার অধিকাংশ বীমা কোম্পানীর পরিচালক ও কর্ম্মীদের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা এবং আলাপ আলোচনা হয়।

—✻—

সম্প্রতি সিংহল গবর্ণমেণ্ট বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। তদনুসারে তথাকার প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে ২ লক্ষ টাকা সিংহল গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা রাখিতে হইবে। যে সকল ভারতীয় কোম্পানী সেখানে বীমার কারবার করিতেছে, তাহাদিগকে এই দুই লক্ষ টাকা এক কালীন দিতে হইবে। খাস্ সিংহলী কোম্পানী সমূহ ঐ টাকা কিস্তি হিসাবে দিতে পারিবে। ভারতীয় কোম্পানীর তরফ হইতে ইহার প্রতিবাদ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত পাঠান হইয়াছে।

—✻—

বেঙ্গল ইন্‌সুর‍্যান্স য়্যাণ্ড রিয়্যাল প্রপার্টী কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী মিঃ বি কে সেন এম্ এ, কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর চীফ্ অর্গ্যানাইজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—✻—

১৯৪০ সালের জুন মাসে সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত লুসার্ণ সহরে য়্যাক্‌চুয়ারীগণের দ্বাদশ ইণ্টার ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

—✻—

লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর লালা বদ্রীদাস এম, এ এবং ডিরেক্টর ডাক্তার নিহালচাঁদ সিক্রী আই, এম, এস, সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনার জন্য লক্ষ্মীর স্থানীয় ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী মিঃ শচীন বাগ্‌চী গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে গ্রেটইষ্টার্ণ হোটেলে এক বিরাট লাঞ্চের (মধ্যাহ্ন ভোজনের) আয়োজন করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরীর বহু সম্ভ্রান্ত লোক এই লাঞ্চে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলের নাম মনে থাকা সম্ভব নহে, তবুও আমরা ইহাদের উপস্থিত দেখিয়াছিলাম,—কলিকাতার মেয়র মিঃ জ্যাকেরিয়া, সার হরিশঙ্কর পাল, মিঃ নায়েক, মিঃ নাজীর, নিউইণ্ডিয়াব মিঃ প্যাটেল ও মিঃ সুধীর চৌধুরী, মিঃ এ, সি, সেন, মিঃ এ, কে, সেন, মিঃ এস, পি, বোস, মিঃ এস, সি রায়, মিঃ পি, সি, বায়, মিঃ পুরী,

মিঃ অমর ঘোষ, মিঃ সুধীন্দ্র লাল রায়, মিঃ জে, সি, দাস, মিঃ জিতেন সেন, মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ, মিঃ মাখন সেন, মিঃ নির্ম্মল ঘোষ, মিঃ রবীরায় চৌধুরী, মিঃ জয়েড্‌কা, মিঃ আই বি, সেন, মিঃ থাপার, মিঃ আশু ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু প্রভৃতি। যে ত্রিমূর্ত্তি লক্ষ্মীর বিজয় বৈজয়ন্তী দিকে দিকে উড়াইবার ভার লইয়াছেন তাহাদের অন্যতম মিঃ কাপুর ও ডিরেক্টরদের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে লক্ষ্মীইনসিওরেন্স কোম্পানী কলিকাতায় এক চৌদ্দতলা Sky Scraper বা আকাশ চুম্বী প্রাসাদ তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। জনরব এই যে এই উদ্দেশ্যেই ইহাদের বর্ত্তমান অভিযান। আমরা বলি, এই শুভাগমন সার্থক হউক—শিবাস্তে পন্থানঃ

ভ্রম সংশোধনঃ—আমাদের ৪৫ সালের বীমা-বার্ষিকীতে "ওরিয়েন্ট্যালের" বিবৃতির মধ্যে কয়েকটী নামের ওলট্ পালট্ হইয়াছে; কলিকাতা ব্রাঞ্চের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারীর নাম রবার্টসন না হইয়া রবার্টস হইবে এবং রাঁচীর সেক্রেটারীর নাম মিঃ নিয়োগী না হইয়া মিঃ গেয়ানী হইবে এবং মিঃ জোন্‌স্ কোম্পানীর ম্যানেজার মাত্র, ম্যানেজিং ডিরেক্টর নহেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ
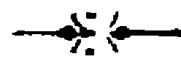
প্রবর্ত্তক ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড্

প্রথম ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট

(১৯৩৩—১৯৩৭)

আমরা প্রবর্ত্তক ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর প্রথম পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার ফল সন্তোষজনক দেখা যাইতেছে। এই কোম্পানী নানাপ্রকার দুরবস্থা ও দুর্বিপাকের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তাহাতে এক একবার আমরা ইহার বাঁচিবার আশাই ছাড়িয়াছিলাম। সকল বিপদ কাটাইয়া কোম্পানীটী যে পুনর্ব্বার সুস্থ ও সবল দেহে দাঁড়াইয়াছে,—শুধু দাঁড়াইয়াছে নহে,—ধীর ও নিশ্চিত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতীয় গৌরবের কারণও রহিয়াছে। নিম্নে আমরা এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্টের সার মর্ম্ম দিলাম।

সাধারণ জীবনবীমা বিভাগে নীট্ প্রিমিয়াম ভ্যালুয়েশন পদ্ধতিতে এই রিপোর্ট তৈয়ারী হইয়াছে শতকরা ৪ টাকা। ইন্ডাষ্ট্রীয়াল বিভাগে অফিস্ প্রিমিয়ামের শতকরা ৮০ টাকার উপর ভ্যালুয়েশন হইয়াছে এবং অফিস্ প্রিমিয়ামের শতকরা ২০ টাকা প্রকৃত খরচ বাবদ বরাদ্দ হইয়াছে। এই বিভাগেও সুদের হার ধরা হইয়াছে শতকরা ৪ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, অল্পবয়স্ক নূতন কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন যে প্রকার পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, তাহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অবলম্বিত হইয়াছে।

ভ্যালুয়েশনের ফলে কোম্পানীর সাধারণ জীবন বীমা বিভাগে ২৩১১ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায়। কোম্পানীর ইন্ডাষ্ট্রীয়াল বীমা বিভাগের কার্য্য ১৯৩৪ সাল হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। ভ্যালুয়েশনের ফলে এই বিভাগে কিছু তহবিল ঘাটতি দেখা যায়, কিন্তু আদায়ী মূলধনের দ্বারা এই ঘাট্‌তি সহজেই পূরণ হয়। ইন্ডাষ্ট্রীয়াল বিভাগের পলিসি সমূহ তামাদি দোষে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই সকল পলিসি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে।

কোম্পানী এবারের ভ্যালুয়েশনে কোন বোনাস্ ঘোষণা করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় ইহা যুক্তিসঙ্গত কার্য্যই হইয়াছে। বুঝা যায়, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে কোম্পানীর পরিচালকগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে। ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে তাঁহারা ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিতে চাহেন না। ইহাই দূরদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের উপযুক্ত কার্য্য। আমরা আশা করি কোম্পানীর পলিসি হোল্ডার এবং অংশীদারগণ ইহা যথার্থরূপে বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন।

পরিচালনা খরচ হইয়াছে প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৯০ টাকা। ১৯৩৭ সালে ১৩৫০০ টাকা স্থায়ী এককালীন খরচা বাবতে ধরা হয়। তাহা না হইলে, পরিচালনা খরচ শতকরা ৮৭'৪ টাকায় নামিত। নিম্নে আলোচ্য পাঁচ বৎসরের আয়-ব্যয় সংক্ষিপ্তরূপে দেখান হইল ;—

সাধারণ জীবন বীমা বিভাগে,—

প্রিমিয়াম আয়	৬১৫১৫ টাকা
সুদ (ইনকম্ ট্যাক্সবাদে)	৩৩৯৭ "
কোম্পানীর কাগজের মূল্যবৃদ্ধি দরুণ আয়	৩৭৩৯ "
অন্যান্য আয়	৮৫ "
মোট	৬৮৭৩৭ টাকা

দাবীশোধ বাবতে ব্যয়	৪৪৭৭ টাকা
কমিশন খরচ	১৪৯৮১ "
পরিচালনা খরচ	২৫৬৯৯ "
ছাড় দেওয়া হয়	৩৮২৫ "

এই সকল খরচা বাদে আলোচ্য বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিল দাড়ায় ১৯৭৮৩ টাকা। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দেখা যায় মোট মজুত পলিসির সংখ্যা ২৫৫। তাহাতে বীমার পরিমাণ ২৬৭৩৭৫ টাকা এবং উহার প্রিমিয়াম আয় ১৩৬৯৮ টাকা।

আমরা আশা করি, যাঁহারা বাঙ্গালীর বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা সকলেই প্রবর্ত্তক ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর এই প্রথম ভ্যালুয়েশনের আলোচনা করিয়া আশান্বিত ও সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা অবগত হইলাম, কোম্পানী ইতিমধ্যে আরও অধিক টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে লগ্নী করিয়াছেন। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক্ অব্ ইণ্ডিয়াতে কোম্পানীর মোট ডিপজিট্ হইয়াছে ৫০ হাজার টাকার উপর। আমরা এসংবাদে অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের ক্রমোন্নতির পরিচয়

আমরা গত মাসে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুর্যান্স সোসাইটীর ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাব ও রিপোর্টের আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে সোসাইটীর যে ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল ;—

(১) নূতন বীমা সংগ্রহ করা হইয়াছে ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকার। ইহার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৩½ লক্ষ টাকার অধিক।

(২) প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে ৬৯ লক্ষ টাকার উপর। পূর্ব্ব বৎসর প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৬২ লক্ষ টাকার বেশী। সুতরাং দেখা যায়, প্রিমিয়াম আয় প্রায় নীট ৭½ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

(৩) জীবন বীমা তহবিল ২৩১৯৮ হাজার টাকা হইতে ২৬৭৮৩ হাজার টাকায় উঠিয়াছে। সুতরাং জীবন বীমা তহবিল ৩৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

(৪) সোসাইটির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা হইতে ২ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে।

(৫) খরচের অনুপাত হইয়াছে শতকরা ২৯.৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহার পরিমাণ শতকরা ১.২ টাকা কম।

(৬) পলিসির দাবী (ভারতে ও ভারতের বাহিরে) দেওয়া হইয়াছে মোট ১৯৬২৪৮৭ টাকা।

(৭) সোসাইটীর পরামর্শদাতা য়্যাকচুয়ারী মিঃ ডবলু, এইচ্ ক্লাউ এফ্ আই এ, ১৯৩৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সোসাইটীর পঞ্চবার্ষিক ভ্যালুয়েশন করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার ফলাফল জানা যায়। তাহাতে প্রকাশ সোসাইটীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩৬১৫০৫৯ টাকা। এত টাকা উদ্বৃত্ত আর কখনও হয় নাই।

(৮) গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সিকিউরিটীতে সোসাইটীর লগ্নীর পরিমাণ মোট ৯০২৭২৮৮ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ইহা ছিল, ৫৮২৭৫৭৫ টাকা।

এই আটটী বিষয়ে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি এবং অবাধ ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান অধিকতর গৌরব মণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী

১৯৩৮ সাল ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার জুবিলীবৎসর। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম, কোম্পানী এবার এক কোটী টাকার উপর বীমার প্রস্তাব লইয়াছেন। আমাদের যতদূর মনে হয় ইহার পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর কাজের পরিমাণ ছিল ৭৩ লক্ষ টাকা। একবৎসরের মধ্যে কাজের পরিমাণ ৭৩ লক্ষ হইতে এক কোটী টাকায় তোলা কম কৃতিত্বের কথা নহে। কোম্পানীর প্রতি লোকের বিশ্বাস ও আস্থার ইহাযে অকাট্য প্রমাণ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মামলা মোকর্দ্দমা

ঢাকায় ভুয়া বীমা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের জেল

১৯৩৩ সালে "নওরোজ ইন্সিওর‍্যান্স্ কোম্পানী" নামে একটী বীমার কারবার খোলা হয় এবং ঢাকাতে ইহার হেড্ আফিস আছে বলিয়া প্রকাশিত হয়। তমিজুদ্দিন আহম্মদ ইহার একজন ডিরেক্টার এবং আজিজুর রহমান ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। কোম্পানীর নিয়মাবলী এবং ডিরেক্টারগণের নাম সহ প্রস্পেক্টাস্ পুস্তিকাও যথারীতি প্রচারিত হয়। তদনুসারে কতিপয় ব্যক্তিকে জীবনবীমা ও বিবাহ বীমার পলিসিও দেওয়া হইয়াছিল। ঐ সকল পলিসিতে তমিজুদ্দিন ডিরেক্টর হিসাবে সহি করে। কোন কোন পলিসিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার হিসাবে আজিজুর রহমানের সহিও থাকে। প্রস্পেক্টাস্ পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে যে, কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্টারীকৃত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কোম্পানী আদৌ রেজেষ্টারী করা হয় নাই।

১৯৩৩ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে সাবুরণ বিবি নাম্নী কোন স্ত্রীলোক তাহার শাশুড়ীর নামে এই কোম্পানী হইতে এক খানি পলিসি গ্রহণ করে। তমিজুদ্দিন সাবুরণ বিবির প্রতিবেশী ছিল। সাবুরণ বিবি পলিসির দরুণ তমিজুদ্দিনকে প্রথমতঃ ৪॥০ টাকা দেয় এবং তৎপর কোম্পানীকে ৬ বৎসর যাবৎ প্রতিমাসে এক টাকা হিসাবে যথারীতি প্রিমিয়াম প্রদান ও তাহার রসিদ গ্রহণ করে। তমিজুদ্দিন সাবুরণ বিবিকে বলিয়াছিল যে, কোম্পানীর আফিস সহরের ওয়াইজ ঘাটে অবস্থিত। অন্য কোন প্রতিবেশীর কথায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া সাবুরণ বিবি তাহার পুত্র আবদুল মালেককে কোম্পানীর আফিসের সন্ধানে পাঠায়। কিন্তু সে যাইয়া দেখে যে, ওয়াইজ ঘাটে কোম্পানীর কোন আফিস নাই। অতঃপর তমিজুদ্দিন সাবুরণ বিবিকে জানায় যে, কোম্পানীর মালিক বুড়ীগঙ্গার অপর পারে কালীগঞ্জ গ্রামে বাস করে। তদনুসারে সাবুরণ বিবি তাহার পুত্রকে তামিজুদ্দিনের সহিত কালীগঞ্জ গ্রমে আজিজুর রহমানের বাড়ীতে পাঠায়। আজিজুর রহমান বলে,—"পলিসি গ্রহণকারিণীর মৃত্যু হইলে টাকা পাওয়া যাইবে।"

কিছুদিন পরে সাবুরণ বিবি প্রিমিয়াম

চালাইতে অক্ষম হইয়া পলিসির দরুণ প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক দাবী করে। এই সুযোগে তমিজুদ্দিন সাবুরণ বিবির নিকট হইতে আরও তিন টাকা লয় এবং তাহাকে বলে যে, কোম্পানী হইতে তাহাকে প্রতি মাসে ৪ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। এই সকল কথায় সাবুরণ বিবির অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্মে। অতঃপর সে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করে।

ঢাকার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হিমাংশু জ্যোতি মজুমদার মহাশয়ের এজলাসে মামলার বিচার হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে আসামী তমিজুদ্দিনের ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা না দিলে আরও দুইমাস জেল খাটিবার আদেশ হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০।১০৯ ধারা অনুসারে আসামী আজিজুর রহমানও ঠিক ঐরূপ শাস্তি পায়। জরিমানার টাকা আদায় হইলে, ফরিয়াদী সাবুরণ বিবি প্রত্যেক আসামীর জরিমানা হইতে ৪০ টাকা হিসাবে ৮০ টাকা পাইবে,—বিচারক এইরূপ আদেশও দিয়াছেন।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ঢাকার জেলাজজের নিকট উকীল শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ রায় আসামীদের পক্ষ হইতে আপীল দায়ের করিয়াছেন। আসামীগণ জামিনে খালাস আছে,—আপীলের শুনানী চলিতেছে।

নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে ডিক্রী

মূলচাঁদ নামক একব্যক্তি ১৯৩২ সালের ১লা জুন তারিখে নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সুর্যান্স কোম্পানীতে জীবন বীমা করিয়া একখানি পলিসি গ্রহণ করে। তাহার সর্ত্ত এইরূপ ছিল যে, যদি ১৯৩৭ সালের ১লা জুনের পূর্ব্বে মূলচাঁদের মৃত্যু হয়, তবে তার উত্তরাধিকারী ৫০০০ টাকা পাইবে এবং যদি মূলচাঁদের মৃত্যু তাহার ৪৭শ জন্মদিনের পূর্ব্বে ঘটে, তাহা হইলে কোম্পানী আরও ৫০০০ টাকা দিবে। পলিসি লইবার একবৎসরের মধ্যেই যদি মূলচাঁদ আত্মহত্যা করে তবে পলিসি বাতিল হইয়া যাইবে এবং তাহার প্রদত্ত সমস্ত প্রিমিয়াম বাজেয়াপ্ত হইবে।

১৯৩৩ সালের ২২শে নভেম্বর মূলচাঁদ লাহোরের কোন এক হোটেলে আত্মহত্যা করে। তাহার পুত্র কানাইয়ালাল পলিসির 'এসাইনী' থাকায়, সে কোম্পানীর নিকট পলিসির টাকার দাবী জানায়। কোম্পানী টাকা না দেওয়ায় কানাইয়ালাল আদালতে মামলা দায়ের করে। বিবাদী কোম্পানী এই যুক্তি দেখায় যে, মূলচাঁদ ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে বিভিন্ন কোম্পানীতে জীবনবীমা করিয়া ২৫০০০ টাকার পলিসি লইয়াছিল। ঐ সকল পলিসির টাকা পাইবার জন্য সে ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং মতলব আঁটিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে সুতরাং বিবাদী কোম্পানীর সহিত মূলচাঁদের উক্ত বীমার পলিসি সম্পর্কিত চুক্তি বাতিল হইবার যোগ্য। কিন্তু বিচারক সিদ্ধান্ত করেন যে,—

মূলচাঁদ যে সকল বীমার পলিসি গ্রহণ করিয়াছিল, সে সমুদয়ের প্রিমিয়াম চালাইবার মত যথেষ্ট অর্থ সঙ্গতি তাহার ছিল। তাহার স্ত্রী অবৈধ প্রণয়াসক্ত হওয়াতেই সে আন্তরিক আঘাত পাইয়া আত্মহত্যা করে। পলিসি

লইবার এক বৎসর পরে মূলচাঁদ আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং তাহার পলিসি বাতিল হইতে পারে না এবং ওয়ারিসান হিসাবে কানাইয়া লাল ন্যায়তঃ দাবীর টাকা পাইবার অধিকারী। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর নিম্ন আদালতে মামলা ডিক্রি হয় এবং কানাইয়া লালকে মৃত মূলচাঁদের পলিসির দাবী বাবত ৪৯০৫ টাকা দিবার জন্য কোম্পানীর উপর আদেশ জারী হয়।

বিবাদী কোম্পানী এই আদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করে। বিচারপতি মিঃ আবদুল রসিদের এজলাসে আপীলের শুনানী হয়। আপীলকারীর পক্ষে সুবিজ্ঞ কাউন্সেলের প্রধান যুক্তি এই দেখান হয় যে, মূলচাঁদের উত্তরাধিকারিগণকে তাহাদের পিতার দণ্ডনীয় অপরাধের সুফল ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে না। এই সম্পর্কে বেরেগ্ বোর্ড বনাম রয়্যাল ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর মামলার নজীর উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিচার পতি মন্তব্য করেন, ইংল্যাণ্ডের সেই মামলার নজীর বর্ত্তমান মামলায় প্রযোজ্য নহে। কারণ ইংল্যাণ্ডের সাধারণ আইন অনুসারে আত্মহত্যা একটী গুরুতর অপরাধ। কিন্তু ভারতে আত্মহত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ নহে। পুনশ্চ ইংল্যাণ্ডের সেই মামলাতে দেখা যায়, বীমাকারী তাহার উত্তরাধিকারীকে পলিসির দাবী আদায়ের সুবিধা দিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়াছে। যদি সে আত্মহত্যা না করিত, তবে দুই তিন মিনিটের মধ্যে তাহার বীমার পলিসি সমূহ স্বতঃই বাতিল হইয়া যাইত। কারণ বীমার প্রিমিয়াম দিবার মত আর্থিক সঙ্গতি তাহার ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান মামলায় বীমাকারীর অবস্থা সেরূপ নহে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া বিচারপতি খরচাসহ আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

সত্য গোপন করায় দাবী অগ্রাহ্য

১৯৩৪ সালের ১২ই জুন কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি ম্যানুফ্যাকচারার্স লাইফ্ ইন্সুর্যান্স কোম্পানীতে জীবন বীমা করিয়া একখানি পলিসি গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই ৩রা আগষ্ট কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার বিধবা পত্নী হরিদাসী উক্ত কোম্পানীর নিকট তাঁহার মৃত স্বামীর পলিসির দরুণ ১৮ হাজার টাকা দাবী করেন। কোম্পানী টাকা না দেওয়াতে হরিদাসী দেবীর পক্ষ হইতে কলিকাতা হাই কোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগে বিচারপতি লর্ট উইলিয়াম্‌সের এজলাসে মামলা দায়ের হয়। কোম্পানীর পক্ষ হইতে এই আপত্তি উঠে যে, বীমার প্রস্তাব উত্থাপনের সময় কোম্পানীর নিযুক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে বীমাকারী সত্য কথা গোপন করিয়াছে। কিন্তু বিচারপতি তাহা অবিশ্বাস করিয়া মামলা ডিক্রি দিয়াছেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে বিচারপতি কষ্টেলো এবং বিচার পতি প্যাংক্রিজের এজলাসে কোম্পানীর তরফ হইতে আপীল দায়ের করা হয়। বিচার পতিদ্বয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি আলোচনা করিয়া এবং কাগজপত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন, বীমাকারী তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইবার সময় স্বাস্থ্যপরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে সত্যগোপন করিয়াছিল।

একমাস পূর্ব্বে বীমাকারীর গৃহে তাহার অশীতি বর্ষীয়া খুড়িমার যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। বীমাকারী তাহা জানিত;—কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে সে তাহা অস্বীকার করে। প্রশ্নগুলি সে যে বুঝিতে পারে নাই, এমনও নহে। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হইয়াছে জানিলে কোম্পানী নিশ্চয়ই সেই বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করিত না। গ্রহণ করিলেও, বীমাকারীকে অধিক প্রিমিয়াম দিতে হইত। সুতরাং এস্থলে বীমাকারীর পলিসির দাবী জন্মিতে পারে না। কোম্পানী টাকা দিবার দায় হইতে মুক্ত হইল।

মুষ্টিযোগ

নখেরকুনি

১। তুঁতিয়া জলে ঘষণ করিয়া নখকুনির বেদনায় দিলে অনতিবিলম্বে বেদনা ভাল হয়।

পেটফাঁপা

২। ৫।৭টা গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া মিছরির পানার সহিত সেবন করিলে তখনই পেট ফাঁপা ভাল হয়।

দুগ্ধ তোলা রোগ

৩। হরীতকী, বচ এবং কুড় এই তিনটী দ্রব্য সমভাবে গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে বালকের দুধ্‌ তোলা রোগ ভাল হয়।

দাঁতের পোকা

৪। বড় পানার শিকড় ২।৩ দিন চিবাইলে দুধে দাঁতে পোকা ভাল হয়।

ক্রমি

৫। খর্জ্জুর পত্রের রস লবণের সহিত সেবনে ক্রমি নষ্ট হয়।

শূলরোগ

৬। আপাং গাছের মূল সৈন্ধব লবণের সহিত ভক্ষণে অজীর্ণ ও শূলরোগ নষ্ট হয়।

বিছার কামড়

৭। উষ্ণ গব্য ঘৃত সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া বৃশ্চিক দংশন ক্ষতের উপর দিলে বৃশ্চিক দংশন জনিত ক্লেশ দূরীভূত হয়।

কুকুরের বিষ

৮। শিরীষ বীজ সীজের আঠায় বাটিয়া দিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শিরঃপীড়া

৯। গমের আটা জল দিয়া কাই করিয়া রগে দিলে মাথা ব্যথা ভাল হয়।

শিরঃশূল

১০। কাশীর চিনি ১ তোলা জল—১ তোলা। ১ তোলা জলে ১ তোলা চিনি গুলিয়া নস্য গ্রহণ করিবে। সম্পূর্ণটা নস্যরূপে লইলে মথা ধরা কমিয়া যাইবে।

উকুন

১১। মাথার চুলে উকুন হইলে চাঁপা পাতার রস চুলে মাখাইয়া শুখাইয়া, পরে ধুইয়া ফেলিলে উকুন মরিয়া যাইবে।

রাত্‌কানা

১২। গব্য ঘৃত গলাইয়া সন্ধ্যার পর রাতকাণা ব্যক্তির ব্রহ্মতালুকায়, চক্ষের পাতার উপর এবং হাতের ও পায়ের তালুদ্বয়ে মালিস করিবে। ইহাতে রাত্র্যান্ধ দোষ নিবারিত হইয়া দেখিতে পাইবে।

কাটা ক্ষতে

১৩। অস্ত্রাঘাতে হাত পা কাটিয়া গেলে গন্ধক গুঁড়াইয়া কাপড়ে উত্তম রূপে ছাঁকিয়া ক্ষতের উপরে দিবে।

ফাল্গুন মাসের কৃষি

এই সময় চৈতে শশা, ঝিঙ্গা, ফুটী, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড়, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, করলা, চালকুমড়া প্রভৃতি সব্জীর বীজ বপন করা চলে। এই সমস্ত বীজ বপন কার্য্য যত শীঘ্র শেষ করা যায় ততই ভাল, নতুবা ফলন খুব নাবি হইয়া যাইবে। ঢেঁড়স, চাঁপানটে প্রভৃতি শাক সব্জীর বীজ বপন এবং কুলী বেগুনের চারা এখন লাগাইতে পারা যায়। এই সময়ে নূতন পটল উঠিতে আরম্ভ হয়। আলু এবং সমস্ত বিদেশী সব্জীর উত্তোলন এই সময়ের কার্য্য। এরারুট, ক্যাশোয়া, গম, তিসি, মসিনা, যব, যই, তিল, মুগ, অড়হর, সরিষা, হলুদ, পিপুল, তামাক, আক প্রভৃতির ফসল এসময় সংগ্রহের উপযোগী হইয়া থাকে। আশুধান্য ও পাটের জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা দরকার। কোন কোন স্থানে পাট এবং আশু ধান্যের বীজ এসময়ও বপন করা হইয়া থাকে। পানের ডগা এই সময় কাটিয়া লাগাইতে পারা যায়।

আম, জাম, লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ এই সময় মুকুলিত হইতে আরম্ভ হয়। যে সমস্ত গাছ এই সময়ে মুকুলিত হয় তাহাদের গোড়ায় পূর্ব্ব হইতে সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। ফলের গুটী দেখা দিলে গাছে জল সেচনের আবশ্যক। বাঁশ গাছের গোড়ায় এসময় সার প্রয়োগ করিতে হয়। অনেক স্থানে এসময় বাঁশ গাছের গোড়ায় শুষ্ক পত্র রাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে।

গোলাপ ও শীতের মরশুমী ফুল ফোটা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গ্রীষ্মের মরশুমী ফুলের জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি যে সমস্ত ফুল গ্রীষ্ম কালে প্রস্ফুটিত হয় এই সময় হইতে তাহাদের গোড়ায় জল ও ভাল সার দেওয়া এবং পরিষ্কার করা দরকার।

সমালোচনা

প্রিণ্টার্স গাইড্

ওরিয়েণ্ট্যাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জি, বি, দে প্রণীত; প্রাপ্তি স্থান ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রী, ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ২॥৵০

আমরা বহুকাল পরে একখানি অতি মূল্যবান এবং তথ্যবহুল টেক্‌নিক্যাল বই সমালোচনার জন্য উপহার পাইয়াছি। বাংলা দেশে প্রিণ্টিং প্রেসের ব্যবসা একটী ক্রম বর্দ্ধমান ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। হাজার হাজার লোক আজ এই ব্যবসাযে কম্পোজিটর প্রেসম্যান, প্রিণ্টার, জমাদার ও কালীওয়ালা রূপে লিপ্ত হইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে এবং বহুলোক সমষ্টিগত ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা এই ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়াছেন। এমন দিন ছিল, যখন যা তা ছাপা হইলেই বা কোন রকমে হরপের ছাপা উঠিলেই লোকে যথেষ্ট মনে করিত; ছাপা যে একটা আর্ট তাহা কাহারও ধারণাই ছিল না। মুদ্রাঙ্কন এবং চিত্র বিদ্যা এই দুইটিই ললিত কলা বা Fine Arts এর এক বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশে চিত্র বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নমুনা ছিল কালিঘাটের পট, এবং মুদ্রাযন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল বটতলার ছাপা। ১৯০০ সালের পূর্ব্বে কলিঘাটের পট এবং বটতলার ছাপা বই ব্যতীত দেশীয় চিত্রকলা অথবা মুদ্রাঙ্কনের বিশেষ কোনো উন্নতি আমরা দেখি নাই। কলিকাতার ধনীদিগের ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে যে সকল বড় বড় চিত্র ঝোলান থাকিত তাহার প্রায় সবই সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিক চিত্রকর দিগের অঙ্কিত "ম্যাডোনা"র ছবি, ওয়াটারলুর যুদ্ধ, রাজা রাণীর ছবি ও নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি।

দেশীয় ললিত কলা বলিতে লোকে কালিঘাটের পট ও বটতলার ছাপা ব্যতীত আর কিছুই জানিত না। আমাদের যতদূর মনে হয় পরলোকগত হেমেন্দ্র মোহন বসু মহাশয়—ব্যবসায়ী মহলে যিনি এইচ, বসু' পারফিউমার বলিয়া পরিচিত—সর্ব্বপ্রথম কুন্তলীন প্রেস স্থাপন করিয়া ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে এদেশে artistic printing সুরু করেন। বর্ত্তমান Art Pressএর তখনো জন্ম হয় নাই। কুন্তলীন প্রেসের Lay out, Display, Design এবং Fine Printing দেখিয়া লোকের তাক্ লাগিয়া

গেল। Printing Lineএ কুন্তলীন প্রেসের অভ্যুদয় যে একটা যুগান্তর আনিয়া দিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের ছাপাখানার ইতিহাসে ইহাকে একটি Land-mark বলা যাইতে পারে। সেই হইতে এদেশে ছাপাখানার যে কত উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং আদর্শ ও আকাঙ্খাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এখন যা তা যে কোন রকমে ছাপাইয়া দিলে খদ্দের তাহা waste paper basket এ ফেলিয়া দেয় এবং আর সেখান হইতে কোনরূপ কাজ পাইবার আশা থাকে না। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানার কাজের বিস্তর চাহিদার সৃষ্টি হইয়াছে। এবার ৫০ হাজার ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছে। ২৫।৩০ বৎসর আগে কেহ কি ইহা কল্পনা করিতে পারিত? শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সিনেমা সংক্রান্ত নানারূপ সচিত্র কাগজ, সচিত্র মাসিক পত্র ফটোগ্রাফি, নানারূপ বিজ্ঞাপন ও চিত্র বিচিত্র News printএর সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। সেইজন্য Artistic Printing এরও যথেষ্ট কদর ও আকৃতি বাড়িযাছে। বর্ত্তমান যুগে সেইজন্য প্রেস চালাইতে অনেক মাথা ঘামাইতে হয়। প্রতিযোগীতার জন্য কাজের অনেক খুটিনাটি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। পয়সাওলা ভাল খদ্দেরদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে হইলে dis-play, lay out, border, type selection প্রভৃতি ছাপার নানারূপ technique সম্বন্ধে প্রেসের মালিক দিগের বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই; তবেই ভাল ভাল খদ্দের পাওয়া যায় এবং বাঁধিয়া রাখা যায়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, প্রেসের কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আরো বাড়িবে এই আশায় অনেকেই বহু টাকা ব্যয়ে প্রেস স্থাপন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের রুচি এবং idea অনুযায়ী কাজ দিতে না পারায় বহু লোকের অল্পদিনের মধ্যে কারবার গুটাইতে হয়। ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে, Knowledge is power অর্থাৎ যে কাজেই নিযুক্ত হওনা কেন, সেই কাজ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকিলে সাফল্য সুনিশ্চিত। আমাদের দেশে লোকে প্রেস করিতেছে অথচ বারআনা লোকের প্রেসের technique সম্বন্ধে কোন রূপ জ্ঞান নাই। ইংরাজিতে Printing সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ বহু গ্রন্থ আছে; কিন্তু কেইবা তাহার সন্ধান রাখে আর,—কেইবা তাহা কষ্ট করিয়া পড়ে। আর এই সকল Technical বই পড়িয়া বুঝিবার মত শিক্ষাইবা কয়জনের আছে?

এমন সময়ে মিঃ দে বাংলা ভাষায় প্রিন্টিং সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এরূপ একখানি সচিত্র ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক প্রকাশ করিয়া ছাপাখানা সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পুস্তকখানি মোট ৩২ অধ্যায়ে বিভক্ত। ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, সরল এবং সহজবোধ্য ভাষায় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের সাহায্যে ছাপাখানা সংশ্লিষ্ট সকল লোকেই কাজ করিতে করিতে প্রিন্টীংয়ের সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। পুস্তক-খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, প্রিন্টিং সম্বন্ধে এমন কোনো বিষয় নাই যাহা এই পুস্তকে বিশেষরূপে আলোচিত হয় নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি মিঃ দের আপ্রাণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। ছাপাখানার মালিকগণ পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে এই যৎসামান্য অর্থব্যয়ে তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন তাহা অমূল্য।

যৌন বিজ্ঞান

গ্রন্থকার—শ্রীযুত আবুল হাসানাৎ সাহেব, আই. পি.
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

প্রাপ্তিস্থান—পোঃ আঃ—সোনাপুর, জিলা—নোয়াখালী।

বাংলা ভাষায় যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু চিত্র সম্বলিত এরূপ বিরাট আকারের পুস্তক আর কোথায়ও দেখি নাই। ইহাকে যৌন বিজ্ঞানের Encyclopedia বলা যাইতে পারে। কাম-শাস্ত্র, পরাশর সংহিতা এবং প্রাচীন নানা গ্রন্থ হইতে সুরু করিয়া আধুনিক যুগে ইয়োরামেরিকায় যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত আধুনিক এবং অতিআধুনিক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার সমুদয় সার সংকলন এই পুস্তকেত আছেই তাহা ছাড়া গ্রন্থকার এ বিষয়ে নানা লোকের মত এবং অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়া প্রকাশ করায় সকল দিক দিয়া গ্রন্থখানিকে অমূল্য করিয়া তুলিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা তারিফ করিবার বিষয় এই যে গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হইয়াছে এবং যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে Sex appeal যাহাকে বলে তাহার কিছুই নাই—এইখানেই গ্রন্থকারের বাহাদুরী।

যৌন আলোচনা আমাদের দেশে অতি অশ্লীল ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যৌন বিজ্ঞান এক, আর যৌন সম্বন্ধীয় রসের কথার আলোচনা এবং পরিবেশন এক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। আমাদের দেশে বিদ্যাসুন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল আদি রসের গ্রন্থ জন সমাজের মধ্যে পূতিগন্ধ বিস্তার করিয়াছে এবং তাহার ফলে যুবক যুবতীদিগের মনের মধ্যে যে রিপুর উত্তেজনা এবং অসঙ্গত আসঙ্গ লিপ্সার প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা গিয়াছে, তাহাতে যৌন কথার আলোচনা অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া এদেশে উহার চর্চ্চা ভদ্র সমাজে এবং ভদ্র পরিবারে যে একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

"নৃপনন্দন কাম রসে বসিয়া
পবিধান ধুতি পড়িছে খসিয়া"

ইত্যাদি বর্ণনাকে যৌন বিজ্ঞান বলে না, ইহা মানব মনে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির এক প্রবল প্রচেষ্টা মাত্র। সুতরাং এই সকল পুস্তক এবং আলোচনার গণ্ডী হইতে গৃহ পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য এদেশে—যৌন কথার আলোচনাই বর্জ্জিত হইয়াছিল।

কিন্তু জগৎ আজ নানা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় মুখর; বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করিবার কাহারও আর সাধ্য নাই। বাংলা ভাষায় যৌন কথার আলোচনা এত কাল নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় এই যৌন বিজ্ঞান এবং Eugenics সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য পরিপূর্ণ এত রাশি রাশি বই বাহির হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে পৃথিবীময় এত গবেষণা এবং অনুসন্ধান চলিতেছে যে তাহার ঢেউ আমাদের "নেতি" "নেতির" গণ্ডীকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। চোখ বন্ধ করিয়া সূর্য্যের আলোকের গতি এবং প্রভাব যেমন বন্ধ করা যায় না, তেমনি "না"-"না" করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতি এবং অগ্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। তাই আমাদের দেশেও আজ যৌন বিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হইয়াছে; Limitation of family, Birth Control Companionate marriage ইত্যাদি কথা আজ আর আমাদের দেশে নূতন ঠেকে না—পরন্তু সমগ্র দেশ আজ এই সকল আলোচনায় মুখর। কিন্তু ইহাদের মূলে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য রহিয়াছে তাহার আলোচনাই সঙ্গত এবং সার্থক। যে গ্রন্থকার এই সত্যগুলি sex appeal শূন্য সরল ভাষায় জন সমাজের নিকট উপস্থিত করিতে পারেন তাঁহার লেখনী সার্থক এবং উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি গ্রন্থকারের সকল অর্থব্যয়, পরিশ্রম এবং নানারূপ সংগ্রহ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। প্রত্যেক পরিণত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষকে নিঃসঙ্কোচে এই পুস্তক পাঠ করিতে আমরা অনুমোদন করিতে পারি।

গাভী পালন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(শ্রীগুরুগোবিন্দ পাত্রাদার)

৬। গরুর শরীরের ওজনের সঙ্গে তাহার আবশ্যকীয় খাদ্যের ওজনের একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত বা সম্বন্ধ আছে। কাঁধের চমর হইতে পশ্চাৎদিকের লেজ ও পশ্চাৎভাগের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত যত ইঞ্চি হয় তাহা দৈর্ঘ্য এবং ঐ চমর ও সম্মুখের পা দুইখানার পিছন বরাবর বক্ষঃস্থলের মাপ করায় যত ইঞ্চ হইবে তাহা প্রান্ত ধরিয়া ঐ দৈর্ঘ্যের বর্গকে প্রস্থের বর্গ দ্বারা গুণ করতঃ তাহাকে ৩০০ দ্বারা ভাগ করিলে গরুর শরীরের ওজন পাউণ্ড হিসাবে (১ পাউণ্ড = প্রায় অর্দ্ধ সের) ঐ ভাগ ফলের সমান হইবে ; যথা,

$$\text{ওজন} = \frac{(\text{দৈর্ঘ্য})২ \times (\text{প্রস্থ})২}{৩০০} = \text{পাউণ্ড।}$$

শরীরের এই ওজনের সঙ্গে খাদ্যের ওজনের যে সম্বন্ধ আছে তাহার অল্প কি অধিক খাদ্য স্বাস্থের হানিকর। শরীরের ঐ ওজনের ১/২৬ ভাগ ওজনের মোট খাদ্যের মধ্যে শুষ্ক খাদ্যের ওজন সিকি ভাগের কিছু কম থাকিবে। গাভীর খাদ্যে খইল ও গুড় মিশাইয়া খাদ্যের চতুর্গুণ জল মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে দুগ্ধের মিষ্ট স্বাদ ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শরিষার খৈল খাইলে গাভী ও মহিষের দুগ্ধের মাখন সুস্বাদু এবং তিষির খইল, কার্পাস বীজ ও কলাইতে মাখন বৃদ্ধি পায়।

Rosa Bonheur নাম্নী একটি হলষ্টিন জাতীয় গাভীর, (Hoslstein cow) শরীরের ওজন ২১ মন ৩০ সের ছিল ; সে দৈনিক ২ মন ৭ সের খাদ্য আহার করিত ; ঐ খাদ্যের মধ্যে ১ মন ১৭ সের জাগ্‌ দেওয়া ঘাস (silage), ৬ সের ভুট্টা, ৪ সের জই চূর্ণ ১ সের কুঁড়া, ৪ সের খইল, ১৩ সের কন্দমূল (roots) থাকিত। ঐ গাভীটি একবার পশু প্রদর্শনীর সময় একদিনে ১মন ১৩ সের দুগ্ধ দেয়।

৭। দুগ্ধ নিঃসারক অন্যান্য উপায় :— (ক) রেড়ীর তৈল কি তদভাবে শরিষার তৈল প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে ওলানে মাখাইবে। তাহা হইলে তাহাতে মশা ও হিম লাগিবে না। পল্লীগ্রামের লোকে গাভীর বাঁটে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া, রাত্রিতে সর্প দুগ্ধ খায় এরূপ সন্দেহ করে এবং তাহা নিবারণের জন্য রসুন তৈল (রসুনের রস মিশ্রিত তৈল) ওলানে ও বাঁটে মাখিয়া দেয় ; রসুনের গন্ধে সর্প আইসে না। কার্ব্বলিক এসিডের গন্ধেও সর্প পলায়ন করে। (খ) দোহন সময়ে গাভীকে লবণ, গুড়, খইল ইত্যাদি যাহা গাভী খাইতে ভালবাসে তাহা চাটিতে (জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে) দিবে। (গ) বাছুর দ্বারা না 'পানাইয়া', বাছুরের বিনা সাহায্যে কিন্তু বাছুরকে গাভীর সম্মুখে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি দুগ্ধ দোহন করিবে, কারণ বাছুর দ্বারা পানাইলে গাভী তাহার জন্য দুধ চুরি করে অর্থাৎ সমস্ত দুধ ছাড়ে

না। তৎজন্য পাত্র হইতে দুধ পান অভ্যাস করাইবে। বাছুরকে এক সপ্তাহ বয়সের পর হইতে হাতে দুধ খাওয়াইবে। মাখন টানা দুধ বাছুরকে খাইতে দিবে। তাড়াতাড়ি দোহন করায় মাখন ও দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একই ব্যক্তি দোহন পটু হইলেই ভাল হয়, কারণ দোহন পটু কোন ব্যক্তি সকল গাভীকেই দোহন করিয়া অধিক দুগ্ধ বাহির করিতে পারে। প্রত্যহ নিয়মিত সময় গাভী দোহন করিবে; দোহনকারী বিশেষতঃ নূতন দোহনকারী দোহন কার্য্যে অপটু হইলে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া নিয়মিত সময় একই ব্যক্তি নিঃশেষ করিয়া দুগ্ধ দোহন করিবে; তাহাতে গাভীর অধিক দুগ্ধ দেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। দোহন সময় কেহ গাভীর গায়ে হাত বুলাইয়া মশা মাছি তাড়াইবে। প্রসবের পরে ১০।১১ মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ পুনর্ব্বার 'ডাক আইসার' এক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুগ্ধ দোহন করায় গাভীর দীর্ঘ সময় দুগ্ধ প্রদানের শক্তি জন্মে। প্রথমে পিছনের দুই বাটের ও পরে সম্মুখের দুই বাটের দুধ দোহন করিয়া তৎপর ওলানের দুই পার্শ্বের দুই বাটের দুধ ক্রমশঃ দোহন করতঃ দোহন কার্য্য শেষ করিবে। তাড়াতাড়ি দোহনে দুগ্ধ নিঃসারক মাংস গ্রন্থি বড় হয় ও দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দুইজন জার্ম্মাণ ফিজিওলজিষ্ট (প্রাণী-বিজ্ঞানবিদ) বলেন দুগ্ধ দোহন সময়ে কন্সার্ট (concert একতান বাদ্য) কি ব্যাণ্ডের বাজনা গাভীর অনতিদূরে হইলে দুগ্ধ নিঃস্রাব অধিক হয়।

৮। দোহন কার্য্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা চাই-ই; ইহা অপরিহার্য্য জ্ঞান করিবে। ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা গাভীর ওলান ধৌত করিয়া ময়লা ও তৎসংলগ্ন লোমাদি পরিস্কার করিবে। দোহনকারী নিজেও জল সাবান, কি সোডা দিয়া হস্ত পরিস্কার করিবে। যে পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হয় তাহা পরিস্কার জলে ধৌত করিয়া তাহার ভিতরে গন্ধকের ধুম (বাষ্প) দিবে এবং দোহন কার্য্য শেষ হইলে তাহা জলে ধুইয়া পরিস্কার করতঃ উনানের অগ্নির উত্তাপে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে দুগ্ধ সহসা নষ্ট হয় না।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসত লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ ফাল্গুন---১৩৪৫ ১১শ সংখ্যা

কৃত্রিম মণিরত্ন প্রস্তুত প্রণালী

(শ্রী সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি)

হীরা জহরৎ মণিমুক্তার ব্যবসা খুব লাভজনক। বাস্তবিক ইহাদের কোন প্রকৃত মূল্য (Intrinsic value) নাই। মানুষের মনোবৃত্তির উপরই এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত। সকলেই ঈশপের সেই গল্পটী জানেন। একটী মুরগী আবর্জ্জনাস্তূপে শস্যকণা খুঁটীয়া খাইবার সময় দৈবাৎ একটী মণি দেখিতে পায়। সে উহা পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী শস্যকণা যত্নের সহিত ঠোকরাইয়া লইল। তখন মণি দুঃখ করিয়া তাহাকে বলিল "তুমি আমার মূল্য বুঝিতে পারিলে না,—তাই আমাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলে"। মুরগী হাসিয়া বলিল "তোমার কি মূল্য আছে? একটী শস্যকণা খাইয়া আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে,—কিন্তু তুমি আমার কোন্ প্রয়োজন সাধন করিতে পার? আমার কাছে তোমার কোন মূল্য নাই।"

বাস্তবিক প্রয়োজন হিসাবে বিচার করিলে হীরা জহরতকে ধূলি মাটী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট মনে হয়। উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য মাটীর আবশ্যক;—ধূলিকণা বৃষ্টি পাতের সাহায্য করে। কিন্তু মণিমুক্তা মানবের প্রাণ ধারণার্থে কোন কাজেই আসে না। কেবল মাত্র ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিগণ নিজেদের একটা অকারণ প্রসূত আকাঙ্খা মিটাইবার জন্য মণি মুক্তা ব্যবহার করেন। এরূপ আবশ্যক দ্রব্যের এত অধিক মূল্য হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সব মণিমুক্তা হীরা জহরতকে একেবারে অনাবশ্যক বলিতেও ভয় হয়। যদি

ইহারা অনাবশ্যকই হইত, তবে সেই পৌরাণিক যুগের কৌস্তভ মণি হইতে বর্ত্তমান যুগের কোহি-নুর হীরক পর্য্যন্ত ঐরূপ বহুসংখ্যক প্রস্তর কণিকার সহিত বহু মানবের সুখ সৌভাগ্য জড়িত রহিয়াছে কেন,—এই প্রশ্ন উঠে। বিভিন্ন প্রকার রত্ন ধারণে গ্রহদোষ শান্তি এবং রোগ নাশ হইবার কথা শুধু ভারতবর্ষে নয়,—ইউরোপ আমেরিকাতেও শুনা যায় এবং তাহার উপরে বড় রকমের ব্যবসাও চলিয়া থাকে। ইহাকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না। সম্প্রতি পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদের মধ্যে "য়্যালার্জ্জি" (Allergy) বলিয়া একটা কথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে আমাদের দেশী ভাষায় "ছুঁত্ লাগা" বা ছোঁয়াচ রোগ বলা যাইতে পারে। কোন বিশেষ দ্রব্যের স্পর্শমাত্রই মানব দেহে কোন রোগের সৃষ্টি অথবা কোন রোগের বিনাশ হইতে পারে,—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। তবে এইসব ভাবিলে হীরা মুক্তা মণি রত্নাদির ক্ষমতায় এবং প্রয়োজনীয়তায় সন্দেহ অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে।

মণিরত্ন মানুষের সৌন্দর্য্য স্পৃহার তৃপ্তি সাধক! ইহার বিবিধ বর্ণ, বিশেষ স্ফটিকাকার (crystal form) এবং আলোক বিচ্ছুরণ শক্তি এই তিনটাই মানুষের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু ইহাকে লাভ করিবার জন্য মানুষের যেরূপ আগ্রহ, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে ইহা স্বভাবতঃ পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ের ভাষায় বলিতে গেলে,—ইহার চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অনেক পরিমাণে কম। সেই কারণেই মণিরত্নাদির মূল্য এত অধিক। তদুপরি মানুষের সুখ সৌভাগ্যের সহিত ইহার একটা রহস্যময় সম্বন্ধ আছে, এই ধারণার জন্যেও মূল্য বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে হীরক, মণি রত্নাদির মত মূল্যবান পদার্থ আর নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার কোন জহরৎ ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কারবার অনেক বৎসরের পুরাতন এবং বিখ্যাত। একখানি ১৩০ ক্যারেট জঙ্কার হীরক (Jonker diamond) বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতে আসেন। উক্ত হীরক খণ্ডের মূল্য প্রায় ২২৫ হাজার পাউণ্ড,—অর্থাৎ প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা। দেখা যায়, এই রকমের হীরার মূল্য উহার সমান ওজনের সোণার মূল্য অপেক্ষা ৪০ হাজার গুণ অধিক। কেবলমাত্র রেডিয়ামের সহিত ইহার মূল্যের তুলনা হইতে পারে।—সমস্ত পৃথিবীতে বর্ত্তমান সময়ে ১০০ ক্যারেটের অধিক ওজনের ২৫ খানি হীরক আছে। ৩০ ক্যারেটের অধিক ওজনের হীরকের সংখ্যা তিনশতের বেশী নহে। (১৫০ ক্যারেট = এক আউন্স)

সমগ্র পৃথিবীর মোট হীরক উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ৪০ লক্ষ ক্যারেট,—প্রায় ¾ টন অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ওজনে ২০ মণের উপর। ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হীরক নানাবিধ শিল্প-কার্য্যে লাগে,—কাচ কাটিবার জন্য, কঠিন পদার্থ ছিদ্র ও পালিশ করিতে চূর্ণ; ছুরি, সূঁচ, বাটালি, ড্রিল প্রভৃতি নানা আকারে হীরক ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট দশমণ হীরক ধনী ও বিলাসীদের সৌন্দর্য্যস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য বিবিধ অলঙ্কারে বসান হইয়া থাকে। সাধারণ হীরকের বাজার দর প্রতি ক্যারেট

৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি আউন্সে ৯০ হাজার টাকা। (১ পাউণ্ড = ১৫৲ ।

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে অলঙ্কাররূপে যত হীরক ব্যবহৃত আছে, তাহার মিলিত ওজন মোট ১৫ টন ;—আমাদের দেশীয় ওজনে ৪০৫ মণ (এক টন = ২৭ মণ) এবং উহার আয়তন ১৩৫ ঘনফুট্। অর্থাৎ ৯ ফুট লম্বা ৫ ফুট চওড়া, ৩ ফুট উচু একটী বাক্স সম্পুর্ণরূপে ভর্ত্তি করিয়া উহাতে ঐ ১৫টন হীরক রাখা যাইতে পারে। বাস্তবিক হীরকের চাহিদা খুব বেশী। প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ কোটী টাকা মূল্যের হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। ভারতীয় ধনী লোকেরা হীরকের বাবতে প্রতি বৎসর দেড় কোটী টাকা খরচ করেন এবং এত টাকা খরচ করিয়াও তাঁহাদের তৃপ্তি নাই! যদি কেহ কৃত্রিম হীরক তৈয়ারীর কারবার করেন, তবে তাঁহাকে অন্ততঃ এক হন্দর (এক মণ ১৪ সের) ওজনের হীরক তৈয়ারী করিতে হইবে। তবেই তিনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী হইতে পাবেন।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লিখিবার পেন্সিল তৈয়ারীতে যে গ্র্যাফাইট্ (graphite) ব্যবহার হয়, কিম্বা বাজারে যে ভূষো কালি (Lamp black) বিক্রয় হয়, তাহা এবং হীরক একই পদার্থে গঠিত। উহার রসায়ন-বিজ্ঞান সম্মত নাম অঙ্গার (Carbon)। অঙ্গারের স্বাভাবিক আকৃতি গ্র্যাফাইট্। প্রচণ্ড উত্তাপ এবং চাপের দ্বারা অঙ্গার হীরকে পরিণত হয়। হীরক স্ফটিকাকার (Crystalline in form। ইহাকে সহজেই গ্র্যাফাইটে পরিবর্ত্তিত করা যায়। কিন্তু গ্র্যাফাইটকে হীরকে পরিণত করা অতি কঠিন কার্য্য। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হেনরী ময়সান নামক একজন ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে এই কঠিন কার্য্য সম্পাদন করেন। সকলেই জানেন, কারবন্ (Carbon), হাইড্রোজেন (hydrogen) ও অক্সিজেন (oxygen) এই তিনটী মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে চিনি উৎপন্ন হয়। হেনরী ময়সান কিছু চিনি গলিত লৌহের মধ্যে দ্রবীভূত করেন। এই গলিত লৌহের উত্তাপ ৭০০০ ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ পর্য্যন্ত উঠান হয়। ইহাকে অতঃপর তিনি গলিত সীসার মধ্যে ঢালেন। এই গলিত সীসার উত্তাপ ৬২৬ ডিগ্রী ফারেন্‌হাইট্ পর্য্যন্ত থাকে। এক্ষণে ঐ গলিত লৌহ ৭০০০ ডিগ্রী হইতে ৬২৬ ডিগ্রীতে নামিবার সময় হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা হয়; তাহাতে উহার বাহিরের আবরণ সঙ্কুচিত ও কঠিন হইয়া যায়। সেই সময়ে সঙ্কোচনের ফলে ভিতরের শাঁসটীর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫ টন, অর্থাৎ ৪০৫ মণ। হেনরী ময়সান্ অবশেষে এই গলিত সীসা সহিত সমস্ত জিনিসটীকে শীতল জলে ডুবান। তার পর উহার বহিরাবরণ ভাঙ্গিয়া ভিতর হইতে হীরক খণ্ড বাহির করিয়া লন। কিন্তু ঐ হীরক খণ্ডগুলি এত ক্ষুদ্র যে তাহাতে কোন কাজ হয় না।

বৃহদাকারের হীরক তৈয়ারী করিতে হইলে কারবন্ (carbon) বা অঙ্গারকে আরও অধিক চাপে আনিতে হয়। বাস্তবিক ভূগর্ভে গলিত শিলা (molten rock) শীতল হইবার সময় যে প্রচণ্ড চাপের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ চাপ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করিতে না পারিলে স্বাভাবিক হীরকের মত উপযুক্ত আকারের হীরক তৈয়ারী করা যায় না। আজ পর্য্যন্ত উহা মানুষের অসাধ্য রহিয়াছে। তবে অন্যান্য মণি

রত্ন তৈয়ারী করা হীরকের মত এত কঠিন নহে। রুবি (Ruby), টোপ্যাজ (Topaz), স্যাফায়ার (Sapphire), য়্যামেথিষ্ট (Amethyst), এমারেল্ড্ (Emerald) প্রভৃতি এই শ্রেণীর মণিরত্নের অন্তর্গত। য়্যালুমিনিয়াম্ (Alumiuium), জিরকনিয়াম (Zirconium), প্রভৃতি মূল পদার্থের অক্সাইড্ (Oxide), বা সিলিকেট্ (Silicate) হইতে এই সকল মণি রত্ন তৈয়ারী হয়। আমরা আগামী প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

ইঁদারার জন্য টেঁকসই দড়ি প্রস্তুত প্রণালী

নদনদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ চারিদিকেই প্রায় জলময়, তাই এর কোথাও কঠিন রুক্ষতা বিরাজ করে না। কিন্তু ভারতে এমন প্রদেশ আছে যেখানে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে জলের লেশ মাত্রও দৃষ্ট হয় না, ভূগর্ভের মধ্য থেকে বারিপুঞ্জ টেনে তুলতে হয়। সে সমস্ত স্থানের পৃথিবীপৃষ্ঠ শুধু মাত্র কঠিন প্রস্তরময় তাই এসব যায়গায় ইঁদারা বা কুয়ার এত প্রাবল্য। বস্তুতঃ, এই কুয়া বা ইঁদারার অবর্ত্তমানে ঐ সমস্ত স্থান মনুষ্য বাসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। বাংলাদেশের অধিবাসীরা হয়ত ইঁদারার প্রয়োজনীয়তা ততটা অনুভব করতে পারবে না, কেননা, শ্যামলশ্রী বঙ্গদেশে কঠিন প্রস্তরভূমির আধিক্য নেই। তবুও ইঁহারা যে মানুষের কতখানি সম্বল তা' বোঝে মগধের অধিবাসী, বোঝে আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা, শুধু বোঝে না, তারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। অবশ্য বাংলাদেশের বর্ত্তমানে যা অবস্থা তাতে কুয়ার প্রয়োজন দিন দিন অনুভূত হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যাদের প্রয়োজন তারা এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী সমূহ যখন শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়ে থাকে তখনকার জলকষ্টের বিষয় বাংলার পল্লীবাসী মাত্রই অবগত আছে। এখনও দেখা যায় যে, এক মাইলব্যাপী যায়গার মধ্যে একটিও পুষ্করিণীতে অর্দ্ধহাত পরিমিত বারিও অবশিষ্ট নেই। তাই পুষ্করিণীর মধ্যখানে খানিকটা যায়গা কুপিয়ে জল অন্বেষণের ব্যর্থ চেষ্টা চলেছে। সেক্ষেত্রে পাড়ায় পাড়ায় যদি একটি গভীর ইঁদারার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে জলকষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হতে পারে।

শুধু জলকষ্ট নিবারণের জন্য নয়, চাষের ব্যাপারে জলসেচনের নিমিত্তও ইঁদারা বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশে বহু নদীনালা বর্ত্তমান থাকার দরুণ জলসেচনের জন্য এখানকার চাষীদের হয়ত ভাবতে হয় না কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত ও উত্তর পশ্চিম ভারতে এই ইঁদারার জল ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। সেখানকার মাটি একান্ত অনুর্ব্বর ও প্রস্তরময়, তদুপরি বাংলাদেশের মত সেখানে নদনদীর মোটেই প্রাবল্য নেই সুতরাং সেখানে ইঁদারার জলই অনেকাংশে একমাত্র সম্বল। বাংলাদেশেও পশ্চিমাঞ্চলে চাষের জলের নিতান্ত অভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়। চাষীরা দৈবের ওপর নির্ভর করে তখন 'হা-জল' বলে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে থাকে। এটা চাষের পক্ষে একটা দুর্লক্ষণ। মানুষ যখন প্রকৃতিকে জয় করতে শেখেনি তখন হয়ত জলের জন্য বরুণ দেবতার ওপর নির্ভর করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতো কিন্তু বিংশ শতা-

যাতে বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ প্রায় সমস্ত বাধা জয় করতে শিখেছে। সুতরাং অনাবৃষ্টিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকা সুবুদ্ধি কিংবা কৃতিত্বের লক্ষণ নয়। অনাবৃষ্টিতে জলাভাব যদি ঘটেই থাকে তা হলেও তা' থেকে বাঁচবার উপায় আছে। সে উপায় হচ্ছে ইঁদারা বা নলকূপ স্থাপন করে জল সেচনের ব্যবস্থা করা। তা' যদি করা যায় ত জলাভাবে ফসল শুকিয়ে যায় না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, বাংলাদেশের লোকেরা ইঁদারার উপযোগিতা তেমন উপলব্ধি করতে না পারলেও উত্তর ও পশ্চিম ভারতে কৃষিকার্য্য ব্যাপারে ইঁদারা না হলে চলে না। এই ইঁদারা থেকে জল তুলে কৃষিক্ষেত্রে সেচনের প্রণালী মোটেই জটিল নয়। একটি চামড়ার ব্যাগ (যাহার আকার প্রকাণ্ড টবের মতো) নেওয়া হয় এবং তাতে দড়ি বেঁধে দড়িটা ইঁদারার উপরকার কপিকলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঐ দড়ির অপর প্রান্ত জোড়া বলদের জোতের সঙ্গে লাগান থাকে। যখন জল তোলবার প্রয়োজন হয় তখন ঐ চামড়ার টবকে ইঁদারার ভেতর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তৎপরে জলভর্ত্তি করে বলদ সাহায্যে সেটা টেনে তোলা হয়ে থাকে। ঐ টবে প্রায় ৮।১০ মণ জল ধরে সুতরাং দুজন পাঁচজন মানুষের সাহায্যে তা' টেনে তোলা সম্ভব নয়। তাই বলদের সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে।

উপরে যে প্রণালীর উল্লেখ করা গেল তাতে দেখা যাবে যে, দড়ির প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। এক একটা ভাল ইঁদারা অতল গভীর বললেও চলে, কাজে কাজেই তা' থেকে জল তুলতে গেলে লম্বা ও মজবুত দড়ির আবশ্যক। তাছাড়া কূপ গভীর হওয়ার দরুণ এবং জলের ওজন বেশী হওয়ার জন্য দড়িতে যে চাড় লাগে তদ্দরুণ দড়ি মোটেই টেঁকে না। সেইজন্যই দড়ির খরচ যোগানো চাষীদের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাষীদের পক্ষে জমিতে জলসেচন করা অপরিহার্য্য, তজ্জন্য তাদের ইঁদারার দড়ি ব্যবহার করতেই হয় কিন্তু এই দড়ি যদি অনবরত ছেঁড়ে তবে চাষী বা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বড় মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই দড়ির জন্য তাদের একটা আলাদা খরচা বাড়ে। এ খরচা বহন করবার সামর্থ্য কারও বা থাকে, কারও বা থাকে না। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, জল সেচনের অভাবে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হয় এবং জলাভাবে গ্রামের লোকের কষ্টের অবধি থাকে না।

এরই জন্য গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ থেকে এমন দড়ি প্রস্তুত করবার চেষ্টা চলছিল যাতে সহজে তা' না ছেঁড়ে। নারকেল ছোবড়ার দড়ি বা শনের দড়ি অথবা ভাল সুতার দড়ি কোনটাই বেশী ভার সহ্য করতে পারে না। জলের বেশী ভারের চাড় যখন পড়ে তখন দড়ির সরু আঁশগুলো সেই চাড় বা টান বহন করতে না পেরে কেটে যায়। এরই জন্য কোন দড়ি বেশী দিন টেকে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দড়ি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এমন কোন পদার্থ যদি ব্যবহার করা যায় যাতে চাড় দড়ির আঁশের ওপর না পড়ে সেই পদার্থের ওপর পড়ে তাহলে দড়ি টেঁকসই হতে পারে। তদনুসারে হিসারের সরকারী ক্যাটল্ ফার্ম্মের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এল্, ডব্লু, স্মিথ্ এক পন্থা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত উপায় অনুযায়ী একটি ১ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট লোহার তারের ওপর শনের আঁশ জড়িয়ে ঐ দড়ি প্রস্তুত হয়ে থাকে। উক্ত লোহার তার আবার কতকগুলি

সরু গ্যালভানাইজড্ ইস্পাতের তার জড়িয়ে তৈরী হয়। তারের ওপর দড়ির মত করে শন জড়িয়ে দেওয়ার পর সমগ্র দড়িটির পরিধি হয় ৩ ইঞ্চি। পরে তার ওপর আলকাতরা বা অনুরূপ কোন পদার্থ মাখিয়ে দিলে সমগ্র দড়ির পরিধি হয়ে দাঁড়ায় ৩৷৷ ইঞ্চি।

উপরে যে দড়ির কথা উল্লিখিত হ'ল তাতে ভারের চাড় আর শণের আঁশের ওপর পড়ে না, চাড় পড়ে লোহার তারের ওপর। তাতে দড়ির কোন ক্ষতিই হয় না, অথচ দড়ি টেঁকে বহুদিন। পরন্তু লোহার তারের ওপর শণ জড়ানো থাকার দরুণ লোহার তারের অসুবিধাও এতে কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আসলে, দড়িটা দেখে কেউ সহজে ধরতেই পারবে না যে তার মধ্যে লোহার তার আছে। হিসারের সরকারী ক্যাটল্ ফার্মের হিসাব অনুসারে প্রতি ইঁদারা পিছু সাধারণ দড়ির খরচ পড়ে বাৎসরিক ১২০৲ টাকা। মহিষের চামড়ায় প্রস্তুত দড়িরও খরচের পরিমাণ হ'ল ১২০৲ থেকে ১৬৮৲ টাকা। কিন্তু উপরোক্ত তারের দড়ির খরচ মাত্র বৎসরে ১৬৲ টাকা। এতেই বোঝা যায় এই দড়ি ব্যবহারে কৃষকের কী পরিমাণ খরচ বাচে।

উপরোক্ত তারের দড়ি শালিমার রোপ ওয়ার্কস্ এ পাওয়া যায়। উহার দাম প্রতি হন্দর ৪২৲ টাকা। আমরা আশা করি কৃষক সাধারণ কিংবা যাঁদের বাড়ীতে ইঁদারা আছে তাঁরা উক্ত দড়ি পরীক্ষা করে দেখবেন। কিংবা অপর কোন দেশী কোম্পানী উক্ত দড়ি প্রস্তুতের প্রতি বা উহাকে জনপ্রিয় করবার প্রতি মনোনিবেশ করবেন।

কৃষি তন্ত্রের কথা

ইক্ষুচাষের জমি তৈরী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য

অপরাপর প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্যের চাষের তুলনায় বাংলাদেশে ইক্ষুর চাষ অপেক্ষাকৃত কম হলেও এর পরিমাণ নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। বরঞ্চ সকল পল্লীবাসী ও অনেকাংশে সহরবাসীর আবশ্যকীয় ইক্ষুগুড় যখন ইক্ষু হ'তে উৎপাদিত হয়ে থাকে তখন উৎপাদিত ইক্ষুর পরিমাণ প্রচুর বলেই ধরা যেতে পারে। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই ইক্ষুচাষে চাষীরা মোটেই লাভবান হয় না। বাংলার সন্নিকটে বিহারী ইক্ষুচাষীদের দুর্দ্দশা এতটা চরমে পৌঁছেছিল যে, বিহার গবর্ণমেণ্ট ইক্ষুর নিম্নতম দর বেঁধে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে যে ইক্ষুচাষীদের দুর্দ্দশা একেবারে ঘুচে গেছে এমন অনুমান করবার কিছুমাত্র কারণ নাই, তবে তাতে যে উক্ত দুর্দ্দশার কিছুটা লাঘব হয়েছে এ কথা বলা চলে; কিন্তু বিহার গবর্ণমেণ্টের ঐ দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখেও বাংলা সরকার ইক্ষুচাষের উন্নতি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করেছেন বলে এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি। অথচ বাংলা দেশের চাষীর দুর্দ্দশা বিহারের চাষীর দুর্দ্দশার চেয়ে এক তিল কম নয় এবং বাংলাদেশে চাষীদের কষ্ট লাঘব করবার জন্য একজন 'জনপ্রিয়' (?) কৃষিমন্ত্রীও বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, চাষীদের নিজেদের উন্নতির ব্যবস্থা নিজেরা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। এইটাই বোঝবার বুদ্ধির অভাব আছে বলেই আমাদের এতখানি কষ্ট ভোগ করতে হয়।

ইক্ষুচাষীর দুর্দ্দশার কারণ যদি অনুধাবন করতে হয় তা হলে প্রথমেই বলতে হয় যে, ফলনের স্বল্পতাই হ'ল দুর্দ্দশার প্রধান হেতু। একেবারে গণ্ডমূর্খ লোকেও এটা বুঝতে পারে যে, জমির ফলন যদি বৃদ্ধি পায় ত তারি ট্যাঁকে বেশী পয়সা জমা হ'তে পারে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই ফলন বৃদ্ধির প্রতিই নজর দেওয়া প্রয়োজন। পাইকারীভাবে আখ ওজন দরে বিক্রী হয়ে থাকে। যেখানে ওজনদরে না বিক্রী হয়ে গুণতি দরে বিক্রয় হয় সেখানেও

ক্রেতা ইক্ষুদণ্ডের দৈর্ঘ্য ও নিরেট আকৃতির প্রতি বেশী মনোযোগ দেয়। অর্থাৎ যে আখ গোছে খুব লম্বা ও মোটা সেইটাই বেশী দরে বিক্রয় হয়ে থাকে। লম্বা ও মোটা আখ ওজনে নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ভারী হয় এবং সেই জন্যই গুণ্‌তি হিসাবে বিক্রী বা ওজন দরে বিক্রী সে ধার দিয়েই ধরা হোক না কেন ফলন বৃদ্ধি পেলেই চাষী লাভবান হয়। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, আমাদের খুব কম চাষীই এই ফলন বৃদ্ধি করবার প্রতি নজর দিয়ে থাকে। যদি ইক্ষুক্ষেত্রে গিয়ে কৃষি কার্য্য পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যায় তাহ্‌লে দেখা যাবে যে, চাষীদের ইক্ষুচাষ ব্যাপারটা অযত্ন লাঞ্ছিত কৃষি কার্য্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন প্রকারে জমী তৈরী করে' আখ লাগিয়ে দিলেই চাষীরা চুপ করে বসে থাকে, চারার যত্ন নেওয়া বা জমির তদ্বির করার দিকে তারা তেমন নজর দেওয়া কর্ত্তব্য বলে মনে করে না। অধিকাংশ চাষীই যে এ রকম করে তা' বলা চলে না কিন্তু অধিকাংশ চাষীই যে এইভাবে কাজ করে থাকে এ কথা জোর করেই বলা চলে। তবে এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, চাষীদের শিক্ষা ও সামর্থ্য খুবই কম—এত কম যে থাকলেও সে না থাকারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং ভাল করে জমি তৈরী করা, জমিতে সার দেওয়া ভাল চারা বসানো প্রভৃতি ব্যাপার সাধারণের আয়ত্তের বাইরে এ কথা বলা চলে। যে চাষীর পেটে ভাত জোটে না, জমিদারের খাজনা যে যোগাতে পারে না, দেনার দায়ে যে একান্ত জর্জ্জরিত—সে কি করে চাষের উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে? কোত্থেকে সে পয়সা পাবে ভাল সার দেওয়ার---ভাল চারা বসানোর? কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ভাল সার দিলে, ভাল জমি তৈরী করলে পরই চাষী পয়সার মুখ দেখতে পাবে, নইলে অপর কোন পথ এ সম্পর্কে খোলা নেই। আজ আমাদের চাষের যা অবস্থা তাতে দিনের পর দিন আমরা ক্ষতি-গ্রস্তই হচ্ছি; এতে আমাদের দেনা বাড়ছে বৈ কমছে না। কাজে কাজেই বর্ত্তমান ধারা পরিত্যাগ করে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু তা' ত শুধু মুখের কথাতেই সম্পন্ন হয় না, তার জন্য রীতিমত অর্থ ব্যয় প্রয়োজন। অর্থ ঢাললেই তবে অর্থ আসে। এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, চাষীদের অর্থ ঢালবার সামর্থ্য নেই; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট থেকে চাষীদের যদি অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কোন উন্নতিই সম্ভবপর নয়। এইটাই বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের বিশেষভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, অর্থাগমের প্রধান উপায় হ'ল ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। সেই জমিতে ফলন বৃদ্ধি পায় যে জমিতে অর্গানিক্ পদার্থ ও নাইট্রোজেনের ভাগ বেশী থাকে। যে জমিতে অর্গানিক পদার্থ ও নাইট্রোজেন ভাগ কম থাকে তার ফলন কিছুতেই বৃদ্ধি পায় না। তবে একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে জমিতে নাইট্রোজেন ও অর্গ্যানিক পদার্থ কম থাকে সেই জমিতে খুব কম সময়ের মধ্যেই আখ তৈরী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে জমিতে অর্গানিক পদার্থ ও নাইট্রোজেন বেশী থাকে সেই জমিতে আখ তৈরী হতে দেরী লাগে। এই শেষোক্ত ব্যাপারে ইক্ষু তৈরী হতে বিলম্ব হলেও এতে লাভ আছে

কারণ এতে ফলন বেশী হয়। যে জমিতে ফলন কম হয় তার ইক্ষু যত তাড়াতাড়িই তৈরী হোক না কেন তাতে লোকসান নেই তবে ইক্ষু তুলে নেওয়ার পর ঐ সময় যদি সেই জমিতে রবিশস্য লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে লোকসান পুষিয়ে যেতে পারে।

উপরে যে তথ্য আমরা লিপিবদ্ধ করলাম তা' পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার প্রায় ৪০০০ বিঘা পরিমিত একটি ইক্ষুক্ষেত্রের বিভিন্ন জমির ইক্ষুকে পরীক্ষা করে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। উক্ত ক্ষেত্রের চারটি বিভিন্ন প্লট্ ঠিক করা হয় এবং ঐ বিভিন্ন প্লট্ থেকে ইক্ষু তুলে নিয়ে তাদের রস নিষ্কাষন করে সেটা পরীক্ষা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ চারটি ক্ষেত্রের ইক্ষু যে জমি থেকে তোলা হয়েছিল সেই জমির মাটিকেও যথাক্রমে বিশ্লেষণ করা হয়। এই উভয় পরীক্ষা কার্য্য ও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়

যে, যে-জমিতে নাইট্রোজেন ও অর্গানিক পদার্থের ভাগ বেশী আছে সেই-জমির ইক্ষুর রসে গ্লুকোজ পদার্থ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুক্রোজ (sucrose) পদার্থ হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে যে জমিতে নাইট্রোজেন ও অর্গানিক পদার্থের ভাগ কম আছে সেই জমির ইক্ষুর রসে গ্লুকোজ পদার্থ হ্রাস পেয়েছে এবং সুক্রোজ পদার্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, জমিতে নাইট্রোজেন ও অর্গানিক পদার্থের অবস্থিতির সঙ্গে গ্লুকোজ ও সুক্রোজের তারতম্যের রীতিমত সম্বন্ধ আছে। নাইট্রোজেন ও অর্গানিক পদার্থের অবস্থিতি ইক্ষুর তেজ বাড়ায় এবং ইক্ষু তৈরী হওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি করে।

ইক্ষু তৈরী হওয়ার অর্থাৎ পাকবার সময় তার রং ও অন্যান্য পরিবর্ত্তনের কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সবুজ রং হলদে হয়ে আসে কিংবা লাল রং ফিকে আকার ধারণ করে। সোজা পাতাগুলি নুয়ে পড়ে এবং নিস্তেজ হয়ে যায়। ইক্ষু যখন কাঁচা অবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যে বেশী পরিমাণ গ্লুকোজ ও কম পরিমাণ সুক্রোজ দেখা যায়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, জমিতে নাইট্রোজেন ও অর্গানিক পদার্থ না থাকলে বা কম থাকলে তার ইক্ষু শীঘ্র পেকে যায়। এই শীঘ্র পেকে যাওয়াকে অনেক চাষী সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলে মনে করে' কেননা, তাহ'লে তারা কলের চাহিদা আগে থেকেই মেটাতে পারে। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ পৌষ মাস থেকে ইক্ষু পাকতে আরম্ভ করে এবং সেই সময় আগাম চাহিদা থাকার দরুণ কেনবার খরিদ্দারও পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে, ডিসেম্বর অর্থাৎ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে পাকা ইক্ষুর ওজন ও ফলন কম হয়। সুতরাং তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে যে ইক্ষু মার্চ্চ মাসে পাকে তার চাষের চেয়ে যে ইক্ষু ডিসেম্বর অর্থাৎ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে পাকে তার চাষে লোকসান যায়, কারণ প্রথমোক্ত ব্যাপারে ফলন বেশী হয় এবং শেষোক্ত ব্যাপারে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হয়। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইক্ষু আগে পাকার দরুণ চাহিদা বেশী থাকায় চাষী দর একটু বেশী পেলেও ঠিক খতিয়ে দেখলে শেষকালে তার লোকসানই হয়। সুতরাং চাষীদের পক্ষে ইক্ষুকে মার্চ্চ অর্থাৎ চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে রাখা লাভজনক। যদি ইক্ষুকে কার্ত্তিক মাসেই তুলে নিতে হয় চাহিদা মেটাবার জন্য তাহ'লে পরে সেই জমিতে রবিশস্য ফলিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিতে হয়।

নিম্নে বিভিন্ন জমি ও উৎপাদিত ইক্ষুর তুলনামূলক বিশ্লেষণের একটি তালিকা প্রদত্ত হ'ল তা' থেকে নাইট্রোজেন শূন্য জমি ও নাইট্রোজেন পূর্ণ জমির উৎপাদনের পার্থক্য বোঝা যাবে।

	১ম জমি।	২য় জমি।	৩য় জমি।	৪র্থ জমি।
শতকরা নাইট্রোজেনের ভাগ	০'০৪৯।	০'০৬৩।	০'০৬৭।	০'০৯৭।
,, অর্গানিক পদার্থের ভাগ	২'৩০।	৩'০৭।	৩'৩৭।	৪'০১।
,, আর্দ্রতার ,,	১'০০।	১'৫০।	১'৫০।	১'৬০।
পরীক্ষিত ইক্ষুর ওজন	৭'৫ পাঃ।	৬'৮ পাঃ।	৯'০ পাঃ।	৮'৫ পাঃ।
ঐ রসের ওজন	৪'৮ ,,।	৪'৬ ,,।	৬'০ ,,।	৫'৬ ,,।
রসে শতকরা সুক্রোজের ভাগ	১৬'৯৪।	১৩'৪৮।	১২'২১।	১০'৭৪।
রসে শতকরা গ্লুকোজের ভাগ	০'০৩৩।	১'০৩।	১'৩৮।	১'৮৩।
বিশুদ্ধতা	৮০'৬৩।	৮২'৬৯।	৮১'৫২।	৭৬'২৬।
একর জমি পিছু উৎপাদনের পরিমাণ	২৮৭৯৮ পাঃ	৪৯৩৬৮ পাঃ	৫৯৪৮৮ পাঃ	৫৭৫৯৬ পাঃ

আমরা উপরে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করলাম। এক্ষণে ইক্ষুচাষী ও ইক্ষু ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এধারে আকর্ষণ করছি। এটা সর্ব্বজন স্বীকৃত যে, ইক্ষু চাষীদের আর্থিক দুর্দ্দশার অন্ত নেই। পাট চাষীদের মত তারাও একদিন সৌভাগ্যের খানিকটা মুখ দেখেছিল, কিন্তু আজ সেই সৌভাগ্যরবি একেবারে অস্তমিত হয়েছে। বর্ত্তমানে চাষীরা ইক্ষুর যে দর পেয়ে থাকে তাতে তাদের লাভ হওয়া ত দূরের কথা চাষীর খরচই পোষায় না। সেইজন্যই আইন দ্বারা ইক্ষুব নিম্নতম দর বেঁধে দেওয়া দরকার। বিহার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষকদের দুরবস্থা দুরীকরণার্থে-ই ইহা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দরের দিকের সুবিধা ছাড়াও চাষীরা যদি জমির ফলন বৃদ্ধি করতে পারে তাহলেও তাদের রীতিমত লাভ হতে পাবে। জমিতে নাইট্রোজেন ও অর্গানিক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা সে ফলন বাড়াতে পারা যায়। অধিকন্তু চাষীরা এই উপায়ে চাহিদা ও যোগান কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। যদি অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে চাহিদা সেটাতে হয় তাহলে নাই-ট্রোজেন শূন্য জমিতে চাষ করার প্রয়োজন এবং পরে সে জমিতে রবিশস্য লাগিয়ে দিলে লাভ হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যোগান দিতে হলে নাইট্রোজেন পূর্ণ জমিতে চাষ করতে হয়। এই ভাবে অন্ততঃ ছয়মাস ধরে চিনিব কলের যোগান নিয়ন্ত্রিত করা যায়। তাতে দরের দিক দিয়ে সুবিধা হয়। চাষীরা এধারে মনোযোগী হলে লাভবান হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ বাংলাদেশে যখন শর্করা শিল্পের প্রসারতার সূত্রপাত হয়েছে তখন ইক্ষু চাষীদের ও ইক্ষু ব্যবসায়ীদেব এদিকে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কীটের আক্রমণ হইতে শস্যাদি রক্ষা করিবার উপায়

আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিধানের সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। আবহমান কাল থেকে কৃষি কার্য্যের জন্য যে প্রণালী অবলম্বিত হয়ে এসেছে সেটা যে আজ কার্য্যকরী নয় একথা বুঝছেন অনেকে ; তবুও প্রচলিত কুসংস্কার ও অর্থাভাবের জন্য ফলপ্রসূ কিছু হয়ে উঠছে না। আজ প্রত্যেক ফসলেরই বিঘা পিছু উৎপাদনের পরিমাণ এতটা কমে গেছে যে তাতে চাষীদের খরচা পোষায় কিনা সন্দেহ। চাষীরা এটা মনে মনে বোঝে কিন্তু কার্য্যকরীভাবে এর কোন প্রতিবিধান করে না। উৎপাদন হ্রাসের বহু কারণ আছে, তন্মধ্যে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া একটি। ফসল নানা কারণে নষ্ট হয়, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার পোকায় যে-পরিমাণ ফসল নষ্ট করে তার লোকসান অনেক। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐ একই অবস্থা। আমেরিকা একটি উন্নতিশীল দেশ, সেখানে শুধু যে বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি অবলম্বিত হয় তা' নয়, পরন্তু সেখানে বৃহৎ স্কেলে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হয়ে থাকে। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, এই রকম উন্নতিশীল দেশেও পোকায় ফসল নষ্ট করে বাৎসরিক দুই বিলিয়ান (2 billions) ডলার ক্ষতি করে। ফ্লেচার সাহেবের মতে ভারতবর্ষে পোকায় বৎসরে অন্যূন ৩০ কোটি টাকার ইক্ষু নষ্ট করে। ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবে এক রকম পোকাকে তুলাচাষের ক্ষতি করতে দেখা গিয়েছিল, হিসাব নিয়ে জানা গেছে যে, তাতে সেখানকার তুলা চাষীদের ৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর হচ্ছে ভূস্বর্গ, সেখানে নানাবিধ ফলবৃক্ষের চাষ হয়। Joce scale নামে এক রকম কীটের আক্রমণে সেখানকার হাজার হাজার ফলের গাছ নষ্ট হয়। এই রকম অনুমিত হয় যে, ভারতবর্ষে পোকায় যে ফসল ও ফলের গাছ নষ্ট করে তার বাৎসরিক লোকসানের পরিমাণ হ'ল খুব কম পক্ষে ১৯৫ কোটি টাকা। এই বিরাট অঙ্কের পরিমাণ থেকে এটা বোঝা কিছুমাত্র শক্ত নয় যে, আর্থিক দিক দিয়ে আমরা কি রকম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এই লোকসান প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। চাষীরা আজ যে দুর্দ্দশার শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, এই লোকসান প্রতিরোধ করতে পারলে তাদের দুর্দ্দশা কথঞ্চিৎ লাঘব হতে পারে। এধারে দেশহিতৈষী মাত্রেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এই যে রীতিমত লোকসান, এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির

নিরন্তর যুদ্ধের ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা দরকার। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষ যেদিন থেকে পৃথিবীর বুকে ফসল ফলাতে আরম্ভ করেছে সেদিন থেকে প্রকৃতির সঙ্গে তার সংঘর্ষ সুরু হয়েছে। চাষের পক্ষে বাধা হচ্ছে মাটির বন্ধ্যা প্রকৃতি, জলকষ্ট, প্লাবন, আবহাওয়া, পোকামাকড়ের উৎপাৎ প্রভৃতি। উপরোক্ত সমস্ত ব্যাপারই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের স্বাভাবিক প্রকাশ, কিন্তু মানুষ প্রকৃতির ঐ স্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে তার আসল রূপটাকে বদলে দিয়ে নিজ নিজ অনুকূল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করে নিয়েছে। তাই দেখা যায় যে, প্লাবনের প্রতিরোধের জন্য বাঁধ বসেছে ও জলনিকাশের ব্যবস্থা হয়েছে, ফলপ্রসূ সার-বস্তু প্রদানের দ্বারা মাটির বন্ধ্যাত্ব ঘুচেছে, ক্যানাল কাটিয়ে দেওয়ার দরুণ জলাভাব মিটেছে। পোকামাকড়ের উৎপাতও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের দরুণ কতকটা দূর হয়েছে, কিন্তু মানুষ এখনো আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় নি। সেইজন্যই অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা প্রবল ঝটিকায় যখন ফসল নষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষের তাতে কিছু করবার থাকে না। তবুও মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে আদিম কাল থেকেই যে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে তারই জের টেনে সে প্রাণপণে আবহাওয়ার অত্যাচার এড়াবার চেষ্টা করছে। একদিন হয়ত সে সফল হবে।

আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য পোকা-মাকড়ের হাত থেকে কি করে ফসলকে রক্ষা করা যায় তারই আলোচনা করা। এদেশে পোকামাকড়ের আক্রমণের দরুণ বাৎসরিক কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয় তার একটি আনু-মানিক হিসাব প্রারম্ভেই উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত হিসাবের অঙ্ক মোটেই সামান্য নয়, বরং তা' আশাতীতরূপে বিপুল। ঐ লোকসান কি করে প্রতিরোধ করা যায় তাই অনুসন্ধান করা কৃষি-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। নিম্নে কতকগুলি উপায় প্রদত্ত হ'ল।

হস্ত দ্বারা পোকা বাছার প্রথা আদিম কাল হ'তেই প্রচলিত আছে। বাঁদর বা হনুমানদের খুব নিপুণতার সঙ্গে হস্ত দ্বারা পোকা বাছতে দেখা যায়। মানুষের মাথার চুলের ভেতর থেকে হাত দিয়ে উকুন বার করে। এই উপায় খুবই কার্যকরী, সুতরাং ছোট ছোট জমিতে এই উপায় অবলম্বন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বড় বড় জমিতেও সুবিধানুযায়ী এই উপায় অবলম্বিত হ'তে পারে। পোকাগুলিকে সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হয় কিংবা একটি সাধারণ টবে জলের উপর খানিকটা কেরোসীন ঢেলে তাতে যদি পোকাগুলিকে ফেলা যায় তাহ'লে তা আপনি মরে যায়।

কতকগুলি গাছে নাড়া দিলে যদি তাতে পোকা থাকে ত তা' আপনি ঝরে পড়ে এবং সেই সময় তলায় ছাতা বা চাদর ধরলে সেগুলি একস্থানে জড়ো করা যায়। কতক পোকা আবার ডিম পাড়ে এবং সেই ডিমগুলি সংগ্রহ করে তা' নষ্ট করে ফেললে পোকার হাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। Sugar cane Pyrilla, Sugar Cane Moth Borers, Hairy Caterpillars প্রভৃতি পোকার এই রকমভাবেই বিনাশ সাধন করা হয়। অনেক সময় পোকা ধরবার জন্য ছোট ছোট জাল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং তাতে সুবিধাজনক ফল ফলে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারের

আঁক্সীর সাহায্যে পোকাকে গর্ত্তের ভেতর থেকে টেনে বার করে নষ্ট করে ফেলা হয়।

এসমস্ত ছাড়া ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা নষ্ট করবার আর এক রকম উপায় আছে—সেটি হচ্ছে গর্ত্ত বা খানা খুঁড়ে ফাঁদ পেতে রাখা। দলবদ্ধভাবে সারি সারি পোকা আসতে আসতে এই গর্ত্ত বা খানায় পড়ে এবং তখন তাদের মাটি চাপা দিয়ে কবর রচনা করা হয়। এই রকমভাবে বহু কীট ও পোকামাকড় নষ্ট করা যায়।

আলোর সাহায্যেও পোকা নষ্ট করবার উপায় আছে। অনেকেই জানেন যে, কতকগুলি পোকা আছে যারা আলো দেখলেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। যদি কেরোসীনযুক্ত জলভরা একটি টবের মাঝখানে একটি আলোকের ল্যাম্প্ রাখা যায় তাহলে সমস্ত পোকা সেখানে এসে জমা হবে এবং তারপর ঐ কেরোসীনযুক্ত জলে পড়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

উত্তাপ প্রয়োগ পোকা মারবার আর একটি উপায়। ১৫০° ফরানহাইট উত্তাপে কোন পোকা বাঁচতে পারে না এবং অধিকাংশই ১৩০° উত্তাপে মারা যায়। সেইজন্যই উত্তাপ পোকার একটি সহজসাধ্য বিনাশযন্ত্র। ভারতবর্ষে সাধারণভাবে রৌদ্রতাপের কোন অভাব নেই, সুতরাং পোকা খাওয়া বা পোকা লাগা কোন দ্রব্য রৌদ্রে দিলে কীট সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রৌদ্রসাহায্য ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে ঘরে যদি উত্তাপ সঞ্চালন করা যায় ত হ'লেও কীটসমূহকে ধ্বংস করা চলে। অনেকস্থলে শস্যাদি কিংবা বীজাদির পোকা নষ্ট করার জন্য এইরূপ কৃত্রিম উত্তাপ সঞ্চালক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যাই হোক্ না কেন, সূর্য্যতাপ বা উক্ত কৃত্রিম যন্ত্র যে কোনটি কাজে লাগানো দরকার। তবে এই উত্তাপ প্রয়োগ ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; চাউল বা তামাক ১৩০° ডিগ্রির অধিক উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এই সমস্ত পদার্থের বেলায় অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপ ব্যবহার করা প্রয়োজন। আগুন লাগিয়েও সময় সময় পোকা নষ্ট করা হয়। এমনও দেখা যায় কোন কোন গাছ বা অন্য পদার্থে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা জন্মেছে। সেক্ষেত্রে আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষে ধ্বংস করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। যদি নিঃশেষে ধ্বংস করা না হয় তাহলে সে পোকাগুলো অপর যায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জিনিসকেই নষ্ট করে ফেলে। তখন সবটাই লোকসান যায়, এবং তার চেয়ে পূর্ব্বে খানিকটা বস্তুকে আগুনে ধ্বংস করে কিছুটা লোকসান যাওয়া ভাল। খুব বেশী উত্তাপেও যেমন পোকা নষ্ট হয়, খুব বেশী ঠাণ্ডায়ও তেমনি পোকা বাঁচতে পারে না। সুতরাং ৪০° ফরানহাইটের কম উত্তাপ হ'লে পোকার আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই।

বিষ প্রয়োগ করেও পোকা মারা যেতে পারে। পোকাদের খাদ্যের সঙ্গে এই বিষ মিশ্রিত করলে তা' তাদের পেটে গেলেই কীটসমূহ মরতে আরম্ভ করে। কিংবা যে সমস্ত গাছ পোকায় খায় তাদের গায়ে যদি বিষের একটু পাতলা প্রলেপ মাখিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও পোকাদের মরণ অনিবার্য্য, এজন্য আরসেনিক অর্থাৎ সেঁকো বিষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই আরসেনিক বিষ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সাধারণের এক কুসংস্কার আছে, কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে আরসেনিক ব্যবহারে ফসল বা ফলের কোন ক্ষতি হয় না। অনেক পোকা

গাছের গা কুরে তার মধ্যে থেকে রস শুসে নেয়; তাদের সেঁকো বিষ দিয়ে মারা যায় না। সেইজন্য তাদের জন্য গন্ধক দ্রব্য, নেপ্থলিন, কেরোসীন তৈল প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হয়।

অনেক সময় বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ দ্বারা পোকা নষ্ট করা হয়। যে সমস্ত বড় বড় গুদামজাত ফসলের মধ্যে পোকা ধরে সেগুলিতে এই গ্যাস প্রয়োগ সুবিধাজনক। এতৎসম্পর্কে হাইড্রোসিয়ানিক এ্যাসিড গ্যাস, কার্বণ ডাইঅক্সাইড্, কার্বনমনোক্সাইড, সালফরিক ডাইঅক্সাইড, কার্বন বাইসাল্ফাইড্ প্রভৃতি গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাচীন কালের প্রথা ছিল, শস্য গুদামজাত করবার সময় তার সঙ্গে সামান্য একটু পারা ও বা তৈল রেখে দেওয়া হ'ত। এতে করে শস্যে বেশী পোকা লাগতে পারত না। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে পারদ ও ছাই বা তৈলের সংমিশ্রিত পদার্থের মধ্যে পোকা ডিম ফুটাতে পারে না।

গাছের মধ্যে ইন্‌জেক্‌সন্‌ প্রদানের দ্বারাও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আপেল গাছকে পোকার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার মধ্যে বেরিয়াম ক্লোরাইড, এ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ প্রভৃতির কমজোরী সলিউশন ইন্‌জেক্‌সন্‌ করে দেওয়া হয়। গাছের গুঁড়ির মধ্যে সামান্য পরিমাণ পটাসিয়াম্‌ সায়ানাইড রেখে দিলে পোকা মরে যায়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বিপদও আছে। তছাড়া প্রতিষেধক সার প্রদানের দ্বারাও পোকা নষ্ট করা যায়। চা-গাছের পোকা নষ্ট করবার জন্য ফস্‌ফেটিক্‌ সার উপকারী।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, পোকার আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করবার জন্য স্থানে স্থানে জাল ব্যবহৃত হয়। গাছ কিংবা চারা বাগানের চারধারে যদি উঁচু জাল দিয়ে রেখে দেওয়া যায় তাহলে পঙ্গপাল, ফড়িং প্রভৃতি পোকা কিছুতেই ঢুকতে পায় না। বীজতলা ও ভাল ভাল ফল কেও অনুরূপ উপায়ে রক্ষা করা যায়। অনেক পোকা আবার গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ফল ও পাতা নষ্ট করে, সেক্ষেত্রে গাছের গুঁড়িটা যদি তেলাকাগজ, অয়েলক্লথ্‌, আল্‌কাতরা বা অনুরূপ পদার্থ দ্বারা ঢেকে রাখা যায় তাহলে পোকাগুলি গাছের গুঁড়ি বেয়ে আর উপরে উঠতে পারে না।

এতক্ষণ পোকাদের আক্রমণ কিকরে প্রতিহত করা যায় তারই বিষয় আলোচনা করেছি কিন্তু এগুলি হ'ল বাইরেকার ব্যাপার। এছাড়া পোকাদের নিজস্ব জগতের ভিতর তাদের শত্রু বর্ত্তমান রয়েছে, সুতরাং মানুষের আবিষ্কৃত পন্থা অবলম্বিত হওয়া ছাড়াও অন্য উপায়ে পোকা ধ্বংস হয়। সকলেই জানেন যে, কতকগুলি জীব আছে যারা শুধুমাত্র পোকা খেয়েই জীবন ধারণ করে। তাদের দ্বারা পোকা জগতের প্রকৃত ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। এটা মানব সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণের কথা। ব্যাঙ্‌, মাছ, সাপ, কতকগুলি পক্ষী, বাদুড়, বানর প্রভৃতি প্রাণীগণ পোকা-মাকড় ধ্বংস করে থাকে। এছাড়া পোকাজগতে মাঝে মাঝে ভীষণ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাতে লক্ষ লক্ষ পোকা মরে। এছাড়া কতকগুলি পোকা আবার সগোত্র মাংস ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করে, তাতেও বহু পোকা ধ্বংস হয়। হিসাব দ্বারা অনুমিত হয় যে, শতকরা ২৫ ভাগ পোকাই এই উপায়ে নষ্ট হয়ে থাকে। পোকা ধ্বংসের যদি এরকম স্বাভাবিক উপায় না থাকতো তাহ'লে পৃথিবীতে পোকাদের বংশ বৃদ্ধি হয়ে মানুষকেই চাপা দিয়ে দিত। সেইজন্যই যেখানে পোকাদের অত্যাচারের প্রাবল্য দেখা দেয় সেখানে যদি পোকাধ্বংসকারী পোকা বা প্রাণীদের ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ অত্যাচার নিবারিত হবার উপায় থাকে। ক্যালিফর্ণিয়ায় একবার সাইট্রাস্‌ গাছসমূহ পোকার আক্রমণে রীতিমত ধ্বংস হ'তে

বসেছিল; তখন সেখানে পোকাদের শত্রুদের ছেড়ে দেওয়াতে গাছগুলো আবার বেঁচে উঠে।

এতক্ষণ আমরা সাধারণভাবে পোকা ধ্বংস-করণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার আমাদের দেশে তার কিরকম প্রয়োগ হতে পারে সেটাই দেখা যাক্। সকলেই জানেন যে ভারতের কৃষকগণ অতিমাত্রায় দরিদ্র, তদুপরি অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সুতরাং তাদের জন্য যতদূর সম্ভব সাধারণ ও ব্যয়শূন্য ব্যবস্থারই প্রবর্ত্তন করা দরকার। বড় বড় মহারথীগণ কর্ত্তৃক জটিল ব্যয়বহুল ব্যবস্থার কথা অনেক বলা হয়েছে কিন্তু কাজ তাতে কিছুই এগোয় নি। কি করেই বা এগোবে? নিরক্ষর দরিদ্র চাষী কিকরে জটিলপন্থা অবলম্বন করবে? তার সে সামর্থ্য কোথায়? সেইজন্যই এখানে প্রাথমিক ভাবে চাষীর আয়ত্তাধীন ব্যবস্থার কথা বলাই ভাল। এটা জানা কথা যে, শতকরা ৯৫ ভাগ পোকা কিছু না কিছু সময় মাটিতে থাকে, সুতরাং ক্ষেতে যত বেশী লাঙ্গল দেওয়া যায় এবং যতো বেশী ক্ষেত পরিস্কার রাখা যায় ততোই ভাল। তাতে পোকা মরে যায় এবং যারা বাঁচে তারাও বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। তাছাড়া পূর্ব্বেই বলেছি যে উত্তাপের মধ্যে পোকা বাঁচে না, কাজে কাজেই লাঙ্গল দেওয়ার দরুণ পোকাগুলো মাটির পরে উপড়ে প্রখর রৌদ্রের সম্মুখীন হয় এবং তদ্দরুণ তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। ভালভাবে জলসেচনের ব্যবস্থা থাকলেও পোকা মারা পড়ে, কেননা, জলের বন্যায় পোকা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অর্থাৎ একটীর পর বদলে আর একটী ফসল বুনলেও ভাল ফল ফলে। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ক্ষেত পরিস্কার রাখা। ক্ষেতে কোন আগাছা জন্মালে বা শুকনো পাতা পড়লে, কিংবা শস্য পড়ে থাকলে অথবা অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটলে সেখানে পোকা বাসা বাঁধবার সুবিধা পায় এবং তদ্দ্বারা গাছ ও ফসল নষ্ট হয়। পক্ষান্তরে এই সমস্ত আগাছা ও পাতা যদি আমরা দূরীভূত করতে পারি এবং বহুবার লাঙ্গল প্রদান দ্বারা জমি ঠিক রাখতে পারি তাহলে পোকা জন্মাতে পারে না।

কোন কোন যায়গায় পোকা তাড়াবার এমন পন্থাও অবলম্বিত হয়ে থাকে যাকে ফাঁদ প্রথা বলে। এক প্রকার গাছ আছে যাদের দিকে পোকা মুহূর্ত্তেই আকৃষ্ট হয়, সুতরাং যে ক্ষেতে পোকার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে তারই একধারে যদি উক্ত গাছ বসানো যায় তাহলে সমস্ত পোকা তারই ওপর গিয়ে পড়বে। তখন পোকাশুদ্ধ সেই গাছকে কেটে জ্বালিয়ে ফেললেই পোকার উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষীয় কৃষকেরা এই সহজ পন্থাটা অনায়াসে অবলম্বন করতে পারে। এতে ব্যয়বাহুল্য মোটেই নেই, প্রণালীটাও অত্যন্ত সহজ।

পোকার আক্রমণ ও তার হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় সম্পর্কে আমরা সমস্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেছি এবং ভারতের দরিদ্র কৃষক-গণের পক্ষে কোন্ পন্থা বিশেষ উপযোগী সেটাও জানিয়েছি। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি এধারে আকর্ষণ করছি। উভয়ের সহ-যোগীতা ব্যতীত কোন প্রকার প্রতিরোধ কার্য্য সম্ভবপর নয়। সকল কৃষক যদি পোকা তাড়াবার প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে তাহলে ব্যক্তিগত চেষ্টায় পোকার হাত এড়াবার কোন উপায় নেই। ধরুন, পাশাপাশি জমির মধ্যে একজন মালিক তার জমি থেকে পোকা

তাড়াবার ব্যবস্থা করলে, কিন্তু তার পাশের জমির মালিক যদি এ-সম্পর্কে উদাসীন থেকে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করে তাহলে ঐ শেষোক্ত জমির পোকা প্রথমোক্ত জমিতে ঠেল মারবে। ফলে, পোকার সংখ্যা কম্‌লেও তাদের আক্রমণ একেবারে এড়ানো যাবে না। সেইজন্য সমস্ত জমির মালিকেরই এসম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় এদিক দিয়ে গবর্ণমেণ্টের একটি আইন করা দরকার এবং পোকা ধ্বংসকরণ সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তা' যদি না করা হয় ত আমাদের দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষকেরা কিছুতেই নতুন পন্থা অবলম্বনে ব্রতী হবে না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এখানে অচল বলেই সরকারী ব্যবস্থার একান্ত দরকার। আমরা যদি কোন-রকমে এই সর্ব্বনাশকর পোকার হাত এড়াতে পারি তাহলে আমাদের বহু অপচয় দূর হ'বে। পৃথক পৃথক ভাবে কোন কৃষক হয়ত এই অপচয়ের পরিমাণটা বুঝতে পারে না, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে সমষ্টিগতভাবে ধরলে এই অপচয়ের পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকা। প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বনের দ্বারা কিছুটা পরিমাণ যদি লাভবান হওয়া যায় তাহলেও দরিদ্র ভারতের পক্ষে তা অনেকখানি কাজে লাগবে।

গাভী পালন।
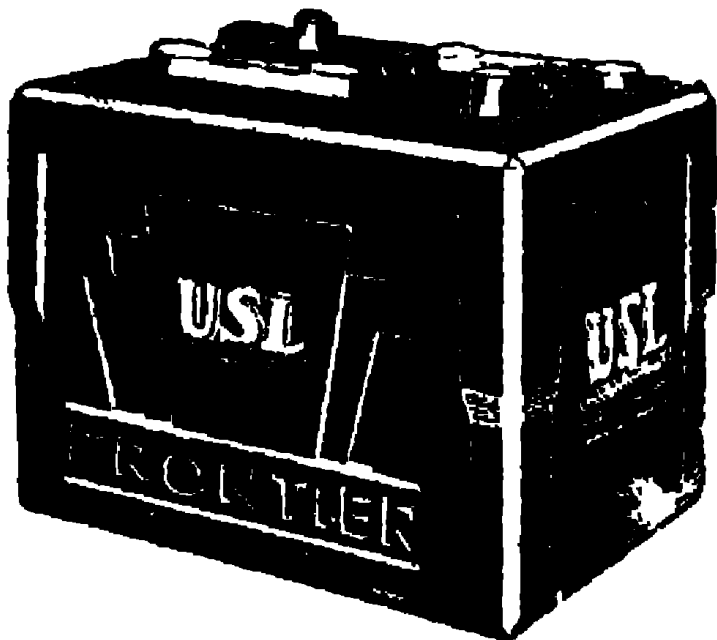
পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পর

(শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার)

বাছুরের যত্ন

প্রসবের পব প্রথম সপ্তাহ বাছুব তাহার মাতার সঙ্গে এক স্থানে থাকিবে। তৎপর তাহাকে একমাস যাবৎ দোহন করা দুগ্ধ পান করিতে দিবে কিন্তু মাতার বাঁটে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধ পান করিতে দিবে না। প্রথমে হাতে করিয়া দুধ পান করাইয়া পরে পাত্র হইতে দুগ্ধ পান করিতে অভ্যাস করাইবে; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাছুর দ্বারা পানাইয়া দুধ দোহন করিলে গাভী সম্পূর্ণ দুধ ছাড়ে না, বাছুরের জন্য দুধ রাখে, তাহাতে নিঃশেষরূপে দুগ্ধ দোহনেব বাধা জন্মে এবং দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হয়। একমাস যাবৎ বাছুরকে দৈনিক ২।৩ সের হইতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ সের পর্য্যন্ত দোহনকরা দুগ্ধ খাওয়াইলে বাছুর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলীষ্ঠ হয়। বকনা বাছুর দেড়মাস এবং এঁড়ে বাছুব দুইমাস বয়সে দুধ ছাড়িতে পারে।

এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, বাছুরকে মাঠে চরিতে দিবে না, কারণ রৌদ্রের উত্তাপ, ডাঁশ, মাছি প্রভৃতির উপদ্রবে বাছুর বাড়িতে পারে না। তৎপর ৩।৪ মাস বয়স পর্য্যন্ত কাঁচা ঘাস, মাখন টানা দুধ, ভাতের মাড় এক ভাগ ও মসিনা সিদ্ধ জল শিকিভাগ দিবে। বাছুর যে স্বতন্ত্র খোপে থাকিবে তাহাতে খড় পাতিয়া দিয়া বাছুরকে আলগা ছাড়িয়া দিতে হইবে, বাঁধিয়া রাখিবে না; বলা বাহুল্য ঐ খোপটীকেও সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

দুই হইতে তিন মাস বয়সের বাছুরকে ডাইলের ভূষি দুইভাগ, ক্ষুদ একভাগ, গমের কুঁড়া দুই ভাগ ও খইল এক ভাগ একত্রে মিশাইয়া তাহাতে লবণ প্রক্ষেপ দিয়া, শরীরের ওজন অনুসারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া দৈনিক আধসের হইতে দুইসেব পর্য্যন্ত দিবে।

উত্তম জাতের গাভী ও ষাঁড় প্রস্তুত কবণ জন্য পাঁচ ছয় মাস বয়সের বাছুরগুলির মধ্যে ভাল বকনা বাছুর ও ভাল এঁড়ে বাছুব নির্ব্বাচন করিতে হইবে। উদ্ভিদের বীজ নির্ব্বাচন প্রণালীর সঙ্গে ভাল জাতের গাভী ও ভাল জাতের ষাঁড় জন্মানোর অনেক সাদৃশ্য আছে। পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাহাকে ঋতুমতী গাভী দেখাইবে না। গাভী হইতে পৃথক স্থানে কিন্তু গাভী দেখা যায় এরূপ স্থানে এঁড়েকে রাখিলে তাহার জননেন্দ্রিয় সবল হয়। কিন্তু "পিডিগ্রী" অর্থাৎ উচ্চজাতের পশু সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে মান্য করিয়া এক বংশীয় বকনা বাছুর ও এঁড়ে বাছুর জনন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। নিকৃষ্ট এঁড়ে গুলিকে বলদ করিয়া দিবে। ষাঁড় অপেক্ষা বলদ অধিক বলীষ্ঠ ও শ্রমশীল এবং অধিকদিন জীবিত থাকে। চারিদাঁতের বকনা

বাছুর গর্ভধারণক্ষম ও এঁড়ে বাছুর শ্রমজনক কার্য্যক্ষম হয়।

গোশালা

গাভীকে অন্যান্য গরু হইতে পৃথক স্থানে ভিন্ন খোপে কি ভিন্ন ঘরে রাখিতে হইবে। বাছুরগুলি সম্বন্ধেও ঐরূপ পৃথক বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। দিবাভাগে "খাগ্‌লা" (বেড়াশূন্য) ঘরে এবং রাত্রিতে গোয়ালঘরে (গো-গৃহে) গরু রাখার প্রথা উত্তম। ষাঁড় ও বলদ গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে খাগ্‌লা ঘরে রাখা যায়। গোয়াল ঘরের জানালাগুলি পরস্পর বিপরীত দিকে সমসূত্রে থাকিবে তাহা হইলে বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইবে না। গৃহ মধ্যে যথাসম্ভব আলোক প্রবেশ করে এরূপ বন্দোবস্ত থাকিবে, কারণ, বায়ু, আলোক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যেরূপ আবশ্যক, গরুর পক্ষেও এইসকল তদ্রূপ আবশ্যক। এই কথা মনে রাখিয়া গোয়াল ঘরের দেওয়াল আবশ্যকমত উচ্চ করিয়া তাহার উপরিভাগে জাফ্‌রি প্রস্তুত করিয়া দিবে, তাহাতে বায়ুসঞ্চালনের সুবিধা হইবে ও গৃহমধ্যে দূষিত উষ্ণ বায়ু সঞ্চিত হইবে না। ঘরের মেজে সর্ব্বদা শুষ্ক রাখার জন্য, তিন কি আড়াই হাত মাটির নীচে এক স্তর

বালি দিয়া তাহার উপর ক্ষুদ্র ইট, ঝামা কি তদ্ভাবে এক স্তর অঙ্গার দিবে এবং ঐ স্তরের উপর আটালেমাটি,—গোবর ও বালি মিশ্রিত করিয়া এক স্তর দিবে, এই স্তরটী ভাল করিয়া পিটিয়ে দিলে তাহা প্রায় পাকা মেজের ন্যায় শক্ত হয়। এইরূপ করায় কৈশিক আকর্ষণের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মাটির নিম্ন হইতে জলীয় রস উপরে উঠিতে পারিবে না এবং মেজে সর্ব্বদা শুষ্ক থাকিবে।

প্রত্যেকটী গরুর জন্য ৬ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ ও ৬ হাত উচ্চ স্থান আবশ্যক। গোশালাটী এরূপ পরিসরের হইবে যে তাহার দৈর্ঘ্যের দিকে বরাবর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পাকা কাজ করা একটী নালী থাকিতে পারে। ঐ নালীর দিক পিছন করিয়া পরস্পর একদিকে পাছা রাখিয়া গরুগুলি থাকিবে এবং তাহাদের ত্যক্ত চোনা ঐ নালী দিয়া যাইয়া গোশালার বাহিরে নালীর এক-প্রান্তে স্থাপিত একটী গামলায় পতিত হইয়া সঞ্চিত থাকিবে। তৎপরে গোবর এবং ঐ চোনা যথাসময়ে স্থানান্তর করিয়া গোয়াল ঘরের সোরা-সাপটী আবর্জ্জনা সহ সারের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। সর্ব্বশেষে ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। সামর্থ্যে কুলাইলে তাহার পর গোয়াল ঘরটী ফেনাইল দিয়া ধুইয়া দিতে পারিলেই সর্ব্বোত্তম হয়।

শীতকালে গোয়ালঘরে খড় ইত্যাদি বিছাইয়া দিয়া ছালাদিয়া গরুর গা ঢাকিয়া দিবে। প্রাতে, চোনা সিক্ত কি গোবরযুক্ত খড় সারের গর্ত্তে ফেলিয়া দিবে। আটালে মাটির গুঁড়ো ও ছাই ছিটাইয়া দিলে ঘরের দুর্গন্ধ দূর হয়। অবশিষ্ট খড় রৌদ্রে শুকাইয়া রাত্রিতে পুনরায় গোশালায় বিছাইয়া দিবে; এইরূপ খড় পুরাণো হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া গেলে আবার নূতন খড় বিছানের বন্দোবস্ত করিবে।

"আওলা" ও "গোয়ালের" দৈর্ঘ্য বরাবর, ঠিক মধ্যস্থল না দিয়া, দুই পার্শ্বে দুইটী "গোড়া" দিয়া তাহাতে ঘাস ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য দিলে চোনা নিঃসারনের ও গোবর সংগ্রহের সুবিধা হয়। কাঠের পিপার (barrel) মধ্যস্থলে কাটিয়া সমান দুই খণ্ড করিলে সুন্দর একটী গামলা হয়, তাহাতে কিংবা মাটির নির্ম্মিত "চারিতে" প্রত্যেক গরুর পৃথক পৃথক ভাবে খাদ্য পানীয় দিলে ঐগুলি পরিষ্কার করা সহজ হয়।

গোশালায় যাহাতে কোনও দুর্গন্ধ না জন্মে তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হইবে। এইজন্য সারের গর্ত্ত কিছু দূর স্থানে হওয়া আবশ্যক। দুগ্ধের কারবার যাহারা করে তাহাদের গোশালায় সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতা অবলম্বন না করিলে রোগবীজাণু সকল দুগ্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষয়কাশ, বসন্ত, ওলাউঠা, টাইফয়েড, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সকল মনুষ্যের মধ্যেও সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গরু ঘাস না খাইলে কিম্বা জাবর না কাটিলে তাহার কোনও প্রকার পীড়া হইয়াছে বুঝিয়া তাহাকে গোশালা হইতে স্বতন্ত্র স্থানে পৃথক ঘরে রাখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবে।

(ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ

ব্রণ

১৪। ব্রণ হইবার সময় ধুতুরা পাতার বোঁটা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে ব্রণ ভাল হয়।

বেদনা

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, হঠাৎ সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার হাঁটুতে ভয়ানক আঘাত লাগে। বহু ঔষধ ব্যবহারে উহা আরোগ্য হয় না, পরে একজন কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া উহার শাঁস গরম গরম বেদনা স্থলে প্রলেপ দিয়া তদুপরি কিঞ্চিৎ লবণ ছড়াইয়া দেন। প্রথম প্রলেপেই প্রায় বার আনা ব্যথা আরোগ্য হয়; এইভাবে তিনবার প্রলেপ দেওয়ায় ব্যথা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একটী বালক গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া মণিবন্ধের হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তেঁতুল পোড়ার প্রলেপে তাহার ভগ্নাস্থি জোড়া লাগিয়া যায় এবং ব্যথাও আরোগ্য হয়। তেঁতুল পোড়ার প্রলেপের উপর লবণ না ছড়াইয়া যদি উক্ত শাঁষের সহিত একটু সোরা মিশাইয়া দেওয়া যায় তবে আরও ভাল হয়। বহু প্রকার ব্যথায় ইহার ব্যবহার করা যায়।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়

প্রত্যহ প্রাতে তিনটী নিমের পাতা ও একটি ছোট আমলকী একত্রে চিবাইয়া খাইলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। তাজা আমলকী না পাইলে শুষ্ক আমলকী ভিজাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

কলেরা

৩টা গোলমরিচ পিষিয়া এক তোলা আপাং-এর শিকড়ের রসের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে কলেরা আরোগ্য হয়। ফলতঃ অপামার্গ মূল বিভিন্ন অনুপানে ব্যবহার করিয়া অনেকেই কলেরা ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন।

শুক্রমেহ

একটী আপাংএর শিকড় পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া লইয়া চিবাইয়া উহার রস পান করতঃ ছিবড়া ফেলিয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস বাসি ঠাণ্ডা জল পান করিবে। এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে শুক্র মেহ আরোগ্য হইবে।

রক্ত পিত্ত

বাসক পাতার রস কিঞ্চিৎ মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে বেগবান্ রক্ত পিত্ত নিবৃত্ত পায়।

বাসক পাতার রসে হরীতকীচূর্ণ-মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিবে। এইরূপে ৭ বার করাইলে ঐ হরীতকীচূর্ণ অর্দ্ধ আনা পরিমাণ মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

কাঠমল্লিকার মূল ১/॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত রোধ হয়।

খুনখারাপী (শোণিত স্তম্ভন) চূণ ৵০ আনা পরিমাণ দুর্ব্বার রসের সহিত সেবন করিলে রক্ত উঠা নিবারণ হয়।

বাত

আকন্দ পাতার রসে নিমপাতা ও শ্বেত কুচের শিকড় বাটিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে।

আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ডালিমদানা বাটিয়া উষ্ণ করতঃ দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হইবে।

বাত আশ্রিত স্থানে জয়ন্তী পাতার রুটী করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে উপকার দর্শে।

সজিনার ছাল, মুসব্বার, সোঁদাল পাতা ও রশুন সমভাগে বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে বাত বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

জ্বর

২ রতি তুতে চূর্ণ চিরতার জল সহ দিবসে ২ বার সেবন করিলে পালা জ্বর নষ্ট হয়।

জ্বর আসিবার পূর্ব্বে আতস পাতার রস নস্য করিলে জ্বর বন্ধ হয়।

ক্ষেত পাপড়া, গুলঞ্চ ও শিউলিপাতা একত্রে মিশাইয়া ২ তোলা অর্দ্ধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে জ্বর নষ্ট হয়।

শাস্ত্রীয় ঔষধ ;—বিষম জ্বরান্তক লৌহ ও (পুটপক্ব) বিষম জ্বরান্তক লৌহ পুরাতন জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ব্যাধিতে মহোপকারী। রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এবং রক্তাল্পতা ঘটিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। জীর্ণ, জটিল এবং বহু উপদ্রবযুক্ত পুরাতন জ্বরে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। ইহা বল এবং রক্ত বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়।

জয় মঙ্গল রস, পুরাতন জ্বর এবং মজ্জাগত জ্বরে জয় মঙ্গল রস মহৌষধ। নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহারেও যে জ্বর দূর হয় নাই জয় মঙ্গল রস সেবনে সেরূপ জ্বরও আরোগ্য হয়।

বৃহৎ সর্ব্ব জ্বর হর লৌহ ;—ইহা সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বরের ও ধাতুগত জ্বরের অমোঘ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্বরের সহিত প্লীহা, কামলা ও শ্বাস কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলেও ইহা সেবনে উপকার হয়।

অতিসার

আমড়ার ছাল ও ক্ষুদে নটের মূল উত্তমরূপে দধির সহিত পেষণ করিয়া ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে প্রবল অতিসার নষ্ট হয়।

কচি বেল পোড়া ১ তোলা, তিল বাটা ১ তোলা, দধির সর ১ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার ও গ্রহণী, আরোগ্য হয়।

মাজা তিল ।০ আনা ওজনে ছাগদুগ্ধের সহিত বাটীয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয়।

বটের ঝুরি চালুনীর জল দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার ও তজ্জনিত বেদনার উপশম হয়।

শাস্ত্রীয় ঔষধ—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—অতিসার ও আমাশয় রোগে অতিশয় উপকারী। ইহা পাচক ও ধারক। কঠিন রোগেও ইহার ফল পাওয়া যায়।

মহা গন্ধক—বালকগণের উদারময়ের মহৌষধ। দীর্ঘকালযাপ্য জটিল উদরাময় রোগও এই ঔষধ সেবনে সত্বর উপশমিত হয়।

মহারাজ নৃপতি বল্লভ। গ্রহণী রোগের নানা অবস্থায় বিশেষতঃ আমানুবন্ধ গ্রহণীতে বিশেষ ফলপ্রদ। পেট কামড়ানি, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, নিয়মিত বাহ্যে না হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত গ্রহণী রোগও ইহা সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্বর্ণ পর্প টী গ্রহণী রোগে বিশেষ উপকারী। দীর্ঘকাল গত শোত সংযুক্ত গ্রহণীতেও ইহার ফল অভাবনীয়।

অম্লশূল

শঙ্খ ভস্ম লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে শূল বেদনা নিবৃত্তি হয়।

শুঠ চূর্ণ ২ তোলা, ও তিল ৮ তোলা দ্বারা পরিমিত দুগ্ধে পায়স প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যহ ১ তোলা পরিমাণ সেবন করিলে সত্বর পরিণাম শূল নিবারণ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় ঔষধ, ধাত্রী লৌহ অম্লপিত্ত ও শূল রোগের অব্যর্থ ঔষধ। অনোগ, ওড্ডদ্ধগ, অম্লপিত্ত এবং তদুপসর্গের বিশেষ মহৌষধ। গলা জ্বালা, বুক জ্বালা, পেট ভার হইয়া থাকা, অম্লজনিত উদ্গার, বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ইহা সেবনে নিরাময় হয়।

মহাশঙ্খ বটী—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ। অতিসার এবং বিসূচিকা রোগের বিভিন্ন অবস্থায়. এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্প

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় সিমেণ্টশিল্প খুব দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে চলিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে সমগ্র ভারতে ৬লক্ষ টনের উপর সিমেণ্ট কাটতি হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে এই কাটতির পরিমাণ বাড়িয়া সাড়ে তের লক্ষ টনের উপর উঠিয়াছে; বিদেশী সিমেণ্টের আমদানীও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে ৪০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা মূল্যের ৮৭৮১৭ টন সিমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ১৯৩৭ ৩৮ সালে এই আমদানীর পরিমাণ কমিয়া ১২লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা মূল্যের ৩১৯২৩টনে নামিয়াছে। রক্ষণ শুল্কের সাহায্য দ্বারা ভারতীয় অনেক শিল্পেরই উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র সিমেণ্ট শিল্পে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অপূর্ব্ব গঠনক্ষমতার ফলে এবং শিল্প ব্যবসায়ীদের কর্ম্মকুশলতায় রক্ষণ শুল্কের সুযোগ না পাওয়া সত্বেও ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা বিদেশীয় কোম্পানীর প্রতি-যোগিতাকে যেমন পরাজিত করিয়াছে, এমন আর কেহ করিতে পারে নাই। বিদেশী সিমেণ্টের আমদানী যে কত কমিয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এখন বিদেশ হইতে কেবল মাত্র বিশেষ রকমের সিমেণ্ট অতি সামান্য পরিমাণে আমদানী হয়।

ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্পে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটী টাকা। কারখানাগুলিকে মোটামুটী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—প্রথমতঃ য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ লিমিটেডের অন্তর্ভুক্ত কারখানা, দ্বিতীয়তঃ ডালমিয়া সিমেণ্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কারখানা, তৃতীয়তঃ অন্যান্য কয়েকটী ছোট খাট কারখানা। য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর কথা পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে স্যার এফ্ ই দীনসার চেষ্টায় ইহা গঠিত হয়। প্রথমে ১০টী কোম্পানী ইহাতে যোগদান করে। শোনভ্যালী পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট কোম্পানী ইহার সহিত মিলিত হয় নাই, কিন্তু ইহার নিয়ম প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। য়্যাসোসিয়েড সিমেণ্ট কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত কারখানা সমূহে প্রতি বৎসর মোট ১৫লক্ষ ৩৫ হাজার টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। সম্প্রতি বেজওয়াদা এবং পাতিয়ালাতে আরও দুইটী কারখানা ইহার অধীনে স্থাপিত হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যদি ৩।৪ মাসের মধ্যে এই দুইটী কারখানাতে কাজ চলিতে থাকে, তবে য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১৭

লক্ষ ৫ হাজার টনে উঠিবে। মহীশূর সিমেণ্ট কোম্পানীর সহিতও য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর একটা চুক্তি হইয়াছে। ডালমিয়া গ্রুপের কারখানার সিমেণ্ট যখন বাজারে কম দামে বিক্রয় হইতে লাগিল, তখন য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীও দাম কমাইতে বাধ্য হইলেন। এই কমতির পরিমাণ প্রতি টনে প্রায় ১০টাকা দাঁড়ায়।

ডালমিয়া সিমেণ্ট গ্রুপ প্রথমতঃ কলিকাতা অঞ্চলে ৩৫ টাকা টন দরে সিমেণ্ট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তখন প্রতিযোগিতায় পড়িয়া য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী দাম কমাইয়া ৩৮ টাকা টন দরে মাল বিক্রয় করিতে থাকেন। তারপর ডালমিয়া সিমেণ্ট গ্রুপ আরও দাম কমাইয়া প্রতি টন ৩০ টাকায় নামেন। ইহাতে য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীও প্রতি টন ৩০ টাকায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। করাচী অঞ্চলে সিমেণ্টের দর কমিয়া প্রতিটন ২০ টাকায় নামিয়াছে। সেখানে শুষ্ক পদ্ধতিতে (Dry process) সিমেণ্ট তৈয়ারী হয়। সেইজন্যই উৎপাদন খরচা খুব অল্প। করাচীর কারখানাতে প্রতিদিন ৫০টন সিমেণ্ট তৈয়ারী হইতে পারে। এত প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও য়্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর কারবার ক্ষতিজনক হয় নাই। ১৯৩৮ সালের জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় কোম্পানীর নীট লাভ হইয়াছে ১১০০২৯৬৬ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই লাভের পরিমাণ ছিল, ৯২৮৮৬৯৭ টাকা। কোম্পানীর অংশীদারগণ প্রতি সেয়ারে ৫ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ড পাইযাছেন। পূর্ব্ব বৎসরে প্রতি সেয়ারে ৭।।০ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

ডালমিয়া সিমেণ্ট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হইলেন,—বিখ্যাত ধনকুবের এবং ব্যবসায়ী সম্রাট রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। ইহার অন্তর্ভুক্ত কারখানা সমূহে বার্ষিক ৮লক্ষ টন সিমেণ্ট তৈয়ারী করিবার সাজ সরঞ্জাম রহিয়াছে। রোটাস ইনডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের কারখানা ভারতে সিমেণ্ট কারখানার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ডালমিয়া সিমেণ্ট গ্রুপের ইহাই প্রধান। ইহাদের করাচীর কারখানা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ড্যাণ্ডট্‌ ও ত্রিচীনপল্লীর কারখানায় কলকব্জা বসান হইতেছে। ঝিন্দষ্টেটের ডালমিয়াদাদ্রি নামক স্থানে (দিল্লী হইতে ৬০ মাইল দূরে) আর একটী কারখানা খুলিবার আয়োজন চলিতেছে। এই কারখানায় বার্ষিক ৯০ হাজার টন সিমেণ্ট তৈয়ারী হইবে। ডালমিয়া কোম্পানী ঝিন্দরাজ্যে সিমেণ্ট তৈয়ারী করিবার একচেটিয়া অধিকার পাইয়াছেন। দিল্লী, যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাবের দক্ষিণ এবং পূর্ব্বাঞ্চল, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের বাজার এই কারখানার সিমেণ্টে দখল করিবে, ইহা একেবারে সুনিশ্চিত।

অন্যান্য ছোট-খাট কোম্পানীর মধ্যে অন্ধ্র সিমেণ্ট কোম্পানী, আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোম্পানী, এবং কল্যাণপুর সিমেণ্ট য়্যাণ্ড লাইম ওয়ার্কস্, এই কয়েকটী প্রধান। ইহাদের কাজ এখনও ভালরূপে আরম্ভ হয় নাই। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোম্পানী জার্ম্মাণীতে (ডেস্যু,-Dessan) মেসার্স ও পলিসিয়াস্ এ জি কোম্পানীর কার্য্যে কলকব্জার অর্ডার দিয়াছেন, তাহাতে দৈনিক ২৫০ টন সিমেণ্ট উৎপাদন
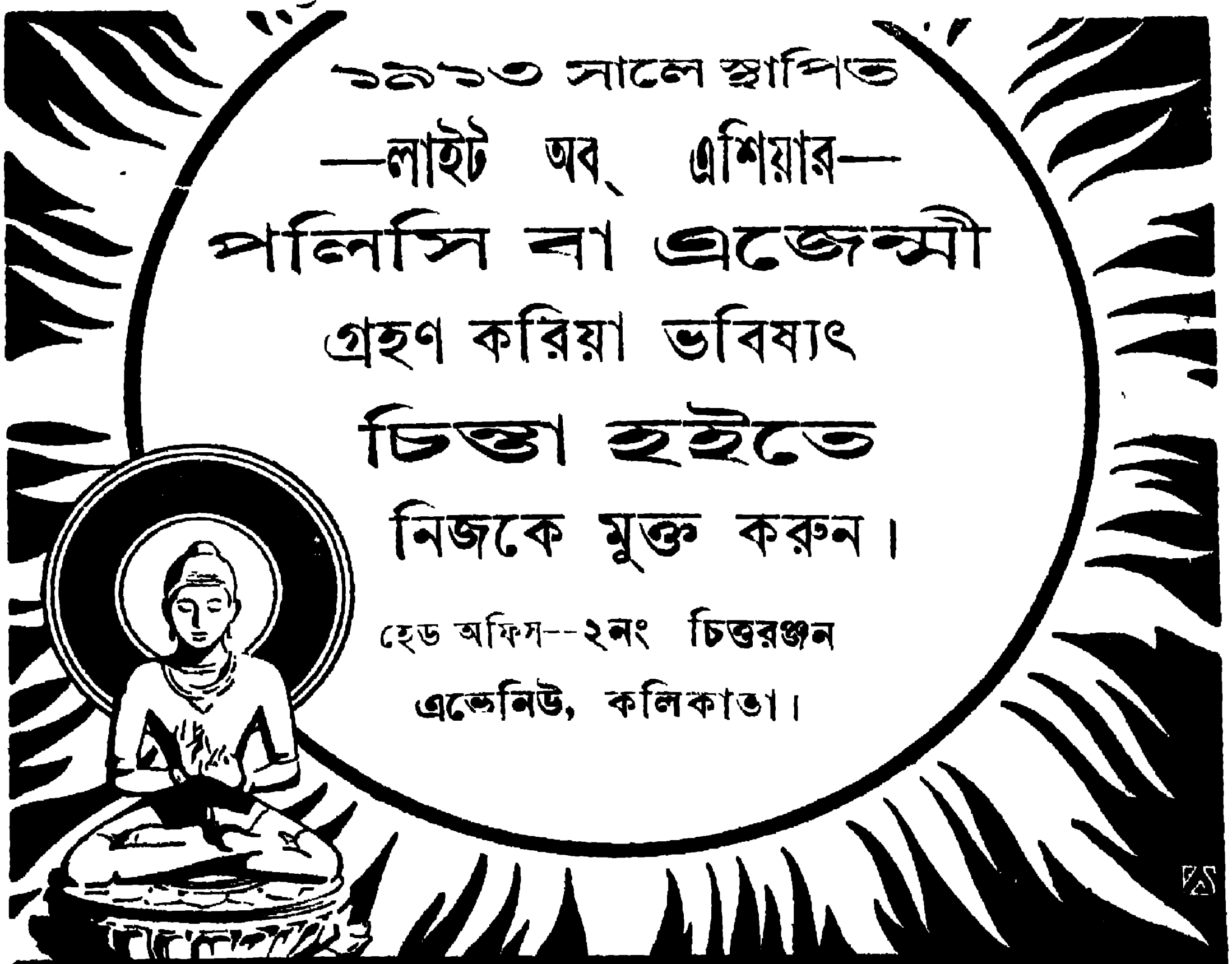
হইতে পারে। ১৯৩৮ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে এই কোম্পানী কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়াছেন। ইহার ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স ইষ্টার্ণ করপোরেশন লিমিটেডের সহিত আসাম গবর্ণমেণ্টের এই চুক্তি হইয়াছে যে, ইস্যু-করা শেয়ারের পাঁচভাগের একভাগ খাঁটী আসাম প্রদেশ-বাসীদের মধ্যে বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে খাঁটী আসাম প্রদেশবাসী লোকেরা ঐ কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে উৎসুক নহে। এক্ষণে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ঐ সব শেয়ার আসামের বাহিরে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি, বাংলাদেশে এই কোম্পানীর শেয়ার প্রচুর বিক্রয় হইবে। ১৯৩৯সালের শেষ ভাগে ইহার কারখানাতে কলকব্জা বসান শেষ হইবে, এইরূপ অনুমান হয়।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ১৯৩৯সালে ভারতের সিমেণ্ট কারখানা সমূহে ২১৷৷লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদনের সাজ সরঞ্জাম আছে। কিন্তু সকল কারখানাতেই সারাবৎসর সমান ভাবে কাজ চলিবে না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, বর্ত্তমান বৎসরে মোট উৎপাদন ১৭লক্ষ টনের কম হইবে না।

ফরমুলা ও রিচিপি

ফায়ার প্রুফ পেইন্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী ঃ—

যে সকল দ্রব্য অগ্নির উত্তাপে ব্যবহৃত হয় ;—যেমন কেটলী, কড়াই, হাঁড়ি প্রভৃতি তাহাদের উপর এমন পেইন্ট মাখাইবার প্রয়োজন, যাহা আগুণের তাপে নষ্ট হয় না। এই সকল পেইন্টের উপাদানে কোন প্রকার তৈল-পদার্থ বা চর্বি থাকে না। কেবলমাত্র জলের দ্বারাই উপাদান সমূহকে মিশাইতে হয়। এইরূপ পেইন্ট তৈয়ারী করিবার কয়েকটি ফরমূলা নিম্নে লিখিত হইল ;—

(১) য়্যাসবেষ্টস চূর্ণ

(Powdered asbestos)	৪০ পাউণ্ড
সোডা য়্যালুমিনেট (Aluminate of Soda)	১০ ,,
চূণ (Lime)	১০ ,,
সোডা সিলিকেট (Silicate of Soda)	৩০ ,,

এই সকল দ্রব্যকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া আন্দাজ মত জল দিয়া মিশাইয়া লউন। ইহাকে এইরূপ গাঢ় করিবেন যেন বুরুশ দিয়া মাখাইতে অসুবিধা না হয়। কোন জিনিসে এই পেইন্টের দুই-তিন কোট মাখাইলেই উহা অগ্নি-সহ হয়। এক কোট শুকাইলে আর এক কোট লাগাইবেন। মশলাটী মাখাইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহা শুকাইয়া যায়। প্রয়োজন মত রং করিবার উপাদান মিশাইয়া এই মশলাটীকে ইচ্ছানুরূপ রঙ্গীন করা যাইতে পারে। কিন্তু এই উপাদান-টীতে যেন কোন প্রকার রোজীন (Rosin) না থাকে। এই মশলা কাঠের জিনিসে লাগাইলে উহা আর আগুনে নষ্ট হয় না। পাকা বাড়ী ও ইমারৎ আদির ভিতরে বাহিরে এই মশলা মাখান থাকিলে উহা আগুনে পুড়িয়া নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

(২) কাচ চূর্ণ (খুব মিহি)	৪০ পাউণ্ড
চীনা মাটী চূর্ণ (খুব মিহি)	৪০ ,,
য়্যাসবেষ্টস্ চূর্ণ (ঐ)	৪০ ,,
পাথুরে চুন (Quick lime)	২০ ,,
সোডা সিলিকেট (Silicate of Soda)	৬০ ,,

প্রথমতঃ কাচ, চীনামাটী, য়্যাসবেষ্টস ও চুণ এই চারিটী উপাদানকে খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লউন। তৎপর ঐ চূর্ণগুলিকে সোডা সিলিকেট ও জলের সহিত মিশ্রিত করুন এবং বুরুশ দিয়া মাখাইবার যোগ্য হয়, এরূপ গাঢ় করিয়া লউন। কোন জিনিসে এই মশলার দুই

তিন কোট অথবা প্রয়োজন মত চারি-পাঁচ কোট লাগাইলেই উহা অগ্নি সহ হয়।

(৩) যে জিনিসটীকে অগ্নি-সহ করিবার আবশ্যক, তাহাতে প্রথমতঃ তিন কোট ওয়াটার গ্লাস (Water glass) মাখাইবেন। সোডিয়াম সিলিকেটেরই আর এক নাম ওয়াটার গ্লাস। এই তিন কোট শুকাইয়া গেলে তাহার উপর আর এক কোট খড়ি-যুক্ত বা হোয়াইটিং মিশান ঘন ওয়াটার গ্লাস লাগাইয়া দিবেন। এইরূপ করিলে পর দেখিবেন জিনিসটী এমন অগ্নি-সহ হইয়াছে যে, সামান্য আগুণে আর পোড়েনা। তবে বহুক্ষণ যাবৎ প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় ধরিলে উহা নষ্ট হইতে পারে।

(৫) জিঙ্ক হোয়াইট

(Zinc White)	৭০	পাউণ্ড
বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের ক্রিয়ায় গুঁড়ায় পরিণত চুণ (air slaked lime)	৩৯	,,
হোইট লেড (White lead	৫০	,,
জিঙ্ক সালফেট (Zinc Sulphate)	১০	,,
সোডা সিলিকেট (Soda Silicate)	৭	গ্যালন

প্রথমতঃ জিঙ্ক হোয়াইট ও চুণ মিশাইয়া খুব মিহি গুঁড়া করুন। তারপর উহার সহিত সোডা সিলিকেট মিশান। অবশেষে হোয়াইট লেড্ এবং জিঙ্ক সালফেট মিশ্রিত করুন। ইহার সহিত প্রয়োজনানুরূপ এবং পছন্দমত রং করিবার উপাদান মিশাইতে পারেন।

(৫) ভিনিসিয়ান রেড

(Venetian Red)	১১২	পাউণ্ড
হোয়াইটিং (Whiting)	৫৬	,,
ব্যারাইটাস্ (Barytes)	১৪০	,,
সোডা সিলিকেট্	৭২	,,
জল	৯	গ্যালন।

এই মশলাটী লাল রং এর হইবে।

(৬) উদ্ভিজ্জ কাল রং (Vegetable Black)

(Vegetable Black)	৪২	পাউণ্ড
খনিজ কাল রং (Mineral Black)	৪২	,,
হোয়াইটিং (Whiting)	৪২	,,
ব্যারাইটাস্ (Barytes)	১৪০	,,
সোডা সিলিকেট্	৭২	,,
জল	৯	গ্যালন

এই মশলাটী কাল রং এর হইবে।

ওয়াটার প্রুফ (Water proof) পেইণ্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী ঃ—

(১) একটী পাত্রে কিছু পাথুরে চুণ রাখিয়া উহাতে জল ছিটাইয়া দিন এবং ঢাকিয়া রাখুন, যেন ভাপ্ বাহির হইয়া না যায়। চুণ গুঁড়া হইয়া গেলে উহাকে মিহি চালুনী দ্বারা চালিয়া লউন। এক্ষণে প্রতি ৬ কোয়ার্ট চুণের সহিত এক কোয়ার্ট সৈন্ধব লবণ (গুঁড়া) এবং এক গ্যালন জল মিশান। ইহাকে ফুটন্ত গরম করিয়া উপরের ময়লা গাদ কাটিয়া ফেলুন,—যেন পরিষ্কার তরল মশলাটী থাকে। ইহার প্রতি ৫ গ্যালনের সহিত ফট্‌কিরি চূর্ণ এক পাউণ্ড, এবং সবুজ কপারেস্ (green copperas) চূর্ণ অর্দ্ধ পাউণ্ড মিশ্রিত করুন। তারপর খুব অল্পে অল্পে পাউণ্ড কষ্টিক পটাস্ (caustic patash) এবং ৪ পাউণ্ড মিহি বালি (sand) উহার সহিত মিশান। খুব ভালরূপ মিশিলে পেইণ্ট তৈয়ারী হইল। বুরুশ দিয়া এই পেইণ্ট লাগাইবেন। শুকাইলে ইহা শ্লেট পাথরের মত শক্ত ও স্থায়ী হয়। ইটের তৈয়ারী পাকা বাড়ীর দেওয়াল অথবা ছাদে মাখাইলে উহাতে আর জল প্রবেশ করিতে পারে না।

(২) দুই কোয়ার্ট জলে এক পাউণ্ড ব্রাউন্ সোপ (Brown Soap) গলাইয়া লউন। তারপর উহার সহিত ৬ কোয়ার্ট (ফুটান) তিসির তৈল এবং এক আউন্স সালফিউরিক য়্যাসিড্ মিশ্রিত করুন। অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া উহাতে ২ কোয়ার্ট তারপিন্ তৈল এবং প্রয়োজন মত রং করিবার উপাদান মিশান। তারপর ছাকিয়া লউন। অধিক গাঢ় হইলে উহাকে তারপিন মিশাইয়া পাত্‌লা করিয়া লইবেন।

(৩) কারবন্ ব্ল্যাক্

(Carbon black)	১০	পাউণ্ড
প্যারিস হোয়াইট (Paris white)	৯০	,,
ব্যারাইটাস (Barytes)	৬০	,,
লিথার্জ্জ (Litharge)	২১	,,
হোয়াইট লেড (White lead)	২১	,,
নরম সাবান (Soft Soap)	১৭	,,
ফুটান তৈল (Boiled oil)	১০	,,
কাঁচা তিসির তৈল	১০	,,
জল	১০০	,,

(৪) জিঙ্ক অক্সাইড

(Zinc Oxide)	১১২ পাউণ্ড
তৈলে পিসাই খাঁটী হোয়াইট লেড (genuine white lead, grounding oil)	১১২ ,,
ব্যারাইটাস (Barytes)	১২২ ,,
প্যারিস হোয়াইট (Paris white)	৩৩৬ ,,
তিসির তৈল	৮৮ ,,
পটাসের নরম সাবান	৫৬ ,,
জল	২৬ গ্যালন

(ওজনে ২৬০ পাউণ্ড)

কোপ্যাল ভার্ণিশ

(Extra pale Copal Varnish ১½ গ্যালন

অনেক জিনিস খোলা অবস্থায় বাহিরে পড়িয়া থাকে। বিভিন্ন ঋতুর জল বায়ুর আক্রমণে উহাদের উপরিভাগ নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ সমস্ত জিনিসটাই একেবারে বিলুপ্ত হয়। এই সকল জিনিসকে রক্ষা করিবার জন্য যে পেইণ্ট মশলা ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্নাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা বাণিজ্যে'র গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব, তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলও থাকিয়া যাইতে পারে।

পত্র লেখকগণের প্রতি
(যাঁহারা গ্রাহক নহেন)

অনেকে আমাদের নিকট ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাঁহারা আমাদের পত্রিকার গ্রাহকও নহেন, অথচ বিনামূল্যে এমন সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন যাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তাঁহাদের মতলব, **"একটি হরিতকিও গুরুদক্ষিণা দিব না,—কিন্তু মন্ত্রটি আদায় করিয়া নিব"।** ব্যবসায়ের সন্ধান দিবার এবং মাল পত্র বেচা কেনা করিবার নিমিত্ত বাজারে "দালাল" নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। তাঁহারা এক একটা মালের জন্য এক এক বারের কেনা বেচায় শ' দু'শ হইতে হাজার বা ততোধিক টাকা দালালী পাইয়া থাকেন। যথার্থ কারবারী লোকেরা যথেষ্ট লাভবান হ'ন বলিয়াই এরূপ উচ্চহারে দালালী দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের সন্ধান জানাইয়া আমরা কাহারও নিকট কোনও রকম দালালী চাহি না। সামান্য

৫।৵০ আনা দিয়া আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হইলেই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেই। কিন্তু যাঁহারা দালালী দিতেও অনিচ্ছুক, অথবা অসমর্থ এবং আমাদিগকেও ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একেবারে ফাঁকিবাজি চলে না। এখানকার নিয়ম,—"ন্যাও,—ন্যাও, ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল।"

আপনি আমাদের নিকট হইতে ফাঁকতালিতে একটি সন্ধান নিয়া লাভের বন্দোবস্ত করিবেন,—অথচ তার জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে একেবারে নারাজ, ঐই প্রকার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে আমরা অক্ষম এবং এইরূপ লোকের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা আমরা প্রকাশ করিতেছি না।

সেজন্য আমাদের অনুরোধ যাঁহারা কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা **আমাদের নিকট কোন ব্যবসায়ীর সন্ধান জানিতে চাহিলে প্রথমতঃ আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।** যাঁহারা আমাদের গ্রাহক নহেন, তাঁহাদিগকে কোন ব্যবসায়ের "সন্ধান-শুলুক" দিয়া আমরা সাহায্য করিতে অক্ষম। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ভদ্রতার খাতিরে এইরূপ অনেক লোককে নানারকম ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীর সন্ধান মুফতে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা গ্রাহক না হইয়াও আমাদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান এবং উপকৃত হইয়াছেন, আর আমরা লাভবান হওয়া ত দূরের কথা, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের পেট ভরাইয়াছি। কিন্তু সহের একটা সীমা আছে! এই জন্য অতঃপর গ্রাহক না হইলে এবং পোষ্টেজ না পাঠাইলে কাহারও পত্রের উত্তর আমরা দিব না।

যাঁহারা গ্রাহক আছেন

আমাদের গ্রাহকদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার মারফতে দিতে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু তাঁহারা অনেকে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, আমরা সম্প্রতি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পৃথকভাবে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদিগকে আফিসে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত লোক রাখিয়া বাজারের খবরাখবর শীঘ্র শীঘ্র যোগাড় করিবার ব্যবস্থাও আমরা করিয়াছি। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি,—**আমাদের যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র শীঘ্র পৃথকভাবে ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রের সহিত ১৲ টাকা ফি আমাদের আফিসে অগ্রিম পাঠাইবেন।** গ্রাহকগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যদি বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তবে এই ফি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ যথারীতি আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদিগের কাগজেই **বিনা মুল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে** প্রদান করিব। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক নম্বর পাঠানো চাই।**

১নং পত্র

ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,—

নিবেদন এই,

আমি ম্যাট্রিক পাশ করার পর আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর যাবৎ বে-কার বসিয়া আছি। দরিদ্রতার জন্য আর বেশী পড়াশুনা করিতে পারি নাই। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার আমার উপরই পড়িয়াছে। বিধবা মাতা, ছোট দুইটী ভাই এবং দুইটী ভগ্নী, ইহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে। দেশে জমি জমা অতি সামান্য, নগদ টাকা হাতে বিশেষ কিছু নাই। আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" কোন গ্রাহকের নিকট আমি মধ্যে মধ্যে ঐ পত্রিকা খানি পড়িতে পাই। তাহাতে আমার কোন কারবার করিতে ইচ্ছা হয়। ইতিমধ্যে আমি এখানকার বাজারে একটা তরীতরকারীর দোকান খুলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা ভাল চলিতেছে না; আশঙ্কা হয়, দোকান তুলিয়া দিতে হইবে। এখন কি করিব ভাবিয়া কুল পাইনা। কোনরূপে শ'পাচেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। ইহাদ্বারা কি কারবার করিলে সুবিধা হইবে, আমাকে উপদেশ দিবেন। সহরে আমাদের ছোট একটা বাসা আছে। গ্রামে বাড়ী সংলগ্ন চার বিঘা আন্দাজ জমিতে কিছু চাষ আবাদ হয়। আমি পরিশ্রম করিতে পারি, কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধির দোষে পরিশ্রমের ফলও পাইনা। সেজন্য আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি। ইতি

নিবেদক

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দাস

কুমিল্লা

১নং পত্রের উত্তর

আমরা সাধারণতঃ আমাদের গ্রাহক ব্যতীত আর কাহারও পত্রের উত্তর প্রদান করি না। আপনার পত্রখানি পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের দেশে অনেক যুবক ঠিক এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হন। তাঁহাদের সকলের জন্যই আপনার পত্রের উত্তর লিখিতেছি।

আপনি যে পরামর্শ চাহিয়াছেন, আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকা খানি রীতিমত পাঠ করিলে সেই পরামর্শ চাহিবার আবশ্যকতা হইত না,—আপনার প্রশ্নের উত্তর এবং সমস্যার সমাধান তাহার মধ্যেই পাইতেন। আপনি যে চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরিয়া ব্যবসায়ে মন দিয়াছেন, ইহা খুব ভালই হইয়াছে। কিন্তু জানিবেন,—ব্যবসায়ে তিনটী জিনিস চাই। ধন, জন ও বুদ্ধি। আপনার ধনের মধ্যে আছে পাঁচ শত টাকা। জনের মধ্যে আপনার ছোট দুইটী ভাই আপনাকে কতদূর সাহায্য করিতে পারিবে জানিনা। যাহাদের মূলধন বেশী, তাহারা বেতন দিয়া কর্ম্মচারী রাখিয়া জনের অভাব পূরণ করে। আপনার অল্প টাকা পুঁজি; সুতরাং নিজের আত্মীয় স্বজনকেই সাহায্যকারী রূপে আপনার সঙ্গে রাখিতে হইবে। অল্প পুঁজির ব্যবসা অনেকস্থলে সাহায্যকারী লোকের অভাবেই নষ্ট হয়। নানা-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপব্যবহার এবং পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতি পড়াশুনা করিয়া ব্যবসাবুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিতে হয়। আপনি যে সহরে তরীতরকারীর দোকান চালাইতেছেন, তাহা ভাল চলিতেছেনা কেন, বুঝিতে পারি না। দোকানদারী একটা উত্তম ব্যবসায়। তরীতর-কারীর বদলে যদি অন্য কোন জিনিসের দোকান

ভাল চলিবে বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা ধরিতে পারেন। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে আপনি নিজে তাহা ঠিক করিবেন,—আমরা দূর হইতে তাহা কিরূপে বলিব? কুমিল্লা হইতে কলিকাতায় কয়েকটী জিনিসের চালানী কারবার করিতে পারেন,—তাহাতে খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। তরকারীর মধ্যে কুমিল্লার করলা বিখ্যাত; দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলের হাতীখুরা, সাত চইকা প্রভৃতির কচু, জলডুবার আনারস, পাহাড় অঞ্চলের আমলকী, এসব জিনিস যদি চালান দিতে পারেন, তবে কলিকাতার বাজারে ভাল মূল্যে তাহা বিক্রয় হইবে। কুমিল্লায় তেলের কল নাই। সম্প্রতি সেখানে ইলেকট্রীক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলায় প্রচুর সরিষা, তিল প্রভৃতি জন্মে। আপনি ছোট একটী মোটরের সাহায্যে ঘানি চালাইয়া তৈল প্রস্তুত করিতে পারেন। আমরা জানি, কুমিল্লা সহরে লোকের জীবন যাত্রায় নানা বিষয়ে নূতনত্ব আসিয়াছে। সেখানে এখনও চলা-ফেরার সুবিধার জন্য রিক্‌সা গাড়ীর প্রচলন হয় নাই। আপনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন,—রিক্‌সা গাড়ীর ব্যবসা খুব লাভজনক। অবশ্য গাড়ী-টানিবার জন্য প্রথমতঃ বিদেশী লোক রাখিতে হইবে। তার পর একবার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে দেশী লোকেরাই টানিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের কাগজ এই উনিশবৎসরে পড়িতে চলিল। অতি সামান্য মূলধনে যে সকল কারবার করা যায় এই কয় বৎসরের মধ্যে অন্যূন তাহার **দেড়হাজার** বিবরণ বাহির হইয়াছে। সেগুলি একত্র করিলে একখানি মহাভারত হইয়া পড়ে। আমরা এই পত্রাবলীর

অধ্যায়ে তাহার কোন্‌টার বিবরণ লিখিব বলুন ?—সে সময় কোথায় ? এবং এত ক্লেশ আপনার জন্য করিব কেন ? আপনি কি বছরে পাঁচটী টাকা দিয়া আমাদের গ্রাহক হইয়াছেন ?—আপনি কি সামান্য ২॥০ টাকা দিয়া এক এক বছরের বাঁধাই সেট্‌ কিনিয়াছেন ? নিশ্চয়ই না। যদি কিনিতেন তবে শত সহস্র রকমের অল্প পুঁজির ব্যবসায়ের সন্ধান পাইতেন। লেখাপড়া শেখার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এযাবৎ অন্যূন হাজার টাকা দিয়াছেন, অথচ জীবিকা-র্জ্জনের জন্য আজ চ'খে শর্ষে ফুল দেখিতেছেন। এইবার উদরান্ন সংস্থানের জন্য "ব্যবসা বাণিজ্যের" বাঁধাই সেট অন্ততঃ পাঁচ বছরের খরিদ করিয়া পড়ুন—জীবিকার্জ্জনের শত শত সন্ধান পাইবেন।

২নং পত্র

"ব্যবসা ও বাণিজ্য"

সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

নিবেদন এই,

আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া একটী প্রাইভেট্‌ লিমিটেড্‌ কোম্পানী খুলিয়াছি। ম্যানেজিং এজেন্সী লইয়া কোন একটা বড় রকমের কারবার,—যেমন কটন মিল, সুগার মিল, প্রভৃতি পরিচালনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। মেঘনার পূর্ব্বতীরে ত্রিপুরা নোয়াখালী জেলার মধ্যে কোন মিল স্থাপন করিতে আমরা ইচ্ছা করি। কারণ, এ অঞ্চল হইতে আমরা কিছু অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিব এরূপ ভরসা আছে। কোথায় কিসের মিল্‌ করা লাভজনক হইবে সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাইতে ইচ্ছা করি। আপনি দীর্ঘকাল যাবৎ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছেন,—সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, আপনার নিকট সদুপদেশ পাইব। আমি আজ দুই বৎসর হইল, আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছি। পূর্ব্বকার বাঁধান সেট্‌গুলি আমার লইবার ইচ্ছা। আমাদের কোম্পানী সংক্রান্ত কাজে আমাকে দুই এক মাসের মধ্যেই কলিকাতা যাইতে হইবে, তখন হাতে হাতে ঐ বাঁধান সেট্‌ কয়েক খানি ক্রয় করিব। আশাকরি, আপনি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ

(গ্রাহক নং ৬০১০)

২নং পত্রের উত্তর

আপনারা একটী ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্ম্‌ খুলিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনাদের চেষ্টা সফল হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। বাংলাদেশে লিমিটেড কোম্পানীর অনেক বাধা আছে। আমাদের অনেক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতেছি। একদিকে মূলধনের টানাটানি,—তার উপরে আবার পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি। বাংলাদেশে যৌথ কারবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। আপনারা এ পথের নূতন পথিক বলিয়াই সাবধান করিতেছি।

মেঘনার পূর্ব্বতীরে নোয়াখালী ত্রিপুরার মধ্যে কটন মিল্‌ অথবা সুগার মিলের চেষ্টা করিবেন না। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া তুলা আমদানী করা ব্যয় সাপেক্ষ,—ইক্ষুর চাষ ত্রিপুরায়

ও নোয়াখালীতে প্রচুর নহে, প্রধানতঃ [এই] দুইটী কারণেই সেখানে কাপড়ের কল ও চিনির কল লাভজনক ও সফল হইবে না। স্থানীয় কাঁচামালের দ্বারা যে কারবার চলিতে পারে, তাহা আরম্ভ করাই যুক্তিসঙ্গত। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় যে তুলা জন্মে এবং কলিকাতায় আসে তাহা long stapled বা দীর্ঘতন্তুবিলক্ষণ নহে এবং তাহার strength, texture ও Quality ও সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের উপযোগী নহে। ইহার দ্বারা মোটা গাত্রাবরণ, শতরঞ্চ, কম্বল ইত্যাদি তৈরী হয়। সুতরাং এই পার্ব্বত্য তুলার সম্যক উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রের মিল করা অসম্ভব। সেই হিসাবে আমি আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, আপনারা নারিকেলের ছোবড়ার শিল্প ও তৈল প্রস্তুতের একটী বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠা করুন। চাঁদপুরই মিল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান। এখানে আপনারা খুব অল্পব্যয়ে নোয়াখালী ও বরিশালের নারিকেল এবং ত্রিপুরার সরিসা ও তিল পাইবেন। ইঞ্জিন চালাইবার জন্য আসাম বেঙ্গল রেলের সাহায্যে কয়লা সরবরাহ সহজ হইবে। নারিকেল ছোবড়ার দড়ি, নারিকেল তৈল, সরিষা ও তিলের তৈল এই কয়টী জিনিস তৈয়ারী করিতে পারিলেই আপনাদের কারবার খুব ভালরূপে চলিবে এবং ইহাতে লাভও নিঃসন্দেহ। ইচ্ছা করিলে এই সঙ্গে চাউলের কলও চালাইতে পারেন। চাঁদপুর, রেলপথ ও ষ্টীমার পথের সংযোগ স্থল ; সুতরাং এখানে মাল আমদানী রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা।

আপনি কলিকাতায় আসিলে, এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে আরও কথাবার্ত্তা হইবে।

৩নং পত্র

"ব্যবসা ও বাণিজ্য"
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

নিবেদন এই,

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কয়েকজন কলিকাতার ফল ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। আমি এখানে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কিছু জমি লইয়া পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ ফলের চাষ করিতেছি। পেয়ারা, লিচু, আম, আতা, কুল, জাম,—প্রভৃতি নানা রকম ফল আমি প্রচুর সরবরাহ করিতে পারি। স্থানীয় বাজারে জিনিসের উপযুক্ত মূল্য পাই না, সেই জন্য কলিকাতার বাজারে চালান দিতে ইচ্ছা করি।

ইতি
শ্রী চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
পাটনা

পুনশ্চ;—আমি আপনার পত্রিকার একজন গ্রাহক। কিন্তু আমার গ্রাহক নম্বরটী ভুলিয়া গিয়াছি। আপনাদের লিষ্টি পুস্তকে নিশ্চয়ই আমার নাম পাইবেন।

৩নং পত্রের উত্তর

কলিকাতার দুইটী ফল ব্যবসায়ী ফার্ম্মের নাম নিম্নে লিখিয়া দিলাম ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, আপনার একবার কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজার, কলেজষ্ট্রীট, নিউমার্কেট, জগুবাবুর বাজার এবং অন্যান্য মার্কেটে ফল বিক্রেতাদের সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করা উচিত। কারণ কলিকাতার অনেক ফল ব্যবসায়ীই সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন দিয়া কারবার করে না। তাহাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা কঠিন তাহা-

ছাড়া এখানকার পাইকারী ও খুচরা বাজার দর ভিন্ন ভিন্ন মার্কেটে নিজে যাইয়া সচক্ষে দেখিয়া উহাদের সঙ্গে কথাবর্ত্তা চালাইবার সুবিধা হইবে এবং আপনার লাভালাভ খতাইয়া দেখিতে পারিবেন। তাহাছাড়া termes of business সম্বন্ধে সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আলোচনা না করিলে পরের দ্বারা কিম্বা পত্র দ্বারা এসব হয় না জানিবেন।

অনেক ব্যবসায়ী বেলষ্টেশন হইতে মাল একেবারে বাজারে নিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট দোকানও থাকে না। কোম্পানী দুইটীর নাম এই,—

(১) Farm and Fruit Products LTD, 10, Ezra Street, Calcutta.

(২) Haji Tilla Mohammad & Bros, Sir Stuart Hogg Market, Calcutta.

৪নং পত্র

"ব্যবসা ও বাণিজ্য"

সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

নিবেদন এই,

প্রায় ৬।৭ বৎসর হইল, আমি আই এস্ সি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছি। আর বেশী পড়াশুনা হয় নাই। চাকুরীর চেষ্টায় এতদিন বৃথা ঘুরিলাম। এখন কোন ছোট খাট ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করি। কি রকম কারবারে হাত দিব, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ চাই। আপনার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আমাকে কিছু সাহায্য করিবে আশা করি। ব্যবসা করিতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন। আমার পক্ষে হাজার কিম্বা দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করাও কঠিন। তবে অনেক কষ্টে শত পাঁচেক টাকা যোগাড় করিতে পারি। ইহাতে কিসের কারবার করা যায়, জানাইবেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

বরিশাল।

৪নং পত্রের উত্তর

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে একটু হাতে কলমে শিক্ষা (যাকে ইংরাজীতে বলে Business Training) না থাকিলে প্রথমে কোন কারবারে হাত দিয়া সফলতা লাভ করা যায় না। আপনাকে ঠিক পরামর্শ দেওয়ার পূর্ব্বে আমার জানা দরকার আপনার কিরূপ কাজে প্রবৃত্তি জন্মে এবং বুদ্ধি খেলে। মূলধনই ব্যবসায় একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। আপনি যে ৫০০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহার দ্বারা পানের দোকান, মুদিখানা হইতে আরম্ভ করিয়া চালানী কারবার পর্য্যন্ত নানারকম ব্যবসা করিতে পারেন। কিন্তু ইহার কোন্‌টীতে আপনার বুদ্ধির পরিস্ফূর্ত্তি হয়, তাহা আমি কিরূপে বলিব?—আপনি নিজেই তাহা ভাল বুঝিবেন। সেইজন্য পছন্দের গোলযোগে আমাদের যুবকদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ সাত বৎসর কিম্বা তাহারও অধিক সময় বিফলতায় কাটিয়া যায়। আপনারও সেইরূপ হইতে পারে,—তাহাতে যদি দমিয়া না যান, তবে ব্যবসা আরম্ভ করুন। আপনি বিজ্ঞান পড়িয়াছেন,—বরিশালে আপনার বাড়ী। একটী

নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান আপনাকে দিতেছি। নারিকেলের নানাপ্রকার সুস্বাদু খাবার তৈয়ারী করিয়া, সে-সব সুন্দর টিনের কৌটায় ভরিয়া বিদেশে, অর্থাৎ যে সকল দেশে নারিকেল নাই,—ধরুন যুক্ত প্রদেশে, উত্তর বঙ্গে, বিহার প্রদেশে, পাঞ্জাবে, চালান দিতে পারেন। খাবার জিনিসগুলি এরূপ তৈয়ারী হওয়া দরকার যেন দীর্ঘকালে উহা নষ্ট না হয় এবং টিনের কৌটা খুলিলেই বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়।

তাহাছাড়া এক নম্বর পত্রের উত্তরে যে সকল কথা লিখিয়াছি তাহা পড়িলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।

চৈত্র মাসের কৃষি।
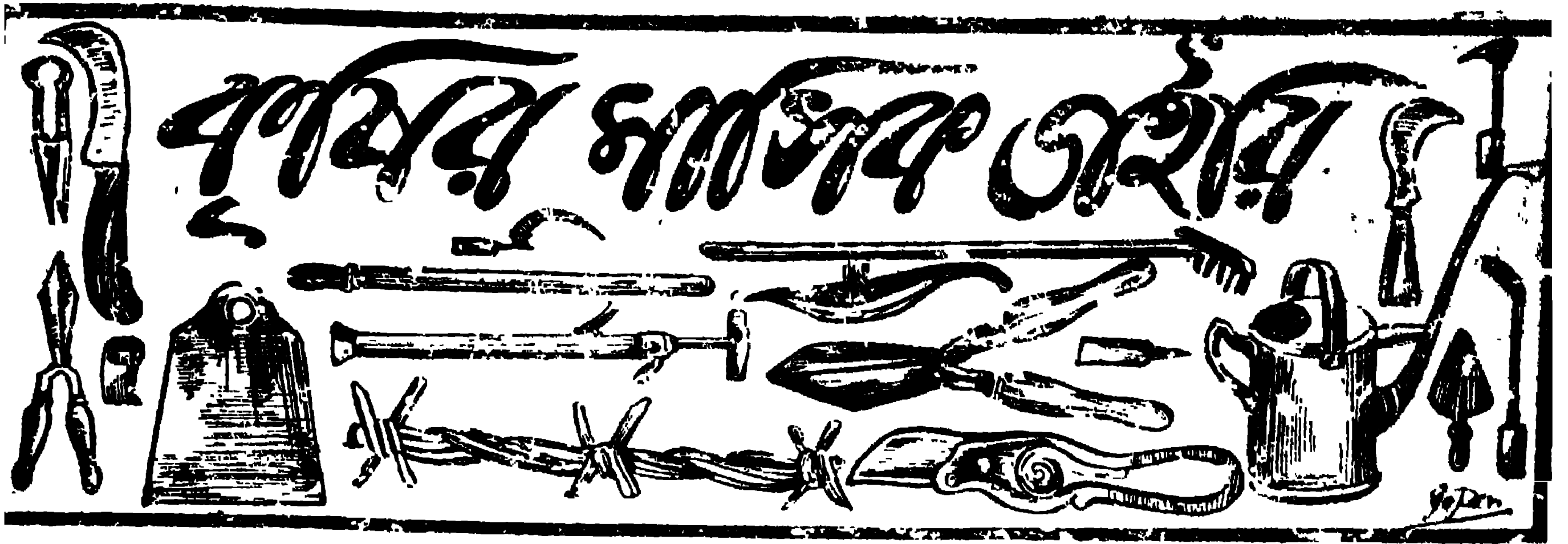
এই সময়ে লাউ কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা ঢে ডশ, স্কোয়াস, বরবটী, চিচিঙ্গা ধুঁদুল প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। উচ্ছে, করলা, কাঁকুড়, ফুটি, তরমুজ ও খরমুজ বীজ এখনও বপন করা চলে; কনকা প্রভৃতি পুঁইশাক এবং কাটোয়ার ডাঁটার বীজ এখন বপন করিতে পারা যায়। আউসে বেগুনের বীজ এ সময় বপন করা আবশ্যক; এ সময়ে শাক আলু, আখের চারা এবং পেঁপে এবং মাসের শেষ দিকে কার্পাস বীজ বপন করা চলে। যব, গম, ছোলা মসুর, খেঁসারী, অড়হর, শরিষা, তিল প্রভৃতি রবিশস্য ফাল্গুন চৈত্র মাসের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া উঠে। ভূট্টা, পাট এবং সবুজ সারের জন্য শণ, ধঞ্চে প্রভৃতির বীজ বপন করা এই সময়ের কার্য্য। আশুধান্যের জন্য জমি এই সময়ে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। মাসের শেষের দিকে আশুধান্যের বীজ বপন করা হয়। এখন হইতেই গরম হাওয়া বহিতে আরম্ভ হয়। গ্রীষ্মের মরশুমী ফুল বীজের জন্য জমির পাট শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক, কোন কোন স্থলে এই মাসের শেষ দিকে ইহা বপন করা হয়।

শীতাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ ফুল ফোটা শেষ হইয়া আইসে। এখন বেল, যুঁই, চামেলী মল্লিকা গন্ধরাজ প্রভৃতি গ্রীষ্মকালিন ফুল ফুটিবার সময় আসিল। যে সমস্ত ফুল গাছ এই সময় পুষ্পিত হয় তাহাদের গোড়ায় রীতিমত জল সেচন করা প্রয়োজন। তরল সার প্রয়োগ করিলে গাছের খুব উপকার হয় এবং প্রচুর ফুল পাওয়া যায়।

আম, জাম, লেবু, লকেট, জামরুল, পীচ প্রভৃতি গাছে এ সময় ছোট ছোট ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। এই সমস্ত গাছে পূর্ব্ব হইতে সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয় ফলের গুটি ধরিবার পর এই সমস্ত গাছে উত্তমরূপে জল দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

ফাল্গুন মাসে বাঁশ ঝাড়ের শুষ্ক গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলা হয় এবং গোড়ায় পতিত শুষ্ক পাতায় অগ্নি সংযোগের প্রথা অনেক স্থলে দেখা যায়! এই সময় বাঁশঝাড়ে পাঁক মাটি প্রয়োগ করিলে গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয় এবং লম্বা ও মোটা হয়। আবার "ফাল্গুনে আগুণ" "চৈতে মাটি" "বাঁশে দিও ধানের চিটা" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিলে অনেক সময়ে সুফল ফলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বাঁশঝাড়ে পাঁক মাটির সহিত ধানের চিটা প্রয়োগের রীতি আছে।

মোরগ ও মুরগী পালন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মুরগীর ঘর

পনেরো কি ২০টীর অনধিক সংখ্যক মুরগীর বাসোপযোগী একটী ঘর ও তাহার চতুর্দ্দিকে বারান্দা থাকিলেই হয়। দক্ষিণ দিকের বারান্দা বড় হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যের স্বাস্থ্যের পক্ষে যেরূপ আলোক, উত্তাপ, শুষ্কঘর, পরিমিত পানীয় জল, শারীরিক পরিশ্রম, ইত্যাদি আবশ্যক, মুরগীর পক্ষেও ঐ সকল জিনিস আবশ্যক। সর্প, বনবিড়াল, নেউল, শৃগাল প্রভৃতি মুরগীর শত্রু। ঘরের জানালা, দরজা, মেজে, বেড়া, ছাদ প্রভৃতি মজবুত ও সতর্কতার সহিত প্রস্তুত করিতে হইবে। ঘরের চারিদিকে জানালা ও একটী দরজা দক্ষিণ দিকে থাকিবে দরজা ও জানালাগুলি লোহার তারের জালের হইবে। মেজে শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকা এবং তাহাতে কোনও গর্ত্ত না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি

মুরগীর ঘর লম্বা ব্যারাকের মত

রাখা আবশ্যক। বৃহদায়োজনে মুরগী পালন করিতে হইলে ঘরের মধ্যে তক্তার মাচা করিয়া দিলে ভাল হয়। মেজের উপর তক্তার মাচা এত উচ্চ করিতে হইবে যে তাহার নিম্নে একজন লোক বসিয়া ময়লা পরিষ্কার করিতে পারে। ঐ মাচা এক দিকে ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে ময়লা হইতে জল সহজে সরিয়া পড়িতে পারে। কাঠের মাচার উপর এক স্তর বালি পুরু করিয়া দিতে হইবে। মুরগী মাচার উপর উঠিবার একটী মই দিতে হইবে। বেড়া হইতে কিছু দূরে বেড়া বরাবর একটী সরু বাঁশের কি কাঠের আড়া দিলে মুরগী তাহার উপর বিশ্রাম করিতে পারে।

শৃগাল, খাটাশ, নেউল, সর্প, বেজী, বিড়াল, ইন্দুর, বাজপক্ষী প্রভৃতি মুরগী ও হাঁসের শত্রু। তজ্জন্য তাহাদের থাকিবার ঘর

এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন তাহার ভিতরে ঐ সকল শত্রু সহজে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাদের বিষ্ঠাদি দৈনিক পরিষ্কার করা যাইতে পারে, এবং ঘরের ভিতর আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে মুরগীর গাত্রে একপ্রকার উকুনবৎ পোকা জন্মিয়া মুরগী মারা যাইতে পারে। ঘরের সমগ্র মেজে ব্যাপিয়া একটী মাচা এরূপ উচ্চ ও দৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে বিষ্ঠাদি নীচে পড়ায় তাহা পরিষ্কার করা যায়, এবং ঐ সকল শত্রুর কোনও-টীই তাহা ভেদ করিয়া মুরগীর খোপে প্রবেশ হইবে না। মুরগীর ও হাঁসের বিষ্ঠায় উত্তম সার হয় এবং তাহা শাকসব্জী ও ফুলের গাছের পক্ষে উত্তম।

মুরগী থাকার জন্য ছোট ছোট খোয়াড় ঘরই ভাল এবং তাহার প্রত্যেকটী ৩।৪ হাত প্রশস্ত ও দীর্ঘ এবং ৫।৬ হাত উচ্চ হইবে; তাহাতে বড় জানালা থাকিবে। তাহার সম্মুখ ভাগে ৫।৬ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট মোটা একটী আড থাকিবে, ঐ আড এরূপ লম্বা হইবে যাহাতে তাহার উপর ৪।৫টী মুরগী ও একটী মোরগ উঠিয়া বসিতে পারে। এক খোয়াড়ে
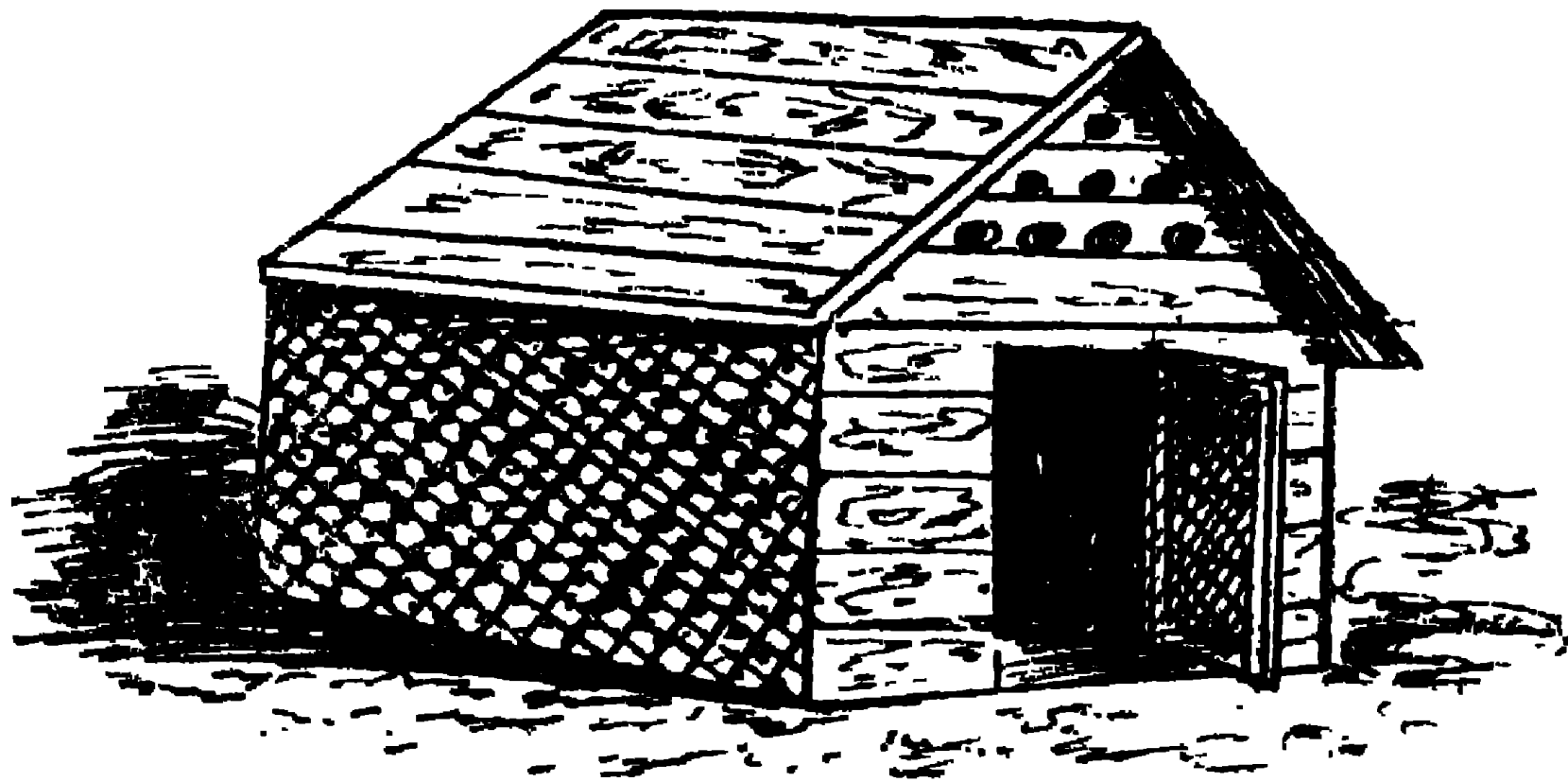
মুরগীর দোচালা ঘর

করিতে না পারে। প্রত্যহ মেজে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ছাই ছিটাইয়া দিবে ও মধ্যে মধ্যে চুণ ছিটাইয়া দিবে। সময়ে সময়ে বেড়া ও মেজে ফেনাইলের জলে ধুইয়া দিবে। এক ভাগ আলকাতরা ও সাত ভাগ কেরোসিন্ তৈল একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা তাহাতে লেপ দিবে। হলুদের জল কিংবা গুঁড়ো, অথবা এক ভাগ ফেনাইলের মধ্যে ১৫ ভাগ ছাই মিশাইয়া ছিটাইয়া দিলে পোকা মরিবে ও ঘরে পোকা উহার অতিরিক্ত মোরগ ও মুরগী রাখা বাঞ্ছনীয় নহে।

আঙ্গিনা

মুরগী ঘরের নিকট একটী আঙ্গিনা থাকা চাই ইহা লোহার তারের জালে চতুর্দ্দিকে ও উপরে ঘেরা থাকা আবশ্যক, উচ্চতা ৪।৫ হাত হইলেই হইবে। এইরূপ ঘেরা আঙ্গিনা করিয়া না দিলে ছানাগুলিকে চীলে ও বাজে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। মুরগীর যত অঙ্গ সঞ্চালন হইবে ততই

সুস্থকায় ও অধিক ডিম্ব প্রসব শক্তি হইবে। আঙ্গিনায় জল না দাঁড়ায় এবং বৃষ্টির জল কর্দ্দম-যুক্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘাসের মধ্যে শস্যাদি খাদ্য ছিটাইয়া দিলে তাহা খাইতে অঙ্গচালনা হইবে। ঘাসশূন্য স্থানে চাষ করিয়া তাহাদের খাদ্য শাকসব্জী, লঙ্কা মরিচ, শরিষা, গম, সূর্য্যমুখী, লেটুস ইত্যাদির আবাদ করিতে হইবে।

চাঁচিয়া তাহার আবর্জ্জনা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়।

ডিম্ব প্রসব স্থান

ঘরের ভিতর এক স্থানে একটী মাটির গামলা (১ হাত পাশে ও অর্দ্ধ হাত উচ্চ) রাখা আবশ্যক তাহাতে দুইটী মুরগী বসিতে পারিবে। অঙ্গার চূর্ণ ও বালি ঐ গামলা মধ্যে রাখিতে হয়। পোকার উপদ্রব নিবারণ জন্য তামাকের ডাঁটা
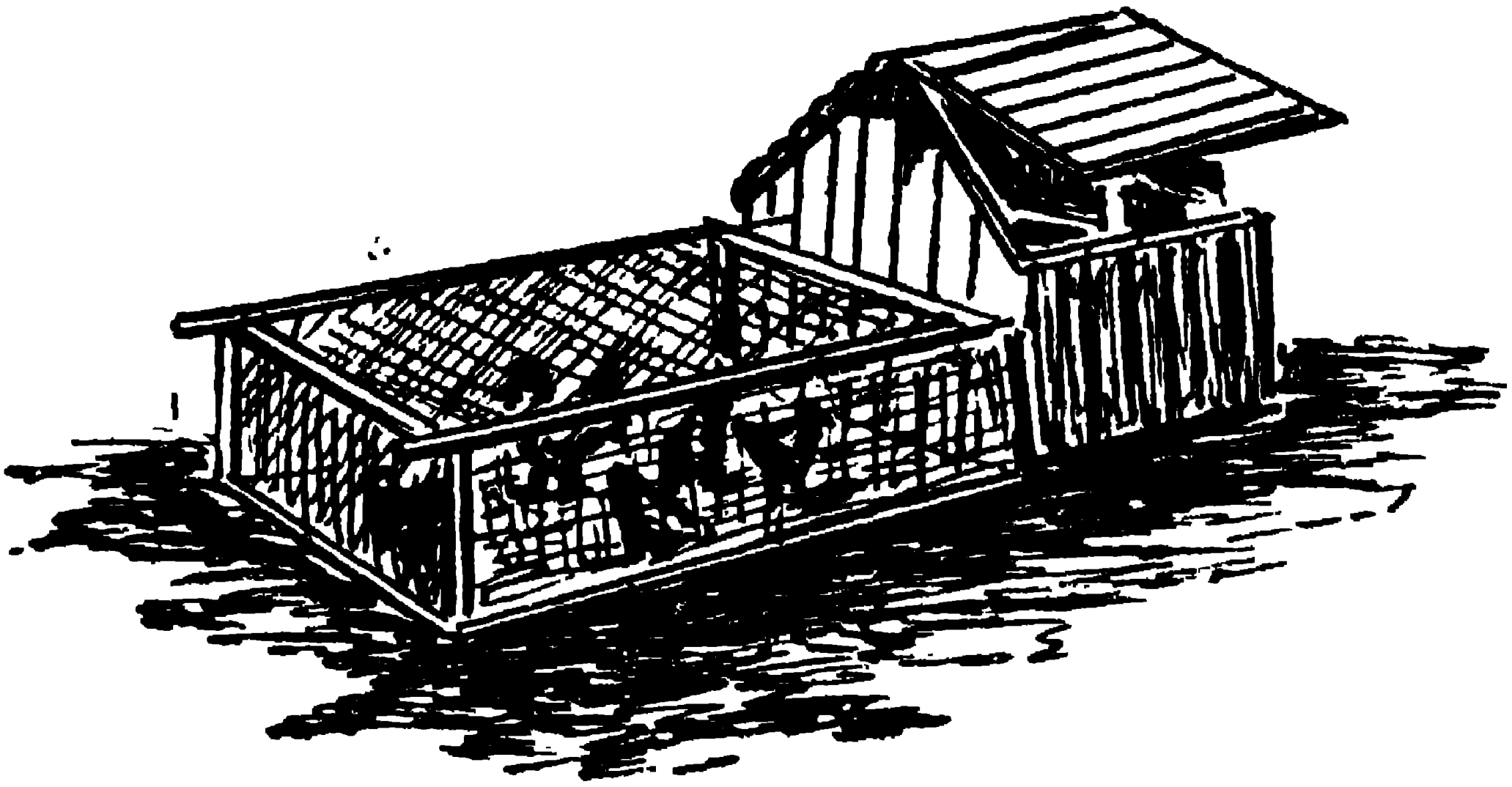
মুরগীর ঘরের সম্মুখে আঙ্গিনা

জলে ভিজিলে মোরগ ও মুরগীর পীড়া হয়, তজ্জন্য বর্ষাকালে মুরগীর ঘরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনার উপর চালা উঠাইয়া দিবে; অন্য কয়েক মাস তাহারা খোলা আঙ্গিনায় চরিয়া, বেড়াইয়া মাটি আঁচড়াইয়া বালু, প্রস্তর, কঙ্কর, পোকা, ইত্যাদি ধরিয়া কি খুটিয়া খাইতে পারে। বিষ্ঠা পড়িয়া আঙ্গিনা অপবিত্র না হয় তজ্জন্য দুই এক দিন অন্তর তাহার উপর ছাই ছিটাইয়া দিবে এবং বৎসরে দুই তিন বার করিয়া তিন চারি অঙ্গুলী পুরু করিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। বৎসরান্তে ঐ আঙ্গিনা

কি হলুদ চূর্ণ ঐ অঙ্গার চূর্ণ ও বালির সঙ্গে মিশাইয়া প্রতি গামলায় চীনা মাটীর শাদা কৃত্রিম ডিম রাখিয়া দিবে।

যে সকল মুরগী ডিমে তা দিতে বসে তাহাদের জন্য সম্মুখ দিকে খোলা আওতা করিয়া দিবে। মুরগীদের ডিমে বসার ঘর, চালা ঢাকা ও খোলা উঠান, দাঁড়ে বা আড়ায় বসার ঘর; ডিম পাড়ার ঘর, সকল গুলিই লোহার সূক্ষ্ম তারের জাল দ্বারা ঘিরিয়া দিবে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শত্রুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

ফাঁদ দরজা। কোন্ মুরগী কতটী ডিম দেয় তাহা জানার জন্য ফাঁদ দরজাযুক্ত দুই প্রকার বিভক্ত বাক্স ব্যবহার করা হয়। ডিম্বপ্রসব কুটুরীতে তাহার তলদেশে এক পার্শে একটী ফাঁদ দরজা (trap door) থাকে। এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া ডিম্ব প্রসব করতঃ অপর ফাঁদ দরজা দিয়া দ্বিতীয় কুঠ্রীতে মুরগী প্রবেশ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকাতে পরে মুরগী পালক এই দ্বিতীয় কুঠ্রীর দরজা খুলিয়া মুরগী বাহির করিয়া দেয়।

ভস্মস্থান। মুরগীর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা জন্মে তাহা নিবারণ জন্য এইরূপ স্থান আবশ্যক। একটী মেটে গামলায় ছাইপূর্ণ করিয়া বারান্দায় রাখিয়া দিতে হইবে।

তাড়িত ও মুরগী

তাড়িত প্রবাহ দ্বারা "আল্ট্রাভায়োলেট্ রেজ" (ultraviolet rays) উৎপাদন করিয়া মুরগীর ছোট বাচ্চাগুলিতে দৈনিক ১০ মিনিট প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময়ে উহারা আকারে বড় ও ওজন দ্বিগুণ হয়। শীতকালে মুরগীর খাঁচায় তাড়িত, আলোক ও উত্তাপ প্রদানে ডিমপ্রসব শতকরা ১৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

লাল মজ্জা

ইহা, মুরগীরছানাকে একদিন পর একদিন এক চামচ যবের জাউ (mashed যবের জাউ) এর সঙ্গে খাওয়াইলে অধিক মোটা ও ওজনে বৃদ্ধি পায় ও অধিক ডিম্বপ্রদান শক্তি জন্মে।

ডিম

মোরগ সংযোগ বিনা, মুরগী আপনা হইতে যে ডিম প্রসব করে তাহাকে "বাওয়া" ডিম (Sterile egg) বলে। মোরগ সংযোগে মুরগীর যে ডিম হইতে ছানা হয় না তাহাকে "কেজো" ডিম বলে। তজ্জন্য এই দুই প্রকার ডিম খাদ্য স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। মোরগ হইতে পৃথক হওয়ার সাপ্তাহিক কাল পরে মুরগীর যে ডিম হয় তাহা প্রায় সব "বাওয়া" হয়। সংযোগের পর ৩ হইতে ৭ দিন মধ্যে যে ডিম হয় তাহা হইতে প্রায়শঃ ছানা হয়। মুরগীর ঘর হইতে দৈনিক দুইবার করিয়া ডিম সংগ্রহ করিবে।

ডিম পরীক্ষা

ডিম পরীক্ষার যন্ত্রে ডিম রাখিয়া, ডিমের ভিতরে যদি মাকড়ের ন্যায় ভাসমান পদার্থ দেখা যায় তাহা হইলে সেই ডিম হইতে ছানা হয়, আর যদি নির্ম্মল জলের ন্যায় দেখা যায় অথবা ঘোলা দেখা যায় তবে তাহাতে বাচ্চা হইবেনা বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মানীর কে-ডি-এফ আন্দোলন

জার্ম্মেনীর সমাজ-জীবন সম্বন্ধে যাঁহারা খোঁজ খবর রাখেন কে-ডি-এফ আন্দোলনের নাম তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। জার্ম্মেনীর বাহিরেও কে-ডি-এফ আন্দোলনের নাম যথেষ্ট ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কে-ডি-এফ এর বিস্তারিত বিবরণ খুব কম লোকেই জানেন। জার্ম্মেনী হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিরাও এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু অনেকেই জানেন না।

Kraft durch freude এই কথা কয়েকটিকেই সংক্ষেপে বলা হয় কে-ডি-এফ। এই জার্ম্মাণ বাক্যটির অর্থ "আনন্দের ভিতর দিয়া শক্তি সঞ্চয়" অথবা strength through joy. জার্ম্মেনীর শ্রমিক জীবনের উন্নতি বিধানই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করণীয় সবই শ্রমিকেরা করিয়া থাকে। এই আন্দোলনে গবর্ণমেণ্ট এবং কারখানার মালিকগণও শ্রমিকদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। কে-ডি-এফ আন্দোলনে শ্রমিক মালিকের মধ্যে বিরোধের স্থান নাই।

Kraft durch freude এর সহায়তায় জার্ম্মেনীর শ্রমিকগণ অতি অল্প ব্যয়ে থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার সুযোগ পায়। ইচ্ছা করিলে স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভের জন্য তাহারা ভর্ত্তি হইতে পারে। যে সকল আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে ধনীদের পক্ষে ভোগ করাই সম্ভব ছিল কে-ডি-এফ এর চেষ্টায় উহা আজ শ্রমিকদের নিকট স্বপ্নের বস্তু নহে। কে-ডি-এফ শ্রমিকদের জন্য যে দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাত্র দুই পাউণ্ড বা তিন পাউণ্ড ব্যয়ে তাহারা বাভেরিয়ার রমণীয় পার্ব্বত্য অঞ্চলে এক সপ্তাহ কাল প্রমোদ ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। এই খরচের মধ্যে তাহাদের যাতায়াতের ট্রেণ ভাড়া এবং খাওয়া থাকার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। প্রায় অনুরূপ ব্যয়ে তাহারা নরওয়ে-সুইডেন কিংবা ভূমধ্য-সাগরে নৌবিহার পর্য্যন্ত করিয়া আসিতে পারে। শ্রমিকদের সমুদ্র-ভ্রমণের জন্য কে-ডি-এফ এর পক্ষ হইতে কয়েকখানি জাহাজ পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। কে-ডি-এফ এর নেতা ডাঃ লে সম্প্রতি নুরেমবুর্গে একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে অতঃপর প্রতি বৎসর শীতকালে জার্ম্মানীর শ্রমিকদের জেনোয়া, নেপলস, ভেনিশ প্যালারমো প্রভৃতি ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে লইয়া যাওয়া হইবে। যাত্রীগণ জাহাজে ভেনিস পর্য্যন্ত যাইয়া ট্রেণে জার্ম্মানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং সেই ট্রেণেই অপর একদল ভেনিসে যাইয়া জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

বিগত বৎসর জার্ম্মানীর প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক কে-ডি-এফ এর সাহায্যে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের

সাহায্য লইয়া পদব্রজে দেশ ভ্রমণ করিয়াছে প্রায় ২০ লক্ষ লোক।

জার্ম্মানীর যে কোন স্থানেই কোন উল্লেখ-যোগ্য দর্শনীয় ব্যাপার ঘটুক না কেন সেখানেই দেখা যাইবে সহস্র সহস্র শ্রমিক স্পেশাল ট্রেণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কে-ডি-এফ এর সহায়তায় প্রত্যেক জায়গায় তাহাদের জন্য খাওয়া থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

বাল্টিক সাগরে রুয়েজেন দ্বীপে kraft durch freude এর জন্য একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইতেছে। সেখানে প্রায় বিশ হাজার শ্রমিকের থাকা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। এই স্বাস্থ্য নিবাসটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে উহা হইবে ইউরোপের একটি স্বাস্থ্য নিকেতন। ইহা ছাড়া কোলবার্গ, পূর্ব্ব প্রাশিয়া এবং কিয়েলের নিকট একটি একটি করিয়া তিনটি স্বাস্থ্য নিবাস ও প্রমোদ নিকেতন তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে। জার্ম্মেনী হইতে রুয়েজেনে যাইয়া সাতদিন থাকিতে যাতায়াত ও খাওয়া থাকার ব্যয় পড়িবে মাথা পিছু ১৮ টাকা।

স্বাস্থ্য-নিবাস ও প্রমোদ নিকেতন তৈয়ারী করা ছাড়া কে-ডি-এফ এর সাহায্যে শ্রমিকদের জন্য নৌবিহার, অশ্বারোহণ টেনিস, হাইকিং প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এগুলি পূর্ব্বে খুবই ব্যয়সাধ্য আমোদ-প্রমোদ ছিল বলিয়া দরিদ্র শ্রমিকগণ ইহাতে যোগদানের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। টেনিস খেলার জন্য কে-ডি-এফ এর পৃথক র‍্যাকেট পর্য্যন্ত তৈয়ারী হয়।

কে-ডি-এফ এর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের জন্য বার্লিনে একটি, মিউনিকে একটি এবং ব্রেসলতে একটি থিয়েটার গৃহ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সমগ্র জার্ম্মানীর থিয়েটার গৃহগুলিতে কে-ডি-এফ এর শ্রমিকদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কে-ডি-এফ এর একটি বৃহৎ অর্কেষ্ট্রা দলও আছে। ইহারা দলে দলে সমগ্র জার্ম্মানীর ফ্যাক্টরীগুলিতে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং শ্রমিকদের খাওয়ার সময় অর্কেষ্ট্রা শুনায়।

এই তো গেল শ্রমিকদের বাইরের আমোদ প্রমোদের কথা। কে-ডি-এফ এর একটি শাখা রহিয়াছে কারখানার ভিতরে শ্রমিকদের কাজ-কর্ম্মের সুব্যবস্থার বিষয় দেখিবার জন্য। এক বৎসর পূর্ব্বে কে-ডি-এফ এর উদ্যোগে কারখানার আলোর সুব্যবস্থার জন্য প্রবল আন্দোলন করা হইয়াছিল। এই আন্দোলনে তাহাদের প্রচারের ধুয়া ছিল, "ভালো আলো ভাল কাজ"।

শিল্পপ্রসঙ্গ

ভারতে মোটর শিল্পের কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার পরিকল্পনা

মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপন ও গাড়ী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান এবং বিশিষ্ট অর্থ-নীতিবিদ্ স্যর এম বিশ্বেশ্বরায়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। এই সকল দেশ ভ্রমণে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন তদনুযায়ী ভারতে একটি মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিয়াছেন। সেই পরিকল্পনার বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

পরিকল্পনায় দেড়কোটি টাকা মূলধন লইয়া বোম্বাইয়ে একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই দেড়কোটি টাকা হইতে ৯০ লক্ষ টাকা কারখানার গৃহাদি, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয় করা হইবে। বাকী ৬০ লক্ষ টাকা কার্য্যকরী মূলধন হিসাবে খাটান হইবে। কারখানার কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রথম দিকে মোটর গাড়ীর বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ম্মাণ করা হইবে এবং ক্রমে কাজ বাড়াইয়া দুই বৎসরের মধ্যে কারখানা মোটরের সমস্ত অংশ নির্ম্মাণে সক্ষম হইবে।

বিশ্বেশ্বরায়া তিন প্রকার মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন—(১) মাঝারী আকারের যাত্রীবাহী গাড়ী (২) ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মালবাহী গাড়ী এবং (৩) বেবী অষ্টিন ও বেবী ফোর্ডের ন্যায় ছোট গাড়ী। এই শেষোক্ত গাড়ীর চাহিদা খুব বেশী।

কারখানার ক্রমোন্নতি কিরূপে বিধান করা হইবে স্যর এম বিশ্বেশ্বরায়া তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথম গাড়ীর বিভিন্ন অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া কারখানায় জোড়া দেওয়ার জন্য কলকব্জা বসান হইবে। দ্বিতীয় বৎসরে মোটরের বিভিন্ন অংশ কার-খানায় প্রস্তুত করিবার কাজ আরম্ভ করা হইবে এবং তৃতীয় বৎসরে মোটরের ইঞ্জিন পর্য্যন্ত খাঁটী ভারতীয় তৈয়ারী জিনিষ হইয়া বাহির হইবে।

মোটরের বিভিন্ন অংশ ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব স্যর এম বিশ্বেশ্বরায়া ইউরোপ ও আমেরিকার প্রচলিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে করিয়াছেন। সেখানে ছোট ছোট কারখানায় গাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলি প্রস্তুত হয়। সেইসব ছোট কারখানা একমাত্র মোটরের বিশেষ অংশ নির্ম্মাণেই বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানায় শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগের অধিক জিনিষ প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন অংশ প্রস্তুতকারক ছোট কারখানাগুলির সহযোগীতায় মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানাগুলি চলে।

স্যর এম বিশ্বেশ্বরায়া মনে করেন যে, ভারতে একবার মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে বিভিন্ন অংশ প্রস্তুতের জন্য ছোট কারখানাগুলি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থলেও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরায়ার প্রস্তাবিত কারখানায় মোটরের সহজ অংশগুলি প্রথম নির্ম্মাণ করা হইবে। পরে আস্তে আস্তে জটিলতর অংশগুলি প্রস্তুতের কাজে হাত দেওয়া হইবে এবং সর্ব্বশেষ তেরী করা হইবে ইঞ্জিন। কারণ দেশে ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে না পারিলে কারখানা স্থাপনের কোন অর্থ হয় না।

চাকা, টায়ার, রেডিয়েটর, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য কারখানায় প্রথম ব্যবস্থা না থাকিলেও চলিতে পারে। এই সব অংশ নির্ম্মাণ করিতে যে ব্যয় পড়িবে যেখানে একমাত্র এই সব জিনিষ তৈয়ারী হয় সেখানেই অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে পাওয়া যাইবে।

বিশ্বেশ্বরায়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নূতন কারখানার কাজের সুবিধার জন্য গাড়ীর মডেল, ডিজাইন এবং বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য যাহাতে পাওয়া যায় তজ্জন্য প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ইংলণ্ড অথবা ইউরোপের কোন দেশের খুব বড় কোন কারখানার সহিত সহযোগিতার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বিশ্বেশ্বরায়ার পরিকল্পিত কারখানায় প্রতি বৎসর দশ হাজার যাত্রীবাহী গাড়ী এবং পাঁচ হাজার ট্রাক্ প্রস্তুত হইতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। আশা করা যায় দেশে গাড়ী তৈয়ারী হইলে নির্ম্মাণ ব্যয় গাড়ী পিছু ২৫০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত কম পড়িবে। এই হিসাবে প্রতি বৎসর কারখানায় ১২ হাজার গাড়ী প্রস্তুত হইলে দেশের ৩০ হইতে ৬০ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে অর্থাৎ মূলধনের উপর শতকরা ২০ হইতে ৪০ টাকা হিসাবে লাভ হইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর আমদানি করে গড়ে ১৯ হাজার মোটর গাড়ী। ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং ভারতের জনসাধারণ যদি ভারতীয় কারখানা হইতে মোটর ক্রয়ের সঙ্কল্প করেন তবে প্রতি বৎসর ন্যূনপক্ষে ১৩ হাজার গাড়ী প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব আদৌ অযৌক্তিক হয় না।

ভারতে প্রস্তুত মোটর গাড়ী দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। এজন্য যত অধিক সংখ্যায়ই গাড়ী তৈয়ারী হউক না কেন ক্রেতার অভাব হইবে না বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রতি গাড়ীর নির্ম্মাণ ব্যয় পড়িবে ১২৫০৲টাকা এবং বাজারে উহা বিক্রয় হইবে ১৮০০ টাকায়। মূল্য কম হইলে যে গাড়ীর ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে

ইউরোপ আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ভারতে প্রতি ১৪২৬ জন লোকের মধ্যে মাত্র একজনের মোটর গাড়ী রহিয়াছে কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচজনে একখানা এবং বৃটেনে প্রতি ২৫ জনে একজনের এক খানা মোটর রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান যুগে মোটর গাড়ী সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। বলদের গাড়ীর যুগে আর ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। মোটর যানের উপকারিতা আজ পল্লীর কৃষক পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে। দেশে মোটর শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে সব দিকেই দ্রুত চলাচলের প্রচলন হইবে এবং পরে ইহা হইতেই এরোপ্লেন প্রস্তুতের পথ প্রশস্ত হইবে।

স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার পরিকল্পনায় বলিয়াছেন যে ভারতে মজুরীর হার খুব কম, লৌহ ও ইস্পাত এবং মোটর গাড়ী নির্ম্মাণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাঁচা মাল খুব সস্তা। বর্ত্তমানে ভারতে ক্রেতাকে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর প্যাকিং, জাহাজের ভাড়া, সমুদ্র বীমা, আমদানী শুল্ক এবং বন্দরের ট্যাক্স প্রভৃতি বাবদ গাড়ী পিছু ১০০০ টাকারও অধিক দিতে হয়। দেশে গাড়ী তৈয়ারী হইলে ক্রেতার এই সকল ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের যে সুযোগ রহিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ নাই।

সম্প্রতি দুনিয়ার বাজারে যে মন্দা পড়িয়াছে তাহার পর হইতে বৃটেন সহ প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টই তদ্দেশীয় অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হইযাছেন এবং শিল্পকারখানার কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারত গভর্ণমেণ্টের অন্ততঃ মোটরের উপর বর্ত্তমান ট্যাক্সকে শিল্প সংরক্ষণ শুল্কে রূপান্তরিত করিতে পারেন। তাহা ছাড়া সৈন্য বিভাগ, রেল বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগে যে মোটর গাড়ী ও ট্রাকের প্রয়োজন হয় দেশীয় কারখানা উহার যতটা সরবরাহ করিতে পারিবে গভর্ণমেণ্টের তাহা ক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ
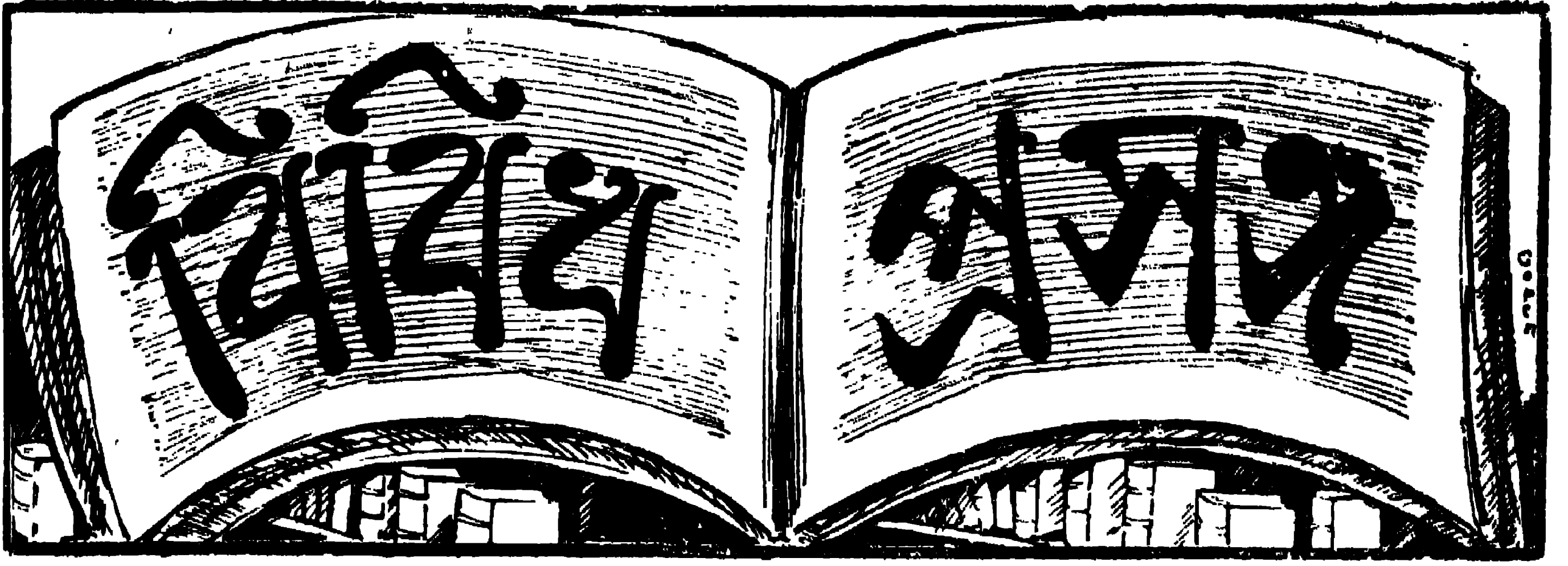
বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা নিবারণের উপায়

সরকারী রিপোর্টে প্রমাণিত হইয়াছে যে সমগ্র পৃথিবীতে যত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে তন্মধ্যে অধিকাংশস্থলেই বিদ্যুত ব্যবহারকারীগণের বাটীতে তাহাদের অজ্ঞতা কিংবা বৈদ্যুতিক তার সংযোগের ত্রুটীর দরুণ হইয়া থাকে।

যদি বৈদ্যুতিক শক্তি অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট বা গ্যাসের ন্যায় গন্ধযুক্ত হইত তাহা হইলে দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে আহত ব্যক্তিগণকে সতর্ক করা যাইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈদ্যুতিক শক্তি দৃষ্ট হয় না অথবা উহার আঘ্রাণ পাওয়া যায় না। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সুইচ বন্ধ করা হইয়াছে—ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে বিদ্যুত পরিচালিত হইতেছে।

সেই হেতু, অজ্ঞতা কিংবা অসাবধানতার দরুণ, দুর্ঘটনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত, নিম্নলিখিত কয়েকটী সাধারণ নিয়ম, আপনার বাটীর প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষতঃ আপনার কর্ম্মচারী কিংবা ভৃত্যগণের জ্ঞাত হওয়া উচিত।

১। বৈদ্যুতিক তার, সরঞ্জাম, পাখা কিংবা বাতি অযথা স্পর্শ করিবেন না।

২। যদ্যপি কোন বৈদ্যুতিক বাতি পরিবর্ত্তন করিতে বা কোন পাখায় তৈল দিতে অথবা কোন তার সংস্কার করিতে হয়, প্রথমে মিটার বোর্ডের নিকট অবস্থিত মেন সুইচ বন্ধ করিয়া দিবেন।

(**দ্রষ্টব্য**)—কেবলমাত্র আপনার ঘরের দেওয়াল সংলগ্ন সুইচ্ বন্ধ করিবেন না। উহাতে মাত্র একটী তারের বিদ্যুত চালনা বন্ধ হয় অন্যান্য তারগুলিতে সমভাবে বিদ্যুত প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সেই নিমিত্ত অন্য তারের দ্বারা আপনি আঘাতপ্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু মেন সুইচ্ বন্ধ করিলে আপনার বাটীর সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তি লোপ পাইবে ও আপনি স্বচ্ছন্দে মেরামত কার্য্য কিংবা সংস্কার কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন।

৩। বহির্ভাগে অবস্থিত তার হইতে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকিবেন এবং তারের সহিত কোন জলসংযুক্ত দ্রব্য বা অনুরূপ কোন দ্রব্যাদি বন্ধন করিবেন না।

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইতেছেন যে, যদি উপরোক্ত ৩টী সাধারণ নিয়ম প্রতিপালিত হয় তাহা

হইলে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা আহত ব্যক্তির সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং আমরা আশা করি যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারকারীগণ তাঁহাদের বাটীতে বৈদ্যুতিক তারগুলি, বিশেষভাবে ফ্লেক্সিবিল তারগুলির উপর মধ্যে মধ্যে সংস্কার করিয়া মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইবার সাহায্য করিবেন। আপনার বাটীর তারগুলি বৎসরে অন্ততঃ একবার, কোন অভিজ্ঞ ইলেক্‌ট্রিক কন্‌ট্রাক্‌টারের দ্বারা পরীক্ষা করাইবেন। তার সংযোগে ত্রুটী থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ঘটনা হইয়া থাকে কারণ যদিও ইহা দেখিতে নিরাপদ কিন্তু ইহাই বাস্তবিক বিপদজনক।

মালোয়ার গো-পশ্বাদি ব্যবসায়

মালোয়া উপত্যকায়, গরু, মহিষাদি পশু বিক্রয়ের ব্যবসা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ছাত্তিসগড়, খান্দেশ বেরার ও নিজাম রাজ্যে মালোয়ার ষাঁড় ও মহিষ বিক্রী হইয়া থাকে। মালোয়ার ষাঁড় প্রধানতঃ ক্ষেত্র চাষের পাকা ও কাঁচা রাস্তায় মাল বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধের জন্য মহিষী বিক্রয় হইয়া থাকে। গরু, মহিষ বিক্রয় বর্ত্তমানে মালোয়ার কৃষকদিগের এক প্রধান লাভজনক ব্যবসায় হইয়াছে। মালোয়ার ষাঁড় যেমন কষ্টসহিষ্ণু, তেমনই কার্য্যক্ষম এবং তাহাদের পালনের ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম।

মালোয়ার পশু বিক্রয় ব্যবসা ক্রমেই বাড়িয়া যাওয়ায় এদিকে কৃষি বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কৃষি বিভাগ গ্রামাঞ্চলে পশু প্রজননের জন্য কতকগুলি বলিষ্ঠ ষাঁড় স্থানে স্থানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ষাঁড় দ্বারা প্রজননের ক্ষতি সম্পর্কে গ্রামবাসীদিগকে উপদেশ দিতেছেন।

এ বিষয়ে মহারাজা সিন্ধিয়া যেরূপ ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন তাহাতে গোয়ালিয়রের জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব দেখা দিয়াছে।

নয়া দিল্লীতে গরু মহিষাদির যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাতে মালোয়ার ষাঁড় গরু বকনা বাছুর ইত্যাদি ভারতের অন্যান্য স্থানের ষাঁড়, গরু অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট গো মহিষাদি পশুর উন্নয়নের জন্য একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কামধেনু গাই

বৈদিক ও পৌরাণিক ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল কামধেনু। এ-বস্তু কল্পলোকের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলে মনে হ'লেও বাস্তবজগতের সংস্পর্শবিহীন নয়, অর্থাৎ নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত কামধেনুর কথাকে নিছক গালগল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া চলেনা। বেদোক্ত সময়ের আশ্রমবাসী ঋষিগণের বা বাণপ্রস্থ অবলম্বনকারী সংসার বিরাগীদের প্রধান আহার ছিল গোদুগ্ধ ও ফলমূল। কথিত আছে যে যথেচ্ছ দুগ্ধ লাভের জন্য প্রত্যেক আশ্রমে একটি করে কামধেনু অবস্থান করতো। অতিথিসেবা ও নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষার অবলম্বন হিসাবে কামধেনু ছিল একমাত্র আশ্রয়স্থল। তারপর কতকাল কেটে গেছে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ব্যাপার এখন ইতিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কামধেনুর কথা বর্ত্তমানে

আর লোকের স্মরণে আসে না, দেখা ত দূরের কথা।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে, কিছুদিন হল ঐরকম একটি কামধেনুর সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল। সমস্তিপুরের তিন মাইল দূরবর্ত্তী জিতোয়ারপুর গ্রামে। মজঃফরপুরের সিভিল ভেটারনারি ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় হচ্ছেন এক্ষেত্রে তথ্যদাতা। তিনি স্বয়ং পরিদর্শন করে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার থেকেই আমরা এই বিবরণ বিবৃত করছি।

১৯২৬ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর পুশা-স্থিত ডেয়ারী ফার্ম্মে এক বাছুর জন্মগ্রহণ করে। বয়স হলে তাকে ষাঁড় দেখানো হয় কিন্তু কোন মতেই তার গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সুতরাং বন্ধ্যা বলে ১৯৩০ সালের ১৬ই নবেম্বর তাকে বিক্রি করে ফেলা হয়। তার নূতন মালিক তাকে বন্ধ্যা বলেই জানতো, অতএব সে যে কোন কালে দুগ্ধধা হবে না এটা তার নিকট সুনিশ্চিত ছিল; কিন্তু তবুও নিছক খেয়াল-কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে সে তাকে দোহন করলে। এতে করে একপ্রকার ময়লা সাদা জলীয় পদার্থ নির্গত হল। মালিক ভাবলে বুঝি বা সে গাভীন হয়েছে, তাই তাকে এমনি রেখে দিলে। কিন্তু ৬।৭ মাস কেটে গেলেও যখন সে প্রসব করলে না তখন মালিক চিন্তিত হয়ে পড়লো। গরুর মোড় তখনও ফোলা, দেখতে ঠিক গর্ভযুক্ত গাভীর মত। যাইহোক মালিক তাকে আবার দোহন করতে সুরু করলে। প্রথম প্রথম ঐ ময়লা সাদা জলীয় পদার্থ নির্গত হল, কিন্তু দিন দশ পনেরো পরে সেটা সাধারণ দুধের রূপ পরিগ্রহ করলে।

সেই থেকেই গরুটিকে দোহন করা চলেছে এবং ঋতু ও আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী সে দৈনিক ২।৷০ সের থেকে ৫ সের দুধ দিয়ে আসছে। তার দুধের স্বাদ সাধারণ গরুর দুধের স্বাদের মত; ঐ দুধে সাধারণ গরুর দুধের সকল পদার্থ বর্ত্তমান। নিম্নে উহার দুগ্ধের বিশ্লেষণ দেওয়া গেল :—

মোট সলিড পদার্থের ভাগ—শতকরা ১৪·৩৩
ফ্যাট— „ ৫
স্পেসিফিক্ গ্রাভেটি— ১·০৩১

উক্ত গাভীন মাতা পাঁচটি সন্তানকে জন্ম দিয়েছিল কিন্তু তাদের কেউ বা তার পূর্ব্ব পুরুষের কেউ বন্ধ্যা ছিল না। উক্ত গাভীকে সাধারণ মণ্টগোমারী গাভী থেকে পৃথক বলে চেনা যায় না কিংবা বন্ধ্যা বলে মোটেই মনে হয় না।

বাঙ্গালীর জাহাজের ব্যবসা :—

বাংলাদেশ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। বোম্বাইর উপকূলে বিশেষ কোন নদীমুখ নাই,—মাদ্রাজ উপকূল অগভীর। কিন্তু বাংলার উপকূলে বহুসংখ্যক খাড়ি ও নদীমুখ রহিয়াছে। এই হিসাবে বাংলার উপকূল শ্রেষ্ঠ এবং জাহাজ চলাচলের উপযোগী। বাংলাদেশের অভ্যন্তরও নদীবহুল। নোয়াখালী, সন্দীপ, হাতিয়া, সাহাবাজপুর, প্রভৃতি স্থানের লোকেরা এক সময়ে নৌ-চালন বিদ্যায় সুনিপুণ ছিল। তুরস্কের সুলতানের নিমিত্ত এইখানে জাহাজ তৈয়ারী হইত। আজও সেই দেশের অধিবাসীগণ নৌ-বিদ্যা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। খিদিরপুরের ডকে, এবং বিদেশী কোম্পানীর

জাহাজে এখনও নোয়াখালী, বরিশাল, এবং চট্টগ্রামের লোকেরাই কাজ করে। সুতরাং বাংলাদেশের অবস্থান এবং জনবল উভয়ই জাহাজ ব্যবসায়ের অনুকূল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদিকে কেহ মনোযোগ দিতেছেন না। পদ্মা, যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) এবং মেঘনা প্রভৃতি নদী দিয়া বহুসংখ্যক মালবাহী ও যাত্রী ষ্টীমার চলাচল করে। এই সমস্ত ষ্টীমার বিদেশী কোম্পানীর। বাঙ্গালীরা তাহাতে চাকুরী করে,—এই মাত্র। পূজার সময় এবং অন্যান্য ঘটনা উপলক্ষে এই সকল ষ্টীমারে যাত্রীর ভিড় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ভিড়ের দরুণ যাত্রীদের যে অসুবিধা ও দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, তাহাও সকলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন।

গঙ্গাসাগর মেলার সময় দুই একটী স্বদেশীয় জাহাজ কোম্পানী যাত্রীবাহী ষ্টীমারের ব্যবসায় করেন,—কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। বাস্তবিক বাঙ্গালীর জাহাজের ব্যবসায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে স্থায়ীরূপে কারবার খোলা দরকার। আমরা জানি কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ভাগ্যকূলের রায় পরিবারের চেষ্টায় এবং অর্থ সাহায্যে একটী ষ্টীমার কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয় প্রতিযোগিতার দরুণ সেই স্বদেশী কোম্পানী উঠিয়া যায়। সেই বিফলতায়ই কি বাঙ্গালীকে নিরুৎসাহ করিয়াছে? প্রথম অবস্থায় কলিকাতায় স্বদেশী বাস্ কোম্পানীর সহিত ট্রাম কোম্পানীরও এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। ট্রাম কোম্পানী নানা কৌশলে বাস্ কোম্পানীকে দমাইবার চেষ্টা করে,—কিন্তু তার সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া আজ স্বদেশী বাস্ কোম্পানী বিজয় দর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীর জাহাজ কোম্পানী কি আবার সেইরূপ দাঁড়াইতে পারে না?

ইংলণ্ডে ভারতীয় শিল্পের কারখানা ঃ—

ভারতবর্ষে বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা অনেক কলকারখানা স্থাপন করিয়া আমাদের দেশের টাকা লুটিয়া নেয়। আমাদের দেশের লোক ঐ সকল কারখানায় চাকুরী বা মজুরী করে। আমাদের লাভ এই পর্য্যন্ত। মোটা লভ্যাংশ বিদেশীয়েরা পায়। এতদিন এইভাবেই চলিয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এইবার "চাকা ঘুরিয়া যাইতেছে"। স্যার হরিসিং গৌরের নাম সকলেরই নিকট সুপরিচিত। মধ্যপ্রদেশের সগর নামক নগরে তাঁহার জন্ম হয়। আইন ব্যবসায়ে এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। সমাজ সংস্কারক এবং গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার সুযশ আছে। এই ষাট বৎসর বয়সেও তিনি জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। সম্প্রতি তিনি "ইউরেকা" নামক এক প্রকার সেফ্‌টী রেজর (Safety Razor) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা তৈয়ারী করিবার জন্য তিনি ২লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড মূলধন লইয়া ইংলণ্ডের চ্যাথাম নামক স্থানে একটী বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন। সেই কারখানায় প্রতি বৎসর ২ কোটী ৪০ লক্ষ সেফ্‌টী রেজর তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক রেজারের দাম এক গিনি হইবে। এই বৎসরের প্রথম ভাগেই উহা ইংলণ্ডের বাজারে চল্‌তি হইবে।

ভারতে তুলার চাষ ও উৎপাদন

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

তুলার শ্রেণী	আবাদী জমির পরিমাণ,— হাজার একর	সম্ভাবিত ফসলের পরিমাণ হাজার গাঁইট্
ওমরা	৯৯৫৪	১৬৩৯
বেঙ্গল-সিন্ধ্	৩৪৬১	৯১৯
ধুলারা	২১৭৩	৩৫১
বরোচ্	১৪২১	৩৮৬
আমেরিকান্	২৪৩৭	৮৪৩
অন্যান্য রকম	৩৬০৩	৬৫৯

—০—

আসামে ভারতীয় চা-বাগান

১৯৩৭ সালের শেষে আসাম প্রদেশে চা-বাগানের সংখ্যা ছিল মোট ১১১৯টী। তন্মধ্যে ভারতীয় চা-বাগান ছিল ৩৮৫টী। ১৯৩৭ সালে আসামে চা-বাগানের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৮৫ একর। তন্মধ্যে ভারতীয় মালিকদের জমি ছিল ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৩৯ একর। সমস্ত বাগানে মোট ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০১ একর জমিতে চা-এর

আবাদ ছিল এবং উহার মধ্যে ৫৮ হাজার ৫৬০ একর জমি ভারতীয় মালিকদের। এই বৎসরে (১৯৩৭) সমস্ত বাগান হইতে ২৪ কোটী ১৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩১১ পাউণ্ড ব্ল্যাক্ চা এবং ৬৭ হাজার ৩৭২ পাউণ্ড গ্রীন্ চা সংগৃহীত হইয়াছিল।

—০—

বাংলায় চাউলের দর

বাংলাদেশে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং চাউলের মূল্য চড়া থাকিবারই কথা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বাংলার চাউলের দর ক্রমশঃ পড়িয়া যাইতেছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর সস্তা দরের চাউল আমদানীই ইহার কারণ। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স এই মর্ম্মে একটী বিবৃতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বাংলার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য ভারত ও ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটী নূতন বাণিজ্য চুক্তির প্রয়োজন। ইহার জন্য তাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

—০—

ভারতীয় কাপড়ের কলে ভারতীয় তুলার ব্যবহার

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে মোট ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৮৭ গাঁইট দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ঐ দুই মাসে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩২ গাঁইট হইয়াছে। বাংলাদেশের কাপড়ের কলে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ১৫৬২৪ গাঁইট দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হওয়া যদিও বাঞ্ছনীয় কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হয় না। কারণ ভারতীয় তুলা খুব উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ নহে সেইজন্য মিশরীয় ও আমেরিকান তুলার সহিত মিশাইয়া উহা ব্যবহৃত হয়। ইংল্যাণ্ড ও জাপান ভারতীয় তুলা ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু সে কেবল স্বার্থের খাতিরে;—তাহাদের তৈয়ারী মাল ভারতে কাট্তি হইবে, এই আশায়।

—০—

ভারতে স্বর্ণ উৎপাদন

১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে মহীশূর স্বর্ণখনি হইতে ২৭৮৬৬ আউন্স স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ঐ মাসে স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম,—২৭৩৮০ আউন্স। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে ২৭১৭৫ আউন্স স্বর্ণ উৎপাদন হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী মিঃ গোলাম হোসেন সোণাওয়ালা গুজরাটের পঞ্চমহাল জেলায় ৫ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে স্বর্ণের খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পাঁচ বৎসরব্যাপী অনুসন্ধানের ফল। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এইস্থানে ৩০ বৎসর যাবৎ স্বর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত অনুমতি দিয়াছেন। আপাততঃ তিনি প্রত্যহ ২০ টন ওজনের স্বর্ণ-মিশ্রিত বালুকা হইতে স্বর্ণসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছেন।

—০—

ভারতীয় তৈলবীজ ও তৈল

১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে তিসি এবং ৩০ লক্ষ একর জমিতে রাই সরিষার চাষ হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালের সরকারী বরাদ্দ অনুসারে দেখা যায় ৩০ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমিতে তিসি এবং ২৭ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে রাই সরিষার চাষ হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত হইতে ৬৪ লক্ষ টাকা মূল্যের রেড়ী বীজ এবং ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন রেড়ীর তৈল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। এই ব্যবসায় ভারতকে ব্রাজীল, পারাগুয়ে, বলীভিয়া প্রভৃতি (দক্ষিণ আমেরিকার) দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় রেড়ীর একাধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। ভারতের মধ্যে হায়দরাবাদেই (নিজাম রাজ্য) রেড়ীর চাষ ও উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতে উৎপাদিত রেড়ীর এক তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

—০—

ভারতবর্ষ ও আফ্‌গানিস্থান

ভারতবর্ষের পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া তাহার সহিত আফ্‌গানিস্থানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও অনিবার্য্য। সম্প্রতি আফগানিস্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদনের জন্য ৩ কোটী আফগান মুদ্রা মূলধন লইয়া একটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চলে তুলার চাষের উপযুক্ত জমি রহিয়াছে। ইহার জন্য প্রচুর কার্পাস বীজও আমদানী করা হইয়াছে। তুলার চাষের সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের কল স্থাপনের আয়োজন এবং ইহার জন্য ৫ কোটী ১০ লক্ষ আফগান মুদ্রা মূলধন সংগ্রহ করাও হইয়াছে। আফগান গবর্ণমেণ্ট তথাকার শিল্পোন্নতির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে উত্তরাঞ্চলের রৌপ্য, তাম্র, সীসা, কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ব্যবস্থাও আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আফ্‌গান গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় আবদুল মজিদ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বাণিজ্য সংক্রান্ত নানাবিষয়ের কথাবার্ত্তা হয়। ভারতীয় চিনি যাহাতে আফ্‌গানিস্থানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইবার সুবিধা জন্মে, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে। তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ভারতীয় চিনি আফ্‌গানিস্থানের বাজার দখল করিতে পারিবে। সেখানে বাৎসরিক প্রায় ২০ হাজার টন চিনি কাটতি হয়। এখন ঐ চিনি জাভা দ্বীপ ও রুশিয়া হইতে আসে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে অধিক সংখ্যক চিনির কল স্থাপিত হওয়ায় চিনির উৎপাদন পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তি অনুসারে ৫ বৎসর যাবৎ জাহাজে করিয়া চিনি রপ্তানীর কোন সুবিধা নাই। সুতরাং ভারতীয় চিনির কলওয়ালারা আফ্‌গানিস্থানে চিনি রপ্তানীর সুযোগ দেখিতেছেন।

—০—

গবাদি পশুর খাদ্যরূপে কচুরীপানা

কাঁচা অবস্থায় কচুরীপানাতে শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ জল থাকে। শুষ্ক কচুরীপানাতে নাইট্রোজনের পরিমাণ শতকরা ০·৯৭

হইতে ২.৫৭ ভাগ। অন্যান্য কাঁচা পশুখাদ্যেও নাইট্রোজেনের পরিমাণ এইরূপ। শুষ্ক কচুরী-পানাতে নাইট্রোজেন ব্যতীত নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়,—

পটাশ	শতকরা	৫ ভাগ
ক্লোরিণ	”	৩ হইতে ৪ ভাগ
চুণ	”	৩.৫ ভাগ
ম্যাগ্‌নেসিয়া	”	০.৯৬ ভাগ।
ফস্ফেট্	”	০.৩৬ ভাগ।

এই সকল উপাদানের বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে শুষ্ক কচুরীপানাকে নেপিয়ার ও গিনিঘাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। নাইট্রোজেন ও পটাশ প্রভৃতির তুলনায় কচুরীপানাতে ফস্ফেটের অংশ কিছু কম বটে কিন্তু উহাতে সুপাচ্য পুষ্টিকর অংশ গিনিঘাস কিম্বা নেপিয়ার ঘাস অপেক্ষা অধিক এবং আমন ও আউস ধানের খড় অপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে আছে। পটাশ এবং ক্লোরিণ আছে বলিয়াই গবাদি পশুরা কচুরীপ্যনা আগ্রহের সহিত খায় না। বাস্তবিক উহা গবাদি পশুকে অধিক পরিমাণে খাওয়ান উচিত নহে। শুষ্ক কচুরীপানার সহিত আমন ধানের খড় ও তিসির খৈল মিশাইয়া দিলে পশুরা তাহা আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে। এই মিশ্রিত খাদ্য খাইলে উহাদের দেহের পরিপুষ্টি হয়। খৈল না মিশাইয়া গবাদি পশুকে কচুরীপানা খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

পাট সম্বন্ধে তদন্ত কমিটীর নূতন প্রস্তাব

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় পাট তদন্ত কমিটীর সদস্যগণ ময়মনসিংহ গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী, উকীল সভার প্রতিনিধি, পাট ব্যবসায়ী এবং পাটচাষীদের প্রতিনিধি প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পাটচাষীদের প্রতিনিধিগণ বিশেষভাবে বলেন যে, বাধ্যকরী নিয়ম প্রবর্ত্তিত না করিয়া কেবল মাত্র উপদেশ ও প্রচার কার্য্যের দ্বারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ হইবে না। পাট ব্যবসায়ী এবং পাটচাষীদের অনেক প্রতিনিধি পাট বিক্রয়ের সুবিধার জন্য একটী সেলিং সিণ্ডিকেট (Selling syndicate) স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান সময়ে পাটচাষীরা বেশী দিন পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। সেইজন্য তাহারা পাটের ন্যায্য মূল্য পায় না। সমবায় পদ্ধতিতে একটী সেলিং সিণ্ডিকেট্ গঠন করিলে এই অসুবিধা দূর হয়। জনসাধারণের মধ্যে শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা অথবা ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়া ইহার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টকে আসল টাকাও সুদ সম্বন্ধে গ্যারেণ্টী দিতে হইবে।

গত ডিসেম্বর (১৯৩৮) মাসে বাংলা দেশ হইতে মোট ৩লক্ষ ৮৮হাজার ৯৭৬ গাঁইট পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। (১ গাঁইটের ওজন ৫ মণ)। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ৫লক্ষ ৫১ হাজার ২৯গাঁইট এবং ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪লক্ষ ৯৬হাজার ৮৫৪ গাঁইট পাট বাংলা দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায়, রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। বাংলা দেশে ইতিমধ্যে কয়েকটী নূতন চটকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং মনে হয়, বাংলাদেশের পাট বাংলাদেশের চটকলেই কিছু অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে। এদিকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ প্রচার কার্য্যের দ্বারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। তদুপরি বিদেশে পাটের পরিবর্ত্তে অন্যপ্রকার তন্তুর ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়াছে।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা বিহার ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের এই পরামর্শ সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বাংলা গবর্ণমেণ্ট পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাধ্যতামূলক নিয়মের পক্ষপাতী নহেন। এ বিষয়ে তাঁহারা বিহার ও আসাম গবর্ণমেণ্টের মন

রাখিয়া চলিতে ইচ্ছা করেন। বিহার ও আসামে খুব কম জমিতে পাট চাষ হয়। সুতরাং বাধ্যতা মূলক নিয়ন্ত্রণে ঐ দুই প্রদেশের ক্ষতি। কিন্তু বাংলাদেশে আইনের সাহায্যে পাট চাষ না কমাইলে পাটের দর উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এদিকে চটকল সমূহের মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে, তদনুসারে প্রতি সপ্তাহে অন্যূন ৪০ ঘণ্টা এবং অনধিক ৫৪ ঘণ্টা কল চলিবে। যে সব চটকলে তাঁতের সংখ্যা ২২০ অথবা তদপেক্ষা কম, তাহাতে সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ চলিতে পারিবে। এই চুক্তি ৫ বৎসর কাল স্থায়ী। সুতরাং দেখা যায়, অন্ততঃ পাচ বৎসর পর্য্যন্ত বাংলার চটকল সমূহে পাটের চাহিদা বাড়িবে না।

ইটালীতে পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য তন্তু জাতীয় অন্য জিনিস উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। তবে এখন পর্য্যন্ত তথায় ভারত হইতে রপ্তানী পাটের পরিমাণ কমে নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাটের সহিত অন্যপ্রকারের তন্তু মিশ্রিত করিয়া থলে ও চট প্রভৃতি তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় ঐ সকল তন্তু টে্যাকসই নহে।

ভারতবর্ষ হইতে ইংল্যাণ্ডে অধিক পরিমাণে পাটের থলে ও চট রপ্তানী হইতেছে। ইহাতে ডাণ্ডীর চটকলওয়ালাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই রপ্তানী বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা করিতেছেন না কিম্বা ডাণ্ডীর চটকলওয়ালাদের সুবিধার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে হাউস্ অব কমন্স সভায় পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য মিঃ ষ্টুয়ার্ট এক উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছেন।

গত ৩রা জানুয়ারী বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির টেক্নোলজিকেল রিসার্চ লেবরেটরীর উদ্বোধন করিয়াছেন। বিগত দুই বৎসর হইতে সেণ্ট্রাল জুট কমিটি পাট চাষ সম্পর্কে নানারূপ নূতন উপায়ের উদ্ভাবন, পাটের মূল্য ও পাটের বাজার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে কেবল মাত্র আঁশগুলি পাকাইয়া পাটের শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। কিন্তু ইহাই একমাত্র উপায় নহে। এই নব প্রতিষ্ঠিত লেবরেটরীতে উৎকৃষ্ট ধরণের এবং অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে। তাহাতে পাটের সর্ব্বপ্রকার দোষ গুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার সুবিধা আছে।

সেণ্ট্রাল জুট কমিটির এক প্রচার পত্রে জানা গিয়াছে, ইতিমধ্যে তুরস্কের রাজদূত রেলী ব্রাদার্সের নিকট ৪ টন পাটের বীজ সরবরাহ করিবার জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। রেলী ব্রাদার্স রাজদূতকে এই বিষয়ে বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উক্ত প্রচার পত্রে আরও প্রকাশ যে, ব্রাজিল দেশে হিবিস্কাস বাইফারকেটাস নামে এক প্রকার স্বভাবজাত তন্তুজাতীয় গাছ পাওয়া গিয়াছে যাহা পাটের অনুরূপ। বর্ত্তমানে ব্রাজিলে ৯ভাগ ভারতীয় পাট ও ১ ভাগ উপরোক্ত গাছের তন্তু মিশাইয়া যে সব থলে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা পাটের থলে অপেক্ষা নাকি অনেক বেশী মজবুত হইতেছে। কঙ্গো দেশেও বর্ত্তমানে পাট-

জাতীয় সেই প্রকার ফসলের চাষ হইতেছে এবং গত ১৯৩৭ সালে কঙ্গো হইতে এই দুই শ্রেণীর ফসল ২১১৭ টন রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩২ সালে কঙ্গো হইতে এই শ্রেণীর ফসল মাত্র ২৬৮ টন রপ্তানী হইয়াছিল।

কোচীন চীনের গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে নারিকেলের ছোবড়া ও আনারসের আঁশ (sisal) হইতে চাউল ও অন্যান্য মাল রপ্তানী করিবার উপযোগী থলে প্রস্তুত বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন! ঐ দেশের বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই যে ২ লক্ষ পেইষ্টার (১ পেইষ্টার = ১৶৹) মূলধন লইয়া একটি কারখানা স্থাপন করিলে ১ হাজার ১০০ গ্রাম (১ হাজার গ্রাম = ১ সেরের কিছু বেশী) ওজনের থলে ২৫ পেইষ্টার সেণ্ট (১ পেইষ্টার সেণ্ট = পৌণে এক পয়সা) মূল্যে তৈয়ার করা সম্ভবপর হইবে। কলিকাতা হইতে আমদানীকৃত ঐ ওজনের পাটের থলের মূল্য পড়ে বর্ত্তমানে ৩৮ পেইষ্টার সেণ্ট। পরিকল্পিত কারখানাটী স্থাপিত হইলে বৎসরে ১ হাজার ৫০০ টন থলের সূতা প্রস্তুত করা যাইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

প্যালেডিয়াম য়্যাস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৮ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত
১৫ মাসের হিসাব ও রিপোর্ট.

(হিসাবের অঙ্ক হইতে আনা পাই বাদ দেওয়া হইয়াছে)

আয় ব্যয় ঃ—আলোচ্য ১৫ মাস সময়ের মধ্যে আয় হইয়াছে মোট ২১৩০৯ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবতে ২০৪৬৬ টাকা এবং সুদ বাবতে (ইন্‌কম্ ট্যাক্স্ বাদ) ৭৩৮ টাকা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৩০৭৩ টাকা। অন্যান্য আয় হইয়াছে ১০৫ টাকা। ব্যয় হইয়াছে মোট ১৮৭৭৭ টাকা। তন্মধ্যে পরিচালনা খরচ ১৪৩৪৮ টাকা। আসবাব পত্রের মূল্য হ্রাস দরুণ খরচ ধরা হয় ১১২ টাকা এবং ঘাট্‌তি ছাড় দেওয়া হয় ৪৩১৬ টাকা। পরিচালনা খরচের মধ্যে এজেণ্টদের কমিশন ৪৫৪২ টাকা, অফিসের ব্যয় ৩২৬৭ টাকা এবং মেডিক্যাল ফিস্ ২৮৪৮ টাকা,—এই কয়েকটী প্রধান।

জীবন বীমা তহবিল ঃ—সমস্ত খরচ বাদে জীবনবীমা তহবিলে ২৫৩২ টাকা জমা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই তহবিলে ৪৩১৬ টাকা ঘাট্‌তি ছিল।

নূতন কারবার ঃ—আলোচ্য ১৫ মাস সময়ের মধ্যে ৫৪৪৩৯১ টাকা মূল্যের ৫১২টী বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৪২৮৮৯১ টাকা মূল্যের ৪০১টী প্রস্তাব গৃহীত ও তাহাদের উপর পলিসি ইস্যু করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১৮৯১ টাকা মূল্যের ৩২টী বীমার প্রস্তাব ইন্‌ডাষ্ট্রীয়্যাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সম্পত্তি ও দায় ঃ—কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮২৩৭০ টাকা। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট পেপার এবং পোষ্ট্যাল ক্যাস্ সার্টিফিকেটে লগ্নী আছে ৩৬০৫১ টাকা। দায়ের মধ্যে দেখা যায় আদায়ী মূলধন ৬০৯৪১ টাকা। শেয়ারের দরুণ ডিপজিট্ ১০৭০১ টাকা। দুই হাজার শেয়ার ক্রয়ের জন্য

দরখাস্তের সহিত প্রেরিত ৪০০০ টাকা। ঐ দুই হাজার শেয়ার এখনও বণ্টন করা হয় নাই।

বিবিধঃ—কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এবং সেক্রেটারীগণ ইহার পরিচালনা খরচ যথা সম্ভব কমাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই এবারে তাঁহাদের প্রাপ্য ফিস্ ও বেতন গ্রহণ করেন নাই। কোম্পানীর প্রথম চেয়ারম্যান অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কোম্পানী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আমাদের মন্তব্যঃ—প্যালেডিয়াম্ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ উন্নতি দেখাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। এই কোম্পানীর সেক্রেটারী হইলেন, "ওয়ার্কার্স্ করপোরেশন"। তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় এবং স্বার্থত্যাগে, কোম্পানী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে আশা করি।

—০—

মোহিনী মিল

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, শ্রীযুত যতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। গত শ্রমিক ধর্ম্মঘটের পর হইতে এ যাবৎ স্পিনিং মাষ্টার শ্রীযুত মহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী অস্থায়ীভাবে ম্যানেজারের কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে দুই কার্য্য করা গুরুতর শ্রমজনক। বিশেষতঃ দুই নম্বর মোহিনী মিলের নির্ম্মাণ কার্য্য তদারক করিতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বেলঘরিয়ায় আসিতে হয়। মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একজন সুযোগ্য ম্যানেজার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুত যতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার ময়মনসিংহ জেলার পাতুয়াইর গ্রাম নিবাসী। বস্ত্রশিল্পে শ্রীযুত মজুমদারের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে খুব কমই আছেন। বিগত ৩২ বৎসর কাল তিনি মধ্যপ্রদেশ, কালিয়াকট্টু, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক কাপড়ের কলে উইভিং মাষ্টার ও ম্যানেজার পদে অত্যন্ত সুনামের সহিত কাজ করিয়াছেন। তিনি ঐ সব অঞ্চলে বহু কাপড়ের কলে উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন। বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কলমালিকদের মধ্যে শ্রীযুত মজুমদার একজন বিশেষ খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। বাঙ্গলা দেশ এতদিন পর্য্যন্ত এই ধরণের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিল। তাঁহার ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আজ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে, আমরা বাংলার বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত হইতেছি। মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষকেও আমরা এই উপযুক্ত নির্ব্বাচনের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

—:০:—

বাঙ্গালায় নূতন যৌথ কোম্পানী

কমরেড্ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ আতাউর রহমান। প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়—অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—চট্টগ্রাম।

হিন্দুস্থান হোসিয়ারি মিলস্ লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ কেশবনাথ চক্রবর্ত্তী। গেঞ্জি, মোজা

প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৫নং নর্থব্রুক হল রোড—ঢাকা।

ডালমিয়া সিমেণ্ট এজেন্সী লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ মোহনলাল জাজুদিয়া। কমিশন এজেন্সী ও আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০৯ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—কলিকাতা।

ইষ্টবেঙ্গল সুয়িং ম্যাসিন কোং লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ হরলাল মুখার্জ্জি। সেলায়ের কল বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—ফরিদপুর।

ইউরেকা ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ বিশ্বাস। চামড়ার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মিনারেল কনসার্ণ লিঃ। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ চিত্তরঞ্জন উপাধ্যায়। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা রেজিষ্টার্ড অফিস ২ নং মিশন রো—কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাকচারার্স ইউনিয়ন লিঃ। ম্যানেজিং এজেণ্টস—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লিঃ। প্রদর্শনী সংগঠন ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪ নং বেণ্টীঙ্ক ষ্ট্রীট—

এক্সপ্রেস প্রভিডেণ্ট এসিওরেন্স কোং লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ সুধীন্দ্রনাথ সরকার। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান সিড্ গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন লিঃ। বীজ ও সারের ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, ২৫২ বি হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা।

সান অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ। ডিরেক্টর মিঃ বি বি মজুমদার। জীবন বীমার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মেদিনীপুর কটন মিলস্ লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ শচীন্দ্রনাথ মাইতি। ব্যবসা কাপড়ের কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১২ ডালহৌসি স্কোয়ার কলিকাতা।

ইন্দো-বৃটিশ টুব্যাকো কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ ডিরেক্টার—মিঃ উপেন্দ্র চন্দ্র সরকার। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রেজিষ্টার্ড আফিস ৯৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা।

হোটেলস্ (১৯৩৮) লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ এস সিংহ বি-এ, এল, এল, বি। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৫এ চৌরঙ্গী কলিকাতা।

স্ক্রীন কর্পোরেশন (১৯৩৮) লিঃ। ডিরেক্টর মিঃ পি সি নান। সিনেমা হাউস ও থিয়েটার পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৬ বেথুন রো কলিকাতা।

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ পি সি নান। ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৬ বেথুন রো কলিকাতা।

রায়স্‌ মেসিনারী এণ্ড ম্যাচ ইণ্ডাষ্ট্রি করপোরেশন লিঃ। সেক্রেটারী মিঃ কে এম চাটার্জ্জি। দিয়াশলাইয়ের ও চিনির কল নির্ম্মাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ৮৩।সি বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এলুমিনিয়াম প্রডাকসন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ এল, জি, বস। অনুমোদিত মূলধন ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

পাঞ্জাব ক্লথ মিলস্‌ লিঃ। ডিরেক্টর—মিঃ রাধাকিসেন সওগানেরিয়া। ব্যবসা-কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত করা। অনুমোদিত মূলধন ২২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২০ নং তাঁরাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রিট কলিকাতা।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে মোটর চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে যে আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মোটর গাড়ী মালিকের পক্ষে দুর্ঘটনার জন্য বীমা করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। অবশ্য নূতন আইনের এই ধারা ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের পূর্ব্বে বলবৎ হইবে না। সম্প্রতি কাউন্সিল অব ষ্টেটে এই আইনের আলোচনা কালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরযানের মালিকের পক্ষে নূতন আইন মতে বীমা করিতে বৎসরে নিম্নলিখিত মত প্রিমিয়াম দিতে হইবে—প্রাইভেট মোটরগাড়ী ৭৬৷৷০ আনা, ট্যাক্সি ১১০৲ টাকা, ২০ জন আরোহী বসিবার উপযুক্ত বাস ১৮৩৷৷০ আনা, ২ টনের কম মাল বহিবার উপযুক্ত লরী ৭৬৷৷০ আনা, ২ টনের বেশী মাল বহিবার উপযুক্ত লরী ৮৩৷৷০ আনা।

গত ২৩শে জানুয়ারী হইতে মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের আফিস ৪ বি কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গত বৎসরের হিসাবে বোম্বে মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে।

মিঃ এ এস্ এম্ আনিসর রহমান বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সুর‍্যান্স্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মনোনীত হইয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর আফিস ২সি, হায়াত খাঁ লেন হইতে ১০২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট (কলিকাতা) এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ এস, বি সেনগুপ্ত সম্প্রতি ঐ শাখার ১০২।১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ আফিসে উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এল এস কপিলকে এক প্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। এই অনুষ্ঠানে কোম্পানীর স্থানীয় কর্ম্মচারী ও কর্ম্মীগণ ছাড়া অনেক ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ২১শে জানুয়ারী (১৯৩৯) এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর (ব্যাঙ্গালোর) জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ভি রঙ্গস্বামী তাঁহার মাদ্রাজস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৪২।

গত ১৪ই জানুয়ারী ডাঃ মিসেস স্বর্ণ মিত্র এম-বি, ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটে নারীর জীবন বীমা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সাধারণতঃ পুরুষদের তুলনায় ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারীদের ভিতর বেশী মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়। তবে ৪৫ বৎসরের বেশী বয়স্কা নারী ৪৫ বৎসরের বেশী বয়স্ক পুরুষের তুলনায় দীর্ঘজীবী হয়। ইংলণ্ডের ৭৩টী জীবন বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম হার আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৪৪টি কোম্পানী নারীর জীবন বীমার জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করেন না। কিন্তু অন্য সমস্ত কোম্পানীই নারীর জীবন বীমার জন্য প্রতি ১০০ পাউণ্ড বীমার উপর বাৎসরিক ৫ শিলিং হইতে ২০ শিলিং পরিমাণ বেশী প্রিমিয়াম দাবী করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় নারীর জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। এজন্য নারীর জীবন গ্রহণ করা বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত কোম্পানীই নারীর জীবন বীমার জন্য বাৎসরিক ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করে। ডিরেক্টর জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়া মেডিকেল সার্ভিসের প্রদত্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় ভারতবর্ষে একমাত্র প্রসবকালীন দুর্ঘটনায় বাৎসরিক ১ লক্ষ ৬০ হাজার নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই অবস্থায় নারীদের জীবন বীমা গ্রহণ করিতে গিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে তাহাদের প্রসবকালীন মৃত্যু সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করাই সমুচিত বলা যাইতে পারে।

গত ১৮ই জানুয়ারী হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের পাবনা জেলার কর্ম্মিগণ মিশন হাউসে বাংলা গবর্ণমেন্টের অর্থসচিব মাননীয় মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারকে এক প্রীতি সম্মেলনে সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন করেন। এজেন্সী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্ এম্ চৌধুরী, এজেন্সী অফিসার মিঃ এস বি রায় চৌধুরী এবং মিঃ কে সি ঘোষ, রাজসাহী বিভাগের অর্গেনাইজার মিঃ জে কে রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্ম্মী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
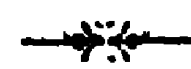
হিমালয় য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী মিঃ সুধাংশু রায় সম্প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানীর অর্গেনাইজিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিউ এশিয়াটিক লাইফ ইনসিউরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ আর কে সরকার উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন

—⊹—

৯ই জানুয়ারী হইতে ইনস্যুর্যান্স য্যাকাডেমীর আফিস ৫ ও ৬ নং হেয়ার ষ্ট্রীট ভবনের এক প্রশস্ত হলঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

—⊹—

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে "আইডিয়াল ডিমক্রেটিক য়্যাস্যুর‍্যান্স য়্যাণ্ড মর্টগেজ লোনস্ লিমিটেড" কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "নাগ ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড" হইয়াছে। ইহার হেড আফিসের ঠিকানা—তিলক তলাও, পারাঞ্জপে বিল্ডিং নাগপুর সিটি।

—⊹—

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ১৯৩৮ সালে ন্যাশন্যাল ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার নূতন বীমার কারবার করিয়াছেন। ইহাই পরিচালকগণের কর্ম্মকুশলতার পরিচয়।

—⊹—

গত ৬ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) মাদ্রাজ সহরে ম্যাঙ্গোলোরের পপুলার ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর একটি ব্রাঞ্চ আফিস খোলা হইয়াছে। মিঃ এ শ্রীনিবাস রাও, বিএ, বিএল এই ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

—⊹—

মহীশূর ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর হায়দরাবাদ (নিজাম রাজ্য) স্থিত চীফ এজেন্সী প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহা একটি সাব আফিসে পরিণত হইয়াছে। ইহার কার্য্য পরিচালনার জন্য যে লোক্যালবোর্ড গঠিত হইয়াছে, রাজা সোমেশ্বর রাও তাহার চেয়ার ম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—⊹—

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে বম্বে লাইফ্ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে কোম্পানী সাড়ে চারি লক্ষ টাকার উপর কাজ পাইয়াছেন।

নিম্নলিখিত তালিকায় ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের গত দশ বৎসরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে,—

সাল	কোম্পানীর সংখ্যা	বৎসরের নূতন বীমার পরিমাণ কোটী টাকা	বৎসরের শেষে মজুত বীমার পরিমাণ কোটী টাকা	মোট আয়ের পরিমাণ কোটী টাকা	দাবী শোধ লক্ষ টাকা	বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিল কোটী টাকা
১৯২৭	৫৬	১২·৮	৬০	৪·২৯	১২৭	১৫·৭
১৯২৮	৫৯	১৫·৪	৭১	৪·২৯	১৩৮	১৭·২
১৯২৯	৬২	১৭·৩	৮২	৪·৯২	১৬৪	১৮·৭
১৯৩০	৬৮	১৬·৫	৮৯	৫·৪০	১৭৪	২০·৫
১৯৩১	৮১	১৭·৮	৯৮	৫·৮৭	১৮৬	২২·৪
১৯৩২	৯৩	১৯·৭	১০৬	৬·৮৮	২০৩	২৫·১
১৯৩৩	১১০	২৪·৮	১১৯	৮·১৫	২২২	২৮·৭
১৯৩৪	১৩৩	২৮·৯	১৩৭	৮·৩৪	২৫৭	৩১·৯
১৯৩৫	১৪৯	৩২·৮	১৫২	৯·৩৩	২৮১	৩৫·২
১৯৩৬	১৬৫	৩৭·৮	১৭৫	১১·৩৫	২৯৯	৪০·২

গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) ইণ্ডিয়ান ইন্স্যুরান্স ইন্‌ষ্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স ভবনে এক সভায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্‌এ, বিএল, পি আর এস্ (য়্যাটর্নী-য়্যাট-ল) "জীবন বীমা ও হিন্দু যৌথ পরিবার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট মিঃ আই বি সেন উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বলেন "হিন্দু সমাজে প্রাচীনকাল হইতে যে একান্নবর্ত্তী যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা দারিদ্র্য এবং বেকার অবস্থার প্রতিষেধক। আজ সেই যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যদি একান্নবর্ত্তী যৌথ পরিবার প্রথা পূর্ব্বের মত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে আর দারিদ্র্য দুর্দ্দশা এবং বেকার সমস্যা এত গুরুতর হইয়া উঠিত না। যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকিলে জীবন বীমারও প্রায়োজন হইত না। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সেই জন্যই এক্ষণে পারিবারিক অর্থ সংস্থানের জন্য জীবন বীমা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যেও জীবন বীমা আবশ্যক। জীবন বীমা করিলে আয়ু কমিয়া যায়, এই কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী কোম্পানীতে জীবন বীমা করাই কর্ত্তব্য।" মিঃ এ কে ঘোষ, মিঃ এস্ সি রায়, মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার মিঃ এস্ পি বসু প্রভৃতি বীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
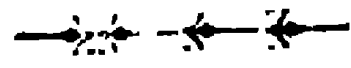
বিচিত্র বার্ত্তা
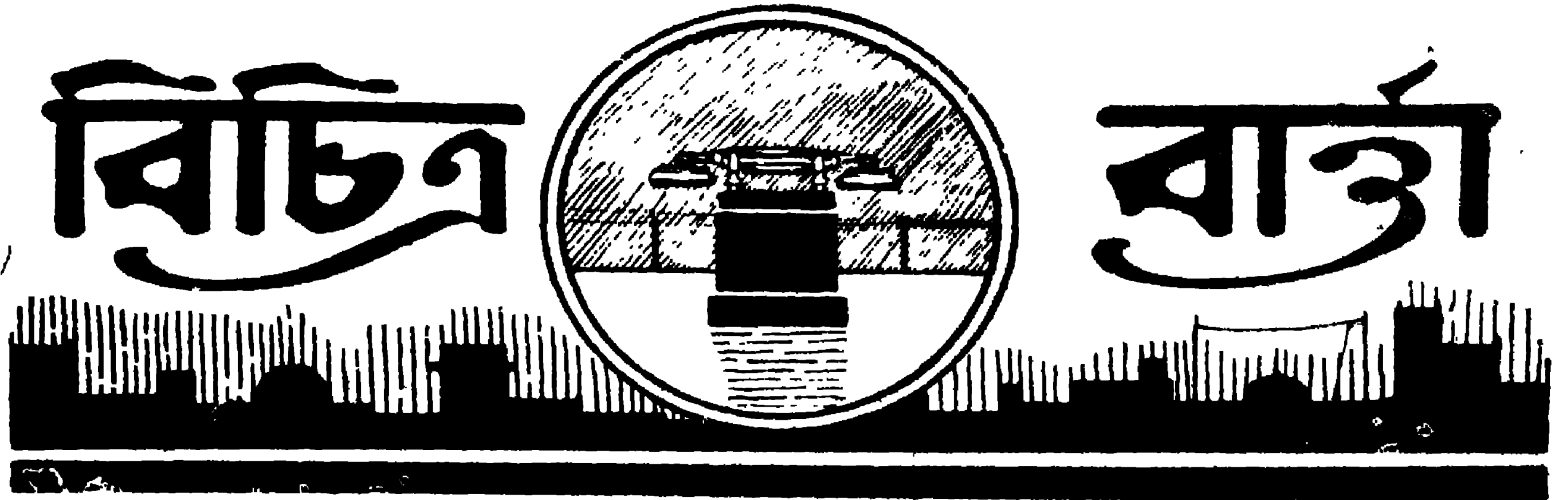
সমগ্র পৃথিবীতে ১৫ বৎসর বয়সের কম বয়স্ক যত বালিকা আছে তদপেক্ষা বালকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু ৭৫ বৎসর বয়সের উপরে সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। ৯০ হইতে ১০০ বৎসরের মধ্যে নারীর-সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ২ বা ৩ গুণ অধিক।

হাঙ্গেরীতে রেল ভ্রমণের মাশুল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। বুডাপেষ্ট হইতে এসষ্টাড ৫ শত মাইল দূর। উহার ভাড়া ৩।০ টাকা। এই কম ভাড়া সত্ত্বেও যদি ১০ জন শ্রমিক একত্র ভ্রমণ করে তবে তাহাদিগকে এই ভাড়ারও অর্দ্ধেক দিতে হয়। দরিদ্র ভারতবর্ষকেও হাঙ্গেরী লজ্জা দিয়াছে।

মিশর দেশের ফসল নীল নদীর প্লাবনের জলের উপর নির্ভর করে। দক্ষিণ মিশরে কখন কখন বৎসরে ২০ মিনিট বৃষ্টি হয়। উত্তর মিশরে বৃষ্টি হয় না বলিলেই হয়।

ফিনল্যাণ্ডে এক প্রকার প্রস্তর আছে উহার নাম সেমাচুইর। শুষ্ক ও পরিস্কার দিনে উহার বর্ণ ঘোর ছাই রঙ্গের থাকে ও মধ্যে মধ্যে সাদা দাগ থাকে কিন্তু বৃষ্টির পূর্ব্বে ও ঘন কুয়াশায় উহা কাল বর্ণ ধারণ করে বিশেষত: সেই সকল স্থানে যথায় সাদা দাগ ছিল।

হায়দ্রাবাদের বর্ত্তমান নিজামের পিতার কৃত্রিম দন্তের মুল্য ১০৫০০ টাকা ছিল।

শিকারিগণ বলেন যে জেব্রা, হরিণ ও অন্যান্য জন্তু যাহাদের সিংহ রাত্রিকালে আক্রমণ করে তাহারা দিবাকালে সিংহ দেখিয়া ভীত হয় না। দিবাকালে যখন সিংহ তাহাদের নিকটবর্ত্তী হয় তখন তাহারা সিংহের যাইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দেয়।

কথিত আছে যে ভারতের বাবুই পক্ষী তৃণ দ্বারা যে বাসা বানায় তাহাতে মাটির আস্তরণ থাকে ও বাসার ভিতর জোনাকির দ্বারা আলোকিত করে।

এক প্রকার মৎস্য স্বাভাবিক ভাবে কিছুদিন জলে চলিয়া বড় হইলে কাত হইয়া চলে। তখন তাহার মস্তক সমান্তরাল ভাবে রাখিবার চেষ্টায় মাথা এক পার্শ্বে ঘুরিয়া যায়।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এক জাতীয় কাঁকড়া বৎসরে একবার দল বাঁধিয়া অলৌকিক ভাবে দিক নির্ণয় করিয়া সমুদ্র তীরে যাইয়া ডিম্ব পাড়ে।

সাহারা মরুভূমির মৃত্তিকার নীচ দিয়া একটি জলপূর্ণ নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে।

এক লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান পুরুষের মধ্যে ১৮ জন হিন্দু এবং ৩৩ জন মুসলমান শত বৎসর বয়স্ক।

মানুষের অন্ত্র প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। তিন মাসের ভ্রূণের শরীরে জলের ভাগ শতকরা ৯৪ ভাগ; শিশুর জন্মকালে তাহার শরীরের জলের ভাগ শতকরা ৬৯ থাকে, ২০ বৎসর বয়সের যুবকের শরীরে জলের ভাগ শতকরা ৬২ ভাগ ও ৭০ বৎসর বয়স্কের শতকরা ৫৮ ভাগ জল থাকে। মানুষ যতই বৃদ্ধ হয় ততই সে বৃক্ষাদির ন্যায় শুকাইয়া যায়।

শোনা যায় যে মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার শরীর সমুদ্রের লবণাক্ত জলে পূর্ণ ছিল। আজও মানব শরীরের রক্তে ম্যাগ্নেসিয়াম, পটাসিয়াম, চূণ ও সোডিয়াম আছে। সমুদ্র জলেও সেই পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য বর্ত্তমান, তবে ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা কিছু বেশী।

য়ুরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে এ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত যত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীতে যত পুরুষ নারী ও বালক বালিকা আছে তাহারা প্রত্যেকে সমভাগে ৫৬ টাকা করিয়া পাইতে পারে।

ভারত সম্রাটের মুকুট ও অন্যান্য রাজকীয় হীরা জহরত ও দণ্ড টাওয়ার অফ লণ্ডনের একটি কাচের আধারে বন্ধ থাকে। উহার চতুর্দ্দিকে লৌহের একটি খাঁচা করিয়া নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজকীয় মণি জহরতাদির মূল্য ৪॥০ কোটি টাকা। কোহ্-ই-নূর হীরক উইণ্ডসর কাসেলে রাখা হয়।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের বোষ্টন রেল ষ্টেশন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রেল ষ্টেশন।

লণ্ডনের সমস্ত ডাক পিয়ন একদিনে ডাক বিলি করিতে যত পথ হাঁটে তাহাতে একটি লোকের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে দুইবার হাঁটার সমান হয়।

প্রাচীন গ্রীসে এরূপ আইন ছিল যে কোন নারীকে পিতামাতার অনুমতি না লইয়া যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ করিত তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

১৬৩৭ সালে স্কটল্যাণ্ডে একটি বালক বল চুরি করায় তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। বৃটেনে চুরির জন্য তৎকালে এইরূপ কঠিন দণ্ড দেওয়া হইত কারণ উহা এক গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন বৃটেনে ১৩ রকম অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। এক্ষণে সেইস্থলে ৪ রকম অপরাধে প্রাণদণ্ড হয়; যথা—হত্যা, রাজদ্রোহ, লুণ্ঠনের সহিত হত্যা বা আঘাত করা, সম্রাটের ডক ও যুদ্ধ সম্ভার নির্ম্মাণাগারে অগ্নি সংযোগ করার জন্য প্রাণদণ্ড হয়।

বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটী

কুটীর-শিল্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে প্রশ্নাবলী

শিল্পের প্রকৃতি ও পরিচয়

সকলেই বোধ হয় জানেন যে বাংলাদেশে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন হইল Industrial Survey Committee নামক একটী কমিটী স্থাপন করিয়াছেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ বি, এল এই কমিটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি এই কমিটী বাংলাদেশে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদিগের আর্থিক ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী গঠন করিয়া প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহা-দিগের এই অনুসন্ধান কার্য্যে সহায়তা করার জন্য আমরা সেই সকল প্রশ্নাবলী এখানে প্রকাশ করিলাম। আমাদিগের কাগজের পাঠকগণ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া এবং তাহা ছাড়াও তাঁহাদের জানিত যদি আর কোনও সংবাদ থাকে তবে তাহা আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। আশা করি আমাদিগের গ্রাহক ও পাঠকগণ এই সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিবেন।

সম্পাদক।

ক্রমিক নং

ইউনিয়ন বোর্ড

মহকুমা

জেলা

১। শিল্পের নাম

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত শিল্পগুলির জন্য এই প্রশ্নাবলী রচিত হইয়াছে :—

(১) তাঁতের কাজ—সূতা (এবিষয়ে পূর্ব্বেই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; অতএব বাদ দিতে হইবে)।
(২) তাঁতের কাজ—পাট।
(৩) তাঁতের কাজ—রেশম।
(৪) লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর কাজ (কাঁসা, পিতল, এলুমিনিয়ম, তামা ইত্যাদি)।
(৫) লৌহজাত ধাতুদ্রব্যাদি (চাষের উপযোগী যন্ত্রপাতি, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি)।
(৬) হাতের তৈয়ারী কাগজ।
(৭) মাটির বাসন ও অন্যান্য জিনিষ।
(৮) চামড়া পাকাইবার কাজ
(৯) ছাতা তৈয়ারী।
(১০) কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারী।
(১১) নারিকেলের ছোবড়া ও আঁশ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি।
(১২) খেলনা, পুতুল ইত্যাদি।
(১৩) চাউল তৈয়ারী।
(১৪) ঘানির দ্বারা তৈল প্রস্তুত।
(১৫) ঝিনুক, ধাতু ইত্যাদি হইতে বোতাম তৈয়ারী।
(১৬) দিয়াশলাই প্রস্তুত।
(১৭) চিনি ও গুড় তৈয়ারী।
(১৮) সেলুলয়েড হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি।
(১৯) কাঠের কাজ।
(২০) চামড়ার জুতা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি।
(২১) কার্পেট তৈয়ারী (তুলা, পশম, পাট ইত্যাদি হইতে)।
(২২) তালা-চাবি তৈয়ারী।
(২৩) সোলার টুপি ইত্যাদি প্রস্তুত।

২। কোন স্থানে অবস্থিত (জেলা, মহকুমা, গ্রাম)

৩। কুটীর-শিল্পীর নাম ও পরিচয়, সে—

(ক) মজুরদ্বারা কাজ চালায় কি না

(খ) স্বাধীন কারিগর কি না

(গ) চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করে কি না

(ঘ) বেতনভুক্ মজুর কি না

৪। মজুরদ্বারা কাজ করাইলে দৈনিক কতজন মজুর খাটে,—

(ক) পরিবারভুক্ত লোকের সংখ্যা

(খ) বেতনভুক্ মজুর (বেশী কাজ এবং কম কাজের সময়ে)

(গ) কোন শিক্ষানবীশ খাটে কি না

৫। স্বাধীনভাবে কাজ করিলে দৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা,—

(ক) পরিবারভুক্ত ব্যক্তি

(খ) বেতনভুক্ মজুরে (বেশী কাজ ও কম কাজের সময়ে)

৬। চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করিলে—

(ক) চুক্তির সর্ত্ত (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক-ভাবে মাল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা, ডেলিভারি দিবার সর্ত্ত ইত্যাদি বিষয়)

(খ) পরিবারভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ কতজন নিযুক্ত রহিয়াছে

(গ) প্রত্যহ কতজন বেতনভুক্ মজুর থাকে

৭। বেতনভুক মজুর হইলে—

(ক) কি প্রকার শিল্প প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত......

(খ) কাজের মরশুম, প্রত্যহ কত ঘণ্টা এবং বৎসরে কতদিন কাজ হয়.........

কাঁচা মাল সরবরাহ

১। কোন্ কোন্ শ্রেণীর কাঁচা মাল ব্যবহৃত হয়...........

২। দেশী ও বিদেশী কাঁচা মাল কোথা হইতে সংগ্রহ করা হয়..... ...

৩। প্রতিমাসে এবং বৎসরে কি পরিমাণ কাঁচা মাল খরচ হয়—

কাঁচা মালের পরিমাণ.........

মূল্য..................

৪। কাহাদের নিকট হইতে কাঁচা মাল ক্রয় করা হয়—

(ক) যদি স্থানীয় কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে উহার মূল্য কিরূপ পড়ে...............

(খ) যদি উহা দেশের অন্য কোন স্থান হইতে আমদানী করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত স্থানে কাঁচা মালের মূল্য এবং উহা আনাইবার খরচ কিরূপ...............

৫। কাঁচা মালের জোগান, ব্যবহার এবং মূল্যে বিভিন্ন সময়ে কোন তারতম্য হয় কি না, এবং উহা কিরূপ............

৬। কাঁচা মাল ক্রয় করিবার সর্ত্ত। উহা নগদ অথবা ধারে ক্রয় করা হয় কি না। ধারে ক্রয় করিলে কতদিন পরে মূল্য শোধ করিতে হয়..............................

৭। কাঁচা মালের কি পরিমাণ ধারে ক্রয় করিতে হয়? ধার কোথা হইতে সংগ্রহ করা হয় এবং উহার সর্ত্ত এবং সুদ কিরূপ............

৮। নগদ মূল্যে এবং ধারে মাল ক্রয় করিলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে মূল্যের তারতম্য থাকে কি না এবং উহা কিরূপ.........

৯। কাঁচা মাল ক্রয়কালে শিল্পীকে কোন সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় কি না (যথা কাঁচা মাল সরবরাহকারীদিগের নিকট শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের সর্ত্ত, অথবা অনুরূপ অন্য সর্ত্ত).........

শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের সরঞ্জাম

১। কি কি কলকব্জা ব্যবহৃত হয়—

(ক) উহার মূল্য.........

(খ) স্থায়িত্ব (কত মাস বা বৎসর) .....

(গ) উহা চালাইতে বৎসরে কি ব্যয় পড়ে ?......

২। সাজ-সরঞ্জাম বসাইতে এবং ব্যবসা চালাইতে মোট কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত রহিয়াছে ? এই মূলধন শিল্পীর নিজের, না উহা ধার করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে ? যদি মূলধনের কতকাংশ শিল্পীর নিজের এবং কতকাংশ ধার করিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার কত অংশ নিজের মূলধন এবং কত অংশ ধার করা মূলধন ?

৩। মূলধন যদি ধার করিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে, তবে—

(ক) উহা কাহার নিকট হইতে ধার করা হইয়াছে ?

(খ) ধারের সর্ত্ত কি ?

(গ) ধার আদায়ের ব্যবস্থা কিরূপ ?

৪। উন্নততর ধরণের কলকব্জা ব্যবহারের পথে কি অন্তরায় রহিয়াছে ?

উৎপন্ন মাল ও মূল্য

১। কি কি শ্রেণীর মাল উৎপন্ন হয় ?

২। প্রতি মাস ও প্রতি বৎসরে প্রত্যেক শ্রেণীর জিনিষ কি পরিমাণ উৎপন্ন হয় তাহার বরাদ্দ—

পরিমাণ......

মূল্য...

৩। কারখানায় প্রত্যহ যত ঘণ্টা কাজ হয় (এই স্থলে প্রত্যহ কত ঘণ্টা কাজ হয় তাহা উল্লেখ করিতে হইবে) তদনুসারে প্রত্যহ প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইতে পারে ?

৪। কারখানায় কি বৎসরের কতকাংশে মাত্র কাজ হয় ? উহার কারণ কি ?

৫। বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে কতদিন কারখানায় বেশী কাজ হয় এবং কতদিন কম কাজ হয় ? এই উভয় সময়ে কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে তারতম্য কিরূপ ?

৬। যখন কারখানায় বেশী কাজ হয় না, সেই সময়ে শিল্পী অন্য কোন কাজ করে কি না এবং উহা হইতে তাহার কিরূপ আয় হয় ?

৭। শিল্পী কি কেবল ফরমায়েসী মাল উৎপন্ন করে, না বাজারে বিক্রয়ার্থ মালও উৎপন্ন করিয়া থাকে ? যদি সে উভয় শ্রেণীর মালই উৎপাদন করে, তবে এই দুই শ্রেণীর মালের পরিমাণ কিরূপ।

৮। যদি ফরমায়েস মত মাল প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে কাহারা এই ফরমায়েস দিয়া থাকে ?

৯। কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর মালের মধ্যে কি কোন প্রকার নূতন ধরণের বা নূতন ডিজাইনের জিনিষ উদ্ভাবিত হইয়াছে ? যদি হইয়া থাকে তবে শিল্পী উহা কতদূর গ্রহণ করিয়াছে ?

১০। ইদানীং কয়েক বৎসরের মধ্যে কি উৎপন্ন মালের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ? যদি হ্রাস পাইয়া থাকে তবে উহা কি পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ? (এই স্থলে গত ৫ বৎসরের উৎপাদনের হিসাব দিতে হইবে)

বিক্রয় ব্যবস্থা

১। উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য সাধারণতঃ কোথায় বিক্রয় হয়—

(ক) স্থানীয় বাজার,

(খ) জেলার অভ্যন্তরস্থ বাজার,

(গ) প্রদেশের অভ্যন্তরস্থ বাজার,

(ঘ) ভিন্ন প্রদেশের বাজার,

(ঙ) বিদেশের বাজার।

যদি পণ্যদ্রব্য একাধিক বাজারে বিক্রয় হয়, তবে কোন্ অঞ্চলে উহা কি পরিমাণ বিক্রয় হইয়া থাকে?

২। শিল্পদ্রব্য কি শিল্পী নিজে বিক্রয় করে, না উহা এজেন্টের মারফতে বিক্রয় হয়? এজেন্টগণকে যদি কোন কমিশন দেওয়া হয়, তবে তাহার পরিমাণ কিরূপ?

৩। পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের সর্ত্ত কিরূপ—

(ক) উহা কি নগদে বিক্রয় হয়?

(খ) ধারে বিক্রয় হয়?

(গ) মহাজন কর্ত্তৃক মূল্য আদায়ের সর্ত্তে বিক্রয় হয়?

৪। যদি উহা ধারে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে মূল্য আদায়ের সর্ত্ত কিরূপ, এবং কত দিনের মধ্যে মূল্য আদায় হয়?

৫। যদি অপর কর্ত্তৃক মূল্য আদায়ের সর্ত্তে মাল বিক্রয় হয়, তাহা হইলে উহারা কে এবং মূল্য আদায়ের সর্ত্ত কি?

৬। নগদ বিক্রী ও বাকীতে বিক্রী, এই উভয় ধরণের বিক্রয়ে মূল্যের তারতম্য কিরূপ, এবং বাজারে মহাজনগণ এই মাল কি দরে বিক্রয় করিয়া থাকে?

৭। উক্ত শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন সমবায় সমিতি রহিয়াছে কি না? এই ধরণের সমিতি থাকিলে উহার সদস্যগণ উহা হইতে কি সুবিধা পাইয়া থাকে? যদি না থাকে তবে শিল্পীগণ এই ধরণের সমিতি চাহে কি?

৮। শিল্পে যে সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহার সহিত অনুরূপ কোন শিল্পদ্রব্য প্রতি-যোগিতা করে কি? এইসব প্রতিযোগী মাল কি কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে? যদি উহা কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে উহা কি দেশী না বিদেশী? (এই স্থানে প্রতিযোগী মালের গুণাগুণ ও মূল্যের বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে)

৯। প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিতে হইলে গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে কিরূপ সহায়তা প্রয়োজন?

১০। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের মূল্যে কোন উঠানামা হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে উহার কারণ কি এবং উঠানামার পরিমাণ কিরূপ? (এই স্থানে গত ৫ বৎসরের হিসাব দিতে হইবে)

মূলধন সরবরাহ ও ঋণের ব্যবস্থা

১। শিল্পে কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন—

(ক) কলকব্জার জন্য,

(খ) কাঁচা মালের জন্য,

(গ) মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য,

(ঘ) অন্যান্য কাজে?

২। মজুরদের বেতন এবং ঋণ-সূত্রে গৃহীত অর্থের সুদ দিবার পর শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের উপর বার্ষিক গড়ে কি হারে লাভ হয়?

৩ যাহারা শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা কি ঋণভারগ্রস্ত? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে উহাদের ঋণের পরিমাণ কি এবং কাহাদের নিকট উহারা ঋণী?

৪। যাহারা শিল্পে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে টাকা ধার করিতে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় কি? যদি তাহা হয়, তবে এইসব অসুবিধা কি?

মজুর নিয়োগ ও উহাদের মজুরী

১। বাহির হইতে যে সব মজুর নিয়োগ করা হয় তাহাদের সংখ্যা। (এই স্থানে পুরুষ ও স্ত্রী মজুরের সংখ্যা, উহাদের বয়স, এবং বেশী কাজের ও অল্প কাজের সময়ে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা দিতে হইবে)

২। প্রত্যেক শ্রেণীর মজুর প্রত্যহ কত ঘণ্টা কাজ করে?

৩। প্রত্যেক শ্রেণীর মজুরের দৈনিক মজুরীর হার কিরূপ?

৪। নিয়মিতভাবে মজুর সংগ্রহে কোন অসুবিধা আছে কি না?

বিবিধ

১। সমগ্র প্রদেশে উক্ত শিল্পের মারফতে মোট কি পরিমাণ এবং কত মূল্যের জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহার কোন হিসাব আছে কি না?

২। সমগ্র প্রদেশে উক্ত শিল্পে মোট কতজন লোক নিযুক্ত আছে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় কি না? যদি থাকে তবে এই শিল্পে মহাজন, স্বাধীন কারিগর এবং বেতনভুক্ মজুরের সংখ্যা কত?

৩। উক্ত শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইলে এই সম্পর্কে অন্য কোন প্রস্তাব আছে কি না?

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে ইংরাজী নববর্ষের ১৯৩৯ সালের ক্যালেণ্ডার ও দেওয়াল পঞ্জিকা পাইয়াছি। এবার একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অনেক ইনসিওরেন্স কোম্পানীই এ বৎসর ক্যালেণ্ডার বাহির করেন নাই।

Indian Insurance Offices Association এর মন্তব্য অনুসারেই যাঁহারা উহার মেম্বার তাঁহারা ক্যালেণ্ডার করেন নাই। এই প্রস্তাবের গুণাগুণ সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

১। প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

২। ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স (পেপার মার্চ্চেণ্ট) ইংরাজী দেওয়াল পঞ্জিকা ও মাসিক ক্যালেণ্ডার

ভোলানাথ বিল্ডীংস ১৬৭ নং ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। বেকন প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ২নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

৪। লাইট অব এসিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ২নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

৫। ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী ১৮ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ৩৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭। ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ৩১ ম্যাঙ্গোলেন

৮। জি ডি ডাগা এণ্ড কোং ৮নং ক্যানীং ষ্ট্রীট, ডাগা হাউস কলিকাতা।

৯। আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ২নং ড্যাল হাউসি স্কোয়ার কলিকাতা।

ইঁহাদের ৩ খানা ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। ক্যালেণ্ডারে ইংরাজী ও বাংলা তারিখ তিথি পূজাপার্ব্বনের তারিখ সম্বলিত আছে।

১০। ভ্যারাইটি ষ্টোর্স ৯৫ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য ক্যালেণ্ডারের বিষয় এবার দেওয়া গেল না।

সমালোচনা

Sen's Insurance Manual 1938.
(সেনের ইন্সুর্যান্স ম্যানুয়্যাল ১৯৩৮)।

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা হইতে "সেন য়্যাণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৸৹টাকা।

পূর্ব্বে বীমা সম্বন্ধীয় বার্ষিক পুস্তিকার মধ্যে টুলী, বোর্ণ ষ্টোন এণ্ড কক্স ইহাদের কয়েকখানিই বিশেষ প্রচলিত ছিল। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া "সেন য়্যাণ্ড কোম্পানীর" ম্যানুয়্যাল পুস্তিকাখানি ঐ সকল বিদেশী পুস্তকের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া জয়-লাভ করিয়াছে। এখন সেনের ইনসিওরেন্স ম্যানুয়্যালও তাহাদের সহিত সমান ভাবে বাজারে টেক্কা দিতেছে।

সেনের ম্যানুয়্যালখানি পূর্ব্বের মত সুন্দর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র আদর লাভ করিয়াছে। ৩৪৪ পৃষ্ঠায় পাঁচটী অধ্যায়ে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় এবং অভারতীয় কোম্পানী সমূহের তালিকা, মর্ট্যালিটী টেবিল (mortality table), আমেরিকার ডাক্তার ও য়্যাক্চুয়ারীদের মতানুসারে মানবদেহের উচ্চতা ও ভার, রক্তের চাপ ও নাড়ীর স্পন্দন, বর্ত্তমান মূল্য এবং চক্রবৃদ্ধির হিসাব প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় ও অভারতীয় কোম্পানী সমূহের Premium tables, Surrender values, Loans on Policies Paidup Policies, Permanent Disability Benefits. ইত্যাদির নিয়মকানুন প্রকাশ করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের নূতন এবং মজুদ বীমার পরিমাণ, ভারতীয় এবং অভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের রেভিনিউ এ্যাকাউণ্ট ও ভ্যালুয়েশনের ফলাফল এবং তাহা ছাড়া মূলধন এবং লগ্নীর বিবরণও প্রকাশ করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের Directory বা পরিচালক ও কর্ম্মীদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কয়েকটী প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর বিবরণও দেওয়া হইয়াছে।

আমরা এবারকার ইনসিওরেন্স ম্যানুয়্যাল দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি সকল বিষয়ই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। প্রকাশকগণ বলিয়াছেন ইহার মূলে Indian Insurance Institute এর প্রেসিডেণ্ট মিঃ আই বি সেনের প্রেরণা তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছে। আমরাও দেখিতেছি মিঃ Sen এর Roman hand এর impress এই Manual খানির সর্ব্বত্র চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি ইহা ইংরাজীতে প্রকাশিত সকল ম্যানুয়্যাল গুলিকে পরাস্ত করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অষ্টাদশ বর্ষ } চৈত্র—১৩৪৫ { ১২শ সংখ্যা

কৃত্রিম মণিরত্ন প্রস্তুত প্রণালী

(শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হীরক ব্যতীত অন্যান্য কয়েকপ্রকারের মণি রত্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা অধিকতর সহজ। য়্যালুমিনিয়াম ধাতুর একটী অক্সাইড্ oxide আছে, তাহা অতিশয় কঠিন এবং স্বচ্ছ। ইহার নাম কোরাণ্ডাম্ (corundum)। অবিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে ইহাকে আমরা এমেরী (Emery) নামে প্রচলিত দেখিতে পাই। লৌহ পিতল প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ঘষিয়া পরিষ্কার ও পালিশ করিবার জন্য এমেরী পাউডার অথবা এমেরী কাপড় ব্যবহার করা হয়। সেই এমেরী অবিশুদ্ধ য়্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই এমেরীর সহিত প্রয়োজন মত ও পছন্দসই রঙ্গীন মশলা যোগ করিয়া রুবী, (Ruby) টোপ্যাজ (Topaz) স্যাফায়ার (Sapphire), য়্যামেথিষ্ট (Amethyst) এবং এমারেল্ড (Emerald) প্রভৃতি মণি রত্ন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভার্নুইল (Verneuil) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথমে এই য়্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হইতে কৃত্রিম উপায়ে রুবী প্রস্তুত করেন। তিনি প্রথমতঃ এক টুকরা বিশুদ্ধ কোরাণ্ডামের অগ্রভাগ ব্লো পাইপের অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত ও নরম করিয়া উহাকে একটী ক্ষুদ্র গোলকে পরিণত করেন। তারপর উহাতে ক্রোমিয়াম চূর্ণ (Powdered chromium) সংযোগ করিয়া পুনরায় উত্তপ্ত করেন। এক্ষণে

ঐ গোলকটীকে ধীরে ধীরে শীতল করিলে উহা "রুবী" নামক মণির আকৃতি ও বর্ণ ধারণ করে। এই রুবীকে স্বাভাবিক রুবী বলিয়া ভ্রম জন্মে। সুদক্ষ মণিকার ব্যতীত কেহ ইহাকে কৃত্রিম বলিয়া ধরিতে পারে না।

তারপর হইতে আজকাল প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রুবী তৈয়ারী হইতেছে। উত্তম কৃত্রিম রুবীর মূল্য বর্ত্তমান সময়ে প্রতিক্যারেট প্রায় ১০ শিলিং অর্থাৎ প্রতি তোলা ৩৩৭৷৷০ টাকা। ১২০ ক্যারেট = এক আউন্স (ট্রয়) *। এক পাউণ্ড (ট্রয়) = ৩২ তোলা। ১২ আউন্স (ট্রয়) = এক পাউণ্ড (ট্রয়)। এক শিলিং = ১২ আনা।

স্বাভাবিক আসল রুবীর দাম কৃত্রিম রুবীর প্রায় একশত গুণ অর্থাৎ প্রতি তোলা তিন হাজার টাকার উপর। ক্ষুদ্র আকারের কৃত্রিম মণি-রত্নের মূল্য প্রতি তোলা ৬৫ টাকার বেশী নহে। নিখুঁত এবং উৎকৃষ্ট কৃত্রিম রুবী তৈয়ারী করিতে গেলে উহার ওজন ১০ ক্যারেট বা ২৯ রতির বেশী করা যায় না। মণিরত্ন খুব ছোট সাইজের হইলে অলঙ্কার হিসাবে বাজারে উহার তেমন চাহিদা হয় না। অলঙ্কার নির্ম্মাণে মাঝারি সাইজের মণিরত্নের ব্যবহারই বেশী। সুতরাং কৃত্রিম রুবী, টোপ্যাজ, এমারেল্ড প্রভৃতি মণিরত্ন একটু বড় সাইজের তৈয়ারী করিতে না পারিলে তেমন লাভজনক হয় না।

ভার্ণুইলের ব্লো পাইপ প্রক্রিয়ায় অরিয়েণ্ট্যাল এমারেল্ড ও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সাধারণ এমারেল্ড অপেক্ষা অরিয়েণ্ট্যাল এমারেল্ড অধিকতর কঠিন এবং দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং ইহার মূল্যও খুব বেশী। সাধারণ এমারেল্ড মণিতে "বিরিলিয়াম" (Beryllium) নামক ধাতু সংযুক্ত থাকে; ক্রোমিয়াম থাকে না। রুবী তৈয়ারী করিতে ভার্ণুইলের প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগ এবং যে পরিমাণ ক্রোমিয়াম সংযোগ করা হয়, তদপেক্ষা অধিক উত্তাপ দিলে এবং অধিক ক্রোমিয়াম যোগ করিলে অরিয়েণ্ট্যাল এমারেল্ড প্রস্তুত হয়। ক্রোমিয়ামের পরিবর্ত্তে টিটানিয়াম (Titanium) যোগ করিলে কোরাণ্ডাম হইতে উৎকৃষ্ট স্যাফায়ার তৈয়ারী করা যায়। স্যাফায়ারকে উত্তপ্ত করিলে উহার বর্ণ স্থায়ীরূপে নষ্ট হয়। সেই বর্ণ আর ফিরিয়া আসে না। রুবীকে উত্তপ্ত করিলে তাহা সবুজ হয় কিন্তু ঠাণ্ডা হইলে আবার পূর্ব্বের রক্তবর্ণ ফিরিয়া আসে।

"জিরকন" (Zircon) নামক আর এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী করা যায়। ইহা তৈয়ারী করা খুব কঠিন কাজ নহে এবং ইহাতে বিফলতার সম্ভাবনাও বেশী নাই। ইহা জিরকনিয়াম (Zirconium) নামক এক প্রকার মূল ধাতুপদার্থের সিলিকেট্ (Silicate)। এই জিরকন নানা বর্ণের হইয়া থাকে। রক্তবর্ণ জিরকনের নাম জ্যাসিন্থ (Jacinth)। অন্য বর্ণের জিরকনকে জারগুন (Jargoon) বলে। কখনও কখনও জিরকন বর্ণহীন হইয়া থাকে। তখন উহার নাম হয় ম্যাচুরা ডায়মণ্ড (matura diamond)।

জিরকন প্রস্তুত প্রণালী সাধারণতঃ এইরূপ; প্রথমতঃ একটী ক্ষুদ্র চীনা মাটীর নলে কিছু জিরকনিয়াম্ অক্সাইড্ (Zirconium Oxide)

---

*মাঘ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল ১৫০ ক্যারেট = এক আউন্স। উহা ভুল হইয়াছে। ১২০ ক্যারেট = এক আউন্স হইবে। ৪ গ্রেন = এক ক্যারেট। ট্রয় ওজনের ৫৭৬০ গ্রেন = এক পাউণ্ড = ১২ আউন্স।
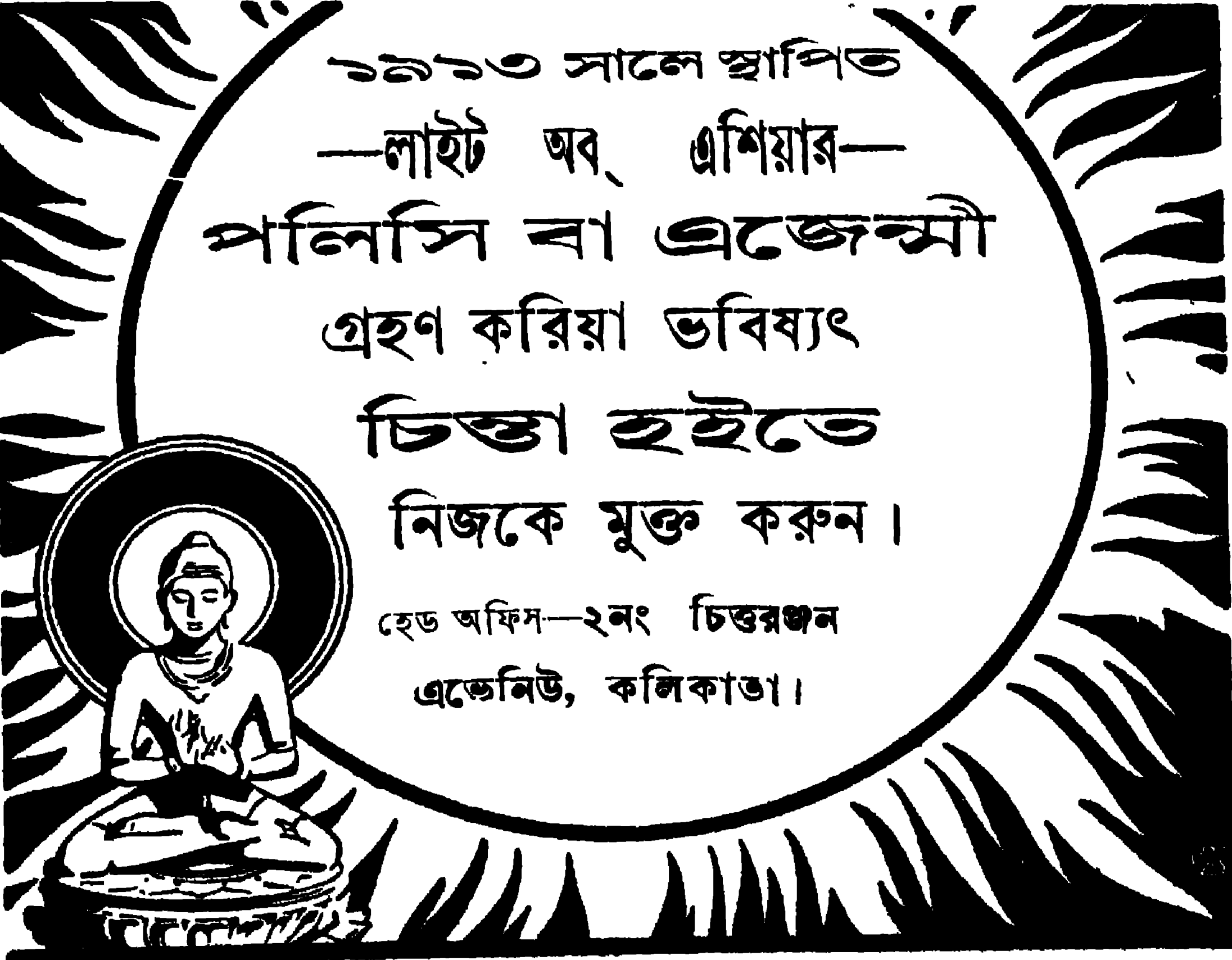
রাখুন। উত্তাপ প্রয়োগে এই নলটীকে রক্তবর্ণ করিয়া তুলুন। তারপর এই উত্তপ্ত নলের মধ্য দিয়া জিরকনিয়াম্ অক্সাইডের উপর সিলিকন্ ফ্লুরাইড (Silicon fluoride) পরিচালিত করুন। এক্ষণে অক্সাইডের সহিত সিলিকন্ সংযুক্ত হইয়া জিরকনিয়াম্ সিলিকেট্ উৎপন্ন করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে কোবাণ্ডাম্ ও জিরকনিয়াম্ অক্সাইড্ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ টন কৃত্রিম মণিরত্ন প্রস্তুত হয়; ইহার মূল্য প্রায় ৩০ কোটী টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বাভাবিক মণিরত্ন অপেক্ষা কৃত্রিম মণিরত্নের উৎপাদন পরিমাণ অনেক বেশী। আজকাল কৃত্রিম মুক্তার ব্যবসায় খুব চলিতেছে। আসল মুক্তা সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। ইহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই বহুমূল্য। সমুদ্রের ঝিনুক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায়। কিন্তু সকল ঝিনুকেই মুক্তা হয় না। কোন কোন মানুষের দেহে যেমন আঁচিল বা আব্ জন্মে, সেইরূপ ঝিনুকের শরীরে মুক্তা গঠিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক মুক্তা হওয়াকে ঝিনুকের একটা রোগ বলা যাইতে পারে। সেইজন্য সকল ঝিনুকের দেহে মুক্তা গঠিত হয় না। আমাদের দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জলবিন্দু শুক্তির (ঝিনুকের) দেহে পতিত হইলে তাহাতে মুক্তা জন্মে।

আমার মনে হয়, মুক্তা যে সহজে গঠিত হয় না তাহা বুঝানই এই প্রবাদের উদ্দেশ্য।

স্বভাবতঃ যে সকল পদার্থ অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়, মানুষ চাষের দ্বারা তাহা অধিক ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতেসমর্থ হইয়াছে। বিবিধ ফল শস্য এবং বৃক্ষ লতাদি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। মুক্তা সম্বন্ধেও মানুষ সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। কি কারণে কোন কোন ঝিনুকের দেহে মুক্তা গঠিত হয়;—মুক্তার রাসায়নিক উপাদান কি,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ সমুদ্র জলের তাপ, গভীরতা, লবণাক্ততা, প্রভৃতি কিরূপ হইলে ঝিনুকের দেহে মুক্তা জন্মিবার সুবিধা হয়;—এই সকল বিষয়ে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলিতে থাকে।

এই সকল অনুসন্ধানের মধ্যে জাপানী বৈজ্ঞানিক প্রফেসার কে মিৎসুকুরীর গবেষণাই সর্ব্ব প্রথমে সাফল্য মণ্ডিত হয়। তিনি ১৮৯০ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ২২ বৎসরে মুক্তা চাষের যে প্রণালী একেবারে নির্ভুলরূপে উদ্ভাবন করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ লাভজনক বলিয়া অবলম্বিত হইয়াছে। তবে বাস্তবিক ইহার পূর্ব্বে যে মুক্তা চাষের প্রণালী অজ্ঞাত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। বাস্তবিক চীনদেশীয় লোকেরা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যে প্রণালীতে মুক্তা চাষ করিয়া আসিতেছে, অধ্যাপক মিৎসুকুরী তাহাকেই উন্নততর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন!

মুক্তা চাষের প্রণালীতে জাপানীরা অনেক মন্ত্রগুপ্তি রাখিয়াছে বলিয়া সে সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিতে পারিলাম না। উহাতে পৃথিবীর নানাদেশের মুক্তা ব্যবসায়ীরা অধ্যাপক মিৎসুকুরীর কারখানা দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই মুক্তা চাষের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। তাই বর্ত্তমান সময়ে কৃত্রিম মুক্তার ব্যবসায়ে জাপানীরা পৃথিবীর বাজার দখল করিয়া রহিয়াছে। তথাপি অন্যান্য দেশেও আজকাল মুক্তার চাষ চলিতেছে। তবে তাহা জাপানের মত উন্নত ও সাফল্য মণ্ডিত নহে।

কৃত্রিম মুক্তা তৈয়ারীর আর একটী সহজ পন্থা সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ইহাকে কৃত্রিম মুক্তা না বলিয়া নকল মুক্তা বলাই যুক্তি সঙ্গত। ইহা তৈয়ারী করিতে সমুদ্রের ঝিনুক পুষিতে বা ধরিতে হয় না। সেইজন্য ইহা খুব সস্তা। দুই আনা চারি আনা মূল্যে এই নকল মুক্তার মালা ফেরীওয়ালাদের নিকট অনেকেই কিনিয়াছেন। ছোট ছোট ফাঁপা স্বচ্ছ কাচেরগুলির ভিতরের দিকে একপ্রকার মশলা মাখাইয়া দিলে উহার বাহিরের দিকটায় ঠিক মুক্তার মত আভা ও বর্ণ দেখা যায়। তারপর উহার ভিতরে গলিত মোম ঢালিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে সস্তাদরের নকল মুক্তা তৈয়ারী হইয়া থাকে। রূপার মত চকচকে মাছের আঁইস হইতে ঐ ভিতরে মাখাইবার (lining) মশলাটী তৈয়ারী হয়।

কৃত্রিম মুক্তা অথবা নকল মুক্তা সহজেই ধরা পড়ে। তাহার জন্য একপ্রকার উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক যুক্ত (Quartz mercury arc lamp) যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং আসল খাঁটী মুক্তার বাজার নষ্ট হয় নাই। উহার আদর ও দুর্ম্মূল্যতা পূর্ব্বের মতই আছে।

কৃষি সংবাদ

জাপানের কৃষি

জাপানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে একখানি মটরগাড়ীতে মাত্র ৫০ ঘণ্টা সময় লাগে। দেশটা এত ক্ষুদ্র হইলেও তথায় যে শস্য জন্মে, তাহাতে সে দেশের সমস্ত লোকের বৎসরের আহার্য্যের সঙ্কুলান হইয়াও প্রচুর পরিমাণ শস্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। জাপানের কৃষিকার্য্য-প্রণালী যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, জাপানী কৃষি-কার্য্যের প্রধান উপায় (১) গভীর কর্ষণ (২) ক্রমান্বয়ে শস্যোৎপাদন এবং (৩) অবিরাম সার প্রদান।

জাপানীরা ইচ্ছামত ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করে। উচু জমি, জলাভূমি প্রভৃতির জন্য চিন্তিত হয় না। তাহারা ইচ্ছানুরূপ জমি উচু-নীচু করিয়া থাকে। উচু জমিতে যে শস্য আবাদ করা প্রয়োজন, তাহা বপনের পর আবার সেই জমিকেই নীচু করিয়া নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত করিয়া সেই জমির উপযুক্ত শস্যের চাষ করে। তাহারা একই ক্ষেত্র হইতে এইরূপে নানাবিধ ফসল আবাদ করিয়া লয়।

জাপানীরা মিশ্র শস্য আবাদের পক্ষপাতী। বৎসরের কোন্ সময় কি ফসল হয়, জানা থাকিলে এবং বুঝিয়া চাষ করিলে বারমাসই সেই ক্ষেত্র হইতে নানাবিধ ফসল পাওয়া যায়। মনে কর, ক্ষেত্র বর্ষাকালে ফল দিবে, এরূপ ফসল শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত হইল এবং সেইগুলি বড় হইতে থাকিল। ইত্যবসরে প্রতি দুই সারি গাছের মধ্যস্থ জমিতে শরৎ ও শীতকালে ফল দিবে, এমন সব গাছের বীজ পুতিলে বর্ষার ফসল পাইবামাত্র গাছ কাটিয়া, নূতন সার দিয়া বসন্তের উপযোগী বীজ পুতিলে ওদিকে শরৎ ও শীতের গাছ তত দিনে বড় হইয়া উঠিবে। আমাদের বঙ্গদেশে অনেকস্থলে এরূপ চাষ হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে আউস ও আমন ধান্য এবং পাট ও আউস ধান্য একত্র করিয়া বপন করে;

বর্ষার পূর্ব্বেই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আউশ ধান্য উঠাইয়া লয়। আমন ধান্য থাকিয়া যায় বা পাটের জমি হইতে শ্রাবণ মাসে পাট কাটিয়া পরে আউস ধান্য কাটিয়া লয়। যে আমন ধান্য জমিতে থাকিয়া যায়, বর্ষা অন্তে ঐ আমন ধান্যের মধ্যে কলাই বা খেসারী ও রাই ছিটাইয়া দেয়, অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিয়া লয় এবং ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে কলাই, খেসারি ও রাই উঠাইয়া জমিতে চাষ দেয়। অবশ্য এই সকল জমি অপেক্ষাকৃত উচু ও তাহাতে বর্ষার জল সামান্যই হইয়া থাকে। যে জমিতে বর্ষার জল অধিক হয় ও যাহা নিম্ন ভূমি, তাহাতে শুধু আমন-ধান্য ব্যতীত অন্য কোন ফসল বপন করা হয় না।

উচ্চ জমিতে বাগান করিয়া তাহাতে নানা-প্রকারের তরি তরকারী ও ফলমূল এই প্রকারে আবাদও করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ফসলের মিশ্র আবাদ হয়, যেমন ছোলা ও গম, মটর ও সরিষা বা রাই, ধান্য। আম বাগানে আদা; আলুক্ষেতে মিষ্ট কুমড়া, তরমুজ, কাঁকুড়; চীনা বাদাম ক্ষেত্রে লঙ্কা; অরহর ক্ষেত্রে ভুট্টা, দেবধান ইত্যাদি মিশ্র আবাদ অনেক স্থলে আমাদের দেশে হয় না ও তাহাতে সম্যক ফল লাভ করা যায় না।

জাপানের ন্যায় সার আমাদের দেশে দিবার নিয়ম নাই। জাপানীদের সার বীভৎস প্রকৃতির। আমাদের প্রবৃত্তি বা সংস্কারের ইহা বিরোধী; কিন্তু বৈজ্ঞানিকস্থলে প্রবৃত্তি বা সংস্কারের কথা উঠিতে পারে না। জাপানীদের মলমূত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার, বিনা ব্যয়ে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা ইহার অব্যবস্থা মূর্খতা বা সংস্কারের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। অস্থিচূর্ণ, সোরা, খৈল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহারে যে ফল পাওয়া যায়, জাপানীরা তাহাদের ঐ একটী সার হইতেই তাহার অধিক ফল লাভ করে। জাপানীরা তাহাদের দেশে প্রচলিত সারই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ব্যবহার করিয়া থাকে। জাপানে মানব-মলের রীতিমত ব্যবসায় চলে। প্রতি প্রভাতে হাজার হাজার নৌকা মলপূর্ণ টব বোঝাই হইয়া নগরে আসে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত টব বিক্রয় হইয়া যায়। সমস্ত দিন খাটিয়া গৃহে ফিরিবার সময় শুধু হাতে না ফিরিয়া কুলি মজুরেরা সারি বাঁধিয়া প্রত্যেকে টব-দুই ময়লা কিনিয়া ফিরিয়া যায়, অথবা গাড়োয়ান খালি গাড়ী লইয়া না ফিরিয়া কিছু মলের টব কিনিয়া লইয়া যায়। এই সমস্ত মলরাশি শুষ্ক চূর্ণাকৃতি বা অন্য উপায়ে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করে না, অবিকৃত অবস্থায় ক্রীত ও বিক্রীত হয়। সর্ব্ববিধ বীজ বপন কালে কৃষকেরা উক্ত সার জলে গুলিয়া ক্ষেত্রে ঢালিয়া দেয় এবং এই উপায়ে প্রচুর ফসল লাভ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে মানুষের মলমূত্র অশুচি ও ন্যাকারজনক বলিয়া দূরে পরিত্যক্ত হয় এবং ইহার সংশ্রবে আসা দোষাবহ জ্ঞানে সতত সাবধান থাকিতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, সহরের মল যে স্থানে মেথরগণ পরিত্যাগ করে, কিছুদিন পরে ঐ স্থানের জমি চাষ করিয়া যে ফসল বপন করা যায় সেগুলি উৎকৃষ্টরূপে জন্মে। ময়লা গাড়ীর সার-সংযুক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন বেগুন সহরে আদরের সহিত লোকে ক্রয় করিয়া থাকে। লেখকের এক বন্ধু গল্প করিয়াছেন, তিনি বাড়ীর আনাচে-কানাচে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মল ত্যাগ করেন ও তাহা

প্রতিরোজ মাটী বা ছাই দ্বারা ঢাকিয়া রাখেন। এইরূপে গর্ত্ত ভর্ত্তি হইয়া গেলে আর একটি গর্ত্ত ভর্ত্তি হইয়া গেলে আর একটি গর্ত্ত এইরূপে পূর্ণ করেন এবং বৎসরান্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গর্ত্তগুলি হইতে এই মল সার উত্তোলন করিয়া নিজেই অল্প অল্প করিয়া জমিতে দিয়া তরিতরকারী আবাদ করতঃ বিশেষ ফললাভ করিয়া থাকেন এবং এই ফসল সহরের বাজারে বিক্রয় করিয়া তাঁহার ৭।৮টি লোক পূর্ণ সংসার স্বচ্ছন্দে পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু এ কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও নিকটস্থ প্রতিবাসীর নিকটও প্রকাশ করেন নাই।

আমার মনে হয়, আমরা যদি সাররূপে গোবর ব্যবহার করি, তাহা হইলেও হয়ত উক্তরূপ ফল পাইতে পারি। কোন গুণ দেখিতে না পাইলে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সে কারণে গোময় ভূমিতে সাররূপে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিতেন না। জাপানী সার অপেক্ষাও এক হিসাবে ইহা শ্রেষ্ঠ সার। চাউল দাইল, তৈল প্রভৃতি আমরা আহার করি এবং আমাদের ব্যবহার্য্য খড় ভূমি, খইল প্রভৃতি আমাদের বৃষ ও গাভীগণ আহার করে। ভূমির অমৃত গোময় সারের পরিবর্ত্তে আমরা ফিরিয়া পাই অমৃত দুগ্ধ; বৃষগুলির দ্বারা আমরা যত কাজ করাইয়া লইতে পারি, সে সমস্ত উপরি লাভ, অধিকন্তু আমাদের সংস্কারেরও ইহা অবিরোধী। বস্তুতঃ গো-বংশের উন্নতি ও বৃদ্ধিই আমাদের কৃষির ও জাতীয় উন্নতি সাধনের সহজ এবং বোধ হয় একমাত্র উপায়। গ্রামে গ্রামে গো-চারণ ভূমি স্থাপন, পাট ও অন্য ফসল কমাইয়া, গো ও মানবের প্রাণ ধারণের উপযোগী ধান্য, দাইল, সর্ষপ প্রভৃতির ক্ষেতের পরিমাণ বৃদ্ধি খোয়াড় (পাউণ্ড) গুলি তুলিয়া দেওয়া, গোয়াল, গো-বাহন প্রভৃতির অধিক মাত্রায় প্রবর্ত্তন এবং যথাসম্ভব গো-হত্যার নিবারণ প্রভৃতি উক্ত উদ্দেশ্য সাধক উপায়াবলী। জাপানীরা বলে এমোনিয়া, সোডা প্রভৃতির ব্যবহারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত হইয়া, অবশেষে অবসাদের লক্ষণ দেখায়। এ তর্ক সত্য কি অসত্য, তাহার বিচার না করিয়া আমাদের সহজলভ্য গোময় সারই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ব্যবহার করা উচিত।

জাপানীরা বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড চাষ ভাল বাসে না। জাপানে মানুষে চাষ করে, কাজেই তথায় এক এক জনের কর্ষণীয় ভূখণ্ডের পরিমাণ ক্ষুদ্র, যেন এক একটা ছোট বাগান। এই সমস্ত ছোট ছোট বাগানে জাপানী কৃষক দু-চারি স্থানে এক একরূপ ফসল জন্মাইয়া সমস্ত বাগানটী হইতে নানারূপ ফসল প্রাপ্ত হয়। যখনই বীজ উপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে সারও প্রদত্ত হয়। প্রায় এক কোটী চৌদ্দ লক্ষ পুরুষ এবং এক কোটী সাড়ে নয় লক্ষ স্ত্রীলোক অর্থাৎ জাপানের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। রেশম ও চায়ের চাষ প্রায় স্ত্রীলোকগণের একচেটীয়া।

জাপানী সখের বাগানগুলি ক্ষুদ্রায়তন বৃক্ষের জন্য প্রসিদ্ধ। একখানি ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছি, কোন অচ্ছিদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে চারা পুতিলে, এই চারার শিখরগুলি যদি বাড়িতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে গাছটী খর্ব্বাকার হয়। গাছের উপরে জাল বাঁধিয়া গাছগুলিকে উচু

হইতে দেওয়া হয় না। জাপানীরা অদ্ভুত দর্শন বস্তু মাত্রেরই সংগ্রহে অতিশয় যত্নশীল। বামন-বৃক্ষের উদ্যান তাহারই এক দৃষ্টান্ত। এই বাগানগুলিতে কেবল গাছ থাকে না, কৃত্রিম পাহাড়, নদী, পুকুর গাছপালা এমনই মানানসই আকারে রক্ষিত হয়, যেন একখানি ছবির বাগান বলিয়া মনে হয়।

জাপানীদের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে চাউল বার্লি, কলাই, ধান, তামাক, চা এবং ওট প্রধান।

রাশিয়ার কৃষি

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকেল বেলা চা খেয়ে সন্ধ্যার দিকে 'কৃষিপ্রদর্শনী' (Peasant's Home) দেখতে যাবার জন্যে ট্রামে চড়লাম। মস্কোর ট্রামের প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে উঠতে রীতিমত শক্তির প্রয়োজন হয়। এখানকার ট্রামগুলির ভেতরে দুধারে সরু দুখানি বেঞ্চ আছে—যাতে একজন কোরে যাত্রী বোসতে পারে, বাকী সব দাঁড়িয়ে যায়। ট্রামের পেছন দিকের দরজা দিয়ে সাধারণ যাত্রীদিগকে উঠতে হয় ও সামনে ড্রাইভারের পাশের দরজা দিয়ে নামতে হয়; অত্যন্ত বৃদ্ধ ও কচি ছেলের মায়েরা শুধু সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে পায়। ভেতরে এত ভীড় যে সামনের কিছুই দেখা যায় না, গাড়ী দাঁড়ালে বা ছাড়লে সমস্ত যাত্রী-মণ্ডলী জমাটবাঁধা মাংসপিণ্ডের মত একসঙ্গে সামান্য একটু আগু বা পিছু হেঁটে, হাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও পোড়ে যাবার ভয় নেই। ধারের জানালার বন্ধ কাচগুলি প্রচণ্ড শীতের জন্যে বরফের প্রলেপে বন্ধ, বাইরে দৃষ্টি চলে না—যারা জানালাগুলির পাশে বসবার সুযোগ পায় তা'হাদিগকে নিজেদের প্রয়োজন ও অন্যের অনুরোধে মাঝে মাঝে আঙুল বুলিয়ে কাঁচখানাকে পরিষ্কার কোরতে হয়, বাইরেটা দেখবার জন্যে। নিয়মিত অঙ্গুলি সঞ্চালনের ফলে বরফের শুভ্র প্রলেপের ওপর একটী গোলাকার ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তারই ওপরে এক চোখ লাগিয়ে গন্তব্যস্থানের দূরত্ব ঠিক করতে হয়। যেখানে নামতে হবে তার দু তিনটী ষ্টপের (stop) আগে থেকে বাইরে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও ঠেলাঠেলি করতে হবে। আমার সামনেই এক বেচারীর পায়ের একপাটী জুতা খুলে গেলো—সে চিৎকার কোরে বোল্লে আমার জুতা খুলে গেছে। প্রত্যেকেই শুধু মাথাটুকু নামালো তার বেশী কোমর বাঁকান সম্ভব ছিল না—বেচারীকে একপায়ে জুতো নিয়েই নামতে হোল। এই ভীড়ের মধ্যে ইচ্ছা কোরলে অনেকেই ট্রামের ভাড়া না দিয়ে নেমে যেতে পারে কিন্তু আমি বহুবার দেখেছি এক কোণের যাত্রী অপর কোনস্থিত কণ্ডাকটারকে অন্য যাত্রী সাহায্যে ভাড়া যাচিয়ে টিকিট নিচ্ছে—জনসাধারণের এমন সাধুতা দেশের পক্ষে গৌরবের জিনিষ। ট্রামের চালক পরিচালক (conductor) অধিকাংশই স্ত্রীলোক। এই সব স্বল্পপরিশ্রমের কাজে রাশিয়ার নারীরা আত্ম-নিয়োগ কোরেছে—পুরুষেরা কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, খনি ইত্যাদির কাজে কঠিন পরিশ্রমে লেগে আছে, সে হিসাবে মেয়েরা এখন 'বুর্জোয়া'।

ট্রাম থেকে নেমে অল্প কিছুদূর হেঁটে গিয়ে একটী স্বল্পালোকিত রাস্তার ধারে একটি বাড়ীতে

ঢুকলাম। এটা কৃষি-প্রদর্শনী; যদিও এর নামের ঠিক প্রতিশব্দ 'কৃষকদের আড্ডা' (Peasant's Home)। এখানকার পরিচালকের সঙ্গে গিয়ে আমার গাইড দেখা কোরলে ও আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। ইনি একজন আইন বিশেষজ্ঞ, ইংরেজী জানেন না; কাজেই গাইডের মারফত কথাবার্ত্তা বল্লেন।

জিজ্ঞাসা করলাম "রাশিয়ার সম্বন্ধে অনেক বইএ দেখেছি কোলহোজ (colhoze) ও সভহোজ (sovhoze) একই অর্থে ব্যবহৃত হোয়েছে। এই দুটী কি একই!"—না। কোলহোজ (colhoze) একত্রীভূত বিরাট কৃষিক্ষেত্র, যা কৃষকেরা নিজেরা স্বেচ্ছায় একত্র করেছে আর সভহোজ রাষ্ট্র পরিচালিত বিশাল কৃষিক্ষেত্র।"—

'কি ভাবে এই কৃষিক্ষেত্রগুলি পরিচালিত হয়?' জিজ্ঞাসা কোরলাম।

'কোলহোজ গুলিতে কৃষকেরা সমস্ত জমি হাল, বলদ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে যোগ দেয়; এখানে তারা সমানভাবে পরিশ্রম করে এবং সমানভাবে এর যা কিছু লভ্য তার ভাগ নেয়। কেউ কম বা বেশী জমি কিংবা যন্ত্রপাতি দিয়েছে। যোগে লভ্যাংশের বাঁটোয়ারায় কম বেশী হয় না'—গাইড বুঝিয়ে বল্লে। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম 'তা হোলে তোমাদের চাষারা আসলের লভ্যাংশ যখন পায়, তারা অনায়াসে তা জমিয়ে রাখতেও পারে?'

এদেশের লোক অর্থ জমাতে পারে কিনা এই কথাটা জানবার জন্যে পূর্ব্বে অন্যান্য ব্যাপারে আমার গাইডকে নানাদিক থেকে প্রশ্ন কোরেছিলাম, কাজেই আবার এ প্রশ্নে সে কপট ক্রোধে বল্লে, 'কি দুষ্টলোক তুমি, ঘুরে ফিরে একই কথা জিজ্ঞাসা কোরছো।'

হেসে বল্লাম, কারণ এই খানেই ত-রাশিয়ার নূতন মতবাদের বৈশিষ্ট্য। কমিউনিজম মতবাদের এই অভিনবত্বের জন্যেই ত আজ সারা পৃথিবী তোমাদের দিকে আশা আশঙ্কার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। কাজেই কৃষকেরা লাভ পায় কিনা, ঐ লাভ তারা স্বেচ্ছামত জমাতে পারে কিনা জানতে চাওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

মৃদু হেসে গাইড উত্তর দিলে, কড়া কমিউনিষ্ট নীতি অনুসারে কৃষকদিগকে তাদের পারিবারিক প্রয়োজনমত শস্য দেওয়া হোতো মাত্র; তার অতিরিক্ত সব শস্য ষ্টেট নিয়ে নিত। কিন্তু ক্রমশঃ এতে কৃষকেরা ক্ষেপে উঠলো কারণ এর মূলে ষ্টেটের কর্ম্মচারীদের কিছু গলদ ছিল। যাদের উপর কৃষকদের প্রয়োজন ধার্য্যের ভার ছিল তাদের অনেকেই কতকটা পূর্ব্ব আক্রোশ বশে, কতকটা অজ্ঞতার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ন্যায্য প্রয়োজনের অনেক কম শস্য তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোরছিল এতে কৃষকেরা অর্দ্ধভুক্ত হোয়ে ক্ষেপে উঠল। তারা ষ্টেটের ওপর সমস্ত সহানুভূতি হারিয়ে যত কম পারলে উৎপন্ন কোরতে লাগলো যাতে তাদের প্রাপ্য নেওয়ার পর ষ্টেট আর কিছু না পায়। তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে ষ্টেটের ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কায় হত্যা কোরতে লাগলো এর ফলে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে। দেশের উৎপন্নের যে পরিমাণ রাষ্ট্র ধার্য্য কোরছিল তার অনেক কম উৎপন্ন হোলো; সহরগুলিতে শস্য এসে না পৌঁছানতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সেখানেই তীব্রতর হ'য়ে

উঠলো। এই মারাত্মক অবস্থার প্রতীকার কল্পে লেনিন পূর্ব্ব ব্যবস্থার বদলে 'নেপের' (Nep—New Economic Policy) প্রাধান্য করেন। এই নীতি অনুসারে কৃষকেরা শস্যের একটা ভাগ রাষ্ট্রকে দিয়ে বাকী অংশ নিজেরা পাবার হক্‌দার হয়। এর পর নেপের পরিবর্ত্তে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হোয়েছে। এখন ষ্টেট চেষ্টা কোরেছে দেশের সমস্ত ছোট কৃষকদিগকে একত্র কোরে বড় বড় 'কোলহোজের' প্রতিষ্ঠা কোরতে এই সব কোলহোজগুলিকে রাষ্ট্র ট্রাকটার, কম্বাইন (combine—কৃষিযন্ত্র) বাছাই বীজ আর, ঘোড়া বলদ প্রভৃতি দিয়ে যথা সম্ভব সাহায্য করে।'

আবার জিজ্ঞাসা কোরলাম 'ব্যক্তিগত কৃষকদিগকে এই সব কোলহোজে যোগ দিতে বাধ্য কোরতে রাষ্ট্র কি উপায় অবলম্বন করে?

—'উঃ, কি চালাক লোক তুমি সর্ব্বদাই খালি চেষ্টা কি ভাবে ষ্টেটের বিরুদ্ধে কিছু জানতে পাবো।'—

তার মুখভঙ্গী দেখে আমি হেসে ফেল্লাম। তাকে বোঝালাম যে সত্যি আমি জিজ্ঞাসু হোয়ে ঐ কথা জানতে চেয়েছি, ষ্টেটের বিরুদ্ধে কিছু জানাবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রশ্ন করি নাই।

ভ্রু কুঁচকে তন্বীসুন্দরী বোল্লে, হ্যাঁ, তা আমি জানি।' পরে সহজকণ্ঠে বোল্লে' রাষ্ট্র কৃষকদিগকে এই সব সমবায় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে জবরদস্তি কোরে বাধ্য করে না; প্রচার কার্য্যের সাহায্যে, কোলহোজে যোগ দিলে রাষ্ট্র যে সব সুবিধা দেয় সেগুলোর প্রলোভনে ছোট খাট কৃষক ক্রমশঃ লোপ পেয়ে আসছে। সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেশে ক্রমশঃই বাড়ছে।' জিজ্ঞাসা কোরলাম 'পূর্ব্বে যে সব সুবিধার কথা উল্লেখ কোরেছ তা ছাড়া অন্য কি বিশেষ সুবিধা রাষ্ট্র কোলহোজ গুলিকে দেয়?"

—"কারখানার শ্রমিকদের সকল সুবিধাই তারা পায়। এদের নিজেদের 'সাধারণ ভোজনশালা, ক্লাব, রেডিও, সিনেমা, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, হাঁসপাতাল, স্নানাগার প্রভৃতি আছে। তাছাড়া সাধারণ সমবায় কৃষিক্ষেত্রগুলি (collective farm) ব্যক্তিগতভাবে যারা চাষ করে তাদের চেয়ে আগে ছাই, বীজ, সার ও ট্রাকটার

প্রভৃতি যন্ত্রপাতি কম দরে এবং কম ভাড়ায় পায়।”

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম ‘ষ্টেট কি কোলহোজের কাছেও যন্ত্রপাতি ভাড়া নেয়?”

—“নিশ্চই, কোলহোজ এবং যে প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে দুইটী ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কাজেই এ প্রতিষ্ঠান অপরটীর কাছ থেকে ভাড়া না নিলে বা না দিলে প্রকৃত লাভ লোকসানের হিসাব কেমন কোরে হবে? ব্যক্তিগত কৃষক যখন রাষ্ট্রের জিনিষ নেয় তাকে চড়া হারে ভাড়া বা দাম দিতে হয়, কাজেই কোলহোজগুলির কাজ থেকেও ভাড়া বা দাম নেওয়া হয়। এই সব বাদ দিয়ে যা লাভ থাকে তার কিছু রাষ্ট্রকে দিয়ে বাকীটুকু সভ্যেরা সমানভাবে পায়। এখানে সকলে একত্রে সমবেতভাবে নিজেদের গ্রাম ও জমি নিয়োজিত করায় ব্যক্তিগত চাষার চেয়ে এর সভ্যেরা বেশী উৎপন্ন করে, কাজেই ভাগেও পায় বেশী’—

বল্লাম “কিন্তু যাদের বেশী জমি আছে তারা তাদের জমি সবার সঙ্গে মিশিয়ে সকলের সঙ্গে সমান ভাগ নিতে রাজী হবে কেন?”

ঘৃণার স্বরে সে বল্লে “ও আপনি কুলকদের (Kuloks) কথা বোলছেন; তাদিগকেই ত আমরা ধ্বংস কোরতে চাই—তারাই ত আমাদের শত্রু, তারা ত রাজী হবেই না”—

এর পর একটু থেমে গাইড বল্লে “রাত্রি বেশী হয়ে আসছে, এবার প্রতিষ্ঠানটী বন্ধ হবে। চল এর হলটী দেখিয়ে আনি।”

পরিচালকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চল্‌তে চল্‌তে জিজ্ঞাসা করলাম ‘আচ্ছা সভহোজ গুলিতে কি নিয়মে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়?”

—“সভহোজগুলো ঠিক যেন একটা কারখানা। এর সমস্ত খরচ ও উৎপন্নদ্রব্য ষ্টেটের; এর লভ্যাংশ আর ভাগ হয় না; কৃষকেরা কারখানার শ্রমিকের মত মজুরী পায়। এখন সভহোজের বদলে কোলহোজের সংখ্যা বাড়ানর দিকে ষ্টেটের নজর বেশী”। প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে বাড়ীটীর অপর অংশে ‘প্রদর্শনী হলে’ এলাম। প্রকাণ্ড হল; দেওয়ালে নানা বিষয়ের মানচিত্র; ঘরটী নূতন ধরণের কৃষকদের গৃহ, ফসলের গোলা (silo), বীজরক্ষার পন্থা প্রভৃতির মডেলে (model) ও নানা জাতীয় ফসলের ও শস্যের নমুনায় ভর্ত্তি। এক ভদ্রলোক দশবারজন রুশীয় কৃষকদের একটী দলকে ছড়ি দিয়ে মানচিত্রগুলির নানাস্থান নির্দ্দেশ কোরে কোথায় কোলহোজ প্রবর্ত্তিত হোয়েছে ও কোলহোজের কি সুবিধা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। আমার গাইড ম্যাপগুলি নির্দ্দেশ কোরে বোলে দিলেন কোনটা অধিবাসীর ঘনত্ব প্রকাশক, কোনটা কোলহোজের প্রসারতা জ্ঞাপক, কোনটা বিভিন্ন শস্যের জন্মস্থান নির্দ্দেশক। কাচের দ্রষ্টব্যাধারে নানা জাতের চাল গম, তুলো, চা, সূর্য্যমুখী (বীজ থেকে তেল হয়) আলু, শশা, ও অন্যান্য নবপ্রবর্ত্তিত বা উন্নীত ফসলের নমুনা ছিল। চা, তুলো, ও ধানের চাষ ওরা খুব ব্যাপকভাবে কোরতে লেগেছে—যে গতিতে ওদের উৎপন্ন দ্রব্য বেড়ে চলেছে শীগ্‌গিরই জগতের বাজারে ওরা একটা বিভ্রাট বাধাবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীনীতির পরিকল্পনার অনুসারে প্রথম পাঁচ বছরেই দেশ থেকে ‘কুলক’ অর্থাৎ ছোটখাট জমিদার নিশ্চিহ্ন করার ও সাধারণ কৃষকের শতকরা কুড়ি ভাগ

সমবায় কৃষিক্ষেত্রে মিশিয়ে দেওয়ার কথা! ১৯৩০ সালে কার্য্যতঃ শতকরা ২২'৪ ভাগ ও ১৯৩১ সালে ৬২'২ ভাগ এবং ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে ৬২'৫ ভাগ কৃষক সমবায় কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্গে মিশে গেছে। সরকারী হিসাব দৃষ্টে দেখা গেল ১৯৩৩ সালে (যখন আমি রাশিয়ায় ছিলাম) প্রকৃতপক্ষে দেশের জমির শতকরা ২০ ভাগ ব্যক্তিগত চাষার হাতে আছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৩৩ সালে (যখন এটী শেষ হ'ল) মোট ১৪১০ লক্ষ হেকটেয়ার জমিতে (১ হেকটেয়ার —প্রায় আড়াই একর) আবাদ করবার কথা; কিন্তু ফলতঃ ১৯৩১ সালেই ১৩৭০'৫ লক্ষ হেকটেয়ার জমিকে আবাদযোগ্য করা হয়েছে। কৃষিকাজের জন্য ধার্য্য মূলধন ১৯৩১ সালে ৩৬,০০০ লক্ষ রুবল ছিল, ১৯৩২ সালে ঐ বাবদ ৪৩,০০০ লক্ষ রুবল ধার্য্য করা হয়—এতে পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত অঙ্কের প্রায় দেড়গুণ বেশী রুবল ব্যয়িত হয়। রাষ্ট্রের হিসাব মত কোলহোজ ও সভহোজগুলি দেশের ২০'৫ লক্ষ কুশলী কর্ম্মী Skilled labourer কে কাজ দিয়াছে। ১৯৩১ সালে সভহোজ ও কোল হোজগুলি দেশের মোট উৎপাদিত পশমের শতকরা ৩ ভাগ, দুধের ১৫ ভাগ, মাংসের ২০ ভাগ উৎপন্ন করে।

ওপরের হলটি দেখে আমরা অন্য একটি নীচের তলার ঘরে গেলাম। এখানে বড় বড় কম্বাইন (Combine) শস্য কাটা ঝাড়াই ও বস্তাবন্দী এক সঙ্গে হয়, অপরদিকে বড়গুলি আঁটি বেঁধে গাদা হয়) লাঙ্গল, শস্য পুঁতবার কাটবার ও আরো অনেক যন্ত্র রয়েছে; কৃষক দিগকে এই সব যন্ত্রের সুবিধা বোঝান হয় ও কোলহোজে যোগ দিলে এগুলির সাহায্য পাবার ভরসা দেওয়া হয়। এই প্রচণ্ড ঘরটির দেওয়ালে কৃষি সম্বন্ধে পঞ্চবার্ষিকী নীতির পরিকল্পনাগুলি টাঙ্গান আছে। রাষ্ট্রের হিসাব মত দেখা যায় যেখানেই ট্র্যাকটার ষ্টেশন আছে সেখানেই সমবায় নীতিতে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়েছে; অর্থাৎ যেখানেই যন্ত্রের সাহায্য পেয়েছে সেখানেই কৃষকরা শীঘ্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; এই জন্যে রাষ্ট্র ট্র্যাকটার ষ্টেশনগুলির সংখ্যা আরো অনেক বাড়াবার সংকল্প কোরেছে। ১৯৩০ সালে ২৬০টী ট্র্যাকটার ষ্টেশন কাজ করে; ১৯৩১ সালের বসন্তে প্রায় ১১০০টি ষ্টেশন ও ঐ সালের শরৎকালে ১৪০০টি ষ্টেশন কাজ আরম্ভ করে। ১৯৩২ সালে আরো ১৭০০টি নূতন ষ্টেশন খোলা হোয়েছে কাজেই ঐ সালে এই ষ্টেশন গুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১০০টি। এক একটি ট্র্যাকটারের পুরো কাজের জন্য ন্যূনপক্ষে ২০০ হেকটেয়ার জমি বরাদ্দ আছে। রাষ্ট্রের হিসাব মত অন্ততঃ ন'লক্ষ ট্র্যাকটার দেশের সমস্ত জমি চাষের জন্য প্রয়োজন এবং এ ছাড়া আরো অন্ততঃ একলক্ষ ট্র্যাকটার ভাঙ্গা বা খারাপ হওয়ার সময় জোগান দেবার জন্যে মজুত রাখা দরকার। এই সব ট্র্যাকটার নির্ম্মাণের জন্যে রাশিয়ার রাষ্ট্র ১৯৩১ সালে ষ্টালিনগ্রাড ও খারকোভে দুটী বিরাট কারখানা তৈরী কোরেছে—এদের এক একটী বৎসরে পঞ্চাশ হাজার ট্র্যাকটার তৈরী কোরবে। ১৯৩২ সালে চৌলিয়াবিনস্ক সহরে আর একটী সমশক্তিসম্পন্ন কারখানা নির্ম্মিত হোয়েছে। লেনিনগ্রাডের পিউটিলোভ কারখানা ১৯৩২

সালের জানুয়ারীর মধ্যে চল্লিশ হাজার ট্র্যাকটার তৈরী করে। এর পরে আরো কয়েকটী ট্র্যাকটার কারখানা তৈরী হোয়েছে, তাদের উৎপন্নের সঠিক খবর আমি জানি না।
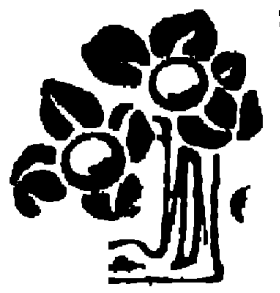
এই সব অঙ্ক ও হিসাব থেকে মনে হয় রাশিয়া অতি দ্রুত তার কৃষিকে যন্ত্রপাতি সাহায্যে সমৃদ্ধ করে তুলবে। তবে গ্রামে কোন কৃষিক্ষেত্র দেখবার সুযোগ না পাওয়ায় দেশের সত্যকার অবস্থা জানবার সুবিধা আমার হয় নাই।*

* রাশিয়ার কৃষি সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে লেখকের Modern Agriculture পড়িতে অনুরোধ করি। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র—

রাশিয়ার চাষের উন্নতি

অনেক হয়ত জানেন পৃথিবীর মধ্যে যে দেশ কৃষিবিদ্যার উন্নতি নিয়ে সকলের চেয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছে সে হচ্ছে রাশিয়া। শুধু মাথা ঘামানো নয়, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর রাশিয়া অতি দ্রুত বেগে এই পথে এগিয়ে চলেছে। যে দেশের কৃষক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আধপেটা খেয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে আজ সে দেশের কৃষি পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ দেশের কৃষিবিজ্ঞানের পাশে দাঁড়াতে পারে। রাশিয়ার চাষারা এখন যা মাইনে পায় তা এক গ্রেট ব্রিটেন বা আমেরিকা ছাড়া অন্য যে কোন দেশের চাষার চেয়ে কম নয়। রাশিয়ার চাষারা যেমন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তা সকল জাতির পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু।

কৃষকদের উন্নতি মানেই সমগ্র রাশিয়ার উন্নতি—কারণ রাশিয়ার লোকদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের উপর চাষ করে খায়। চাষাদের ঘরে এই যে স্বচ্ছলতা এসেছে একে এনেছে রুশ সরকারের বৈপ্লবিক নীতি। আগেকার দিনের চাষাদের সমস্ত নিয়ম কানুন একেবারে ওলোট পালট হয়ে গেছে। আগেকার আমলের জমি জোতের প্রথা, গুরুতর করের প্রথা প্রভৃতি চাষাদের পঙ্গু করে রেখেছিল, তারা চাষাদের ভাল যন্ত্র কিনতে পারতো না—ঘরে টাকা নেই, কিনবে কি দিয়ে? যন্ত্রের অভাবে শক্ত মাটি চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সকলেই খুঁজত নরম জমি অথচ নরম জমির সমস্ত অধিকার ছিল জমীদারের হাতে তারা খুব চড়া খাজনা না হলে সে সব জমি ছাড়ত না। চাষার ঘরে এমন পয়সা ছিল না যে জমির জন্যে ভাল সার কেনে, কারণ তার যা কিছু আয় হত, দেনা শোধ করতেই সমস্ত চলে যেত। আরো অসুবিধে ছিল প্রত্যেক চাষার সমস্ত জমি এক জায়গায় থাকত না; টুকরো টুকরো ভাবে দূরে হয়ত বিশ পাঁচশ জায়গায় ছড়ানো থাকত। গ্রাম থেকে বেরিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে চাষাকে জমির তদারক করতে হত। এই সব কারণে ক্ষেত্রের ফসলও ভাল হত না।

তার উপর ১৮৬০ খৃঃ থেকে ১৯০০ খৃঃ মধ্যে যখন দেশে শতকরা ৭২ জন কৃষক বেড়ে গেল, জমির চাহিদাও গেল বেড়ে। খাজনা চড়ে গেল আরও; চাষাদের কষ্ট বাড়ল বই কমল না, মাঝখান থেকে জমীদারের সুবিধা হয়ে গেল। এই ভাবে সকল দিক দিয়ে রুশ-জমীদার ও Kulaksদের হাতে গরীব চাষাদের দুর্গতির সীমা ছিল না।

এই রকম যখন রাশিয়ার অবস্থা তখন দেশে এল রাষ্ট্রবিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে তার কৃষি-জগতেও বিপ্লব ঘটে গেল। পুরোনো বিধান ধ্বংস হয়ে এল নতুন বিধি। জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার কারো রইল না; খাজনার প্রথা গেল উঠে, দাম দিয়ে জমি কিনতেও

হল না; সকলে বিনামূল্যে জমি পেতে লাগল। গরীব চাষাদের কাঁধ থেকে একটা মস্ত বড় বোঝা গেল নেমে।

এখনকার চাষারা জানে দেশজোড়া জমি পড়ে রয়েছে। লাঙল চষে খাও—কেউ জমির দামও চাইবে না, খাজনাও চাইবে না। সরকারী কর গেছে কমে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে যে শতকরা ৩৫ জন অত্যন্ত গরীব তাদের দীর্ঘকালের মত সব রকম করের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এক কথায়, চাষাদের সাহায্যের জন্যে যতদূর করা সম্ভব সবই সরকার থেকে করা হয়েছে। কিন্তু শুধু এই টুকুই কৃষির উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট হল না। এর চেয়ে ঢের বেশী ওলোট পালট দরকার হয়ে পড়ল।

তখনকার দিনে চাষের জমি ছিল ছোট ছোট। সোভিয়েটরা দেখলে চাষের উন্নতি যদি করতে হয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করতে হবে। ছোট জমিতে চাষের ভাল সুবিধে হবে না, চাষের জন্যে চাই বড় বড় ক্ষেত। এই উদ্দেশ্যে তারা প্রকাণ্ড বহু সরকারী কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি করল। তাদের প্রত্যেকটির আয়তন ৫০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ 'একর' পর্য্যন্ত। এই সব বড় বড় কৃষিক্ষেত্রের কাজ সরকারী তদ্বিরে ভাড়া করা মজুর দিয়ে চালানো হয়, মজুরেরা খুব উচ্চ হারে মাইনে পায়; মাসে ৬০ রুবল থেকে ১৪০ রুবল পর্য্যন্ত। প্রতি চারদিন অন্তর একদিন করে তারা ছুটি পায়। এ ছাড়াও তারা এমন অনেক সুবিধে ভোগ করে যে তাদের সত্যিকারের মাইনে আরো অনেক বেশীতে দাঁড়ায়।

কৃষকদের আদর্শের জন্যে সরকারী কৃষিক্ষেত্র হয়েছে। এই সমস্ত আদর্শ ক্ষেত্রে পুরানো দিনের অভ্যাস মুছে ফেলে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে চাষ করা হচ্ছে। যন্ত্রের সাহায্য নেওয়ায় উৎপাদন তো বেড়ে গেছেই, তা ছাড়া একজন চাষা একাই বহু জমি চাষ করতে পারছে। যে সকল কঠিন জমি আগেকার চাষারা চষতে পারত না, Tractorএর সাহায্যে তাতে অনায়াসে চাষ হচ্ছে। এই ভাবে চাষের অনুপযুক্ত ৫০,০০০,০০০ 'একর' জমি এখনও চাষের কাজে লাগছে।

আরো উন্নতি কেমন করে করা যায় এই উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে বৃক্ষ জন্মান এবং যন্ত্র পরীক্ষার কাজে গবেষণা করা হয়, কাজের জন্যে ছাত্র নেওয়া হয়, তারা ক্ষেতে গিয়ে এবং ল্যাবরেটারিতে বসে কৃষিবিষয়ক রাসায়নিক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণা করে। এই সব ক্ষেত থেকে যা শস্য হয় তা সরকার থেকেই দেশে-বিদেশে চালান দেওয়া হয়, উপরন্তু আশ-পাশের চাষাদের এই আদর্শে চাষ করবার জন্যে সাহায্য করা হয়; তাদের মাটি চষা যন্ত্র বীজ ছড়ানের যন্ত্র, সতেজ শস্যের বীজ প্রভৃতি ধার দেওয়া হয়। তারা এইখান থেকে শিক্ষা, উপদেশ এবং নূতন প্রণালীতে চাষ করবার সাহস পায়। Statistics থেকে বোঝা যায় এই চেষ্টা কতদূর সার্থক হয়েছে। রাশিয়ার মধ্যে সকলের চেয়ে বড় কৃষিক্ষেত্র হচ্ছে গিগান্ট সরকারী কৃষিক্ষেত্র। সারা পৃথিবীর মধ্যেও এত বড় কৃষিক্ষেত্র আর কোথাও নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এইখান থেকে রাশিয়ার ৪৭টা বিভিন্ন Collective farmএ বড় বড় চাষের যন্ত্র চালান দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ Uralsএ ১০৭ খানা বীজ বপনের যন্ত্র পাঠানো হয়েছে। প্রতি বছরেই সরকারী শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ বেড়ে

চলেছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৩৫ লক্ষ, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৪৫ লক্ষ এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৯৫ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে চাষ হয়েছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গড়ে প্রতি 'একরে' ৬৩৭ পাউণ্ড গম জন্মাতো ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মায় ১৩৪৪ পাউণ্ড; শুধু তাই নয়, চাষের খরচও অনেক কমে গেছে। হল্যাণ্ড ইংলণ্ড ও জার্ম্মানি ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার অন্য কোন দেশেই 'একর' প্রতি এত গম উৎপন্ন হয় না।

"সোভিয়েট আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে" কেবল যে শস্যের চাষ হয় তা নয়। দুধ, গরু, ভেড়া, শূয়ার, হাঁস, মুরগী, চিনি, তুলো, তিসি প্রভৃতি বহু জিনিষ উৎপন্ন হয়। এর জন্যে যা জমি লাগছে তার পরিমাণ ৬৫,০০০,০০০ 'একর'।

এই আদর্শ ক্ষেত্র ছাড়া আর এক রকম কৃষিক্ষেত্র আছে তার নাম Collective farm বা সংহত কৃষিক্ষেত্র। এগুলি সরকারী জিনিষ নয়, কৃষকরা সমবেত হয়ে এগুলিকে গড়ে। এখানে যারা খাটে তারা মাইনে পায় না—সব শুদ্ধ যা উৎপন্ন হয় সকলে সমান ভাবে ভাগ করে নেয়। কখনো একদল চাষা, কখনো গ্রামশুদ্ধ সব চাষা এক জোট হয়ে তাদের যা কিছু সম্পত্তি আছে—গরু, ঘোড়া জমি, জমা, সব একত্র জড় করে একটা বড় কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। সমবায় সমিতি বা সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তারা চাষের যন্ত্র ভাড়া করে এনে (এদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে এই রকম প্রতিষ্ঠান খোলা হয়) চাষ করে।

রাশিয়ার চাষারা ব্যক্তিগত চাষের চেয়ে সংহত চাষের সুবিধে যে কত বেশী তা বুঝতে পেরেছে। তাই দলে দলে চাষা আজ ঐ দিকে ঝুঁকছে। নীচের হিসেব থেকে বোঝা যাবে সংহত এবং সরকারী কৃষিক্ষেত্রে শস্যের চাষের কি দ্রুত উন্নতি হচ্ছে—

	সংহত ক্ষেত্র	সরকারী ক্ষেত্র
১৯২৮ খৃঃ	৩৮'৫ লক্ষ একার	৩৭'৫ লক্ষ একার
১৯২৯ খৃঃ	৪৯'০ লক্ষ একার	১১৫'০ লক্ষ একার
১৯৩০ খৃঃ	৮৮'৫ লক্ষ একার	৪০৫'০ লক্ষ একার

বর্ত্তমানে রাশিয়ায় শতকরা ৬০ জন চাষা সংহত কৃষিক্ষেত্রে যোগ দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করে প্রচুর লাভ করছে। বাকি ৪০ জন চাষা এখনও সেই পুরোনো প্রথা ছাড়তে পারেনি। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই যখন তারা বুঝবে যে সংহত উপায়ে অপর চাষীরা বেশী লাভবান হচ্ছে, তারাও ঐ প্রথা অবলম্বন করবে।

রাশিয়ার কৃষিবিজ্ঞানে এ এক নতুন যুগ—এ যুগে কৃষকরা দারিদ্র্যের দুঃখ ভুলে গেছে। যুগ যুগ ধরে যে চাষাকে গেঁয়ো, বর্ব্বর mouzhik বলে লোকে ঘৃণা করে এসেছে, তাদের মধ্যে থেকে জেগে উঠেছে শিক্ষিত সভ্য কৃষকশ্রেণী।

ইটালীর পল্লী-প্রাণতা ও চাষ

ইটালীর হর্ত্তাকর্ত্তা মুসোলিনী ঐ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহার মতে চাষই দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। এজন্য ইটালীর গ্রামের দিকে তিনি অধিক মনোযোগ দিয়াছেন, এবং গ্রামে যাহাতে ভাল ভাবে চাষ হয় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ওদেশে এমন আইনও হইয়াছে যে, লোকে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইউরোপের মধ্যে ইটালীই ম্যালেরিয়া প্রধান দেশ ছিল, এখন আর সে অবস্থা নাই। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইটালী এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। আজ রুসিয়ার দিকে যেমন সমগ্র পৃথিবী চাহিয়া আছে, ইটালীর দিকেও ঠিক তাই। ইটালীর চাষ সম্বন্ধে আমরা আজ কিছু আলোচনা করিতে চাই।

গম ইটালীবাসীগণের প্রধান খাদ্য; কিন্তু ৮ বৎসর পূর্ব্বেও ইটালীর অধিকাংশ গম বিদেশ হইতে আসিত। কেবলমাত্র পার্ব্বত্য কৃষকগণের মধ্যে এক বদ্ধমূল প্রথা আছে যে, তাহাদের নিজেদের আবশ্যকীয় গম তাহাদের নিজেকে উৎপন্ন করিতেই হইবে। গম কিনিবার অর্থ থাকিলেও তাহারা কখনই কিনিয়া গম খাইবে না। তদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য স্থানে যে গম হয়, তাহাও দেশবাসীগণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। তাই বিদেশ হইতে আমদানী গমে ইটালীবাসীগণকে জীবন ধারণ করিতে হইত। মুসোলিনী দেখিলেন যে, ইহা দেশের পক্ষে ভয়ানক সাংঘাতিক অবস্থা। এমন দিন আসিতে পারে যে দিন হয়ত বিদেশী জাহাজ আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন ইটালীকে শুকাইয়া মরিতে হইবে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যই মুসোলিনী দেশেই অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন।

ইটালীর জমি আমাদের দেশের ন্যায় সমতল নহে। ইহার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জমি পার্ব্বত্য। সুতরাং ইহাদের চাষ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর। তারপর ইটালীর আবহাওয়াও আমাদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট—বৃষ্টিপাত মোটেই সুবিধাজনক নহে, আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রায়ই হইয়া থাকে, শুষ্ক গরম হাওয়ায় প্রায়ই ফসলের অনিষ্ট করে। পূর্ব্বে এদেশের চাষীদের কৃষিসম্বন্ধে জ্ঞানও খুব কম ছিল। এখন তাহাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যে সকল জমিতে গম হয়, সেই সকল জমির উৎপন্ন ফসল যাহাতে আরও বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা সম পরিমাণ জমিতে অধিক ফসল (Intensive cultivation) উৎপন্ন করিবার জন্য সমধিক চেষ্টা হইতেছে। ইটালী আর বিদেশ হইতে কোন ফসল আমদানী করিবে না এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতেছে।

দেশের মধ্যে গম চাষের উন্নতি সাধন করিবার জন্য ১৯২৫ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে মুসোলিনী একটী কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিয়াছেন, তাহার নাম "The Permanent Wheat Committee"। ইটালীতে ৯২টী প্রদেশ আছে। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক গম-সমিতি গঠিত হইয়াছে ; ইহারা কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্যে সহায়তা করে। মুসোলিনী নিজে কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি। বড় বড় কর্ম্মচারীগণ এই সমিতির সভ্য আছেন। তদ্ব্যতীত ১১ জন বিশেষজ্ঞও (experts) এই সমিতির সভ্য। প্রাদেশিক সমিতিতে ১২ হইতে ২০ জন সভ্য থাকেন। তাঁহারা আবশ্যকমত গভর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য করিতে পারেন। প্রাদেশিক সমিতির সভ্যগণ কাজ করিবার জন্য সামান্য সামান্য পকেট খরচা পাইয়া থাকেন। আবার আবশ্যক হইলে তাঁহারা অবৈতনিক ভাবেই কাজ করিয়া থাকেন। মুসোলিনীর বৈদ্যুতিক শক্তিতে সকলে দেশহিতব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই সকল প্রাদেশিক সমিতির অফিস খরচা প্রভৃতি কিছুই নাই বলিলেই হয়। গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের অফিসেই ইহাদের কার্য্য হইয়া থাকে। এই ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সমিতিই বহন করিয়া থাকে।

দুইটী প্রধান নীতিকে ভিত্তি করিয়া এই সকল গম-সমিতি কার্য্য করিতেছে,—

(১) যে সকল জমিতে পূর্ব্ব হইতে গম হয়, তদপেক্ষা গমের জমি আরও অধিক বাড়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিংবা অন্য যে সকল জমিতে কড়াই বা অন্য ফসল হয়, তাহাতেও গম উৎপন্ন করিবার আবশ্যকতা নাই।

(১) অপর পক্ষে যে সকল জমিতে গম হয়, তাহারই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যাহাতে আরও বাড়ে তাহাই করা আবশ্যক।

এই দুইটী মূল নীতি অবলম্বন করিয়া ঐ সকল সমিতি কাজ করিতেছে, কৃষকদিগকে উন্নত প্রণালীতে চাষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—দেশমধ্যে চাষের এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ফলে, পূর্ব্বাপেক্ষা ইটালীতে অধিক পরিমাণ গম উৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত দেশের মনোযোগ গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় এ দেশের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। ইটালীকে পল্লীপ্রাণ করিয়া তোলাই (Ruralisation of Italy) মুসোলিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, দেশের উন্নতির মূল পল্লী-উন্নতির মধ্যেই নিহিত আছে।

ইটালীর ন্যায় আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টিও পল্লীর দিকে আকৃষ্ট হইলে দেশের দুরবস্থা অচিরে দূরীভূত হইয়া যায়।

বাংলার কৃষি ও কৃষক

বাংলার কৃষকদিগকে বাঁচাইয়া কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য সর্ব্বত্রই আলোচনা চলিতেছে। এবিষয়ে আইন প্রণয়নের চেষ্টারও বিরাম নাই। কিন্তু আইনের পরিবর্ত্তে কৃষকদের অর্থেরই বেশী দরকার। এই প্রদেশের আর্থিক ব্যবস্থার মূলে অনেক গলদ রহিয়াছে বটে, কিন্তু পল্লী-গ্রামস্থ জন-সাধারণের ঋণগ্রহণ সম্পর্কীয় সমস্যা-সমাধানের অভাবই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক গলদ। কৃষকদের আথিক অবস্থা অত্যন্ত অস্বচ্ছল; তদুপরি কৃষকেরা ঋণভাবে জর্জ্জরিত।—ঋণের পরিমাণ প্রায় ১শত কোটী টাকা। এই হতভাগ্য কৃষক-কুলের আর্থিক স্বচ্ছলতা না ঘটিলে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কৃষকদের অবস্থার একটু উন্নতি হইলেই জন-সাধারণের ও সরকারের আয় বৃদ্ধি অনিবার্য্য। ইহাতে দেশের চেহারাও ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে একদিকে যেমন ব্যয়হ্রাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। সামাজিক উৎসবাদির ব্যয়ভার হ্রাস এবং অন্যান্য উপায়ের দ্বারা কৃষকদের আথিক অবস্থার উন্নতি করা যায়। নিম্ন-লিখিত উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারে—

(১) অল্পসুদে কৃষকদের টাকা ধার দেওয়া; (২) কৃষি-জাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবস্থা করা (৩) উন্নত ধরণের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা, (৪) জাতির স্বাস্থ্য গঠন; (৫) সঞ্চয়শীলতা, মিত ব্যয়িতা এবং শিক্ষার দ্বারা কৃষকদের চরিত্র গঠন; (৬) উন্নত ধরণের চাষ করিবার প্রণালী; (৭) অবসর সময়কেও কাজে লাগাইবার চেষ্টা; (৮) পরস্পরের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা কোন কিছু নষ্ট হইতে না দেওয়া; (৯) সামাজিক উৎসবাদির সময়ে অযথা ব্যয়ের বিরতি। কোন জিনিষ উৎপন্ন করিতে হইলে উপযুক্ত মূলধনের আবশ্যক। কিন্তু যাহাদের দুবেলা ভাত জোটে না, তাহারা মূলধন পাইবে কোথায়? সুতরাং মূলধনহীন চাষীরা বাধ্য হইয়াই ধার করিয়া কার্য্য চালায়। তাহারা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণেই কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়—

(১) জমির স্থায়ী উন্নতি বিধান; (২) চাষ করিবার জন্য স্থায়ী মূলধন বলিয়া কথিত গরু এবং অন্যান্য উপকরণ প্রভৃতি ক্রয়; (৩) জমিতে সার দেওয়া, বীজ ক্রয়, ভাড়াটে মজুর সংগ্রহ এবং আবশ্যক হইলে দুর্ভিক্ষ বা শারীরিক পীড়াদির প্রতিবিধান; (৪) শস্যাদি কম পড়িয়া গেলে বৎসর চালাইবার খরচ; (৫) মামলা-মোকদ্দমা এবং সামাজিক কর্ত্তব্য-পালন প্রভৃতির জন্য অর্থ সংগ্রহ ও (৬) দূরদর্শিতার অভাবের জন্য শস্যাদির দর কমিয়া গেলে সংসারিক অনটনের প্রতীকার।

কর্জ্জকরা দোষের নয়; কিন্তু অযথা ব্যয়ের জন্য কর্জ্জ করিলে উহা অবশ্যই নিন্দনীয়। বাংলার কৃষকেরা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হওয়ায় নির্ব্বোধের মত সঞ্চিত অর্থ অযথা ব্যয় করিয়া ফেলে। "অধিকাংশ খাতকই পারিবারিক উৎসব এবং কোনও বিশেষ বিবাহাদি উপলক্ষে অপরিমিত ব্যয়ের দরুণ ঋণ-জালে জড়াইয়া পড়ে।" (—Economic life of a Bengal District.) একথা সকলেই জানে যে, বাৎসরিক শস্যাদি সংগ্রহ করিবার পর কৃষকেরা এত বেশী খরচ করিয়া বসে যে, অভাবের সময় তাহাদের হাতে আর কিছুই থাকে না।

সংসারিক খরচের জন্য এই কারণেই তাহাদের ঋণ করিতে হয় এবং সেই ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। মহাজনেরা উচ্চহারে সুদ লইয়া টাকা ধার দিয়া থাকে। ক্রমবর্দ্ধনশীল ঋণের জালে চাষীরা চিরজীবনের মত জড়াইয়া পড়ে, আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। জমি বা জমিজাত শস্যাদি ক্রমে ক্রমে মহাজনদের কবলে গিয়া পড়ে। মহাজনেরা তখন সত্ত্বাধিকারী; আর কৃষকেরা তাহাদের অধীন প্রজা মাত্র। বাংলার চাষীরা যেন কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে চায়; কিন্তু তাহাও বুঝি তাহাদের অভিশপ্ত অদৃষ্টে নাই।

কৃষকেরা অল্প বয়স হইতেই সংসারের প্রতিপালক, সুতরাং জীবন ধারণে অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে একমাত্র জমির উপরই নির্ভর করিতে হয়। ফলে, যে কোনও সর্ত্তে রাজী হইয়া এই হতভাগ্য চাষীরা জমিতে আবাদ করে। জমি যেখানে মহাজনের করতল গত সেখানে কোনও আইনই খাতকের পক্ষে কার্য্যকরী হইবে না। ঋণ পরিশোধে অক্ষম চাষীদের অন্নসংস্থান করিবার জন্য জমি চাই, আর এই জমির জন্য তাহাদিগকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। মহাজনদের নিকট কোনও কৃষকের ঋণের পরিমাণ সম্ভবতঃ তাহার স্থাবর সম্পত্তির মূল্য হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী।

বাংলাদেশে সুদের এই উচ্চহার জমিতে মূলধন প্রয়োগের বাধা সৃষ্টি করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। অর্থলোভী মহাজনদের স্বার্থরক্ষার জন্য আজকাল এই প্রকারেই দেশের কৃষি শিল্পের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ। 'উপকরণ প্রভৃতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যাদি উচ্চ-মূল্যে বিক্রয় করাই হইতেছে ব্যবসা ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার গূঢ় উপায়। ভারতবাসীরা কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত করে। সাধারণতঃ মহাজনেরাই ক্রয় বিক্রয়ের হার নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। দেউলিয়া জনসাধারণের পরিশ্রমের ফলে ব্যবসার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ভারতীয়দের ৩।৪ভাগ লোকই ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। মহাজনের হুমকির জোরেই ব্যবসা বাণিজ্যের পন্থা নির্দ্দেশ হয়।' (—স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন।) কৃষকদের দৈন্যই হইতেছে বাংলার পল্লী অঞ্চলের উন্নতির সর্ব্ব প্রধান বাধা। মূলধনের অভাব যে এই দৈন্যের কারণ, তাহা নহে। প্রধান সমস্যা হইতেছে—মূলধনের কর্তৃত্ব মহাজনদের হাত হইতে লইয়া কি প্রকারে কৃষকদের—প্রকৃত উৎপাদনকারীদের হাতে দেওয়া যায়। দেশের উন্নতির জন্য এই সমস্যার সমাধানই আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এই সমাধান যতদিন না হইবে, ততদিন কৃষির উন্নতির জন্য আমরা বৃথাই চেষ্টা করিব। উক্ত মূলধন সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমাদের অবশ্যই 'কৃষি' জিনিষটিকে তলাইয়া দেখিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির মতে বাংলার যে কোনও কো-অপারেটিভ পরিবারের গড়পরতা ঋণ প্রায় ১৪৭৲। এই প্রদেশের কৃষি-ঋণের পরিমাণও ১০০ কোটী টাকা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য যে ঋণ আবশ্যক, তাহারও পরিমাণ প্রায় ৯৬ কোটী টাকা। বর্ত্তমানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি

এবং লোন-অফিসগুলি যথাক্রমে প্রায় ৪ কোটী এবং ২ কোটী টাকার ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে জমি উন্নতি বিধায়ক ঋণ আইন অনুসারে ৯৩৲ টাকা (হাজার হিসাবে এবং কৃষি ঋণ আইন অনুসারে (Agriculturists Loans Act.) ১৪, ৪১ টাকা (হাজার হিসাবে) দেওয়া হইয়াছিল। ঋণের অবশিষ্টাংশ মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। মহাজন এবং লোন-অফিস উভয়েই ঋণ গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া অযথা ব্যয়ের জন্য ঋণ প্রদান করিয়া থাকে যে, বাংলার চাষীরা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী এবং যথেচ্ছাচারী। সে জন্যই সহজে ঋণ গ্রহণের সুবিধা তাহাদের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ। যাহারা আয় বুঝিয়া ঋণ করে এবং কিরূপে উহা ফল-প্রসূ হইবে তাহা সম্যকরূপে জানে, তাহাদের পক্ষেই এই ধরণের ঋণ গ্রহণ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। দরিদ্র হইলেও বাংলার কৃষকদের হাতে সংসার চালাইবার জন্য অবশিষ্ট কিছু থাকে। কিন্তু সঞ্চয়শীল এবং মিতব্যয়ী না হওয়ার দরুণ তাহারা উহাও ব্যয় করিয়া কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়। 'শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতি মহাজনের ধূর্ত্ততা এবং খাতকের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পক্ষে উত্তম ঔষধ। যে কৃষক অশিক্ষা এবং অমিতব্যয়িতার দরুণ নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনে, তাহাকে সহানুভূতি জ্ঞাপক কোনও আইনই রক্ষা করিতে সমর্থ নয়।"—The report of Royal Commission on Agriculture in India.

ঋণ দান সম্পর্কে মহাজনদের ধূর্ত্ততা এবং উচ্চহারে সুদ গ্রহণ রীতি সর্ব্বজনবিদিত। এই জন্যই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটী সুদের হারের উচ্চতম সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া মহাজনদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমিটির মতে—মহাজনদিগকে প্রদত্ত ঋণের হিসাব রাখিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত হিসাব পরীক্ষিত হইবে; ঋণ পরিশোধের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রসিদ দিতে হইবে এবং যখনই খাতকেরা তাহাদের মোট ঋণের পরিমাণ জানিতে চাহিবে, তাহাদিগকে তাহা জানাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি কিন্তু মহাজনদের নাম রেজেষ্টারী করার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, শিক্ষা বিস্তার করিয়া, কো-অপারেটিভ ও জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, খাতকদের মিতব্যয়ী হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া এবং পাঞ্জাব রেগুলেশন অব একাউণ্টস্ এ্যাক্ট এর মত নিয়ম কানুন প্রবর্ত্তন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। কমিটি খাতকদের স্বার্থের জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটিও গড়িয়া তুলিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল সমবায় সমিতির ক্ষমতাও যথেষ্ট নহে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জমি উন্নতি-বিধায়ক আইনানুসারে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ এবং সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষার জন্য কোনও ঋণ অগ্রিম দিতে অক্ষম। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য এই দুইটী সমস্যার সমাধানই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। সুতরাং বাংলায় কৃষিকার্য্য চালাইবার জন্য বেশীদিনের হিসাবে মূলধন প্রবর্ত্তন করার ব্যবস্থাই প্রকৃত সমস্যা। এইজন্য বিভিন্ন কমিটি কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্কীম প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি এই প্রদেশের জন্য সমবায় প্রথাভুক্ত ল্যাণ্ডমর্টগেজ

ব্যাঙ্কের সুপারিশ করিয়াছে। কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আইন কানুনের মধ্যে চলিলে এই ধরণের ব্যাঙ্কের কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী। কৃষিকার্য্য চালাইবার পূর্ব্বে আমাদের কতকগুলি বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

(১) প্রকৃতপক্ষে বাংলার কৃষকরা ঋণ পরিশোধে অক্ষম নয়; উহারা যথেচ্ছাচারী এবং অমিতব্যয়ী। সেই জন্য তাহাদিগকে সঞ্চয়শীল এবং মিতব্যয়ী হইবার জন্য শিক্ষা দিতে হইবে। (২) দীর্ঘকালের জন্য কর্জ্জ গ্রহণ একমাত্র পূর্ব্বে ঋণ পরিশোধার্থ আবশ্যক হইবে। (৩) কৃষির উন্নতির জন্য জমিদারদের দাবী প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাদের ঋণগ্রস্ত জমিদারী খালাস পৈতৃক ঋণ পরিশোধ এবং অংশীদারদের সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইবার জন্য কর্জ্জ করা যখন তখন আবশ্যক হইতে পারে। (৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার জমিদারেরা লভ্যাংশ সম্বন্ধে স্থিরসংকল্প হইয়া একমাত্র জমিতেই মূলধন প্রয়োগ করে। এই সুবিধার অভাবের জন্যই তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূলধন প্রয়োগ করিতে বিরূপ। (৫) জমির উৎপাদান শক্তির একটা সীমা আছে এবং জমিতে ল অব ডিমিনিশিং রিটার্ণের আধিক্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ঘটিয়া থাকে। অধিকন্তু পাট ক্ষয়শীল পণ্য। বঙ্গদেশে ৫টী ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাদের কাজ হইবে উপযুক্ত চাষী, ছোট ছোট জমিদার এবং তালুকদারদের দীর্ঘকাল স্থায়ী ঋণ সরবরাহ করা। এই ঋণ নিম্নলিখিত ৩টী কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। (১) জমি মর্টগেজ হইতে খালাস এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধ (২) জমি এবং চাষ করিবার প্রণালীর উন্নতি এবং (৩) কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য জমি ক্রয়। মেম্বারগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক মূলধন সংগ্রহ করিবে।

গবর্ণমেণ্ট চল্তি ঋণের সুদ পরিশোধ করিবার গ্যারাণ্টী দিলে এই ঋণের পরিমাণ সাড়ে বার লাখের বেশী হইবে না। কোন মেম্বার তাহার শেয়ারের মূল্যের ২০ গুণ বেশী হিসাবে কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ২৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত হইবে না, এবং কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে উহা ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িতে পারে। অবশ্য ইহা কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহের রেজিষ্টারের অনুমতি সাপেক্ষ। মর্টগেজ আবদ্ধ জমির মারকেট ভ্যালুর শতকরা ৫০ ভাগ এবং উৎপন্ন মালের শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী পরিমাণ ঋণ কখনও দেওয়া হইবে না। যে মেম্বার চাষ আবাদ কার্য্যের আয় হইতে সুদ পরিশোধ করিতে অক্ষম, তাহাকে ঋণ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

এই স্কীম অনুযায়ী প্রাথমিক কার্য্য-চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৪ সালে ৪০,০০০ হাজার টাকার তহবিল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম বৎসর সরকার এই কার্য্যের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসর গঠন-মূলক কার্য্যের ব্যয় ও গ্রস প্রফিটের মধ্যে যদি প্রথম কার্য্যটীর জন্য খরচ বেশী পড়ে, তবে তাহা বহন করিবেন। তৃতীয় বৎসরের পর

কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কোনও দায়িত্ব থাকিবে না।

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের কার্য্যসূচীর মধ্যে একটি বিশেষ কৃষি-ঋণ বিভাগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই বিভাগের কর্ত্তব্য হইবে—

(১) কৃষি ঋণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের পরীক্ষা করিবার জন্য একটি দক্ষ সমিতি গঠন করা। এই সমিতির স-পরিষদ গবর্ণর জেনারেল প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরামর্শ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হইতে হইবে। (২) প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের যোগাযোগ স্থাপন করা।

এই কার্য্য অষ্ট্রেলিয়া এ্যাক্টের কমনওয়েলথ ব্যাঙ্কের অনুসরণ মাত্র।.:....

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির মতে কৃষিঋণের পরিমাণ ১০০ কোটী টাকা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে এই হিসাবের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি, সি, মহলানবিশের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য :—

"পাবনা, বগুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, এবং ফরিদপুর—এই ৬টী জিলার প্রত্যেকটীতেই শতকরা ৫২ হইতে ২৫ ঘর কৃষক পরিবার
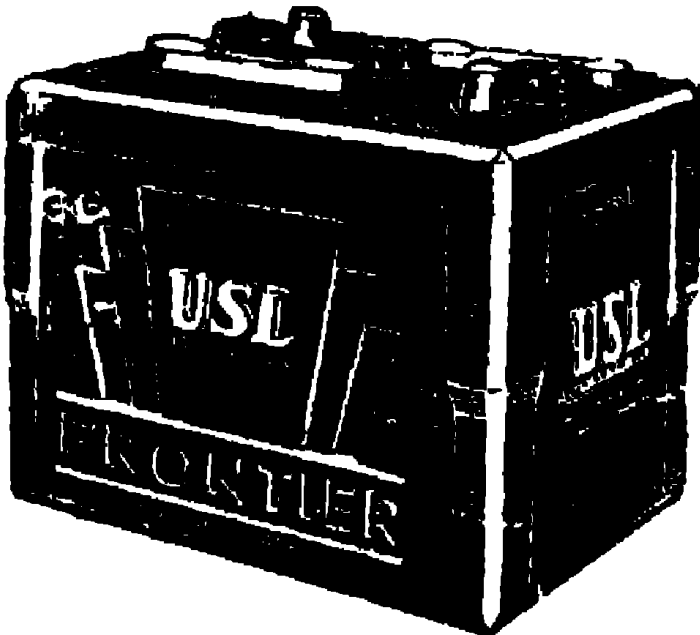
ঋণে আবদ্ধ। এই আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিনে ঋণের পরিমাণ তাহাদের আয়ের দ্বিগুণ। শতকরা ১৪ হইতে ২২ ঘর পরিবারের ঋণের পরিমাণ তাহাদের ২ হইতে ৪ বৎসরের আয়ের সমান। বর্দ্ধমান ভিন্ন সম্ভবতঃ অন্যান্য জিলাগুলিতে কৃষকদের শতকরা ১০ ঘর পরিবারের ৪ হইতে ৮ একর এবং শতকরা প্রায় ১২ ঘর পরিবারের ২ একর জমিও নাই, শতকরা ৬ ঘর পরিবারের ৮ একরের উপর জমি আছে। এই আর্থিক সঙ্কটের দিনে (১৯২৯ খৃঃ হইতে) চাষীদের আয় যথাক্রমে শত করা ৫০ ভাগ এবং শত করা ৪০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।"

কেহ কেহ বাংলায় কৃষিঋণের পরিমাণ ২১০ কোটী টাকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।..... অনেকে বলেন এই কৃষিঋণ উন্নতির চিহ্ন। এক বিষয়ে ইহা সত্য। Indebtedness is an indication of one's cedit and credit in its turn shows the economic worth of his assets. বঙ্গদেশের কৃষকেরা অতিরিক্ত ঋণভারে জর্জ্জরিত; কিন্তু ঋণ পরিশোধে অক্ষম নহে। যদি উন্নতির কোনও আশা না রাখিয়া অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে চলে, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের পুনরাক্রমণ অনিবার্য্য। আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে বর্ত্তমানে কৃষি-জীবিদের দুঃখ-ভার লাঘব করা। জমিদার এবং চাষীরা দেউলিয়া অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইলে সমাজের মঙ্গল। কৃষি-শিল্পকে ইহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিলে এই বাধার অবসান হইতে পারে।

এই নিরাশা-ব্যঞ্জক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য Debt Conciliation Board প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের কার্য্য হইতেছে পূর্ব্ব ঋণের যথাযথ সুরাহা করিয়া কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা। বোর্ড তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনও ঋণ গ্রহণ করিবার সুবন্দোবস্ত করা দূরে থাকুক, পূর্ব্বঋণ সময় মত পরিশোধ করিবার জন্য কৃষকদের সম্পত্তি নিজেদের কাছে মর্টগেজ রাখিয়া ঋণ করিবার সকল পথ বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োগ এক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক। কৃষকদের সম্পত্তি যদি অপর কোনও অবস্থাপন্ন কৃষকের কাছেই হস্তান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা যাইত, তাহা হইলে হয়ত দেশের অবস্থা অন্যরকম হইত। মহাজন খাতকদের ঋণ দিয়া পরে তাহাদের জমি-জমা কৌশলে ক্রয় করিয়া লয়। খাতকেরা তখন মহাজনের প্রজা, তাহাদের সমস্ত সুখ সুবিধা মহাজনের আয়ত্তাধীন।

এই সম্বন্ধে অনারেবল মিঃ জাষ্টিস্ ফিল্ডের উক্তি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়ঃ

"ইহা কখনই স্থির করা উচিত না যে, এই প্রদেশের অসুবিধাগুলি দূর করিতে এক আইনই কার্য্যকরী হইবে। এই আইন জমিদার এবং প্রজার সম্বন্ধ নিরূপণ করে মাত্র। আধুনিক ইউরোপের ভোটাধিকার প্রাপ্ত দাস্য হইতে বাঙ্গালী বা বিহারী কৃষক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের লোক। ইহারা আলস্যপরায়ণ অমিতব্যয়ী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন।—শুধু বর্ত্তমানকে নিয়াই মশগুল। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনও ইহাদিগকে ফরাসী, প্রুসিয়ান অথবা বেলজিয়াম-কৃষকের সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়শীল হইতে সাহায্য করিবে না। কোনও

কৃষককে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলে, হয়ত সেই একটা ছোট খাটো জমিদার রূপে নিকৃষ্ট ধরণের অত্যাচারী হইয়া বসিতে পারে। পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্যেই এই বিপদ বেশী। ১৮৭৯ সালে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কোনও পত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে—

"There is undeniable evidence in the Report before us that the very improvements introduced under our rule, such as fixity of tenure and lowering of the assessments, have been the principal causes of the great destitution which the great Commissioners found to exist. The saleable value of the land increased the credit of the ryot, and encouraged beyond measure the national habit of borrowing and more expensive modes of living" বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রদেশগুলির কৃষকেরা অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাউক, তাহাদের উপর ধার্য্য কর ন্যায্য হউক এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের নিজের পরিশ্রম-লব্ধ ফলের অধিকারী তাহারা হউক; কিন্তু তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের স্বাধীনতা লাইসেন্সে-এ পরিণত করা যায় না—বিশ্বস্তভাবে কর্ত্তব্য পালন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রেরণ করার উপরেই তাহাদের নিরাপত্তা সূচক আইনের সাফল্য নির্ভর করে।" বঙ্গদেশে অন্যায্য ভাবে সুদ গ্রহণ প্রভৃতি যে আইনের দ্বারা শাসিত হয়, তাহা বর্ত্তমানে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল মানিলেণ্ডার্স এ্যাক্টের অধীন। ১৯১৮ সনের ইউসরিয়াস লোনস এ্যাক্ট ব্যর্থ হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহাজনদের সুদের হারের তালিকা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

জিলা	শতকরা বাৎসরিক	
বর্দ্ধমান	২৪ হইতে	১৭৫
বীরভূম	১৫	৩৭১/২
বাঁকুড়া	১৬	২৫
মেদিনীপুর	১২	৭৫
হুগলী	১২	৩৭১/৪
নদীয়া	৩৭১/২	৭৫
যশোহর	১৮২/৪	৭৫
খুলনা	২৫	৩৭১/১
মুর্শিদাবাদ	১৮	১২০
২৪ পরগণা	১২	১৫০
ঢাকা	১২	১৯২
ময়মনসিংহ	২৪	২২৫
বাখরগঞ্জ	২৪	১০০
ফরিদপুর	১৫	১৫০
চট্টগ্রাম	১৫	৭৫
নোয়াখালী	২৪	৭৫
ত্রিপুরা	২৪	৭৫
রাজসাহী	১৮৩/৪	৭০
পাবনা	৩৭১/২	৩০০
দিনাজপুর	২৪	৭৫
রঙপুর	৩৭ ১/২	৬৬ ১/৪
মালদহ	১০/৩/১	৭৫
জলপাইগুড়ি	১০	৫০
দার্জ্জিলিং	৩০	৬০
হাওড়া	১২	১৭৫

বঙ্গদেশে যথেষ্ট ঋণদান সমিতি নাই। সুতরাং দেশেরপক্ষে ক্ষতিকর হইলেও মহাজন-

দের প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ১৯৩৩ সনের বঙ্গীয় মহাজন আইনে বলা হইয়াছে—

When in any suit in respect of any money lent by a moneylender after the commencement of the Usurious Loans Act, 1918, it is found that the interest charged exceeds the rate of fifteen per cent per annum in the case of a secured loan, on twenty five per cent per annum in the case of an unsecured loan or that there is a stipulation for rests at intervals of less than six months, the Court shall, until the contrary is proved, presume for the purpose of section 3 of the Usurious Loans Act, 1918 that the interest charged is excessive and the transaction was harsh and unconscionable and was substantially unfair but this provision shall be without prejudice to the powers of the Court under the said section where the Court is satisfied that the interest charged though not exceeding fifteen per cent per annum or twenty per cent per annum as the case may be is excessive."

এই আইনের উপকারিতা যদি খাতকেরা গ্রহণ করিতে পারে, তবে সুদ গ্রহণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বাধার সৃষ্টি হইবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, এই আইনের দ্বারা ঋণ গ্রহণ ব্যাপারে খাতকের সুবিধা হইতে পারে।*

*শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি-এল, প্রণীত Studies in the Land Economics of Bengal হইতে।

সমবেত চাষ

বিহারে এই সর্ব্বপ্রথম সমবেতভাবে কৃষির চেষ্টা হইতেছে। বিহারের মন্ত্রিগণ পরীক্ষার্থ এই নূতন ভাবে চাষের ব্যবস্থা করিবেন। এই পরীক্ষা গভর্ণমেণ্ট মাত্র কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে করিবেন। প্রতি বিভাগে একটী গ্রাম বাছিয়া লওয়া হইবে, সেই গ্রামে সমবায়ের ভিত্তিতে সমবেত চাষ প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হইবে। সমবেত-চাষ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল নির্ব্বাচিত গ্রামের কৃষিযোগ্য জমি সকলের ভার লইবেন ও তাহার চাষ করিবেন। ঐ সকল জমিতে চাষের পরে যে ফসল হইবে, সেই সকল ফসল চাষীদিগকে তাহাদের জমির পরিমাণ অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ জমি চাষ করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা বাদ দিয়া ফসল দেওয়া হইবে।

বিহার গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে এই পরীক্ষা সফল হইলে ইহা অপর সকল গ্রামে আরম্ভ করা হইবে। এই ব্যবস্থা যদি ফলপ্রদ হয়

> আমরা এই সংখ্যায় সুবিখ্যাত সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ার কৃষি পদ্ধতি, মুসোলিনী প্রবর্ত্তিত ইটালীর কৃষি পদ্ধতি এবং জাপানের কৃষি প্রণালীর সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এই সকল দেশের কৃষির সহিত তুলনায় আমাদের দেশের কৃষি পদ্ধতিরও নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। তাহা ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে সম্প্রতি কংগ্রেস শাসিত বিহারের কয়েকটি স্থানে সমবেত প্রণালীতে (Co-operative basis) যে কৃষি কার্য্যের সূচনা করা হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম। আশা করি বাংলার চাষী এবং ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় এই প্রবন্ধ কয়েকটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।
>
> ব্যবসা ও বাণিজ্য
>
> সম্পাদক

তাহা হইলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে খাজনা আদায় করিতে যে মনোমালিন্য এবং শত্রুতা হইয়া থাকে তাহা দূর হইবে। কারণ এই ব্যবস্থানুসারে গভর্ণমেণ্ট জমির উৎপন্ন ফসল চাষীদিগকে ভাগ করিয়া দিবার পূর্ব্বে জমিদারের প্রাপ্য খাজানা বাদ দিয়া লইবেন।

বিহারে বিগত কৃষি কনফারেন্সে এই প্রস্তাবনা কার্য্যকরী করিবার জন্য সকলেই একবাক্যে ইহা সমর্থন করেন।

বিহার গবর্ণমেণ্ট যে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা সাম্যবাদের দেশ রাশিয়াতে চলিতে পারে। এদেশে সাম্যবাদ অনুমোদিত উপায়ে কৃষিকার্য্য করায় দেশের মধ্যে এক নূতন

অবস্থার উদ্ভব হইবে। যেহেতু গবর্ণমেণ্ট উৎপন্ন শস্য হইতে জমিদারের খাজানা কাটিয়া লইবেন সেইজন্য জমিদারের সহিত প্রজার আর কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। শত শত বৎসর ধরিয়া জমিদার ও প্রজার যে নিকট সম্বন্ধ ছিল, প্রজাগণ জমিদারকে বিপদ আপদের বন্ধু বলিয়া জানিত এবং জমিদারও প্রজাদের প্রতি বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিতেন, জমিদারের প্রতি প্রজার যে শ্রদ্ধা ছিল, সেই সকল সম্পর্ক এই নূতন ব্যবস্থায় শেষ হইবে।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় নহে, যথায় টাকা আনা পাইই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এদেশে একের প্রতি অপরের দরদ আছে। সেইজন্য পথিককেও লোকে ভাই বলিয়া ডাকে। জমিদারকে খাজানা দিলেই যেমন প্রজার কর্ত্তব্য শেষ হইত না, তেমনি খাজানা পাইয়াও জমিদারের কার্য্য শেষ হইত না। উভয়ের মধ্যে এক আন্তরিক টান ছিল, যাহার জন্য বিপদে আপদে সকল সময়ে প্রজা জমিদারের নিকট সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইত। প্রস্তাবিত প্রথায় সেই মানবতাপূর্ণ মনোভাব প্রজার চিত্ত হইতে বিহার গবর্ণমেণ্ট বিদূরিত করিবেন।

বিহার গবর্ণমেণ্ট যদি এই অনুসারে কার্য্য করেন, তবে উত্তম জমির মালিক ও মধ্যম জমির মালিক জমির পরিমাণ হিসাবে যখন ফসল পাইবেন, তখন সকলেই জমির হার হিসাবে ফসল পাইবেন। ইহার ফলে কেহ নিজের জমির উন্নতি করিবেন না। দেশে প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ হইলে যখন প্রজার খাজনা দিবার শক্তি থাকিবে না, তখন প্রজার কি অবস্থা হইবে? জমিদারের খাজনা তাহারা দিতে পারিবে না কিন্তু জমিদারকে রাজস্ব সম্পূর্ণরূপে দিতে হইবে। জমিদার ও প্রজার সহিত কোনও সম্পর্ক থাকিবে না, মধ্যে থাকিবেন গভর্ণমেণ্ট।

গভর্ণমেণ্ট যদি সমবেতভাবে গ্রামের সকলের চাষের ভার লন ও যাহার জমিতে যত শস্য সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহাকে প্রদান করেন তাহা হইলে প্রজাদের অনেক সুবিধা হয়। তবে জমিদারের খাজনা প্রদান, মহাজনের সুদ দিবার ভার প্রভৃতি দায়িত্ব স্কন্ধে লইলে গভর্ণমেণ্ট আরও জটিল অবস্থার উদ্ভব করিবেন।

কৃষির মাসিক তালিকা

বৈশাখ মাসের কৃষি

ফুলের বাগান

বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারাস্থাস, দোপাটী, গ্লোব আমারাস্থাস সান ফ্লাওয়ার বা রাধা পদ্ম, লজ্জাবতী, মিটিনিয়াভারাণ্ডা মেরীগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতরা প্রভৃতি ফুলবীজ বপন করিতে হয়।

বেল ও যুঁই ফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণ জল পাইলে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিয়া থাকে।

ফলের বাগান

আম. কাঁঠাল, লিচু, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও উহার ফল রক্ষণা-বেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই।

আনারস গাছগুলির গোড়ায় জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বেশ বড় হয়।

সব্জী বাগান।

মাখন-সীম এবং অন্যান্য সিম, বরবটী, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি হয়তো কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। কিন্তু এখনও এর পরেও উহা বপন করা চলে। টেপারির গাছ পাতা ও ফলে টমাটোর সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহার চাষও—বেগুণ চাষের মত। তবে ইহার ক্ষেতে বেগুন অপেক্ষা অধিক জল সেচন আবশ্যক হয়। বেগুনের মত চারা তৈরী করিয়া লইতে হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে লাঠি করিয়া চারা বসাইলে শীতের শেষ পর্য্যন্ত ফল থাকে। টমাটোর মত ইহার গাছগুলি খুব ঝাড়াল ও লতানে হয়; তাই গাছের আশে পাশে মাচা বাঁধিয়া দিলে গাছ অনেকদিন পর্য্যন্ত তেজস্কর থাকে এবং অনেক ফল দেয়। ফলের আকার বড় করিতে হইলে কতকগুলি ফেঁকড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

দোঁয়াস মাটিতেই টেপারির চাষ ভাল হয়। ছাই মিশ্রিত গোবরের সার ব্যবহার করা উচিত। আবশ্যক হইলে বেগুণের ক্ষেতে গোবরের সার দেওয়া যাইতে পারে। এক

বিঘা জমিতে দুই তোলা বীজ দরকার। ৫ফিট × ২ফিট ব্যবধানে চারা বসাইতে হয়। বীজতলায় চারা ৮ইঞ্চি বড় হইলে তবে ক্ষেতে বসাইবার উপযুক্ত হয়।

শশা বিলাতি কুমড়া (মিঠাকুমড়া) লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতি কচু, পালাঝিঙ্গা, পুঁই ডেঙ্গোশাক, নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বপন কার্য্য শেষ করিতে হয়। এসময় ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল, ধুন্দুল, চালকুমড়া, প্রভৃতির বীজ বপন করিতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা বৈশাখ মাসের মধ্যেই প্রস্তুত কবিয়া লইতে হয় এবং একটু ভারি বৃষ্টির পর বৈশাখ মাসের শেষাশেষি উহা জমিতে নাড়িয়া বসাইতে পারিলে ভাল হয়।

আদা, হলুদ, ওল, কচু, মানকচু, জেরুজেলেম, আর্টি-চোক, মেটে আলু, প্রভৃতির বীজ বা গেঁড় এই সময় বপন করা চলে।

ভুট্টা, চিনাবাদাম, অড়হর, পাট, ধইঞ্চা, জোয়ার, রিয়ান, গিনিঘাস, প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। আশু ধান্যের জমি হাল ও লাঙ্গল দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। আশু ধান্যের বীজও এ সময় বপন করা চলে। পান চাষের আবশ্যক থাকিলে পানের ডগা কাটিয়া এই সময় একটু বৃষ্টির পর লাগান উচিত। চৈত্র মাসে যে সমস্ত আকের ডাল লাগান হইয়াছিল, এসময় উহাদের এবং আনারস, কলা, প্রভৃতি ফলের গাছের গোড়ায় মাটি চাপাইয়া দেওয়া ও জল সেচন করা প্রয়োজন।

ভুট্টা বারমাসই জন্মাইতে পারা যায়। ইহার জমি সর্ব্বদা জল সেচন দ্বারা সরস রাখা আবশ্যক। গাছ অত্যান্ত তেজাল হইলে কাণ্ডের উপরার্দ্ধ ভাগ কাটিয়া ফেলা এবং গোড়া বা গাত্র হইতে ফেক্‌ড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। সুপক্ক ফলগুলি মোচা সমেত উঠাইয়া বীজের জন্য রাখিয়া দিবে।

আশু বেগুনের চারা ইতিপূর্ব্বে তৈয়ারী করিয়া লইয়া বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে রোপন করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র

বৈশাখ মাসের শেষে পূর্ব্বোক্ত আশুধান্য প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়।

গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় বিয়ানা, গিনিঘাস. প্রভৃতি বপন করা উচিত। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে উত্তমরূপ "যো" হইলে তবেই ঐ আবাদ চলিতে পারে।

জোয়ার প্রভৃতির বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত। যদি উহা তখন শেষ না হইয়া উঠে তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে। কিঞ্চিৎ অধিক বৃষ্টি হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমে উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়। তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া উহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে।

চৈত্র মাসের মধ্যেই আখের (ইক্ষু) বীজ বা টাঁক বসাইরা কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিতে হয়। ইক্ষুক্ষেতে বৈশাখের মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হয়। দুই সারির মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া

এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আবশ্যক হইলে সমুদায় ফসলের ক্ষেত্রে জল দিয়া পাটাইয়া দিতে হয়।

চুপড়ি আলু ও ওল এই সময় বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। ওলচাষের জন্য উচ্চ দোঁয়াস হালকা জমি এবং মাটী গভীর কর্ষিত হওয়া আবশ্যক; আলুর ন্যায় ইহার জমি পাইট করিতে ও সার দিতে হয়। উদ্যানে জন্মাইতে হইলে তিন হাত অন্তর সারি করিয়া সারিতে দুইহাত ব্যবধানে দেড় হাত গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের মাটি তুলিয়া শুকাইয়া ও উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করিয়া আবার গর্ত্তগুলি ভরাট করিয়া দিতে হয়। এইরূপ গর্ত্তে ওলমুখী বসাইয়া মধ্যে মধ্যে জল দিলে বা বৃষ্টির জল পাইলে শীঘ্র মুখী অঙ্কুরিত হয়। ইহার পর আর বিশেষ কোন কষ্ট নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ১০।১২ মাস পরেই ওল খাইবার উপযুক্ত হয়। ২।৪ বৎসর বাদে মাটী হইতে ওল তুলিলে এক একটী ওল প্রায় অর্দ্ধমণ ত্রিশসের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

মান কচুর ন্যায় ওলের মুখীও পরিচিত গাছ হইতে লওয়া আবশ্যক। পরিচিত গাছ অর্থাৎ (যে গাছের বা স্থানের ওল বা কচু খাইলে গলা ও মুখ চুট চুট না করে) বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মহীশূরের ওল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই জাতীয় ওলের চাষ এদেশে হওয়া উচিত। সাঁতরাগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বোম্বাই ওলের চাষ হইয়া থাকে। ইহাও খাইতে খুব সুস্বাদু এবং ফলনও খুব বেশী হয়। রসা এবং ছায়া জমিতে যে ওল জন্মে তাহাতে ছিব্‌রা অর্থাৎ (আঁশ আঁশ) হয় এবং তাহা খাইতে প্রায়ই মুখ চুট চুটায় বা চুলকায়। শুষ্ক, ছায়া বিহীন উচ্চ জমিই ওল চাষের পক্ষে প্রশস্ত।

তুঁত গাছের গোড়ায়ও পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।
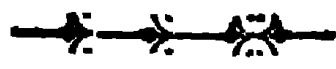
নেপিয়ার ঘাস

নেপিয়ার ঘাস গরুর পক্ষে খুব পুষ্টিকর; গরু ইহা খাইতে খুবই ভালবাসে।

এই ঘাস ১৯২৭ সালে সিংহল দ্বীপ হইতে বাংলাদেশে প্রথম আমদানী করা হয়। এই পর্য্যন্ত গরুর খাদ্যের জন্য যত রকম ঘাসের চাষ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে নেপিয়ার ঘাসের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

পাট যে মাটীতে জন্মে নেপিয়ার ঘাসও সেই মাটীতে জন্মিতে পারে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই ঘাসের চাষের জন্য বেশ উঁচু জমি দরকার, কারণ ইহার গোড়ায় জল দাঁড়াইলে ইহা মরিয়া যাইবে।

বার বার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটী ভাল করিয়া তৈয়ার করা ও ঘাস জঙ্গল বাছিয়া জমি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বিঘা প্রতি ১০।১৫ গাড়ী অর্থাৎ ১০০।১৫০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করিলে ফলন বেশী হইবে। দুই হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দুই হাত অন্তর ঘাসের "কাটিং" লাগাইতে হয়; প্রত্যেক "কাটিং" কাত করিয়া মাটিতে এইরূপ ভাবে বসাইতে হইবে যেন উহার মাথা দুই ইঞ্চি পরিমাণ মাটীর উপর থাকে; এক স্থানে ২।৩টি করিয়া "কাটিং" লাগান ভাল, তাহাতে ভাল ফলন পাওয়া যায়; "কাটিং" লাগাইয়া মাটী চাপা দিতে হয়; যদি দেখা যায় যে কাটিং লাগাইবার পর বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই ও জমিতে রস নাই তাহা হইলে জল সেচন করা খুব দরকার; গাছ লাগিয়া গেলে যখন সবুজ পাতা বাহির হয় তখন গাছের গোড়ায় মাটী দিলে ভাল হয়; জমিতে ঘাস জঙ্গল জন্মিলে উহা নিড়ানি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া দরকার।

বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই ঘাস লাগাইতে হয়।

বিঘা প্রতি ৫ হাজার "কাটিং" এর দরকার হয়; বেশ পাকা গাছ হইতে ১০।১২ ইঞ্চি লম্বা করিয়া "কাটিং" প্রস্তুত করিতে হয়। "কাটিং" লাগাইবার এক কিংবা দেড়মাস পরেই ঘাস কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়; ঘাস শক্ত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে উহা কাটিয়া লওয়া উচিৎ; অর্থাৎ দেড় হইতে দুই হাত লম্বা হইলেই ঘাস কাটিয়া লওয়া ভাল; মাটী ঘেঁসিয়া ঘাস কাটা উচিৎ। এক মাস অন্তর ঘাস কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়। প্রত্যেক বার ঘাস কাটিবার পর কোদাল দিয়া জমি একবার খুঁড়িয়া দেওয়া ভাল। দুইবার ঘাস কাটিয়া লইবার পর একবার গোবর সার দেওয়া দরকার।

বিঘা প্রতি ২৫০।৩০০ মণ ঘাস পাওয়া যায়; মাঝে মাঝে সেচ দিলে বিঘা প্রতি ৫০০ মণ পর্য্যন্ত ফলন পাওয়া যাইতে পারে। মোট কথা এক বিঘা জমিতে নেপিয়ার ঘাসের চাষ করিলে অন্ততঃ তিনটি গরুর বৎসরের খোরাকের বন্দোবস্ত করা হয়।

গোলমরিচের চাষ

(শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ)

সরস দো-আঁস-মৃত্তিকাই গোলমরিচ-চাষের পক্ষে প্রশস্ত। যেস্থান আংশিক ছায়াযুক্ত, অথচ দিনের বেলায় কতক সময়ে রৌদ্র পায় এবং যেস্থানে আলো ও বাতাস সম্যকরূপে লাগিতে পারে, সেই স্থানই ইহার চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। গোলমরিচ গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে, উহা মরিয়া যায়। সুতরাং যে উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না, বা যে স্থান বর্ষার জলে প্লাবিত হয় না, সেরূপ উচ্চ ভূমিতেই চাষ করিতে হয়। সুপারি বা আমবাগানের মৃত্তিকায় গোলমরিচ গাছ উত্তমরূপে জন্মে।

সার

গাছের পাতা-সারই গোলমরিচ গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। গো মূত্রসংযুক্ত গোয়াল-ঘরের আবর্জ্জনা বা গোময় পচাইয়া সাররূপে ব্যবহার করিলেও গাছগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হয়। মরিচগাছের গোড়ায় পলিমাটির সহিত পচা-খৈল দিতে পারিলে ফলন অধিক হয় এবং মরিচও বেশী ঝাল হইয়া থাকে। অস্থিচূর্ণাদি হাড়ভাগ সংযুক্ত সারে ফলন অধিক হয় এবং ফল ওজনে ভারি হইয়া থাকে। যে স্থানের মৃত্তিকায় Phosphate বা হাড়ভাগের অংশ যত কম, সেই স্থানের মরিচই তত নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে মরিচ-চাষে সুফল করিতে হইলে, অন্যান্য সারের সহিত হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। যে বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া মরিচলতা বর্দ্ধিত হয়, সেই সার তাহার পক্ষেও অত্যাবশ্যক। মোট কথা, আশ্রয়দাতা বৃক্ষের উপযুক্ত সার যথেষ্ট পরিমাণে দিতে পারিলে, আশ্রয়ী মরিচগাছের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সার দেওয়ার বড় আবশ্যক হয় না। আমরা সাররূপে একমাত্র পচা কচুরিপানা ও হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া, আশ্রয়দাতা আম, সুপারি প্রভৃতি ফলগাছের এবং আশ্রয়ী মরিচলতার চাষে আশানুরূপ সুফল লাভই করিতেছি।

চারা উৎপাদন

যে ভাবে লতা-কলম করিয়া পান-লতার বংশ বৃদ্ধি করা হয়,ঠিক সেইভাবেই মরিচলতারও সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিপক্ক লতার কর্ত্তিত খণ্ডগুলি (cuttings) 'তেরছা' ভাবে মৃত্তিকায় দুই-তিন অঙ্গুলি পরিমাণ পুতিয়া দিলেই, সে সকল খণ্ড হইতে নূতন গাছ জন্মে। প্রত্যেকটি গ্রন্থির পার্শ্বে (লতার উপর পত্রোৎপত্তি স্থানগুলিকে গ্রন্থি বা গাঁট বলে) কাটিয়া খণ্ড করিতে এবং গ্রন্থি-যুক্ত পার্শ্বই রোপণ করিতে হয়। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে খণ্ডগুলির চারা প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নহে। কেননা কর্ত্তিত খণ্ডগুলি যে মাটিতে বসান হয়, বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে জলসেচন করিয়া তাহা সকল সময়েই সরস রাখা আবশ্যক। বর্ষাকালে গোলমরিচের পরিপক্ক লতা মাটীতে শায়িত করিয়া, উহার প্রত্যেকটী

গ্রন্থির উপর কিঞ্চিত মৃত্তিকার চাপ দিয়া রাখিলেও পাঁচ-সাত সপ্তাহের মধ্যেই প্রত্যেকটি গ্রন্থি হইতে এক একটী নূতন চারার উদ্ভব হয়।

রোপণকাল

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত মরিচচারা রোপণ করিবার উপযুক্ত সময়। বর্ষান্তে গাছ রোপণ করিলে, মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য সপ্তাহে দুই তিন দিন জলসেচন করা আবশ্যক। কিন্তু বর্ষার প্রথমাবস্থায় মরিচ গাছ রোপণ করিলে, বৃষ্টির জলেই উহা সতেজ হইয়া উঠে বলিয়া কখনও জলসেচন করিবার আবশ্যক হয় না।

মরিচ-চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে, নির্দ্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা কোবাইয়া এবং উহার সহিত কিছু গোবরসার মিশাইয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর তাহাতে এক একটী গর্ত্ত করিয়া সেই সকল গর্ত্তেই চারা লাগাইতে হয়। বর্ষার প্রারম্ভে ফলবৃক্ষের গোড়ার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা কোবাইয়া তাহাতে সার মিশ্রিত করিতে হয়। ইহা করিলে মরিচগাছের জন্য স্বতন্ত্রভাবে জমি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হয় না। এক বিঘা জমিতে চারি হাত অন্তর সুপারিগাছ লাগাইলে ৪০০ গাছ লাগান যায়। প্রতি গাছের গোড়ায় এক একটি লতা রোপণ করিতে এক বিঘা জমিতে ৪০০ মরিচ-লতা রোপণ করা যাইতে পারে।

মরিচগাছ রোপণ করিবার পর সময়ে সময়ে উহার গোড়ার মাটি আলগা করিয়া দিতে এবং আগাছাদি বাছিয়া ফেলিতে হয়। লতার বন্ধন-খর্ব্বতা দৃষ্ট হইলে উহার গোড়ায় আবশ্যকমত সার ও জল দিতে হয়। প্রথম দুই এক বৎসরই গাছের পরিচর্য্যা অধিক করিতে হইবে। এই সময়েই আলগা লতা-গুলিকে গাছের সহিত বাঁধিয়া বা ডালায় উঠাইয়া দিতে হয়। তাহা করিলেই উহারা আশ্রয়-বৃক্ষের কাণ্ড-শাখাদিতে আবদ্ধ রহিয়া সতেজে উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। মরিচ-চারা রোপণ করিবার পর তিন হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মরিচলতা আশ্রয়-বৃক্ষ অবলম্বনে যথেষ্ট বাড়িয়া উঠে; ঐ সময়েই উহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। ফলপ্রসূ হইবার পরেও ২০-২৫ বৎসর পর্য্যন্ত গাছগুলি বেশ সতেজ থাকে তারপর ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও মরিয়া যায়।

নানা কথা

মরিচগাছ চারি-পাঁচ বৎসরের বড় হইলেই উহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রথমতঃ দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত ফলন অল্প (প্রতি গাছ গড়ে এক সের) হয়। তৎপর ক্রমশঃ গাছ যতই বড় হইয়া ডালপালা বিশিষ্ট হইতে থাকে, উহাতে ততই ফলন অধিক হয়। দশ-বার বৎসরের পুরাতন গাছে তিন চারি সের পর্য্যন্ত গোলমরিচ জন্মে। ইহার চাষ বিশেষ শ্রমসাধ্য বা অর্থব্যয়সাপেক্ষ নহে; অথচ যথেষ্ট আয়কর। ক্রমাগত তিন চারি বৎসর যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে হইবে, অথচ তাহাতে একটী পয়সাও আয় হইবে না। ভবিষ্যতে লাভের আশায় এমত কার্য্যে সাধারণ কৃষকেরা প্রবৃত্ত হইবে না—হইতেও পারে না। যাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া আম, সুপারি প্রভৃতি ফলের বাগান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গোলমরিচের চাষ করিয়া আদর্শ স্থল হইতে পরামর্শ দিতে পারি। আয় দেখিলে অনেক কৃষকও চাষে প্রবৃত্ত হইবে। গৃহস্থের বাড়ীর পার্শ্বস্থ আম্রাদি

ফলবৃক্ষের গোড়ায় অত্যল্পসংখ্যক গোলমরিচ গাছ রোপণ করিয়াও পারিবারিক ব্যবহারের উপযোগী মরিচ বিনাব্যয়েই পাইতে পারেন। আমরা এই আয়কর কৃষির প্রতি গৃহস্থমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গলায় যে সকল জেলায় বারিপাত অধিক হয়, সেই সকল জেলাতেই পিপুল, মরিচ প্রভৃতি আয়কর লতার চাষ অধিক সুফলপ্রদ হয়। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মরিচচারা সংগ্রহ করিয়া সেই সকল রোপণ করিতে পারিলেই ভাল হইবে। মালাবার হইতে মরিচলতার মূল সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করিতে পারিলে সুফল-লাভের সম্ভাবনা অধিক। মূলে অল্প মৃত্তিকা দিয়া সিক্ত অবস্থায় রাখিতে পারিলে বহুদিবস পর্য্যন্ত উহার উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয় না। সুতরাং মূল আনয়ন করা কষ্টসাধ্য নহে।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মৃত্তিকায় উত্তমরূপে গোলমরিচ জন্মিতে পারে। এই সকল স্থানের বন-জঙ্গলে স্বতঃই মরিচগাছ জন্মে এবং সে সকল গাছ ফলপ্রসূও হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মৃত্তিকা যে মরিচ-চাষের পক্ষে প্রশস্ত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কেহ কেহ বলেন যে, অতিবৃষ্টিতে মরিচলতার পাতা ঝরিয়া যায়, তাহাতে গাছও মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইহা আংশিক সত্য হইলেও বৃষ্টিতে মরিচগাছের যথেষ্ট উপকারই সাধিত হয়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অতিবৃষ্টি হইলে মরিচগাছের অনিষ্ট ঘটে সত্য, কিন্তু তাহাতে গাছ মরিয়া যায় না, বা মরিয়া যাইবার আশঙ্কাও অতি কম থাকে। মরিচলতা ফলের গাছের কাণ্ড ও শাখার সহিত থাবার সাহায্যে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিলে, ইহার মরিয়া যাওয়ার কোনও আশঙ্কাই রহে না। এই লতার কাণ্ডগ্রন্থিতে গুচ্ছমূলযুক্ত 'থাবা' হয়। এই থাবাই বৃক্ষের সহিত ইহাদের আবদ্ধ ও উর্দ্ধে গমন করিবার প্রধান সহায়। রোপণ-প্রণালীর বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তদনুযায়ী মরিচ-লতা রোপণ করিতে পারিলে সুফল-লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্রই বাস্তুকৃষির হিসাবে মরিচের চাষ-প্রথা প্রচলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

খড়ির চাষ

পান চাষ যে লাভজনক কৃষি তাহা আজকাল অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য অনেকেই পান চাষের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। অবশ্য ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক চাষ—খড়ির চাষের দিকে তেমন কাহারও দৃষ্টি নাই। আজকাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কেহ না কেহ পানের চাষের দিকে ঝোঁক দিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ গ্রামে এখনও পর্য্যন্ত খড়ির চাষ দৃষ্ট হয় না। সে কারণ যাহাদের বরোজ আছে তাহাদিগকে সুদূর হইতে যথেষ্ট মূল্য দিয়া এবং আনিবার জন্য যথেষ্ট খরচ করিয়া খড়ি ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। বিনা খড়িতে বরোজের কাজ একেবারেই চলিতে পারে না এবং যে খড়ি বরোজে **"ল"** ধরাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার মুল্য অনেক সময় তিন চারি টাকা হিসাবে কাহন বিক্রয় হয়। অধিকন্তু ভিন্ন স্থান হইতে ঐ খড়ি আনিবার জন্য যথেষ্ট বেগ বহন করিতে হয়। অথচ খড়ির চাষ অতি সহজসাধ্য এবং লাভজনক।

সাধারণতঃ দেখা যায়, এঁটেল মাটি অধিকাংশ চাষের পক্ষে সেরূপ সুবিধাজনক নহে। দোঁয়াশ মাটিই প্রায় সর্ব্ববিধ চাষের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু খড়ি চাষের পক্ষেই দোঁয়াশ মাটি না হইলেও এঁটেল মাটিতে ইহার চাষের কোনরূপ ক্ষতি দৃষ্ট হয় না। ইহা বাদে যে সকল নাবাল জমি অন্য কোন চাষের পক্ষে সুবিধাজনক নাই সেই সকল জমি খড়ি চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

পান বরোজের জন্য খড়ি যে একটী অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ তাহা যাঁহাদের পান বরোজ আছে তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন। ছোট বড় সকল প্রকার খড়িই পান বরোজে লাগিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা যেগুলি ভাল খড়ি সেগুলি বরোজের "ল" ধরাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেগুলি মাঝারি সেগুলি বরোজের চাল ছাইবার জন্য লাগে এবং যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট সেগুলি বরোজের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেড়ায় ব্যবহৃত হয়। মোটের উপর ছোট বড় সকল খড়িই পান বরোজের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়।

খড়ির চাষ করিতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নাই। পৌষ মাঘ মাসে জমিতে দুই তিনবার লাঙ্গল দিয়া তিন চারি হাত অন্তর এক ফুট গভীর করিয়া এক একটি গর্ত্ত করিতে হয় এবং ঐ গর্ত্তে পুকুরের পাঁক মাটি ও গোবর সার দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া উহাতে খড়ির মূল সমেত এক একটি ঝাড় লাগাইতে হয়। যে ঝাড় লাগাইতে হয় সেই ঝাড়ে মূল সমেত তিন চারিটি খড়ি থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ এক বিঘা জমিতে চারি শত হইতে পাঁচ শত ঝাড় খড়ি লাগান চলে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি বৃষ্টিপাত না হয় তাহা হইলে বৈশাখ মাস হইতে প্রতি মাসে একবার করিয়া জল সেচন করা আবশ্যক। জল সেচন দ্বারা খড়ি উত্তমরূপে ঝাড় বাঁধে এবং উহা সুচারু রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাত না হইলে বা জল সেচন না করিলে খড়ি সেরূপ সতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

পর বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে জমির জল শুষ্ক হইলে খড়ি কাটিয়া লইতে হয়। খড়িগুলি কাটিবার পর জমিতে কোদাল দেওয়ার পর মূল হইতে পুনরায় খড়ির কোঁড়া বাহির হয়। ২।৩ বৎসরের মধ্যে ঝাড়ের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাহা খড়িতে পূর্ণ হইয়া যায়। খড়ির মূলে কোদাল দেওয়ার পর পাঁক এবং গোবর সার দেওয়ার একান্ত আবশ্যক। খড়ির জমির সাধারণ উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য খইল এবং হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে; খড়ি কাটার সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার বিষয় এই যে, খড়ির মূল হইতে কোঁড়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই খড়ি কাটা আবশ্যক। খড়ি কাটার পর খড়িগুলি এক সপ্তাহকাল এক স্থানে জাঁত দিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তারপর উহার পাতা ঝাড়িয়া বড়, মাঝারি ও ছোট অর্থাৎ "ল" ধরাইবার খড়ি, চাল ছাইবার খড়ি ও বেড়ার খড়ি এই তিন সাইজ করিতে হয়। "ল" ধরাইবার খড়িগুলি শুষ্ক করতঃ ৮।১০ দিন কাল জলে পচান উচিত। চালের বা বেড়ার খড়ি পচাইতে হয় না।

১৴০ বিঘা জমিতে খড়ি চাষের আয়-ব্যয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১ম বৎসর

আয়—

বড় খড়ি	০
মাঝারি খড়ি (১৬ বোঝা)	৮৲
ছোট খড়ি (৮ বোঝা)	২৲
	১০৲

ব্যয়-

৩ খান লাঙ্গল	১॥০
খাদ কাটা, পাঁক ও গোবর সার দেওয়া	১৲
খড়ি মুড়া বসান	১৲
জল সেচন	১৲
খড়ি কাটা	১৲
খড়ি আড়া, সাইজ করা, পচান ইত্যাদি	১৲
	৬॥০

২য় বৎসর

আয়

বড় খড়ি (৮ কাহন)	২৪৲
মাঝারি খড়ি (২৪ বোঝা)	১২৲
ছোট খড়ি ২০ বোঝা	৫৲
	৪১৲

ব্যয়

কোদাল দেওয়া	২॥০
পাঁক ও গোবর সার দেওয়া	॥০
জল সেচন	১৲
খড়ি কাটা	৩৲
খড়ি আড়া, সাইজ করা, পচান ইত্যাদি	৩৲
	১০৲

৩য় বৎসর

আয়

বড় খড়ি (১২ কাহন)	৩৬৲
মাঝারি খড়ি (৩২ বোঝা)	১৬৲
ছোট খড়ি (২৪ বোঝা)	৬৲
	৫৮৲

ব্যয়

কোদাল দেওয়া	২॥০
পাঁক ও গোবর সার	॥০
জল সেচন	১৲
খড়ি কাটা	৫৲
খড়ি আড়া, সাইজ করা, পচান ইত্যাদি	৬৲
	১৫৲

ব্যাঙ্কিং অধ্যায়

ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের বর্ত্তমান অবস্থা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া হল গৃহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারদের বার্ষিক সভা হয়। তাহাতে উহার গভর্ণর স্যার জেমস্ টেলর সি আই ই মহোদয় যে অভিভাষণ প্রদান করেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম লিখিত হইল।

১৯৩৮ সালে আমাদের খরচ হইয়াছে ৯৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯৩৭) এই খরচের পরিমাণ ছিল ৯৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। খরচ কিছু কমিলেও, লাভ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ফলে আমরা গবর্ণমেণ্টকে আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে পারিয়াছি। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড হইতে অল্প সময়ের মেয়াদে যে ডিপজিট পাওয়া যায়, তাহার উপরেই আমাদের লাভ নির্ভর করে। এবারে ঐ ডিপজিটের উপর সুদের হার একটু কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দীর্ঘকাল মেয়াদের ডিপজিটের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

সিকিউরিটীর বাজার ঠিক একভাবে চলাতেই আমাদের লাভ কিছু বেশী হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ দুইটী;—প্রথমতঃ নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তন। এই নূতন আইন অনুসারে বীমা কোম্পানী সমূহকে তাহাদের মোট সম্পত্তির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা রাখিতে হয়। এই নির্দ্দিষ্ট অংশের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। জনসাধারণের মন বীমার দিকে অধিকতর ঝুঁকিয়াছে;—বীমা কোম্পানী সমূহের কারবারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী নিরাপদ ও লাভজনক বলিয়া উহার বাজার দর বেশী এবং সেইজন্য উহাতে লগ্নীর পরিমাণও অধিক। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে ভারতগবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বাজেটে আয়-ব্যয়ের মধ্যে যেরূপ একটা সমতা দেখা যায়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ নাই। যে সকল বৃহৎ ব্যাপারে একটা পৃথক আয়ের সম্ভাবনা থাকে, ভারতীয়

বাজেটে সেই গুলিকেই মূল খরচ (Capital expenditure), বলিয়া ধরা হয়,—যেমন বিজলী তৈয়ার ও সরবরাহের পরিকল্পনা কিম্বা জলসেচ কার্যের পরিকল্পনা ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য দেশে তাহা নহে। সেখানে গবর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করিবার বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেন, ভবিষ্যতে লাভ পাওয়া যাইবে এই আশাতে নহে, কিন্তু জনসাধারণের উপর আর ট্যাক্স চাপান অসম্ভব, সেই কারণে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা টাকা দিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট এই বৃথা আশাও মনে মনে পোষণ করিয়া থাকেন। যদিও কম সুদে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়, তথাপি সেই কম সুদ বরাবর বজায় রাখা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠে। এই হিসাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ গ্রহণ নীতি বিশেষ প্রশংসনীয়। এখনও যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কম সুদে টাকা পাইতেছেন, ইহাই তার প্রমাণ।

পৃথিবীর সকল দেশেই একটা অগ্রগতির চিহ্ন দেখা যায়। বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নূতন নূতন যন্ত্রাদির উদ্ভাবন, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি কার্যের বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে মানুষের জীবন যাত্রা অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীব্যাপী শিল্প বাণিজ্যের এই কর্ম্মময় অভিব্যক্তির ফলে ভারতবর্ষই অধিক পরিমাণে উপকৃত হইবে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা জটিল ও বিপদসঙ্কুল হওয়াতে ভারতবর্ষ সেই উপকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। একদিকে স্পেনীয় যুদ্ধ এবং অন্যদিকে চীন সমর সর্ব্ববিধ শান্তি ও সাম্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই কারণে পূর্ব্বদেশে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তুলা রপ্তানী কমিয়া যাওয়াতে ভারতের আর্থিক ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টাও কম প্রবল নহে। কয়েক মাস পূর্ব্বে একটা আসন্ন মহাযুদ্ধ হইতে পৃথিবী রক্ষা পাইয়াছে। ভারতীয় আর্থিক সমস্যায় কৃষিকার্য্য একটা প্রধান বিষয়। সম্প্রতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। যে সকল প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের ১৯৩৮-৩৯ সালের বজেটে দেখা যায় পল্লী গ্রামের উন্নতির জন্য বিশেষরূপে বহু টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পদ্ধতি, উৎকৃষ্ট শস্য বীজ এবং সার জোগান, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, জমিতে জলসেচ প্রভৃতি নানা কার্য্যে এই বরাদ্দের টাকা খরচ করা হইতেছে। কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহের দোষ ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ঐ কো-অপারেটিভ সোসাইটীর দ্বারাই কৃষি সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় পাওয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহের পুনঃ সংস্কার এবং পুনর্গঠনের একান্ত প্রয়োজন। তবেই উহাতে সুফল ফলিবে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিষয়ে অনেক কথা আলোচ্য বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে তালিকাভুক্ত একটী বড় ব্যাঙ্ক Quilon Bank বাতি জ্বালিয়াছে। ইহার অনেক শাখা ছিল। এই ব্যাঙ্ক ফেল্ পড়াতে দক্ষিণ ভারতের আরও কয়েকটী ব্যাঙ্কের অবস্থা টলটলায়মান হইয়া উঠে। সৌভাগ্য বশতঃ এখন সেই সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে। তালিকাভুক্ত

ব্যাঙ্ক সমূহের সহিত রিজার্ভব্যাঙ্কের সংযোগ আরও গাঢ়তর করা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা এই ঘটনায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের আয় ব্যয় ডিপজিট, লগ্নী, দেনা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্ব্বদা জানা থাকিলে কোন আকস্মিক বিপদের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া বাঁচাইতে পারে। এ সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে তালিকাভুক্ত সমস্ত ব্যাঙ্কের নিকট চিঠি প্রেরিত হইয়াছে।

যে সকল ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত নহে, তাহাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপেক্ষা করে নাই। যদিও আইন অনুসারে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যের বহির্ভূত। বাস্তবিক দেশের ব্যাঙ্কিং কারবারের যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে ঐ সকল ছোট ব্যাঙ্কেরও বাঁচিয়া থাকা দরকার। এই জন্য তালিকাবহির্ভূত কয়েকটী বড় ব্যাঙ্কের নিকট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে চিঠি প্রেরিত হইয়াছে। তাহার উত্তরে আশাজনক সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ সকল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সংযোগ রাখিতে ইচ্ছুক।

সকলেই অবগত আছেন, দেশের মধ্যে নানা স্থানে বহুসংখ্যক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃহৎ ব্যবসায়ের না হউক, অন্ততঃ ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প ও কৃষি কার্য্যের উন্নতির পক্ষে এই সকল ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু যথেষ্ট মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল না থাকায় এবং অবিচারিত ভাবে দূর দূর স্থানে বহু সংখ্যক ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়া এই সকল ব্যাঙ্ক অল্পসময়ের মধ্যে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বেশী পরিমাণ ডিপজিট পাইবার জন্য ইহারা উচ্চহারে সুদ দেয়। সেইজন্য ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া বিপদজনক কারবারে টাকা লগ্নী করিতে হয়। ফলে ইহারা অধিকতর বিপদে জড়াইয়া পড়ে। এইজন্য ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী বিষয়ক আইনের সংশোধন সময়ে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী গঠন বিষয়ে কয়েকটী নূতন নিয়ম করা হইয়াছে। তাহা যথেষ্ট না হইলে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে এ সম্বন্ধে নূতন আইন করা প্রয়োজন হইবে।

বাংলার নদ-নদী সমস্যা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত আশুতোষ হল্-গৃহে বাংলা গবর্ণমেণ্টের সেচবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মহরাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী (কাসিমবাজার) "বাংলার নদ-নদী এবং তাহার আর্থিক উন্নতি" সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই ;—

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, এই কয়েকটী জেলা এবং হুগলী হাবড়া জেলার পশ্চিমাংশ ধৌত করিয়া দামোদর, অজয়, ময়ুরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর, কাঁসাই প্রভৃতি নদ প্রবাহিত। ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে ইহাদের উৎপত্তি। বর্ষাকালে ইহাদের স্রোত অতি প্রবল হয়। মধ্যবঙ্গের হাবড়া-হুগলী জেলার পূর্ব্বাংশ, মুরশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা জেলা ধৌত করিয়া ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা, জলাঙ্গী, ভৈরব, গড়াই প্রভৃতি বহুসংখ্যক নদ-নদী গঙ্গার শাখারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। পদ্মার মধ্যদিয়া গঙ্গানদী পূর্ব্ব বাহিনী হওয়াতে বর্ত্তমান সময়ে এই সকল শাখা ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে। উত্তর বঙ্গের রাজসাহী বিভাগে এবং ঢাকা বিভাগের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় তিস্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনা এবং মেঘনা নদীসমবায় রহিয়াছে। তিস্তার প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র যমুনার দিকে যাওয়াতে পুনর্ভব, আত্রেয়ী এবং করতোয়া প্রভৃতি নদ-নদী মজিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় ব্রহ্মপুত্র তাহার পুরাতন গতিপথ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার পথে চলিয়াছে। একমাত্র মেঘনা নদী এখনও অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া পূর্ণশক্তিতে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর খাত এখনও গভীর এবং জলসম্ভার প্রচুর রহিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার বাংলাদেশের নদীসমূহের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। উহাদের দ্বারা বাংলার বাণিজ্যসম্পদ এবং সুখসৌভাগ্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে হ্যামিল্টন্ বলিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশের বর্দ্ধমান জেলাই কৃষিসম্পদে শ্রেষ্ঠ,—তারপর মান্দ্রাজের তাঞ্জোর জেলা। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ বেণ্ট্‌লি বাংলার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত এই সকল অভিমতের কি শোচনীয় অসাদৃশ্য! ম্যালেরিয়া, মড়ক, দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ—এই সব দুঃখজনক দৃশ্যই সেই চিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলার নদীসমূহের দুরবস্থাই ইহার প্রধান কারণ।

প্রতিকারের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলা গবর্ণমেণ্ট বন্যার জলে জমি সেচ করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে হুগলী, হাবড়া ও বর্দ্ধমান জেলার প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচ হইবে। ইহার জন্য খরচ বরাদ্দ হইয়াছে আড়াই কোটী টাকা।

শীঘ্রই এই কার্য্য আরম্ভ হইবে। গবর্ণমেণ্টের আরও দুইটী মতলব আছে,—একটী দ্বারকেশ্বর, অন্যটী ময়ুরাক্ষী। এই দুইটীতে সুবৃহৎ জলাধার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বন্যার জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ সঞ্চিত জল জমিতে সরবরাহ করা হইবে। দ্বারকেশ্বর জলাধারের দ্বারা বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জিলার প্রায় ৬ লক্ষ বিঘা জমিতে এবং ময়ুরাক্ষী জলাধারের দ্বারা বীরভূম ও মুরশিদাবাদ জেলার প্রায় ১৩ লক্ষ বিঘা জমিতে জল সেচ করা যাইবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দুঃসাধ্য সমস্যা হইয়াছে,—দামোদর অজয় প্রভৃতি নদ-নদীর তীরে সুদীর্ঘ বাঁধ। নিতান্ত অবিবেচনার ফলেই এই সকল বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে নদ-নদী-সমূহের অতিরিক্ত জল প্রবাহের গতিরোধ হওয়াতে ভূমির উর্ব্বরতা এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের সেচবিভাগের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বাঁধ রহিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল। বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর এবং চব্বিশপরগণা জেলায় অধিকাংশ বাঁধ অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত নদীয়া মুরশিদাবাদ, গঙ্গার উত্তর তীর এবং ত্রিপুরা জেলাতেও বাঁধ আছে।

নদী মজিয়া যাওয়ার দরুণ মুরশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, চব্বিশপরগণা এবং খুলনা, বিশেষ এই কয়টী জেলাতেই কৃষি ও স্বাস্থ্যের চরম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট কিছুকালপূর্ব্বে মিশরের সেচ-ইঞ্জিনিয়ার স্যার উইলিয়ম উইলকক্সের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, মিশরে নীলনদের উপর যেরূপ বাঁধ বা ব্যারেজ নির্ম্মিত হইয়াছে সেইরূপ একটী ব্যারেজ গঙ্গার উপরে নির্ম্মাণ করা দরকার। যেস্থানে বড়ল নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে' সেই স্থান হইতে ১৪ মাইল দূরে ভাটির দিকে এই ব্যারেজ নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে গঙ্গার অতিরিক্ত বন্যার জল মাথাভাঙ্গা জলাঙ্গী প্রভৃতি শাখা দিয়া প্রবাহিত হইবে। সারা বৎসর ধরিয়া ভাগীরথী এবং হুগলী নদীতেও সমানভাবে জলপ্রবাহ চলিবে। স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের হিসাব মতে এই ব্যারেজ নির্ম্মাণ করিতে ১৮ কোটী টাকা খরচ পড়িবে।

ফরমুলা ও রিসিপি

নস্য প্রস্তুত প্রণালী—ভাল তামাকের পাতা খুব মিহি করিয়া গুঁড়া করিয়া গোলাপ জল কিম্বা ল্যাভেণ্ডারে বা ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিবে। এইরূপে ৪।৫ বার করিয়া খুব মিহি চালুনী দ্বারা চালিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নস্য তৈয়ারী হয়।

ব্ল্যাক কালী—হরিতকী দেড় পোয়া, টহরী অর্দ্ধপোয়া, মাজুফল দেড় পোয়া, হীরাকস অর্দ্ধপোয়া, নীলরং অর্দ্ধ কাঁচ্চা, খদির একপোয়া পীত ম্যাজেণ্টা এক গ্রেণ। প্রথমে মাজুফল, হরীতকী ও টহরী গুঁড়া আড়াই সের জলে ৪।৫ দিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে লৌহ কটাহে করিয়া অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিবে। তৎপরে তাহাতে খদির ও হীরাকস মিশ্রিত করিয়া উত্তম রং হইলে মাখাইয়া বেশ করিয়া ছাঁকিবে। তৎপরে ৮।১০ দিন সেই ভাবে রাখিবে। তৎপরে পুনরায় ছাঁকিয়া লইয়া অর্দ্ধ কাঁচ্চা নীলরং ও এক গ্রেণ পীত ম্যাজেণ্টার মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।

ব্ল্যাক পাউডার—মাজুফলের গুঁড়া তিন পোয়া, আরবী গঁদ ৬ আউন্স, হীরাকস ১০ আউন্স, নীলরং পৌণে ১ কাঁচ্চা, পীত ম্যাজেণ্টা ২।০ গ্রেণ। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলেই কাল কালীর গুঁড়া প্রস্তুত হইল।

কাল কালী—হীরাকস এক পোয়া, হরীতকী অর্দ্ধ পোয়া, টহরী অর্দ্ধ পোয়া, মাজুফল অর্দ্ধ পোয়া, জল /৫।। সের। টহরী, হরীতকী ও মাজুফল অর্দ্ধ গুড়া করিয়া ৭।৮ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। লৌহ কটাহ মধ্যে সিদ্ধ করিয়া হীরাকস মিশাইয়া পুনরায় অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিবে। যখন দেখিবে বেশ কাল রং হইয়াছে তখনই নামাইয়া ছাঁকিয়া ৪।৫ দিন রাখিয়া দিতে হইবে। পরে পুনরায় ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম কাল কালী প্রস্তুত হইল।

লাল কালী—কারমাইন ৪ ড্রাম, লাইকার এমোনিয়া ১ আউন্স, আরবী গঁদ ১ স্ক্রুপল, ৩৬ আউন্স। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলেই লাল কালী প্রস্তুত হয়।

২। রেকটীফায়েড স্পিরিট ১।। আউন্স, বকম কাষ্ঠ ২ আউন্স, ফটকিরি ৫ ড্রাম, ক্রিম অব টার্টার ৪ ড্রাম, আরবী গঁদ চূর্ণ ৪ ড্রাম, টিঞ্চার কচিনিল ২০ গ্রেণ। বকমকাষ্ঠ ক্রিম অফ টার্টার ও ফটকিরি জলে সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া উহাতে আরবী গঁদ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে লাল হইলে উহাতে রেকটীফাইড স্পিরিট ও টিঞ্চার কচিনিল মিশ্রিত করিয়া লইবে।

লাল কালীর পাউডার

১। কারমাইন ১।।০ ড্রাম ও আরবী গঁদ ১৫ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলেই উত্তম লাল কালী প্রস্তুত হয়।

নীল কালী—প্রুসিয়ান ব্লু ৪ ড্রাম এবং জল প্রয়োজন মত লইয়া একত্র মিশ্রিত করিলেই উত্তম নীল কালী প্রস্তুত হয়।

সবুজ কালী—বর্দ্দী বা ভারদিগ্রিণ ২ আউন্স, ক্রিম অব টার্টার ১আউন্স। এই দ্রব্যকে ৮ আউন্স জলে দ্রব করিয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে এবং শীতল করিয়া বোতলে পুরিবে।

সাদা কালী—মিউরাটিক এসিড ১ ড্রাম, আরবী গঁদ চূর্ণ ১২ গ্রেণ, জল ১ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাল, নীল কিম্বা হরিদ্রা বর্ণের কাগজে লিখিবে।

সোণালী কালী—অল্প পরিমাণ স্বর্ণ পাউডার (যাহা ডাকের সাজে প্রতিমায় ব্যবহৃত হয়) উহা গঁদের জলে মিশাইয়া লিখিলে পরে শুকাইয়া গেলে বস্ত্র দ্বারা ঘসিয়া লইতে হয়।

কাপড় মার্কার কালী—লাইকার এমোনিয়া ৪ পাউণ্ড, তুঁতে ১।।০ আউন্স, সোডা কার্ব্ব ২ আউন্স, কষ্টিক ৪ আউন্স। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে লিখিয়া আগুনে তাপ দিলেই কাল লেখা হইবে।

রবার ষ্ট্যাম্পের কালী—বেগুনী রং ২ আউন্স, গ্লিসারিণ ২ আউন্স, জল ১ আউন্স। প্রথমতঃ লৌহ কটাহে করিয়া জল গরম করিয়া তাহাতে রং মিশ্রিত করিবে। তৎপর গ্লিসারিণ দিয়া অল্পক্ষণ ফুটাইয়া লইতে হয়। ইহাতে বেগুনী রংয়ের পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন প্রকার রং মিশ্রিত করিবে সেই প্রকার কালিও প্রস্তুত হইবে এবং ভূষা মিশ্রিত কাল কালী প্রস্তুত হয়।

জুতার কালী—হাড় পোড়া, কয়লা দেড় ছটাক, খাঁড়গুড় ১।। ছটাক, হোয়াইট্ মৎস্যের তৈল ৬ ড্রাম, গন্ধদ্রাবক ৬ ড্রাম, ভিনিগার ১।। পাউণ্ড। কয়লা, খাঁড়গুড় ও ভিনিগার একত্র মিশাইয়া পরে গন্ধদ্রাবক ও হোয়াইট মৎস্যের তৈল এক করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে।

ব্রক্কো (যাহা সাদা জুতায় লাগায়) সপেটা ৫ ছটাক, মাজাখড়ি ৭ ছটাক, গঁদ অর্দ্ধ তোলা, নীল ৫ গ্রেণ। প্রথমে সপেটার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া গুলিবে, পরে তাহাতে খড়ি ভিজাইয়া কাদার ন্যায় করিবে। পরে নীল ও গালান গঁদ মিশাইয়া রাখিতে হইবে, শেষে যখন ময়দার ন্যায় হইবে তখন ইচ্ছানুযায়ী লৌহ অথবা টিনের ছাঁচে ফেলিয়া উত্তমরূপে চাপ দিয়া বাহির করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট সাদা ব্রক্কো প্রস্তুত হইল।

ব্রক্কো (যাহা ব্রাউন অথবা বাদামী জুতায় লাগায়) ভেড়ার চর্ব্বি ১২ আউন্স, ভাল মোম ১।।০ আউন্স, সুইট অয়েল ১৫ আউন্স, গঁদ ৩ড্রাম, চিনি ৩ড্রাম, হলদে রং ১।।০ড্রাম। প্রথমে চর্ব্বি মোম ও সুইট অয়েল অগ্নিতে চড়াইবে, চর্ব্বি ও মোম গলিয়া গেলে গলান গঁদ ও চিনি

মিশাইয়া পরে অল্প টার্পিন মিশাইয়া প্রস্তুত করিবে। পরে ঠাণ্ডা হইলে শিশি পূর্ণ করিবে।

চুলের কলপ

১। ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ১॥ আউন্স, সলফিউ-রেট অব পটাশ ১০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া চুলে লাগাইলে চুল বেশ কাল হইবে।

২। মুদ্রা শঙ্খ ২ ছটাক, টাটকা শঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, চা খড়ি ১ ছটাক এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ একটু লইয়া গরম জলে গুলিয়া ন্যাকড়া করিয়া চুলে মাখাইয়া রাখিবে, দুই ঘন্টা পরে মস্তক ধুইয়া ফেলিলেই চুল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইবে। এই দ্রব্য খুব বিষাক্ত, সাবধানে ব্যবহার করিবে যাহাতে হাতে বা মুখে না লাগে।

গো মহিষাদির কথা

গরু ও মহিষ চিকিৎসা

গরু ও মহিষ উভয়েরই চিকিৎসা একই প্রকার। সুতরাং পৃথক পৃথক না লিখিয়া এক সঙ্গেই দেওয়া গেল।

মচকান—১। কোনরূপ আঘাত লাগিলে বা মচকিয়া গেলে সোরা একদফা, নিশাদল একদফা খানিকটা তারপিন তৈল সহ মালিশ করিবে।

২। কাঁকড়ার মাটি ও খিচ অথবা টাটকা গোবর গরম করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হইবে।

৩। অপমার্গ ও হলুদ আতপ চাউলের সহিত বাটিয়া বেদনার স্থানে দিলে সত্বর ফল পাওয়া যায়।

শিং ভাঙ্গিলে—ঘুঁটের ছাই, চুল ও নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়।

আগুনে পুড়িলে—১। কলাগাছের পচা গোড়া বাটিয়া দিলে সমস্ত যন্ত্রণার শান্তি হয়, ঘা হয় না।

২। নারিকেল তৈল অল্প চুণের সহিত বেশ করিয়া মিলাইয়া দগ্ধস্থানে তুলায় করিয়া লাগাইয়া দিলে সত্বর পোড়া ঘা সারিয়া যায়।

রক্তপড়া—১। কোনরূপে কাটিয়া গিয়া যদি রক্ত পড়ে তাহা হইলে তামাকের গুল গুঁড়া করিয়া সরু নেকড়ায় ছাঁকিবে। পরে সেই চূর্ণ কাটা যায়গায় দিয়া কলাপাতা মুড়িয়া বেশ করিয়া নেকড়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে রক্ত পড়া বন্ধ ও ক্ষত আরোগ্য হয়।

২। হলুদ চূর্ণ দিলেও উপকার হইবে।

৩। গোয়ালে লতা বাটিয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

দরদ—১। লাঙ্গলের গরু মহিষের ঘাড়ে বেদনা হইলে মেন্দিপাতা বাটিয়া আগুনে গরম করিয়া গরম গরম চাপাইয়া দিলে বেদনা আরোগ্য হয়।

২। শামুকের জল কিংবা বেশী বেদনা থাকিলে গরুর চর্ব্বি ঘাড়ে মর্দ্দন করিলে আরোগ্য হয়।

বাঁটে ঘা—১। বেশ করিয়া বাঁট ধুইয়া (যদি ধুইতে না দেয় তাহা হইলে এমনই)

ঘি বাঁ মাখন বা ননী লাগাইলে আরোগ্য হইবে।

২। যদি অধিক ফাটে বা পুঁজ পড়ে তবে ফিটকারী, মোম ও সফেদা সমভাবে ঘিয়ের সহিত গলাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া বাঁটে লাগাইতে হয়।

প্রসবদ্বার ফাটা ঘা—১। নারিকেল তৈলে রসুন ভাজিয়া ঐ তৈল লাগাইলেই ভাল হইবে।

কাউর ঘা—১। গরু মহিষের স্কন্ধে (যে যায়গায় কড়া পড়িয়াছে) এক প্রকার ঘা হয়। খুব শুড় শুড় করে বলিয়া নিজেই ঘর্ষণ করে। এক ছটাক মতিহার তামাক জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ১২ ঘণ্টা ভিজার পর আগুনে চাপাইয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। যখন বেশ ঘন হইয়া আসিবে উহার সহিত এক ছটাক খাঁটি সর্ষপ তৈল মিশাইতে হইবে। উহা ৫।৭ দিন ব্যবহারেই ভাল হইবে।

২। তালের মাড়ির সঙ্গে কলি চুণ মিশাইয়া অথবা শিয়ার কাঁটার রস দিলে উপশম হইবে।

জিভে ঘা—১। চিতল মাছের আঁইস ভস্ম করিয়া ক্ষতস্থানে দিয়া দুই ঘণ্টা মুখ বাঁধিয়া রাখিবে। দিনে একবার করিয়া ৪।৫ দিন দিলেই ঘা শুকাইয়া যাইবে।

২। অশ্বত্থ ছাল ভস্ম করিয়া দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৩। তেঁতুল পাতা দিয়া মাজিয়া দিলেও উপকার হয়।

পোকা—ঘাড়ে পোকা হইলে খানিকটা মড়ার মাথার খুলি গলায় বাধিয়া দিবে, আর সামান্য একটুকু খাওয়াইয়া দিলে পোকা নষ্ট হইয়া অচিরে আরোগ্য হইবে।

২। আতার পাতা বাটিয়া কলি চুণ সহ লাগাইলে পোকা পড়া ভাল হয়।

৩। পাটের বীচি বাটিয়াও ঘাড়ে দিলে পোকা নষ্ট হয়।

সুটি—লক্ষণ—গরু অত্যন্ত হাঁচে কাশে ও নাক ঝাড়ে। ১। মাথার গর্ত্তে সরিষার তৈল ২।৩ দিনে দুইবার দিতে হয়।

২। অল্প পরিমাণে ঘলঘষে গাছের রস নাকের ভিতর ঢালিয়া দিলে সত্ব সত্ব ভাল হয়।

ক্রিমি—১। হুকার জলের সহিত গোটা-কতক কাগজি লেবুর পাতা বাটিয়া ৩।৪ দিন খাওয়াইলে আরোগ্য হইবে।

২। লবণ এক তোলা, হিরাকসের গুঁড়া দুই আনা, এক সঙ্গে কলাপাতা মুড়িয়া খাওয়াইলে ক্রমি অবশ্য ভাল হইবে।

পেটফাঁপা ১। কদম পাতার রস আধ পোয়া একেবারে খাওয়াইয়া দিলে পেট ফাঁপা দূর হয়।

২। গুড় আধ পোয়া ও কাঁচা হলুদের গুঁড়া এক ছটাক মিশাইয়া খাওয়াইলে ভাল হইবে।

রক্তদুগ্ধ ১। কিঞ্চিৎ রেড়ীর বা তিসির তেলের সহিত হাঁসের বা মুরগীর ডিমের সাদা অংশটা ৫।৭ দিন খাওয়াইলে ভাল হইবে।

উদরাময়—১। পলাস ১।০ তোলা, চিরতা চূর্ণ ৸০ আনা, চা খড়ি চূর্ণ ।৵০ আনা, আফিং ৴০ আনা এই সকল চূর্ণ করিয়া এক ছটাক দেশী মদের সহিত ভাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উদরাময় আরোগ্য হয়।

২। চিড়ে ফুড়ো ও চাঁপা কলা একত্র করিয়া অথবা বাঁশের পাতা কিংবা চালতার পাতা খাওয়াইলে আরোগ্য হইবে।

চোখে জল ঝরিলে ১। ভুরুর উপরে নেড়া সিজুর আটা খড়িকায় করিয়া ৪।৫ বিন্দু লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হইবে। সিজুর আটায় ঘা হইয়া যায় সেইজন্য অধিক দেওয়া নিষিদ্ধ। চোখের ভিতর যাহাতে না যায় এ বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

পেটকামড়ানি ১। কদমপাতার রস আধপোয়া, ইক্ষুগুড় এক ছটাক উভয় একত্র করিয়া খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

২। আমরুল শাকের পাতা বেশ করিয়া ধুইয়া তাহার রস নিংড়াইয়া চোপে এক ফোঁটা মাত্রা দিলে বিশেষ উপকাব হয়।

৩। চা খড়ি চূর্ণ একতোলা ও কাঁটা নটের শিকড় একতোলা ভাতের মাড়েব সহিত খাওয়াইলে উপকার হয়।

রক্তদাস্ত ১। নাটার ডাঁটা, গুলঞ্চ, রক্ত কম্বলের গোড়া, নিমের ছাল প্রত্যেক একতোলা করিয়া একত্রে বাটিয়া কলাপাতা মুড়িয়া সেবন করাইলে রক্তদাস্ত ভাল হয়। কুর্চ্চি সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ভাল হয়। বাছুরের রক্তদাস্ত হইলে গরম ভাতের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ঘুটের ছাই মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

রক্তমূত্র ১। পরিষ্কার মাড়ের সঙ্গে ১॥০ ছটাক গুড় ও এক ছটাক দেশী মদ মিশাইয়া খাওয়াইলে অচিরে আরোগ্য হয়।

২। ১০টী নারিকেল ফুল খাওয়াইলে সদ্য সদ্য ভাল হয়।

এঠুলি লাগিলে ১। কেরোসিন অথবা তারপিন মাখাইলে এঠুলী ছাড়িয়া যাইবে।

২। পাণের ও ছোট পিয়াজের রস মাখাইলে এঠুলী ধ্বংস হইবে।

মুষ্টিযোগ

অতি প্রাচীন কালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পাঁচন এবং মুষ্টিযোগ দ্বারা জ্বরাদি সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা হইত এবং রোগীও অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ হইত। এমন কি আমাদের দেশের কুল মহিলাগণও মুষ্টিযোগ দ্বারা বহু রোগ আরোগ্য করিতেন। পূর্ব্বকালে কাহারও জ্বর হইলে আদার রস, বেলপাতার রস এবং বৃহতী পত্রের রস সেবন করিলেই সেই রোগী আরোগ্য লাভ করিত, অন্ততঃ ৭ দিন গত না হইলে কাহাকেও ঔষধ সেবন করান হইত না। এইরূপ নিয়মেই গৃহে রোগীগণ আরোগ্য লাভ করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর ভারতে সেই নিয়ম নাই। এখন আর মুষ্টি যোগ দ্বারা রোগের চিকিৎসা হয় না, অথবা আহার বিহারের দোষে শারীরিক ধর্ম্মের ব্যভিচারিতায় এখন আর মুষ্টিযোগ তেমন ফল প্রদান করে না। বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রের অবমাননা, নিয়মের ব্যতিক্রম পদেপদেই সঙ্ঘটিত হইতেছে, শারীরিক অবনতিও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন আর বাঙ্গালার গৃহে শান্তির লেশ মাত্র নাই, নিত্য নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি হইয়া অভাবের বৃদ্ধি করিতেছে। বর্ত্তমান কালে প্রাচীন কাল অপেক্ষা সহস্র গুণ চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় সত্ত্বেও আরামদায়িনী চিকিৎসা পাওয়া যাইতেছে কই?

পূর্ব্বে রোগ জনিত শারীরিক অশান্তি কদাচিৎ শুনা যাইত, এখন গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে রোগের পূর্ণ রাজত্ব! কত নূতন নূতন নামধারী সংক্রামক রোগের যে আমাদের দেশে আমদানি হইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করে? নানাবিধ রোগের বিষে জর্জ্জরিত, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, শারীরিক ও মানসিক অশান্তিতে শীর্ণ, দুর্ব্বল চিত্ত বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ কে নির্দ্দেশ করে? কারণ আর কিছুই নয়, হিন্দু-শাস্ত্র গত পবিত্রতার অভাবই রোগের একমাত্র কারণ। বলিতে গেলে দোষ হয়, বিদেশী লোকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বংশ গত পবিত্রতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে হিন্দু সন্তান আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়মের অধীন, এখন কয়জন লোক সে নিয়ম প্রতিপালন করে?

নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই বিকার আসিবে, সে ত স্বতঃসিদ্ধ কথা।

বর্ত্তমান সময়েও প্রাচীন নিয়মাদি প্রতিপালন করেন এইরূপ লোকের অভাব নাই। তাঁহাদেব কার্য্য কলাপ ও শারীরিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝা যায়, যাঁহারা স্বধর্ম্মানুরাগী পবিত্রহৃদয় তাঁহারাই স্বাস্থ্য সুখের অধিকারী, তাঁহারাই সংসারে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন; সংসারের কোন ও অশান্তি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তবে ঋতু ধর্ম্ম বশতঃ কখন কখন তাঁহাদিগকেও সামান্য রূপ রোগের কবলে পতিত হইতে হয়। কিন্তু তাহা সামান্য আয়াস সাধ্য সাধারণ মুষ্টি যোগ দ্বারাই তাহার প্রশমন হইয়া থাকে।

"নবজ্বরে"—(১) বাতের প্রকোপ প্রকাশ পাইলে বেলপাতার রস ও সৈন্ধব লবণ তুলসী পাতার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(২) ধনে ১ তোলা ও পটোল পাতা ১ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বরের উপশম হইয়া থাকে।

(৩) পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতা, শুঠ, ইহাদের প্রত্যেক পদ সমান ওজনে মোট ২ তোলা লইয়া পূর্ব্ব নিয়মে কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাত শ্লৈষ্মিক জ্বরের উপশম ও কাস রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(৪) পূর্ব্ব নিয়মে দশ মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলেও বাত শ্লৈষ্মিক দোষ উপশমিত হয়।

"বিষম জ্বরে"—ক্ষেৎ পাপড়া ও শেফালিকা পত্রের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

"জীর্ণজ্বরে"—নিমপাতা, উচ্ছে পাতা, কাক তুলসীর পাতা ও গোল মরিচ ইহাদের প্রত্যেকে সমানাংশ গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া বুট প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতে গোমূত্র অনুপানে সেবন করিলে প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

"পালাজ্বরে"—অপাঙ্গের মূলের রসের নস্য অথবা অপরাজিতা পাতার রসের নস্য ২।৩ দিন গ্রহণ করিলে পালাজ্বর দূরীভূত হয়।

পিত্তজ্বরে যে ব্যক্তি তৃষ্ণা ও দাহেতে অত্যন্ত কাতর হয়, তাহার শিরঃ প্রদেশে ভূমি কুষ্মাণ্ড, দাড়িমের খোসা, লোধকাষ্ঠ, কৎবেল ও ছোলঙ্গ লেবুর সমভাগ লইয়া একত্র উত্তমরূপে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। ইহা প্রায় জীর্ণজ্বরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিঁপুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস কাস জ্বর, প্লীহা ও হিক্কা নিবারিত হয়। ইহা বালকের পক্ষেও প্রশস্ত,—কিন্তু মাত্রা খুব অল্প হওয়া আবশ্যক।

কণ্টকারি, বেড়েলা. বাম্না,—বাচালতা, গুলঞ্চ ও শ্যামলতা, এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে বাত পিত্ত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মুথা শুঠ ও চিরতা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় লইয়া ক্বাথ করিবে। ইহা সেবনে কফ বাত প্রশমিত হয়, বিশেষতঃ ইহা পাচক ও জ্বর বিনাশক।

মরিচ, পিপুল, শুঠ, মুথা, হরিতকী আমলকী বহেড়া কটকী পটোল পত্র, নিমছাল, বাসকপত্র

চিরতা গুলঞ্চ ও দুরালভা এই সকল দ্রব্যের যথা বিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ প্রশমিত হয় এবং তদাত্মক ব্যাধিরও উপশম হইয়া থাকে।

অতিসার চিকিৎসা।

আম, জাম ও আমলকী পাতার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধু সহযোগে সেবন করিলে অতি প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

বাবলা বৃক্ষ পত্রের রস অথবা সোনাছাল ও কুটজের ছালের রস ২ তোলা পরিমাণ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

ইন্দ্র যবের ক্বাথ সেবনে পিত্তাতিসার নিবারিত হয়।

গ্রহণী রোগ চিকিৎসা।

দাড়িমের ছাল ১ তোলা ও কুটজের ছাল ১ তোলা লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে অতিসারও গ্রহণী রোগের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

শালপাণি (ছালানি). বালা. বেলশুঠ ধনিয়া ও শুঠ ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে আধ্মান, শূল প্রভৃতি উপসর্গ সহ বাতজ গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা।

অর্দ্ধ তোলা বা এক তোলা হরীতকী, জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহাতে ১ সিকি ইক্ষু গুড় অথবা সৈন্ধব লবণ কিম্বা দুই আনা পরিমাণ শুঠের চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নির উদ্দীপন হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

যমানি (জৈন) একসিকি উত্তমরূপে পেষণ করতঃ তাহাতে দুই আনা সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবণ করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল ও হরীতকীর ক্বাথে অর্দ্ধ তোলা সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়। ধূমোদ্গার চোঁয়া ঢেকুর পেট ফাঁপা ও বেদনা নিবারিত হয়।

ধনিয়া ও শুঠের ক্বাথ পান করিলে আমাজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঠ ও সৈন্ধব লবণ একত্রে পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা যাইলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

শুঠ ১ তোলা ও যমানি ১ তোলা কুটিত করতঃ ১ পোয়া গরম জলে দুই ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিলে অজীর্ণ ও পেট ফাঁপার উপশম হয়।

ক্রিমি রোগ চিকিৎসা

পলাশ বীজ চূর্ণ ॥ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৩।৪ রতি মধুর সহ লেহন করিলে ক্রিমি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

আনারসের গাছের ডগা থেতো করিয়া তাহার রস মধু সহ সেবন করিলে ক্রিমির উপশম হইয়া থাকে।

ইনসিওরেন্স প্রসঙ্গ

পত্রান্তরে প্রকাশ, লাহোরের "হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী" স্বেচ্ছায় কারবার তুলিয়া দিবার জন্য লাহোর হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছেন।

—※—

গত ১লা জানুয়ারী হইতে ইউনিক য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর হেড আফিস ১এ ড্যান্সীটার্ট রো (ড্যালহৌসী স্কোয়ার, সাউথ) কলিকাতা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

—※—

মিঃ রামকৃষ্ণ সরকার নিউ এশিয়াটিকের কলিকাতা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—※—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, "বম্বে লাইফ" য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানী ১৯৩৮ সালে ১৪৪৬০০০০ টাকার নূতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহার পরিমাণ সাড়ে চারিলক্ষ টাকা অধিক।

—※—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ য়্যাসোসিয়েশানের আফিস ১৩।২ ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) উঠিয়া গিয়াছে।

—※—

হিন্দুস্থান কো-অপেরাটিভের মিঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ বি এস্ সি (লণ্ডন) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে "ব্যাঙ্কিং" বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

—※—

আমরা অবগত হইলাম, সম্প্রতি কলিকাতাতে সান্ অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানী নামে একটী নূতন বীমার কারবার খোলা

হইতেছে। ইহার মূলধন ৬লক্ষ টাকা এবং রেজিষ্টার্ড আফিস ১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত।

মেট্রোপলিটান ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর হেড আফিস্ ৪ বি, কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, মিঃ ভি কে চেট্টি সাউথ ইণ্ডিয়া ফায়ার য়্যাণ্ড জেনারেল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর (কোয়ম্বটুর) ম্যানেজার পদে আর নাই। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভি রঙ্গস্বামী নাইডু এক্ষণে উহার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

মিঃ বি সেন সরস্বতী ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের কার্য্য তত্বাবধান করিতেছেন।

কৃষ্ণনগরে ভারত ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর একটী সাব আফিস খোলা হইয়াছে। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম্ এম্ ষ্টুয়ার্ট আই, সি এস্ সেই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বাংলাগবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের পরামর্শদাতা য়্যাক্চুয়্যারী মিঃ ডবলু এইচ ক্লাউ এফ্ আই এ মহোদয়কে তাঁহার রঞ্জনী প্রাসাদে এক সান্ধ্য সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কলিকাতার বহু বীমাকর্ম্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই বৎসরে (১৯৩৯ সালে) বোম্বাইতে একটী নূতন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম, বম্বে য়্যালায়্যান্স য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানী লিমিটেড। স্যার জে বি বোমান বেহরাম ইহার চেয়ারম্যান হইয়াছেন। রেজিষ্টার্ড আফিস, সোরাব হাউস; ২৩৫ নং হরনবী রোড বোম্বাই।

ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ অরবিন্দ ঘোষ এম এ, কলিকাতার বীকন্ ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী হইয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ এম্ কে শ্রীনিবাসম্ বোম্বাইর জেনিথ লাইফ য়্যাসুর‍্যান্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বম্বে লাইফের কলিকাতাস্থিত চীফ্ এজেন্সীর ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এন্ সেন, সম্প্রতি বোম্বাইর ইষ্ট য়্যাণ্ড ওয়েষ্ট ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিসের য়্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিশ্ব ভারতীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ নেপাল চন্দ্র রায় এম্ এ, সম্প্রতি য়্যাসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়া (প্রভিডেণ্ট) ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী ইন্সুর‍্যান্স হেরল্ড পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটার মিঃ আশুতোষ ব্যানার্জ্জি লণ্ডনের মার্কেণ্টাইল য়্যাণ্ড জেনারেল ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর য়্যাক্চুয়ারী মিঃ ডবলু

এইচ ক্লাউকে উক্ত পত্রিকা কার্য্যালয়ে এক প্রীতি সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী ইন্সুর‍্যান্স য়্যাকাডেমীর সেক্রেটারী মিঃ এস্ এল্ রায়, তাঁহার যাদবপুরস্থিত বাসভবনে মিঃ ক্লাউকে অভ্যর্থনা করেন। মিঃ সিদ্ধ নাথ সেন, মিঃ ডি কে সান্ন্যাল, মিঃ পি সি ঘোষ, মিঃ ডি আর কৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীযুত নীরদ কুমার রায়, শ্রীযুত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ এস্ বি রায় চৌধুরী, শ্রীযুত শচীন্দ্র নাথ বাগচী, মিঃ বি কে গুপ্ত প্রভৃতি বহু বীমাকর্ম্মী সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আমরা অবগত হইলাম, বম্বে মিউচুয়্যাল কলিকাতায় নিজেদের একটা বৃহৎ বাড়ী তৈয়ার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ড্যাল্‌হৌসী স্কোয়ারের গীর্জ্জার নিকটে ২৫ কাঠা জমির উপর এই নব প্রস্তাবিত ছয়তলা বাড়ী নির্ম্মিত হইবে। ইহার জন্য খরচ হইবে ১০ লক্ষ টাকা।

লাহোরের নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সুর‍্যান্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চ আফিস গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ৪৪নং ষ্টীফেন হাউস, ড্যালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, এই ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা।

বাংলাদেশের জন্য একটী পরিকল্পনা।

(কে এম্ ওয়ালেস্-লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত)

জাতীয়-স্বাস্থ্য বীমা যে ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে মতদ্বৈধতা নাই। কিন্তু এ যাবৎ গবর্ণমেণ্ট অথবা জনসাধারণ কাহাকেও সে বিষয়ে উদ্যোগী হইতে দেখা যায় না। ভারতের শোচনীয় দুর্দ্দশা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, রোগ, ব্যাধি, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রতিকারের জন্য সাহস ও শক্তির সহিত অগ্রসর না হইলে এই শোচনীয় অবস্থা চিরকাল চলিতে থাকিবে। জাতীয় স্বাস্থ্য বীমার প্রচলনই প্রতিকারের একটি প্রধান উপায়। ইহা প্রবর্ত্তিত হইলে ঐ সকল দুঃখের কারণ শীঘ্র নিরাকৃত হইয়া যাইবে।

যাহাদের মাসিক বেতন ১০০ টাকার কম, তাহারা প্রত্যেকে যাহাতে পীড়িত অবস্থায় বিনা খরচে ডাক্তারের সাহায্য পায়, এমন একটা স্কীম্ যদি গঠন করা যায়, তবে তাহাতে দেশের অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যায় এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের মধ্যেও বেকার সমস্যা আর থাকে না। এমন কি ডাক্তারের অভাবও হইতে পারে। দেশে হাঁসপাতালের সংখ্যা যথেষ্ট নাই। গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী অথবা জনসাধারণ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিবার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং পীড়িত ব্যক্তিগণকে তাহাদের বাড়ীতে যাইয়াই চিকিৎসা করিতে হইবে। দেশের এই অল্প হাঁসপাতালে রোগীর ভিড়ও তাহা হইলে অনেক কমিয়া যায়।

সাধারণ চাকুরী জীবি ও শ্রমজীবি লোকেরা রোগাক্রান্ত হইলে অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারে না। তাহারা আফিসে ও কারখানায় অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাহাদের উপার্জ্জন কমিয়া যায়। এই কারণেই তাহাদের দারিদ্র্য। প্রথম অবস্থা হইতে যথারীতি চিকিৎসা করাইলে অনেক কঠিন রোগও অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়া যায়। অল্প বেতনের কেরাণী ও মজুরেরা যদি বিনাখরচে চিকিৎসার সুবিধা পায়, তবে তাহাদের এই দারিদ্র্য দুঃখ অনেক কমিয়া যায়। চিকিৎসার অভাবে অনেকে রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তখন আর অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং দারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইলে কেরানী ও মজুরেরা সর্ব্বদা সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম থাকিবে,—আফিসের ও কারখানার কাজ ভাল চলিবে, ভিক্ষুকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, জনসাধারণের মধ্যে মৃত্যুর হার এত বেশী থাকিবে না, দেশের অধিবাসিগণ সুস্থ ও সুখী হইবে,—সঙ্গে সঙ্গে "হাতুড়ে" ডাক্তার কবিরাজ লোপ পাইবে।

এইরূপে অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকদের সহিত জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে, জনসাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে অধিকতর

মনোযোগী ও শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। তাহাদের বাসগৃহ, খাদ্যদ্রব্য, পানীয়জল, বেশভূষা, জীবনযাত্রা প্রণালী, সমস্তই স্বাস্থ্যনীতি সম্মত হইবে। সহর ও পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং সকল দিকেই একটা সজীবতার আনন্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ইহার দায়িত্ব প্রধানতঃ ডাক্তারদের উপর। আশা করা যায়, তাঁহারা এই দায়িত্ব বিশেষ যোগ্যতার সহিত গ্রহণ করিবেন। স্বাস্থ্যবীমার দ্বারা কেবল যে আফিসের কর্ম্মচারী ও কারখানার শ্রমিকেরাই উপকৃত হইবে, এমন নহে। মালিকেরাও এ উপকারের ভাগী হইবেন। সুতরাং ইহার জন্য মালিকদিগকে যে চাঁদা দিতে হইবে, তাহা তাঁহারা বিনা আপত্তিতে আনন্দের সহিতই দিবেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দুইটী দেশে প্রচলিত স্বাস্থ্য বীমা পদ্ধতিই বিশেষ উন্নত প্রণালীর। ইহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু কয়েকটী নিয়ম উভয়েরই একরূপ। স্বাস্থ্যবীমা পদ্ধতি অনুসারে ডাক্তার যে বীমাকারী রোগীর চিকিৎসা করেন, তাহা যতদূর সম্ভব তাঁহার প্রাইভেট প্র্যাকৃটিসেরই মত হওয়া উচিত অর্থাৎ রোগী নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা থাকিবে। ইহাই স্বাস্থ্যবীমা পদ্ধতির প্রথম এবং প্রধান নীতি।

দ্বিতীয়তঃ মেডিক্যাল কাউন্সিল যেরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে থাকেন, সেরূপ এই ক্ষেত্রে ডাক্তারের যোগ্য আচরণের জন্য দায়ী থাকিবেন। ফ্রান্সে কোন বীমাকারী ব্যক্তি রোগের সময় যে কোন ডাক্তারের নিকট যাইয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন এবং যে কোন ফি দিতে পারেন। পরে ইন্সুর্যান্স কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট দর অনুযায়ী ডাক্তারকে টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা বীমাকারীকে ফিরাইয়া দিবেন। সেইরূপ বীমাকারী ইচ্ছামত যে কোন ঔষধের দোকান হইতে ঔষধ কিনিতে পারেন, পরে শতকরা ১৫ টাকা বাদে সেই খরচা ফেরৎ পাইবেন। রোগী দেখিবার সময় অনেক সময় ডাক্তার জানিতেও পারে না, কোন রোগীর স্বাস্থ্য বীমা করা হইয়াছে, কোন্ রোগীর স্বাস্থ্য বীমা করা হয় নাই। ডাক্তারের স্বাক্ষর লইবার জন্য একখানি কার্ড্ উপস্থিত করিলে, তবে তিনি জানিতে পারেন যে রোগীটীর স্বাস্থ্য বীমা করা আছে।

ইংল্যাণ্ডে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য কয়েকজন ডাক্তারকে লইয়া একটী সংঘ (Pannel) গঠিত হয়। প্রত্যেক ডাক্তার সেই সংঘে যোগ দিতে পারেন। এক একজন ডাক্তারের হাতে ২৫০০ জন রোগীর বেশী দেওয়া হয় না। স্বাস্থ্যবীমাকারী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত যে কোন ডাক্তারের তালিকাভুক্ত হইতে পারেন। এক ডাক্তারের হাত হইতে অন্য ডাক্তারের চিকিৎসায় যাইতেও বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাট নাই। ডাক্তারগণ তাঁহাদের সাধারণ রোগীকে যে ভাবে দেখেন, স্বাস্থ্যবীমাকারী রোগীদিগকেও সেইভাবে দেখিয়া থাকেন। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য ডাক্তারগণের প্যানেল কমিটি (Pannel Committee) ব্যতীত একটি ইন্সুর্যান্স থাকে। স্বাস্থ্য বীমাকারীদের প্রতিনিধি এবং প্যানেল ভুক্ত ডাক্তারদের প্রতিনিধিগণ সেই ইন্সুরেন্স কমিটির সদস্য হন। ইহা ছাড়া কাউন্টি কাউন্সিল অথবা বুরো (Borough) কয়েকজন সদস্য মনোনীত করেন। বীমাকারীগণ রীতিমত ডাক্তারের সাহায্য পায়

কিনা, ডাক্তারগণ তাঁহাদের পারিশ্রমিক পান কিনা, এবং স্বাস্থ্যবীমার কার্য্য মোটের উপর কি ভাবে চলিতেছে, ইত্যাদি বিষয়ের তত্বাবধান করা ইন্‌সুর‍্যান্স কমিটির প্রধান কর্ত্তব্য। ডাক্তারগণ কোন বিষয়ের প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর নিকট আপীল করিতে পারেন। কতিপয় ব্যবসায়ী ডাক্তারের দ্বারা গঠিত এক কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী কার্য্য করিয়া থাকেন। সর্ব্বোপরি ব্রিটীশ মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েসনের সামিল ইন্‌সুর‍্যান্স কমিটি রহিয়াছে। সুতরাং ডাক্তারদের স্বার্থ ও অধিকার সর্ব্বপ্রকারে সুরক্ষিত এবং তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের সমব্যবসায়ী চিকিৎসকগণই তাঁহাদের কার্য্যের বিচার করিবেন। বীমাকারীদের স্বার্থও নানাদিকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। ডাক্তারগণ যাহাতে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান বাবদে অতিরিক্ত চার্জ্জ না করেন, তাহা নিয়ন্ত্রীত করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার জন্য একটী স্পেশ্যাল কমিটী থাকে। প্যানেলভুক্ত ডাক্তারগণ বিনা পারিশ্রমিকে বীমাকারীর কোন বিশেষ রোগের চিকিৎসা করেন না। নারীদের সন্তান প্রসবকালীন এইসব ডাক্তারদের ডাকা হয় না। বীমাকারীদের দন্তসম্বন্ধীয় পীড়াতেও এইসব ডাক্তারকে ডাকা নিষেধ। কেবল মাত্র সাধারণ রোগ চিকিৎসার্থে তাঁহাদিগকে ডাকা হয়।

ডাক্তারগণ যে সকল রোগীর চিকিৎসা করেন তাহার একটা হিসাব ও তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদিগকে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিও রাখিতে হয়। কোন কোন স্থলে ডাক্তারগণ মাইল হিসাবে ভাতা পান। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ডাক্তারগণ নিজে ঔষধ ও যন্ত্রপাতি রাখেন এবং প্রয়োজনমত অন্যত্র সরবরাহ করেন। ইহার জন্য তাঁহারা একটা ভাতা পান। এই সকল ঔষধ এবং যন্ত্রপাতির তালিকা গবর্ণমেণ্ট তৈয়ারী করিয়া দেন এবং যে সকল কেমিষ্ট দোকানদার ঐ সকল জিনিস বিক্রয় করেন, তাঁহারা তালিকা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের বেশী লইতে পারেন না। একটী কেমিষ্ট কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধাদির মূল্য নির্দ্দিষ্ট এবং উহাদের বিশুদ্ধতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ডাক্তারের অনুপস্থিতিকালে রোগীর চিকিৎসা কিরূপ চলিবে, সেই ব্যবস্থা ডাক্তারকেই করিতে হইবে।

জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা পদ্ধতি দুই প্রকারের,
—(১) বাধ্যতামূলক
(২) স্বেচ্ছাকৃত।

যে সকল শিল্পি ও মজুরেরা বিপদজনক কাজ কারবারে নিযুক্ত থাকে তাহাদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা বাধ্যতামূলক। রোগ ব্যাধির সময় ইহারা টাকা খরচ করিয়া ডাক্তার ডাকিতে পারে না; উপরন্তু ইহাদের উপার্জ্জনও তখন বন্ধ হইয়া যায়। সেই জন্য ইহাদের স্বাস্থ্যবীমা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। যাহাদের উপার্জ্জন বার্ষিক (২৫০ টাকার) কম, তাহাদের জন্যই স্বাস্থ্য বীমা পদ্ধতির ব্যবস্থা। কোন কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষে স্বাস্থ্য বীমা স্বেচ্ছাকৃত রাখা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, মোট স্বাস্থ্য বীমা কারীদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত বীমাকারীর সংখ্যা খুব অল্প। সেইজন্য সকল দেশেই স্বাস্থ্যবীমা বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবীমা পদ্ধতিতে বীমাকারী মজুরেরা প্রতি সপ্তাহে তাহাদের বেতন হইতে প্রিমিয়াম স্বরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা

দেয়। তাহাদের মনিবকেও ঐ সমপরিমাণ চাঁদা দিতে হয়। এইরূপ সংগৃহীত টাকা একটী কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা থাকে। বীমাকারীরা তাহাদের প্রদত্ত চাঁদার রসিদ স্বরূপ এক এক খানি টিকিট পায়। তাহার নাম ন্যাশন্যাল হেল্‌থ ইন্‌সুর‍্যান্স ষ্ট্যাম্প। প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্ত ঐ টিকিট তাহারা একখানি পুস্তিকায় বা কার্ডে লাগাইয়া রাখে। কেন্দ্রীয় তহবিলে সংগৃহীত টাকা গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন জেলার প্রয়োজন অনুসারে বাঁটরা করিয়া দেন। মোট তহবিলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ শতকরা ২০ টাকা) গবর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট হইতে জোগান হয়। এই কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা হইতে ডাক্তারেরা তাঁহাদের ফিস্ পাইয়া থাকেন। প্রত্যেক ডাক্তারের তালিকায় যত বীমাকারীর নাম থাকে, সেই সংখ্যা গণনা করিয়া মাথা-পিছু একটা নির্দ্দিষ্ট হারে তিনি ফিস্ পাইবেন,—বীমাকারী সুস্থই থাকুক কিম্বা অসুস্থই থাকুক, বীমাকারী যতবার পীড়িত হউক না কেন, ডাক্তার তাহাকে বিনা পারিশ্রমিকে দেখিবেন এবং তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রথমতঃ প্রাদেশিকভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে। বাংলা দেশের কথা ধরা যাউক। প্রধানতঃ কোন শ্রেণীর লোক ইহা দ্বারা অধিকতর উপকৃত হইবে ? কারখানার মজুর, কুলী, মুটে প্রভৃতি লোক যাহারা দৈনিক রোজগার করে, ছুতোর মিস্ত্রী, রাজ মিস্ত্রী, কামার কুমোর প্রভৃতি কারিকর, ট্রাম, বাস্, ট্যাক্সি, লরী, গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের চালক, গবর্ণমেণ্ট ও প্রাইভেট্ আফিসের কেরাণী, মিউনিসিপালিটীর ঝাড়ুদার, মেথর ধাঙ্গড় প্রভৃতি, বাসার ঝি-চাকর দাই আয়া নার্স এই সকল চাকুরীজীবিদের মাসিক বেতন ১০০ টাকার উপরে নহে। রোগ ব্যাধির সময় ইহারা অর্থাভাব হেতু ডাক্তার ডাকিতে পারে না। জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রবর্ত্তিত হইলে ইহারাই অধিকতর উপকৃত হইবে। এই বীমা পদ্ধতি যতদূর সম্ভব বাধ্যতামূলক করা কর্ত্তব্য। বীমাকারীদের চাঁদার হার ঠিক করিতে হইলে অনেক প্রশ্ন উঠে,—সকলের চাঁদা সমান হইবে না ; চাকুরী ও বেতনের পার্থক্য অনুসারে প্রিমিয়াম বা চাঁদার হারও বিভিন্ন রকমের হইবে ? স্ত্রীলোকদের প্রিমিয়ামের হার পুরুষদের অপেক্ষা কম হইবে কিনা। বীমাকারীর ওয়ারিশানগণকে ইহার ফলভাগী করা যায় কিনা, এবং তাহা হইলে প্রিমিয়ামের হার কিরূপ হইবে ?

ডাক্তারদের ফিস্ কত হওয়া উচিত ? কেহ কেহ মত দিয়াছেন যে, ডাক্তারদের মাসিক ফিস্ ১৫০ টাকা করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, মাসিক ১৫০ টাকায় খুব ভাল ডাক্তার পাওয়া যাইবে না। তবে প্রথম আরম্ভে মাসিক ১৫০ টাকা ফিস্ নির্দ্ধারিত করা মন্দ নহে। প্রত্যেক বীমাকারী যদি মাসিক এক আনা করিয়া চাঁদা দেয় তবে ২৪০০ জনের নিকট হইতে ১৫০ টাকা আদায় হয়। দুই আনা করিয়া চাঁদা আদায় হইলে প্রত্যেক ডাক্তার তাঁহার তালিকায় ১২০০ জন বীমাকারীকে রাখিতে পারেন। একজন ডাক্তারের পক্ষে ১২০০ জনের দেখা যদি অসম্ভব হয়, তবে ১২০০ জনের স্থলে ৮০০ জন করা যাইতে পারে। কারণ সমপরিমাণ চাঁদা কারবারের মালিকদের

নিকট হইতে পাওয়া যাইবে এবং গবর্ণমেণ্ট গ্রাণ্টের টাকাও কিছু আসিবে। সাধারণ কেরাণীও মজুরদের পক্ষে মাসে দুই আনা চাঁদা দেওয়া কষ্টকর নহে। কারবারের মালিকগণ এবং আফিসের মনিবেরা তাঁহাদের কর্ম্মচারীর বেতন হইতে প্রতি মাসে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজেদের চাঁদা সহ গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় তহবিলে পাঠাইবেন। এই প্রণালীতে জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা পদ্ধতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবর্ত্তিত করা যায়।

যাঁহারা শ্রমিক দরদী এবং শ্রমিকদিগের নানারূপ সুখ সুবিধার জন্য আন্দোলন করিতেছেন আমরা সেই সকল শ্রমিকদের এবং কাউন্সিলরদিগকে এবিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি এবং শীঘ্রই এ সম্বন্ধে আইন সভায় বিল আনিতে পরামর্শ দিতেছি।

বন্যা-বীমা

মান্যবর

শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

আপনি আপনার পত্রিকায় Life, Fire, Marine, Motor car এবং Accident বীমা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশে এবং সুদূর প্রাচ্যে অন্যান্য নানাবিষয়ে যে সকল বীমা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে যেগুলি আমাদের দেশে প্রচলনের উপযোগী সেগুলি প্রচলিত করিবার জন্য অনেকবার পাঠকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ আমি Flood Insurance বা বন্যা-বীমা সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাঠাইলাম; আশা করি ইহা পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদক
শ্রীসমরেশ চক্রবর্ত্তী
নয়াদিল্লী

8/A Ratendone Road,
New Delhi.

নানাবিধ দৈব দুর্ঘনার দরুণ মানুষের যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি পূরণের জন্যই বীমা প্রথার উদ্ভব। ইহাদের মধ্যে মৃত্যুই প্রধান। সেই-জন্য জীবন বীমার কারবার জনসমাজে অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। তারপর বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা দোকান গুদাম প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্র-গামী বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি প্রভৃতি ঘটনার জন্যও বীমা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। যাহারা রেলে, জাহাজে, খনিতে বিমানপোতে, অথবা বিপজ্জনক কলকারখানাতে কার্য্য করে, তাহাদের সুস্থ অবস্থাতেও হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে। এই সকল লোকের জন্য য়্যাক্সিডেণ্ট্ (accident) বা দৈব দুর্ঘটনা বীমার প্রচলন হইয়াছে।

বাংলাদেশ প্রতি বৎসর প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত হয়। বহুলোক তাহাতে প্রাণ হারায়, সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন হইয়া পথে বসে এবং অন্ন বস্ত্রাভাবে নিদারুণ দুর্দ্দশায় উপনীত হয়।

ইহার প্রতিকারের জন্য প্রতি বৎসর বাংলা দেশের নানাস্থানে বন্যা সাহায্য সমিতি গড়িয়া উঠে। ঐ সকল সমিতি চাঁদা তুলিয়া বিপন্ন লোকদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করিয়া থাকেন। ইহা "ভিক্ষা-করা" ব্যতীত আর কিছুই নহে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মধ্য ইউরোপে এই প্রণালীতে অগ্নি বিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকদিগকে সাহায্য করা হইত। উহার চলতি নাম ছিল "Fire beggary." আমাদের দেশেও সেইরূপ "বন্যা-ভিক্ষা" প্রচলিত হইয়াছে। ইউরোপের সেই Fire Beggary প্রথা পরবর্ত্তী যুগে নিন্দনীয় হইয়াছিল এবং এখন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও এই "বন্যা-ভিক্ষা" প্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য।

এই বিপুল ক্ষতিপূরণের জন্য বন্যা-বীমা প্রথা প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট বন্যা নিবারণের জন্য চেষ্টিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বাংলার নদ-নদী সমস্যা সমাধানের জন্য যে বৃহৎ পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহাতে বন্যা নিবারণ সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই হইবে না। সুতরাং অবশিষ্ট যে সকল লোকের দুর্দ্দশা থাকিয়া যাইবে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বীমার দ্বারা হওয়া আবশ্যক।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইউরোপের প্রায় সকল স্বাধীন জাতির মধ্যেই বন্যাবীমা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়াতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে বন্যাবীমা প্রথার আরম্ভ হয়। ১৮৬৬ সালে ফরাসীদেশে বন্যাবীমা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত সেখানকার ১৭ বৎসরব্যাপী বন্যা বীমার ইতিহাস নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। নরওয়ে, বুলগেরিয়া, সোভিয়েট রুশিয়া, প্রভৃতি দেশে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বাধ্যতামূলক বন্যাবীমা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবিষয়ে সুইজারল্যাণ্ডের বিশেষজ্ঞ মিঃ কার্ট-রমেলের পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

আশাকরি বাংলাগবর্ণমেণ্ট বন্যাবীমা বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া জন সাধারণের হিতার্থ উহা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রবর্ত্তিত করিলে দেশের দরিদ্র গৃহস্থদের মহদুপকার সাধিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক সম্পত্তি অধিকতর সাম্যভাব প্রাপ্ত হইবে এবং বাংলার লোন কোম্পানী সমূহ দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে

—:—

যুদ্ধে ক্ষতির বীমা :—

স্যার জন সাইমন হাউস অব কমন্স সভাতে এক বক্তৃতায় যুদ্ধে ক্ষতির বীমা সম্বন্ধে বগর্ণ-মেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রধান কথা এই যে, যুদ্ধের সময় যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা ছাড়া যুদ্ধের ক্ষতি সমগ্র জনসাধারণের উপরেও কার্য্যকরী হয়, এইরূপ মনে করিতে হইবে। সুতরাং জন-সাধারণ যুদ্ধে ক্ষতির বীমার সুফল পাইবার অধিকারী। যুদ্ধের সময় আকাশ হইতে বোমা ফেলিবার দরুণ যাহারা নিহত কিম্বা আহত হয়, অথবা যাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট হয়, কিম্বা জাহাজ ডুবি ও গুদামজাত মাল নষ্ট হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বীমার সাহায্যে করা হইবে।

—:—

বীমা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর উক্তি ঃ—

করাচী সহরে লক্ষ্মী ইন্সুর্যান্স কোম্পানীর নবনির্ম্মিত বৃহৎ সপ্ত-তল প্রাসাদোপম অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন "মানবের সেবাই বীমা কোম্পানীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ পরিবারকে দুশ্চিন্তার দংশন হইতে রক্ষা করিবে,—এই বীমা কোম্পানী সমূহ। যে সকল বীমা কোম্পানী কেবলমাত্র নিজেদের লাভ ক্ষতি লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই। অনেকের মনে স্বদেশীয়তা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আছে। তাঁহারা মনে করেন দেশী জিনিস কিনিয়া ব্যবহার করিলেই স্বদেশীয়তা হইল। কিন্তু তাহা নহে। দেশীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা না করিলে পূর্ণ এবং প্রকৃত স্বদেশীয়তা হয় না। দেশীয় বীমাকোম্পানীতে করাই যথার্থ স্বদেশ ভক্তির পরিচয়। এখনও শতকরা ৪০ জন ভারতীয় লোকের বিশ্বাস, বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করা অধিকতর নিরাপদ ও লাভজনক। কারণ তাহারা খুব মোটা বোনাস্ প্রদান করে। এই মিথ্যা মোহ অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

মামলা মোকদ্দমা

কয়েকটী ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীকে প্রতারণা করিয়া অগ্নিবীমার টাকা আদায় করিবার অভিযোগে নুরুল আমীন, গুনুমিয়া, প্রমুখ ১১ জন লোক চট্টগ্রামের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেসন জজ্ মিঃ ইউ, সি, মজুমদারের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা গত ১৯৩৫ সাল হইতে এইরূপ প্রতারণার কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তাহাদের কাঠগুদাম এবং দোকান অগ্নিবীমা করাছিল। নিজেরাই তাহাতে আগুন লাগাইয়া বীমা কোম্পানীর নিকট টাকা আদায় করে। ১৯৩৫ সালে নুরুল আমীন নামক আসামী এইরূপে নিউজিল্যাণ্ড ইন্‌স্যুর‍্যান্স কোম্পানীর নিকট হইতে ৫৮৯ টাকা আদায় করে। ১৯৩৬ সালে সে লয়েড্‌স্ কোম্পানীর নিকট হইতে ঐরূপ প্রতারণা করিয়া ৯৫০০ টাকা আদায় করে। ১৯৩৮ সালে পুনরায় আসাদগঞ্জ নামক স্থানে নিজেদের দোকানে আগুন লাগাইয়া সে লয়েড্‌স্ কোম্পানীর নিকট টাকা দাবী করে। কিন্তু এবারে তাহার প্রতারণা ধরা পড়িয়া যায়। আসামীরা সকলে সেসন আদালতে অভিযুক্ত হয়। স্পেশ্যাল জুরী এবং এসেসারের মতানুসারে বিচারক প্রধান আসামী নুরুল আমিনকে প্রথমতঃ আগুন লাগাইবার অপরাধে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। দ্বিতীয়তঃ ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে তাহার দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ৫ মাস জেলের আদেশ হয়। এই দুই অপরাধে গুনুমিয়ার যথাক্রমে ৬ বৎসর ও দেড় বৎসর এবং কবীর আহাম্মদের যথাক্রমে ৩ বৎসর ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। নুরজোয়া নামক অন্য একজন আসামীর দুই বৎসর জেল হয়। রাজসাক্ষী ফারোক আহাম্মদ এবং অন্যান্য আসামীগণ খালাস পায়। দীর্ঘকাল যাবৎ এই মামলার বিচার চলিয়াছিল। চট্টগ্রামে জনসাধারণের মধ্যে ইহাতে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নুরুল আমিন, গুনুমিয়া এবং কবীদ আহাম্মদ হাইকোর্টে আপীল করে। মিঃ জষ্টিস বার্টলী এবং মিঃ জষ্টিস রাউ মহোদয়ের এজলাসে আপীলের শুনানী হয়। তাঁহাদের বিচারে আসামীদের দণ্ডাদেশ বহাল থাকে এবং আপীল ডিসমিস হয়। বিচারপতিদ্বয় রায়ে মন্তব্য করেন "রাজসাক্ষী ফারোক আহম্মদ যে স্বীকারোক্তি করে, তাহাতে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা প্রকাশ পায়। তাহার কথা অন্যান্য প্রমাণের দ্বারাও সমর্থিত

হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় আসামী হুকল আমিনের দোকানগুলিতে যে ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পর পর আগুন লাগিয়াছিল, তাহা দৈব ঘটনা নহে, স্বেচ্ছাকৃত ও ষড়যন্ত্রমূলক। আগুন লাগিবার পূর্ব্বে, অগ্নি কাণ্ডের সময় এবং তাহার পরে আসামীদের আচরণ হইতেই তাহাদের দোষের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার জন্য রাজ-সাক্ষীর উক্তির আবশ্যকতা নাই।"

—:০:—

কলিকাতার আবদুল্লা আয়ুব য়্যাণ্ড কোম্পানী জাপান হইতে কাপড় আমদানী করে। তাহারা ঐ কাপড়ের উপর ইংল্যাণ্ডের ক্যালিকো প্রিন্টার্স য়্যাসোসিয়েসানের একটী চিত্র ছাপ লাগাইয়া বাজারে বিক্রয় করিত। এই অভিযোগে উক্ত ক্যালিকো প্রিন্টার্স য়্যাসোসিয়েসানের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এই দরখাস্ত করা হয় যে, মামলার শেষ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আবদুল্লা আয়ুব য়্যাণ্ড কোম্পানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক, তাহারা যেন সেই চিত্রছাপ আর ব্যবহার না করে। কারণ উহা দরখাস্তকারী কোম্পানীর পেটেণ্ট করা নিজস্ব সম্পত্তি। সুতরাং তাহাদের কপিরাইট স্বত্ব নষ্ট করা হইয়াছে। বিচারপতি মিঃ জষ্টিস ম্যাক্‌নায়ার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া অভিযুক্ত কোম্পানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন।

মুরগী পালন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাল ডিম জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ফেলিলে ডুবিয়া যায় কিন্তু নষ্ট ডিম, জলের উপর ভাসিয়া উঠে। পুরাতন ডিমের ভিতরে বায়ু-বুদ্‌বুদ্‌ কিছু বড় এবং অল্পদিনের ডিমে ঐ বুদ্‌বুদ্‌ ছোট দেখায়।

ডিমে তা দিলে ছানা হইবে কি না তাহা পরীক্ষার্থ, একখানা পাতলা তক্তা বা galvanized মোটা চাদরের মধ্যে গোলাকার একটী ছিদ্র করিয়া সেই তক্তা খাড়া ভাবে রাখিয়া তাহার এক পার্শ্বে একটী প্রদীপ রাখিবে, এবং ঐ ছিদ্র মধ্যে ডিম রাখিয়া অপর পার্শ্ব হইতে দেখিলে যদি ডিমের ভিতর ভাগ ঘোলা দেখায় তবে ছানা হইবে না; আর যদি, সাদা অংশ ও কুসুম এই দুইটীর মধ্যে কাল দেখা যায় তাহা হইলে তাহা হইতে ছানা হইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে।

বর্ষাকালে অধিক ডিম পাওয়া যায় এবং তাহার অধিকাংশ হইতেই ছানা জন্মে। বাচ্চা করিবার জন্য ভাল জাতের মুরগীর ডিম খরিদ করিতে পাওয়া যায়।

ডিম সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রণালী

(ক) মাখন মাখাইয়া রাখিলে ডিম অনেক দিন তাজা রাখা যায়।

(খ) $\frac{1}{10}$ ভাগ চুণ ও $\frac{1}{10}$ ভাগ লবণ জলে মিশাইয়া তাহা একটি মেটে পাতিলে জাল দিয়া ফুটাইবে; তৎপরে ঐ জল শীতল হইলে উপরের জল পৃথক করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে ডিমগুলি তিনচারি অঙ্গুলী জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে।

(গ) তরলকাচ (water glass—জলবৎ কাচ) বা সিলিকেট্ অব সোডা (Silicate of Soda) তাহার ২০ গুণ জলমধ্যে মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার টাটকা ডিম রাখিলে সেই ডিম দীর্ঘকাল ভাল থাকে। কিন্তু ডিম তরল কাচের জলীয় দ্রবন মধ্যে রাখিবার পূর্ব্বে, ২০।২৫টী ডিম একটী চালুনীর উপর রাখিয়া তাহার উপর উষ্ণ তরল চর্ব্বি ঢালিয়া দিবে; তৎপর চালুনী হইতে ডিমগুলি বাহির করিলে, ডিমের গায় চর্ব্বির প্রলেপ শীতল হইয়া কঠিন হইবার পর, পূর্ব্বোক্তরূপ ডিমগুলি তরলকাচের জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে।

(ঘ) ২০ ভাগ হীরাকস ও ১½ ভাগ ট্যানিন্ (tanin), জলে গুলিয়া তাহার মধ্যে ডিমগুলি ৫।৬ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিয়া উঠাইয়া লইবে। তৎপর পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া দিবে।

বাচ্চা করিবার জন্য ডিম

(ক) তা দিবার জন্য টাটকা ডিম ব্যবহার করা অপরিহার্য্য; তবে, তদুদ্দেশ্যে ৫।৬ দিবস যাবৎ ডিম সংগ্রহ করা যায়। ভালজাতের মোরগ ও মুরগীর, বিশেষতঃ ভাল মোরগের সংযোগে উৎপন্ন, ডিম আবশ্যক এবং ঐ মোরগ

ও মুরগী এক বংশের হওয়াও ভাল নয়। এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাহাদিগকে জননকার্য্যে নিযুক্ত করিবে না এবং তিন বৎসরের অধিক বয়সের হইলেও তাহারা জননকার্য্যের অনুপযোগী হয়। দুই হইতে তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মুরগীর ডিম, ছানা জন্মান জন্য ব্যবহার করিবে। যে মোরগকে পূর্ব্বে কখনও জননকার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই সেই প্রকার মোরগই এই কার্য্যে প্রশস্ত। একটী মোরগকে পাঁচটীর অধিক মুরগীর সঙ্গে থাকিতে দিবে না। যে মুরগীর বক্ষস্থল প্রশস্ত, পেট মোটা, চর্ব্বিশূন্য ও অধিক ডিম দেয়, ছানা উৎপাদন জন্য সেই রূপ মুরগীই ভাল।

(খ) ডিম ফুটানের বাসার জন্য, প্রশস্ত তলা বিশিষ্ট গামলা ভাল। মুরগী যে ঘরে থাকিয়া ডিমে তা দেয় তাহা শীতল ও তাহার বায়ু আর্দ্র হইলে ডিম শীঘ্র ফুটে কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টি লাগা ভাল নয়। ঐ গামলার মধ্যে মুরগী ১০ হইতে ১২টা এবং হংসী ৬ হইতে ৮টা ডিমে তা দিতে পারে। হংস-ডিম্বও মুরগীর ডিমের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে মুরগী তাহার উপরও বসে; এমন কি সমান আকারের একখণ্ড চক রাখিয়া দিলেও মুরগী তাহার উপর ডিম্ব ভ্রমে বসে।

(গ) ডিমে তা দেওয়া সময়ে মুরগীকে কঠিন খাদ্য দিবে। আস্ত ভুট্টা তদুদ্দেশ্যে ভাল। তাহার নিকট আবশ্যকীয় খাদ্য, পানীয় জল, ও একটী বালুকা স্তূপ কি, ছাই স্তূপ রাখিবে। মুরগী ঐ ছাই কি বালিতে স্নান করিবে। ৪।৫ দিন অন্তর মুরগীর গাত্রে একবার করিয়া হলুদ কি গন্ধক চূর্ণ দিলে গাত্রে পোকা হইবে না।

(ঘ) মধ্যম আকারের টাটকা ডিম, হাত স্পর্শ না করিয়া, বসাইবে। প্রথমবারের ডিমে মাদী এবং তাহার পরে যে ডিম হয় তাহা হইতে নর-ছানা হয়।

তিন সপ্তাহ তা দেওয়ার পর, ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।

প্রবাদ সংগ্রহ

জগতের সব দেশের সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে সুরু করিয়া ছেলে মেয়ে সকলের মুখেই প্রবাদের ছড়া শোনা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল দেশের সাহিত্য জীবন্ত, তাহারা এই সকল প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় ভল্যুম্ বাহির করিয়াছে। ইংরাজীতে "Proverbs and Quotations" নামক পুস্তকখানি ইংরাজী সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয়।

কারণ এই সকল প্রবাদ বচনের মধ্যে শতাব্দী-সঞ্চিত জ্ঞানের আকর (accumulated wisdom of centuries) লুক্কায়িত আছে। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লোককে যাহা বুঝানো যায়না, তাহা দুই একটা লাইনের প্রবাদ আওড়াইয়া শুধু যে সহজে বুঝানো যায় তাহা নহে, পরন্তু একেবারে মনের মধ্যে দাগ পাড়িয়া দেওয়া যায়। এই সকল প্রবাদ বাক্যকে জ্ঞানের Concentrated Tablet বলা যায়। আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে "প্রবাদ সংগ্রহ" অথবা ঐরূপ দুই একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা আর বাজারে পাওয়া যায় না। অথচ এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহাদের যে প্রবাদবাক্য বা ছড়া জানা আছে, তাহা যেন সংবাদ পত্রে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আর কেহ না ছাপুন, আমরা অতি আগ্রহের সহিত এই সকল প্রবাদ, প্রবচন, ও ছড়া প্রকাশ করিব এবং পরে এই সকল সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সংগ্রহকারীদিগকে এক একখানি বিনামূল্যে প্রদান করিব।

—সম্পাদক

গলা নেই, গান গায় মনের আনন্দে,
মাগ্ নেই শ্বশুড়বাড়ী যায় আগের সম্বন্ধে।

*

আশ্ পায়ে আশ্লা
গোদা পায়ে তস্লা।

*

যার যাহা রীত
যে ছাড়ে কদাচিৎ।

*

আপন হাতে পড়লে হাঁড়ি
ভাত রেখে আমানি বাড়ি।

*

ছুঁচোর গু পর্ব্বতে উঠে।

*

বুড়ো বয়সে বিয়ে করে পরের তরে
নাইবার সময় তেল মাখে জলের তরে।

*

আহা মরি দিদি, খাঁদায় কথা কয় না
অহঙ্কারে মট্মট্ গায়ে পিতলের গয়না।

*

বেশ্ গায়ে মারি ঠেস্
যেন রস্করা সন্দেশ।

*

আনাড়িতে ধরলে নাড়ি
রোগের করে বাড়াবাড়ি।

*

কানাপুতের নানা রোগ।

*

মাড়োয়ারীর ঘি,—
না হোমে, না যজ্ঞে।

*

ভাইয়ের মত বন্ধু নেই
যদি না থাকে বেঁচে।

*

চটকস্য মাংসং।

*

লাখ কথার এক কথা
ছোট মুখে বড় কথা।

*

কাঠবিড়ালিতে সাগর বাঁধে।

*

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

*

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া।

*

সে গুড়ে বালি।

*

পাত্‌লে ফাঁদ পরের তরে
নিজের পা সেই ফাঁদে পড়ে।

*

অকালে কি না খায়
কোঁদলে কি না বলে।

*

ভাবুনী লো ভাবুনী,
তোর ঘর যে পুড়ে যায়।
যাকগে আমার ঘর পুড়ে
আমার ভাবনা ব'য়ে যায়।

*

ছেঁড়া ফুলে খোঁপা বাঁধা।

*

পর লাগে না পরে
অম্বল লাগে না জ্বরে।

*

কুঁচুলে কড়াই শুঁটী----
কুল নেই কো দড়ির খুঁটি।

*

সব করেছে অসি
বাকী আছে খালি ভীম একাদশী।

*

যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা
টক্ ঘোল তার ছেঁদা মালা।

*

বেঙের ভরসায় কি পুকুর কাটিয়াছি ?

*

ঘর পোড়ে ফিঙ্গে ধোঁয়া খায়।

*

বেলমোক্তা ফুরান॥

*

মাগ্‌নার মদ বামুনে পেলে খায়॥

*

যাকে স্বামীতে করে হেলা----
তাকে রাখালে মারে ঢেলা।

*

মর্‌বে জীব আপন দোষে----
কি কর্‌বে তার হরিহর দাসে।

*

মোগল, পাঠান হদ্দ হোল
ফার্সি পড়ে তাঁতি॥

*

যার মনে যা----
ফাল দিয়ে ওঠে তা—

*

নেকা নেকা কথা কয়
বার টাকা দিয়ে তের টাকা লয় ॥

*

গ্রাম নষ্ট কানায়
পুকুর নষ্ট পানায় ॥

*

মাঝি বেটা বড় বেটা
বসে মাহিনা খায়
হাল না ফিরাতে পাল্লেই
নৌকা এদিক ওদিক যায় ॥

*

উঠবি ত হাল্ ধর
বস্‌বি ত ছেলে ধর।

*

যেমন তেমন ঝি বিয়োবো
যৌবন কালে রূপ দেখাব ॥

*

না জেনে খেয়েছ কচু
এখন তেঁতুল কোথা পাব ॥

*

অরগুণ নেই বর্‌গুণ আছে
ধান্ ভানা নেই কুলোখানা আছে ॥

*

সইলেই সম্পত্তি
না সইলেই বিপত্তি।

*

দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকা

*

মনের অগোচর পাপ নেই।

*

চোর দায়ে ধরা পড়া।

*

সাত ঘাটের জল খাওয়া।

*

তুলে ধর্‌তে গলে পড়ে।

*

মাথা ভেঙ্গে তাল পড়া।

*

মনকে চোক ঠারা।

*

গুরুর চেয়ে শিষ্য দড়।

*

পোঁদে গু ভট্ ভট্ করে
আলো চালের হবিষ্যি করে।

*

বেওয়ারিশ মাল্
দরিয়া মে ডাল ॥

*

হক্ কথাতে কারে ডরাই।

*

সাবধানের মার নেই ॥

*

পেট বৈরাগী গেরুয়া পরে ॥
মোচ্ছবের ধারে ধারে ঘোরে ॥

*

রোগা যেন বেরষ কাঠ।

*

গতর আর বয় না।

*

শুধু হাত মুখে উঠে না।

*

পুরানো কাসুন্দি তোলা কেন ?

*

খেনো চায় ধান
পেনো চায় পান।
বাঁদির বাচ্ছা কয় কথা
তায় দিবি না কান ॥

*

সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে
সীতা কার ভার্য্যা।

*

ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশ্‌বে।

*

অকালে সকাল
গিন্নির পাতে ক্ষীরের তাল।

*

হয় নষ্ট দুধ
না হয় বেরালের এঁটো।

*

শশাবেচিনী বেচত শশা
তার হয়েছে সুখের দশা।

*

পায়ে দুগাছা মল
ওটা কি গাছের ফল ?

*

তুলা দিয়ে সওয়াবে
লোহা দিয়ে বওয়াবে।

*

ভাবের ভাবী ভাঁড়ারের চাবি
দেখালে নারি রইতে পারি।

*

ঘোরালে লাঠি
ফেরালে কোঁৎকা।

*

লেজে কাটলেও কাটে
মাথায় কাটলেও কাটে।

*

আয় ষাঁড় গুঁতিয়ে যা।

*

এখন মরে লক্ষ্মণ
ঔষধ দিবে কখন ॥

*

যে খাওয়ালে ক্ষুদের জাউ
তাকে নিয়ে হাগ্‌তে যাও।

*

সেকালে করেছে বিয়ে
একালে এসেছে নিতে
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে
লাজ লাগছে যেতে ॥

*

কালে কালে কত হো'ল
পুলি পিঠের ল্যাজ বেরুল ॥

*

গোদা পায়ে নমস্কার
বচনেই পুরস্কার।

*

খাবনা খাবনা অনিচ্ছে
তিন কাঠা চাল একটা উচ্ছে ॥

*

এইতেই পেট ফাটে
দুধ হ'লে আরও কিছু আঁটে ॥

*

কাজ কি আমার বামুন নামে
যা সুতা কাটি সব পৈতায় লাগে ॥

*

নূতন নূতন ন'তলা
পুরান হ'লে ছ'তলা ॥

*

আপনি রাঁধে আপনি খায়
আপনার রান্নাই বলিহারি যায় ॥

*

সাপ হোয়ে কামড়ায়
রোজা হো'য়ে ঝাড়ে ॥

*

যার নদী কুলে বাস
তার ভাবনা বারমাস।
নয়ত ভাল নয়ত মন্দ
নয়ত সর্ব্বনাশ ॥

*

বিয়োতে আছে মাস পাঁচ ছয়
কাপড় তুলেছে হাত পাঁচ ছয় ॥

*

ছুট্ বল্‌তে চললো ॥
বল্‌তে সবুর সয় না ॥

*

কচি কলার পাত---
এক মাগকে ভাত দিতে পারে না---
আরও মাগের সাধ ॥

*

খ্যাঁদা মেয়ের নাম পদ্মলোচন ॥

*

কথায় কথা বাড়ে
ভোজনে পেট বাড়ে ॥

*

আমার কপাল হোলো একপেশে---
যার বাড়ী যাই, সেই বলে ফ্যান্ খেসে ॥

*

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না ॥

*

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ ॥

*

যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না ॥

*

শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস
(রায়বাহাদুর)

চায়ের খবর

চা-শিল্প বনাম শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগের রাস্তা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক শিক্ষিত বেকারদের সুবিধার জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ উক্ত বক্তৃতা প্রদান করে থাকেন। এইরূপ বক্তৃতার দ্বারা যুবকদের জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবার সম্ভাবনা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্প্লয়মেণ্ট বুরো এইরূপ লেকচারের ব্যবস্থা ক'রেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আশুতোষ হলে জলপাইগুড়ির দেবেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ভারতবর্ষের চা-শিল্প সম্পর্কে এক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ঘোষ চা-শিল্প ও চায়ের ব্যবসা সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, এ বিষয়ে তাঁর হাতেকলমে জ্ঞান ও শিক্ষা আছে; সুতরাং তাঁর কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

চা জিনিষটা আমাদের পানীয় হিসাবে প্রিয় হয়ে উঠেছে। টি মার্কেটিং এক্সপ্যান্সন্ বোর্ড (চা বিক্রয় সমিতি) এর প্রচারকার্য্যের কল্যাণে বাংলার নিভৃত গ্রামের সাধারণ চাষীরাও চা-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু চা-শিল্প যে আমাদের কতোবড় শিল্প সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। আমরা শুধু জেনে রেখে দিয়েছি যে, পৃথিবীতে যে পরিমাণ চা প্রয়োজন হয় তার বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ যোগান দেয়, কিন্তু এই চা-শিল্পে কত সংখ্যক লোক জীবিকা অর্জ্জন করছে এবং এর দ্বারা শিক্ষিত বেকারদের জীবিকার্জ্জনের কি সুবিধা

হতে পারে তা' আমাদের সকলকার জানা নেই। তা যদি জানা থাকতো তাহলে পানীয় হিসাবে আমরা চায়ের যেমন সমাদর করি, শিল্প হিসাবেও তাকে তদ্রূপ করতাম।

চা-শিল্পের ইতিহাস এবং তার উন্নতি ও প্রসারতার বিবরণী বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবেশবাবু বলেছেন যে ভারতবর্ষ হ'তে যে পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী হয় তার মূল্য হচ্ছে ২০ কোটি টাকার কাছাকাছি এবং ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যের মোট টাকার অঙ্কের এ হচ্ছে প্রায় এক অষ্টমাংশ।

রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলা ও পাটের পরেই চা-এর স্থান। সুতরাং এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে চা-শিল্প একটি কতো বড় শিল্প। উৎপন্ন তুলা বিদেশে চালান যায় এবং তা ছাড়াও দেশের বস্ত্রশিল্পের সূতা যোগায়। বস্ত্রশিল্পে কতো ব্যক্তি যে প্রতিপালিত হয় তার ইয়ত্তা নেই। উৎপন্ন পাট বিদেশে চালান যায় এবং এ দেশীয় চটকলসমূহও পাট ক্রয় করে। পাট বিক্রয়, পাটের দালালী এবং পাট কলসমূহ থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পাট কলসমূহ এতো বেশী লভ্যাংশ প্রদান করতো যে, দেশের লোকের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, কোন ব্যক্তির পাটকলের একখানি সেয়ার থাকলে তাকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আর ভাবতে হয় না। চা-শিল্পও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার। চাবাগান কোম্পানীসমূহও চটকলগুলির মতো এত বেশী হারে লভ্যাংশ প্রদান করতো যে, দেশের লোকের চাবাগানের সেয়ার ক্রয় করবার জন্য আগ্রহের অন্ত ছিল না। লোকে গহনা বিক্রয় ক'রে জলপাইগুড়ির চা-বাগানের সেয়ার কিনত।

এতদিন পর্য্যন্ত চায়ের ব্যবসা রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে বহুলাংশে সীমাবদ্ধ ছিলো, কিন্তু কয়েক বছর পূর্ব্ব থেকেই চায়ের ব্যবসা দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। আজকে এ কথাটী বলা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয় যে, রপ্তানী বাণিজ্যে টাকার অঙ্ক বেশী হলেও আভ্যন্তরীণ চায়ের ব্যবসায়ে বেশী লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যতগুলি কাঁচা চা ও পানীয় চা বিক্রয় করার দোকান আছে তার যদি একবার হিসাব নেওয়া যায় তাহলে তা আমাদের কথার যথার্থতা সপ্রমাণ করবে। ঐ হিসাব হতে দেখা যাবে যে লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এটী সর্ব্ববাদীসম্মত যে, সহরসমূহই দেশের মধ্যে সভ্যতা বিস্তারে অগ্রদূত হয়ে থাকে, কিন্তু সংস্কৃতিগত সভ্যতা এখনো পল্লী-গ্রামে প্রবেশলাভ না করলেও চা-সভ্যতা নিভৃত পল্লীর প্রান্তসীমা অতিক্রম করে ইতিমধ্যে বিজয়কেতন উড়িয়ে দিয়েছে। চা-শিল্পের এই অসামান্য বিজয় সাফল্যে ব্যবসায়ী-মাত্রেই গৌরবান্বিত।

২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে চায়ের কাটতি ছিল মাত্র ২ কোটি পাউণ্ড—আজ চা বিক্রয় সমিতির কয়েক বছরের প্রচারের ফলে সেই কাটতি দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি পাউণ্ড। ব্যবসার এই রকম প্রসারতা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এর থেকে একটী জিনিস আমাদের শেখবার আছে। আমরা জানি লোকের হাতে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেই

তার জিনিষের কাটতি বাড়ে। কিন্তু এই প্রচলিত ব্যবস্থার একমাত্র ব্যতিক্রম আমরা দেখলাম চা-শিল্পের প্রসারতায়। বাংলার অর্থনীতি ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, গত কয় বছরে দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতার পরিমাণ কিছুমাত্র বাড়েনি, বরং কমেছে। দেশের যে অগণিত কৃষক সমাজের মধ্যে বর্ত্তমানে চায়ের নেশা ছড়িয়ে পড়েছে তাদের ক্রয় ক্ষমতা এতটা কমে গিয়েছে যে তা ধারণা করা যায় না। অথচ ঐ ক্রয় ক্ষমতাহীন কৃষক সমাজের মধ্যেই চায়ের কাটতি সবচেয়ে বেড়েছে। অর্থনৈতিক সূত্রের দিক দিয়ে ব্যাপারটা খুব উল্টোপাল্টা শোনালেও বিষয়টা সত্য, একেবারে খাঁটি সত্য। সুতরাং দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা যাই থাকুক না কেন, আমরা যদি কোন পণ্যদ্বারা জনসাধারণের মন ভোলাতে পারি তাহলে সেই পণ্যদ্রব্যের কাটতি যে রীতিমত বেড়ে যাবে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই।

যাক্‌গে সে কথা! আমরা দেখেছি যে, কি আভ্যন্তরিণ বাণিজ্যে—কি রপ্তানী বাণিজ্যে চায়ের কাটতি রীতিমত বেড়ে গেছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে, এতে কি আরও অধিক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হয় না? যে শিক্ষিত বেকারের দল আজ গৃহের শান্তি, সমাজের শান্তি, দেশের শান্তি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছে তাদের কি এই শিল্পের মধ্যে নিয়োজিত করা চলে না? এই প্রশ্নেরই আমাদের যথাযথ উত্তর দেওয়া দরকার।

চা বিক্রয় ব্যাপারে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই জীবিকা নির্ব্বাহ হচ্ছে, কিন্তু চা উৎপাদন ক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগ করবার আরও যথেষ্ট স্থান রয়েছে। আসামের চা বাগানে কাজ করবার নামে আমাদের স্বতঃই একটা সংস্কার-বদ্ধ ভীতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই ভীতি যে একেবারে মিথ্যা একথাটা জোর করে বলা যায় না, কেননা, চা-বাগানের কর্ম্মচারী ও কুলীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী এখনো লোকে বিস্মৃত হয় নি। এখনো যে সেখানকার কুলী ও কর্ম্মচারীদের বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা বর্ত্তমান সম্মিলিত কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সংস্কারমূলক প্রস্তাব হতেই বোঝা যায়। কিন্তু একটা অস্পষ্ট ভীতির আশঙ্কায় নির্ব্বিবাদে বেকার যন্ত্রণা ভোগ করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে চা-বাগানের কাজে অসুবিধা থাকলে শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিয়োগের দ্বারাই তা' দূরীভূত হতে পারে। এর কারণ হচ্ছে যে গলদ কোথায় এবং তা প্রতিকারের উপায় কি তা শিক্ষিত কর্ম্মচারীই খুব শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারে।

আরও একটি ব্যাপারের দ্বারা শিক্ষিত বেকারদের চা-উৎপাদন ব্যাপারে নিযুক্ত করা যায়। চা-উৎপাদন কৃষিকার্য্যের ব্যাপার, সুতরাং জমিতে বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিপদ্ধতি পরিচালিত করলে একর পিছু জমিতে চায়ের উৎপাদন ও গুণাগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আজ যে জমিতে সাধারণ চা উৎপন্ন হয় বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সেই জমিতেই ভাল কোয়ালিটির চা উৎপাদিত হ'তে পারে। কিন্তু তার জন্য কৃষি-বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে প্রধানতঃ সাধারণ কুলির দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। চা বাগান মালিক সমিতির নিকট হ'তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্ম্মে যদি প্রতিশ্রুতি পান যে তাদের ডিগ্রিপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদেরই

মালিকগণ নিযুক্ত করবেন তাহলে কৃষিবিজ্ঞান ও জমি বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে করে নিয়োগের একটি নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। তাছাড়া ম্যানেজারের অধীন অপরাপর কর্ম্মচারীর পদের প্রতি যদি শিক্ষিত বেকারেরা নজর দেন এবং মালিকগণ যদি সেই সমস্ত পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ড মারফৎ শিক্ষিত বেকারদেরই নিযুক্ত করেন তাহলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কথঞ্চিৎ হ্রাস পাবে বলেই মনে হয়।

এইখানে চায়ের রপ্তানী বাণিজ্যের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। পূর্ব্বেই বলেছি যে, চা রপ্তানী বাবদ ভারতবর্ষ প্রতি বছর প্রায় ২০ কোটি টাকা পেয়ে থাকে। এই টাকার অঙ্ক যদি আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে চা-বাগানগুলির কাজ ভাল চলার দরুণ যে অধিক মাত্রায় সেখানে লোক নিযুক্ত হবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্তির পথে বাধা আছে। বাধা হচ্ছে অপরাপর চা উৎপাদনকারী দেশের প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্য শুল্কের বাঁধন। এই উভয় প্রকার চাপে পড়ে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়া ত দূরের কথা সঙ্কীভূত হবার দাখিল হয়েছে। প্রত্যেক দেশের রপ্তানীর পরিমাণ আন্তর্জাতিক কমিটির দ্বারা যদি আরও অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করা না যায় তাহলে যোগান বেশী হওয়ার দরুণ দর আরও পড়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে চা-শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আসামের কাছাড় সিলেট বাগানের পক্ষে সে ক্ষতি হবে দুঃসহ। কারণ, কাছাড় সিলেট বাগানের চা উৎকৃষ্ট নয়, তার উৎপাদন খরচা অপেক্ষাকৃত বেশী। দর [illegible] পড়ে যায় ত তার পক্ষে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া, ১৯৩২ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে 'প্রেফারেন্সিয়াল ট্যারিফ' অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব-মূলক শুল্ক প্রবর্ত্তিত হয়েছে তদ্বারা ভারতের লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই হয়েছে বেশী। কারণ উক্ত শুল্ক ব্যবস্থার [illegible] বৃটেন ছাড়া অপরাপর ক্রেতা দেশ [illegible] হারিয়েছে। সুতরাং উক্ত ব্যবস্থা [illegible] হয় ততই মঙ্গল।

আমরা উপরে চা-শিল্প ও তাহাতে শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য [illegible] করলাম। চা-বাগানের মালিক ও কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী

বিজ্ঞাপন

১৯৩৯ ৪০ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর মুদ্রণ কার্য্যাদি করিবার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক দুইটি টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

১। [illegible]ing papers বা সভার কার্য্য বিবরণাদি ছাপিবার জন্য বার্ষিক টেণ্ডার।

২। ফরম, রেজিষ্টার প্রভৃতি ছাপিবার জন্য বার্ষিক টেণ্ডার।

[illegible] কিহি [illegible] খামের উপর উপরোক্ত দুইটী শি[illegible] দি [illegible] খ্যামের নামে ১৯৩৯ সালের [illegible] র বেলা ২টা পর্য্যন্ত টেণ্ডার [illegible] স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক [illegible]হা গ্[illegible]

প্রে[illegible] র সহিত কেশীয়ার বা [illegible] নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সার্টি-[illegible] দাখিল করিতে হইবে যে, ১৯৩৯ সালের ২৮শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ২ ঘটিকায় কিম্বা তৎপূর্ব্বে নগদ ১০০ টাকা অথবা তাহার [illegible] মূল্যের কোম্পানীর কাগজ অগ্রিম জমা [illegible] হইয়াছে। যদি কোন টেণ্ডার দাতা তাঁহার টেণ্ডার গৃহীত হইবার পর টেণ্ডার [illegible] করেন, অথবা টেণ্ডার গৃহীত হইবার পর এক পক্ষকাল সময়ের মধ্যে উপরি উক্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য নি[illegible] ব[illegible] [illegible] চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিতে এবং [illegible] [illegible] [illegible] দশ ভাগ জমা দিতে অস্বীকার [illegible] করেন, তাহা হইলে [illegible] অগ্রিম জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

যে সকল ফরম, রেজিষ্টার প্রভৃতি ছাপান দরকার তাহার নমুনা এবং বার্ষিক তাহা কি পরিমাণ প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ আফিস খোলা থাকিবার দিন বেলা দুইটা হইতে চারিটার মধ্যে ষ্টোর কীপারের আপিসে পাওয়া যাইবে।

মিউনিসিপ্যালিটীর টেণ্ডার বিভাগে এক টাকা মূল্যে টেণ্ডার ফরম্ ও সিডিউল পাওয়া যাইবে। অন্য কোন ফরমে টেণ্ডার দিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

নিম্নতম মূল্যের টেণ্ডার, অথবা কোন বিশেষ টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কিম্বা কোন টেণ্ডার গ্রহণ না করিবার কারণ দর্শাইতে কমিশনারগণ বাধ্য নহেন।

টেণ্ডার দাতাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, তাঁহাদের লিনোটাইপ্ মেসিন আছে কিনা।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
হাবড়া
১৯ই মার্চ্চ, ১৯৩৯

জে, সি, দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী

ব্যাঙ্কিং ও বীমা কোম্পানীর নানাকথা

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে হিন্দু মিউচুয়্যালের সেক্রেটারী মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল আগামী বৎসরের জন্য Indian Life offices' Association-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বীমা জগতে মিঃ রায়ের নাম সুপরিচিত এবং বীমা বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। ভারতীয় বীমা আপিস সমূহের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তির সমুচিত আদর করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। পূর্ণবাবুর সভাপতিত্বের কালে ভারতীয় বীমা এক্টের ধারা-

গুলি সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী ভাবে আমলে আসিবে। এই আইনের ক্ষতিকর ধারাগুলি সম্বন্ধে ভারতের নানা স্থান হইতে বীমা বিলের আলোচনার সময় এবং বীমা এ্যাক্ট পাস হইবার পরেও তুমুল প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। আশাকবি পূর্ণবাবুর পরিচালনায় বীমা এ্যাক্টের আপত্তিজনক অংশগুলি সুস্পষ্টরূপে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের অগ্রগতির পথে যে সকল বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তাহা সংশোধন করিবার জন্ম আন্দোলন আরম্ভ হইবে।

—✦—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে ভারতের প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানী Empire of India-র বর্ত্তমান বৎসবের চলতি বীমাব পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটী টাকা, মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটী টাকা এবং এ যাবৎ বীমাকারীদিগের দাবী পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটী টাকা।

—✦—

আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ২নং মিলে নানারূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে এবং এই মিলের বস্ত্রাদি অতি শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে।

—✦—

আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম হেয়ার ষ্ট্রীটস্থ Central Calcutta Bank দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ দেবীদাস রায়ের সহিত যাঁহারা একবার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি অল্পভাষী হইলেও অত্যন্ত মৃদুভাষী এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনায় সিদ্ধ হস্ত। ইঁহারা ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে কার্য্য বৃদ্ধির জন্ম শাখা স্থাপন করিতেছেন। দক্ষিণ কলিকাতা এবং শ্যামবাজারে ইঁহাদেব শাখা আছে এবং মফঃস্বলেব মধ্যে সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর ও নৈহাটীতে শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাশী নগরীতে ভিজিয়ানা গ্রামের মাননীয় মহারাজকুমার এই ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের উৎসবে পৌরহিত্য করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদেব উন্নতি কামনা করিতেছি।

—✦—

Bhowanipur Banking Corporation একেবারে নির্জ্জলা বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক। ১৮৯৬ খৃঃ ইহা সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রথম স্থাপিত হয় এবং নানা অবস্থার মধ্য দিয়া ইহা উন্নতির উচ্চ শিখবে আরোহণ করিয়াছে, আর ৭ বৎসর পরেই ভবানীপুর ব্যাঙ্ক তাহাব স্বর্ণ জুবিলি (Golden Jubilee) সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিবে। যে সকল বিশ্ব নিন্দুকেরা বলে যে বাঙ্গালীরা ব্যাঙ্কের কাজ বুঝে না বা ব্যাঙ্ক চালাইতে জানে না তাহাদেব চোখে আঙ্গুল দিয়া আমরা এই ভবানীপুর ব্যাঙ্কেব কার্য্য পরিচালনা দেখাইতে চাই। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আহেল্ ইংরাজ পরিচালিত সিভিলিয়ানদিগের Alliance Bank of Simla, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে যাঁহারা মুখ্য কুলীন বলিয়া বড়াই করিয়া বেড়ান সেই বোম্বাইয়ের চুণীলাল সারায়া প্রতিষ্ঠিত Indian Specie Bank এবং ইংরেজ প্রতি-

ষ্ঠিত Bank of Burma লালবাতি জ্বালাইয়াছে এবং ব্যাঙ্কিং জগতে নানাস্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সকল খণ্ড প্রলয়ের মধ্যেও বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত এই ভবানীপুর ব্যাঙ্ক অচল অটল হইয়া মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা বাঙ্গালীর কম কৃতিত্বের কথা নহে। ভাবানীপুর ব্যাঙ্ক আজ যে অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে তাহাতে খাস কলিকাতা সহরের মধ্যস্থলে একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত দরকার। কলিকাতার লোকের পক্ষে ভাবানীপুরে যাইয়া ব্যাঙ্কের account খোলা নানা কারণে অসুবিধাজনক। কর্ত্তৃপক্ষ যদি Dalhousie Square অঞ্চলে কিম্বা তাহার আশেপাশে তাঁহাদের একটি শাখা কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা হইলে ভবানীপুর ব্যাঙ্কের জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম আছে তাহাতে আমাদের মনে হয় যে অচিরকালের মধ্যে বহুলোক এই ব্যাঙ্কের সহিত লেনা দেনা আরম্ভ করিবে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে বলি। ভবানীপুর ব্যাঙ্কের এই সাফল্যের জন্য আমরা ইহার সভাপতি হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রায় এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র সেন ও অন্যান্য
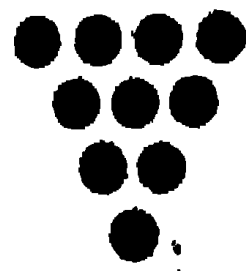
সহকর্ম্মীদিগকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কের পরেই Bengal Central Bank সমগ্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইয়া মাথা খাড়া করিয়া দাড়াইয়াছে। ১৯১৮ সালে স্থাপিত হইয়া আজ ২০ বৎসর কাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া এই ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর পাঁচ বৎসর পরেই ইহার রজত জয়ন্তী উৎসব দেখিব আশা করিতেছি। কলিকাতা এবং সহরতলীর অধিবাসীদিগকে ব্যাঙ্কিং-এর নানারূপ সুবিধা দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতার নানাস্থানে ইহার শাখা স্থাপন করিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক ছাড়া ব্যবসায়ে দাঁড়াইবার অথবা সাফল্য লাভ করিবার কোন উপায় নাই। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগকে অন্তকোন ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ সাহায্য করে না এবং করিবে না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা এযাবৎ কাল দেখিয়া আসিতেছি। সুতরাং বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের পশ্চাতে যদি বাঙ্গালীরা আসিয়া মদ্দৎ দিয়া না দাঁড়ায় এবং বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলিকে বড় করিয়া না তোলে তবে প্রয়োজনের সময় তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিবার দুনিয়ায় কেহ থাকিবে না। বাঙ্গালী যে ব্যাঙ্কের কাজ জানে, বুঝে এবং দক্ষতার সহিত চালাইতে পারে তাহার প্রমাণ চোখের সামনেই সকলে দেখিতে পাইতেছে। সুতরাং এখনও যদি তাহারা বিশ্বনিন্দুকের মত বলিয়া বেড়ায় "ডেপুটি হইলে কি হয়—মাইনা পায় না" তাহা হইলে আমরা নাচার।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর রজত জয়ন্তী

(Silver jubilee)

পুণা সহরে সম্প্রতি ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার রজতজয়ন্তী মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে কোম্পানীর কলিকাতাস্থ চীফ এজেন্সী আপিসেও এই রজতজয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন করার জন্য মিঃ এস সি দাস বিপুল আয়োজন করিতেছেন। এপ্রিল মাসে ইষ্টারের ছুটির মধ্যে এই উৎসব কলিকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হইবে। পুণার রজত জয়ন্তীতে মিঃ দাস বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিতে গিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে তাঁহার এজেন্সীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় কোম্পানী মিঃ দাসকে বিশেষভাবে সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করিয়াছেন এবং একটি মূল্যবান স্মারক চিহ্ন উপঢৌকন দিয়াছেন।

১৩৪৫ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যের বর্ষ সূচী

বৈশাখ মাস

বিষয়	পৃষ্ঠা

জ্যৈষ্ঠ মাস

বিষয়	পৃষ্ঠা

আষাঢ় মাস

বিষয়	পৃষ্ঠা

শ্রাবণ মাস

ভাদ্র মাস

আশ্বিন মাস

বিষয় সূচী

মাঘ মাস

ফাল্গুন মাস

চৈত্র মাস

ব্যবসা ও বাণিজ্যের নিয়মাবলী।

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য

মূল্য

"ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ নগদ ৫।৵০ ভিঃ পিঃ তে লইলে ৫৸৵০ ; প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য হাতে হাতে ৷৹, নমুনা চাহিলেও ঠিক ঐরূপ মূল্য লাগে। কিন্তু নমুনা বলিয়া আমরা কোন বিশেষ সংখ্যা ছাপাই না। হালের যে কোন সংখ্যা পাঠাই। বিনা মূল্যে কিংবা ভিঃ পিঃ ডাকে কাহাকেও নমুনা পাঠান হয় না। অগ্রিম মূল্য বাবদ আট আনার পোষ্টেজ পাঠাইলে তবে পাঠান হয়। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয় ; এবং বৎসরের যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হ'ন না কেন, **বৎসরের প্রথম হইতে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে কাগজ লইতে হয়।**

অপ্রাপ্ত সংখ্যা

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের মধ্যেই অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে ও আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগকে জানাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ডাক বিভাগে তাহার তদন্ত করিয়া সেই তদন্তের মর্ম্ম এবং ফলাফল আমাদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে ; নতুবা গ্রাহকদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যাখানির জন্য মূল্য ও ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন অথবা ঠিকানা পরিবর্ত্তন

বিজ্ঞাপন কিংবা ঠিকানা বদলাইতে হইলে পূর্ব্ববৎ বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যেই জানানো চাই, নচেৎ কাগজ না পাইলে কিংবা বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত না হইলে আমরা দায়ী নহি।

পত্রোত্তর

রিপ্লাই কার্ড এবং টিকিট না পাইলে সাধারণতঃ কোন চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

প্রবন্ধাদি

টিকিট দেওয়া থাকিলে কিম্বা পাঠাইয়া দিলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়। প্রবন্ধ "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা প্রবন্ধ পাঠাইবার এক পক্ষকাল পরে রিপ্লাই কার্ডে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

"ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী" অধ্যায়ে যাঁহারা মফঃস্বলে নানা বন্দর, বাজার, গঞ্জ, মোকাম এবং আড়তদারদিগের নাম ঠিকানা এবং সেই সকল স্থানের আমদানী রপ্তানী দ্রব্যাদির বিশেষ বিবরণ সঠিক সংগ্রহ করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশের জন্য পাঠাইবেন, ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হইলে, তাঁহারা একখানি বিনামূল্যে উপহার পাইবেন কিন্তু অন্ততঃ চারিটী মোকামের বিবরণ পাঠানো চাই।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

মলাটের ১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৫০৲	মলাটের ২য় এবং ৩য় পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ স্থানের চার্জ্জ—	৩০৲
মলাটের ২য় পৃষ্ঠা	৫০৲	পুস্তকারম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠার চার্জ্জ—	৬০৲
মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা	৫০৲		
মলাটের ৪র্থ বা শেষ পৃষ্ঠা	৭০৲	পুস্তকের ভিতর প্রবন্ধাদির মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ	
বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রকাশ করিলে সাধারণ পৃষ্ঠা	২০৲	করিলে তাহার পুরা পৃষ্ঠার চার্জ্জ—	৩০৲

1227